NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : HISTORY

PAPERS : 1 - 4

POST GRADUATE
HISTORY

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ইতিহাস　　　　　　　　　　　　　　　　স্নাতকোত্তর স্তর

প্রথম পত্র
পর্যায় 1-4

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার	
পর্যায় 2	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত
পর্যায় 3	অধ্যাপক শুভাশিস বিশ্বাস	
পর্যায় 4	অধ্যাপক শুভাশিস বিশ্বাস	

দ্বিতীয় পত্র
পর্যায় 1-4

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত
পর্যায় 2	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত	—
পর্যায় 3	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত	—
পর্যায় 4	অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

তৃতীয় পত্র
পর্যায় 1

	অনুবাদক	অনুবাদ সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক রাজেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	অধ্যাপিকা কেকা দত্তরায়

পর্যায় 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক নির্মাণ বসু	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত
একক 2	অধ্যাপিকা হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়	—
একক 3	অধ্যাপিকা হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়	—
একক 4	অধ্যাপক নির্মাণ বসু	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

পর্যায় 3

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. কেকা দত্তরায়	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত
একক 2	—	—
একক 3	—	—
একক 4	—	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

পর্যায় 4
চতুর্থ পত্র
পর্যায় 1-3

		মূল রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1		অধ্যাপক অলোক কুমার ঘোষ	অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ
পর্যায় 2	একক 1	অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ	
	একক 2	অধ্যাপক তপন চ্যাটার্জী	অধ্যাপক প্রাঞ্জল ভট্টাচার্য
	একক 3 & 4	অধ্যাপিকা চিত্রা অধিকারী	অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ
পর্যায় 3		অধ্যাপিকা নিখিলেশ গুহ	অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পালিত

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG History 1 - 4

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

প্রথম পত্র

পর্যায় 1

একক 1	❑ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	9
একক 2	❑ মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার এবং মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠতা	30
একক 3	❑ মুঘল শাসননীতির প্রকৃতি	34
একক 4	❑ সম্রাট ও শাসকগোষ্ঠী	53

পর্যায় 2

একক 5	❑ মুঘল শাসননীতির সংকট	67
একক 6	❑ জায়গীরদারী সমস্যা	78
একক 7	❑ মুঘল সমাজ ও অর্থনীতি	83
একক 8	❑ মুঘল নগরায়ণ	95

পর্যায় 3

একক 9	❑ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন	102
একক 10	❑ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	106
একক 11	❑ বিদেশি আক্রমণ	118
একক 12	❑ মুঘল পতনের ইতিহাস রচনা	120

পর্যায়
4

একক 13	❑ অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো	127
একক 14	❑ কোম্পানি ও ভারতীয় বণিকরা	132
একক 15	❑ পলাশী যুদ্ধের পটভূমি ও ইঙ্গ-ফরাসীদ্বন্দ্ব	137

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায়
1

একক 1	❑ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা	145
একক 2	❑ বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির সুদৃঢ়ীকরণ	152
একক 3	❑ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমান্ত বিস্তার নীতি	162
একক 4	❑ মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭)	178

পর্যায়
2

একক 5	❑ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা	193
একক 6	❑ কৃষক বিদ্রোহ	197
একক 7	❑ সম্পদ নিষ্কাশন নীতি	204
একক 8	❑ ভারতে রেলপথের সূত্রপাত ও তার ফলাফল	216

পর্যায়
3

একক 9	❑ ভারত সম্বন্ধে পূর্ব মনোভাব	224
একক 10	❑ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া	231
একক 11	❑ ১৮৫৭ সালের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন	241
একক 12	❑ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার	246

পর্যায়
4

একক 13	❑ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট	254
একক 14	❑ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা	258
একক 15	❑ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা	262
একক 16	❑ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্ কংগ্রেসী যুগ	265

তৃতীয় পত্র

পর্যায়
1

একক 1	❑ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ	273
একক 2	❑ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি : নীতি এবং কার্যক্রম	277
একক 3	❑ সাম্প্রদায়িকতা : উত্থান এবং বৃদ্ধি	284
একক 4	❑ ভারতের জাতীয় আন্দোলন : পরিবর্তনশীল অবস্থা	289

পর্যায়
2

একক 1	❑ ভারতীয় অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	303
একক 2	❑ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ	314
একক 3	❑ Congress—অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন	323
একক 4	❑ কংগ্রেস ও ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণি	336

পর্যায়
3

একক 1	❑ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ	357
একক 2	❑ বামপন্থার উত্থান ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম	371
একক 3	❑ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা ১৯৪২-এর আগস্ট বিদ্রোহ	390
একক 4	❑ ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের দিকে	403

পর্যায়
4

একক 1 ❑ ১৯৪৭ সালে ভারত 427
একক 2 ❑ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 435
একক 3 ❑ স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার 439
একক 4 ❑ বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪) 444

চতুর্থ পত্র

পর্যায়
1

একক 1 ❑ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পরিধি 455
একক 2 ❑ ইতিহাস-রচনার বিভিন্ন পর্যায় 464
একক 3 ❑ ইতিহাস রচনাতে বার্লিন বিপ্লবের অবদান 470
একক 4 ❑ ইতিহাস-রচনা ও প্রগতির ধারণা 475

পর্যায়
2

একক 5 ❑ মার্কস এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব 481
একক 6 ❑ মরিস ডব এবং পুঁজিবাদের উত্থান 492
একক 7 ❑ সামাজিক ইতিহাসের কাঠামো এবং মনস্তত্ত্ব 504
একক 8 ❑ ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাসে মার্কসীয় ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল, এরিখ হব্‌স্‌বম্‌ এবং ই. পি. থম্পসন এবং নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস 509

পর্যায়
3

একক 9 ❑ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ 520
একক 10 ❑ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া 538
একক 11 ❑ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা 552
একক 12 ❑ ঐতিহাসিক বিতর্ক 576

একক ১ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ মুঘল ইতিহাসের উপাদান
১.২ মুঘল সাম্রজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর
১.৩ আকবরের পূর্বে মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তার
১.৪ বাবরের ভারত পর্যালোচনার সত্যতা
১.৫ হুমায়ুন

১.০ প্রস্তাবনা

মুঘল যুগের ইতিহাস পড়ার অর্থ হল প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানা। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হ'ল মুঘল সাম্রাজ্য। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন, তবে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই আকবরের আমলে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা হয়। এই গ্রন্থের চারটি পর্যায় থেকে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার, পতন, বিভিন্ন আর্থসামাজিক দিক, ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসার ইত্যাদির কথা জানতে পারি।

১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপনা

মুঘলদের ভারতে শাসনের বিস্তারিত তথ্য ইউরোপ-কেন্দ্রিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত উপাদানগুলি থেকে পাওয়া যায়। এর কারণ ইউরোপীয়রাই ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাস লিখতে শুরু করে। এদের মধ্যে আছেন হেনরী মেন, ম্যাকলে, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি বৃটিশ প্রশাসনিক ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস ব্রিটিশ দখলদারদের হাতে বিকৃত হয়। তারা এই মতবাদ উপস্থাপন করে যে পূর্ববর্তী সভ্যতা ছিল দিব্যতান্ত্রিক এবং তাদের সভ্যতা এই দিব্যতান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে উন্নত। এ্যানি বিভারেজ "তুজুকে-ই-বাবুরী ভুল ভাষ্য প্রদান করেন। তিনি অযোধ্য নিয়ে লেখেন। এছাড়া ইতিহাসের কালবিভাজনেরও সমস্যা আছে। মধ্যযুগীয় ভারতকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাথে তুলনা করা হয়। সামাজিক নিয়মকানুন ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারত ও ইউরোপকে সমান্তরাল ধরা হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল বর্বর ও অন্ধকারযুগ। ইউরোপীয়রা একইভাবে ভারতের ঐ সময়কে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করেছে। এছাড়াও এই ইতিহাস ছিল উত্তর কেন্দ্রীক। ইউরোপীয় কালবিভাজনে বর্তমানকে গৌরবান্বিত করার সাথে সাথে মধ্যযুগের ইতিহাসকে হেয় করার উপর জোর দেওয়া হয়।

মুঘল রাজত্বের সময়কালের ইতিহাস জানার পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া যায়। ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল বাদশাদের সময়ানুক্রমিক শাসনের বিবরণীই শুধুমাত্র আছে তা নয়। প্রত্যেক শাসনের একাধিক লিখিত বিবরণ আছে। এই সময়কার লেখাগুলি ফার্সি ভাষায় লেখা। এগুলি রাজসভার ঐতিহাসিক এবং সে সময়কার ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী দক্ষ লোকদের দ্বারা লিখিত। ভারতে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আর্বিভাবের সময় থেকে মুঘল বাদশাদের সময়কালের শাসনের সাধারণ ইতিহাসও বেশ কিছু লেখা আছে। তাই এই উপাদানকে সরকারী এবং

বেসরকারী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

সরকারী উপাদানে আত্মচরিত বা জীবনীগুলিকে ফেল্যা যায়। এগুলি মূলত সরকারী সহায়তায় বা সরকারী খবরের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। রাজ দরবারের বিবরণ এবং সময়ানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী পারসিকদের দ্বারা লিখিত। এই রচনাগুলি রাজা বা রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত। অন্য সরকারী নথীর মধ্যে রয়েছে সরকারী চিঠি, আইন, ঘোষণা, ফর্মান, দলিল, সরকারী নথী হিসাবে রক্ষিত আদালতের আদেশ ও বিধিবদ্ধ আইনগুলি।

বেসরকারী উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান হল বিদেশীদের দ্বারা লেখা বিবরণী। এছাড়া আছে প্রাদেশিক বেসরকারি উৎস, মৌখিক ইতিহাস ও কৃষ্টিয় শিল্পকলা।

জীবনী ও আত্মচরিত

তুজুক-ই-বাবরী ও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর আত্মচরিত দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নিজের স্মৃতিকথা তুজুক-ই-বাবরী এই সময়কার প্রথম রচনা। এটি তার অবসর সময়ে লেখা তুর্কীতে আত্মজীবনী। দুঃখের বিষয় এ'টি সম্পূর্ণ নয় এবং এর প্রাপ্ত সমস্ত কপিগুলিতে তিনটি ফাঁক থেকে গেছে। মুঘল শাসনের সমস্তকালে এ'টি এত জনপ্রিয় ছিল যে এটি চারবার ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়। বাবরের শাসনকালের এবং হুমায়ুনের জীবনের আদিপর্বের এটি সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। লেখকের রচনা শৈলী সহজ অকপট এবং তাজা। এখানে তিনি নিজের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেননি। রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর বর্ণনা ছাড়াও তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিখুত বর্ণনা এতে আছে। আছে রাজত্বের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। এছাড়াও মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতের খুব সুন্দর তুলনা বাবর দিয়েছেন। মধ্য এশিয়ার রাজনীতি এবং অবস্থা, যা নাকি তাঁকে ভারতে আসতে বাধ্য করেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুজুক-ই-বাবরীতে পাওয়া যায়। এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি শত্রুদের উপর অত্যাচার না করার উপদেশ দেন। তিনি কবিও ছিলেন এবং সাহিত্যের প্রতি তার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। মধ্য এশিয়ার কৃষ্টি ও ভৌগলিক দৃশ্যপট এই আত্মজীবনীতে ধরা দেয়। ভারতের আবহাওয়া নিয়ে তিনি অখুশী ছিলেন এবং তাই মৃত্যুর পর কাবুল নদীর ধারে সমাহিত হবার ইচ্ছা তিনি এই বিবরণীতে লিখে যান। তবুও এই উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনীর সবকিছু যাচাই না করে সঠিক বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এই আত্মজীবনীর তৃতীয় খন্ডকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস বলে ধরা যেতে পারে। এটি সেই সময়ের এক অন্যতম চিত্রাকর্ষক রচনা।

অপর আত্মজীবনীটি হচ্ছে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী। এ'টি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুই খন্ডে রচিত আত্মজীবনী। তিনি নিজে ১৭ বছর ধরে এই স্মৃতিকথা লেখেন। এরপর এই কাজ মুট্টামুদ্দিন খাঁর উপর ন্যস্ত হয় এবং তা রাজকীয় শাসনের ১৯ বছরের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে। মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হবার পরের সম্পূর্ণ কাহিনী এতে ধরা আছে। তিনি নুরজাহানের সাথে তার সম্পর্ক এবং কিভাবে তিনি ক্ষমতা দখল করেন তার বর্ণনা দেন।

এই খন্ডদুটি মূলত ভারতের সাথে মুঘলদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়টির উপর জোর দেয়।

এরপরেই বাবর এবং হুমায়ুন সংক্রান্ত খবরাদির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল তারিখ-ই-রসিদি। এটি বাবরের গুণগ্রাহী এবং বন্ধু তাঁর ভাইপো মীর্জা মহম্মদ হায়দার দৌলত রচনা করেন। যেহেতু লেখক নিজের চোখে নানা ঘটনা বিশেষ করে বাবরের জীবন সংগ্রাম এবং হুমায়ুনের কাশ্মীর বিজয় দেখেছেন তাই এ'টি বাবর এবং হুমায়ুনের বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। ঐতিহাসিক খন্দ আমিরের লেখা হাবিব-উসসিয়ার এবং হুমায়ুননামা প্রসিদ্ধি লাভ করে। হাবিব-উসসিয়ার তেহেরানে মুদ্রিত হয়। বাবর এবং হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম তিন বছরের উপর এটি আলোকপাত করে।

হুমায়ুনের নির্দেশেই হুমায়ুননামা লেখা হয়। এ'টি বিস্তৃতভাবে হুমায়ুনের তিন বছরের শাসন বর্ণনা করেছে।

হুমায়ুনের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে এ'টি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। সমসাময়িক কালের একই রকম উল্লেখযোগ্য আর একটি গ্রন্থ হল আহাসান-উস-সিয়ার। এটি মীর্জা বরখারদারের লেখা এবং এটিতে পারস্যের শা ইসমাইলের সাথে বাবরের সর্ম্পকের বর্ণনা দেয়। হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগমের লেখা হুমায়ুননামা আকবরের বাসনা এবং প্রথম দুই মুঘল শাসকের স্ত্রীদের এবং পুত্র, কন্যা, ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে পারিবারিক সর্ম্পক তদোপরি সামাজিক ও হারেমের জীবন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। হুমায়ুন রাজত্বের আর একটি ঘটনাপঞ্জী হল তৌহর আফতাবের তাজকিরত-উল-বাকিয়ত। এ'টি আকবরের আদেশে ১৫৮৭ সালে লেখা হয়। হুমায়ুনের বাল্যকাল সর্ম্পকে এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র। শাতাহমাস্পসের তাজকিরাত-ই-তাহমাস্পসে্ হুমায়ুনের পারস্যবাসের ইতিহাস পাওয়া যায়। বায়জিৎ বিয়াতের স্মৃতিকথা এবং তারিখ-ই-হুমায়ুন দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম কিছু বছরের বর্ণনার আর একটি বিশেষ সূত্র হল গিয়াসুদ্দিন মহাম্মদ খন্দ আমিরের লেখা কানুন-ই-হুমায়ুনি।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম ধারাবিবরণী হল হাফি মুহম্মদের তারিখ-ই-আকবর। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি কান্দাহারী বলেও পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনীর লেখা তারিখ-ই-বদাউনী তিনটি খন্ডে পাওয়া যায়। প্রথম খন্ডে বাবর ও হুমায়ুনের সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খন্ড পুরোপুরিভাবে আকবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে লেখা এবং ১৫৯৪ সাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তাঁর রাজত্বকালের প্রশাসনের সমালোচনামূলক বিবরণ, তাঁর স্বভাব ও বিশেষভাবে তাঁর ধর্মের সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ একজন ধর্মান্ধ সুন্নী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা বলে আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মীয় নীতির একটি পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ। সমগ্র মুঘল যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বিখ্যাত সুফী পন্ডিত শেখ মুবারকের পুত্র আবুল ফজল-আলামী। তিনি আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং আকবরের আমলের ইতিহাস রচনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর আকবরের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। তবে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর শৈলী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাকে তিনি অতিমানব হিসাবে গণ্য করতেন, তাঁর প্রতি চাটুকারিতার দোষে বিকৃত হয়েছে। আবুল ফজলের দু'টি বিখ্যাত বই হল আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা। তিন খন্ডে বিভক্ত আকবরনামায় মুঘল রাজপরিবারের ইতিহাস তৈমুর থেকে হুমায়ুনের সময়কাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও ৩য় খন্ডে ১৬০২ এর মধ্যে আকবরের রাজত্বকালের সমস্ত ঘটনা এবং তাঁর পিছনে উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। আকবরের জীবন ও সময়কার প্রতিটি ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ করা আছে। 'আইন-ই-আকবরী' ও তিন খন্ডে রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মূলতঃ আকবরের সমস্ত বিভাগ এবং সমস্ত বিষয়ে যা যা নিয়ন্ত্রণের ধারা ছিল, তার সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও পররাষ্ট্র ও অন্যান্য বিষয়ের পরিসংখ্যানগত খুঁটিনাটিও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তৃতীয় খন্ডে রচয়িতার পূর্ব ইতিহাস ও বইয়ের তালিকা রয়েছে। আকবরের শাসননীতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র হল আইন-ই-আকবরী। খ্বাজা নিজাম-উদ্-দিনের তাবাকাৎ-ই-আকবরী মুসলমান শাসনের শুরু থেকে আকবরের রাজত্বকালের ৩৯তম বর্ষ পর্যন্ত ইতিহাসের দলিল।

যেখানে আবুল ফজলের লেখা সমাপ্ত হয় প্রায় সেখান থেকেই, মানে আকবরের রাজত্বের ৪৬তম বর্ষের থেকে আবুল ফজলের আকবরনামারই পরবর্তী ইতিহাস হল ইনায়তুল্লাহর তাকমিল-ই-আকবরনামা। মুল্লাহ মুহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহের "গুলশন-ই-ইব্রাহিমী" হল জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত মুসলমান ভারতবর্ষের ইতিহাস।

আকবরের সময়কার দুই লেখক বদাউনী ও আবুল ফজলের পারস্পরবিরোধী রচনাই ওই সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বদাউনী বলেছিলেন, "আকবর ইসলামের ধ্বংসকারী।" আবুল ফজলের বক্তব্য "আকবর নিজেই ঈশ্বর।"

যদিও শাহজাহান আত্মজীবনী রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিহাস রচনা করা হয়েছিল এবং রচনার অগ্রগতি তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রচুর জীবনী রচনা পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত উন্নতমানের

কালপঞ্জীও সহজলভ্য। এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম কাজ হল শাহজাহানের নির্দেশে লিখিত মুহম্মদ আমিন কাজিনিভির পাদশাহনামা। এই একই নামের বিখ্যাত বইয়ের লেখক আবদুল হামিদ লাহোরি। দুই খন্ডের এই বইতে শাহজাহানের জীবন ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে রাজপুত্র ও দ্বিতীয় খন্ডে শাসক হিসাবে শাহজাহানের কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। মুহম্মদ ওয়ারিস রচিত আর এক পাদশাহনামা থেকে আমরা শাহজাহানের রাজত্বকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে পারি। ইনায়ত খানের শাহজাহাননামায় ১৬৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখল ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ অধিকারের সময়কার ইতিহাস রচিত হয়েছে। আবার মুহম্মদ সাদিক খানের শাহজাহাননামায় সম্রাটের সিংহাসনারোহণ থেকে ক্ষমতাচ্যুতি পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি ছাড়া জাহাঙ্গীরের সময়ের অন্যান্য রচনাও পাওয়া যায়। যেমন খ্বাজা কাঙ্গাঁর গাইতাতের মাসির-ই-জাহাঙ্গীরি। অন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল মুতামিদ খানের ইকবালনামা ও মুহম্মদ হাদিসের ওয়াকুয়াত-ই-জাহাঙ্গীরি।

যদিও ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ করেছিলেন তাসত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মূল্যবান রচনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের আলমগীরনামা। এটি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ১০ বছরের সরকারী ইতিহাস। এই সমস্ত ইতিহাস রচনায় কোনো বাধা ছিল না। তিমুরিদ রাজবংশের সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় মুহম্মদ হাশিম কাফি খান রচিত মুন্তাখাব-উল-লুবারে। এই গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেরও সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। পরের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মুহম্মদ সাকি মুস্তাইদ খানের মাসভি-ই-আলমগিরি। এটি সরকারী কাগজপত্র ও নথিপত্রের ওপর নির্ভর করে রচিত ঔরঙ্গজেবের সময়ের একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ। আকিল খান রচিত জফরনামা-ই-আলমগিরিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঔরঙ্গজেবের দুই হিন্দু কর্মচারীও ঔরঙ্গজেবের সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন। ভীমসেন দাক্ষিণাত্যে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে অনেক সত্য ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এইগুলি তিনি "নক্সা-ই-দিলখুশা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৬৭০-১৭০৭ পর্যন্ত সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানার জন্য এই বই খুবই কার্যকরী। ১৬৫৭ থেকে ১৬৯৮ এর মধ্যে রাজস্থানের ইতিহাস পাওয়া যায় ফুতুহাত-ই-আলমগিরি নামে ঈশ্বর দাসের লেখা এক বিস্তৃত বিবরণে।

জীবনীসাহিত্য কয়েকটি সমস্যার দ্বারা বিশেষভাবে জর্জরিত।

ক) মূল পাঠ্যাংশের বিকৃতি

খ) কোন কোন সময়ে প্রক্ষিপ্তি

গ) পৃষ্ঠপোষকতার সমস্যা

ঘ) দেশে প্রচলিত কিছু গল্প

যেহেতু সমস্ত ফার্সী রচনাই সুন্দর হস্তাক্ষরের ওপর নির্ভর করত, তাই মূল পাঠের থেকে টুকে রাখার রেওয়াজ ছিল। এই টোকার পথ ধরেই কেউ কেউ নিজের ভাবনাচিন্তাও লিখে ফেলতে শুরু করে। এইভাবে বইয়ের বিকৃতি ও কোন কোন সময়ে প্রক্ষিপ্তি শুরু হয়। উপরন্তু যেহেতু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী রচিত হত, তাই এগুলি হত রাষ্ট্র-সদৃশ এবং রাষ্ট্রের কথা ছাড়া আর খুব কিছুই রচিত হত না। এই দলিলগুলি উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখানোর এক প্রচেষ্টা। নীচের থেকে ইতিহাস রচনার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এতে দারিদ্র্য, শ্রমিকের শোষণ, দুর্ভিক্ষের কথা তুলে ধরা হয়নি। সুতরাং বিদেশী পর্যটকদের রচনা, যাতে দরিদ্র মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এই পক্ষপাতদুষ্ট লেখাগুলির কোনো মিল নেই। এই রাষ্ট্রীয় দলিলগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত মতামতভিত্তিকও বটে।

আঞ্চলিক সরকারী নথিপত্রের মধ্যে সালিমুল্লাহর "তারিখ-ই-বাঙ্গালা" বাংলার ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। শাহজাদা সুজার বাংলার শাসক থাকার সময়কার বিবরণ দেওয়া রয়েছে মুই মুহম্মদের "তারিখ-শাহ-সুজা"তে। মীরজুমলার

কুচবিহার আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় শিহাবুদ্দিন আহমদ তালিশের রচনায়। শিতাব খানের "বাহারিস্তান-ই-খালিবি" তেও বাংলার ইতিহাস পাওয়া যায়। গুজরাটের ইতিহাস পাওয়া যায় আলি মুহম্মদ খানের "মীরাট-ই-আহমদি" থেকে। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে জানার জন্য অনেকগুলি রচনা গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে সৈয়দ আলি তবাতবার "বুরহান-ই-মাসির", হাবিবুল্লাহর "তারিখ-ই-মুহম্মদ কুতবশাহী এবং জাহিরুদ্দিন জাম্বরির-রচনা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারতের ইতিহাসের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা হল "তারিখ-ই-সিন্ধ" যা গুজরাটে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল নিয়ে রচিত, এবং মীর-আবু-তুরাব-ভালির "তারিখ-ই-গুজরাট"। পূর্ব ভারতের ইতিহাসের জন্য "তারিখ-ই-আসাম" যা মীরজুমলার অভিযান নিয়ে রচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য সরকারী উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ—

ক) ফরমান অর্থাৎ রাজকীয় ইচ্ছা বা রাজকীয় নির্দেশ। আকবরের সময়কার পাঁচটি রাজকীয় ফরমান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল ১. তারিদাতা-ই-ফরমান-ই-সালাতিন-ই-দিল্লী, ২. আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মথুরার নাথ গোস্বামীকে দেওয়া করবিহীন ভূমি অনুদান। ৩. তাখবরের মুঘল ও যোগী যাদের কাছে পাঞ্জাবের তাখবরের নাথ যোগীদের দেওয়া আকবরের রাজকীয় ফরমান রয়েছে।

খ) রাজস্ব দলিল ঃ— এই উপাদানগুলির মধ্যে পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা ও সাম্রাজ্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজস্ব আইন-কানুন, পরিসংখ্যান ইত্যাদিসহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাজকীয় ইস্তেহারের নাম হল "দস্তুর-উল-আমল"। কোনো হিসাবের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও রাজস্বের নথিপত্র পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক তথ্যের বিপুল সম্ভার পাওয়া গেছে এতে। ঔরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের প্রশাসন সম্বন্ধে জানার পক্ষে এটি অমূল্য।

গ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সংবাদ ও ইশতিহার। এগুলি আখবারাত-ই-দরবারী মৌলা নামে পরিচিত। এগুলি হল দরবারের ইস্তেহার ও সংবাদপত্র। রাজস্থান আর্কাইভসে এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংরক্ষিত আছে। এই আখবারাত-ই-দরবারী মৌলা অনেক পান্ডুলিপিতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই লিখিত। রাজার কল্যাণমূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে মনসবদাররা লিখে দরবারের দেওয়ালে সেঁটে দিতেন। কখনও ঢাক বাজিয়ে অথবা মুখেও বলে যাওয়া হতএইসব কাজকর্মের কথা। বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সচিবরা শ্রেণীবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সঙ্কলন রেখে গেছেন। এগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পত্রসাহিত্যের এক বিশিষ্ট শৈলী হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বেশ কিছু খন্ডে প্রাপ্ত এই পত্রসাহিত্য ইনশা-আল্লাহ বা মাকতুবাত বা রুকয়াৎ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আদ-বি-আলমগিরি, আহকাম-ই-আলমগিরি ইত্যাদি গ্রন্থে কয়েকটি চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠিগুলি থেকে দরবারী ষড়যন্ত্র ও নাগরিক ও জনসাধারণের প্রতি সম্রাটের মনোভাব জানতে পারা যায়।

এই উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য অত্যন্ত সাবধানে এগুলি ব্যবহার করা উচিত।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ঃ—

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচুর ইওরোপীয় পর্যটকের ভারতে আগমন ঘটে। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল বণিক, চিকিৎসক, দূত, ধর্মীয় প্রচারক, নাবিক, ভাগ্যান্বেষী এবং সমস্ত রকমের অভিযানকারীরা। তাদের মধ্যে কেউ ব্যবসার সন্ধানে, কেউ নতুন জীবিকার সন্ধানে, এমনকী কেউ কেউ নতুন দেশে, নতুন মানুষদের কাছে নতুন এক জীবনের খোঁজে এসেছিল। এদের ব্যবহার ছিল অদ্ভুত, রীতিনীতি ছিল অভিনব। তারা যা দেখেছিল ও শুনেছিল তা লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদান রেখে গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় ষোড়শ শতক থেকে। ভারতে এইসময় নিয়মিত মানুষজন আসতে শুরু করেন। মার্কোপোলোর পথ ধরেই ইওরোপীয়ানরা ভারতবর্ষে আসতে থাকে কিন্তু তাঁরা কেউই অল-বেরুণী বা ইবন বতুতার মত প্রাজ্ঞ (intellectual) ছিলেন না। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন পথ ধরে ইওরোপীয় পর্যটকরা দলে দলে এদেশে আসতে শুরু করেন। বিভিন্ন

ঐতিহাসিক বা সেই অর্থে কালপঞ্জীর রচয়িতারা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে মুঘল ইতিহাস রচনা করেছেন।

আকবরের রাজত্বের (১৫৮৩-৯১) মধ্যে র‍্যালফ ফিচ্ নামে একজন ইংরেজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর লম্বা যাত্রায় তিনি সব ধরনের খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র, জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, দিউ থেকে আগ্রা থেকে বাংলা এবং সেখান থেকে পেগু এবং পরে দক্ষিণ ভারত এবং সিংহল পর্যন্ত ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বেশ কিছু পন্ডিত জাহাঙ্গীরের দরবারেও এসেছিলেন। ১৬০৮-১১ সালের মধ্যে উইলিয়াম কিঞ্চ ভারতে আসেন এবং জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে লিখে গেছেন। উইলিয়াম হকিন্স সপ্তদশ শতাব্দীর সুরাটে বসে লিখেছিলেন। ১৬০৮ সালে সুরাটে এসে রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করার পর সেখানে ১৬১১ পর্যন্ত থাকেন। সুরাটে তিনি ১৬০৮-১১ সাল পর্যন্ত কাটান। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে দাক্ষিণাত্য নীতি ঘোষণা করা হয় ও মুঘল দরবারে মারাঠাদের অবস্থান স্থির করা হয়।

প্রথম জেমসের কাছ থেকে আরেকটি চিঠি নিয়ে উইলিয়ম এডওয়ার্ড ১৬১৫ সালে ভারতবর্ষে জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌঁছন। এর তিন বছরের মধ্যেই স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তাঁর রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ যড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুর্নীতিতে পূর্ণ একটি দরবারে কাজকর্ম কিভাবে চালনা হত, সেই ইতিহাসের পক্ষে এই রচনা অপরিহার্য। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা হলেন টেরী এবং ফরাসী ট্র্যাভেরনিয়ের এবং বার্নিয়ার। ফ্রান্সের উদয় এবং ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তথ্য খুব সহজেই সংগ্রহ করা যেত। বার্নিয়ার পূর্ব ভারতের ওপর জোর দেন। ফ্রান্সিস পেলসারি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং কিছু মূল্যবান পর্যবেক্ষণ নথিভুক্ত করেন। ডি-ফ্যাক্টও ঐ একই সময়ে ভারতে আসেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে দুজন ইংরেজ বণিক ভারতে আসেন। এরা হলেন ব্রুটন এবং কার্টরাইট। এরা বাংলা ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। পিটার মুন্ডির ভ্রমণ শাহজাহানের দরবারের ১৬৩০-৩৪ এবং ১৬১৯-৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। রেনেল ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। নিকোলো মানুঞ্চি নামে এক ইটালীয় (ভেনেশিয়ান) ভারতবর্ষে বহুদিন থাকার পর "স্টোরী ডো মোগোর" নামে এক জনপ্রিয় রচনা সৃষ্টি করেন। আরও দুয়েকজন হলেন নিকোলো কান্টি, জাঁ-ডে-থেভেনশ' প্রমুখ।

যদি আমরা সঠিকভাবে এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে দেখব এই উপাদানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি পক্ষপাতহীন, গোঁড়ামিহীন এবং খোলা মনে রচিত। যারা এই রচনাগুলি লিখেছেন তারা কেউই ঐতিহাসিক ছিলেন না। তাই অল বেরুনীর মত পান্ডিত্য এবং সমালোচনার গুণ তাদের ছিল না। সাধারণ মানুষের সহজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই রচনাগুলি রচিত হয়েছে। এগুলি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয় এবং ভৌগোলিক ধারণা প্রায়শঃই ভুল। ভারতের অতীত সম্বন্ধে রচিত কোনো ঐতিহাসিক দলিলের নাগাল পাওয়া তাদের সাধ্য ছিল না। তৎকালীন ঘটনাবলীর জন্য তাঁদের মূলতঃ বাজারচলিত গল্পের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। উপরন্তু ভারতের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি ভাষা সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মবাদের দেশ বলে ভাবা হত এবং রচনাগুলি ভ্রান্ত ধারণা এবং ভুল তথ্যের শিকার হত।

অন্যান্য বেসরকারী উপাদান ঃ—

ক) সাহিত্য

খ) শিল্প / স্থাপত্য / চিত্রকলা

গ) মৌখিক ইতিহাস।

সাহিত্য ঃ—

সাহিত্যগত উপাদান পরোক্ষভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের যোগান দিয়েছে। মুঘল ইতিহাস পুর্ণলিখনের জন্য এগুলি

ব্যবহার করা হয়। মুঘলযুগে দরবারী সাহিত্য এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। আরবী ও ফার্সী ছাড়া অন্যান্য ভাষাও সহাবস্থান করত। সাম্রাজ্যের সংহতির সময় ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত প্রাধান্য লাভ করে।

আকবরের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সী ও সংস্কৃত যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। ফার্সী ও স্থানীয় কথ্য ভাষাগুলির মিশ্রণের ফলে স্থানীয় ভাষাগুলির বিকাশ ঘটে। আঞ্চলিক ভাষা যেমন হিন্দভি এই সময়েই পরিণতি লাভ করে। এই সময়েই রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। তুলসীদাসের রামায়ণ সপ্তদশ শতকের উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে ধারণা দেয়। উপরন্তু আঞ্চলিক কবি, লেখক যেমন তুকারাম, একনাথ প্রমুখের রচনা মারাঠী সাহিত্যের বিকাশ ঘটায়। শিবাজীর গুরু রামদাসও এই সময়ের প্রচুর তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। রাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতার সম্বন্ধে ধারণা মেলে তুলসীদাসের রচনা থেকে। শিখদের ইতিহাস, শিখধর্মের নীতিসমূহ, শিখদের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" বা "আদিগ্রন্থ" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের বিবরণ অত্যন্ত উগ্র আঞ্চলিকতার পরিচয় দেওয়ায় এই বিবরণ মুঘল গ্রন্থাদির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাম্রাজ্য ছাড়া, মারাঠারা এক অর্ধ রাষ্ট্র, হিসাবে আভাসিত হয়ে উঠেছিল যা তুকারাম, একনাথ প্রমুখের লেখনীতে পরিস্ফুট। মহারাষ্ট্রীয় কবিতাগুলিকে বলা হত বাখার। শিবাজীর সম্বন্ধে প্রথম এবং সবচেয়ে মূল্যবান রচনা হল কৃষ্ণজীর "শিব-ছত্রপতিচেন চরিত"। শিবাজীর পুত্র রাজারামের আমলের কবি অনন্ত সুভাসদ বা সুভাসদ বখর অসমাপ্ত কলমী বখর শেষ করেন ও "শিবকালিন-পত্রসার-সাঙ্গঁলা" এবং "শিব-চরিত-সাহিত্য" রচনা করেন। অসমীয়া ভাষায় রচিত কিছু বুরাঞ্জী স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে। দক্ষিণে মালয়লী ভাষায় রচিত কিছু রচনা দক্ষিণ ভারতের আলাদা পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে। এতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ও প্রতিপত্তি ও ঐ অঞ্চলের সাপেক্ষে সাম্রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা মেলে। এই সময়ের পূর্বে জয়দেবের চৈতন্যের ওপর রচিত মঙ্গলকাব্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধারণা দান করে। এই সাহিত্যগুলি থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে সাধারণ মানুষের জীবন মোটেও সুখী ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক শাসনকেই শুধুমাত্র অন্ধকার বা দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী করা যায় না। তাছাড়াও এই সাহিত্যগুলি তখনকার মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধেও তথ্য পরিবেশন করে।

শিল্প/স্থাপত্য/চিত্রকলা ঃ—

তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, ময়ূর সিংহাসন ও মিনিয়েচার চিত্রকলা মুঘল যুগের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশের নির্দশন। মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারী এইরকমই একটি নির্দশন। এগুলিতে পারসীক ও ভারতীয় শৈলীর যে মিশ্রণ দেখা যায় তার সূত্রপাত মুঘল যুগেই ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আগ্রা দুর্গ একজন চৌহান রাজা নির্মাণ করেছিলেন। পরে হুমায়ুন এই দুর্গ জয় করেন। পারসিক গম্বুজ শৈলীর দ্বারা মন্দির শিল্প প্রভাবিত হয়। কিন্তু এই শিল্পকে কোনোভাবেই ইসলামি শিল্প বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় শিল্প ইউরোপীয় শিল্পধারার দ্বারাও প্রভাবিত হতে শুরু করে। গোয়াতে চ্যাপ্টা ছাদ, জানালা ফ্রেম ইত্যাদিতে তা সুস্পষ্ট। এগুলির মাধ্যমে আত্তীকরণ এবং অর্থনৈতিক জীবনের সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। যদিও স্থাপত্যের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়, কিন্তু কোষাগার শূন্য হয়ে যাওয়া ছিল একটি অদ্ভুত ঘটনা। এইভাবে প্রত্নতত্ত্বগত উপাদানগুলি থেকে সাংস্কৃতিক প্রভাব, একাত্মকরণ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

মৌখিক ইতিহাস ঃ—

অলিখিত উপাদান খুবই সহজলভ্য, যেমন গান, লোককথা, গদ্য কালপঞ্জী, কিছু কাব্যসাহিত্য, রাজস্থানের প্রচলিত কিংবদন্তী ও রাজস্থানের ব্যালাড। এগুলি টডের রচনায় একত্রিত করা হয়েছে। এর নাম "অ্যানালস এ্যান্ড অ্যান্টিকুইটি অফ রাজস্থান।"

বাংলা সাহিত্যে স্মৃতিকথা, পাঁচালী, ব্রতকথা, কিংবদন্তী কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর

মধ্যে ব্রজবুলির বিকাশ ঘটে। মথুরা ও রাজস্থানের কিছু সঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী, মধ্যপ্রদেশের মৃগনয়নীর কাহিনী, রাজবাহাদুর ও রাণী রূপমতির প্রেমকাহিনী ছাড়া বৈজু বাওরা ও তানসেনের গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিচিত।

এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনোটিকেই এককভাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনোটিই এককভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠাও করতে পারে না। বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণের দ্বারাই ইতিহাস রচিত হয়। এই উপাদানগুলির প্রামাণ্যতা অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে বারেবারে নিরীখ করে নিতে হয়। উপরন্তু ঐতিহাসিকদের উচিত শুধুমাত্র সরকারী উপাদানের ওপর নির্ভর না করে বেসরকারী উপাদানগুলিকেও কাজে লাগানো।

১.২ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর

স্ট্যানলি লেনপুলের মতে "বাবর সম্ভবত প্রাচ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি যে লেখনীর দ্বারা। তাঁর স্মৃতিকথায় এই সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, তা তাঁর খ্যাতির পক্ষে বড় কম কথা নয়। তিনি মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে হানাদার বাহিনী ও রাজকীয় সরকারের মধ্যে এবং তৈমুর ও আকবরের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিলেন।" এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ অপহরণকারী, যারা জাতিতে ছিলেন মোঙ্গল ও তুর্কী অর্থাৎ চিঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লঙের রক্ত তাঁর শিরায় প্রবাহিত হয়েছে। এর ফলে তাঁর মধ্যে সাহস ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পরে তাঁর মধ্যে পারসীকদের সংস্কৃতি ও নাগরিকতার জন্ম হয়। জাহির উদ্দিন মহম্মদ বাবরের শুরুর দিকের ইতিহাস অবিশ্বাস্য সাফল্য, বিস্ময়কর বিপর্যয়ের ইতিহাস যা মধ্য এশিয়ার একান্ত নিজস্ব, তা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। দুই দুর্ধষ বিজেতার রক্ত তাঁর শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। তৈমুরের পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর তিনি। পিতার তরফ থেকে তিনি এই বিশ্বত্রাস বীরের ঐতিহ্য পেয়েছিলেন। মায়ের পক্ষ থেকে তিনি চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। বাবরের মায়ের নাম ছিল কুতলুগনিগার আনুম। তাঁর পরিবার মূলতঃ তুর্কীর চাঘতাই ভাগের সদস্য হলেও তিনি সাধারণভাবে মুঘল নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে মুঘলদের উৎপত্তি মোঙ্গঁলদের থেকে। চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর দু'জনেই মোঙ্গঁল গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় হয়তো মুঘল নামটি সেখান থেকেই প্রাপ্ত।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯) ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলেনি। তবে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল উজবেগ ও পারস্যের সাফাভিদদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। মির্জা নামে পরিচিত তার বংশধরেরা তাদের সাধারণ ঐতিহ্যের সংহতি সাধনে ব্যর্থ হন। এদের মধ্যে ওমর শেখ মির্জা নামে একজন উত্তরাধিকার সূত্রে ফরগানা প্রদেশ পেয়েছিলেন। ফরগনাতেই ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে বাবর জন্মগ্রহণ করেন। ওমরের মৃত্যুর পর মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবর ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরগনার শাসক হয়ে ওঠেন। এর পর দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি তাঁর খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইদের সাথে ক্রমাগতঃ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মুঘলদের জেষ্ঠ্যপুত্রের সিংহাসনে সর্বময় অধিকারের তত্ত্ব ছিল না বলেই এই ধরনের যুদ্ধ ঘটত। এই সময়ে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা রাজ্য ও তাঁর রাজধানী সমরখন্দ জয় করা। এমনকী ১৪৯৬ সালে তিনি প্রথমবার সমরখন্দ জয় করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরের বছর তিনি একই চেষ্টা চালান। এবার তা সফল হয়। কিন্তু সমরখন্দে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই খবর ফরগনায় পৌঁছানমাত্রই সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পর তিনি ফরগণায় পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। যখন বাবর আবার সমরখন্দে পৌঁছন, তাঁর পিতৃব্য আহমদ মির্জার কাছে তিনি একজন দূত পাঠিয়ে জানান ফরগণা জয় করার পর তিনি ঐ সিংহাসনে অন্য কাউকে বসাবেন। এই প্রস্তাব যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আহমদ মীর্জা সমরখন্দে পিছিয়ে

যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনায় তাঁর মামা মাহমুদ খান যদিও দুঃখ পান, তবুও ফরগণা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। কিছুদিন পরে তিনি আবার সমরখন্দ জয় করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৪৯৮ সালে বাবর ফরগনা হাতে পেলেও ১৫০০ সালে আবার তা হস্তচ্যুত হয়। ১৫০০-১ সালের মধ্যে বাবর সমরখন্দ জয়ের মরীয়া প্রয়াস চালান। কিন্তু উজবেগ সর্দার শৈবানী খান তাঁকে পরাজিত করেন এবং দ্বিতীয়বার ঐ শহর দখল করেন। ১৫০২ সালে সার-ই-পালে তিনি বাবরকে পরাজিত করেন। বাবর ৮ মাসের মধ্যে আবার সমরখন্দ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। শৈবানী খানের সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে তবে তিনি নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৫০৪ সালে বাবরের কাবুল জয় ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য এবং এখানে তিনি তার প্রধান কেন্দ্রস্থাপন করেন। আবারও আর্চিয়ানের যুদ্ধ বাবরের ভবিষ্যৎ নতুন করে গঠন করে। এর ফলে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নীতিতে নতুন একমাত্রা যোগ হয়। তিনি তাঁর জন্মের স্থানকে শেষ বিদায় জানিয়ে, তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষের মুঠো থেকে বেরিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে নিজের ভাগ্য অন্বেষণে বের হন। কাবুলের রক্তপাতহীন বিজয় বাবরের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এখানে তিনি এমনই এক ঘাঁটি স্থাপন করতে পেরেছিলেন যে হয় পশ্চিমে সমরখন্দ বা পূর্বে হিন্দুস্থান এই দু'টির মধ্যে যে কোন একটিতে মনোনিবেশ করতে পারতেন। প্রথমে কাবুলেই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের পরিকল্পনা করেন। এর মানে এই ছিল না যে তিনি মধ্য এশিয়ায় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে গেছিলেন। নিজে পছন্দ করে নয়, ঘটনাচক্রের চাপেই তিনি হিন্দুস্থান যাত্রা করেন। তিনি তাঁর ভাইদের কাছে সাহায্য চাইলেও রিক্তহস্তেই ফেরত আসেন এবং ফলতঃ তিনি শাহ ইসমাইলের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হন। তাঁর সাহায্যে তিনি সমরখন্দ আবার জয় করেন এবং বুখারা ও খোরাসান দখল করেন ১৫১২ সালে। ইতিমধ্যে উজবেগরাও তুর্কীস্থানে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তিনি কান্দাহারও জয় করেন ও হারান। শাহ ইসমাইল বাবরের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠান এবং পারসিকদের হাতে আবদ্ধ বাবরের বোনকে ফেরৎ পাঠান। বাবর শাহের নাম খুৎবায় পড়বেন এবং বারোজন ইমামের সঙ্গে তাঁর নামও মুদ্রায় খোদাই করবেন, এই শর্তসাপেক্ষে তিনি বাবরকে সাহায্য করতে রাজী হন। কিন্তু উজবেগদের হাতে শাহ ইসমাইলের পরাজয় এবং ১৫১৪-তে তাঁর মৃত্যু বাবরের মধ্য এশিয়ায় সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। সমরখন্দের সিংহাসন যা তিনি তিনবার পেয়েছিলেন ও হারিয়েছিল তাতে আবার আরোহণ করার সমস্ত আশা বিলুপ্ত হয়। মধ্য এশিয়ার একমাত্র অঞ্চলে যেখানে তাঁর প্রতিপত্তি তখনও ছিল, তা হল বাদাকশান। বাবরকে তাঁর অশান্ত আফগান প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে বার্ষিক অভিযান চালাতে হত। এইভাবে আর্থিকভাবে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে ও উত্তরদিকে তাঁর সমস্ত পথ রোধ হওয়ায় ১৫১৫ সাল থেকে বাবর ভারতে আসার চেষ্টা করতে থাকেন। এখন দক্ষিণ দিকে ধন আহরণের চেষ্টা না করলে, তাঁর সৈন্যবাহিনী তিনি ধরে রাখতে পারতেন না।

ভারতবর্ষের অবস্থাও তাঁর পক্ষে কিছু কম লোভনীয় ছিল না। ঐ সময় ভারত কোনো ঐক্যবদ্ধ উপমহাদেশ ছিল না। ভারতের উত্তর অংশ একেবারেই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। চেঙ্গিস খানের ভারতে হানা শুধুমাত্র এর সীমানাকেই স্পর্শ করতে পেরেছিল, কিন্তু তৈমুরের ভারত আক্রমণ ভারতে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। দিল্লী ও আগ্রার রাজত্ব এর পূর্ব গৌরবের ছায়ামাত্র হয়ে অবস্থান করছিল। সৈয়দরা এই অরাজকতা ও অবস্থানের মোকাবিলা না করতে পেরে লোদীদের উত্থানের পথ বিস্তৃত করেছিল। লোদী রাজত্ব ছিল অর্ধ স্বাধীন কিছু শাসনকর্তাদের এক ঢিলেঢালা জোট মাত্র। এই শাসনকর্তারা ছিলেন মুখ্যতঃ আফগান। লোদী বংশের প্রথম দুই লোদী ছিলেন দুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া প্রকৃতির আফগান। ইব্রাহিম লোদী অপরপক্ষে নিজেকে আফগানদের সহানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলায় বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাঞ্জাব ও জৌনপুরে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং রাজপুতরাও তাদের পরাজিত করেন। কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য এলাকা ছিল রাজপরিবারের দ্বারা শাসিত অঞ্চল। অন্য এক আফগান রাজবংশ, শাহরা গুজরাটে রাজত্ব করতেন। বুলগাখানায় উল্লেখিত আছে বাংলায় হুসেন শাহী ও নসরৎ শাহী রাজবংশ প্রায় একটি স্বশাসন চালু করেছিল। আফগানরা নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না, এবং উপজাতীয় কলহের ফলে দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজপুতরা সাফল্যের সঙ্গে রাজত্ব করতেন। রাজপুতরা হুন, প্রতিহার ইত্যাদি গোষ্ঠীর একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য ছিল বলে কথিত আছে। নর্মদা নদীর দক্ষিণ অঞ্চল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল বিজয়নগর ও বাহমনী, তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন সূচিত করে। এর ফলে বিদর, খান্দেশ ও আহম্মদনগর নামে কিছু রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হত। এদেরকে স্থানীয় শাসক ও মারাঠারা সাহায্য করতেন। যুগের প্রয়োজন মেটাবার মত শক্তিশালী ছিল না লোদী বংশ। অর্ন্তকলহের ফলে জন্ম নেওয়া ষড়যন্ত্র দ্বারা পরোক্ষভাবে এবং আমন্ত্রণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ভারতে মুঘলদের ডেকে আনা হয়।

সামাজিকভাবে ভারত তখন কয়েকটি ধর্মীয়, জাতীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরা প্রত্যেকে নিজেদের আলাদা পরিচয় বজায় রাখতে চায় এবং তারা কখনই একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের সম্পদ মুলতঃ কৃষি ও হস্তশিল্পের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ভারতের সম্পদ না ছিল সমভাবে বন্টিত, না তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগান হত।

দুঃসাহসী বাবর একজন বিচক্ষণ ও ধূর্ত পরিকল্পকও ছিলেন বটে। ১৫১৫-১৮, এই চার বছর তিনি কাবুল অঞ্চলে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উত্তর পশ্চিম সীমানায় নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা। তাই তিনি তাঁর এক পিতার দিকের ভাইয়ের মৃত্যুতে ১৫২০ সালে বাদাকশান দখল করেন। ১৫২২ সালে তিনি কান্দাহার দখল করেন। ফলে বালখ ও বাদাকশান তাঁর ক্ষমতার অধীনে চলে আসে। সুতরাং তাঁর হাতে গ্রামস্বী (Gramsvi) দেশগুলি চলে আসে। তিনি বালেখরা থেকে উজবেগদের বিতাড়ন করেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া ঐ অঞ্চলে তিনি একটি সমসাময়িক সামরিক কৌশল স্থাপন করেন। দুই তুর্কী গোলন্দাজবিদ উস্তাদ আলি ও মুস্তাফার সাহায্য লাভে সক্ষম হন। অল্পবয়স্ক হলেও তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। তাঁকে তাঁর জীবনে অসংখ্যবার নিজের মতই কোনো তুর্কী, মোঙ্গল, উজবেগ, পারসিক এবং আফগান প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি চালাকির দ্বারা তাদের কিছু নিজস্ব যুদ্ধ ও সামরিক কৌশল তাদের থেকে শিখে নেন। উজবেগদের কাছ থেকে তিনি "তুলখামা" পদ্ধতি শেখেন। এর অর্থ ছিল শত্রুর সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ এবং একই সঙ্গে তাদেরকে অবিশ্বাস্য গতিতে সামনে এবং পিছন থেকে আক্রমণ করা। মোঙ্গল ও আফগানদের কাছ থেকে তিনি শেখেন "অ্যামবাসকেড" বা অর্তকিতে আক্রমণ প্রণালী। এর সাহায্যে শত্রুকে বিপদের এলাকায় তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। ঐ এলাকাটি আগে থেকেই চিহ্নিত করা থাকত এবং সেখানে লোকজন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে ঘিরে রাখা হত। এরপর শত্রুর ওপর দুই দিক থেকে অর্তকিতে ঝাঁপিয়ে পড়া হত। পারসিকদের কাছ থেকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখেন এবং তাঁর তুর্কী আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি গতিশীল অশ্ববাহিনীর সঠিক প্রয়োগ শেখেন। এইভাবে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসায় একটি অতি উন্নত যুদ্ধকৌশল ও ব্যবস্থা বাবরের দখলে আসে। বেশ কিছু মধ্য এশিয়ার গোষ্ঠীর থেকে শেখা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের বিজ্ঞানসম্মত সংশ্লেষেরই ফল ছিল এই কৌশল। এই পদ্ধতি গতিশীল অশ্ববাহিনী, বিজ্ঞানসম্মত পদাতিকবাহিনী, অসাধারণ রণকৌশল ইত্যাদির সঠিক মিশ্রণ দ্বারা নিজস্ব চরিত্র লাভ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ঠান্ডা মেজাজ, মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যেই তাকে মানুষের এক বিচক্ষণ নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এর ফলে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কখনও আশা হারাতেন না।

জন স্ট্রেমন্ড তাঁর "The formation of Mughal empire" গ্রন্থে বারুদ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মধ্যে বারুদই ছিল মুখ্য, গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র কারণ যা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইতিহাসবিদ মার্শাল, জি.এস. হজসন এবং উইলিয়াম. এইচ. ম্যাকনিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বকে মেনে নিয়েও এই মত ব্যক্ত করেছেন যে আগ্নেয়াস্ত্র, বিশেষতঃ অবরোধনকারী কামানগুলি কেন্দ্রীয় শক্তির বৃদ্ধি করে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়েছিল। তাদের মতামতকে বারুদ সাম্রাজ্য তত্ত্ব" (Gunpowder empire thesis) হিসাবে বর্ণনা করা যায়। মুঘল বাহিনীর ওপর

রচিত ঐতিহাসিক সাহিত্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই তত্ত্বে যথেষ্ট আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সাহিত্যগুলি মুঘল বাহিনীর বর্ণনা করেছে অথচ মুঘল যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃত রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করেনি। সুতরাং এই প্রকল্পের বিবর্তন আলোচনা করতে গেলে, আমাদের শুরুতেই কয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনা করতে হবে।

বিখ্যাত রুশ প্রাচ্যবাদী ভি.ভি. বারটোল'ভ প্রথম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে মুঘল, অটোমান এবং সাফাভিদ সাম্রাজ্য তাদের পূর্বজদের ছাড়িয়ে আয়তন, কেন্দ্রিকতা এবং সময়ের ব্যাপ্তিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছিল শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্রের বিকাশ ও ব্যাপ্তির দরুন। এই তিন সাম্রাজ্যের ওপর ভিত্তি করে হজসন এই প্রকল্পকে জোরদার করেছেন। তিনি ইসলামিক এই কর্মপ্রচেষ্টাকে—বারুদের ওপর গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য বলেছেন। ম্যাকনিল তাঁর "World Military History"-তে একে "ক্ষমতার নেশা" বলে বর্ণনা করেছেন। হজসন বলেছেন যে সেই আবিষ্কার যা বারুদ সাম্রাজ্যগুলি গড়ে তুলেছিল, তা শুরু হয়েছিল প্রায় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন পশ্চিম ইউরোপীয় এবং অটোমানরা গোলন্দাজীকে প্রথমে অবরোধের ক্ষেত্রে ও পরে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ণায়ক অস্ত্র হিসাবে গড়ে তোলেন। ইসলামীয় জগতে অবরোধ এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনী বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায়। "গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপ্তিশীলতা এবং তার সামনে পাথরের দুর্গগুলির টিকে থাকার অক্ষমতা স্থানীয় সামরিক বাহিনীর চেয়ে এক অধিকতর সুবিধা এনে দিয়েছিল। ম্যাকনিল ষোড়শ শতকে এশিয়ার বৃহদ সাম্রাজ্যগুলির উত্থানকে আবিষ্কার চক্রের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সামরিক নিবৃত্তির ফল হিসাবে দেখেছেন। আগ্নেয়াস্ত্র ও বিশেষতঃ অবরোধের ক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনী কেন্দ্রীয় শাসনকে এক গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে তৎক্ষণাৎ বা উপস্থিত পরিস্থিতির মোকাবিলা অনেক সহজতর হয়। ম্যাকনীল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নতুন বন্দুকগুলি আক্রমণের দিকে অনেক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সেইরকম প্রত্যুত্তর সৃষ্টি করেনি। তবে সব ঐতিহাসিক হজসন ও ম্যাকনীলের সঙ্গে একমত হননি। অবরোধপন্থী যুদ্ধের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও নতুন লেখক ডাফি এই মন্তব্য করেছেন যে মুঘল যুগে দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেনি যা ভারতীয় দুর্গকে ইউরোপীয়ান দুর্গগুলির সদৃশ করে তোলে। তবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে অবরোধের পক্ষে গোলন্দাজ বাহিনী মোটেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারেনি। মুঘলরা তাদের অবরোধ পরিকল্পনা প্রচুর অর্থ লগ্নী করে শুরু করেন। দুর্গ নির্মাণ, ঘেরাও করার উপযোগী বৃত্ত নির্মাণ, দুর্গের চারিপাশে পরিখা ও খনি বা সুড়ঙ্গখনন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গোলন্দাজবাহিনীর ধীর গতি সাম্রাজ্যের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ম্যাকনীল স্বীকার করেছেন জল যোগাযোগের ওপর নির্ভর না করার ফলে মুঘল শক্তিবৃদ্ধি অনিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি অবরোধ যুদ্ধে সাফল্য ও সুবিধা লাভ করায়, গোলন্দাজী বা দুর্গনির্মাণ কোনোটাই উন্নততর করে তোলা হয়নি।

বারুদ সাম্রাজ্যের এই প্রকল্প কাজেই এই মত প্রকাশ করে যে মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করা ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্র রাজকীয় কেন্দ্র ও প্রাদেশিক অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কই পুরো পাল্টে দেয়। এই নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমে যা সামরিক উদ্ভাবন ঘটেছিল, তার তুলনায় ভারতে অগ্রগতির ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। এই প্রকল্প যদি সঠিক হত তাহলে আকবরের রাজত্বের প্রথম কয়েক বছর তিনি বিদ্যমান দুর্গগুলি ধ্বংস করে প্রদেশের ক্ষমতা দখলকারী শাসকদের তাদের শক্তি ও স্বশাসনের অনেকটাই বিসর্জন দিতে বাধ্য করতেন। হাবিব ও ডাফির সমালোচনায় মনে হয় মুঘল গোলন্দাজ বাহিনী বিদ্যমান দুর্গগুলিকে সম্পূর্ণ অচল করতে পারেনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘলদের দক্ষতা তাদের অবরোধ যুদ্ধের ক্ষমতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গেছিল। কাজেই সামরিক কার্যকলাপের ধরণই এটা প্রমাণ করতে পারবে যে হজসন ও ম্যাকনীল না তাঁদের সমালোচকরা সঠিক।

পাণিপথ যুদ্ধের আগে বাবর কয়েকটি অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৫০৫ নাগাদ তিনি মুলতানের কিছু অংশ অধিকার করেন কিন্তু তিনি সিন্ধু নদী পেরোননি। ১৫০৭-এর মধ্যে আরও কয়েকবার হানা দেওয়া হয়েছিল। এবার তিনি মানদ্রাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে ফেরৎ চলে গেছিলেন। ১৫১৯ সালের শুরুর দিকে তিনি ভারতে প্রথম অভিযান করেছিলেন।

এই অভিযান অশান্ত ও বিদ্রোহী ইউসুফজাই উপজাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। এরা বন্দুকের মুখোমুখি না হলে কোনোভাবেই আনুগত্য স্বীকারে রাজী হত না। এদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে বাবর আরও এগিয়ে বাজাউর নামক জায়গায় প্রচন্ড আক্রমণ চালান। এখানে এক কঠিন পরিস্থিতিতে তার গোলন্দাজ বাহিনী এক নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি আশেপাশের লোকেদের আতঙ্কিত করার জন্য বাজাউরের মানুষদের বাছবিচারহীনভাবে মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। এই অভিযানের যদিও কোনো সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল না। ১৫১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আবার ভারতের দিকে চোখ ফেরান। তিনি আফগান ইউসুফজাই উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। ১৫১৯ সালে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ভেরা দুর্গ বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫২০ সালে তিনি আবার ভেরায় একটি বিদ্রোহ দমন করেন, শিয়ালকোট পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং সৈয়দপুরে আক্রমণ চালান। ১৫২৪ এ বাবর আরেকটি অভিযান চালান। লাহোর ও দীপালপুর দখল করেন। যদিও তিনি এই অভিযানগুলিতে সফল হন, তিনি তার সেনাপতিদের প্রজাদের উৎপীড়ন করতে বারণ করেন। তাই তিনি তৈমুর বা চেঙ্গিস খানের মত একজন আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর কাহিনী শুধুমাত্রই লুঠতরাজ ও ধ্বংসের কাহিনী নয়, শক্তিবৃদ্ধিরও কাহিনী। তাঁর প্রাথমিক সাফল্যের পরে বাবর যেমন তার আত্মচরিতে লিখেছেন, পঞ্চম বারে হিন্দুস্তান বিজয় সম্পন্ন হয় ও হিন্দুস্তান তাঁর দখলে আসে।" পঞ্চম অভিযানে বাবর লোদী সুলতানদের অর্ন্তকলহের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হন। এই ঘটনাই ১৫২৬ সালের ২১শে এপ্রিল পানিপথের যুদ্ধ ঘটায়, যা বাবরের নির্ণায়ক জয়ে সমাপ্ত হয়। ইব্রাহিম লোদী এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। বাবর মাত্র ২৪০০০ সৈন্য নিয়ে আসেন। আফগান বাহিনী অতি দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তারা যতই এগিয়ে আসে, তাদের বাহিনী ইতঃস্তত করতে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে পেছনের সৈন্যদল সামনে এগিয়ে আসে। ফলে এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাবর এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁর একেবারে প্রান্তের দিকের সৈন্যরা আফগানদের ঘিরে ফেলে এবং সর্বপশ্চাৎ ভাগে এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালায়। অন্যদিকে তাঁর দক্ষিণ ও বাম বাহিনী ইব্রাহিমের সৈন্যদের উপর সোজা আক্রমণ চালায়। ফলে তারা এগোবার বা পিছোবার কোনো পথ খুঁজে পায় না। না তারা নিজেদের অস্ত্রের কোনো সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। বাবরের অসাধারণ নেতৃত্ব, তাঁর রণকৌশল, তাঁর সৈন্যদের উন্নত অনুশাসন ও মনোবল এবং আফগান বাহিনীর অসন্তোষ এই সহজ বিজয়ের গুপ্ত কারণ। এই যুদ্ধ নির্ণায়ক যুদ্ধ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। লোদীদের সামরিক শক্তি এর ফলে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে এবং স্বয়ং তাদের রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন। ভারতের তুর্কো-আফগান শাসকশ্রেণী ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিপদের সম্মুখীন হয়। উত্তর ভারতে বিজয়ের ক্ষেত্রে পানিপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তির সূচনা হয়। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লী ও আগ্রার রাজা হলেও, বাবরের প্রকৃত কাজ পানিপথের যুদ্ধের পরই শুরু হয়। পানিপথের যুদ্ধ তাঁকে সেখানকার সার্বভৌমত্বের জন্য কার্যকরী দাবী তুলতে সাহায্য করে। পানিপথের এই যুদ্ধ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, মুঘলরা দিল্লী ও আগ্রার বাইরে তাদের স্বশাসন স্থাপন করতে পারেননি। এইসময়েই আসলে সামরিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের প্রকৃতি বোঝা যায়। এটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা। এই যুদ্ধের পর আরও দু'টি যুদ্ধ হয়।

১) শোগরার যুদ্ধ (১৫২৭-২৮)— আফগানদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়। বাবর নিজে ভোপালের কাছে অবস্থিত বুন্দেলখন্ডের এবং মালবের সীমানায় চান্দেরী নামক একটি স্থান, যা বিখ্যাত রাজপুত শাসক মেদিনী রাইয়ের অধীনে ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই মেদিনী রাই মালব অঞ্চলে অন্যদের রাজা বানানোর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। মুঘলরা তাঁকে অবরোধ করে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থান দখল করেন।

২) খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)— অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ শত্রু ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ, যিনি ছিলেন ঐ সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজপুত রাজা। অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তিনি

আশা করেছিলেন তৈমুরের মত বাবরও একজন হানাদার মাত্র এবং দিল্লীর সিংহাসন খালি পড়ে থাকবে। কিন্তু পানিপথের পরে বোঝা যায় বাবরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সংগ্রাম সিংহ তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানান। সুতরাং ১৫২৭ সালের ১৬ই মার্চ খানুয়া নামক স্থানে এক নির্ণায়ক যুদ্ধ শুরু হয়। বাবর রাণার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) বলে ঘোষণা করেন এবং তাদের মনে করিয়ে দেন যে তিনি ধর্মের গৌরবের জন্য এই যুদ্ধ লড়ছেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুতদের সামরিক শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর রাজপুত মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

বাবর সফলভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটান। বাবর একটি রাষ্ট্র স্থাপনা করেছিলেন এবং তিনি শুধুমাত্র একজন আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর হুমায়ুনের অধীনে সাম্রাজ্যের সাময়িক পতনের জন্যও তিনি দায়ী নন। সুতরাং রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকলেও তিনি তা বাস্তবায়িত করার যথেষ্ট সময় পাননি।

এত সফল একজন যোদ্ধা ও বিজেতা হওয়া সত্ত্বেও বাবর একজন সাধারণ মানের প্রশাসক ছিলেন। তাঁর কোনো গঠনমূলক প্রতিভা ছিল না। তিনি সর্বত্রই পুরোনো ও যুগের তুলনায় পিছিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি কোনো নতুন ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে ঐগুলিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেননি। আসলে তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে তাঁর কার্যকলাপ ছিল ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নয়। তিনি তাঁর অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাঁর দলপতি ও কর্মচারীদের সেগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইভাবেই সামরিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ওই অঞ্চলগুলি ছিল অর্ধস্বাধীন এবং একটিমাত্র বন্ধনে আবদ্ধ। সেই বন্ধনটি ছিল সম্রাট স্বয়ং। প্রত্যেক স্থানীয় শাসকের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল এবং তাঁর অঞ্চলে তিনি মানুষের দন্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন। সাম্রাজ্যের জন্য একই খবরের রাজস্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও বাবর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিচারব্যবস্থাও ছিল অবিন্যস্ত। সংখ্যার জটিলতা সম্বন্ধে কোনো গভীর ধারণা না থাকায় বাবর একজন অযোগ্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন।

আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বাবর বড়জোর একজন সাহিত্য ও সামরিক বিষয়ে দক্ষ একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু একজন রাষ্ট্রনেতা ছিলেননা। তিনি তাঁর নিজস্ব চিহ্ন সংবলিত কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেননি। তিনি আফগানিস্তান কিংবা ভারত, কোথাও সংস্কারও শুরু করতে পারেননি। ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাঁর বিচার ছিল সঠিক যখন তিনি দায়িত্বশীল অভিজাতদের দেশের অবস্থা শান্ত করার কাজে লাগান। শাসনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বাবরের সরকার আগ্রা থেকে কাবুল পর্যন্ত পথ নির্মাণ করতে শুরু করে। পনের মাইল অন্তর অন্তর তিনি সরাই নির্মাণ করতে শুরু করেন। তাঁর নির্দেশে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। তিনি ডাক ব্যবস্থারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

বাবর কি করতে পারেননি তারা নিরীখে তাঁর বিচার করা ঠিক হবে না। বাবরকে লোকে ভয় পেত এবং শ্রদ্ধা করত এবং তিনি দরবারের নেতার সম্মান ভোগ করতেন। ভারতের অসংখ্য রাজ্যের মধ্যে তৎকালীন ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও নতুন ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়ে তিনি ভারতের পুরোনো মানচিত্রের বদল ঘটান। ইতিহাসে তাঁর প্রভাব বিশাল। তিনি যে প্রযুক্তি ভারতে এনেছিলেন, তার ফলে ভারতে যুদ্ধের ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো ছাড়াও বাবর ভারতবর্ষকে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

বাবর সেই ভিত্তি স্থাপন করেন যার ওপর তার পৌত্ররা তাঁদের সাফল্য পেয়েছিল। মুঘল আক্রমণ ছিল তৈমুর বা চেঙ্গিস খাঁয়ের আক্রমণ থেকে আলাদা প্রকৃতির। তিনি এক নতুন ধরনের নীতি বলবৎ করেন যা লুঠতরাজ ও ধ্বংসের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। সুতরাং বাবর তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার দরুণ এমন একটি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যা শুধু যুদ্ধের সময়ই কাজ করত। রাশব্রুক উইলিয়মসের মতে, "তিনি তাঁর পুত্রকে এমন একটি রাজতন্ত্র উত্তরাধিকার

সূত্রে দিয়ে গেছিলেন, যাকে একমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সাহায্যেই সংগঠিত রাখা যেত এবং যা শান্তির সময়ে দুর্বল, কাঠামোহীন ও মেরুদন্ডহীন হয়ে যেত।" সুতরাং বাবর ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের কৃপতি ছিলেন না।

১.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসার ও বিস্তার

ইতিহাসের পাতায় বাবরের খ্যাতি মুখ্যতঃ তাঁর যুদ্ধজয়গুলির জন্য হলেও, তাঁর বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগ তাঁকে অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি ছিলেন একজন সুকবি ও চমৎকার গদ্যলেখক। অনুরূপভাবে তিনি তুর্কী ও ফার্সী এই দুটি ভাষাতেও পন্ডিত ছিলেন। তিনি প্রচুর রচনা করলেও, তাঁর গদ্য রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তুর্কীতে লেখা বাবরনামা বা বাবরের স্মৃতিকথা। এই বইয়ে তিনি খোলাখুলিভাবে এবং বিস্তৃতভাবে তাঁর জীবনের কাহিনী লিখেছেন। তাঁর লেখনীর সহজাত দক্ষতা ও তাঁর নিষ্ঠা রচনাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন লিখেছেন, "শৈলীটি হল সহজ ও পুরুষালী, তথা জীবন্ত ও চিত্রবৎ। এটি তাঁর দেশের মানুষ ও সমসাময়িকদের হাবভাব, উপস্থিতি, কাজকর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদি আয়নার মত হুবহু তুলে ধরেছে। এই ব্যাপারে এটি এশিয়ার একমাত্র ঐতিহাসিক নমুনা। সাধারণ লেখকরা যদিও জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে থাকেন, তাঁরা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর লোকেদেরও জীবন ও আচার-আচরণ কেটেছেঁটে দেন। বাবর যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের চেহারা, পোশাক, রুচি, অভ্যাসগুলি উপস্থাপনা করেছেন, তাতে মনে হয় আমরা যেন তাদের মধ্যেই রয়েছি, তাদের চিনি ও তাদের মতই চলি। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "আমরা যেমন যেমন এটি পড়ে যাই, তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের সম্মোহন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনের শক্তির একজন সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে তীক্ষ্ণভাবে যুদ্ধপরিস্থিতি বুঝে নেবার ক্ষমতা—এই সবই আমরা অনুভব করতে পারি। প্রাচ্যের কোনো রাজাই বাবরের মত এক পুঙ্খানুপুঙ্খ, আকর্ষণীয় ও সত্যনিষ্ঠ রচনা রেখে যেতে পারেননি। স্যর ডেনিসন রস উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেছেন, "বাবরের স্মৃতিকথাকে চিরকালের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও রোমান্টিক রচনাবলীর মধ্যে অবশ্যই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।" প্রিঙ্গল কেনেডি বলেন, "বাবর এমন একটি আত্মজীবনী রেখে গেছেন যা প্রাচ্যের চিরকালের সবচেয়ে উজ্জ্বল আত্মচরিতগুলির মধ্যে একটি। স্ট্যানলি লেনপুনের বক্তব্য, "বাবরের বংশের শক্তি ও জাঁকজমক আজ আর নেই। তাঁর জীবনের কথা সময়কে পরিহাস করে আজও অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয় রয়ে গেছে।"

বাবরের স্মৃতিকথা আকবরের আমলে ১৫৯০ সালে মির্জা আবদুর রহিম খান-ই-খানান ফার্সীতে অনুবাদ করেছেন। লেডেন ও আরস্কাইন ১৮২৬ সালে এটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। এটির একটি ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। যেখানে এই অনুবাদগুলি ফার্সী অনুবাদটির থেকে অনুদিত হয়েছে। মিসেস এ্যানেট সুসানাহ্ বেভেরিজ মূল তুর্কী বইটিরই একটি সংশোধিত ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর বক্তব্য অনেক বেশী প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। "৮৯৯ সালের রমজান মাসে আমি ফরগানার রাজা হলাম।" এইভাবেই শুরু হয়েছে বাবরের বিখ্যাত আত্মচরিত। এবং তিনি বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে লিখে গেছেন, "তাসখন্দ ও সেরিয়াঙ্গের মধ্যে ইয়েঘমা ও আরও অনেকগুলি ছোট গ্রাম আছে যেখানে ইব্রাহিম আতা আর ইশাক আতার সমাধি আছে। আমরা ঐ গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হলাম এবং কনিষ্ঠ খান কখন আসবে সঠিক না জানায়, আমি ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দেশটা দেখতে, তখন হঠাৎই আমি তাঁর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব থেকে অবতরণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। যেই আমি এগোতে শুরু করলাম খান আমাকে চেনার দরুন অত্যন্ত বিব্রত হলেন। কেননা, তিনি অন্য কোথাও অবতরণ করে আমাকে সঠিক আদব-কায়দায় অভ্যর্থনা ও আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি এত দ্রুত নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম যে, উনি অনুষ্ঠানাদির কোনো সময়ই পেলেন না। আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁটু গেড়ে

বসে পড়লাম এবং তুষার এখন পর্যন্ত মাত্র দু-তিন মাইল জায়গাই দখল করতে পেরেছিল। আমি তুষারকে পায়ের চাপে পিষে ফেলতে সাহায্য করছিলাম। দশ পনের ঘর লোক ও কাশিম বেগও তাঁর পুত্রদের ও ভৃত্যদের সাথে আমরা সবাই ঘোড়া থেকে নেমে ও কষ্ট করে তুষার মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাদের কোমর বা বুক অবধি তুষারে ঢেকে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তুষারকে অগ্রাহ্য করে চললাম। কিছুটা এগোনর পর একটি লোক অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং অন্য একজন তার স্থান নিল।” এই পর্যবেক্ষণের স্পষ্টতায়, এই নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

তাঁর স্মৃতিকথায় বাবর তাঁর ব্যক্তিগত অভিযান ও বাধাবিপত্তির বিস্তৃত বর্ণনার পাশাপাশি হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভারতে আসার পেছনে তাঁর নিজের দেশের অনৈক্য এবং পাঞ্জাব অধিপতি দৌলত খাঁ লোদী ও রাজপুতানার শাসক রাণা সঙ্গের আমন্ত্রণই সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পাণিপথের রণক্ষেত্রে পৌঁছে বাবর দেখলেন ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যা অগুন্তি। প্রায় এক লাখ সৈন্যের কাছাকাছি, কিন্তু তরুণ ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিটি পদক্ষেপে গাফিলতি, শৃঙ্খলাহীনভাবে অগ্রসর হওয়া, যেখানে সেখানে থেমে যাওয়া এবং কোনো দূরদৃষ্টি ছাড়াই লড়াই চালিয়ে যাবার ফলেই ইব্রাহিমের পরাজয় হয়। পানিপথের যুদ্ধে জয়ের জন্য বাবর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কেন না ঈশ্বরই তাকে ভারতের মত একটি বিশাল দেশের বিজেতা বানিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, “এই সাফল্যকে আমি আমার নিজের শক্তির ফল বা আমার উদ্যোগগুলির ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাপ্ত সৌভাগ্য মনে করি না। বরং ঈশ্বরের করুণাধারারই ফল মনে করি।” রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বাবর লিখেছেন, “ভারত সাম্রাজ্য হল সুবিশাল, জনবসতিপূর্ণ এবং ধনী। এর উত্তরে রয়েছে কাবুল, গজনী ও কান্দাহার। ভারতবর্ষের রাজধানী হল দিল্লী। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে লিখেছেন, “বাংলার এক অনন্য রীতি হল সেখানে রাজার জন্য একটি সিংহাসন আছে। একইভাবে প্রত্যেক আমীরের জন্যও একটি করে আসন রক্ষিত আছে। ওই সিংহাসন এবং আসনগুলিই বাংলার মানুষের মনে শ্রদ্ধার স্থান দখল করে রয়েছে। কেউ যদি রাজাকে হত্যা করে তাঁর স্থানে নিজে বসে যেতে পারে, সেই তৎক্ষণাৎ রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সমস্ত আমীর, উজীর, সৈন্যদল এবং কৃষককুল তাঁকে তৎক্ষণাৎ তাদের আগের রাজার মতই মান্য করে ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। তাঁকেই তারা তখন তাদের সম্রাট মনে করে। ভারতবর্ষের মানুষ সম্বন্ধে বাবরের বক্তব্য হল, “ভারতবর্ষে আনন্দ বা ফূর্তির অবকাশ কমই আছে। মানুষগুলি দেখতে সুন্দর নয়। তাদের না আছে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ সম্বন্ধে কোনো ধারণা, তারা না জানে মানুষের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে। তাদের কোনো সহজাত সৃজনীশক্তি, সৌজন্যবোধ, দয়া ও সহমর্মিতা নেই। হাতের কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো দক্ষতা বা যান্ত্রিক উদ্ভাবনীশক্তি বা স্থাপত্যে কোনো নক্সাজ্ঞান বা শৈলী নেই। তাদের কাছে নেই ভাল ঘোড়া, মাংস, আঙুর, খরমুজা, সুস্বাদু ফল, বরফ, ঠান্ডা জল, এমন কী তাদের বাজারে ভাল খাদ্য, রুটি পাওয়া যায় না। কোন গোসলখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো মশাল, এমন কী একটা মোমবাতিও পাওয়া যায় না। মোমবাতি বা মশালের পরিবর্তে আছে একদল নোংরা লোক যারা দিহাতী বলে পরিচিত, বাঁ হাতে একটি তেপায়া বস্তু ধরে থাকে। এটি কাঠের হলেও আগের দিকটি লোহার তৈরী। সেখানে মধ্যম আঙুলের সমান একটি নমনীয় পলতে থাকে। ডান হাতে তারা একটি ফাঁপা লাউ ধরে থাকে। লাউয়ের মধ্যে ছিদ্র দিয়ে সরু ধারায় তেল এসে পড়ে এবং পলতেটির যখনই তেল দরকার হয়, তেল এসে পড়ে। এইসব মহান লোকেরা একশ, দু'শ দিহাতী লোক রেখেছে শুধু এই কাজের জন্য।” তাঁর এই পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য উত্তরের শেষ দিকে জানাব।

বাবরের পক্ষে সত্যই দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল যে শীতের দেশের বংশধর হয়ে তাকে গ্রীষ্মকালে ভারতে এসে পৌঁছতে হয়েছিল। দিল্লী, আগ্রার গরম তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছেন, হিন্দুস্থানের তিনটি জিনিস আমাদের অত্যন্ত বিরক্তিকর লেগেছে। প্রথমটি হল গরম, অন্যটি হল এর জোর হাওয়া এবং তৃতীয়টি হল ধুলো।”

এর জন্য তিনি অভিযোগ করেছেন, "ভারতবর্ষের অন্যতম ত্রুটি হল কৃত্রিম জলধারার অভাব।" সুতরাং পরে তিনি তাঁর খ্বাজা খানকে লেখা একটি চিঠিতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, "ভারতে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই আমি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তোমাদের কাছে যাত্রা শুরু করব। এ তো হতে পারে না যে ওইসব জায়গার আনন্দের স্মৃতি আমার মন থেকে একেবারে উঠে গেছে।"

অর্থনৈতিকভাবে এ দেশকে ধনী বলেই মনে হয়েছে বাবরের। শুধু ভূমি থেকেই আয় হত প্রায় ৪২১২০০০ টাকার মত, যা সমগ্র রাজস্বের এক অংশমাত্র পরাজিত ইব্রাহিম লোদীর কোষাগার থেকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন পান যা তিনি তার বন্ধু ও প্রিয় পাত্রদের মধ্যে দুহাতে মুক্তভাবে বিতরণ করেন। তিনি শুধুমাত্র হুমায়ুনকেই সত্তর লক্ষ টাকা দেন। ষাট হাজার থেকে এক লক্ষর কাছাকাছি টাকা তিনি আমীরদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি কাবুলের প্রতিটি অধিবাসীকে এক টাকা করে উপহার পাঠান। এই সমস্ত সম্পত্তি সাধারণ মানুষের ক্ষুধা ও বঞ্চনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। বাবরের ভাষায় "নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও কৃষকেরা প্রায় নগ্নভাবেই দিন কাটায়। শালীনতা বজায় রাখার জন্য তারা নাভির দুবিঘৎ নীচে "ল্যাঙ্গুটা" নামে বস্ত্রখন্ড পরে, দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখত। মহিলারাও দু'খন্ড বস্ত্রের সাহায্যেই লজ্জা নিবারণ করত। একটি কোমরে জড়ানো থাকত। অন্যটি মাথার দিকে জড়িয়ে রাখত।

বাবর মানুষের কাজকর্মের সম্বন্ধেও লিখে গেছেন। "ভারতবর্ষের আরেকটি ভাল দিক হল এখানে সব ধরনের কাজের লোক অসংখ্য পরিমানে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধরনের কাজের একটি নির্ধারিত শ্রেণী আছে। এখনও পর্যন্ত পিতা থেকে পুত্র এইভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে কাজ শেখে।" বাবর লক্ষ্য করেছেন যে তৈমুর বেগের প্রস্তর সমাধি নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে মোল্লা শরফ আজারবাইজান, ফারাস, হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দূর দেশ থেকে আগত মাত্র ২০০ জন কর্মীর কথা বলেছেন। অথচ শুধুমাত্র আগ্রাতেই বাবরের নিজস্ব গৃহনির্মাণে ৬৮০ জন এবং আগ্রা, সিক্রি, বায়না, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র ও কয়েল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পাথর কাটার কাজে ১৪৯১ জন নিযুক্ত আছে। একইভাবে বছরের সবসময়ই ভারতবর্ষের সর্বত্র সবধরনের অসংখ্য হস্তশিল্পী ও কর্মী পাওয়া যায়।" ভারতের ব্যবসার কথা লিখতে গিয়ে বাবর বলেছেন "দুটি প্রধান বাজারকেন্দ্র ছিল কাবুল এবং কান্দাহার। হিন্দুস্তান ও মধ্যে বিস্তৃত এই দেশটি পণ্যের চমৎকার বাজারের জন্য বিখ্যাত। হিন্দুস্তানের মরুযাত্রিরা প্রতিবছর পনের থেকে কুড়ি হাজার কাপড় নিয়ে আসে। হিন্দুস্তানের পণ্যসামগ্রী ছিল ক্রীতদাস, সাদা কাপড়, চিনির মিছরি, শোধিত এবং সাধারণ চিনি, ওষুধ এবং মশলাপাতি। ভারতীয় বণিকরা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা এবং রূপা আহরণ করত।

১.৪ বাবরের ভারত পর্যালোচনার সত্যতা

বাবরের বক্তব্যের অকপটতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় ভারতের প্রতি বৈরিতা বা অপছন্দের জের টেনে কোনো বক্তব্য রাখেননি। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ অবশ্য মনে করেন, "ভারতের মানুষজনের প্রতি বাবরের খারাপ মনোভাব যা প্রকাশ পেয়েছে তা অনেকটাই অতিরঞ্জিত। এর কারণ বাবর এদেশের মানুষদের ভাবনাচিন্তা, অভ্যাস ও স্বভাব ঠিকভাবে ও পুরোপুরি চেনার জন্য যত সময় প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম সময়ই এদেশে কাটিয়েছেন। (A short History of Muslim Rule in India, 1939, page 228) ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে, "প্রথমে তাঁর মনোভাব বিজিতের প্রতি বিজয়ীর যে হেয় মনোভাব হয় তাই ছিল।" (Mughal Empire 1957 page 33) বাবর নিজেও লিখে গেছেন, "আমি যখন আগ্রায় পৌঁছলাম তখন সেটা গরমকাল। সমস্ত লোক ভয়ের চোটে পালিয়েছে। আমরা নিজেদের জন্য কোনো খাদ্যকণা কিংবা ঘোড়াগুলোর জন্য খড়কুটো বা জাবনা কিছুই পেলাম না। গ্রামের লোকেরা বৈরিতা বা ঘৃণার থেকে বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। এমনকি চুরি-ডাকাতিও

শুরু করেছে।" এই যদি মুখ্য নগরী আগ্রার আশেপাশের এলাকার অবস্থা হয়, তবে বাকী দেশের অন্যান্য অংশের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। তাই বাবর যদি আক্রমণকারীর প্রতি দেশের লোকের অভদ্র আচরণ বা বাজারে সুখাদ্যের অভাবের জন্য যদি দুঃখপ্রকাশ করে থাকেন তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। তবে তিনি ভাল কথাও লিখে গেছেন। "হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভাল দিক হল এই সুবিশাল দেশে প্রচুর সোনা রূপা পাওয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে আবহাওয়া খুবই মনোরম। কোনো কোনো দিন দশ, পনের এমনকী কুড়ি বারও বৃষ্টি পড়ে। বর্ষায় হঠাৎই নদী ছাড়িয়ে চারদিক ভাসিয়ে প্লাবন আসে। এমন কী সেইসব জায়গাতেও যেখানে অন্যসময় কোনো জল থাকে না। যখন মাটিতে বৃষ্টি নেমে আসে তখন মৃদু এবং মনোরম উষ্ণতা বয়ে আনা বাতাসের চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছুই নেই। খবাজা খাঁ দিল্লী ছেড়ে আফগানিস্তান যাবার সময় এই ছত্রটি লিখে গেছিলেন ঃ "যদি আমি নিরুপদ্রবে, নিরাপদে সিন্ধ পেরিয়ে যাই, আমি কোনোমতেই ভারতের কথা আর ভাবব না।" বাবর তাঁকে উত্তর পাঠিয়েছিলেন এইরকম ঃ Return a hundred thank, O Babar, for the bounty of merciful God has given you Sind, Hind and numerous kingdoms. If unable to stand the heat, you long for cold. You have only to recollect the frost and cold of Ghazni. "হে বাবর, দয়ালু ঈশ্বরের করুণার জন্য তাঁকে শত ধন্যবাদ জানাও। তোমাকে সিন্দ, হিন্দ ও অন্যান্য রাজ্য যিনি দিয়েছেন। যদি গরম না সহ্য করতে পার, শীতের জন্য প্রার্থনা কর। এখন গজনীর কুয়াশা আর ঠান্ডা মনে করা ছাড়া তোমার কিছুই করার নেই।"

সুতরাং বোঝা যায় যে, বাবর যা দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেই সব স্বাভাবিক আবেগই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর লেখনীতে স্থান পেয়েছে। প্রিঙ্গল কেনেডির সাথে আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিত "তাঁর সম্বন্ধে আর যে যাই ভাবুক না কেন, এই হাসিখুশী, সুরসিক, প্রকান্ড মানুষটির প্রতি গভীর ভালবাসা না রেখে পারবে না, যিনি তাঁর দুর্বলতাগুলি লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেননি, নিজেকে কোনোভাবেই সাধারণ মানবজাতির চেয়ে উন্নততর প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি।"

১.৫ হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুর তিনদিন পরে ২৯ ডিসেম্বর ১৫৩০ এ উৎসব ও আনন্দোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে হুমায়ুন আগ্রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যন্ত সুরুচির সঙ্গে উদ্‌যাপিত এই অনুষ্ঠানে নৌকাভর্ত্তি সোনা বিতরণ করা হয়েছিল। তাঁদের পূর্ব ইতিহাস যাই হোক না কেন অবিচ্ছেদ্য আনুগত্যের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পেলেন স্বপদে নিযুক্ত থাকার আশ্বাস। এই তরুণ, বীর রাজপুত্র তখন বুঝতে পারেননি, যে সিংহাসন তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেন তা টিকিয়ে রাখা সহজ হবে না। যখন বাবর বুঝতে পারলেন যে তাঁর অসুস্থতার কোনো প্রতিকার সম্ভব নয় এবং তাঁর মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তিনি তাঁর সমস্ত অভিজাতদের ডেকে হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করতে এবং শাসনকার্যে তাঁকে সমস্তরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। স্বয়ং হুমায়ুনকে তিনি বলে যান ঃ "আমি ঈশ্বরের কাছে তোমাকে, তোমার ভাইদের, আমার জ্ঞাতিবর্গ, আমার প্রজা ও তোমার প্রজাদের রেখে গেলাম। এদের সবার জন্য আমি তোমার ওপর ভরসা রাখি।"

তিনদিন বাদে বাবর তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একজন বাধ্য ছেলের মত হুমায়ুন পিতার আদেশ কখনই অমান্য করেননি, যার ফলে তাঁর প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। তাঁর তিন ভাই এবং দুই জ্ঞাতি ভাই যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ কদাচিৎই ছাড়তেন, তাদেরকেও তিনি বাবরের বিজিত অঞ্চলের বড় অংশ ছেড়ে দেন। কাবুল ও কান্দাহারে কামরান তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন। আসকারি পান সম্ভল এবং হিন্দলকে দেওয়া হয় আলওয়ার ও মীরাট। বাদাকশান দেওয়া হয়েছিল সুলেমান মির্জাকে। বাবরের কন্যা মাসুমা বেগমের স্বামী মহম্মদ জামান মির্জাকে

জৌনপুরের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। সাম্রাজ্যের এই অবাধ বিভাজন কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করে তুলেছিল এবং সাম্রাজ্যকেও দুর্বল করেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে ডঃ ত্রিপাঠীর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। হুমায়ুন তুর্কো-মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী তাঁর ভাইদের সঙ্গে সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। কেননা এর অন্যথায় তাঁর পক্ষে অসুবিধার সূচনা হতে পারত। কারণ যাই হোক না কেন, একটা কথা খুবই পরিস্কার। ভারতবর্ষের সীমানার বাইরের অঞ্চলগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মুঘল সৈন্যবাহিনীর মূল নিয়োগক্ষেত্রকে খুইয়ে ফেলেন। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানের পাহাড়ী উপজাতি বা অস্কাসের লোকেরা শক্তি যোগাত ও তা বজায় রাখত। কিন্তু এখন ঐ উৎসগুলিকেই হুমায়ুন ধ্বংস করে ফেলেন। এরপরে হুমায়ুনকে ভারতবর্ষের বিলাসবহুল জীবনযাপন ও ক্ষতিকারক জলবায়ুর শিকার এক ক্ষয়িষ্ণু সৈন্যবাহিনীর উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

প্রফেসর উইলিয়ম রাশব্রুক লিখেছেন, "বাবর তার পুত্রকে এমন একটি রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী করে গেছিলেন যা বিরামহীন যুদ্ধ পরিস্থিতিতেই শক্ত করে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল এবং শান্তির সময় দুর্বল, মেরুদন্ডহীন এবং অসংগঠিত হয়ে পড়ত। প্রকৃতপক্ষে বাবর যথেষ্ট সময় পেতেন তার সাম্রাজ্যকে সুসংসত করে তুলতে যদি তিনি এক কার্যকর শাসনব্যবস্থা স্থাপনে আগ্রহী হতেন। তিনি একজন অচেনা বা বিদেশী হয়ে এ দেশে ঢুকলেও শাসক ইব্রাহিম লোদীকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেকে হিন্দুস্তানের বাদশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি ১৫২৭ সালে রাণা সঙ্গের নেতৃত্বাধীন রাজপুত্র জোটকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইব্রাহিম লোদীর অন্য এক ভাই মাহমুদ লোদীকেও ১৫২৯ সালে ঘাঘরার যুদ্ধে অপমানজনকভাবে পরাজিত করেন। বাবরের পক্ষে এগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হলেও তার শত্রুরা এর ফলে নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হয়ে যায়নি। যদিও মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত প্রতিরোধের মেরুদন্ড ভেঙে পড়েছিল, তবুও রাজপুতরা এখনও শত্রুভাবাপন্ন ছিল। আফগানরাও মুঘলদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বোঝাপড়ায় রাজী হয়নি এবং তাদের হারানো ভাগ্য ফিরে পেতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাদের আরও একটা সুবিধের দিক ছিল যে তারা অপসারিত রাজবংশের বংশধর মাহমুদ লোদিকে পেয়েছিল। তাকে সমস্ত আফগান অভিজাতরাই সমর্থন করতে রাজী ছিলেন। বাংলা ও বিহারে ইতিমধ্যেই শেরখান অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং মুঘল শক্তিকে সরিয়ে আফগান শক্তির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছিলেন। "যদি ভাগ্য আমার সহায় হয়, আমি হিন্দুস্তান থেকে মুঘলদের তাড়িয়ে দিতে পারি। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে মোটেও উন্নততর নয়।" দক্ষিণেও তরুণ, উচ্চাকাঙ্খী ও যুদ্ধপ্রিয় বাহাদুর শাহ তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রচুর বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। গুজরাট এবং মালবের উপরেও তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। দক্ষিণে অনেক দুর্বল শাসকের কাছে তিনি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজপুতানা জয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন। ডঃ ত্রিপাঠী মনে করেন উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন এবং আইনানুগ সম্রাট না হলেও তিনি কার্যত সম্রাটের ভূমিকাই পালন করছিলেন। এই বক্তব্য আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে এবং এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বিশেষতঃ বাহাদুর শাহ এবং শের খানের সামনে হুমায়ুনের খুব কিছু করার ছিল না। বাবরের ব্যাপক ধনবন্টনের কল্যাণে কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে আর্থিক ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের সীমানা আমু নদী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের অনেক দূরবর্তী অঞ্চল যেমন গজনী, কান্দাহার ছাড়াও মূলতান, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা ইত্যাদিও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই বিশালতা সত্ত্বেও এটি না ছিল সুসংবদ্ধ, না ছিল সুশাসিত। বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেও কোনো সমতা ছিল না। আরস্কাইন লিখেছেন, "প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি জেলা এবং প্রায় প্রতিটি গ্রাম সাধারণ ব্যাপারে একান্ত নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করত। দেওয়ানী, ফৌজদারী এমনকি প্রাণদন্ডের ক্ষেত্রেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যথাযথ শৃঙ্খলা ও সংযমের সাথে সিদ্ধান্ত নিতেন না।" এইসব কারণেই শাসক রাজবংশের প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আনুগত্য তো ছিলই না, বরং তারা সদাযুদ্ধরত আফগান, মুঘল, তুর্কী, পার্সিয়ান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর

অবিরাম চলাচলে ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এইসব বিভিন্ন জাতির সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন উপজাতীয় সর্দারের অধীনে থাকত এবং তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি খুব দুর্লভ দৃশ্য ছিল না। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রায়ই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় সৈন্যবাহিনী একই শ্রেণীভুক্ত বা শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল না। তাই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করা যেত না।

একটি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজার বীরত্ব ও বিচক্ষণতার দ্বারাই জাতির নিয়তি নির্দ্ধারিত হয়। হুমায়ুন যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার চারপাশে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান করা খুব সহজ ছিল না। তবুও আমরা যদি বাবর কিংবা আকবরের অল্পবয়স ও তাঁদের সমস্যাসঙ্কুলতার সঙ্গে হুমায়ুনের তুলনা করি, তবে আমরা হুমায়ুনের কথা ভেবে হতাশ হই না। হুমায়ুন বাবরের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছিলেন, আকবরের জন্য তিনি তার থেকে বেশী কিছু রেখে যেতে পারেননি। বাবরেরও প্রথম জীবনে সব কিছুই তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তিনি মাত্র বার বছর বয়সে ফরগনার অধিপতি হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যপাট হারিয়ে ভবঘুরের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমস্যা ও তার সমাধানই একটি মানুষকে সম্পূর্ণতা দান করে। হুমায়ুনের সমস্যাগুলিও অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ছিল না। একথা সত্যি, "সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি স্পষ্ট বুঝবার ও তার দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় অসম্ভব শক্তি ও যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতা জরুরী ছিল।" বাবর একবার হুমায়ুনকে লিখেও পাঠিয়েছিলেন ঃ

"এই পৃথিবী তারই যে ক্ষমতার জোরে কেড়ে নিতে পারে। সংকট দেখা দিলে নিজেকে খাটিয়ে নিতে ভুলো না। রাজত্ব করতে হলে আলস্য এবং আরাম চলবে না।"

কিন্তু হুমায়ুনের এত সব গুণ ছিল না। তিনি নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন। তিনি বড়ই আরামপ্রিয় এবং অসংযত ছিলেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন, "তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতেন। যখন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন তখন তিনি দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করতেন। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। প্রকৃতির শুভ-অশুভ লক্ষণ বিচার না করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।" লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও সংকল্পের অভাব ছিল। তিনি নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এক মুহূর্তের বিজয়ের পরেই আরামে ও আফিম সেবন করে নেশার ঘোরে ডুবে যেতেন। অথচ তার শত্রুরা তখন প্রায় তাঁর দরজায় এসে হানা দিচ্ছে। যখন শাস্তি দেবার কথা তখন তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

তাঁর চরিত্র আকর্ষণ করত কিন্তু কখনই তা শাসন করত না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো তিনি মনের মত সঙ্গী ও একনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি ব্যর্থ।" হুমায়ুনের পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত অঞ্চলের অধিকার হারানো এবং ফিরে পাওয়ার ইতিহাস বাবরের অভিযানগুলির মতই চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ।

রাজত্বের শুরুর দিকে হুমায়ুন যুদ্ধে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাগ্যও এই তরুণ রাজার সহায় হয়েছিল। তাঁর জীবনের প্রথম অভিযান হয়েছিল বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গে। সন্দেহ করা হয়েছিল যে রাজা আফগানদের সঙ্গে বাদশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। হুমায়ুন কয়েকমাস দুর্গ অবরোধ করে রাখলেও দুর্গটিকে জয় করা সম্ভব হয়নি। তবু তিনি এই সূত্রে প্রচুর ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। তিনি এবার আফগান ষড়যন্ত্রের অপর একটি ঘাঁটি দখল করতে উদ্যোগী হন। জৌনপুরে মাহমুদ লোদীর অধীনে আফগানরা বারাবাঙ্কি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তিনি তখন শের খানের এক প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি চুনার দখল করে নেন কিন্তু শের খানের তরফ থেকে সম্পূর্ণ দায়সারা ভাবে আত্মসমর্পণ করা হলে তিনি ওই অবরোধ তুলে নেন। ভবিষ্যতে এর ফল হুমায়ুনের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কেননা এই শের খানই একদিন মুঘলদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন।

হুমায়ুন তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে গুজরাট ও মালবের উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক বাহাদুর শাহের সঙ্গে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। সত্যি কথা বলতে কি, বাহাদুর শাহ বাদশার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন

তিনি মুঘলদের দুই পলাতক প্রতিপক্ষ মহম্মদ জামান মির্জা অর্থাৎ বাবরের জামাতা এবং আলম খান-আজনা-উদ-দিন লোদী নামে এক আফগানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই আলম খান লোদী নামক আফগান মুঘল সিংহাসনের প্রতি লালায়িত ছিলেন। যাই হোক বাহাদুর শাহ এই পলাতকদ্বয়কে মুঘলদের কাছে হস্তান্তর করতে বা গুজরাট থেকে বিতাড়ন করতে আগ্রহী ছিলেন না। এই কারণে হুমায়ুন এবার বাহাদুর শাহকে শায়েস্তা করতে ১৫৩৪ সালে মালবে উপস্থিত হলেন। এইবারে হুমায়ুন ভুল বিবেচনার শিকার হলেন। কেননা বাহাদুর শাহ ঐ সময় চিতোর দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, চিতোরের রাণী কর্ণবতী হুমায়ুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন যদি সামান্যও বিবেচনা করতেন, তবে তিনি কর্ণবতীর আবেদনে সাড়া দিতেন কেননা বাহাদুর শাহ ছিলেন দু'পক্ষেরই শত্রু। হুমায়ুন চিতোরের দিকে যাত্রাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ইসলামিক যুদ্ধে নিরত থাকার দোহাই দিয়ে হুমায়ুনকে যুদ্ধ শুরুর থেকে বিরত রাখেন। সম্রাটের দিক থেকে এটি একটি বড় ধরনের ভুল ছিল। রাজপুত সাহায্য পাবার ও তাঁর নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুকে বিনাশ করার এক সুবর্ণ সুযোগ তিনি এর ফলে হারালেন।

চিতোরের পতনের পরে মান্দাসোর নামে এক কৃত্রিম জলাশয়ের পাশে মুঘল বাহিনী ও বাহাদুর শাহের মধ্যে সম্মুখসমর শুরু হল। বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়ে মান্ডু দুর্গে আশ্রয় নেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে ধাওয়া করে দুর্গটিকে অবরোধ করেন। ভাগ্যও হুমায়ুনের সহায় হয়েছিল। ফলে মুঘলরা দুর্গটি দখল করতে সক্ষম হয়। বাহাদুর শাহ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী তাঁর পিছনে ছায়ার মত লেগে রইল, যতক্ষণ না বাহাদুর শাহ মান্ডু থেকে চম্পানীর, পরে আমেদাবাদ ও কাম্বে হয়ে দিউয়ে আশ্রয় নিলেন। গুজরাট বিজয় ১৫৩৫ এর অগাস্ট মাসে সম্পূর্ণ হয়। এর ফলে হুমায়ুন তাঁর বাকী সাম্রাজ্যের প্রায় সমান আয়তনের মালব ও গুজরাটের অধিকার পান। কিন্তু তাঁর বিজিত অঞ্চলগুলিকে সংহত না করে বা সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা কায়েম না করে, এই মূল্যবান সময় তিনি শুধুই আনন্দ উৎসবে নষ্ট করেন। এর ফল হল এই যে, যেইমাত্র তিনি আগ্রা ছেড়ে বেরিয়ে শের খানকে মোকাবিলা করতে যান, বাহাদুর শাহ তাঁর সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। লেনপুল লিখেছেন, "এক বছরে দু'টি বৃহৎ প্রদেশ দ্রুত জয় করা হোল, পরের বছরই ঐ দু'টি প্রদেশ ততটাই দ্রুত হারিয়ে গেল।" এইভাবে গুজরাট বিজয় এক হতাশাজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এর পরে হুমায়ুনের কাজ ছিল তাঁর প্রধান শত্রু শের খানের মোকাবিলা করা। ইতিমধ্যেই গুজরাটে হুমায়ুনের অনুপস্থিতির সুযোগে শের খান তাঁর অবস্থাকে সুসংহত করে ফেলেন এবং বাংলার রাজাকে পরাজিত করেন। গুজরাট থেকে আগ্রায় ফিরে হুমায়ুন তখনই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে না পৌঁছে পুরো এক বছর আনন্দ করায় ব্যস্ত রইলেন। অবশেষে ১৫৩৭-এর শেষের দিকে যখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ত জীবনের তন্দ্রার ঘোর থেকে উঠলেন, তখনও তিনি সোজা গৌড়ের দিকে না গিয়ে চুনার দুর্গ ঘিরে ফেললেন। বাংলার রাজার সাথে এদিকে ততদিনে শের খান চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এদিকে চুনার দুর্গের সাহসী যোদ্ধারা টানা ছয় মাস ধরে মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সময়ের মধ্যে শের খান গৌড় দখল করে নিয়ে মুঘলদের মোকাবিলা করার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে হুমায়ুন চুনার দুর্গ দখল করে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন এবং সহজেই বাংলা দখল করলেন। কিন্তু যথারীতি সম্রাট তাঁর দূরদৃষ্টির অভাবে এই সুযোগও কাজে লাগাতে পারলেন না। কেননা তখনই তিনি শের খানকে জব্দ না করে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ করে গৌড়ে ছয় মাস কাটালেন এবং গৌড়ের নতুন নামকরণ করলেন জান্নাতাবাদ (স্বর্গের শহর)। ইতিমধ্যে শের খান বিহারে নিজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটান এবং কনৌজ পর্যন্ত মুঘল এলাকা দখল করে নেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আগ্রায় ফেরা মনস্থির করলেন। ততদিনে জোরদার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল এবং তার ফলে সৃষ্ট বন্যা সম্রাটের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে জিনিসপত্রের সরবরাহের অভাব দেখা দিয়েছিল এবং বহুদিন বসে থাকার ফলে সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আগ্রায় ফেরত যাবার সময় অর্তকিতে আফগান সৈন্যরা সম্রাটের বাহিনীকে আক্রমণ করলে তা বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অনেক

সৈন্য ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রাণ দেয় এবং খুব কম সংখ্যক সৈন্যই ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পায়। স্বয়ং সম্রাটকেও বেপরোয়াভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। পরে একটি জলযানে চড়ে তিনি অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচান। অভাগা এই সম্রাট সম্পূর্ণ একা আগ্রায় পৌঁছন এবং রাজকীয় হারেমের মহিলাদের পরে আফগান সেনারা আগ্রায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়। এত বিশাল পতন ভারতীয় ইতিহাসে খুবই বিরল।

আফগান ও মুঘল সৈন্যের অন্তিম সম্মুখসমর হয়েছিল ১৫৪০ সালের মে মাসে কনৌজের যুদ্ধক্ষেত্রে। হুমায়ুন পুরো একবছর সময় ধরে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পুর্নগঠন করেন এবং এক লক্ষ সৈন্য জোগাড় করেন। কিন্তু আগে থেকেই শিথিল ও অসংহত মুঘল বাহিনীকে ত্যাগ করে সৈন্যরা ক্রমাগতঃ চলে যাওয়ায় বাহিনী আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোনো চেষ্টা ছাড়াই মুঘল বাহিনী ভীত হয়ে পড়ে এবং সহজেই আফগানদের কাছে পরাজিত হয়। সবাই গঙ্গা নদীর দিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলে সেতু ভেঙে পড়ে। হুমায়ুন খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এর পরে পনের বছর তিনি ভবঘুরের জীবন কাটান। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর অপদার্থ ছেলেদের অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে হুমায়ুন ভারত আক্রমণ করেন এবং ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে মাত্র কয়েক মাসের বেশী সিংহাসন ভোগ করা ছিল না। ১৫৫৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী দিল্লীতে পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ৪৮ বছরেরও কম বয়সে মারা যান। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ২৫ বছর ভারতে রাজত্ব করেন। বাবর যে অনিশ্চিত মুঘল বংশের বীজ বপন করেছিলেন, হুমায়ুনের উচিত ছিল তাকে শক্তিশালী করে তোলা। কিন্তু কয়েকটি কারণে, প্রতিকূল অবস্থা ও তাঁর নিজের ভুলের জন্য তিনি বিপাকে পড়েছিলেন, যার ফলে তাকে এক রাজকীয় ভবঘুরের জীবন কাটাতে হয়েছিল প্রায় পনের বছর। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, "একজন মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে, তার ওপরেই তাঁর স্বভাব অনেকটা নির্ভর করে। যতক্ষণ না আমরা তাঁর অসুবিধা, এবং মধ্যযুগীয় নৃপতিসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সুবিধাভাবে বিবেচনা না করি, তখন তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।"

রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের সাফল্যের জন্য অনেকাংশে সৌভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, যা হুমায়ুনের ক্ষেত্রে ঘটেনি। কর্তব্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আত্মীয়তার প্রতি সম্মান যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একজন রাজার স্বাভাবিক আচরণবিধি যে কোনো সাধারণ ব্যক্তির মত হতে পারে না। তাঁর আচরণের ধরণের কোনও পরিবর্তন না করায় হুমায়ুনের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। তিনি যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছিলেন এবং তাঁর যে সমস্ত ত্রুটি ছিল, তার ফলে ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। তাঁর যে ত্রুটি তার উদ্যমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা হল সহজাত সদ্‌গুণ এবং তাঁর অসীম ক্ষমাশীলতা দেশে ঐক্য বজায় রাখার জন্য তিনি শত্রুর অনেক দোষ-ত্রুটি অগ্রাহ্য করে যেতেন। তাঁর কিছু গুণই তাঁর বিপর্যয় ডেকে আনে। তাসত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে কঠিন অবস্থাতেও আশা হারাননি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তাঁর নির্বাসন থেকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরলেন। এর পর তিনি অনেক শক্ত, সক্রিয় বা বাস্তববোধসম্পন্ন হয়ে ফিরলেন। যদি আমরা খুঁটিয়ে হুমায়ুনের রাজত্বের ঘটনাবলী বিচার করি, তবে অবশ্যম্ভাবী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছব, যে হুমায়ুন যত না অযোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যপীড়িত। তাঁর দৈহিক শক্তি কিছু কম ছিল না এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজের ক্ষমতার সুপরিচয় দিয়েছেন। এলফিনস্টোনের বক্তব্য, "সংকটের সময় হুমায়ুন কখনই পিছিয়ে পড়তেন না। সহজ ও আরামের জীবনের প্রতি তাঁর টান থাকলেও চাপ ও টানটান পরিস্থিতিতে তিনি অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সংকটের সময় তিনি দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতেন। কিন্তু যেইমাত্র কিছু লাভ করতেন তখনই সেটা হারিয়ে ফেলতেন। লেনপুল লিখেছেন, "যদি পড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা থাকত, হুমায়ুন কখনই তা হারাতেন না। উনি সারাজীবন ধরেই হোঁচট খেলেন এবং মারাও গেলেন হোঁচট খেয়েই। রাজা হিসাবে শেষ পর্যন্ত যদি তিনি ব্যর্থ হয়ে থাকেন, এই ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের।"

একক ২ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার এবং মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠতা

মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বাবরের ভারত আগমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মুঘল সম্রাট ভারতবর্ষে নতুন ধরনের যুদ্ধকৌশল চালু করেন। যদিও ভারতে এর আগেই বারুদের প্রচলন ছিল। তবু দক্ষ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীর যৌথ উদ্যোগ কী অর্জন করতে পারে তা বাবর প্রথমবার দেখালেন। তাঁর বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে দ্রুত বারুদ ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করল। কিন্তু ১৫৪০ সালে হুমায়ুন তাঁর সাম্রাজ্য হারালেন।

হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল আফগান দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৫৬ সালে আকবর ও আফগান শাসক আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে এই শ্রেষ্ঠত্বের কথাই আবার প্রমাণিত হয়। হিমু ধৃত হন ও তাঁকে আকবর শাস্তি প্রদান করেন। এর পরে আকবর তাঁর পিতা ও পিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল পুর্নদখল করেন।

গোড়ার দিকের সাম্রাজ্য বিস্তার (১৫৫৬-৭৬) ঃ

বৈরাম খানের অভিভাবকত্বাধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আজমীর বাদে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলির মধ্যে ছিল মালব ও (Garhkatanga) গড়-কাটাঙ্গা।

বাস্তবিকই ১৫৫৬তে আকবর যখন মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এর বিশেষ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুকালে এই সাম্রাজ্যের সীমা কাবুল থেকে আহম্মদনগর ও পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন বড় মাপের সম্প্রসারণবাদী ছিলেন।

কিন্তু আকবরের রাজ্য জয়ের পিছনে প্রকৃত কারণগুলি কী ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ডঃ স্মিথ বক্তব্য রেখেছেন, "স্বাভাবিক রাজকীয় উচ্চাকাঙ্খা ও পর্যাপ্ত ক্ষমতার মিশ্রণেরই ফল হল আকবরের রাজ্য জয়।" তিনি বলেছেন রাজার দায়িত্বই হল তাঁর এলাকা বিস্তৃত করা এবং অ্যানে বেভেরিজের মন্তব্যকে সর্মথন করেছেন। বেভেরিজের মতে, "আকবর ছিলেন এক শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ সম্প্রসারণবাদী, যাঁর সূর্যকিরণের লর্ড ডালহৌসীর তারকাদীপ্তি ম্লান হয়ে যায়।"

জি.ভি. ম্যালসন এবং ভ্যান নোয়ের-এর মত ঐতিহাসিকরা পূর্বোক্ত মতের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন যে আকবর কখনই কোনো আক্রমণমূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। ম্যালসনের মতে তার সবক'টি যুদ্ধই ছিল প্রয়োজনের খাতিরে। ভ্যান নোয়ের মন্তব্য করেছেন, "শুধুমাত্র যুদ্ধ ও বিজয়ের দ্বারাই আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যস্থাপনের লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল।"

লরেন্স বিনিয়ন এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তৈমুরের একজন বংশধর হিসাবে ঐতিহ্যগতভাবে ও বংশসূত্রে আকবর ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি সামরিক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার খাতিরেও তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আসলে, মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতির লক্ষ্য ছিল সারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। আবুল ফজলের মতে, স্থানীয় স্বার্থপর নৃপতিদের অনৈতিক স্বেচ্ছাচারের অধীনে অত্যাচারিত মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেবার ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আকবর যুদ্ধজয়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই কথা সর্বাংশে সত্যি নয় যে আকবর প্রয়োজনের খাতিরেই সাম্রাজ্যবাদী হয়েছিলেন এবং মানুষ হিসাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আইন, শৃঙ্খলা ও স্থিতাবস্থা ধরে রাখার জন্য যুদ্ধজয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলতেন, "একজন রাজার উচিত সর্বদাই যুদ্ধজয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নয়তো তাঁর প্রতিবেশীরাই তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে।" যখন তিনি উত্তর

ভারতের বৃহদাংশের অধীশ্বর হয়েছিলেন, শুধুমাত্র তখনই তিনি ভারতবর্ষের মানুষকে নিরাপত্তাদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি শুধুমাত্র শক্তির ওপরেই নির্ভরশীল ছিল না। আকবর যুদ্ধ ও কূটনীতির এক মিশ্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র পশুবলের দ্বারা সমগ্র দেশের ওপর সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারবেন না। সুতরাং শুধুমাত্র কূটনীতি ব্যর্থ হলেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করতেন।

তাঁর গোড়ার দিকের যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিল্লী ও আগ্রা জয় জরুরী ছিল। কেননা, এই অঞ্চলগুলি ছিল যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্র এবং তাঁর পিতার অধিকৃত অঞ্চল ছিল।

মালব ও জৌনপুর ছিল এই রাজ্যের বহির্সীমানা। তাই মালব ও জৌনপুর জয় দিল্লী ও আগ্রার নিরাপত্তার খাতিরে জরুরী ছিল। মালব ও জৌনপুরের মধ্যেকার অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল গোয়ালিওর, চুনার, মির্থা ইত্যাদি দুর্গের ওপর। সুতরাং ১৫৬১-৬২ সালের মধ্যে আকবর এই সমস্ত অঞ্চল দখল করেন।

আকবরের রাজপুতানা জয় নিশ্চিতভাবে তাঁর আক্রমণমনাত্মক নীতিরই ফল ছিল। অবশ্য তিনি রাষ্ট্র রাজনীতিতে রাজপুতদের গুরুত্বও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। সম্প্রসারণের এক সূক্ষ্ম নীতি আশ্রয় করে যে রাজপুতরা দুর্ধর্ষ শত্রু হতে পারত তাদেরকেই তিনি মিত্র হিসাবে রাষ্ট্রের পক্ষে বিশাল সম্পদ করে তুললেন। তিনি রাজপুতদের তাঁর সামরিক রাষ্ট্রের স্তম্ভ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিবাহবন্ধন ছাড়াও তাঁর যুদ্ধবিজয় নীতি সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল। গন্ডোয়ানা রাজ্যে রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজত্ব করতেন। ১৫৬৪ সালে আকবর এই রাজ্য জয় করেন। এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে কোনো অজুহাত ছিল না যা তাঁকে এই কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

পরের দশ বছরের মধ্যে আকবর রাজস্থানের বেশীরভাগ অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং গুজরাট ও বাংলা জয় করেন। রাজপুত রাজ্যগুলি দখলের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য পদক্ষেপ ছিল মেবারের রাজধানী চিতোর জয়, কেননা চিতোরকে মধ্য রাজস্থানের প্রবেশদ্বার হিসাবে গণ্য করা হত। চিতোর আকবরের মত "একজন ম্লেছ বিদেশীর" কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হওয়ায় আকবর উপলব্ধি করেন যে চিতোর জয় না করলে, অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি তাঁর আংশিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করবে না। তাছাড়া চিতোরের রাণা উদয় সিং আকবরের শত্রু ও মালবের প্রাক্তন শাসক রাজ বাহাদুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মেবার রাজ্যটি গুজরাট যাবার পথে, অর্থাৎ দিল্লী ও আমেদাবাদের যোগাযোগের রাস্তার মধ্যে পড়ত। এই কারণে ১৫৬৭ সালে আকবর চিতোরের রাণা উদয় সিংকে অপসারণ করতে সক্ষম হন এবং ছয় মাস ধরে বীরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর চিতোরের পতন হয়। উদয় সিং এর পুত্র প্রতাপ সিংও এই সংঘাতের ফলে ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধেপরাজিত হন। এই দুই শক্তি গোলন্ডার প্রান্তরে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দুই পক্ষই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবী করে। ১৫৯৭ সালে প্রতাপ তাঁর মৃত্যুর আগে চিতোর, আজমীর ও মন্দিরগড় বাদে মেবারের বাকী সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। সুতরাং আকবরের যুদ্ধজয় নীতি মেবারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল ছিল না।

১৫৭০ সাল নাগাদ চিতোরের পতনের পরে রাজস্থানের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ রণথম্ভোর জয় করা হয়েছিল। যোধপুর আগেই জয় করা হয়ে গেছিল। এইসব বিজয়ের ফলে বেশীর ভাগ রাজপুত রাজ্য, যেমন কালিঞ্জর, বিকানীর ও জয়সলমীর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কয়েকটি রাজ্য, যেমন দুঙ্গারপুর, বন্সওয়ারা ও প্রতাপগড়ও বশ্যতা স্বীকার করে।

বাহাদুর শাহ মারা যাবার পর থেকে গুজরাট দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর উর্বর মাটি, এর উন্নত শিল্প এবং আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র হিসাবে এর গুরুত্ব, এইসবই গুজরাটকে লোভনীয় এক আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছিল। হুমায়ুন গুজরাটে কিছুদিন রাজত্ব করায় আকবর গুজরাটের ওপর দাবী স্থাপন করেন। আরও একটি কারণ ছিল দিল্লীর কাছে

কিছু মির্জা বিদ্রোহে সফল না হতে পেরে গুজরাটে আশ্রয় নেন। এত সম্পদশালী একটি রাজ্যকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কেন্দ্র হতে দিতে আকবর রাজী ছিলেন না। ১৫৭২ সালে আকবর আজমীর ঘুরে আমেদাবাদে পৌঁছান। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই আমেদাবাদ আত্মসর্মপণ করে। এবার আকবর যে সমস্ত মীর্জারা সোপারা, ব্রোচ, বরোদা এবং সুরাট দখল করে রেখেছিলেন, তাদের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর কাম্বে বিজয় পর্তুগীজদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে। অবশেষে ১৫৭২-৭৩ সালে তৃতীয় মুজফ্‌ফর খানের নামেমাত্র আংশিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিবদমান দলগুলির মধ্যে একদলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ লাভ করে তিনি লড়াইয়ে সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হন এবং গোটা গুজরাট দখল করেন। তাঁর এই বিজয়কে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল, কেননা এর ফলে তারা গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

বাংলায় আফগান শাসক সুলেমান কাররানির পুত্র দাউদ আকবরের আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না এবং পূর্বদিকে এক আফগান সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এইবারে আকবর যে সুযোগ খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী বাংলা আক্রমণ করল এবং কঠিন যুদ্ধের পর দাউদ শান্তির জন্য আবেদন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শীগগিরই দাউদ আবার বিদ্রোহ শুরু করেন। বাংলা ও বিহারে তখনও মুঘলদের অবস্থা খুব ভাল না হলেও আগের চেয়ে ভালভাবে মুঘল বাহিনীকে সাজান হয়েছিল এবং ১৫৭৬ সালে বিহারে এক কঠিন যুদ্ধের পর দাউদ খান পরাজিত হন এবং তাঁকে তখনই হত্যা করা হয়। এইভাবে পূর্ব ভারতের শেষ আফগান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

বিজ্ঞানসম্মত সীমানা স্থির করা ছাড়া আকবরের পক্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এই সীমানা স্থির করার জন্যই ১৫৮৫ সালে তিনি কাশ্মীর জয় করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

কাবুলে আকবর আক্রমণাত্মক কোনো পদক্ষেপ নেননি। এক্ষেত্রে তাঁর ভাই মির্জা হাকিম বাংলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলে আকবরকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। ১৫৮১ সালে আকবরের কাবুলের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক।

১৫৯৫ সালে বালুচিস্তান ও ১৫৯২ সালে সিন্ধ অধিকার আকবরের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার জন্য জরুরী ছিল। আসলে কান্দাহারের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলগুলিকে তিনি কাজকর্মের জন্য ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কান্দাহারের অসম্ভব সামরিক গুরুত্বের জন্যই আকবর একে জয় করতে চেয়েছিলেন। এতদিন হিন্দুকুশ পর্বত মধ্য এশিয়াকে আফগানিস্তান, বালুচিস্তান ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু হীরাটের উত্তর দিকে পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে একদল আক্রমণকারীর ভারত আক্রমণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যেহেতু কাবুল ছিল ভারতেরই অংশ, কান্দাহার ছিল আত্মরক্ষার প্রথম ক্ষেত্র। কান্দাহার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রও ছিল। বেশ কিছু বাণিজ্যপথ এর মধ্যে দিয়ে গেছে। পর্তুগীজদের ভারত মহাসাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন ও পারস্যের সঙ্গে বিরোধের পর সমুদ্রপথ তেমন নিরাপদ না থাকায় এই বাণিজ্যপথ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব কারণেই ১৫৯৫ সালে আকবর কান্দাহার জয় করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে এটি আবার পারস্যের অংশ হয়ে যায়।

ভারতীয় উপদ্বীপে আকবরের নীতি সম্পর্কে ভ্যান নোয়ের মন্তব্য করেছেন, "আকবর তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে দাক্ষিণাত্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, অশান্তির একটি সমাধান হওয়া উচিত।" সুতরাং তিনি দাক্ষিণাত্যের চারটি সুলতানশাহীকে মিলিয়ে একটিই সুলতানশাহীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভ্যান নোয়েরের এই মন্তব্যকে ভিনসেন্ট স্মিথ "ভাবপ্রবণ অর্থহীন উক্তি" বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আসলে আকবর মনে করেছিলেন যে দাক্ষিণাত্য দখল না হলে ভারতের ঐক্যবদ্ধতা সম্ভব নয়। উপরন্তু আকবর যখন উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পর্তুগীজরা নিজেদের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং একটি ভারতীয় শক্তি হিসাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিল। সমগ্র মহাসাগরীয় বাণিজ্য ও মক্কার তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার প্রশ্নটি তাদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই বিদেশীদের তাড়াবার জন্য

দাক্ষিণাত্যে আকবরের শক্ত মাটির প্রয়োজন ছিল। আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান কখনই ধর্মীয় কারণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না। ১৫৯১ সালে আকবর আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও খান্দেশে রাষ্ট্রদুত পাঠান। কিন্তু একমাত্র শেষোক্তটিই তাঁর আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। অগত্যা আকবর যুদ্ধ করাই স্থির করেন এবং আহম্মদনগরের কিছু অংশ দখল করে নেন। তাঁর আসীরগড় দখল অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতার নির্দশন।

মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ছিল উচ্চাকাঙ্খা ও যুদ্ধকৌশলের মিশ্রণ। ভারতের তৎকালীন অবস্থাই মুঘল বিস্তারনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই বিস্তারনীতি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ সফল হলেও, দাক্ষিণাত্যে আংশিকভাবেই সফল হয়েছিল। শুধুই লুন্ঠন ও আগ্রাসন নীতির ভিত্তিতে এই সাম্রাজ্যবিস্তারকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সমস্ত বিজয়ের মাধ্যমে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বৃদ্ধি করে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা হয়েছিল।

একক ৩ ❑ মুঘল শাসন নীতির প্রকৃতি

গঠন

৩.০ আকবর
৩.১ রাজ্যজয় এবং আকবরের উত্তর ভারতের অভিজাতদের সঙ্গে আপোষ
৩.২ আকবরের ধর্মীয় নীতি
৩.৩ জাহাঙ্গীর
৩.৪ শা-জাহান

৩.০ আকবর

১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কাহানারে আকবরের রাজ্যভিষেক ঘটে। বৈরাম খাঁ আকবরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বৈরাম খাঁ ছাড়াও তাঁকে অন্যান্য কয়েকজন পরিচালনা করেন। আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকে রাজ্যভার পরিচালনা করছিলেন মূলত তাঁর মাতা হামিদা বানু, এবং মাহাম আনাগা। আকবর ধীরে ধীরে নিজেকে এই নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্ত করেন। ১৫৬২ সালে তিনি একজন যথার্থ শাসক হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে রাজ্যজয়ের নীতি অনুসরণ করেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন উদার, সুফিবাদে বিশ্বাসী এবং তিনি জিজিয়া (Ziziah) নির্মূল করেন। রাজ্যজয়ের শেষে তিনি নীতি পরিবর্তন করেন। আকবরের যথার্থ পরিচয় আমরা পেতে পারি তাঁর ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে। তিনি মূলত সম্রাট এবং পরে দার্শনিক।

আকবরের শৈশব কাটে বেশ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তিনি বড় হয়েছেন তাঁর কাকাদের অধীনে, যারা তাঁর পিতার প্রতি সদয় ছিলেন না। ফলে অবহেলার সাথেই তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন। তিনি শিক্ষাগ্রহণের সামান্য সুযোগই পেয়েছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজা। বহুবিধ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে খুব সাহায্য করেছিল। তিনি নিজে কখনও লেখেননি কারণ তিনি কোনো প্রচলিত নীতির অবলম্বনকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চাননি। তিনি একদিকে গোঁড়া সুন্নিদের সাথে পরিচিত ছিলেন, আবার অপরদিকে মধ্য এশিয়ার উদার সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সুফিবাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ তাঁর মাতার কারণে। তিনি সুফিবাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষক ফৈজল (Faizl) এবং আবুল ফজল (Abul Fazal)-এর কাছ থেকে।

আবুল ফজল এবং বাদৌনীর পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের জন্য আকবরের যথার্থ পরিচয় পেতে আমরা সমস্যায় পড়ি। আবুল ফজল-এর মতে আকবর এবং আল্লাহ্ সমতুল্য, এবং আকবর গভীর ধ্যানে আল্লাহ-র সাথে কথাও বলেছিলেন। অপরদিকে সুন্নিদের গোঁড়া নেতা, বাদৌনী-এর মতে আকবর ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করেন এবং এক নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী (Din-i-Ilahi)-র প্রবর্তন করেন।

৩.১ রাজ্যজয় এবং আকবরের উত্তর ভারতের অভিজাতদের সঙ্গে আপোষ

১৫৫৬-তে আকবর হুমায়ুনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অঞ্চল পান, দিল্লী, আগ্রা, এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশও তাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈরাম খানের হাত ধরেই প্রথম বিস্তার নীতি শুরু হয়। তাঁর অভিভাবকত্বাধীনে আজমীর,

গোয়ালিয়র এবং জৌনপুর অধিকৃত হয়। এই নতুন শাসকের অধিকারভুক্ত হয় এক বিশাল অঞ্চল।

আকবর একটি যুদ্ধবিজয়ের নীতি প্রবর্তন করেন। যুদ্ধবিজয় নিয়ে তাঁর আদর্শ ছিল নিম্নরূপঃ "একজন রাজার উচিত সবসময়ই যুদ্ধে আগ্রহী হওয়া। নয়তো তাঁর শত্রুরাই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করবে।" আবুল ফজল তাঁর যুদ্ধজয়ের পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন। "ক্ষুদ্র শাসকদের অপশাসনে জর্জরিত মানুষের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার ইচ্ছা।" এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে একটি সামরিক উদ্দেশ্যও ছিল। এটি ছিল সাম্রাজ্যের সীমাকে আরও বড় করা। তিনি বলেছেন "সৈন্যবাহিনীকে সবসময়ই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত রাখা উচিত। পাছে অনুশীলনের অভাবে তারা সংযমহীন না হয়ে পড়ে।" মালবের বিরুদ্ধে অভিযান (১৫৬১) থেকে শুরু করে আসীড়গড়ের পতন পর্যন্ত (১৬০১) প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আকবর একজন বিজেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এর ফলে তিনি অত্যন্ত ফলপ্রসূ পুরস্কার পান। উত্তর ভারতে একমাত্র আসাম এবং দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ বাদে সমগ্র ভারত আকবরের অধীনে আসে। ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থই বলেছেন, "শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী যার সূর্যকিরণের সামনে লর্ড ডালহৌসীর তারকাদীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। আকবরের নীতিতে কোনো অভিনবত্ব ছিল না। এ ছিল শেরশাহ্ ও দিল্লীর অন্যান্য শক্তিশালী সুলতানদের দ্বারা অনুসৃত নীতিরই নবীকরণ। Sir Wolseley Haig এই সত্যের মধ্যে কোনো কিছুই খুব আশ্চর্যজনক খুঁজে পাননি যে, "একজন বিজেতার তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যে হানা দেবার জন্য তাদের দখল করার ইচ্ছা ভিন্ন আর কোনো অজুহাতের প্রয়োজন হয় না।"

১৬০৫ সালে যখন আকবর মারা যান, তাঁর সাম্রাজ্য কাবুল থেকে আহ্‌ম্মদনগর এবং বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলেও রাজ্যজয় না করে থাকতে পারেননি।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, "আকবর ছিলেন একজন সাধারণ সম্প্রসারণবাদী।" জিভি ম্যালেসন ও ভ্যান নোয়েরের মতে, "আকবর শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।" লরেন্স বিনিয়নের মতে, "তিমুরিদ আকবর ছিলেন একজন ঐতিহ্যগত সাম্রাজ্যবাদী। একই সময়ে তিনি নিরাপত্তার কারণেও যুদ্ধে লিপ্ত হন।"

আবুল ফজল যুদ্ধে মানবতাবাদ আনার চেষ্টা করেছেন। আকবরের যুদ্ধজয় ১৬৫১-৫২ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্যের মধ্যবর্তী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করার মাধ্যমে সূচিত হয়। শুরু থেকেই রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি তিনটি নীতি গ্রহণ করেন ঃ অঞ্চল অধিকার, বৈবাহিক মৈত্রী এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টা।

আকবরের রাজ্যজয় শুরু হয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, যেমন জৌনপুর, মীরাট, গোয়ালিয়র, চুনার, মির্থা এবং মালব ১৬৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

মহম আনাগার অভিভাবকত্বাধীনেই মালব জয় (১৫৬১) সম্পন্ন হয়। মালবের স্বাধীন সুলতান বাজবাহাদুর রাজনীতি ও যুদ্ধের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সঙ্গীত ও আনন্দই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আধাম খান ও পীর মহম্মদ খানের নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালানো হয়। বাজবাহাদুর মালবে ফিরে এসে তা পুর্নদখল করলেও মুঘল বাহিনী তাকে বিতাড়ন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর দরুন ক্লান্ত হয়ে ১৫৭০ সালে তিনি আকবরের কাছে আত্মসর্মপণ করেন। বৈরাম খানের পতনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ব প্রদেশগুলির আফগানেরা এক বিশাল বাহিনী সংগঠিতকরেন এবং জৌনপুরে অভিযান চালিয়ে লুপ্ত ক্ষমতা অধিকার করার প্রয়াসে ব্যর্থ হন। এর পরে চুনার দুর্গের আফগান প্রধান ১৫৬১ সালে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসর্মপণ করেন।

১৫৬৪ সালে আকবর গন্ডওয়ানা জয় করেন। তিনি আসফ খানকে গড় কাটাঙ্গাঁর গোন্ড রাজ্যকে পরাজিত করার নির্দেশ দেন, যা আগে কখনই বশ্যতা স্বীকার করেনি। নাবালক রাজা বুই নারায়ন ও তার মা রানী দুর্গাবতী বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং এক সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর রাণী আহত হয়ে পড়েন। দু'মাস পরে আসফ খান চুনারের দিকে এগিয়ে যান ও তা দখল করেন।

সমস্ত রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে চিতোর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল। এটি আকবরের

"স্বর্ণমন্ডিত শিকলের" দ্বারা আবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছিল। রাণা উদয় সিংহ আকবরের বশ্যতা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি অম্বরের রাজার কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহকে হিন্দু ধর্মের লঙ্ঘন হিসাবেই দেখেছিলেন। এ ছাড়াও, মেবারকে তাঁর সাম্রাজ্যের কক্ষপথে নিয়ে আসার পেছনে গভীর-সামরিক এবং রাজনৈতিক কারণও ছিল। তিনটি শক্তিশালী দুর্গ, মারওয়াড়ের মীর্থা, বুঁদির রনথম্ভোর এবং চিতোর রাণার বিচারাধীন এলাকাতেই পড়ত। উপরন্তু মেবার গুজরাটে যাবার পথেই পড়ত। চিতোরের দুর্গ নিজের দখলে না এলে, গুজরাটের মত একটি ধনী প্রদেশকে কিছুতেই নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা যেত না। এই প্রসঙ্গে যে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতার আশ্রয় তিনি নিয়েছিলেন তাতে আকবরের নামে এক অনপনেয় কলঙ্ক লেগেছিল। আবুল ফজল অবশ্য এই কথা বলে ব্যাপারটাকে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন যে, অসামরিক জনগণও আত্মরক্ষার লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর ফলে মেবারের সমতলভূমি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আসে। এটি গুজরাট জয়ের পথ থেকে একটি বাধা অপসারণ করে এবং রণথম্ভোরের দ্রুত পতন (১৫৬৯) ঘটায়। মেবার ও বিকানীর বশ্যতা স্বীকার করে (১৫৭০)। রাণা প্রতাপ সিংহ হলদিঘাটের প্রান্তরে ১৫৭৬ সালে এক চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এটি ছিল মুঘলদের একটি নিষ্ফলা বিজয়। ১৫৭৮-এ কুম্ভলগড় দখল করা হয়। আকবর কয়েকটি অভিযান পাঠান এবং মেবার বিধ্বস্ত হয়। রাণার মৃত্যুর পর চিতোর এবং মন্ডলগড় ছাড়া সমগ্র মেবারের ওপর আকবর প্রভুত্ব পান। রণথম্ভোর, কালিঞ্জর এবং মারওয়াড় ছিল বিজিত এলাকার অধীন। মারওয়াড়কে তিনটি নীতির মধ্যে যে কোনো একটির অধীনে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ওই সময়ের মধ্যে গুজরাট জয়ও সম্পন্ন হয়েছিল। মালব বিজয়ের পর এবং রাজস্থানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর আকবরের অগ্রগতির পথে গুজরাট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এটি ছিল একটি ধনী রাজ্য যার অধীনে কয়েকটি বন্দর ছিল। সুরাট ও কাম্বেতে ভারতীয় ও বিদেশী বহু ধনী ও প্রভাবশালী বণিক বাস করত। আক্রমণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল আক্রমণের পক্ষে উপযোগী। বিশেষ ক্ষমতাবান কোনো সুলতান গুজরাটের সিংহাসন দখল করেননি। বহু বছর ধরে অসৎ অভিজাতরা সুলতানদের মসনদে বসিয়েছিল ও নামিয়েছিল এবং দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এটি ছিল এক বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা, তুর্কী ইত্যাদির সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। ইত্যবসরে মির্জারা গুজরাটে শাসন চালাত। কাম্বে থেকে আকবর তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করেন এবং তাদের সারমলের যুদ্ধে (১৫৭২) পরাজিত করেন। যুদ্ধে বিজয়ের পর সুরাট দখল সম্পন্ন হয়। গুজরাটে আবার নতুন করে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং আকবর ঝড়ের গতিতে আহমেদাবাদের দিকে ধাওয়া করেন ও সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করেন। এর ফলে রাজকীয় কোষাগারে বিপুল অর্থাগম হয়।

১৫৭৫-৭৬ সালে বাংলা জয় করা হয়। শূরেরা আকবরের সিংহাসনারোহনের সময় বাংলা অধিকার করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গড়ে ওঠা রাজ্যে সুলেমান কাররানী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট বিচক্ষণ হবার কারণে তিনি আকবরের কর্তৃত্ব মেনে নেন এবং তার নামে খুৎবা পাঠ করে এবং সময়ে সময়ে উৎকোচ প্রদান করে আকবরকে খুশী রাখেন। কিন্তু পরে পুত্র দাউদ অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে আকবর দাউদকে শাস্তি দিতে আদেশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিহারের দিকে অগ্রসর হন। স্থলপথে এক বিশাল বাহিনী অগ্রসর হয় ও পাটনা দখল করে। আকবর বিপুল লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও ২৬৫টি হাতি নিয়ে রাজধানীতে ফেরেন। সুরযগড়, মোঙ্গীর, ভাগলপুর ও কোলগাঙ্গঁ পরপর অধিকৃত হয়। দাউদ উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুঘল বাহিনী উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। বিজ্ঞানসম্মত সীমানা সৃষ্টি করতে ১৫৭৫ সালে কাশ্মীর জয় করা হয়। ইউসুফ খান নামে এক স্বাধীন শাসকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় এবং তাকে কাশ্মীরের সামন্ত প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দান করে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৫৮৬ সালে কাশ্মীর দখল করা হয়। ওই বছরই বালুচিস্তানও জয় করা হয়। বালুচিস্তান দখল করার জন্য আকবর একটি অভিযান চালান এবং বালুচি প্রধান বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর তাদের সামন্ত প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং

বালুচিস্তানকে তাদের অধীনে থাকতে দেন। ১৫৯২ সালে সিন্ধু, ১৫৯৫ সালে কান্দাহার এবং ১৫৯১-৯২ সালে সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হয়।

আকবর তাঁর প্রথম নীতির প্রয়োগ ঘটান দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যেই প্রথম তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ছাপ রাখেন। ভ্যান নোয়ের আরও বলেন, মুঘল অধিকার থেকে ছিটকে যাওয়া আকবর তাদের পর্তুগীজ সিল্ক রুটের ওপর দখল পাবার জন্যই সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং সুতরাং একটি নির্গমণপথ চেয়েছিলেন।

ব্যতিক্রম হিসাবে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য বাদে দক্ষিণ ভারত কখনই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল না। উত্তর ভারতে মুসলিমরা বাদে রাজপুতরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী। রাজপুতনীতিকে একটি স্বতন্ত্র নীতি হিসাবে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজপুতরা কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের আওতায় আসতে অনিচ্ছুক ছিল।

রাজপুতদের প্রতি আকবরের ব্যবহার অপরিণামদর্শী আবেগ বা তাদের সাহস, দয়া বা দেশপ্রেমের প্রতি বীরধর্মপূর্ণ শ্রদ্ধার প্রকাশ ছিল না। এটি ছিল একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতির পরিণতি। এই নীতি জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থমনস্কতা, গুণের কদর, ন্যায়বিচার এবং সুব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আকবর তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকেই বুঝতে পেরেছিলেন, যেহেতু তাঁর মুসলিম কর্মচারী এবং অধীনস্থরা সকলেই বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য, কাজেই প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারেই কাজকর্ম করতেন, সুতরাং তাদের ওপর নির্ভর করা চলত না। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকেই তাঁকে নিজের দরবারে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শাহ আবদুল মোলি, শাহ মনসুর থেকে শুরু করে অনেকেই এই তালিকার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এমনকী বৈরাম খাঁও সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর পরে মহম আনাগাও চূড়ান্ত অনৈতিক ও স্বার্থপররূপে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। যাদের ওপর নির্ভর করে বিদেশী মাটিতে অচেনা জনসাধারণের ওপর মুঘল কর্তৃত্ব গড়ে উঠেছিল, প্রায়ই তাদের দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহের ফলে আকবর বোঝেন যে, তাঁর শাসন ও বংশকে স্থায়িত্ব দিতে হলে এই দেশের জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীদের কাছ থেকেই সমর্থন খুঁজতে হবে। যা তাঁর পিতা বা পিতামহ দেখতে পারেননি, আকবর তাঁর বিচক্ষণতার দরুণ দেখতে পেয়েছিলেন যে রাজপুতদের অধীনে বিশাল এলাকা থাকা ছাড়াও তাঁরা ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনীর কর্তা এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষা ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। এদের ওপর নিশ্চিতভাবে ভরসা করা চলত এবং তাদের মিত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং তিনি তাদের সহযোগিতা পেতে চান এবং স্বার্থান্বেষী মুঘল, উজবেগ, পারসিক এবং আফগান অভিজাত ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চান। এই নীতি অনুসরণ করে তিনি অম্বরের রাজা ভারমলের বশ্যতা স্বীকারকে মেনে নেন এবং ১৫৬২ সালে কাছুওয়াহা শাসক বংশের সাথে এক বৈবাহিক সম্বন্ধে লিপ্ত হন। তাঁর কাজকর্মের ক্ষেত্রে তিনি ভগবন্ত দাস ও মান সিংহের সাহায্য পান। শীগগিরই তিনি দেখতে পান যে তাঁরা অধিকাংশ উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীদের থেকে অনেক বেশী অনুগত এবং সেবাপরায়ণ। তিনি চেয়েছিলেন সবচেয়ে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী ও সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য রাজপুতদেরও তাঁর কাজের আওতায় আনতে।

আকবর শাসক শ্রেণীর বেশ কাছাকাছি অবস্থান করতেন। আকবর ও অন্যান্য শাসক গোষ্ঠী রাজস্বের ওপর যথেষ্ঠ নির্ভরশীল ছিলেন, কেননা মধ্যযুগে তা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠী একটি অনুৎপাদক শ্রেণী হবার দরুণ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ওপর নির্ভর করতে হত। আকবর এদিকে জিজিয়াও বিলোপ করেছিলেন। ইকতাদার আলম খানের মত ঐতিহাসিকেরা আকবরকে 'এপিসোডিক' (episoadic) বলে বর্ণনা করেছেন। সাম্রাজ্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুমাত্রিক।

আবুল ফজল হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। এটা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণও কিছু ছিল না। অন্যদিকে আকবর তার রাজত্বের প্রথম কয়েক বছর বেশ কঠোর ইসলামীয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যা বুন্দেলখন্ড বা চিতোরে লক্ষ্য করা যায়। তিনি জিজিয়া বিলোপ করেন, কিন্তু চিতোর যুদ্ধের সময় ধর্মের নামে "জিহাদ" ঘোষণা করেন।

১৫৬৮ সালে চিতোরের পতনকে "বিধর্মীদের বিনাশ" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আসলে রাজত্বের শুরুর দিকে আকবর একমুখীভাবে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলতে পারেননি। এও লক্ষ্য করা গেছে যে, আকবর অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর দরবারের সুন্নী গোষ্ঠীর বাকরীতিদ্বারা পরিচালিত হতেন। আকবর রাজনৈতিকভাবে সুস্থিত ছিলেন না এবং তাঁর সামরিক নীতি মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিত ও স্থায়িত্ব দিতে পেরেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীকরণ আনতেও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর কাছ থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর ফলে, তুরানী অভিজাতরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আরও বেশী করে অনুভূত হয়। এবার তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শেখজাদা ও রাজপুতদের তাঁর প্রশাসনে উচ্চতর স্থান দিতে চান। কিন্তু রাজপুতরা এতে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

আকবরের যাবতীয় নীতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অধীনস্থদের জড়ো করবার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কূটনীতির ক্ষেত্রে আকবর কোনো একরৈখিক পথে চলতে পারেননি। মূলতঃ সুন্নী নেতা মুকাদ্দম-উল-মুল্ক্ এবং আবদুল নবীর কথাই মেনে চলতেন, যদিও তিনি তাঁদের কথা উপেক্ষা করার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই কারণেই তিনি জিজিয়া বিলোপ করেন। তিনি সুফী তীর্থক্ষেত্রগুলিও পরিদর্শন করতে যান। আবার অন্য দিকে চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি জিহাদ বলে বর্ণনা করেন। আকবর একজন বিশাল মাপের কূটনীতিবিদ হওয়ায় তিনি সময়ের দাবীর সঙ্গে আপোষ করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই একজন সম্রাট হিসাবে তিনি সফল। একজন অসাধারণ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৈবাহিক সম্পর্ককে গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের সময়ে সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

যখন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে অঞ্চলের প্রসার জরুরী হয়ে পড়ে, বশ্যতা মানার প্রশ্নটি তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুঘলদের রাজত্বকালে এক ব্যাপক অঞ্চলে বংশানুক্রমিক রাজা, রাণা, রাওয়াত ইত্যাদি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন প্রধানরা রাজত্ব করতেন। এদেরকে একত্রে জমিদার বলা হত যারা কর আদায় করত। এরা ছিল বংশানুক্রমিক ও হিন্দু। আকবরকে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। একদল বংশানুক্রমিক জমিদার মুসলিম জাগীরদারদের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল এবং তাদের সংঘাত এক ধর্মীয় আকার ধারণ করে। আকবর আসলে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে চেয়েছিলেন এবং প্রধানদের সাথে তাদের প্রাথমিক সংঘর্ষের পর তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজপুতদের মধ্যে সাম্রাজ্যের ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ একদল জমিদারের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি পাঞ্জাবে সিকান্দার খান শূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। তিনি একটি নতুন সামাজিক স্তর সৃষ্টি করেন এবং ১৫৭৮ সালে লাহোর সুবায় টোডরমলকে নিয়োগ করেন। সুতরাং পাঞ্জাব-লাহোর নেতা আকবরের প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য হন। কাছাকাছি সুবাগুলির মধ্যে আকবর আফগান এবং দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের বিদ্রোহী অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এই যুদ্ধের সময় তিনি কিছু নিম্নশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন যারা তাঁকে ভট্টের রাজা রামচন্দ, রাজা মনসর চন্দ, গোন্ডের রাজা মান প্রমুখের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে সাহায্য করে। এইভাবে তিনি প্রাধান্য লাভে সক্ষম হন। মুঘলরা প্রায়ই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হত মুঘল রাজার মৃত্যুর পর। আকবর সংহতি সাধনের চেষ্টা করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দরুণ স্থানীয় প্রধানরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কেন্দ্র ও সীমান্তের মধ্যে সংঘর্ষ চলতেই থাকে। বিহারে আনন্দ চেরো নামে এক উপজাতীয় প্রধানকে আফগানরা অপসারণ করে। রাজপুতানার রাজা বিহারীমল অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে আকবরের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চন্দ্রসেনের কাছ থেকে যোধপুর জয় গায়ের জোরেই করা হয়েছিল। বৈরাম খানকে আশ্রয় দেবার কারণে বিকানীর আক্রমণ করা হয় এবং পরে কল্যাণমল মনসবদার হিসাবে মুঘলদের পক্ষে অংশ নেন। জয়সলমীরও ওই একই পথ অনুসরণ করে। কিন্তু মেবারের রাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না।

মালবের রাজা বাজবাহাদুর রাণী রূপমতীর সাথে পালিয়ে গেছিলেন। আকবর বলপ্রয়োগের রাস্তা ছেড়ে কূটনীতির পথ গ্রহণ করেন এবং তিনি এক্ষেত্রে কিছু নিচু জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটান। আকবরের প্রধানদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় আংশিক বা সম্পূর্ণ বশ্যতার বিনিময়ে শেষ হয়। এই প্রণালী দরবারের উপশাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় আফগানদের বিরুদ্ধে চালিত সামরিক অভিযানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একবার আফগান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের দিক থেকে ভয় কমে যাবার পর রাজপুত প্রধানরা এক বড়সড় চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেন।

সতীশ চন্দ্র যুক্তি পেশ করেছেন যে, রাজপুতদের সঙ্গে মুঘল সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়, বরং দেখা উচিত সংঘাতের এক অংশ হিসাবে যার প্রচুর পূর্ববর্তী ইতিহাস ছিল। দিল্লীর সুলতান শাহীর পতনের পর এবং রাজস্থান, গুজরাট, মালব ইত্যাদি অঞ্চলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠা, যেমন রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং রাণা কুম্ভের উত্থানের সময় থেকে এই ইতিহাসকে টানা যায়। তিনি রণকৌশলের ক্ষেত্রে এইসব অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্বকেও তুলে ধরেছিলেন। বাহাদুর শাহ, শের শাহের এদের মৃত্যুর পর আফগানদের পতনের পর রাজপুতরা প্রচারের কেন্দ্রে আসে। সতীশ চন্দ্র যুক্তি দেখিয়েছেন যে যেহেতু আফগানদের প্রচারের আলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজপুতরা সেহেতু ভৌগলিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। বাহাদুর শাহের পতন মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের হিন্দুদের মধ্যে একতা নিয়ে আসে এবং রাজপুত জোট গঠিত হয়।

সতীশ চন্দ্র আকবরের রাজপুত নীতিকে একরৈখিক এবং তিন স্তর বিশিষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। প্রথম পর্বটি হল যখন আকবর বিহারীমলের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তার নিজের রাজনীতির ওপরেই তখন তার খুব দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, তিনি আসলে মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং একে জিহাদ বলেছিলেন। সেখানে কোনো উদার নীতি ছিল না।

তৃতীয় পর্যায়ে আকবর কাছুওয়াহার রাণা ভগবান দাস এবং মানসিংহের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই শেষ পর্যায়ে আকবরের রাজপুত নীতি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছয় যাতে গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সম্মতি ছিল না। আকবর এমন কিছু উদারনীতির প্রবর্তন করেন, যাকে উলেমারা সমর্থন করেনি। আবুল ফজল এই বিষয়টির উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে আকবর ছিলেন শক্তিমান ও তিনি গোঁড়া উলেমাদের উপেক্ষা করতে পারতেন। রাজপুতদের সাথে তার নতুন সম্পর্ক তাঁকে মির্জা, কোকা ইত্যাদি জাতিকে হারাতে সাহায্য করে। এই মৈত্রী ১৫৮৪ সালে ভগবন্ত দাসের কন্যা মান বাই ও সালিমের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্য অনেক ভাবেও আকবর তার উত্তরাধিকারীদের রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ১৫৮৩-৮৪ সালের মধ্যে আকবর বেশ কিছু 'অনুগত' হিন্দুকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রশাসনের কাজকর্মে নিযুক্ত করেন। যেমন টোড়রমল, মান সিং প্রমুখ। আবুল ফজল এই ঘটনাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেননি। এই নীতি কিভাবে জ্ঞানদীপ্তির সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়ে আবুল ফজল নীরব।

রাজার ঠিক পরবর্তী স্তরের অধস্তন কর্মচারীরা উপেক্ষিত হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমানরা সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নয়, শুধুমাত্র তাদেরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় রাজারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার ফলে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এস. ইনায়ৎ. এ. জাইদি আকবরের সময়কার সরকারী সূত্র আকবর-নামা এবং আইন-ই-আকবরীর অভিজাত এবং নির্ভরশীলদের বাদ দিয়ে সমগ্র জনসংখ্যাকে উপ-শাসক শ্রেণী এবং প্রজা, এই দুই ভাগে ভাগ করার ঝোঁকের ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমদলকে জমিদার, মারজবানান এবং আকওয়ান এবং শেষোক্তদের রাইয়ত্ত এবং মারদুন বলা হয়েছে।

অভিজাতবর্গকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি এবং এই অভিজাতবর্গের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। একজন

সম্রাট হিসাবে উভয় শ্রেণীর স্বার্থ দেখাকেই আকবর নিজের দায়িত্ব মনে করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর প্রতি তাঁর চিন্তা শাসকশ্রেণীকে মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার পথে চালিত করেছিল। একদিকে স্বাধীন শাসকদের পরাজিত করে আকবর স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন। অন্যদিকে রাজকীয় শাসক শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত করিয়ে তিনি এঁদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। এইভাবে আকবর মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নতুন শাসক গোষ্ঠীকে একাত্ম করতে চান। আকবরের পূর্বপুরুষদের থেকে এটি ছিল একটি বিচ্যুতি এবং এর ফলে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে জাতীয়তাবোধের এক আদি রূপের সৃষ্টি হয়। একজন স্থানীয় প্রধানকে বশ মানানো, তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পেশকাশ (রাজকর) আদায় ও পরে তাঁকে তাঁর অঞ্চলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া— এখন থেকে এটাই চিরাচরিত রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এইসব প্রধানদের রাষ্ট্রকে সামরিক দলপতি হিসাবে সেবা করার সুযোগ দিয়ে ও ইরানী ও তুরানী অভিজাতদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে তিনি তাদের মূল মঞ্চেনিয়ে আসেন। দেওয়া ও নেওয়া নীতির মাধ্যমে আকবর এইসব প্রধানদের স্বার্থকে রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করেন। আকবর এবং আফগান ও রাজপুতরা একই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত হলেন। যারা রাজকরের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। সম্রাট ও স্থানীয় প্রধান উভয়েই রাজকীয় জাগীর (zagir) যা সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়াতে সাহায্য করেছিল, তাঁর মাধ্যমে কৃষককে শোষণ করার জন্যই কাজ করেছিলেন।

পেশকাশ আদায় করার ও যখনই দরকার তখনই সামরিক সেবা দাবী করার পূর্বেকার নীতি শুধু যে স্থানীয় শাসকদেরই প্রচন্ড ক্ষতি করছিল তাই নয়, তাদের রাইয়ত, যারা করের বোঝা বয়ে বেড়াত, তাদেরও অভূতপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই কারণে প্রধান ও তাঁর প্রজাদের স্বার্থও ছিল অনেকটা একইরকমের। তারা উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাকে ঝেড়ে ফেলতে আগ্রহী ছিল। ষোড়শ শতক নাগাদ দেশজ শক্তিগুলির মধ্যে রাজপুতরা একটা শক্তিশালী স্থান অধিকার করেছিল। সৈন্য ও যুদ্ধের পশুর সংখ্যা অনুযায়ী তাদের সামরিক সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে আকবর তাদের মুঘল শাসক শ্রেণীতে নিযুক্ত করেন। তিনি মুঘল বাহিনী শুধুমাত্র প্রধানদের কাছেই উন্মুক্ত রাখেননি। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর নেতৃবর্গের কাছেও তা উন্মুক্ত ছিল। তাদেরকেও মনসব দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের প্রধানদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল যা শুধুমাত্র মনসবের শ্রেণীক্রমের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এইসব নবনিযুক্ত প্রধানদের তাদের প্রাপ্ত মনসবের ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী ও পশু বাহিনী রক্ষা করতে হত। ফলতঃ গোড়ার দিকে বিশাল সংখ্যক মানুষ ছিলেন কৃষক-যোদ্ধা, ভূমি থেকে তাঁদের আয় ছাড়া মুঘল মনসবে সামরিক সেবার মাধ্যমেও তারা উপরি আয় করতে থাকেন। এইভাবে সাম্রাজ্যের প্রতি সেবার মাধ্যমে রাজপুত প্রধান ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরা তাঁদের অঞ্চলে বেশ কিছু ধনরত্ন জমা করতে সক্ষম হন। আকবর এই রাজপুত প্রধানদের অভিজাতবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেন। তিনি তাদের উচ্চ প্রশাসনিক পদ যেমন স্বদর (রাজ্যপাল), ফৌজদার (সেনাধ্যক্ষ), দিওয়ান (রাজস্ব আধিকারিক), কিলাদার ইত্যাদি পদে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। রাজপুত প্রধানদের রাজকীয় চাকরীতে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে আকবর প্রথমদিকে চিরাচরিত নীতিরই প্রয়োগ ঘটান। একজন প্রধানের বশ্যতা স্বীকারের পর তাঁর এলাকা তাঁকেই এই শর্তাধীনে ফিরিয়ে দেওয়া হত যে দরকারে তিনি সামরিক সাহায্য দেবেন। নিজেদের প্রধানদের সাথে সংঘর্ষের পরে যেসব রাজপুতরা আকবরের চাকরীতে যোগ দিতেন, তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে অবশ্য এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হত না। বিকল্প একটি পন্থা ছিল মুখ্য প্রধানের কাছ থেকে কিছু এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্যান্য রাজপুত অভিজাতদের জাগীর হিসাবে দান করা। যেহেতু কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট পদ কিছু অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তাই রাজপুত প্রধান ও তাঁদের আত্মীয়দের যে জাগীর দেওয়া হত, তা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল। এখন যেসব রাজপুত প্রধানের দেওয়া মোট বেতনের পরিমাণ তাঁদের রাজত্বের জমা হিসাবের চেয়ে বেশী হত, তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্য অংশ কিছু জাগীর দেওয়া হত। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৫৭৩ সালে মানসিংহ মালবের খিচিওয়াড়া জাগীর হিসাবে পেয়েছিলেন। আকবর ও কিছু ছোট রাজপুত রাজ্যের উপরেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে রাও মালদেওয়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আকবর যোধপুরকে সরাসরি রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনেন। আকবর তাঁর অভিজাতদের মনসব স্থির করেন এবং দাগ ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি নতুন করে রাষ্ট্রের জমা নির্ধারণ করে দেন, যাতে মনসবদার ও সৈন্যদের বেতন দিতে পারেন। ১৫৯২-৩ সালে, উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তিনি ভট্টকে প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে আনতে চান। আকবর মধ্যপদস্থ জমিদারদের সাথেও বন্ধুত্ব করতে চান। এটি ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যকে এক শক্তি দান করে। মুঘলদের অনেক রকমের ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল কিন্তু আকবরকে তার জন্য দায়ী করা যায় না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সাম্রাজ্য ও দরবারী রাজনীতির সংঘাতের জন্য ঘটেনি, ঘটেছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির জন্য। কেন্দ্রীয়তাকে এই পতনের জন্য দায়ী করা যায় না।

রাজপুতরা সর্ববৃহৎ মনসবদারীর অধিকার পান এবং আকবর আসলে তাঁদের খুশী করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তাঁরা মুঘল চাকুরীতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাজপুত রাজ্যগুলির দখলেই ওয়াতনগুলিকে ছেড়েছিলেন। শুরুর দিকে তিনি প্রত্যেক রাজপুত প্রধানকে বংশানুক্রমিক খেতাব-রাও, রাজা এবং দুর্গগুলিকে দিতেন। একে তাঁর বংশানুক্রমিক অধিকার হিসাবে সম্রাট স্বীকৃতি দেন। অনেক প্রধানের অঞ্চলই আগে অভিজাতরা ভোগ করতেন এবং সেগুলিকে খালিসার অন্তর্ভুক্ত করা হত। এর ফলে মুঘল শক্তির ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় একতা গড়ে ওঠে। মুঘল সাম্রাজ্যের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় আনুগত্য গড়ে ওঠে। এটি মক্কেল-মুরুব্বী সম্পর্ক নামে পরিচিত। প্রধানদের এলাকা থেকে ঠিকানাদার, পাওনাদার ইত্যাদি পদের বহু লোককেও সরাসরি মুঘল রাজকীয় শাসনের অধীনে গ্রহণ করা হয়। এই পদগুলিকে পূর্ববর্তী প্রধানের থেকে স্বতন্ত্র নিয়োগ হিসাবে গণ্য করা হয়। এর ফলে গোষ্ঠী মৈত্রীসঙ্ঘ ভেঙে পড়ছিল এবং বৃহৎ জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছিল। এইবারে প্রধানদের বদলে উপপ্রধানেরা সরাসরি সাম্রাজ্যের প্রতি কৈফিয়ৎযোগ্য হলেন। এটি ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই স্বত্বনিয়োগগুলি যা প্রধানরাই করতে পারতেন তা সাধারণ জাগীরের থেকে আলাদা ও অহস্তান্তরযোগ্য প্রকৃতির ছিল।

১. ওয়াতন জাগীর চিরস্থায়ী ভিত্তিতে দান করা হত।

২. সম্রাট তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যের কোনো স্থানে যে কোনো অভিজাতের জন্য ওয়াতন জাগীর সৃষ্টি করতে পারতেন।

৩. যে অভিজাতকে ওয়াতন জাগীর দেওয়া হবে, আশা করা হত ওই স্থানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকবে।

৪. আকবর বুঝেছিলেন রাজপুত প্রধানদের তাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারলে স্থানীয় আনুগত্যকে শক্ত করা হবে কিন্তু পিতৃপুরুষদের জমি থেকে দূরে ওয়াতন জাগীর সৃষ্টি করতে পারলে ওই প্রধানদের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের মিলন ঘটবে। যেহেতু প্রধানরা মুঘলদের কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তাদের মনসব দেওয়া হয়েছিল তারা সহজেই জাগীরের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিল। এর থেকে একটা অংশ সর্বদাই তাদের ওয়াতনের দাবী হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সুতরাং ওয়াতনের রাজস্ব তাঁদের বেতনের অংশ ছিল। এই বন্দোবস্তের প্রকৃতি সাধারণ জাগীরের মতই ছিল। শুধু এটির ছিল অ-হস্তান্তরযোগ্য। ওয়াতন জাগীরের ক্ষেত্রে রাজস্বের পরিমান নির্ধারিত ছিল না এবং এটির সময়ে সময়ে পরিবর্তনও হত। সুতরাং আকবর পিতৃপুরুষদের জমির সঙ্গে রাজপুতদের আবেগের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই অপ্রয়োজনীয় ভাবে জমি থেকে উৎখাত থেকে দূরে থাকতেন। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁদের রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংহত করেছিলেন। অন্যত্র বড় জাগরী বা প্রশাসনিক পদের লোভ দেখিয়ে প্রধানদের সঙ্গে অনেক সময় সমঝোতাও করে নেওয়া হত। এর ফলে স্বয়ং রাজপুত প্রধানদের মধ্যেই সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা দিয়েছিল। তাদের নজর এখন স্থানীয় স্বার্থ থেকে আমলাতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে যায় এবং এর ফলে রাজপুত প্রধানদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য দেখা দেয়। রাজস্থানের রাজপুত প্রধান এবং পূর্ব

ও মধ্য ভারতের প্রধানরা একে অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজপুত জাগীরদাররাও অনেক স্থানীয় লোকেদের নিজেদের অধীনে নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে অনেকেই পিতৃভূমির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেন। আকবরের রাজপুতনীতি ভৌগোলিক ধারণায় রাজনৈতিক পরিচয় স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। এটি আদি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল এবং সাম্রাজ্যের সংযুক্তি ও সংহতিকরণ ঘটিয়েছিল।

এর ফলে রাজপুতরা মুঘল শাসনের কট্টর সমর্থককে পরিণত হন এবং দেশব্যাপী তাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এক কার্যকর ভূমিকা নেন। সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা দরাজভাবে ও প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেন। তাদের সহযোগিতা শুধু যে মুঘল শাসনকে নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব দেয় তাই নয়, দেশে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণও ঘটায়। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় মুঘল রাজত্বের এক অমূল্য প্রাপ্তি।

৩.২ আকবরের ধর্মীয় নীতি

আকবর যে ধর্মীয় নীতির প্রচলন করেছিলেন, তাকে আদৌ আধুনিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অগ্রদূত বলা যায় কিনা, তা তর্কসাপেক্ষ, এবং এই বিতর্ক জোরালো হয়ে ওঠে সমকালীন ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মতবাদের দরুন। আকবর-এর সমসাময়িকদের মতে ওঁর দর্শন মূলতঃ তৎকালীন দার্শনিক মতবাদের থেকে আহরণ করা। রক্তারক্তির উর্দ্ধেও হিন্দুত্ব এবং ইসলাম, এই দুই ধর্মের আত্তীকরণ এবং সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল। এই মিলনের কথা আকবর-এর আগে ভক্তিবাদী এবং সুফিবাদী দার্শনিকেরা উল্লেখ করেছিলেন।

আকবর-এর সমসাময়িক দুই ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। Abu Fazl আকবরকে একজন নায়ক, দুর্ধর্ষ সম্রাট, প্রতিভাবান এবং ভগবানের দূত হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই আকবরের দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরদিকে, সভার এক গোঁড়া নেতা, বাদৌনীর মতে আকবরের উদারনীতির জন্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংসলাভ করেছে এবং তিনি আকবরকে একজন খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আকবরের দর্শনের যথার্থ মূল্যায়ন তার ক্রমবিকাশের পটভূমিতে ধরা উচিত। আকবর এক সংঘাতপূর্ণ ধর্মীয় আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মধ্যএশিয়ার সুন্নি এবং মাতা ছিলেন এক পার্সী পন্ডিতের সন্তান। হুমায়ুনের পলায়নকালে আকবর এক হিন্দু প্রধানের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং তাঁর উপর তাদের প্রভাব পড়ে। শৈশবকালে আকবর সুফিবাদের সংস্পর্শেও আসেন। তিনি তাঁর হিন্দু-স্ত্রীদের এবং টোডারমল, বীরবলদের সূত্রে হিন্দু ধর্মের আরো কাছাকাছি আসেন। অস্থিরমতি আকবর ইসলাম ধর্মও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন। আকবর সুন্নিবাদের ধর্মতত্ত্ব এবং আইন সম্পর্কে প্রথাগত শিক্ষালাভ করেননি। তাঁর নমনীয় মানসিকতার আর এক প্রধান কারণ শেখ মুবারক এবং আব্দুল লতিফের অধীনে শিক্ষালাভ এবং এক উদার পরিবারে বড় হয়ে ওঠা।

আকবরের ধর্মীয় নীতির মূলে আছে কিছু বৌদ্ধিক প্রভাব। আবুল ফজল-এর মতে রাষ্ট্রীয় নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল রাজার এবং সভার কিছু অভিজাত সদস্যের কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাত। ইকতিদার আলম খাঁ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন আকবরের দর্শনের প্রধান উপাদান মূলতঃ পার্থিব এবং রাজনৈতিক। আকবরের প্রাথমিক সহনশীলতার নীতি, তীর্থকর ও জিজিয়াকরের লোপ আসলে আনুষঙ্গিক। রাজত্বের শুরুর কালে আকবর উদারনীতির ওপর জোর দেন এবং কয়েকটি উদারপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুকাদ্দম-উল-মুলুক এর মত কয়েকজন সুন্নি নেতার উপর নজর দেন ও কিছু নেতাকে সভা থেকে বহিস্কারও করেন। জিজিয়া ছিল আসলে রাজপুতদের সাথে

আপোষ এবং এক অর্থনৈতিক কৌশল মাত্র। তিনিই অবার রাজপুতদের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেষ্টায় জিহাদ ঘোষণাও করেছিলেন। দেশীয় রাজা এবং অভিজাত ও উলেমা সমন্বিত মুসলিম শাসকশ্রেণীর সাথে আকবরের সম্পর্কের ওপর খাঁ জোর দেন। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সেটাই আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত করে। আকবর আসলে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন যথার্থ যুক্তিবাদী। তাঁর জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসার ফল ছিল তাঁর বিশ্বাস—"সকল ধর্মেই সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিল এবং ....যদি কোনো সত্যজ্ঞান থাকে তা সর্বত্রই খুঁজে পাওয়া যাবে।"

আকবরের দর্শন আদর্শবাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। তাঁর ভাবনা এবং কাজের মধ্যে ফারাক ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে শেখ আব্দুল নবি এবং মৌলানা আব্দুল সুলতান ঘৌরী প্রভৃতি উলেমাদের নেতৃত্বে গোঁড়া ইসলামের কর্তৃত্ব ছিল। যদিও আকবর তাদের বিরোধিতা করেননি কিন্তু তারা যে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ করছিল—এ ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। তিনি তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কৌশলে হস্তান্তর করার চেষ্টাও করছিলেন। সেজন্য ইবাদাতখানার মতামতও নিয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৫৭৫ সালে ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদাতখানা-র ভিত্তি স্থাপন হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে ধর্মীয় আলোচনা বসত। প্রথমে এতে অংশগ্রহণ করতে পারত মুসলিমরা এবং তাদের মধ্যে চারটি শ্রেণী ছিল।

(১) শেখ—যারা সাত্ত্বিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ।
(২) সঈদ বা পয়গম্বরের বংশধর।
(৩) উলেমা—ধর্মতত্ত্ববাদী এবং বিচারক।
(৪) সভার অভিজাত সদস্যরা যারা ধর্মতত্ত্বে আগ্রহী।

এই ইবাদাতখানায়, উলেমা এবং ধর্মীয় নেতারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করতেন। শীঘ্রই উলেমারা সভার উদার পন্থীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আকবর এর সুযোগ নিয়ে প্রমাণ করেন যে ধর্মীয় অভিজাতরা সমাজে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে না। তাঁর মানসিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে এবং সুন্নিদের হিংস্র সসহিষ্ণুতার দরুন গোঁড়া ইসলামদের প্রতি তার বিশ্বাস ক্ষয়ে যেতে থাকে। শিয়া ও সুন্নিদের অন্তর্বিরোধ ইবাদাতখানায় বিতর্কের সৃষ্টি করে। আকবর উপলব্ধি করেন যে ধর্মীয় আলোচনা বৃহত্তর ভিত্তি ছাড়া সম্ভব নয় এবং তিনি ইবাদাতখানাকে 'ধর্মীয় সংসদ'-এ পরিণত করেন। তিনি সমস্ত যুক্তিকে আন্তরিকতার সাথে শোনেন। বাদৌনীর মতে—"আকবর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক রীতি ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসগুলো খতিয়ে দেখেন এবং এক অনুসন্ধিৎসুক মন নিয়ে সমস্ত পুঁথিগত তত্ত্ব নির্বাচন ও সংগ্রহ করেন।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উলেমারা আকবরকে 'সুলতান-ই-আদিল' মেনে নিয়ে এক বিবৃতিতে মেজহার স্বাক্ষর করেন—যা কিনা আকবরকে 'মুতাহিদ' বা আইনের প্রবর্তকদের থেকেও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। যতক্ষণ না পবিত্র কোরানের তত্ত্ব ভঙ্গ হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি কোনো ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতেন না। পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারকরা ব্রাহ্মণত্ব, বৌদ্ধধর্ম, সুন্নিবাদ, জৈনধর্ম, ভগবত, জেসমিট ভ্রাতৃদ্বয়, চৈতন্যদেব নিয়ে আলোচনা করতেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য ও ধর্মীয় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা প্রসঙ্গে খোলাখুলি প্রশ্ন করতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি 'খলিফা' শাসন চালু করতে চেয়েছিলেন এবং নিজেকে এক ঐশ্বরিক সম্রাট প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি উদারনীতিতে বিশ্বাস করলেও নিজেকে ঈশ্বর প্রতিপন্ন করবার লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি সমস্ত ধর্মের নেতা হতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মলম্বীরা মেনে নিলেও সুন্নি মুসলিমরা তাঁর বহুবিবাহের কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষকে দিব্যতান্ত্রিক বা পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না, তখন তিনি ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দেন। পরবর্তী সময়ে একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই সমস্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। আকবর কোনো নাম না দিলেও জাহাঙ্গীরের দলিলে এই দর্শনে বিশ্বাসী লোকেদের 'দিন-ই-ইলাহী' নামে অভিহিত করা হয়।

আকবর প্রজাদের কাছাকাছি পৌঁছবার প্রয়োজনে কয়েকটি ধর্মীয় রীতি, যথা ঝারোখা দর্শন (রাজপুত ঐতিহ্য) প্রচলন করেন এবং হোলি, দিওয়ালি, রাখী প্রভৃতি হিন্দু উৎসবও পালন করেন।

ইসলাম চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করলেও তিনি সৌর ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন। এই রীতি প্রচলনের সাথে তিনি তাঁর কিছু অনুচর তৈরী করেন যারা আফগান বা অন্যান্যদের ছেড়ে তাঁকে শাসক হিসেবে মেনে নেন। ইসলামের সংকীর্ণ ঐতিহ্যের উর্দ্ধে উঠে তিনি নিজেকে শক্তিশালী করেন এবং ১৫৭৯ সালে "মেজহার নামা" বা অভ্রান্ততার ঘোষণাপত্র (Infallibility decree) অনুমোদন করেন। একই সালে তিনি নিজেকে ইসলামধর্মীয় আইনের একমাত্র মধ্যস্থতাকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষ নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। সুন্নিরা এই বিধান অমান্য করে এবং এর পরবর্তী সময়ে মৃত্যুকাল (১৬০৫) অবধি তিনি সুন্নি রক্ষণশীলতাকে কোনোরকম গুরুত্ব দেননি।

মেজহার প্রবর্ত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া জারি করা হয় এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে আকবর সমস্ত ধর্মীয় বিতর্ককে দূরে সরিয়ে দেন। তিনি ইসলাম ঘেঁষা নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং এক নতুন ধর্মীয় নীতি 'সুল-ই-কুল' প্রচলন করেন। 'সুল' অর্থাৎ পথ এবং 'কুল' অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব—এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব পরবর্তীকালে 'দিন-ই-ইলালী' নামে পরিচিত হয়। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে মুঘল সাম্রাজ্যের এক নতুন দর্শন 'দিন-ই-ইলাহী' জন্ম নেয়। রিজভি এবং রিচার্ডসের মতে — 'দিন' হচ্ছে শাসক এবং প্রজাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বন্ধন, যাতে প্রজারা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মেনে নেয়। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে প্রজারা নিজস্ব ধর্ম, সম্পত্তি, সম্মান এবং জীবন তাঁর প্রতি অর্পণ করেছিল। এসত্ত্বেও আকবর কোনোদিনও 'দিন-ই-ইলাহী'-কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। তিনি অতি সহজেই তাঁর ক্ষমতার জোরে প্রজাদের ধর্মান্তরিত করতে পারতেন, কিন্তু সচেতন ভাবেই এই কাজ তিনি থেকে বিরত থাকেন। শুধুমাত্র বীরবল স্বেচ্ছায় 'দিন-ই-ইলাহী' গ্রহণ করেন। সুতরাং 'দিন-ই-ইলাহী' 'সুল-ই-কুলের' এক রাষ্ট্রীয় ভাষ্য হয়ে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অভ্যাস করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে আকবরের ধর্মীয় শিক্ষাকে কোনো নতুন বিশ্বাস হিসেবে দেখেননি। এটা বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যের ওপর জোর দেয় এবং পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতার এক বিকল্প। এটা দেখায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা বা জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নেই, ওই প্রাচ্যেও বর্ত্তমান।

যদিও রাষ্ট্র সব ধর্মকেই স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সুল-ই-কুলের সঙ্গে প্রত্যেককেই সমমর্যাদা দেওয়া হয়। 'সুল-ই-কুল'-এর দর্শন হল মিলাট যা শিষ্যদের নিজেদের সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন না রাখার শিক্ষা দেয় এবং তারা যেন অন্য যে-কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরোধিতায় বিচলিত না হয়। তিনি প্রজাদের 'সুল-ই-কুল'-এর পথ অনুসরণ করতে বলেন যা কিনা চরম শান্তির একমাত্র পথ।

আকবর বিভিন্ন হিন্দু, জৈন, জোরাস্ট্রিয়ান, খৃষ্টীয় মতের দ্বারা আকৃষ্ট হন। সুফিবাদের কিছু অতীন্দ্রিয় ধারণাও তাকেও আকৃষ্ট করে। কিন্তু কোনো মতই তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটাতে পারে না এবং ঐক্য ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না। তিনি এক নতুন ধর্মের বিকাশ করতে চান যা কিনা 'সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারণাগুলো নিয়ে এবং ত্রুটিগুলো বাদ দিয়ে' তৈরী হবে। এই দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, অভিজাত পদাধিকারীদের নিয়ে এক সভার ডাক দেন। 'দিন-ই-ইলাহী' যা 'জৌহাদ-ই-ইলাহী' হিসেবে স্বীকৃত ছিল—তার কোনো বর্ণনা না দিলেও এটি ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। এর কোনো বিশিষ্ট তত্ত্ব বা দর্শন ছিল না। শুধুমাত্র এক পরম ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। দিন-ই-ইলাহীর এক আচরণ বিধি ছিল যা উদারতা, পরোপকারতা, ক্ষমা, কোমলতা, জাগতিক লিপ্সা থেকে সংযম, পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর অভ্যাস করত।

ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদাতখানার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আকবরের কাজকর্ম বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

স্ট্রেমঞ্চের মতে আকবর ইসলামের আইন না ভেঙে উলেমাদের কর্তৃত্ব শেষ করবার পন্থা খুঁজছিলেন। রিজভির মতে "অভ্রান্ততার ঘোষণাপত্র" ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেনি কিন্তু মুঘল সভায় ইসলামের আইনের ব্যাখ্যা করার

ক্ষমতা সম্রাটকে প্রদান করেছিল। এখান থেকেই দুটি বিতর্কিত প্রশ্ন ওঠে—আদৌ ইসলামের প্রতি আকবরের মনোভাব পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা এবং তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য বিকল্প ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন কিনা।

বাদৌনী ইসলামের ধ্বংসের জন্য আকবরের সমালোচনা করেন। অপরদিকে "জেসুইট ভ্রাতা"রা দাবী করে যে আকবর ১৫৭৯ থেকে ১৬০৫-এর মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের কাছাকাছি আসেন। যদিও ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করে যে আকবর কোনোদিনও নিজেকে অবিশ্বাসী ঘোষণা করেননি, এবং একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলিম হিসেবেই দেহত্যাগ করেন। এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তিনি উলেমাদের সভা থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সুন্নি রীতিনীতি পালন করা হয়। আকবর দিন-ই-ইলাহীকে কোনোদিনও ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি ইসলাম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতাও করেন এবং সমস্ত ধর্মগোষ্ঠীকে একইরকম বদান্যতা দেখান।

আবু ফজল-এর 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' পড়লে দেখা যায় যে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস থাকলেও তাঁর ঈশ্বরপূজার পদ্ধতি প্রচলিত ইসলাম বা হিন্দু পদ্ধতিগুলোর থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি হিন্দুদের মূর্ত্তি পূজা ও ইসলামদের প্রার্থনা-রীতি দুটোকেই নিন্দা করেন। প্রচলিত সুফি মতবাদে ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হয় এবং মানুষের বৃহত্তর প্রয়াস ছাড়া তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। আকবরের বিশ্বাস এর সাথে অনেকটাই মিলে যায়। তাঁর মতে ঈশ্বরপূজার প্রকৃত পন্থা হবে "আলোকিত যা আলো ভালোবাসে"। একজন সম্রাট হিসাবে তিনি হলেন 'ভগবানের নির্বাচন'—আকবর নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হিসাবে দেখেন, যা কোন বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করে না। তিনি সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-এর কথা বলেন যা কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা বা যুদ্ধ ছাড়া কোনো অস্ত্র বহন করা নিষেধ। সর্বেশ্বরবাদের দ্বারা তিনি হিন্দু এবং ইসলাম উভয় মতবাদের বিকৃত চিন্তাগুলির খোলাখুলি নিন্দা করেন। যদিও সর্বেশ্বরবাদের তত্ত্ব কয়েকটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু 'সুল-ই-কুল'-এর তত্ত্ব তাঁর সাম্রাজ্যনীতির সমস্ত বৃত্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রকৃতপক্ষে মুঘলশাসকদের বিভিন্ন মতবাদ দিয়ে গঠিত এক বিমিশ্র চরিত্র সৃষ্টি করেন। তিনি সুন্নি-শিয়াদের বিরোধিতারও অবসান ঘটান। তাঁর দার্শনিক প্রবণতা ধর্মীয় জটিলতাগুলোকেও বোঝবার সাহায্য করে। তিনি মুসলিমদের 'গো-হত্যা' এবং হিন্দুদের 'সতীদাহ' প্রভৃতি রীতিগুলোও রদ করেন।

অধ্যাপক শর্মা মুঘল সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নীতির আলোচনায় বলেন যে আকবর কোনো নতুন ধর্ম চালু করেননি, এমনকি 'দিন-ই-ইলাহী' নামকরনও করেননি। উপসংহারে বলেন যে আকবর তাঁর তীক্ষ্ন বন্দিকে আশ্রয় করে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াসে এক নতুন পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় মতবাদের প্রচলন করেন, যা তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করেন এবং যুক্তির ব্যাপক প্রয়োগে যা ক্রমশঃ তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। 'সুল-ই-কুল' এর সমালোচকরা একে পরিত্যাগ করলেও এটা স্মরণীয় যে আকবর ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে এক সংহতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়াসে ছিলেন। তাঁর দর্শন একটিমাত্র স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, কারণ তাঁকে সামরিক রাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হত।

তাঁর কাছে দর্শনের থেকে রাজনীতি চিরকালই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলতঃ তিনি যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তখন তিনি সেলিম চিস্তির দরগায় তাঁর আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে আবার ধর্মের নামের যুদ্ধ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি। তবুও আকবর ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক উদারমনস্ক মানুষ। যদি তাঁর দর্শন ভারতবর্ষের আধুনিক রাষ্ট্র গঠনকারীদের প্রভাবিত করে থাকতে পারে, তাহলে তা হবে মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসের এই দুর্ধর্ষ মানুষটির দূরদৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৩.৩ জাহাঙ্গীর

মুঘল রাজবংশে সেলিম হলেন প্রথম যুবরাজ যিনি কোন কলহ বা সংগ্রাম ছাড়াই নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর

পাদশা গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাদশা তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন যে, জাহাঙ্গীর (পৃথিবীর ধারক) নাম গ্রহণের কারণ রাজার কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীকে আয়ত্বে রাখা এবং নুরউদ্দিনের অর্থ তিনি সূর্যোদয়ের অনতিপরে সিংহাসনে বসেন। এছাড়াও এর আর একটি কারণ হল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই উপাধি পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তিনি বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর পিতামাতার প্রথম জীবিত সন্তান হিসাবে তাঁর উপর অত্যধিক স্নেহভালবাসা ও যত্ন বর্ষিত হয়। আবদুর রহিম খাঁ নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির নিকট তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা লাভ করেন। সঠিক প্রশাসনিক ও সামরিক শিক্ষাও তিনি লাভ করেন। বারো বছর বয়সে তিনি কাবুল অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং ষোল বছর বয়সে ১২০০০ সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নিত হন। তাঁর জীবনের ষোলটি বসন্ত অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মন রাজের সাথে ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খুবই জাঁকজমকের মধ্যে তাঁর বিয়ে হয়। এক বছর পর তিনি জগৎ গোঁসাইকে বিবাহ করেন যিনি পরে শাজাহানের জন্ম দেন। ফাদার জেভিয়ারের মতে ১৫৯৮ সালে তাঁর হারেমে কুড়ি জনের কম আইন সিদ্ধ স্ত্রী ছিল না। ডাঃ বেণী প্রসাদ বলেন রক্ষিতা নিয়ে তাঁর হারেমের অধিবাসীর সংখ্যা দাড়ায় ৩০০। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আকবরের মৃত্যুর পর ৩৮ বছর বয়সে ১৬০৫ সালে সিংহাসনে বসার পূর্বে সেলিম আরাম, ফুর্তি এবং লাম্পট্যের মধ্যে জীবন কাটান। তিনি ভাগ্যবান ছিলেন কারণ পিতা আকবর তাঁর জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং ভাল প্রশাসন রেখে যান। জাহাঙ্গীরকে তাই সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য প্রায় কিছুই করতে হয়নি। তাঁর শাসনকালে তিনি দুই দশক ধরে (১৬০৫-২৭) কোন বড় বিদ্রোহের সম্মুখীন হননি। হলে হয়ত তার পক্ষে তা দমন করা কঠিন হত। তিনি তাঁর পিতার নীতিগুলি অনুসরণ করেছিলেন, ফলে কোন সমস্যা ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে আনন্দফুর্তি উপভোগ করতে পেরেছিলেন। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে জাহাঙ্গীরের মধ্যে একটি দয়ালু এবং স্নেহশীল স্বভাব ও অসংযমী অভ্যাস গড়ে উঠেছিল।

জাহাঙ্গীরের শাসনকাল আনন্দফুর্তি এবং উৎসবের মধ্যে শুরু হয়েছিল। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং শত্রু মিত্র প্রভেদ না করে উপাধি বর্ষণ করা হয়েছিল। ১৬০৬ সালের নওরজ (নববর্ষ) তিনি দুই সপ্তাহ ধরে বিশাল জাঁকজমক ও পানভোজনের মধ্য দিয়ে পালন করেন। মহান বাদশাদের ঐতিহ্য মেনে তিনি তাঁর নতুন রাষ্ট্রীয় নীতির বারোটি নির্দেশ জারী করেন। এগুলি হল— (১) খাজনা মকুব (২) জাতীয় সড়কে চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে নির্দেশ (৩) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অবাধ উত্তরাধিকার (৪) মদ এবং সমস্ত রকম নেশার সুরার উপর নিষেধাজ্ঞা (৫) অপরাধীদের নাক, কান কাটা বা বাড়ীর দখলের উপর নিষেধাজ্ঞা (৬) বলপূর্বক সম্পত্তি দখলের উপর নিষেধাজ্ঞা (৭) কোন কোন ঐতিহাসিক স্থান বা রাজে পশুবলির উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। কিন্তু এসব জাহাঙ্গীরের মনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নুর জাহানের হাতের ক্রীড়ানক ছিলেন।

এটি সৌভাগ্যের কথা যে জাহাঙ্গীর তাঁর শাসন কালের কথা তাঁর স্মৃতিকথা "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরে" পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন। প্রিঙ্গল কেনেডি বলেন "যদিও সঠিক ইতিহাসের জন্য এই স্মৃতিকথা নির্ভরযাগ্য নয় কারণ ঘটনার অতিরঞ্জন করা এবং চাটুকারী প্রবণতা হচ্ছে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, তথাপি তৎকালিন ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে জাহাঙ্গীর নিজেকে কিরূপে দেখাতে চান এবং সত্যি সত্যি কি ছিলেন তা খুবই মুল্যবান। সার রির্চাড বার্ন বলেন "যদিও স্মৃতিকথাগুলি মানুষের উচ্চাকাঙ্খা, ভয় ও আশার সঠিক দলিল নয় এবং চলমান ঘটনাবলীর যথার্থ মুল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয় তথাপি লেখকের চরিত্র বুঝতে এগুলি খুবই সহায়ক।" ইংল্যান্ডের রাজা জেমস জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরাজদের জন্য ব্যবসার সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্যাপটেন উইলিয়াম হকিন্স এবং সার টমাস রোকে রাজদূত করে পাঠান। হকিন্স ১৬০৮ সালে ভারতে আসেন এবং তিন বছর থাকেন। প্রাথমিক ভাবে পর্তুগীজদের বিরোধিতার জন্য সম্রাটের সাক্ষাৎ পেতে তার খুব অসুবিধা হয়। কিন্তু যখন তিনি সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন তখন তাঁকে খুব সুন্দর ভাবে স্বাগত জানান হয়। তিনি শীঘ্রই সম্রাটের সখ্যতা লাভে সমর্থ হন। কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রের জন্য তার

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। স্যর টমাস রো ১৬১৬ সালে জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌঁছন এবং তিন বছর থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় কারণ তিনি ইংরাজদের সুরাটে ব্যবসা করার ফরমান আদায় করেন। হকিন্স এবং রো দুইজনেই তাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বিস্তৃতভাবে মুঘল দরবারের অবস্থা এবং বাদশার কর্মধারা সম্বন্ধে লেখেন। এ দু'জন ছাড়াও টেরী, পিত্রো-ডেলা-ভালে এবং পেলসার্ট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাঁদের ভারতের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এ সমস্ত বৃত্তান্তগুলি বাদশার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়তে সাহায্য করে। এটা মনে রাখতে হবে যে সম্রাট তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর সফলতা এবং গুণাবলীর হয়ত অতিরঞ্জন করেছেন কিন্তু বিদেশী ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত মূলত তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং তা ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক নয়। জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বকে সঠিক বোঝার জন্য আমাদের দুই ধরনের উপাদানের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনতে হবে।

হকিন্স বলেন, "সম্রাট খুবই সদয় এবং হাসিহাসি মুখে আমাদের সহৃদয় স্বাগত জানান" এবং একজন পর্তুগীজ পাদরির সাহায্যে রাজা জেমসের পাঠানো চিঠি পড়ে বলেন, "রাজা যা লিখেছেন তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার চেয়ে বেশী প্রদান করবেন।" তিনি আরও বলেন যে সম্রাট তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত ঘরে নিয়ে যান এবং অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ কথোপকথন করেন। সম্রাট তাঁকে প্রতিদিন আসতে বলেন। "দিনে এবং রাতে, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলায় তিনি আনন্দ পেতেন।"

হকিন্স জাহাঙ্গীরের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছেন। "এখন এখানে আমি তাঁর দরবারের আদব কায়দা এবং রীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই। দিন শুরুর সময় প্রথমে সকালে বিছানায় তিনি পশ্চিমে মুখ করে মালা জপ করতেন। যখন তিনি আগ্রায় থাকতেন তখন তাঁর প্রার্থনা করার কায়দা ছিল এইরকম। একটি সুন্দর পরিষ্কার ঘরে সুস্থাপিত একটি পাথরে শুধুমাত্র একটি পারসিক ভেড়ার চামড়ার উপর বসে তিনি জপ করতেন। এই পাথরের উপরিভাগে মাতা ও খৃষ্টের খোদিত ছবি ছিল। সেখানে বসে ৩২০০ বার পুথি গুণে মন্ত্র জপ করে তাঁর প্রার্থনা শেষ করতেন। এটি করার পর তিনি প্রজাদের দর্শন দিতেন এবং তাদের সেলাম গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন সকালে বহুলোক এই উদ্দেশ্যে আসতন। এরপর তিনি দু'ঘণ্টা আবার ঘুমাতেন এবং পরে আহার গ্রহণ করে তাঁর মহিলাদের সাথে সময় কাটাতেন। দুপুরে আবার তিনি দর্শন দিতেন। বেলা তিনটে পর্যন্ত নানা রকম মানুষের খেলাধুলা, পশুদের লড়াই এবং অন্যান্য খেলা দেখে সময় কাটাতেন। তিনটের সময় সাধারণভাবে সুস্থ থাকলে আগ্রার সব অভিজাতরা দরবারে হাজির হত। সম্রাট তাঁর রাজকীয় সিংহাসনে বসে দর্শন দিতেন। প্রত্যেকটি লোক তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে সম্রাটের সামনে দাঁড়াত। প্রধান প্রধান উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা লাল সীমানা ঘেরা জায়গায় দাঁড়াত। অন্যরা এর বাইরে থাকত। সম্রাট প্রতিদিন দুঘন্টা ধরে এখানে অভাব অভিযোগ শুনতেন। এরপর প্রার্থনার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জায়গায় চলে যেতেন। প্রার্থনার পর ভাল করে সাজিয়ে চার পাঁচ রকমের ঝলসানো খাবার আনা হত। তা থেকে তিনি তার পছন্দমত কিছু খাবার কড়া পানীয়ের সহযোগে খেতেন। এরপর দুঘন্টা ঘুমানোর পর তাঁকে জাগিয়ে নৈশ্যভোজন তার কাছে আনা হত। তখন তিনি খেতে চাইতেন না, কিন্তু জোর করে মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এটা চলত রাত একটা পর্যন্ত। বাদবাকী রাত তিনি ঘুমিয়ে কাটাতেন।" স্যার রো রাজদরবারের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। একদিন গভীর রাতে রো শুয়ে পড়ার পর সম্রাট একটা ছবি দেখানোর জন্য ডেকে পাঠান। রো এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

যখন আমি এসেছিলাম তখন তিনি একটি ছোট সিংহাসনে আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে বসেছিলেন। সিংহাসনটি হীরা, মুক্তা ও চুনীতে ভূষিত ছিল। সামনে একটি সোনার টেবিল, তাতে মণিরত্ন খচিত পঞ্চাশটি সোনার থালা ছিল। অভিজাতরা মহার্ঘ-ভূষণে আচ্ছাদিত হয়ে হাজির ছিল। তাদের রাজা আনন্দফুর্তির জন্য পান করতে বলেন। বিশাল বিশাল মদিরার ঘড়া সাজান ছিল। নিজে পান করে এবং অন্যদের পান করতে বলে সম্রাট ও তাঁর সব পাত্রমিত্ররা অচিরেই আমার দেখা হাজার মজার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

পেত্রো ডেলা ভালে ১৬২৩ সালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নুরজাহান সম্বন্ধে

লেখেন যে ঃ "তাঁর সমস্ত নারীদের মধ্যে একজন স্ত্রী বা মহিষীকে তিনি সবচেয়ে বেশী গণ্য করতেন এবং প্রশ্রয় দিতেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য এই মহিষীর পরামর্শে চালিত হত। মহিষীকে নুরমহল বলে ডাকা হত। নুরমহলের অর্থ হল প্রাসাদের আলো।"

বিদেশীদের এইসব বর্ণনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে যে নবাব জাঁকজমকের মধ্যে বাস করতেন এবং তাঁর পারিষদরা অবিশ্বাস্য ধনী ছিল। তিনি তাঁর প্রজাদের ভালবাসতেন এবং তাদের কল্যাণের উপর নজর রাখতেন। তিনি প্রচুর পান করতেন এবং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরাম এবং আমোদে থাকা। ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ইসলামে অনুরক্ত থাকলেও, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি তাঁর মহিষীকে আবেগ দিয়ে ভালবাসতেন। প্রশাসনের বিষয়ে মহিষীর (নুরজাহান) মতামত চূড়ান্ত ছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেন যে তিনি অতিরিক্ত পাণাসক্ত ছিলেন। তিনি লেখেন "প্রথম দিকে আমি যখন আকুলভাবে পান করতে চাইতাম তখন দুই বার পরিশোধিত করা প্রায় কুড়ি পেয়ালা পান করতাম। পরবর্তীকালে এর কুফল বুঝতে পেরে আমি পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করি। সাত বছরের মধ্যে আমি এটা ৫ বা ৬ কাপে নামিয়ে আনি। আমার পানের ভিন্ন ভিন্ন সময় ছিল। কখনও দিবাবসানের ২-৩ ঘন্টা আগে, কখনও রাত্রে পান করতাম। কিন্তু দিনের বেলা খুবই কমই পান করতাম। সুতরাং আমার ত্রয়োদশ বর্ষে আমি স্থির করেছিলাম যে আমি রাত্রে ছাড়া পান করব না। বর্তমানে আমি কেবলমাত্র হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য পান করি।"

জাহাঙ্গীর শুধুই পানাসক্ত ছিলেন না। তিনি সু-শাসক এবং শিল্পের এক মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবুল হাসান নামক একজন চিত্রকর-যাকে নাদির-উজ-জামান উপাধি দেওয়া হয়—সম্রাটের দরবারের একটি ছবি আঁকেন এবং বাদশাকে উপহার দেন। "জাহাঙ্গীরনামা"র সামনের পাতায় এই চিত্রটিকে ব্যবহার করা হয়। এটি খুব উচ্চস্তরের হওয়ায় বাদশা তাঁকে প্রচুর উপহার দেন। বাদশা চিত্রকলা খুব পছন্দ করতেন এবং সেগুলির এমন বিচার করতে পারতেন যে কোনটি কোন জীবিত বা কোনটি কোন মৃত চিত্রকরের সৃষ্টি তা বলতে পারতেন। যদিও জাহাঙ্গীর নিজে গোড়া সুন্নী মুসলান ছিলেন এবং প্রত্যহ প্রার্থনা করতেন তবুও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি সহনশীল ছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ ছিল না এবং তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক হিন্দু রীতি ও উৎসব মানতেন। কিন্তু তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং কাংড়া বিজয়ের পর পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গনে গরু বলি দেন। খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল। তাদেরকে ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

এটা খুবই দুঃখের যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা খৃষ্টান মিশনারিদের বর্ণনাকে আধার করে নবাবের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের ছবি আঁকেন। এগুলি মহান আকবরের মহান পুত্রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্যায্য। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর চরিত্রচিত্রনে বলেন—"কোমলতা ও নিষ্ঠুরতার, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনার পরিশীলতা ও পশুত্বের সৎবুদ্ধি আবার ও ছেলেমানুষির এক অদ্ভুত মিশ্রণ।"

লেনেপুল বলেন "১৬০৫ সালে যখন তিনি ৩৭ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন তাঁর চরিত্রে ভাল গুণের অভাব ছিল না। এখন তিনি অনেক কোমল এবং তাঁর নিষ্ঠুরতা কমে গিয়ে অনেক বেশী সংযত। দিনের বেলায় তিনি ছিলেন মিতাচারী এবং রাতে খুবই মহিমাময়।" বিভারেজ মন্তব্য করেন যে, "জাহাঙ্গীর সত্যই একজন অদ্ভুত মিশ্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একজন জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া দাঁড়িয়ে দেখতে পারার সাথে সাথে সুবিচারে অনুরক্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবারের প্রতিটি সন্ধ্যায় উচ্চমার্গের কথাবার্তা বলে অতিবাহিত করার পাশাপাশি আবুল ফজলকে হত্যার প্ররোচনা দেওয়া এবং বিনা অনুশোচনায় তা স্বীকার করাও তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল। আবার শীতকালে সম্রাটের হাতিরা জলক্রীড়ার পর শীতে কাতর হলে তিনিও সমব্যথি হয়ে উঠতেন।

জাহাঙ্গীরের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে আমরা ঈশ্বরীপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও বেণীপ্রসাদের মতামত দিতে পারি। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লেখেন—মুঘল ইতিহাসে জাহাঙ্গীর একজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আমোদপ্রিয়,

নির্মম অত্যাচারী, মানুষ ছিলেন বলে সাধারণত যে ধারণা আছে তা সঠিক নয়। সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী তিনি একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সহজেই রাজ্যের সমস্ত জটিল সমস্যা বোঝায় সমর্থ ছিলেন।" ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে "জাহাঙ্গীর সাহিত্য ও শিল্পকলার সুক্ষ্ম রুচিতে সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রকৃতি, জীবজগৎ বৃক্ষরাজির এবং সৌন্দর্যের রসবোধ তার সক্ষম বর্ণনার সমান ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা তাঁর নিজস্বতার সাক্ষ্য বহন করে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রকৃতিপ্রেম এবং অন্যান্য গুণের সাক্ষ্য দেয়। ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল যা নাকি তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও পালন করতেন। তার মৃত্যুর বহু বছর পরেও তাকে ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসাবে মনে করা হত। জাহাঙ্গীর শিল্প ও সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই চিত্রকলা উন্নতিলাভ করে, স্থাপত্যে নতুন অলঙ্করণ যুক্ত হয়। সাহিত্যে যদিও তাঁর পিতার আমলের মত না হলেও যথেষ্ট তবু প্রাণবন্ত ছিল। ডাঃ বেণিপ্রসাদ তাঁর সময়ের প্রশংসা করে বলেন ঃ—"তাঁর পিতার কালজয়ী গৌরবগাথা এবং পুত্রের উজ্জ্বল দীপ্তিময় ছবির কাছে তাঁর খ্যাতি অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। তাঁর সমস্ত জীবনের পুর্নবিচার করলে তিনি একজন বিচক্ষণ, সহৃদয়, পরিবারের প্রতি গভীর মমতাময় এবং সকলের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রতিভাত হন। তাঁর অত্যাচারের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি গভীর আসক্তি ছিল। সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীরের শাসনকাল সাম্রাজ্যের পক্ষে শান্তি ও সমৃদ্ধি এনেছিল। তাঁর শাসনে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয়, স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করে, চিত্রকলা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছায় এবং সাহিত্য এমন বিকাশ লাভ করে যা পূর্বে কখনও হয়নি। এই সময় তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেন যা তাৎক্ষণিকভাবে হোমার, বাইবেল, সেকসপিয়ার এবং মিলটনের মত উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই সময় বহু উল্লেখযোগ্য পারসিক এবং দেশীয় ভাষার কবি সমবেত ভাবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল। জাহাঙ্গীরের আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতিই এই সময়কার প্রধান গুণ।

রিচার্ড বাঁণ-এর উক্তি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন "ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন এক উদারমনা মানুষ, যিনি খেলা, শিল্প ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেমিক ছিলেন। তিনি সবার ভাল করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু শুধুমাত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবের জন্য মহান প্রশাসকের স্তরে পৌঁছাতে পারেন নি।"

৩.৪ শা-জাহান

বাদশা শা-জাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য তার গৌরবের শীর্ষে পৌঁছায়। সাধারণভাবে এই সময়কে মুঘল রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলা হয়। স্ট্যানলি ইয়ানপোল এবং ঈশ্বরী প্রসাদ শা-জাহানকে এক মহৎ বাদশা বলে অভিহিত করেন। এলফিসটোনের মতে শা-জাহানের যুগ তৎকালীন সময় পর্যন্ত সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী যুগ। অবশ্যই তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য তার গৌরব এবং উজ্জ্বলতার শীর্ষে পৌঁছায়। তখন দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। ভারতের অবিশ্বাস্য ধনদৌলতের খ্যাতি বহু দূর দেশের অনেক বিদেশীকে এদেশে টেনে এনেছিল। তারা বাদশা এবং তার চর্তুদিকের জাঁকজমক দেখে হতবাক হয়ে যায়। রাজদরবারে জাঁকজমক তাদের কল্পনার অতিরিক্ত ছিল এবং তারা অকৃপণভাবে এ সম্বন্ধে লেখেন। তাজমহল, জামা মসজিদ, দিয়ানি আম, দিওয়ানি খাস এবং আরও অনেক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য যা নাকি শা-জাহান নির্মাণ করিয়েছিলে সেগুলি আজও মুঘল সাম্রাজ্যের মহিমা এবং শাজাহানের শাসনকালের গৌরব বহন করে। কিন্তু এই আড়ম্বর ও বিশালতার ছটার আড়ালে পতন ও অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এই সব বৃহৎ নির্মাণকার্য, যুদ্ধ ইত্যাদির অর্থ যোগানের জন্য রায়তদের এবং অন্যদের উপর করের নিদারুণ বোঝা চাপান হয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রশাসন মাথাভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক যন্ত্র ধীরে ধীরে গতিহীন এবং অকার্যকরী হয়ে উঠেছিল। শা-জাহানের রাজত্বকাল আর্থিক দিক থেকে ফ্রান্সের চর্তুদশ লুই-এর সময়ের মত হয়ে ওঠে। বাদশা বয়স

বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ হলে প্রশাসনিক এবং আর্থিক অবক্ষয়ের স্পষ্ট লক্ষণগুলি দেখা দিতে থাকে। এডওয়ার্ড এবং গ্যারেটের বলেন শা-জাহানের শাসন মুঘল সাম্রাজ্য ও তার অর্থব্যবস্থার মৃত্যু ঘন্টা ধ্বনিত করে। দিল্লীর শাহজাহানের ইতিহাসের রচয়িতা ডাঃ বি. পি. সাক্সেনাও এই মত সমর্থন করে লেখেন যে সাম্রাজ্য ধ্বংসের অনেকগুলি প্রবণতার উৎস ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শা-জাহানের শাসনকালে খুঁজে পাওয়া যায়। শা-জাহানের শাসনকাল তাই এক বিচিত্র স্ব-বিরোধী চিত্র হাজির করে যা নাকি এ বিষয়ে আমাদের বিচক্ষণ ও ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গী দাবী করে।

শা-জাহান গভীর রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর প্রজাদের 'ঝরোকা দর্শন' দিতেন। এই সময় সাধারণ জনগণ রাজ সান্নিধ্যের অবাধ অধিকার পেত এবং তারা সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীদের অবিচারের বিরুদ্ধে নবাবের বিচার চাইতে পারত। এটি অবশ্যম্ভাবী যে দরবারের রাজকীয় গম্ভীরতা ও জাঁকজমক অনেককে আতঙ্কিত করত। খুব কমজনই সাহস সঞ্চয় করে বাদশাকে তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারত। কিন্তু যখনই কোন অভিযোগ বাদশার নজরে আনা হোত তিনি কঠিন হাতে দোষীকে শাস্তি দিতেন। সুবিচার দেবার জন্য নবারের হস্তক্ষেপের নানা উদাহরণ উপকথায় পরিণত হয়েছে।

শা-জাহান একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খানের মতে রাজ্য জয় এবং আইনের প্রতিষ্ঠায় যদিও আকবর শ্রেষ্ঠ ছিলেন তথাপি সুশাসন ও অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শা-জাহানের সাথে তুলনীয় কোনও নবাব কখনও ভারতে শাসন করেন নি। শা-জাহান আকবরের চালু করা প্রশাসনিক কাঠামোয় খুব কমই পরিবর্তন করলেও রাজকর্মচারীদের কাজে কোনও রকম গাফিলতি সহ্য করতেন না। প্রশাসনিক জটিলতার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখতে নবাব কখনও ক্লান্ত হতেন না। তাঁর এই মনোভাব থেকেই এক সজীব প্রশাসন জন্ম নেয়। এই বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ তাঁকে ভালভাবে প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। শা-জাহানের রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা থাকায় শান্তি বিরাজ করত। সমসাময়িক ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি অনুযায়ী রাজ্যে জনগণের যাতায়াতের এবং সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। চুরির অপরাধে কখনও কাউকে শাস্তি দিতে হয় নি।

শা-জাহানের সময়ে রাজ্যে শান্তি থাকার কারণে সাধারণ প্রজার শ্রী ও সমৃদ্ধি আসে। তিনি পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত শুষ্ক খালগুলির সংস্কার করেন এবং নতুন খাল খনন করেন। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুরী এবং আমেদাবাদে অনেক কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করায় অনেকের কর্মসংস্থান হয়। হিন্দু ব্যবসায়ীরা ধনী ছিল এবং তাদের কারো কারো সরকারের উপর গভীর প্রভাব ছিল। ১৬৩৮ সালে আমেদাবাদে শান্তিদাস নামক এক ধনী ব্যবসায়ী বিশাল এক মন্দির নির্মাণ করে নগর শেঠ উপাধি লাভ করেন। বার্নিয়ার নামক এক বিদেশী পর্যটক শা-জাহানের রাজত্বের সমৃদ্ধির সম্বন্ধে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে খুবই প্রশংসা করেন। বাঙ্গলা সম্বন্ধে তিনি বলেন —"বাঙ্গলায় জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য পর্তুগীজদের দ্বারা বিতাড়িত দোআশলা পর্তুগীজ ও অন্য অনেক খৃষ্টীয় লোকদের বাঙ্গলায় আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত করে। বাঙ্গলার প্রাচুর্য এবং সেখানকার নারীদের সৌন্দর্য্য এবং নরম স্বভাব পর্তুগীজ, ইংরাজ ও ডাচদের মধ্যে একটা কথা চালু করেছিল যে, বাঙ্গলায় ঢোকার শত দরজা আছে কিন্তু বেরোবার কোনও পথ নেই।

কবি, দার্শনিক এবং পন্ডিতেরা সবাই রাজদরবারে হাজির হত এবং বাদশার আনুকুল্য লাভ করত। নবাবের এই মহান উদাহরণ তাঁর উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং তারা ও প্রতিভাশীল লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজদরবারে সাহিত্যবিষয়ে দক্ষ বেশ কিছু ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দি ও ফারসী ভাষা সেখানে পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে। ডাঃ সাকৃসেনা লিখেছেন যে শা-জাহানের রাজত্বকালে হিন্দি ভাষা এবং সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটে। হিন্দি কবিদের মধ্যে সুন্দর দাস, চিন্তামনি এবং কবিন্দ্র আচার্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সাইদল গিলানী, আবদুল তালিব কালিম এবং কুদসী ছিলেন ফারসী ভাষার কবিদের মধ্যে অন্যতম। নবাব সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। রাজ দরবারের প্রতিথযশা সংগীতকাররা ছিলেন লাল খাঁ, গুন সমুদ্র (তান সেনের জামাই) এবং জগন্নাথ। শেষোক্ত সংগীতকার মহা কবি রায় সুখ সেন উপাধি পান এবং গিটারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন সুর সেন।

উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের জন্য শা-জাহানের নাম তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমাদৃত। তিনি স্থাপত্যের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই তিনি বিশাল, দর্শনীয় ইমারত তৈরী করান। তিনি দুর্গ, রাজপ্রসাদ এবং মসজিদ নির্মাণ করান। মুঘল স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিগুলির জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। এই সব স্থাপত্যের মধ্যে তাজমহল, মতি মসজিদ, জামা মসজিদ, দিওয়ানি আম ও দিওয়ানি খাস প্রভৃতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাদশার প্রিয়তমা মুমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ্য তাজমহল তার সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবীর বিস্ময় হিসাবে ধরা হয় এবং চিরকালের আনন্দের উপকরণ হিসাবে গণ্য হয়। সমগ্র স্থাপত্যের ইতিহাসে এইরকম নির্মাণ আর কখনও হয়নি এবং এইরকম আর একটি নির্মাণের কল্পনাও কখনও হয় নি। এটি চোখকে তৃপ্তিতে এবং হৃদয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে। অন্য স্থাপত্যকলাগুলি তাদের নিজস্ব গঠনশৈলী এবং সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। যদিও সেগুলি স্বকীয়তায় এবং নকশায় সর্বোৎকৃষ্ট নয়, তথাপি কারুকার্য এবং সমৃদ্ধ অলঙ্করনের জন্য অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। দেওয়ানি খাসের ব্যয়বহুল রূপোর আচ্ছাদনের কারুকার্য এবং দেওয়ানি খাসের রূপোর আচ্ছাদনে সোনা, মহার্ঘ পাথর এবং মার্বেলের কারুকার্য আমীর খুসরুর খোদিত লিপিকেই সার্থক প্রমাণ করে ঃ "পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।"

বাস্তবে শা-জাহান রাজকীয় বিলাস এবং জাঁকজমকের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পৃথিবীর কাছে ভারতের নবাবের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সমসাময়িক ফরাসী জহুরী শা-জাহানের ময়ুর সিংহাসনের মূল্য ১৫০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার্য করেন। এটি খাটি সোনা দিয়ে তৈরী এবং মূল্যবান রত্নখচিত। এটা প্রচলিত কাহিনী যে শা-জাহানের প্রথম রাজ্যাভিষেকের সময় নবাব ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করেন এবং নিজেকে মূল্যবান ধাতু ও রত্ন দিয়ে ওজন করান। পরে এগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এখন শা-জাহানের রাজত্বকালের অন্যদিকগুলিতে চোখ ফেরান যাক। শা-জাহানের রাজত্বকালে ১৬৩০ সালে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, খান্দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু লোক অনাহারে মারা যায়। আবদুল হামিদ লাহোরির বর্ণনা অনুযায়ী "অভাব এমন স্তরে পৌঁছায় যে মানুষ পরস্পরকে খাওয়া শুরু করে এবং পুত্রের ভালবাসার চেয়ে তার দেহের মাংস প্রিয় হয়ে ওঠে।" পিটার মুন্ডি লেখেন যে জাতীয় সড়কগুলিতে মৃতদেহ ছড়ান থাকত এবং সেগুলি দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। ডাঃ ভিনসেন্ট স্মিথ তীব্র নিন্দা করে বলেন যে সরকার জনগণের এই দুর্গতি লাঘবের জন্য তার প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেনি।

মধ্য এশিয়ায় শা-জাহানের নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনে। তাঁর পারস্যের কাছ থেকে কান্দাহার পুর্ণদখলের চেষ্টা সফল হয়নি। তিনবার কান্দাহার অভিযানে প্রচুর অর্থ এবং লোকক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারেননি। হিসাব করে দেখা গেছে এই অভিযানে ১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এর ফলে শুধু মুঘলদের সম্মানহানি হয়েছিল তাই নয় মুঘলদের সামরিক অপদার্থতাও বাইরের শক্তির কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় শা-জাহানের অভিযান দুর্দশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বাদশা তাঁর পূর্বপুরুষদের মত হৃদয়ের গভীরে পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভু-ভাগ বালাখ এবং বদকশান বিজয়ের আশা পোষণ করতেন। অন্তঃবিরোধের সুযোগ নিয়ে মুঘলরা যুবরাজ মুরাদের নেতৃত্বে বালাখ আক্রমণ করে। প্রাথমিক ভাবে তারা সফল হলেও এই জয় তারা স্থায়ী করতে পারেনি। উজবেকরা জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে ফলে ঔরঙ্গজেবকে কঠিন কষ্ট করে পিছু হটতে হয়। স্যার যদুনাথ সরকারের হিসাব অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমি বা কোনরকম রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ছাড়াই এই অভিযানে রাজকোষ থেকে ৪ কোটি টাকা খরচ হয়।

পিতামহ আকবরের অনুসৃত ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি শা-জাহান উল্টে দেন। তিনি তাঁর নিজের ধর্মের সক্রিয় সমর্থক হয়ে ওঠেন। হয়ত তাঁর স্ত্রী মুমতাজ মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এটি করেন। তিনি আবার তীর্থকর চালু করেন, এমন কি ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ যোগান। তাঁর পিতার আমলে শুরু হওয়া হিন্দু ধর্মীয় স্থানগুলি তিনি

১৬৩২ সালেই ধ্বংসের আদেশ দেন। একমাত্র বারাণসীতেই ৭৬টি মন্দির ধুলিসাৎ করা হয়। পরে বাদশার সুবুদ্ধি ফিরে আসে এবং তিনি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন। ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে "শা-জাহানের শাসনকে কোনও অর্থেই ব্যাপক ধর্মীয় নির্যাতন, গোঁড়ামি অথবা অসহিষ্ণুতার কাল বলা যায় না।"

শা-জাহানের শাসনকাল খুঁটিয়ে দেখলে এটা প্রমাণিত হয় যে উপর উপর যা দেখা যায়, গভীরে তা সব সময় নাও দেখা যেতে পারে। রাজ দরবারের সীমাহীন শ্রী-র পাশাপাশি দেখা যেত অপশাসনের ফলে সাধারণ কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চনার ছবি। সাধারণ জনগণ, যাদের শ্রীবৃদ্ধির উপর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করত, তাদের উপর বাদশার সামরিক বাহিনী ও আমলাদের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান খরচ জোগান দেবার অসহ্য বোঝা চাপান হয়েছিল। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং একই সঙ্গে খাজনা আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল। ডাঃ স্মিথ নিন্দা করে বলেন যে রাজ্য শাসনের বিষয়ে শা-জাহান তার সময়ের অন্য রাজাদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক এবং অসাধু ছিলেন না, কিন্তু তাদের চেয়ে অবশ্যই ভালও ছিলেন না। এই উক্তি আমাদের কাছে খুব কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু বাদশা বৃদ্ধ হবার সাথে সাথে তার পুরানো কর্মদ্যোম এবং শক্তি হারিয়ে সহজ আমোদ-প্রমোদের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ড্রাইডেন ঔরাঙ্গজেবের সাথে তুলনা করে লেখেন যে ঃ— O' had he still that character maintained, of vator which in blooming youth he gained. He promised in his East a glorious Race; Now, sunk from his Meridian, sinks apace, But as the Sun, when he from noon declines, And with abated heat less fiercely shines, Seems to grow milder as he goes away, Pleasing himself with the remains of day; So he who in his youth for glory strove, would recompense his Age with Ease and Love.

স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেন যে রাজ্য শাসনের বোঝা তার আমোদপ্রমোদে বাধা হয়ে ওঠায় তিনি তার ক্ষমতা চার পুত্রের মধ্যে হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন। এইভাবে শা-জাহান তাঁর প্রশাসনকে ঢিলেঢালা করে তোলেন এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসকামী শক্তিগুলি আটকানোর প্রয়াস থেকে বিরত থাকেন।

শা-জাহান দীর্ঘকাল গত হয়েছেন কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁর অন্তিম দিনগুলির দুঃখ-কষ্টের জন্য বিলাপ করবে। কিন্তু তাঁর নির্মিত অপূর্ব স্থাপত্যগুলি তাঁর স্মৃতিকে চিরনবীন রাখবে। এটা সত্যি যে এগুলি তৈরী করতে গিয়ে সাধারণ লোক হতদরিদ্র হয়ে অসহনীয় জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু সাধারণের জীবনে দুঃখকষ্ট নেই, এরকম শাসনের কথা কে বলতে পারে। কিন্তু শা-জাহানের দৃষ্টিগোচর করলে তিনি তাদের দুঃখ দূর করার এবং দোষীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতেন।

একক ৪ ❑ সম্রাট এবং শাসকগোষ্ঠী

গঠন

৪.০ সম্রাট ও শাসকগোষ্ঠী
৪.১ মনসবদারী প্রথা
৪.২ ভূমি রাজস্ব বা জাব্‌ত ব্যবস্থা
৪.৩ সমালোচনা ও পরিসমাপ্তি
৪.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ সম্রাট এবং শাসকগোষ্ঠী

রাজপুত ঃ আকবরের সাথে রাজপুতদের সম্পর্ককে মুঘলদের শক্তিশালী রাজা ও জমিদারদের প্রতি অনুসৃত নীতির পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। হুমায়ুন যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, তখন তিনি এই সমস্ত শ্রেণীর মন জয় করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালান।

আকবরও পিতার এই ঐতিহ্য মেনে চলেন এবং তিনি নিজেও তাঁর নিজের সময়ের আত্তীকরণ ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের এক ফসল ছিলেন। আকবর সিংহাসনে আরোহনের পরেই অম্বরের শাসক বিহারীমল আকবরের দরবারে আসেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁর আজমীর যাত্রাকালে জানতে পারেন যে স্থানীয় মুঘল অধিপতিদের দ্বারা বিহারীমল অপদস্থ হয়েছেন। বিহারীমল ব্যক্তিগতভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে এবং তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা রেখাবাইকে আকবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেন।

ওই সময়ে মুসলমান শাসক ও হিন্দু রাজাদের কন্যাদের মধ্যে বিয়ে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আকবর এই বিয়েতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেন। তিনি একটি নতুন নীতি গ্রহণ করে তাঁর হিন্দু পত্নীদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি পত্নীদের পিতামাতা ছাড়াও অভিজাতবর্গের মধ্যে অবস্থিত আত্মীয়দেরও সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। বিহারীমল একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্র ভগবান দাস ৫০০০ মনসবদারীর পদে ও পৌত্র মান সিং ৭০০০ মনসবদারীর পদে উন্নীত হন। আকবর অম্বরে কাছুওয়াহা শাসকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতিও বিশেষ জোর দেন। ওখানকার নাবালক রাজপুত্র দনিয়লকে অম্বরে বিহারীমলের পত্নীদের কাছে বড় করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উজবে বিদ্রোহের সময় বিহারীমল সর্বদা আকবরের সহায়তা করে গেছেন। এর পরে বিহারীমল ও ভগবান দাসকে সম্রাটের বাহিনীতে নজর রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এমনকী তারা রাজবাড়ির মহিলাদেরও পাহারা দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। এই অধিকার শুধুমাত্র সেই অভিজাতরাই পেতেন যাদের সঙ্গে সম্রাটের আত্মীয়তা আছে। কাছুওয়াহা রাজকুমারীর মাধ্যমে সেলিমের জন্ম আকবরকে অম্বরের শাসকবর্গের আরও নিকটবর্তী করে তোলে।

কিন্তু আকবর বৈবাহিক সম্পর্ককে কখনই একটি বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত করে তোলেননি। উদাহরণস্বরূপ রণথম্ভোরের হাদাসদের সঙ্গে বৈবাহিক কোনো সম্পর্কই ছিল না। তবুও তারা আকবরের অভিজাতবর্গের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু স্থানে ছিলেন।

আকবরের রাজপুত নীতির সঙ্গে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি মিলিত হয়েছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর জিজিয়া কর তুলে দেন যার সাহায্যে উলেমারা প্রায়ই অ-মুসলমানদের নির্যাতন করতেন। এর আগেই তিনি তীর্থকর বিলোপ করেছিলেন। যুদ্ধে বন্দীদের জোর করে ধর্মান্তরিতকরণও তিনি বন্ধ করেন।

এসব উদার পদক্ষেপ সত্ত্বেও ১৫৬৮ সালে চিতোর পতন ও তারপরে রণথম্ভোর দখলের পরেই আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে। ওই সময় নাগাদ বেশীরভাগ অগ্রণী রাজপুত শাসকরাই আকবরের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আকবরকে উপঢৌকন পাঠাতে শুরু করেছিলেন। জয়সলমীর ও বিকানীরের শাসকরাও ইতিমধ্যে আকবরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মেবারই ছিল একমাত্র রাজ্য যা মুঘল আধিপত্য মানতে চায়নি। চিতোর ও তার আশেপাশের সমতলভূমি মুঘল আধিপত্যাধীনে এলেও, উদয়পুর ও পাহাড়ী অঞ্চল তখনও পর্যন্ত রাণার অধীনেই ছিল।

১৫৭২ সালে আকবর উদয় সিংয়ের উত্তরাধিকারী প্রতাপের কাছে মুঘল আধিপত্য মেনে নেবার আর্জি জানিয়ে বেশ কয়েকটি দৌত্য পাঠান। কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের প্রান্তরে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং রাণা পালিয়ে যান। ঐ দুই পক্ষ আবার গোগুন্ডার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং দুই পক্ষই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবী করেন। এরপরে রাণা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কখনই ধরা পড়েননি। কিন্তু যে লক্ষ্যের জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন, সেই লক্ষ্য ততদিনে প্রায় হারিয়ে গেছিল, কেননা বেশীরভাগ রাজপুত রাজ্যই ততদিনে মুঘল বশ্যতা মেনে নিয়েছে।

তাই একটি ত্রিমাত্রিক নীতি, যথা বৈবাহিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও কূটনীতির সাহায্যে আকবর রাজপুতদের রাষ্ট্রের এক নির্ভরযোগ্য মিত্র করে তুলেছিলেন। রাজপুত রাজাদের মুঘল দরবারে সম্মানজনক কাজ দেওয়া মুঘল মনসবদারদের মত সমান সম্মান দেওয়া, আটামটি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহারের দ্বারা আকবর রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতাকে দৃঢ় করেন। তাই রাণা প্রতাপের মুঘল বশ্যতা স্বীকার করা প্রত্যাখ্যান অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ওপর খুব ক্ষীণ প্রভাব ফেলেছিল। কেননা, তারা বুঝতে পেরেছিল যে বর্তমান অবস্থায় ছোট ছোট রাজ্যগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। উপরন্তু রাজপুত রাজ্যগুলিতে একটি উদার স্বশাসন কায়েম রেখে (উদাহরণস্বরূপ রাজপুতদের তাদের ওয়াতন জাগীরের ওপর কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়।) আকবর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে রাজপুত রাজারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেনি।

মেবার ছাড়া, মারবাড়েও আকবরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মালদেওয়ের কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রসেন মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করলে আকবর ১৫৬২ সালে মারবাড়কে পুরোপুরিভাবে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। পরে, চন্দ্রসেনের দাদা উদয় সিং এর ওপর যোধপুরের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর অবস্থানকে আরও জোরদার করে তুলতে আকবর উদয় সিং এর কন্যা যোধাবাইকে বিয়ে দেন তাঁর পুত্র সেলিমের সঙ্গে। বেশ কিছু হিন্দু অনুষ্ঠান এই বিয়েতে পালিত হয়।

আকবরের বিকানীর ও বুঁদির শাসকদের সঙ্গেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। এঁরা বেশ কিছু যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করেছেন। ১৫৯৩ সালে বিকানীরের রাজা রাই সিং এর জামাতা যখন মারা যান আকবর স্বয়ং রাজার বাড়ি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন ও তাঁর কন্যাকে "সতী" হতে বারণ করেন, যেহেতু তাঁর সন্তানেরা তখনও ছোট ছিল।

আকবরের রাজপুত নীতি মুঘল রাষ্ট্র ও রাজপুত দু'পক্ষের পক্ষেই উপকারী হয়েছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে মুঘলরা এই দেশের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের পেয়েছিল, রাজপুতরা সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংহতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আকবরের রাজপুতনীতি তিনটি পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছিল। প্রথম পর্যায়ে, যা প্রায় ১৫৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, যে সমস্ত রাজপুত রাজারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের রাষ্ট্রের অনুগত মিত্র মনে করা হত। দ্বিতীয় পর্যায়কে ১৫৭২ সালে গুজরাট অভিযান থেকে শুরু বলে মনে করা যায়। এই সময় থেকে রাজপুতরা সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে দেখা দেয়। রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায় ১৫৭৮ থেকে শুরু হয়। ঐ সময় রাজা ভগবান দাস এবং মান সিং উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে অভিযানের জন্য পশ্চিম পাঞ্জাবের ডেরায় সম্রাটের তাঁবুতে এসে পৌঁছন। এই ঘটনার সময়ে আকবরের সঙ্গে গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়, সদর শেখ আবদুল নবীর বিতাড়ন ও আকবরের মহজর এর প্রশ্নে এই বিরোধ বেধেছিল। এর পর থেকেই রাজপুতদের সর্বত্র ব্যবহার করা হতে থাকে। এমনকী তাদের রক্তের সম্পর্কের রাজকুমারদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে পাঠান হয়।

আকবরের রাজত্বের বাকী কয়েকটি বছরের মধ্যে অংশীদার হিসাবে রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। ১৫৮৬-৮৬ সালের মধ্যে রাজপুতদের চারটি সুবার যুগ্ম শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই সুবাগুলি হল লাহোর, কাবুল, আগ্রা এবং আজমীর।

এই সন্ধি রাজস্থানে শান্তি নিশ্চিত করেছিল এবং রাজপুতরা তাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরদেশে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারতেন। এর ফলে তাদের সম্মান ও সামাজিক প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। মুঘলদের সঙ্গে কাজকর্মে আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও লাভ করে রাজপুতরা। রাজপুতদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করতে তাদের বংশানুক্রমিক জাগরী বাদে আরও নতুন জাগীর দেওয়া হয়। রাজপুত রাজাদের ওয়াতন জাগীর দেওয়া হয় তাঁদের নিজস্ব বাসভূমিতেই। এই জাগীরগুলিকে কোনো শাসকের জীবদ্দশায় হস্তান্তরিত করা যেত না।

তাদের নিজেদের প্রদেশের মধ্যে মোটামুটি স্বশাসন বজায় রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে মুঘলরাও এক ধরনের কর্তৃত্ব দাবী করেছিল, যার অর্থ ছিল এই যে, রাজপুত রাজারা একে অন্যের অঞ্চলে হানা দেবেনা বা সীমানা নিয়ে কোনো বিবাদে যুদ্ধের আশ্রয় নেবে না। এছাড়া উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি এখন থেকে অধিকারের থেকে সম্রাটের দয়ার ওপরেই অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আকবরের রাজপুত নীতি তাঁর উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মেনে চলেন। এই নীতির সাহায্যে মুঘলরা এক সর্বভারতীয় মুঘলিকা বা মুঘল সাম্রাজ্য গঠন করতে পেরেছিলেন। এর ফল ছিল শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন। এই নীতির অবক্ষয় শেষের দিকে পারস্পরিক উৎকণ্ঠা ও চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

মনসবদারী প্রথা ঃ মুঘলদের দ্বারা সৃষ্ট এক অদ্বিতীয় প্রথা ছিল মনসবদারী প্রথা। বৃহত্তর অর্থে মনসব বলতে কাউকে কোনো পদে অধিষ্ঠিত করা বোঝায়। যা সরকারি শ্রেণীক্রমে তাঁর মর্যাদা ও বেতন নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য হিসাবে মনসবের অধিকারীকে বেশ কিছু সশস্ত্র সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। অধিকারীকে যে কোনো শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক কাজে বা দরবারের সভাসদ হিসাবে নিয়োগ করা যেত। তাই মনসবদারী ছিল এমনই একটি প্রথা যাতে নাগরিক ও সামরিক দুই প্রকারের দায়িত্বেরই মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। যদিও নগদে বেতন দেওয়া যেত, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জাগীর প্রদান করাই ছিল রীতি। জাগীর প্রদানের অর্থ ছিল, রাষ্ট্রের প্রাপ্য যাবতীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার। অভিজাতদের দেওয়া মনসবের পরিমাণ ১০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত হতে পারত। ছেষট্টি ধরনের প্রচলিত এই মনসব ১০ এর গুণিতক হিসাবে ১০০ পর্যন্ত এবং তারপরে ৫০ ও ১০০-র গুণিতক হিসাবে চালু ছিল।

তবে এর কোনো স্থিরতা ছিল না যে এই ছেষটি ধরনের মানের মনসব সবসময়ই প্রদান করা হত। ছেষট্টি সংখ্যাটি প্রধানতঃ ছিল একটি কাল্পনিক পবিত্র সংখ্যা। কাগজেকলমে যেহেতু এটি একটি একক চাকরী ছিল। সেহেতু একজনকে নিম্নতম মানে প্রবেশ করে পরে ধীরে ধীরে উন্নতি করতে হত। কিন্তু ৫০০০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত মনসবগুলি রাজপরিবারের রাজপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

মনসবের সংখ্যাগত মানকে প্রায়ই চেঙ্গিস খানের সময় থেকে গণনা করা হয়। চেঙ্গিস খান তাঁর সেনাবাহিনীকে ১০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত মানে বিভক্ত করেছিলেন। ধ্রুপদী মুসলমান লেখকেরা রাষ্ট্রের কর্মচারীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যোদ্ধারা ছিলেন আশাবউস-সাইফ বা অসিচালনায় দক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন হিসাবরক্ষক, কেরানী ও আশাবউল-কলম্ এর দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীরা। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ বা বিচারক বা আশাব-উল-আমামাহ্ বা পাগড়ীআলা মানুষেরা। হুমায়ুনও তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন।

এই হল আকবরের রাজত্বের ৪০তম বর্ষের (১৫৯৫-৯৬) দ্বৈত পদমর্যাদা বা জাট ও সওয়ার পদ চালু করবার পটভূমি। মনসবদারী প্রথা চালুর সঠিক সময় নিয়ে মোরল্যান্ড ও আবদুল আজিজের মত পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছাড়া আকবরের পক্ষে রাজ্যবিস্তার ও তার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব ছিল না। এই উদ্দেশ্যে অভিজাতশ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। মনসবদারী প্রথার সাহায্যে তিনি এই দুই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করেছিলেন। আবুল ফজলের মতে মনসবদারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা নিজেদের মনসবের সমান সংখ্যক সওয়ার প্রতিপালন করতেন, তাদের প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। যারা মনসবের অর্ধেক বা তার বেশি সংখ্যক সওয়ার প্রতিপালন করতেন তাদের নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। যারা মনসবের সংখ্যার অর্ধেকেরও কম সংখ্যক সওয়ার যাদের ছিল, তাঁরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত।

বহুদিন ধরে জাট ও সওয়ারের অর্থ নিয়ে এক জটিল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হল আকবরের অধীনে মনসব পদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং গোড়ার দিকে প্রায় ১৫৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত এটি ছিল অন্য ধরনের। তখন এতে শুধুমাত্র একটিই পদ ছিল। দ্বৈত জাট ও সওয়ার পদ্ধতি ১৫৯৫-৯৬ সালের পর চালু হয়েছিল। "জাট" বলতে বোঝায় কোনো অভিজাতের ব্যক্তিগত বেতন ও তাঁর মর্যাদা। সওয়ারের অর্থ হল বাস্তবে যতগুলি ঘোড়সওয়ার তার প্রতিপালন করার কথা।

অভিজাতরা যেসব সওয়ারদের নিয়োগ করতেন, তারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হত। এই উদ্দেশ্যে যোদ্ধার একটি বর্ণনামূলক ক্রমিক সংখ্যা (চেহারা) রাখা হত এবং তার ঘোড়াকেও সম্রাটের নিজস্ব ব্যবস্থায় চিহ্নিত করা হত (দাগ পদ্ধতি)। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অভিজাতকে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে সম্রাটের নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পর্যবেক্ষণের জন্য আসতে হত। ঘোড়াগুলিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হত এবং শুধুমাত্র আরব বা ইরাকে জাত উন্নত শ্রেণীর ঘোড়াগুলিকেই রাখা হত। সব থেকে উত্তম ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক দশজন অশ্বারোহীর জন্য কুড়িটি ঘোড়া রাখতে হত। এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কেননা যুদ্ধে অগ্রগতির সময় ঘোড়াদের বিশ্রাম দিতে হত এবং যুদ্ধের সময় বদলীর প্রয়োজন খুব বেশী ছিল। মাত্র একটি ঘোড়া থাকলে একজন সওয়ারকে অর্ধেক বা অসম্পূর্ণ মনে করা হত। যতদিনই এই ১০-২০ নিয়ম মানা হত, ততদিন মুঘল অশ্ববাহিনী ছিল সুদক্ষ।

অভিজাতদের বাহিনীগুলিকে এক মিশ্র চরিত্র দিতে মুঘল, পাঠান, হিন্দুস্তানী, রাজপুত সব গোষ্ঠী থেকে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এর সাহায্যে আকবর উপজাতিবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন।

অশ্বারোহী ছাড়া তীরন্দাজ, বন্দুকধারী, পরিখাকর্মী ও খনিকর্মীদেরও নিয়োগ করা হয়। এদের প্রত্যেকের মাইনের তারতম্য ছিল এবং একজন সওয়ারের গড় মাইনে ছিল মাসে কুড়ি টাকা। ইরানী ও তুরানী সৈনিকরা আরও বেশি

পেত। পদাতিক সৈন্যরা মাসে তিন টাকা পেত। এই সমস্ত ধরনের সৈনিকদের প্রাপ্য অর্থ ও মনসবদারের নিজস্ব মাইনে যোগ করা হত ও মনসবদারকে দেয় অর্থ জাগীর প্রদানের মাধ্যমেই প্রদান করা হত। কখনো কখনো মনসবদারদের নগদেও বেতন দেওয়া হত। আকবর নিজে জাগীর পদ্ধতি পছন্দ না করলেও পুরোপুরি এই পদ্ধতি বর্জন করতে পারেননি, কেননা এর শেকড় অনেক গভীরে পৌঁছে গেছিল।

মুঘলদের অধীনের যে মনসবদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয়। এর কোনো সঠিক সমান্তরাল ব্যবস্থা ভারতের বাইরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের ব্যক্তিগত খরচ সামলানো ছাড়াও মনসবদারদের নিজস্ব বেতন থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া, হাতি, উট, খচ্চর ও মালপত্র বহন করার গাড়ী রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ দিতে হত। আবদুল আজিজের দাবীতে এইসব পশুগুলি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মনসবদারেরা তাদের নিজস্ব বেতন থেকে দিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ শিরীন মুসভির বক্তব্য অনুযায়ী মনসবদাররা এদের ভরনপোষণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ পেতেন, যার ফলে এই পশুগুলি বোঝা না বরং সম্পদ হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, আবুল ফজল স্পষ্টই বলেছেন যে ভারবাহী পশুগুলিকেও দাগের জন্য হাজির করতে হত। এই সমস্ত খরচ সামলানোর জন্য মুঘল মনসবদারদের ভারী বেতন দেওয়া হত। সাধারণভাবে, এই বেতনের কিছু অংশ পরিবহনের জন্য ব্যয়িত হত। তা সত্ত্বেও মুঘল মনসবদাররা ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী।

সুতরাং মনসবদারী ব্যবস্থা বেতন, পদোন্নতি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথার বিবর্তনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতির সাহায্যে আকবর সাম্রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের মানুষকে একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি একে রাজকীয় ইচ্ছাপূরণের একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আকবর ভারসাম্য নীতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের মানুষকে একটি মাত্র ব্যবস্থায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে অনেক দিক থেকে বিচার করেই বলা যায় সুলতানী আমলে প্রচলিত সামরিক সংগঠনের চেয়ে মনসবদারী ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিত্ব ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক ব্যবস্থা ছিল এটি। কয়েকটি শর্তের অধীনে কয়েকজন প্রধান কর বা খাজনা গ্রহণের দায়িত্বে থাকতেন। আগের দু'টি ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে এই ব্যবস্থা আগের দু'টি ব্যবস্থার থেকেই উন্নততর হয়ে উঠেছিল। জাতিগত আত্মীয়তাই তাদের নিজের নিজের প্রধানের প্রতি অনুগত করে তুলেছিল। এর ফলে, বড় ধরনের কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা সম্ভব হয়েছিল। অথচ দলপতিদের তরফ থেকে বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই ব্যবস্থায় অভিজাতদের দ্বারা নিযুক্ত বাহিনী এবং উপজাতীয় খাজনা আদায়ের স্থানে আসে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক সৈন্যবাহিনী। পরাক্রান্ত মুঘলেরা একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই তাঁরা আনুষ্ঠানিক আনুগত্যে আবদ্ধ ও পদোন্নতির আশায় আশান্বিত মনসবদারদের কাজে লাগাতে উৎসাহী ছিলেন। এসব ছাড়াও আপনা থেকেই এই ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা মনসবদারদের তরফ থেকে পূর্ণ আনুগত্যকে নিশ্চিত করেছিল। অন্যদিকে পদমর্যাদা, আয় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনিশ্চিয়তার ফলে, মনসবদারদের ব্যক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে বিশিষ্টতা লাভের অবিরল প্রচেষ্টা থাকত, যাতে রণদক্ষতা সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যায়। সেজন্য গঠনের শুরুর থেকেই লক্ষ্য রাখা হত কোন ইউনিট কোন কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং তাকে সেই কাজেই লাগান হত। এমনকী একটি ইউনিটের অপর একটি ইউনিটের বিরুদ্ধে কূটনৈতিকভাবে ব্যবহারও করা হত। মনসবদার শ্রেণীগুলির জাতিগত গঠনই ছিল বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বাধা। মধ্য এশিয়ার উজবেক, পারসিক, আফগানদের প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ছিল এবং রাজপুতরা তাদের বিরুদ্ধে এক ভারসাম্য রক্ষা করত। মনসবদাররা রাজকীয় বদান্যতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে একটি ন্যূনতম দক্ষতা, অনুশাসন ইত্যাদি বজায় রাখত। তাই আবদুল আজিজের

ভাষায় মনসবদারী সৈন্যবাহিনী অভিজাতশ্রেণী ও নাগরিক প্রশাসনের সব মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু কোনো পদই বংশানুক্রমিক ছিল না, সেহেতু এই জীবিকাটি সকলের সামনেই খোলা ছিল। এই ব্যবস্থায় গুণের কদর ছিল ও দক্ষতাকে উৎসাহ দেওয়া হত।

কিন্তু এই ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটিও ছিল। আকবর জাট-সওয়ার ব্যবস্থা, ঘোড়াকে চিহ্নিত করা বা সৈন্যতালিকা সম্বন্ধে বিশদ নিয়মবিধি চালু করেও অবাধ দুর্নীতিকে রোধ করতে পারেননি। সৈন্যতালিকাও ঘোড়ায় দাগ দেওয়া সত্ত্বেও খুব কম মনসবদারই বেতন অনুযায়ী যে সংখ্যক অশ্বারোহী রাখা উচিত সেই পরিমাণ অশ্বারোহী রাখতেন। মনসবদাররা প্রায়শই সম্রাটকে ঠকাতেন। চাষবাসের ক্ষেত্রেও জমা ও খরচের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। এর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জাগীরের অসম বন্টন আরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সমস্ত সম্পদ মাত্র কিছুসংখ্যক লোকের হাতেই পুঞ্জীভূত হয় ও অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। সৈন্যদলকে তাদের দলপ্রধানের মাধ্যমে বেতন দেবার প্রথা কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করতে বাধ্য ছিল। প্রায়ই দেখা যেত নির্দিষ্ট সৈন্যরা সম্রাটের তুলনায় তাদের অব্যবহিত প্রধানের কাছেই বরং বেশী অনুগত ছিল। মনসবদার ও তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে জাতিগত ও ব্যক্তিগত বন্ধন অনেকসময়ই সৈন্যবাহিনীর সংহতি এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। মনসবদারী ব্যবস্থায় কোন মৌলিক কেন্দ্র বা জাতীয় সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যা একান্ত জরুরী, সেই সংহতির অভাব ছিল। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, অনুশাসন কিংবা দক্ষতা—কোনো বিষয়েই কোনো সমতা ছিল না।

মনসবদারের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটায় অসন্তোষ ও অদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাঁচশো ও ৫০০০ এর মধ্যবর্তী মনসবদারের সংখ্যা আকবরের আমলে ছিল ২৪৯। জাহাঙ্গীরের আমলে তা বেড়ে হয় ৪৩৯ এবং শাহজাহানের আমলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬৩-তে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে, যাবতীয় মনসবদারের সংখ্যা হয়েছিল ১৪,৪৪৯। সৈন্যবাহিনীর তালিকায় এই ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি প্রচন্ড আর্থিক বোঝার সৃষ্টি করে। কিন্তু মূলতঃ এটি সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তার ও ক্রমাগতঃ যুদ্ধবিগ্রহে জমানোরই ফল। মনসবদারদের নিযুক্তি ও পদোন্নতি মূলতঃ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্বারাই নির্ধারিত হত। এম. ভি. পিয়ারসন মন্তব্য করেছেন "সম্রাট ও মনসবদারের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাকে পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্ক বলা যায়। এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব সম্রাটের ধনসম্পত্তির পরিমাণ ও ক্ষমতার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল এবং তা চিরস্থায়ী ছিল না। আকবর তাঁর নিজস্ব গুণাবলী ও যুদ্ধজয়ের দ্বারা মনসবদারদের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শাহজাহানের ব্যর্থতা আনুগত্যের সেই বাঁধনকে দুর্বল করে তুলেছিল। ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্য তৈরীর নীতি আবার গ্রহণ করলেও, দাক্ষিণাত্যে তাঁর ব্যর্থতা মনসবদারদের আনুগত্যে আরও ফাটল ধরায়।

মনসবদারেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকায় সর্বদাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজতে ব্যস্ত ছিল। নিজেদের পদোন্নতির জন্য তারা রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থও বলি দিতে প্রস্তুত ছিল। যেহেতু তাদের চাকরী ও সম্পত্তি সম্রাটের খেয়ালখুশীর ওপরেই নির্ভরশীল ছিল, তারা প্রত্যেকবার উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে জয়ী পক্ষে যোগদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। উন্নততর পদমর্যাদা ও লাভজনক জাগীর পাওয়ার জন্য মনসবদারদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত, তার ফলে ভাঙনের শক্তিগুলি জোরদার হয়ে উঠেছিল। জে. এফ. রিচার্ডস দেখিয়েছেন যে মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ার ফলে জাগীরের যে অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল, তা প্রধানতঃ ঔরঙ্গজেবই ঘটিয়েছিলেন। ঘুষ দেওয়া, মনসবের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি তখনকার দিনের প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক মনসবদারই দরবারে নিজের অবস্থা গোছাতে ব্যস্ত ছিল। এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে তুলেছিল, যদিও এই রাজনীতি কোনোদিনই সশস্ত্র লড়াই পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এটি মুখ্যতঃ দরবারের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত সীমিত ছিল। সম্রাট সমস্ত দলের মধ্যেই একটি ভারসাম্য বজায় রেখে নিজের সিংহাসন বাঁচাতে চাইতেন। কিন্তু এইভাবেই তাঁর নিজের অবস্থা দুর্বল হয়। নাগরিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত মনসবদারেরা, যাদের সামরিক বিষয়গুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা,

তারাও এই সমস্যায় জড়িয়ে গেছিলেন। তাঁরা সৈন্যদলের প্রশিক্ষণ বা তাদের মধ্যে পেশাদারী ব্যবস্থা আনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় দরবারের ছবি তাদের বিলাসব্যসনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল, যা সামরিক জীবনের পরিপন্থী ছিল। সতীশ চন্দ্র লিখেছেন, "প্রাপ্ত সামাজিক উদ্বৃত্ত শাসনের খরচ বহন করতে, এক বা অন্য প্রকারের যুদ্ধের ব্যয় চালাতে, শাসক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবন-প্রণালী বজায় রাখার পক্ষে অপর্যাপ্ত ছিল।" আথার আলির মতে, "বিলাসদ্রব্যের মূল্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বাড়তে শুরু করে। ইউরোপের বাজারে ব্যাপক চাহিদার ফলে সরবরাহ অনেকটা পশ্চিমমুখী হতে থাকে এবং ইরান, ভারতবর্ষে সেই কারণেই মূল্য বাড়ে।" উপরন্তু মনসবদারদের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়েনি।

মনসবদাররা কোনোদিনই রাজনৈতিক সুস্থিরতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারেননি, এবং কখনওই কোন স্বাধীন বংশানুক্রমিক আভিজাত শ্রেণী তুলতে পারেননি, যার অবস্থা ও সম্পদ প্রত্যেক প্রজন্মেই রাজার পছন্দের উপর নির্ভর করে থাকবে না। তারা এই কারণে কোনোদিনই রাজকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সাহসী প্রতিপক্ষ হবার সার্মথ্য পাননি। ইংল্যান্ডে বংশানুক্রমিক ব্যারনদের সুযোগসুবিধা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকারসমূহের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। মুঘল ব্যবস্থায় এরকম সুস্থ সাংবিধানিক বিকাশের কোনো জায়গাই ছিল না।

৪.২ সম্রাট ও শাসকগোষ্ঠী-ভূমি রাজস্ব বা জাব্‌ত ব্যবস্থা

মধ্যযুগে আমদানী-রপ্তানীর ওপর ধার্য শুল্ক, অন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের করব্যবস্থার থেকে আয় হত না। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। সে যুগে জনকল্যাণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের কোনো ধারণা না থাকায় এবং এগুলি একেবারেই আধুনিক ধারণা হওয়ায় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শাসিতের তুলনায় শাসকের স্বার্থই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং, কৃষকদের উপকারের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের ওপর রাজস্বের গুরুভার চাপাতে রাজা বিবেকের কোনো দংশন অনুভব করতেন না। আলা-উদ-দিন-খলজীর আমলে জমির সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা হিসাবে নির্ধারিত হয়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দিল্লীর সুলতান শাহীর যুগে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। জমি ও উৎপাদন পরিমাপের কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না এবং রাজস্ব আদায়ের ভার সামরিক প্রশাসক বা জাগীরদারদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এর ফলে শুধু প্রজাদের উপরেই যে শুধু দুর্বিসহ করের বোঝা চেপেছিল তাই নয়, রাষ্ট্রও এর যথাযোগ্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। সামরিক কর্মচারী বা জাগীরদার যারা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা যে পরিমাণ রাজস্ব মানুষের কাছ থেকে আদায় করতেন তা কখনই রাজকোষে জমা দিতেন না। এর ফলে সরকার নির্ধারিত অসহ্য করভারে মানুষের নাভিশ্বাস উঠলেও রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের কাছে ঠকে যেত এবং রাষ্ট্রের কোষাগারের অসম্ভব ক্ষতি হত। আরেকটি ত্রুটি ছিল এই যে, হিসাবের বা পরিমাপের ব্যবস্থা ছিল খেয়ালখুশিমত এবং কৃষকের কোনো ধারণা ছিল না যে ফসল তোলার পর ঠিক কতটা তাকে রাজস্ব দিতে হবে। শের শাহ্ প্রথম এই বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠে সুব্যবস্থার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং রাজস্বব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

প্রশাসনিক ইতিহাসের দলিলে বিচক্ষণ ও উপকারী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য শেরশাহের নাম সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ, যা ভবিষ্যতের কৃষি ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাঁর সংস্কার শুধুমাত্র যে রায়তদের পক্ষেই মঙ্গলকর হয়েছিল তাই নয়, রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়েছিল। শেরশাহ সরাসরি কৃষকের সাথেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র ভূমিব্যবস্থাকে তত্ত্বাবধানের সাহায্যে জরিপ করে, উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ অংশ রাষ্ট্রের অংশ বলে নির্ধারিত হয়। নগদে বা শস্যে রাজস্ব দেওয়া যেত। কিন্তু প্রথম ধরণটিই বেশী পছন্দসই ছিল। রায়তের স্বার্থরক্ষার্থে বন্দোবস্তের একটি রেকর্ড রাখা হত। সরকার কৃষকের কাছ থেকে

একটি চুক্তিপত্র পেত (কবুলিয়াৎ) এবং কৃষক একটি স্বত্বাধিকারপত্র (পাট্টা) পেত। রাষ্ট্রের কর্মচারীরা কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন কিন্তু কৃষকেরা সরাসরি পরগণার কোষাগারেও তাঁর দেয় জমা দিতে পারত। শের শাহ সঠিক সময়ে রাজস্বের পুরোটাই জমা দেবার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি কর্মচারীদের প্রাপ্য রাজস্ব হিসাব করার সময় কোমল এবং কর আদায়ের সময় কঠোর হবার নির্দেশ দেন। কিন্তু শেরশাহের রাজস্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর অধিকাংশ ভাল কাজই তাঁর আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে দুর্বল প্রশাসন এবং পরবর্তীকালে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

যখন হুমায়ুন তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন, তখন তিনি দেখেন যে সাম্রাজ্যের জমি "খালসা" এবং "জাগির" এই দুই ভাগে বিভক্ত। অভিজাত এবং আমিররা জাগির প্রথায় জমির মালিকানার জন্য সরকারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিত এবং পরিবর্তে যত খুশী টাকা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত। "খালসা" জমি সরকারের ছিল এবং তা থেকে আলাদা শস্যের জন্য আলাদা রাজস্ব আদায় করত। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লেখেন, "সাম্রাজ্য যেহেতু ছোট ছিল এবং সমস্যাও সহজ ধরনের ছিল, তাই কোনও অসুবিধা অনুভূত হয়নি।"

আকবরের অভিষেক ভারতের ইতিহাসে এক সদাশয় স্বৈরতন্ত্রের যুগের সূচনা করে। সম্রাট জনগণের কল্যাণের বিষয়ে ব্যগ্র ছিলেন। নিজের রাজত্ব সুদৃঢ় করার পর তিনি প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। রাজস্ব বিভাগ তাঁর অগ্রাধিকার লাভ করে। রাজা টোডরমলের সাহায্যে মুজাফফর খাঁ ঘুরবাতি ১৫৭০-৭১ সালে রাজস্বের সমস্ত পদ্ধতির পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। সত্যিকারের আদায়ের ভিত্তিতে বর্তমান রাজস্বের পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জমির সঠিক চরিত্র এবং সঠিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ স্থির করার জন্য স্থানীয় কানুনগোদের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হিসাব সাম্রাজ্যের রাজধানীতে দশজন উর্দ্ধতন কানুনগো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন। এরা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম উজবেক বিদ্রোহের জন্য পন্ড হয়ে যায়। গুজরাট বিজয়ের পর টোডরমল জমির সঠিক পরিমাপ করান এবং জমির পরিমাপ ও গুণের ভিত্তিতে রাজস্বের হিসাব নির্ণয় করেন। ১৫৭৫-৭৬ সালে আকবর রাজস্ব প্রশাসনে আর একবার পরীক্ষা চালান। বাংলা, বিহার ও গুজরাট বাদে সমস্ত সাম্রাজ্য ১৮২টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ থেকে এক কোটি টঙ্কা (২৫০,০০০) রাজস্ব আশা করা হত। প্রত্যেকটি ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী পদাধিকারীর পদের নাম ছিল "ক্রোরিস"। শীঘ্রই তারা লোভী এবং দুর্নীতি- পরায়ণ হয়ে ওঠায় এই পদ্ধতি মসৃণভাবে কাজ করতে পারে নি। ক্রোরী পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পুরানো খাজনার বিভাগ চালু করা হলেও পরবর্তি সময়ে জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের আমলেও ক্রোরি পদবীর ব্যবহার দেখা যায়।

১৫৮২ সালে টোডরমল দিওয়ান-ই-আশ্রাফ নিয়োগ করেন। স্ট্যানলি লেনেপুলে লেখেন, "মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত টোডরমলের চেয়ে প্রসিদ্ধ কোনও নাম ছিল না এবং এর কারণ ছিল আকবরের সংস্কারের আর কোনও দিক জনগণের কল্যাণের এত কাছে পৌঁছাতে পারে নি যা রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে পেরেছিল। এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অহেতুক ভারাক্রান্ত না করে এমন একটি সঠিক রাজস্ব নিরুপণ করা যা সরকারী প্রশাসনকে ভালভাবে চালু রাখবে।" এতদিন বাৎসরিক উৎপাদন বর্তমান বাজার দর ভিত্তি করে রাজস্বের হিসাব হত। ফলে রাজ্যের দাবী প্রতিবছর আলাদা হত। রাজস্ব আদায়কারীরা রাজধানী থেকে যতদিন নির্ধারিত খাজনা ঘোষণা না করত ততদিন রাজস্ব আদায় করতে পারত না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য টোডরমল অনেকগুলি সংস্কারের সূচনা করেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঃ (ক) জমির মাপ, (খ) জমির শ্রেণী নির্ণয়, (গ) রাজস্ব নির্ধারণ। রাজস্বের প্রতিবছর ওঠানামা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি "দশ শালা (দশ বছর)" রাজস্ব হার চালু করেন। সৎ এবং বিশ্বস্ত মানুষদের পূর্বতন পাঁচবছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এবং পাঁচ বছরের সত্যকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাপ বিচার করে দশ বছরের (১৫৭০-৭১ থেকে ১৫৭৯-৮০) গড় রাজস্ব আদায় শুরু হয়। যত্ন করে জমির মাপ হয়। এই কাজে পূর্বে শনের দড়ি ব্যবহার করা হত। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে এই দড়ির মাপের পরিবর্তন

হত। ভেজা আবহাওয়ায় এর দৈর্ঘ সঙ্কুচিত এবং শুকনো আবহাওয়ায়-এর দৈর্ঘ প্রসারিত হত। টোডরমল ৩৩ ইঞ্চি মাপের "ইলাহি গজ" ব্যবহার শুরু করেন। এগুলি তানাব (তাবুর দড়ি) অথবা জারির (শৃঙ্খল) বা লোহার বলয় দ্বারা সংযুক্ত বাঁশ দ্বারা তৈরী হত।

চাষের ধারাবাহিকতা অথবা অবচ্ছিন্নতার উপর ভিত্তি করে জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ (১) পোলাজ-বাৎসরিকভাবে ধারাবাহিক চাষ করার উপযুক্ত, (২) পারাউতি, যে জমি এক বা দুই বছর অনাবাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে, (৩) চাষের—জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে জমি দু-এক বছর ফেলে রাখা হয়েছে (৪) বানজার—যে জমি পাঁচ বা ততোধিক বছর অনাবাদি রয়েছে। প্রথম তিন শ্রেণীভুক্ত জমিকে তিনটি ক্রমে ভাগ করা হয়—উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে ভাল, মধ্যম ও খারাপ। তিনটিরই গড় উৎপাদনের হিসাব নিয়ে রাজস্ব নির্ধারিত হত। শুধুমাত্র যতটা জমি চাষ করা হয়েছে তা হিসাব করে উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে রাজ্য দাবী করত। সরকারী আধিকারিকরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন প্রদেশে মূল্যের প্রভেদের জন্য বিভিন্ন রাজস্ব হার নির্ধারণ করত। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, "যথাকালে একদল সরকারী কর্মচারী শস্যের হিসাব তৈরীর জন্য কতটা জমি চাষ হয়েছে, তা দেখার জন্য গ্রামে যেত। প্রত্যেক মালিকানার প্রত্যেক শস্য দেখে বিটিকচি হার নির্দিষ্ট করত এবং চাষীর সরকারকে রাজস্ব দেবার পরিমাণ বলা হত।" এটিকে "জাবতি" ব্যবস্থা বলা হত এবং এটি আগ্রা, এলাহাবাদ, বিহার, দিল্লী, লাহোর, মালওয়া, মুলতান, অযোধ্যা এবং আজমীর ও গুজরাটের কিছু অংশে চালু ছিল।

একই সাথে আরও দু'টি পদ্ধতি চালু ছিল। সেগুলি হল ধলাবক্স এবং নাসাক্। ধলাবক্স সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজস্ব হিসাবের পদ্ধতি ছিল যাতে শস্যের একটি ভাগ শাসক নিতেন। এটি সিন্ধুতে এবং কাশ্মীর ও কাবুলে আংশিকভাবে প্রচলিত ছিল। নাসাক পদ্ধতিও হিসাবের জন্য বহুল প্রচারিত এবং পুরানো ছিল। ডাঃ ত্রিপাঠীকে উদ্ধৃত করলে—এতে জমির মাপজোক বা শস্যের শ্রেণী বিভাগ না করে সম্ভবত জমির মালিক এবং সরকারের মধ্যে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত কায়দায় একটি রাজস্বের চুক্তি হত।" এই পদ্ধতি বাংলা ও গুজরাটের কিছু অংশে চালু ছিল।

প্রফেসর আর. এস. শর্মা লেখেন যে নতুন বন্দোবস্তের গুণ এর সঠিক হিসাব, যা নাকি খুবই সযত্নে করা নিখুঁত জরিপের উপর নির্ভরশীল ছিল। একর প্রতি উৎপাদনের ভিন্নিতে জমিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা এবং চাষের ধারাবাহিকতার বিচারে জমিকে ভাগ করার নীতিটি প্রচলিত নীতির চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ছিল। এই নতুন পদ্ধতির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এর স্থায়ীত্ব যেহেতু এই পদ্ধতির জন্য কোনও সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়নি। শের শার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে আকবর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটান।

খাজনা আদায়কারীদের প্রতি সম্রাটের বিশেষ নির্দেশাবলী এবং চাষীদের কল্যাণের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তারা বলেছিলেন "রায়তদের চাষবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ যোগাও এবং সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাদের চাষ করতে দাও।" তাদের সব চুষে নিও না কারণ রায়তরা স্থায়ী। খরা দেখা দিলে কৃষকদের অগ্রিম দেওয়া হত, ত্রাণ দেওয়ার জন্য সরকারী কাজ শুরু করা হত। কৃষককে তার দেয় খাজনা নগদে বা বস্তু দিয়ে, এমনকি নিজে সরকারী কোষাগারে গিয়ে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ ত্রিপাঠী লেখেন যে রাজস্ব আদায়কারীকে কোষাগারে রায়তের রাজস্ব দেবার দিন নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য এবং কোষাধ্যক্ষকে রায়তদের প্রতিটি খাজনা আদায়ের রসিদ দেবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

৪.৩ সমালোচনা ও উপসংহার

আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রায় সব ঐতিহাসিকই প্রশংসা করেছেন। যতক্ষণ সম্রাট শক্তিশালী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন কার্যকরী থাকত ততদিন এই নীতি ভালভাবে কাজ করত। ভাবনা ও তার প্রয়োগের মধ্যে খুব কমই ভেদ থাকত,"

যা আবুল ফজল আইনি আকবরিতে বলেছেন। কালক্রমে প্রশাসনের মান খারাপ হওয়ায় এই ভেদবাড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কাজেই সরকারী আধিকারিকরা রায়তের প্রতি সবসময় যত্নশীল থাকার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। স্যার যদুনাথ সরকার লেখেন, "সরকার এবং রায়তের মধ্যে বিবাদ সবসময় রাজস্ব আদায় নিয়ে হত এবং বাকী খাজনা খুব কম সময়েই আদায় হত। বাকী খাজনা আদায়ের নাম করে রায়তের কাছ থেকে তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম বস্তু বাদ দিয়ে সব হরণ করাই ছিল এই অনৈতিক চক্রের অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ।" দ্বিতীয়ত মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব এক যথেষ্ট বোঝা ছিল এবং তা প্রচলিত হিন্দু আইন রীতিতে নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ থেকে অনেক বেশী ছিল। যখন আমরা বুঝতে পারি যে সরকার কৃষকদের সাহায্যের জন্য বাস্তবিক পক্ষে কিছুই করত না তখন আমাদের কাছে এটি খুব অত্যাচার মনে হয়। এডওয়ার্ড এবং গ্যারেট লেখেন যে—আকবরের সময়েও রায়ত পারিপার্শ্বিক থেকে খুব কমই সাহায্য পেত। উৎপাদিত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করার সুবিধার অভাব ছিল। সমাজ সামগ্রিকভাবে চাষের উন্নতির জন্য কিছুই করত না। দুর্ভিক্ষের সময় কোনও সাহায্য ছাড়া কৃষক একাই বোঝা বহন করত। হয়ত রাষ্ট্র তার দাবী কিছু কমাত। পরে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকের একটি আদেশ প্রমাণ করে যে আধিকারিক এবং জায়গিরদাররা রায়তের জমি দখল করে নিত এবং নিজেরা চাষ করত। প্রশাসন নিজের প্রয়োজনে অথবা অন্যলোককে দেবার জন্য রায়তকে তার অধিকারের জমি প্রত্যেকবার বদল করতে বাধ্য করত। এইভাবে রায়ত তার দখলী সম্পত্তিতে কোনও স্থায়ী মালিকানা তো হত ভোগ করতনা এবং ফলে কোনরকম উদ্যম দেখান না"

মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এখনও এমন কোনো পথ বা পন্থা আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা কোনো বিভাগের নিখুঁত প্রশাসন সম্ভব। আমরা যদি আধুনিক মাপকাঠির সাহায্যে মধ্যযুগীয় শাসকদের বিচার করতে যাই আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতিত্বকে খাটো করব। আকবরের সময়ের সাপেক্ষে তাঁর রাজস্ব প্রশাসন ছিল অসাধারণ। ডঃ স্মিথের মত একজন সমালোচকও বলেছেন "সংক্ষেপে বলা যায় এই ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়। নীতিগুলি ছিল যথাযথ এবং আধিকারিকদের দেওয়া নির্দেশগুলিতে যা যা বাঞ্ছনীয়, সেই সব কিছুকেই অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল।

৪.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

দিল্লী সুলতানশাহীর আমলে সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুলিকে কোন নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ভাগ করা হয়নি। ইক্তার অধিকারী মাক্তিরা প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং আশা করা হত যে তারা ভূমি রাজস্ব আদায় করতে ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। স্থায়ী প্রশাসনের যন্ত্রটি ছিল সরকার।

আকবর এই ব্যবস্থাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫৮০ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। ১৫৮০ সালে এই সাম্রাজ্য যা ততদিনে গুজরাট, বাংলা, বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তাকে ১২টি সুবাহ্, বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। সুবাহ্র শাসনতান্ত্রিক প্রধানকে বলা হত সিপাহসালার বা সেনাপতি, যদিও শেষদিকে সুবাদার বলার প্রচলন দেখা দেয়। সুবাহ্র প্রধান বা রাজ্যপালকে দিওয়ান, বক্সী, কাজী, বিচারের জন্য মীর-আদল, একজন কোতোয়াল, একজন মির বাহ্র বা নদীগুলির ও বন্দরের তত্ত্বধায়ক ও একজন ওয়াকিয়া নবিস বা বার্তালেখক সাহায্য করতেন। এই কর্মচারীরা রাজ্যপালের অধীনস্থ হলেও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হতেন না। এরা সরাসরিভাবে সম্রাটের দ্বারাই নিযুক্ত হতেন এবং তাঁকেই কৈফিয়ৎ দিতেন এবং তাঁদের মন্ত্রকের প্রধানকেও কৈফিয়ৎ দিতেন। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রেও মেনে চলা হত।

আকবরের অধীনে, শেষের দিকে বিজিত ওড়িশাকে বাংলার এবং কাশ্মীরকে কাবুল সুবার অর্ন্তভুক্ত করা হয়। আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা চারটি প্রদেশ গঠন করেছিল। যথা এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা এবং দিল্লী। পরের

দিকে সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলে, আরও তিনটি প্রদেশ খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগর সৃষ্টি করা হয়। এই প্রদেশগুলোকে একজন রাজপ্রতিনিধির অধীনে স্থাপন করা হয়। এই রাজপ্রতিনিধি প্রায়শই কোনো রাজপুত্র হতেন।

১৫৮৬ সালে পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসাবে আকবর প্রত্যেক প্রদেশে দু'জন শাসনকর্তা নিয়োগ করা স্থির করেন। আবুল ফজলের মতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে একজন শাসনকর্তা বিব্রত না হয়। হয়তো, সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসনকর্তাদের ক্ষমতার একটি উর্ধ্বসীমা বজায় রাখা। কিন্তু এর ফলে অপ্রয়োজনীয় রাগারাগির সৃষ্টি হয় এবং এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়।

আইন-ই আকবরীতে প্রত্যেকটি সুবার ভৌগোলিক সীমারেখা, জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সাধারণ পরিস্থিতি, উৎপাদিত সামগ্রী, ইতিহাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি প্রদেশকে সরকারও পরগণায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি সরকারের হিসাব করা আয়, জমিদারদের কি শ্রেণী, তাঁর অধীনে কত সৈন্য আছে ইত্যাদিও নথিভুক্ত করা আছে আইন-ই-আকবরীতে। এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ স্বশাসিত রাজাদের অঞ্চলকে রাজ্য হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়নি, বরং তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিকে সুবা, সরকার বা পরগণার অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এইভাবেই মেবারকে চিতোর সরকারের অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং জয়পুর আজমীর সরকারের অধীনে একটি পরগণায় পরিণত হয়। এই সমস্ত সুবাহগুলির আয়তন, নির্ধারিত আয় ইত্যাদির এক বিশাল ব্যাপ্তি ছিল। বাংলা সুবার অধীনে চব্বিশটি সরকার ছিল ও বাংলার নির্ধারিত আয় ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মূলতানের অধীনে তিনটি সরকারের মোট নির্ধারিত আয় ছিল মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা। অন্যান্য প্রদেশগুলির আয় এই দুই চরম সীমার মধ্যেই অবস্থান করত।

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ছিলেন সম্রাটের বদলে কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঐ শাসনকর্তারা প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁদের নিযুক্তিপত্র থেকে জানা যায় যে প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব, সাধারণ শাসনভার, তথা সুবার জনসাধারণের কল্যাণ ও অগ্রগতির দায়িত্ব ছিল এদের হাতে। বিদ্রোহী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিরাজস্ব আদায় করার কাজে প্রাদেশিক শাসনকর্তা দিওয়ানকে সাহায্য করতেন। এছাড়াও দিওয়ানের কৃষির প্রসারের কাজ, জলাধার, কূপ, জলবাহিকা, বাগান, সরাইখানা ও নাগরিকদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ ও কোনো কিছু সারাইয়ের কাজকর্মের ব্যাপারেও তাঁকে সাহায্য করতে হত। তাঁর উপরে ফৌজদারী বিচারের সুষ্ঠ সমাধানের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু কাউকে প্রাণদন্ড দেবার পূর্বে তাঁকে চূড়ান্ত বিবেচনা করতে হত। তাঁকে সারা প্রদেশ জুড়ে ভ্রমণ করবার কথা বলা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি বিশ্বাসী গুপ্তচর ও সংবাদলেখকদের মাধ্যমে রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন। লক্ষ্যণীয় যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কারুর ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। শাসক সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে রাজকেরা আদায় করার দায়িত্বে ছিলেন। এদের কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল ছিল না কিন্তু এদের প্রায়শই বদলী করা হত।

সুবার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন দিওয়ান। প্রথমদিকে যদিও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দিওয়ান নিযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু ১৫৯৫ এর পর থেকে সম্ভবতঃ প্রধান দেওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী তারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিযুক্ত হতেন। এরপর থেকে দেওয়ান প্রাদেশিক শাসকের অধীনস্থ কর্মচারী রইলেন না, এবার থেকে তিনি সহকর্মী হলেন। অবশ্য প্রাদেশিক শাসক তবুও প্রশাসনের প্রধানই রইলেন। আবুল ফজল দেওয়ানের কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো তথ্য দেননি। কিন্তু পরের দিকের তথ্য থেকে জানা যায় প্রাদেশিক দেওয়ানরা কেন্দ্রীয় দেওয়ানের কাছে আর্থিক ব্যাপারে ও টাকাকড়ির হিসাবের পাক্ষিক বিবরণ, দাখিল করতেন। তিনি ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন এবং অন্যান্য কর আদায়, তার হিসাব ও তার বন্টন সুষ্ঠুভাবে সারার দায়িত্বে ছিলেন। দেওয়ানের অপর একটি মুখ্য দায়িত্ব ছিল কৃষির প্রসার ও উন্নতি ঘটান। একাজে আমিল তাঁকে সাহায্য করতেন। অবশ্য দেওয়ান আমিলের যে কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দিতেন এবং আমিলের কাজকর্মের তত্ত্বধান করতেন। তিনি দাতব্য উদ্দেশ্যে দেয় ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ

করতেন। সুবায় বক্‌শী ও সদর এর কাজকর্ম কেন্দ্রে তাদের মন্ত্রকের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল। বক্‌শীকে অনেক সময় গুপ্তচর বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করতে হত। এর ফলে অনেক সময়ই তার প্রাদেশিক শাসনকর্তার সঙ্গে সংঘর্ষ লাগত। কেননা, শাসনকর্তার অন্যায় আচরণ নিয়ে তাকে প্রায়ই দরবারে অভিযোগ জানাতে হত। সদ্‌র ধর্মীয় অনুদানগুলির সুপারিশ জানাতেন এবং বিচারবিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। আকবর কাজীদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুতরাং তিনি প্রদেশে বিচার-বিভাগের কর্মচারী হিসাবে মীর-আদ্‌লদের নিযুক্ত করেন। কাজীদের এদের অধীনে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করতে হত।

নগরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিল কোতওয়াল। তাকে শহরের সাধারণ সুযোগসুবিধা যেমন ওজনের সঠিক মাপ ও অন্যান্য মাপ ঠিক রাখা, জুয়া খেলা নিয়ন্ত্রণ করা ও বেশ্যাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হত।

প্রদেশের শাসনকর্তারা একটি দলের প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। কর্মচারীরা প্রত্যেকেই নিজেদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন ও কেন্দ্রে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন। ফলে শাসনকর্তাদের তরফ থেকে কৌশল ও দক্ষতা ছাড়া এদের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হত না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের এই নীতি তখনই কার্যকর হত যখন কেন্দ্রে একজন সক্ষম সম্রাট এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একগুচ্ছ দক্ষ কর্মচারী অধিষ্ঠিত থাকতেন। সাংবাদিক-গুপ্তচর প্রমুখের সাহায্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাজকর্মের ওপর আকবরের কড়া নজর রাখার নীতি, ব্যাপক ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা অবহিত হওয়া, অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ রোধ করার পক্ষে কার্যকরী হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্রাট প্রাদেশিক বা স্থানীয় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগের তদন্তের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন।

এইভাবে আকবর এমন একটি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রের মধ্যে একটি যোগাযোগ সূত্র হিসাবে গড়ে উঠবে ও কেন্দ্রে তথ্য পাঠানোর কাজ করবে।

৪.৫ অনুশীলনী

১. তুমি কি বাবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে কর?

২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এটি কিভাবে ভারতবর্ষের সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তন করেছিল?

৩. সাম্রাজ্য স্থপতি নয় বরং একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন বাবর। এই মত আলোচনা কর।

৪. ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বাবরের স্মৃতিকথার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫. "বাবরের স্মৃতিকথা ভারতবর্ষ ও তার মানুষদের সঠিক চিত্র অঙ্কন করেনি।" তুমি কি এই বক্তব্যকে সমর্থন কর?

৬. কেন এবং কিভাবে আকবর সুলহ্-ই-কুলের বিশ্বাসী হয়ে পড়েন? এই নতুন ধর্মমত ইসলাম ও তৎকালীন রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৭. বাবরের ভারত আক্রমণের পূর্বে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? বাবর সেই অবস্থা কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন?

৮. হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে সংঘর্ষ আলোচনা কর। শের শাহ্ কেন সফল হয়েছিলেন?

৯. তুমি কি এই মত সমর্থন কর যে হুমায়ুনের সবচেয়ে শত্রু তাঁর নিজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল?

১০. আকবর তাঁর চরম শাসনের মধ্যে কিভাবে উত্তর ভারতের শাসক শ্রেণীকে খাপ খাইয়েছিলেন?

১১. সুলহ্-ই-কুলের প্রতি বিশেষ উল্লেখ সহ আকবরের ধর্মনীতি বিশ্লেষণ কর।

১২. একজন শাসক ও বিশ্বাসী হিসাবে আকবরের দর্শন ব্যাখ্যা কর। তিনি কি ইসলামকে ধ্বংস করেছিলেন?

১৩. আকবরের ধর্মনীতিকে আকার দিতে রাজনীতি কি ভূমিকা নিয়েছিল?

১৪. জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের ওপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। এই সময়ে নূরজাহান কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?

১৫. শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল যুগের সুবর্ণযুগ ছিল—ব্যাখ্যা কর।

১৬. "প্রস্তর স্থাপত্যকীর্তির কিছু নির্দশন ছাড়া শাহজাহানের রাজত্বের সবকিছুই ছিল নএগ্রর্থক।" তুমি কি এই মতকে সমর্থন কর?

১৭. আকবরের রাজপুত নীতি সূক্ষ্মভাবে বিচার কর। এটি কিভাবে সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্য (pax Mughalica) গঠন করতে সাহায্য করেছিল?

১৮. মনসবদারী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলি কি ছিল?

১৯. মুঘল সাম্রাজ্যকে এর সৈন্যবাহিনী ও মনসবদারদের ছাড়া গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তুমি কি সমর্থন কর?

২০. জাব্‌ত ব্যবস্থার একটি সমালোচনামূলক বিবরণ দাও। এই ব্যবস্থা কিভাবে শেরশাহের সংস্কার সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

২১. তুমি কি মনে কর মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীলতা দান করেছিল?

২২. মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. A.C. Banerjee – New History of Medieval India
2. A.L. Srivastava –The Mughal Empire.
3. Iswari Prasad – Medieval India
4. R.P. Tripathi–Rise and Fall of the Mughal Empire.
5. Stanley Lanepool–Babar.
6. The Cambridge History of India Vol.–IV
7. A.S. Beveridge–Memories of Babar Vol.–I & II.
8. Iswari Prasad–The Life and Times of Humayun
9. I. Prasad–A short History of Muslim Rule in India.
10. V.A. Smith–Akbar the great.
11. Douglas E. Strensand–The formation of the Mughal Empire.
12. E. Vanina
13. Irfran Habib ed–Akbar and his India
14. Muzaffar Alam ed.–The Mughal Empire.
15. Rushebrooke W; Uiams–An Empire Builder of the Sixteenth Century.
16. Ibu Hasan–The Central Structure of the Mughal Empire.
17. R.P. Tripathi–Some aspects of Mughal administration.
18. Beni Prasad–History of Jahangir.
19. Rogers and Beveridge–Mendirs of Jahangir.
20. J.N. Sarkar–Mughal Administration.

21. A. Aziz–The Mansabdari System and the Mughal Army.
22. I.H. Qureshi–The Administration of the Mughal Empire.
23. B.P. Saksena–History of Shah Jahan.
24. P. Saran–The Provincial government of the Mughals.
25. W.H. More land–Agrarian system of Moslim India.
26. Raidhey Shyam –Babar.
27. Irpan Habib –Agrarian System of Mughal India.
28. Irfan Habib–Essays in Indian History.

একক ৫ ❑ মুঘল শাসননীতির সংকট

৫.০ প্রস্তাবনা

৫.১ শাজাহানের পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ

৫.২ আওরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের বিস্তার। সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক সমস্যা ঃ রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য

৫.৩ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য সমস্যা

৫.০ প্রস্তাবনা

আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা বিশেষ করে আকবরের পরবর্তী যুগের কথা, মুঘল শহরের শ্রেণীবিন্যাস, নগরজীবন যা কিনা দেশের অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল জানতে পারি।

৫.১ স্বৈরতন্ত্রের সঙ্কট ঃ শাজাহানের পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ

১৬৫৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শাজাহান হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছরোগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। রাজবৈদ্যদের দিবারাত্রির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসুখ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যা এত বাড়ে যে সম্রাট শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং রাজদরবারে আসতে অসমর্থ হন। লোকচক্ষুর সামনে থেকে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং জনগণ উদগ্রীব হয় পরবর্তী সম্রাট কে হবে তা জানার জন্য। মুঘলদের জ্যেষ্ঠ সন্তানের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন বা প্রথা ছিল না এবং যখনই সিংহাসন শূন্য হত, শক্তির দ্বারা সে বিষয়টির মীমাংসা হত। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আইন অনুসারে সম্রাটের বৈধ সন্তানরা শুধু নয়, উপপত্নীদের সন্তানরাও রাজা হতে পারত। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান, প্রত্যেককেই সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শাজাহানের হঠাৎ অসুস্থতার ফলে তাঁর চার সন্তানের মধ্যে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অবশ্য, সবক্ষেত্রেই ন্যায্য প্রার্থী যুদ্ধে জয়ী হয়ে সিংহাসন অধিকার করত না, কিন্তু তার জয় তাকে একজন নিপুণ সৈনাধক্ষ্য এবং উন্নততর সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রমাণ করত।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে মুখ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল শাজাহানের চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের, যদিও সম্রাটের দুই কন্যা জাহানারা এবং রোশনারা যথাক্রমে দারা এবং আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেছিল। প্রত্যেক দাবীদারই পরিণতবয়স্ক ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে স্বাধীন শাসনকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় এবং প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। দারার বয়স ছিল ৪৩, সুজার ৪১, আওরঙ্গজেবের ৩৯ এবং মুরাদের ৩৩। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ছিলেন সমন্বয়বাদী উদারপন্থী এবং শিক্ষানুরাগী— যে গুণগুলি ভারতের মত এক বিশাল দেশের সম্রাটের পক্ষে মানানসই। তিনি নিয়মিতভাবে মুসলিম সুফী, হিন্দু বেদান্তবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সমান উৎসাহ নিয়ে তালমাদ এবং নিউ টেস্টামেন্টের নীতিকথা শুনতেন। তাঁর উদ্যোগে উপনিষদ এবং অথর্ববেদের অনুবাদ করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতাদর্শগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। এজন্য, স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমধর্মাবলম্বীদের ক্রোধ এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হন, যারা

আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করে। কিন্তু এই ঘটনা দারাকে সব ধর্মের সহাবস্থানের নীতি প্রচারের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি সম্রাটের সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল শাহ্ বুলন্দ ইকবাল এবং তিনি অভূতপূর্বভাবে ৪০ হাজার অশ্বের ভারপ্রাপ্ত মনসবদার ছিলেন। রাজসভায় তিনি সিংহাসনের কাছেই একটি সোনার আসনে বসতেন এবং পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্রাটের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য দারার মধ্যস্থতার প্রয়োজন হত। শাজাহান দারার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বই শুধু প্রকাশ করেন নি, তাঁর অসুস্থতার সময়ে তিনি প্রধান অভিজাতদের এবং রাজকর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং ভবিষ্যৎ সম্রাট হিসেবে দারাকে মেনে চলার। পিতার অসুস্থতার সময়ে দারা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করেন। দারা এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, মূলতানের মত সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে। কিন্তু তিনি কখনই প্রদেশগুলির প্রশাসনিক কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতেন না, যার ফলে স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি কখনই সফলভাবে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা না করা সেনাধক্ষ্য হিসেবে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। রাজধানীতে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করার দরুণ তাঁর মধ্যে কিছু দুর্বলতা জন্মায়। তিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয়, উদ্ধত, চাটুকারিতভক্ত এবং সম্পূর্ণ বাস্তববোধহীন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ লিখেছেন যে সম্মুখযুদ্ধে আওরঙ্গজেবের মত যোদ্ধা এবং কূটনীতিবিদের বিরুদ্ধে সফল হবার কোন সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না।

শাহ্জানের দ্বিতীয়পুত্র সুজা বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধি, সুরুচি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট সাহস, বীরত্ব ছিল এবং তিনি দক্ষ সৈন্য ছিলেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে তাঁর বিলাসপ্রিয়তা, বাংলার সহজ প্রশাসন, এবং প্রায় ১৭ বছর সেই পৌরুষহীন, দুর্বল দেশে বসবাস তাঁকে দুর্বল, আরামপ্রিয়, অসতর্ক করে তুলেছিল। কঠোর পরিশ্রম, ক্রমাগত সতর্ক প্রহরার তিনি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর রাজ্যে প্রশাসনিক শৈথিল্য দেখা যায়, তাঁর সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং প্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগে অকর্মণ্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মুরাদ গুজরাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগপ্রবণতা এবং অপরিণামদর্শিতা। একজন সাহসী সৈন্য হওয়া সত্ত্বেও সফল সেনানায়ক হবার দক্ষতা তাঁর ছিল না। ডঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন যে সাহসী, দানশীল হওয়া সত্ত্বেও মুরাদ ছিলেন বিলাসপ্রিয়, অসংযত এবং উদাসীন প্রকৃতির। এসবের সঙ্গে তিনি ছিলেন নির্বোধ, দূরদৃষ্টিহীন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা ছিল তাঁর স্বভাবের অঙ্গ। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অল্প এবং তিনি জ্ঞানলাভের কোন চেষ্টা করেন নি। আত্মতুষ্ট, স্বার্থপর, বিবাদপ্রিয় এবং একগুঁয়ে মনোভাবাপন্ন মুরাদ শাসনভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।

যোগ্যতমের উদ্বর্তনই যদি জীবনের নিয়ম হয়, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন আওরঙ্গজেব, যিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তাঁর ছিল সাহস, অটল সংকল্প এবং কূটনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে গভীর দক্ষতা। যুদ্ধের নীতি এবং শান্তির শর্তের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সেনাধক্ষ্য এবং প্রশাসক হিসেবে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভা এবং দক্ষতার প্রমাণ দেন। আরভিন লিখেছিলেন যে তাঁর সরল এবং পরিশ্রমবহুল জীবনে তিনি কখনোই অবসর উপভোগ করেননি। তিনি সেসব বিরল লোকেদের মধ্যে অন্যতম, যারা ভাবে তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা কাজগুলিও ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। একজন নিষ্ঠাবান এবং উৎসাহী সুন্নী মুসলমান হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সনাতন ও নীতিবাগীশ। একারণে তিনি ধর্মান্ধ উলেমা এবং অভিজাতদের সমর্থন লাভ করেন। ডঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন যে এই বৈশিষ্ট্য আওরঙ্গজেবের সামর্থ ও দুর্বলতা উভয়েরই কারণ হয়। এটি তাঁর আদর্শ ও পরিকল্পনাকে স্থিরতা দেয়, দৃঢ় বিশ্বাস এবং অনাড়ম্বর চরিত্র থেকে উদ্ভূত শক্তি যোগায়, উৎসাহ দেয় এবং লক্ষ্যে স্থির থাকা ও লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে, এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য একমুখিতা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভুল ধারণার জন্ম দেয়। একজন শাসকের এই মানসিকতা পরধর্মবিদ্বেষ এবং ধর্মান্ধতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের জন্ম দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিজের ধর্ম ছাড়া অন্যের ধর্মকে

ঘৃণা করার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে এবং আওরঙ্গজেব সুবিচারক হবার পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়েন। এর ফলে আওরঙ্গ জেবের পক্ষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যাচারের নীতি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। এভাবে রাষ্ট্রের মূল কাঠামো ভেঙে পড়ে। এধরনের কাজের পেছনে ছিল আওরঙ্গজেবের ধারণা যে তিনি ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত এবং জাগতিক বাস্তববোধ তাঁকে তাঁর ভ্রান্ত পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

যদি আমরা রাজপুত্রদের চরিত্র বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে চতুর্মুখী সংগ্রাম হল উদারনীতি, সনাতনপন্থা, বিলাসপ্রিয়তা এবং অপরিরামদর্শিতার মধ্যে সংগ্রামের প্রতীক যাতে সনাতনপন্থার জয় হয়। দারা প্রগতিশীলতা এবং ভবিষ্যতের প্রতিনিধি ছিলেন এবং আওরঙ্গজেব ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ধর্মান্ধতার পূজারী। এসব বিশ্লেষণ অবশ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে কারণ তরবারিই মুঘল সিংহাসনের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

রণক্ষেত্রে কোন নীতি বা বিশ্বাসই একজন রাজপুত্রকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিল না। উন্নত রণকৌশল এবং দক্ষ সেনানায়কই যুদ্ধে জয়লাভের সহায়ক হয়। সেনাধ্যক্ষরা, এমনকি রাজপুত নেতারাও অতি সহজে পরাজিত দলের থেকে বিজয়ী দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের পরিবর্তন করতেন, যেখানে ধর্মীয় বিভেদের কোন ভূমিকা ছিল না। হিন্দু অভিজাতরা এবং সাধারণ মানুষ কেউই ভাবতে পারেনি যে আওরঙ্গজেব মুঘল সিংহাসন দখল করার ফলে ধর্মীয় অত্যাচারে ভরা এক শাসনের সূচনা হবে। নিজের পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ব্যবহার নৈতিকতার দিক থেকে নিন্দনীয় হলেও আওরঙ্গজেব দার্শনিক ছিলেন না, সিংহাসন অধিকারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। রাজক্ষমতা দখলের লোভে মত্ত ব্যক্তি নিজের আত্মীয়দেরও রেহাই দেয় না।

এখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাক। ১৬৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শাজাহান আরোগ্যলাভ করলেও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি দূর করার পক্ষে এখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গিয়েছিল। দারা আগ্রায় তাঁর পিতার নিকটে থাকায় তাঁর নিজের শক্তি বাড়ানোর সুযোগ ছিল কারণ সম্রাটের অসুস্থতার সময়ে তিনি তাঁর পিতার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মুরাদ জাহানারা বেগমের অধীনে থাকা সুরাট বন্দর অধিকারের জন্য ৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠান এবং দেওয়ান মীর আলিকে নকিকে হত্যা করেন। ১৬৫৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর মুরাদ নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করার পর খুতবা নিজের নামে পড়ার ব্যবস্থা করেন এবং মুদ্রার ওপর নিজের নাম খোদাই করেন। বাংলায় সুজা নিজের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন রাজমহলে। কিন্তু আওরঙ্গ জেব দ্রুত নিজের অভিষেকের কোন আয়োজন করেননি। তিনজন ভাই নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তারা ধর্মদ্রোহী ও ইসলামবিরোধী দারার বিরুদ্ধে একত্রিত হবার পরিকল্পনা করেন। বিদ্রোহী তিন রাজপুত্র ইসলামের নামে দারাকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ইসলামের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইসলাম বিপন্ন হওয়ার এই প্রচার জনগণের মধ্যে অতি সহজেই উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

শাজাহান যখন রাজপুত্রদের ঘৃণ্য আচরণের কথা জানলেন, তখন তিনি তাদের শাস্তির জন্য সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দেন। সেজন্য বিদ্রোহী রাজপুত্রদের গতিরোধের জন্য দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে তিন ভাগে বিভক্ত এক সৈন্যদল পাঠান হয়। সুজা, যিনি প্রথম আক্রমণে উদ্যোগী হন, বারাণসীর কাছে পরাজিত হন দারার পুত্র সুলেমান শিকো এবং কচ্ছের রাজা জয় সিংহের নেতৃত্বে প্রেরিত মুঘল বাহিনীর কাছে। নর্মদার কাছে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের দিল্লী অভিমুখী সৈন্যদল একত্রিত হয়। ইতিমধ্যেই দুই ভাই সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার শপথ গ্রহণ করেন ঈশ্বর এবং মহম্মদের নামে। চুক্তির শর্তগুলি ছিল—

(১) যুদ্ধে জয় করা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মুরাদের এবং দুই-তৃতীয়াংশ আওরঙ্গজেবের থাকবে

(২) বিজয়ের পর পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং সিন্ধ লাভ করবেন মুরাদ, যিনি মুদ্রা প্রচলন করবেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করতে পারবেন।

দুজন বিদ্রোহী রাজপুত্রের সম্মিলিত বাহিনীর মহারাজ যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বাধীন মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে ধর্মাতে সংঘাত হয়। ভয়াবহ এই যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির পর মুঘল সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। রাঠোররা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কাশিম খাঁ নিষ্ক্রিয় ছিল। যখন যশবন্ত সিংহ যোধপুরে পালিয়ে যান তখন তাঁর গরিমাময়ী পত্নী দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেন স্বামীর যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের প্রতিবাদে। ধর্মাতের যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের সম্মান বৃদ্ধি করে। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের নায়ক শুধুমাত্র যে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই যুদ্ধে জয়ী হন, তাই নয়, তাঁর সামরিক খ্যাতি তাঁকে ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। দ্বিধাগ্রস্তেরা আর ইতস্তত না করেই বুঝতে পারে যে চার ভাইয়ের মধ্যে কোনজন বিজয়ী হবার উপযুক্ত।

চম্বল অতিক্রম করে বিজয়ী রাজপুত্রেরা সামুগড়ের প্রান্তরে উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেবকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং মুসলিমদের জীবনহানি প্রতিরোধের জন্য শাজাহান ও জাহানারার চেষ্টার কোন ফল হয় নি। পরিবর্তে আওরঙ্গজেব দারার প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য সম্রাটকে অভিযুক্ত করেন। শুধুমাত্র রণক্ষেত্রেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। ৫০,০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দারা অগ্রসর হন। ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে এক নৃশংস যুদ্ধ হয়। রাজপুতদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও দারার কৌশলগত ত্রুটি জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে। যখন দারার হাতি তীরবিদ্ধ হয়, দারা হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়েন। স্মিথের মতে এই ঘটনা যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করে দেয়। হাতির উপর তাদের নেতাকে দেখতে না পেয়ে মুঘল সৈন্যরা দারাকে মৃত বলে ধরে নেয় এবং বিভ্রান্ত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যায়। যদি কোন সৈন্যবাহিনীকে ভীতি গ্রাস করে তাহলে কোন শক্তিই তাদের পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করে। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সামুগড়ের যুদ্ধে জয়ের পর আওরঙ্গজেব আগ্রার দিকে রওনা হন। যদিও পিতাপুত্রের মধ্যে সন্ধির চেষ্টা হয় সেটি পূর্বের সব প্রয়াসের মতই ব্যর্থ হয়। আওরঙ্গজেব আগ্রার দুর্গ আক্রমণ করেন এবং যখন দুর্গরক্ষীরা আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে তখন তিনি যমুনা থেকে দুর্গে জলসরবরাহ বন্ধ করে দেন এবং এভাবে ১৬৫৮ সালের ৮ই জুন দুর্গ অধিকার করেন। দুর্গের জলসরবরাহ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন প্রবল প্রতিপত্তিশালী ভারত সম্রাটকে দুর্গের মধ্যের কূপের জলের দ্বারা তৃষ্ণানিবারণ করতে হয়। শাজাহান অত্যন্ত বেদনাদগ্ধ হয়ে লিখেছেন যে হিন্দুরা প্রশংসনীয় কারণ তারা মৃত্যুপথযাত্রীদের জল দেয় এবং আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও পিতার জলকষ্টের কারণ হন।

এই প্রার্থনায় আওরঙ্গজেব কর্ণপাত করেননি। অবশেষে সম্রাট অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং অভিযোগ করা বন্ধ করে দেন। ধর্মের মধ্যে তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান এবং আত্মসমপর্ণের মনোভাব নিয়ে প্রার্থনা আর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন শুরু করেন।

আগ্রায় আওরঙ্গজেব আমীরদের আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং কার্যত শাসকে পরিণত হন। এখন তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন এবং পথে শুধুমাত্র কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মথুরার কাছে মুরাদকে বন্দী করেন। দিল্লীতে ১৬৫৮ সালের ২১শে জুলাই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং আলমগীর উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিজের ভাইদের এবং সিংহাসনের অন্য দাবীদারদের নির্মূল করা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তিনি এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। সুজা যিনি সিংহাসন দখলের জন্য নতুনভাবে চেষ্টা করেন, এলাহাবাদের কাছে খাজায় পরাজিত হন ১৬৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী। মীরজুমলা তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও সম্ভবত আরাকানবাসীরা তাঁকে হত্যা করে। মুঘল বাহিনী ১৬৫৯ সালের ২৩শে আগস্ট মুরাদকে বন্দী করে দিল্লীতে আনে এবং ১৬৫১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করা হয়। দিল্লীতে মুরাদকে এবং তাঁর পুত্র সিফির শিকোকে অপরিচ্ছন্ন হাতির পিঠে বসিয়ে অপমানজনকভাবে ঘোরান হয়। এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বার্ণিয়ার লিখেছেন যে সর্বত্র নরনারী এবং শিশুরা দারার দুর্ভাগ্যের জন্য অনুতাপ করছিল এবং মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে আসার জন্য বিলাপ

করছিল। এই পরিস্থিতিতে দারাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা আওরঙ্গজেবের পক্ষে বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। দারার বিচারের জন্য সভার আয়োজন করা হয়। উলেমারা দারাকে ইসলামধর্ম বিরোধী এবং প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। আওরঙ্গজেব দারার আবেদনের উত্তরে দারাকে ক্ষমার অযোগ্য আখ্যা দেন। ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট দারার শিরচ্ছেদ করা হয় এবং তাঁর মৃতদেহ রাস্তায় প্রদর্শন করা হয় যাতে জনগণ তাদের প্রিয় রাজপুত্রের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারে।

আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা নিষ্ফল। মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁর সৌভাগ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিজয়ী ব্যক্তির গুণের অতিরঞ্জন এবং পরাজিতের নিন্দা ঐতিহাসিকদের রীতি। সেজন্য একটি মত প্রচলিত যে আওরঙ্গজেব ছিলেন কৌশলী এবং দক্ষ সেনানায়ক। ডঃ ত্রিপাঠী সঠিকভাবেই লিখেছেন যে আওরঙ্গজেবের কাছে দারার পরাজয় যদিও আওরঙ্গজেবের উন্নত সামরিক শক্তির পরিচায়ক তবুও তা দারাকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য এমন অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে যা একজনের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। দার্শনিকের মত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভাগ্য ভারতবর্ষে মুঘল শাসন দীর্ঘায়ত করার বিরুদ্ধে ছিল। বাবরের সাম্রাজ্যকে আকবর যদি শক্তিশালী করে থাকেন, এর ভাঙনের সূত্রপাত করেন আওরঙ্গজেব।

৫.২ আওরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের বিস্তার, সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক সমস্যাঃ রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য

আওরঙ্গজেবের শাসন শাজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি থেকে অষ্টাদশ শতকের ভাঙনের মধ্যবর্তী পর্যায় ছিল। বহুকাল ধরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব পুরোহিততন্ত্র বা দিব্যতন্ত্রের সূচনা করেন এবং তাঁর নীতি সাম্রাজ্যে সাংগঠনিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন রাজত্বের প্রথম থেকেই আওরঙ্গজেব দিব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ফারুকী উল্লেখ করেছেন যে আওরঙ্গজেব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে একজন গোঁড়া মুসলমান হিসেবে আওরঙ্গজেব রাজনৈতিক প্রয়োজনকেই সনাতনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য হন। সতীশচন্দ্রের বক্তব্য ছিল ধর্ম বিপন্ন এই মত প্রচারিত হত শাসকদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে। শ্রী রাম শর্মা বলেছেন ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ মুসলিম উলেমাদের জয়কে চিহ্নিত করে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে ইসলাম ধর্মের প্রতি আওরঙ্গজেবের অনুরাগ রাজনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা প্রশমিত ছিল।

সেজন্য গোঁড়ামি সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি এবং রাজনৈতিক কর্ম এমনভাবে পরিকল্পিত যে তাতে রাজনীতির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত মতকে প্রাধান্য দেবার কোন সুযোগ ছিল না। এই রাজনীতির প্রয়োজন স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল ছিল না। আথার আলীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ ডঃ সরকার এবং ডঃ শর্মার অভিমতের থেকে ভিন্ন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আওরঙ্গজেব কখনই আক্ষরিক অর্থে দিব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, যাঁর শাসনে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী সুন্নী মুসলমান, নীতিবাগীশ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মোন্মাদ। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রতি তিনি অন্ধ ছিলেন না। ভারতবর্ষে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তিনি জানতেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক মিশ্র জনগণকে তিনি শাসন করছেন। যার মধ্যে বেশীসংখ্যক মানুষই অমুসলমান। সেজন্য রাজত্বের সূচনা থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তাঁকে তাঁর সনাতনপন্থী নীতি অনুসরণ করতে হয় কয়েকটি ভিন্ন পর্যায়ে।

আবার একই সময়ে আওরঙ্গজেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল বহু ঈশ্বরের পূজা বন্ধ করা এবং ভারতবর্ষকে দার-উল-হার্ব থেকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়া। সনাতনপন্থী ইসলামের শাসন শক্তিশালী করার জন্য তিনি তাঁর শাসনের সূচনা করেন কয়েকটি মুসলিম নীতি ঘোষণা করার মাধ্যমে।

রাজপুতানার সমস্যা ঃ যদি আকবর তাঁর বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা রাজপুতদের বন্ধুত্ব এবং সমর্থন লাভের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন, আওরঙ্গজেব তাহলে সেসব হারান তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং ধর্মোন্মদনার জন্য। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরিণতি হয়। ভাসা-ভাসা ভাবে এটাই শুধু বলা যেতে পারে যে সমধর্মালম্বী না হওয়ায় আওরঙ্গজেব রাজপুতদের ঘৃণা করতেন এবং নীতিবাগীশ সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে রাজপুতরা আওরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী দারার সঙ্গে একত্রিত হয়। কিন্তু সেগুলিই মূল কারণ হলে আওরঙ্গজেব অম্বরের রাজা জয়সিংহ এবং যোধপুরের রাজা যশবন্ত সিংহকে মুঘল প্রশাসনে নিযুক্ত রাখতেন না এবং তাঁর শাসনের দু-দশক পরেও সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব এবং মনসবের অধিকার তাঁদের ভোগ করতে দিতেন না। রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ ছিল যে অত্যন্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে আওরঙ্গজেব প্রত্যেক উপজাতি এবং সম্প্রদায়কে অবদমিত করতে এবং তাদের নিজস্ব অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে মুঘল নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হন। এর ফলে তিনি রাজপুতদের সঙ্গে মহামূল্যবান সম্পর্ক নষ্ট করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশেই তিনি যুদ্ধ করেন এবং তাঁর পাঁচ দশকের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমে প্রাথমিক অভিযান থেকে শুরু করে জীবনের শেষভাবে মারাঠাদের সঙ্গে সংগ্রাম পর্যন্ত তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে লাভের পরিবর্তে তিনি সবই হারান এবং বিখ্যাত মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে তিনি শুধু নিজেরই নয়, অন্যদের জীবনেও দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য নিয়ে আসেন।

যখন আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজপুতরা নিজেদের রাজ্যে শান্তিতেই ছিল। রাজপুতদের তিনজন বিখ্যাত রাজার মধ্যে মাড়ওয়াড়ের রাজা যশবন্ত সিংহ এবং অম্বরের রাজা জয়সিংহ মুঘল সৈন্যবাহিনীতে মনসবদারী ভোগ করতেন। তৃতীয় রাজপুত রাজা, মেবারের রাণা রাজ সিংহ মুঘল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন এবং শাজাহানের রাজত্বকালেই মুঘলদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন। এসব সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব শিবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে রাজপুত রাজাদের সন্দেহ করতেন এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের থেকে মুক্তি পেতে চান। স্যার যদুনাথ সরকার এবং ডঃ দত্তের মতে ১৬৬৭ সালে দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব বিষপ্রয়োগ করে প্রথমে রাজা জয় সিংহকে হত্যা করেন এবং ১৬৭৮ সালে এগারো বছর পর খাইবার পাসের জমরুদ দুর্গে মুঘলদের সেনানায়ক হিসেবে যশবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। যশবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারী না থাকায় আওরঙ্গজেব মৃত রাজার প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তীকরণ এবং কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের দমন করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। মাড়ওয়াড় রাজ্যকে মুঘল প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আদেশ জারী করা হয় এবং স্থানীয় শাসনকার্যের জন্য ফৌজদার, কোতোয়াল এবং আমীর নিয়োগ করা হয়। পরিকল্পনা সফল করার জন্য আওরঙ্গজেব আজমীর যান। রাজপুত অঞ্চল অধিকারের জন্য রাঠোড়দের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে আওরঙ্গজেব যোধপুরের খুব কাছেই আজমীরে উপস্থিত হন। ১৬৭৯ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি রক্তক্ষয় ছাড়াই মাড়ওয়াড়ের আনুগত্য আদায় করে খুশীমনেই দিল্লী ফিরে যান। সেই একই দিনে তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়াকর পুর্ণপ্রবর্তন করেন, যেটি প্রায় একশ বছর আগে তাঁর প্রপিতামহ আকবর রদ করেছিলেন। অল্প পরেই নাগৌরের রাজা ইন্দ্র সিংহের কাছে যোধপুর বিক্রী করে দেওয়া হয় ছত্রিশ লাখ টাকার বিনিময়ে। রাজা ইন্দ্র সিংহ বংশানুক্রমিকভাবে মুঘল সামন্ত ছিলেন এবং তিনি উত্তরাধিকারসংক্রান্ত কর প্রদান করেন। কিন্তু জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ রাজা ইন্দ্র সিংহকে সাহায্যের জন্য মুঘল রাজকর্মচারীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

এই সবকিছুই পরাক্রমশালী রাঠোড়দের অসন্তোষকে বাড়িয়ে তোলে। এগুলির সঙ্গে আর একটি কারণ যুক্ত হয়।

মহারাজা যশবন্ত সিংহের দুজন রাণী তাঁদের স্বামীর মৃত্যুর পর দুই পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। ১৬৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যোধপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে। দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুই পুত্রের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। যশবন্ত সিংহের বিশ্বস্ত, অনুগত কর্মচারীরা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং মৃত রাজার স্থানে তাঁর শিশুপুত্রের উত্তরাধিকারের দাবী স্বীকার করার জন্য আওরঙ্গজেবের কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব শিশু রাজপুত্রকে মুঘল হারেমে পাঠানোর আদেশ দেন যেখানে সে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হবে এবং পরিণতবয়স্ক হবার পর সে রাজা হতে পারবে। রাজপুতদের ভীতি ছিল যে অজিত সিংহকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতে পারে এবং ধর্মান্তরিত হলে তবেই সে সিংহাসন লাভ করবে। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে ১৭০৩ সালে কারারুদ্ধ শাহুকে দেওয়া এধরনের প্রস্তাবের দৃষ্টান্ত থেকে এটিই আমাদের বিশ্বাস হয়। সম্রাটের প্রস্তাব রাঠোড়রা সমর্থন করেনি এবং তারা তাদের মৃত রাজার শিশুপুত্রকে যেকোন মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাদের দুর্গাদাস নামে একজন সাহসী, নিষ্ঠাবান এবং কর্মঠ নেতা ছিলেন। রাজপুত শৌর্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর স্মৃতি এখনও রোমন্থন করা হয় রাজপুত গাথায়।

আওরঙ্গজেবের প্রস্তাবে দুরভিসন্ধির আভাস পেয়ে তিনি শিশু রাজপুত্র এবং দুজন রানীকে নিয়ে মাড়ওয়াড় পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। যখন মুঘল বাহিনী রাজা যশবন্ত সিংহের শিশুপুত্র এবং রানীদের দুজনকে বন্দী করার চেষ্টা করে, রঘুনাথ ভাট্টি প্রায় একশ মৃত্যুভয়হীন সৈন্য নিয়ে রাজসৈন্যদলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিশৃঙ্খলতার সুযোগে, রাজপুত শিবির থেকে দুজন রানীকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরিয়ে শিশুপুত্রসমেত দুর্গাদাস পলায়ন করেন। বীর শহিদ হিসেবে রঘুনাথ এবং তাঁর অনুচরদের মৃত্যুর আগেই দুর্গাদাস দিল্লী ছেড়ে নয় মাইল চলে যান। যদিও মুঘল বাহিনী তাঁকে অনুসরণ করে, রণছোড়দাস যোধার নেতৃত্বে রাজপুত সৈন্যরা মুঘলদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ক্রমাগত যুদ্ধ শিশু রাজপুত রাজপুত্রকে বন্দী করার জন্য মুঘল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে দুর্গাদাসের সহায়ক হয় এবং ১৬৭৯ সালের জুলাই মাসে নিরাপদে যোধপুরে পৌঁছে তিনি একটি সুরক্ষিত স্থানে শিশুটিকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। হতাশ হয়ে আওরঙ্গজেব একজন গোয়ালার পুত্রকে প্রকৃত অজিত সিংহ হিসেবে উপস্থিত করেন এবং যে শিশুকে দুর্গাদাস যোধপুরে নিয়ে যান তাকে নকল রাজপুত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। রাঠোড়দের শাসন করতে অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি সম্রাট ইন্দ্র সিংহকে পদচ্যুত করে সমগ্র মাড়ওয়াড় এক মুঘল সেনানায়কের অধীনে নিয়ে আসেন।

সফলভাবে রাজপুত প্রতিরোধের মোকাবিলা করার জন্য আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালের অক্টোবর মাসে আজমীরে পৌঁছান এবং রাঠোড়দের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাজপুত্র আকবর এবং তাহাভুর খানের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। রাজপুতদের পরাজয়ের পর মাড়ওয়াড় মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন জেলায় ভাগ করে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে এটি ছিল উদ্দাম সাম্রাজ্যবিস্তারের এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর ফলে রাজপুতদের দুটি উপজাতি-রাঠোড় এবং শিশোদিয়ারা একত্রিত হয়। শিশোদিয়াদের মহারাণা রাজসিংহ ছিলেন অজিত সিংহের জননীর সহোদরভ্রাতা। তিনি বুঝতে পারেন যে আওরঙ্গ জেবের দ্বারা মাড়ওয়াড়ের নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতের মেবার জয়েরই দ্যোতক। সেজন্য তিনি রাঠোড়দের পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিশোদিয়ারা কোন উপযুক্ত প্রস্তুতি নেবার আগেই, রণকৌশল আর পরিকল্পনায় দক্ষ আওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন। সাহসী রাজপুতরা শক্তিশালী কামানে সুসজ্জিত মুঘল বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে রাজ সিংহ এবং ইউরোপীয়রা আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নেন। মুঘলরা উদয়পুর এবং চিতোর জয় করার পর সেখানকার সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে। হাসান আলীর নেতৃত্বে সৈন্যদল পার্বত্য অঞ্চলে মহারাণাকে তাড়া করে যায় এবং তাঁর সম্পত্তি এবং গোলাবারুদ দখলের দ্বারা ১৬৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে পরাজিত করে। মেবারের শক্তি বিনষ্ট করার পর সম্রাট সন্তুষ্টচিত্তে ১৬৮০ সালের মার্চ মাসে আজমীরে ফিরে যান। বারো হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে থাকা রাজপুত্র আকবরের শাসনাধীনে রাখা হয় চিতোরকে।

এটি সত্য যে রাজপুতদের ক্ষমতা নষ্ট করে তাদের রাজ্য অধিকার করলেও আওরঙ্গজেব তাদের শৌর্য এবং আত্মমর্যাদার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হন। মুঘলদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ বন্ধ করা যায় নি। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে সমগ্র রাজপুতানায় মুঘল বিরোধিতার আগুন জ্বলতে থাকে। মুঘল অধীনস্থ মেবার এবং মাড়ওয়াড় আরাবল্লী পর্বত দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজসিংহ তাঁর সৈন্য নিয়ে ওই পর্বতে আশ্রয় নেন এবং পূর্ব বা পশ্চিমে মুঘল বাহিনীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করেন। মুঘলদের পক্ষে চিতোর থেকে মাড়ওয়াড়ে সৈন্য পাঠান কষ্টকর এবং পরিশ্রমসাধ্য হয়ে ওঠে। এসব প্রতিবন্ধকতার কুফল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শিশোদীয়ারা মুঘল সৈন্যদের মধ্যে তীব্র ভীতি সৃষ্টি করে এবং রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়। শিশোদিয়াদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ আকবরকে আওরঙ্গজেব মাড়ওয়াড়ে স্থানান্তরিত করেন এবং আজমকে চিতোরে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেন। এর ফলে আকবরের দম্ভে আঘাত লাগে কারণ তিনি যথার্থই বোঝেন যে তাঁর নিজের ত্রুটি নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। সেজন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকার কথা ভাবেন এবং রাজপুতদের সাহায্যে পিতার রাজমুকুট ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। রাজপুতরা এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায় এবং রাজপুত্রকে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৬৮১ সালের জানুয়ারী মাসে আকবর নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করেন যখন তাঁর বেতনভোগী চারজন উলেমা নির্দেশনামা জারী করেন যে ইসলাম ধর্মের নীতির বিরোধিতার মাধ্যমে আওরঙ্গজেব সিংহাসনের ওপর তাঁর অধিকার হারিয়েছেন। সেসময়ে আজমীরে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী না থাকায় হতাশ আওরঙ্গজেব নিজেকে অসহায় এবং নিরাপত্তাহীন মনে করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে আকবর নিজে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনি বিলাসিতায় সময় নষ্ট করেন। দিনে দিনে আওরঙ্গজেবের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যখন মুঘল বাহিনী আজমীর পৌঁছয়। রাজপুত্র মুয়াজ্জম সম্রাটের সঙ্গে একত্রিত হলে মুঘল সেনাবাহিনীর শক্তি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও মুঘলদের সমর্থনকারী এবং বিদ্রোহীরা যদি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হত তাহলে যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করা কঠিন ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দেয়। পরিকল্পনামাফিক রাজপুতদের প্রতারণা করার জন্য আকবরকে প্রশংসা করে আওরঙ্গজেব একটি চিঠি পাঠান এবং রাজপুত নেতাদের হাতে সেই চিঠি পৌঁছবার ব্যবস্থা করেন। এতে কাজ হয় এবং রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আকবর নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র রাজপুতদের শরণাপন্ন হলে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজপুতরা যেকোন মূল্যের বিনিময়ে বিদ্রোহী রাজপুত্রকে তাঁর পিতার হাত থেকে রক্ষার সংকল্প করেন। আবার রাঠোড় নেতা দুর্গাদাস তাঁর সাহসের পরিচয় দেন এবং মুঘলদের বন্দী করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আকবরকে নিরাপদে মারাঠী রাজা শম্ভুজীর রাজসভায় পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেন।

আকবরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সেটি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। অবশেষে আওরঙ্গজেব রাজপুতানার পরিবর্তে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে অংশ নেন এবং সেখানেই মুঘল সাম্রাজ্যের কবর খনন করেন। আওরঙ্গজেব রাজপুতানা ছেড়ে যাবার আগেই মুঘল এবং শিশোদিয়াদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় ১৬৮১ সালের জুন মাসে। সন্ধির শর্তগুলি ছিল— (ক) জিজিয়া কর দেবার বিনিময়ে মহারাণা মন্ডলপুর এবং বিদৌর পরগণা মুঘলদের অধীনের ছেড়ে দেয়। (খ) মুঘলরা মেবার থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং (গ) মহারাণা রাজ সিংহের পুত্র, জয়সিংহ মেবারের রাণা হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং পাঁচহাজারী মনসবদারী লাভ করেন।

তা সত্ত্বেও রাঠোড়রা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মুঘলদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যতদিন না পর্যন্ত মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ মাড়ওয়াড়ের উপর অজিত সিংহের দাবী স্বীকার করে নেন।

আওরঙ্গজেবের রাজপুত যুদ্ধের পরিণতি ছিল ভয়াবহ। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন যে রাজপুত যুদ্ধের ফলে আওরঙ্গজেবের অর্থ এবং সৈন্যের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং ভারতবর্ষে তাঁর সম্মানহানি ঘটে। স্যার যদুনাথ সরকারের আক্ষেপ যে চরম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে আওরঙ্গজেব বিশ্বস্ত রাজপুতদের বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে

প্ররোচিত করেন যখন সীমান্তবর্তী আফগানদের সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। দুটি প্রখ্যাত রাজপুত উপজাতি আওরঙ্গজেবের বিরোধিতা করায় মুঘল বাহিনী সবচেয়ে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত সৈন্যদের নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন। ক্রমশ রাঠোড় এবং শিশোদিয়াদের থেকে হারা আর গৌর উপজাতির মধ্যেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মালবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ভারতের সর্বত্র মুঘলদের বিরোধিদের অনুপ্রাণিত করে। স্ট্যানলি লেনপুলের মতে মহান আকবরের সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের মত ধর্মান্ধ ব্যক্তি বসায় রাজপুতরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোনকিছুই করতে প্রস্তুত ছিল না। নিজের দক্ষিণ হস্ত হারানোর পর আওরঙ্গজেবকে তাঁর দাক্ষিণাত্যের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

৫.৩ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য সমস্যা

তাঁর রাজত্বকালের প্রথমার্ধে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যবিস্তার এবং অন্য রাজ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের কোন নীতি আওরঙ্গজেব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এই নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যখন সম্রাটের বিদ্রোহীপুত্র আকবর রাজপুতদের সাহায্যে মুঘল সিংহাসন দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান এবং শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর রাজসভায় উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেন। আওরঙ্গজেবের ভাষায় 'ভারতের শান্তিবিনষ্টকারী' এবং 'শয়তান পিতার শয়তানপুত্রের' একত্রিত হওয়া তাঁকে অসন্তুষ্ট করে এবং নিজের পলাতক পুত্র এবং তার সহযোগী শম্ভুজীকে শাস্তি দেবার জন্য সম্রাট সশরীরে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত নেন। শিয়ারাজ্য বিজাপুর ও গোলকুন্ডা ধ্বংস করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ১৬৮১ সালের জুন মাসে মেবারের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের পর তিনি আজমীর ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে রওনা হন ১৬৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর। ১৬৮২ সালের ১লা এপ্রিল সম্রাট আহম্মদনগর পৌঁছন। কখনোই তিনি মানসচক্ষে দেখতে পাননি যে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা তাঁর ধ্বংসের সূচনা করবে। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যে কাটান এবং তাঁর মৃতদেহ সেখানেই কবর দেওয়া হয়। দৌলতাবাদের কাছে খুলদাবাদে তাঁর কবর বাবরের সাম্রাজ্যের পতনকে চিহ্নিত করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

রাজপুত্র আকবরকে বন্দী করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আওরঙ্গজেব চার বছর কাটান এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন। একই সঙ্গে তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয়ের উদ্যোগ নেন। তাঁর দাক্ষিণাত্যের এই দুটি শিয়া রাজ্যকে তাঁর হিন্দু রাজ্যগুলির মতই খারাপ মনে হয় এবং তিনি সেগুলিকে মৃতদেহভক্ষণকারী দানব ও বিধর্মী আখ্যা দেন। সম্রাট এই প্রদেশগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রের গৌরব বাড়াতে চান এবং সরাসরি মারাঠাদের মোকাবিলার চেষ্টা করেন। ১৬৮৫ সালের ১১ই এপ্রিল মুঘলরা বিজাপুর অবরোধ করলেও সেখানে সৈন্যরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রায় একবছরের বেশী সময় ধরে অবরোধ চলে। অবশেষে যখন দুর্গের রসদ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় এবং দুর্ভিক্ষে বহুলোকের মৃত্যু হয় তখন বাধ্য হয়ে ১৬৮৬ সালে বিজাপুরিরা আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ী মুঘল বাহিনী শহরে প্রবেশ করে ধ্বংসলীলা চালায়। দুর্গের বেশ কিছু দেওয়ালচিত্রকে শরিয়তবিরোধী আখ্যা দিয়ে আওরঙ্গজেব নষ্ট করেন। বিজাপুর প্রদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বছরে এক লাখ টাকা অবসরগ্রহণের ভাতা হিসেবে পান বিজাপুরের শাসক।

মুঘল বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল গোলকুন্ডা জয় করা। ১৬৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে দুর্গ অবরোধ করা হয়। দুর্গরক্ষীদের যথেষ্ট রসদ ছিল এবং তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবরোধ চলতে থাকায় মুঘল বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকেন। আট মাস কেটে যাওয়ার পরও সাফল্যের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। বীরত্ব বিফল হলে মুঘলরা বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নেয়। সম্রাট আবদুল্লা পানি নামে গোলকুন্ডার সুলতানের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীকে ঘুষ দেন। সে দুর্গের পূর্বদিকের ফটক ফুলে রেখে দেয় এবং এভাবে মুঘল সৈন্যদের দুর্গে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্গ মুঘলদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আগে আবদুর রজ্জাক লারী নামে গোলকুন্ডার সুলতানের

একজন সাহসী কর্মচারী পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করে। মাটিতে পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত সে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। চরম শত্রুরাও তার বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হয়। শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলার পর মুঘল বাহিনীতে উচ্চপদে তাকে নিয়োগ করা হয়। গোলকুন্ডা জয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর গোলকুন্ডার সুলতান আবুল হাসান বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা অবসর গ্রহণের ভাতা হিসেবে পান এবং দৌলতাবাদের দুর্গে নির্বাসিত হন।

বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা অধিকার আওরঙ্গজেবকে মারাঠাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত করে এবং তিনি তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমদিকে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য পান। শম্ভুজীকে বন্দী করে হত্যা করা হয় ১৬৮৯ সালের মার্চ মাসে। শম্ভুজীর রাজধানী রায়গড় আক্রমণের পর তাঁর পুত্র শাহু বন্দী হন। একসময়ে মনে হয় যে মারাঠাদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। সুদূর দক্ষিণে আধিপত্যবিস্তার করে তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনোপল্লী'র হিন্দু শাসকদের কাছ থেকে সম্রাট অর্থ আদায় করেন। এভাবে ১৬৯৩ সালে আওরঙ্গজেব তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছন। কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন তিনি। একুশটি প্রদেশ নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য গঠিত হয় এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব ছিল ৩৩কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, আকবরের সময়ের ১৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার তুলনায়। কিন্তু বাহুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং এর পতন ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব সব জয় করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সব হারান। এটি ছিল তাঁর ধ্বংসের সূচনা। তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ এবং হতাশাব্যঞ্জক অধ্যায় শুরু হয়। কেন্দ্রের থেকে একজন ব্যক্তির শাসন করার পক্ষে মুঘল সাম্রাজ্য অতিরিক্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সমস্ত শত্রুকে তিনি যদিও পরাজিত করেন কিন্তু চিরকালের মত তাদের ধ্বংস করতে পারেন নি। উত্তর ও মধ্যভারতের বহু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সুদূর দাক্ষিণাত্যে থাকা বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর কর্মচারীদের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারান এবং প্রশাসন অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ তাঁর রাজকোষ শূন্য করে, প্রশাসন দেউলিয়া হয়ে যায়, দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়া ক্ষুধার্ত সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে স্পেনের ক্ষত তাঁর পতন ঘটায়। দাক্ষিণাত্যের ক্ষত আওরঙ্গজেবকে ধ্বংস করে।

আওরঙ্গজেব যদিও মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শক্তি বিনষ্ট করেন, তিনি তাদের জাতীয়তাবোধের অবলুপ্তি ঘটাতে পারেন নি। এর ফলে শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় মুঘল সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম। শিবাজীর অপর পুত্র রাজারাম মারাঠাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল না। প্রত্যেক মারাঠা নেতা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুঘল অধিকৃত অঞ্চল লুঠ এবং মুঘলদের বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করতেন। এজন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়েই সম্রাট শত্রুদের সম্মুখীন হন যাদের সঠিকভাবে চিহ্নিত ও দমন করা ছিল অসম্ভব। স্ট্যানলী লেনপুলের মতে এটি ছিল হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং জলকে আঘাত করা। যতদূর পর্যন্ত তাদের শিবির এবং শহর বিস্তৃত ছিল ততদূর পর্যন্তই মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ মারাঠাদের দখলে থাকে। সন্তাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদব নামে দুজন মারাঠা নেতা মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে বিধ্বংসী আক্রমণ চালান এবং তাদের সামরিক শিবির ধ্বংস করে দেন। সন্তাজীর নামেই মুঘল সৈন্যদের মধ্যে এমন ত্রাসের সঞ্চার হত যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কোন সেনানায়ক রাজী হত না। সেজন্য মুঘল প্রদেশ থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করার জন্য রাজারামের তাঁর সেনাধ্যক্ষদের প্রেরণ কিছুই বিস্ময়কর ছিল না। এই সংবাদ পাবার পর আওরঙ্গজেব জিঞ্জি দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। জুলফিকর খানের নেতৃত্বে ১৬৯১ সালে দুর্গ অবরোধ শুরু হলেও দুর্গরক্ষীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকে। দুর্গটি মুঘল বাহিনী অধিকার করার আগে, মারাঠা নেতা রাজারাম সাতারায় পালিয়ে গিয়ে একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন।

এরপর স্বয়ং সম্রাটের তত্ত্বাবধানে মুঘল বাহিনী সাতারার দুর্গ অবরোধ করে ১৬৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ১৭০০ সালের ১২ই মার্চ রাজারামের মৃত্যুতে মারাঠারা ভগ্নহৃদয়ে দুর্গ মুঘলদের হাতে সমর্পণ

করে। রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নেন এবং মারাঠারা মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে বিধ্বংসী আক্রমণ শুরু করে। কাফী খান লিখেছেন যে তারাবাঈ মুঘল অঞ্চল আক্রমণের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেন এবং সিরোঞ্জ, মান্দাসোর, মালব পর্যন্ত ছয়টি সুবা লুঠ করার জন্য তিনি মারাঠা বাহিনী পাঠান। তারাবাঈ তাঁর সৈন্যদের হৃদয় জয় করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের সংগ্রাম, পরিকল্পনা, অভিযোগ, অবরোধ সত্ত্বেও মারাঠাদের শক্তি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

আওরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের যুদ্ধ চালিয়ে অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করেন। তাঁর পার্লি, পান্হালা, কোন্ডালা, খেলনা, রাজগড়, তোর্ণা, ওয়াজিনজেরা জয় মারাঠাদের হতোদ্যম করতে পারে নি এবং তারা মুঘল প্রদেশগুলির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়। কোন দুর্গ দখলই চিরস্থায়ী হয় নি কারণ দুর্গগুলি হারানোর পর মারাঠারা সেগুলি পুনরুদ্ধার করে। এর ফল ছিল মুঘলদের সঙ্গে মারাঠাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ যাতে মুঘলদের চরম ক্ষতি হলেও মারাঠারা নিরাপদেই থাকে। যদি একজন উদ্যমী মুঘল সেনানায়কের কাছে মারাঠারা পরাজিত হত তাহলে তারা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গিয়ে পরে মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করত, হেরে যাওয়া অঞ্চলের অর্থ ও সম্পদ লুঠ করে সেই অঞ্চলগুলি থেকে চৌথ আদায় করত। মারাঠা লুঠতরাজের এই সমস্যা এত ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে ১৭০৩ সালে তারা বেরাহ, ১৭০৬ সালে গুজরাট এবং বরোদা লুঠ করে। একসময় ১৭০৬ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে মারাঠা সৈন্য আহম্মদনগরে সম্রাটের শিবির আক্রমণ করে এবং এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। মারাঠা আক্রমণে পরিশ্রান্ত আওরঙ্গজেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ১৭০৬ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করার পক্ষে তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধ ছিলেন এবং নিজের ছেলেদের অবিশ্বাস করায় তাদের সঙ্গে শাসনকার্য ভাগ করে নিতে তিনি চাননি। এতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কখনোই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে পারেননি। তাঁকে শীর্ণ এবং মৃত প্রায় দেখাত। তাঁর সমস্যার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও আওরঙ্গজেব নিয়মিতভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করতেন। ১৭০৭ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের পক্ষে কোনভাবেই লাভজনক হয় নি এবং ধনসম্পদ ও সাম্রাজ্যের মত তাঁর শরীর ও মনেরও ক্ষয় হয়। দীর্ঘ বঞ্চনা এবং কষ্টের ফলে তাঁর সৈন্যরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মারাঠাদের লুঠতরাজের জন্য পথঘাট নিরাপদ ছিল না। ১৭০২ সাল থেকে ১৭০৪ সালের মধ্যে অনাবৃষ্টির জন্য প্লেগ দেখা দেয়। খিদে ও অসুখে কয়েকলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। আওরঙ্গজেব এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না এবং যথেষ্ট ব্যথিত, হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। পুত্র আজমকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি এজন্য আক্ষেপ করেন। আওরঙ্গ জেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও একজন কঠোর পরিশ্রমী শাসক এমন শোচনীয়ভাবে বিফল হলেন কেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।

ডঃ স্মিথের মতে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয় আওরঙ্গজেবের হঠকারিতা ছিল কারণ এতে কর্মহীন সৈন্যরা লুঠতরাজ করতে থাকে এবং মারাঠা নেতারা স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভয় থেকে মুক্তি পায়। এই মতের বিরোধিতা করে স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন যে পতনোন্মুখ মুসলমান প্রদেশগুলির পক্ষে নবজাগ্রত, উৎসাহ, উদ্যমে পরিপূর্ণ এবং জাতীয়তার আদর্শে সংগঠিত মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব ছিল। ভারতে দেড়শ বছরের মুঘল শাসনের দরুণ সৈন্যেরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল ও কর্মক্ষমতা হারিয়েছিল। তারা আরামপ্রিয় ও শ্লথ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুঘলদের সামরিক ত্রূটি সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব নিজেই নিজের শত্রু ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র শত্রুর জন্ম দিয়েছিলেন, মিত্রের সৃষ্টি করতে পারেননি। শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা না করেই তিনি তাদের ধ্বংস করেন। এভাবে তিনি শত্রু তৈরী করেন এবং বন্ধুদের হারান। শুধুমাত্র মারাঠারা নয়, সব উপজাতি ও সম্প্রদায় তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সফলভাবে তাদের দমন করলেও তার এই নীতির সীমাবদ্ধতা বুঝতে ব্যর্থ হন আওরঙ্গজেব। যদি মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করে আওরঙ্গজেব তাঁর রাজধানীতে ফিরে যেতেন তাহলে হয়ত তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকত। তাঁর অদূরদর্শী নীতি ভাঙনের প্রবণতাকে শক্তিশালী করে এবং তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের অক্ষমতা ও ব্যাভিচারের জন্য সাম্রাজ্যের ভাঙন দ্রুততর হয়।

একক ৬ ❏ জায়গীরদারী সমস্যা

৬.০ জায়গীরদারী সমস্যা
৬.১ কৃষক বিদ্রোহ

৬.০ জায়গীরদারী সমস্যা

জায়গীরদারী সংকটের ভিত্তি ছিল প্রশাসনিক এবং সামাজিক। জায়গীরদারী ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করত সরকার দ্বারা নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য রাখা এবং নিজের আশা ও অভ্যেস অনুযায়ী বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজস্ব জায়গীর থেকে সংগ্রহ করার ক্ষমতার উপর। জায়গীরদারী ব্যবস্থায় জায়গীর হিসেবে প্রদত্ত অঞ্চলে জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করায় জায়গীরদারদের কায়েমী স্বার্থ ছিল। এর ফলে নির্ধারিত রাজস্ব ও আদায়ীকৃত রাজস্বের মধ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদানের বাস্তবতার উপর শুধু নয় বরং ফৌজদারদের সাহায্য নিয়ে জমিদারদের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করায় জায়গীরদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করত। এই জমিদাররা সশস্ত্র ছিল এবং জমির অধিকারী কৃষকদের সঙ্গে জাতিগত এবং বংশগতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিল।

এভাবে দেশে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে জায়গীরদারী ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিভিন্ন কারণের জন্য একমাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা ছাড়া উত্তর ভারতের অধিকাংশ জমিদার নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুঘলদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্রমশ বেশীরভাগ জমিদারকেই পেশকাশ প্রদানকারী থেকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীতে পরিণত করা হয় ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে। তখনও মনসবদারদের খুব দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং বেতন হিসেবে মনসবদারদের দাবীর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় কারণ তখনও স্থানীয় জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের জন্য মনসবদাররা ফৌজদারদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

দাক্ষিণাত্য, যেখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং যেখানে ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকায় স্থানীয় জমিদাররা এর সুযোগ নেয়, সেখানে এই ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের মূল ভিত্তি রচনা করে।

দাক্ষিণাত্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভীম সেন মনসবদার ও ফৌজদারদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে বলেছেন যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে অধিকাংশ মনসবদারই একহাজারের বেশী সৈন্য রাখতে পারতেন না। ভীমসেনের বক্তব্য অনুসারে প্রতিটি জেলাতেই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা ফৌজদারদের অগ্রাহ্য করে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে তোলে। এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং অভিযান পরিচালনার ব্যয়ের কথা ভেবে ফৌজদারেরা একজায়গায় বসে থেকেই শত্রু মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করে। তাঁর লেখা অনুসারে সাতহাজারী মনসবদাররাও মাত্র সাতশ সৈন্য রাখতে সক্ষম হয় এবং ফৌজদারদের অক্ষমতার জন্য এবং রাজপুত্র ও তাদের পুত্রদের ভবঘুরের মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় ফৌজদারদের মত।

প্রশাসনিকব্যবস্থা পরিস্থিতি আরো খারাপ করে দেয়। সবচেয়ে বেশী সম্পদ উৎপাদনকারী (সৈর হাসিল) জাগীর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাম্রাজ্যের খাস জমি হিসেবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। পরিণতিস্বরূপ যেসব স্থানে জমিদারদের অতিরিক্ত শক্তি ও জমির অধিকারী কৃষকদের ক্ষমতার জন্য ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল, সেসব জায়গায় জায়গীরদারদের জায়গীর দেওয়া হয়। সাধারণত এসব অঞ্চল প্রাচীন বিজাপুর ও গোলকুন্ডার প্রান্তে ছিল। জায়গীরদাররা দাগের জন্য সরকার নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৈন্যরা আবারও ঘোড়া পেশ করতে ব্যর্থ হলে তাদের

জায়গীরদারী বাজেয়াপ্ত হত এবং পাইবকী বা বিলি করার উপযোগী জমির অন্তর্ভুক্ত করা হত।

সৈর-হাসিল জায়গীরের জন্য সংঘর্ষ মনসবদারদের কাছে জীবন-মরণের সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায় এবং মুৎসুদ্দিদের জায়গীরদের দ্রুত স্থানান্তরিত করার মত দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের সুযোগ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে ভীমসেন তীব্র অভিযোগ করেছেন। এর ফলে ক্ষুদ্র মনসবদারদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

জায়গীরদারী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অকর্মণ্যতা যথেষ্ট সংখ্যায় জায়গীরের অভাবের জন্য বৃদ্ধি পায়। কাফী খান বলেছেন যে দান করার মত পাইবকী জমির অভাবে এবং অগণিত মনসবদার, বিশেষ করে এবং দক্ষিণী ও মারাঠী মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ায় প্রাচীন অভিজাতদের পুত্র বা খানজাদরা প্রায় চার-পাঁচ বছর জায়গীর লাভ করতে সক্ষম হয় নি। ১৬৯১-৯২ সালে এটি ঘটে। জায়গীরদারদের সংখ্যা যাতে সাম্রাজ্যের সম্পদের চেয়ে বেশী না হয়ে যায় সেজন্য আওরঙ্গজেব নতুন অভিজাতদের নিয়োগ বন্ধ করে দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। বারংবার তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর নতুন কর্মচারীর প্রয়োজন নেই এবং নবনিযুক্তদের কোন তালিকা বা মিসল তাঁর কাছে না দেবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। কাফী খান বলেছেন যে এর ফলে তাঁর শিবিরে এবং যারা বহু বছর নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করেছিল তাঁদের মধ্যে আক্ষেপ দেখা যায়।

ক্ষুদ্র মনসবদারদের ঘন ঘন স্থানান্তরন এবং জায়গীর পাবার আগে নতুন জায়গীরদারের কর্মচারীর কাছে অর্থ দাবী করা, জানানো জায়গীর পাবার আগেই সম্রাটের পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের দাবী এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দোষ ছিল। খানজাদরা বা যারা বহু প্রজন্ম ধরে সাম্রাজ্যের সেবা করেছে এবং যাদের আনুগত্য ও সমর্থন সম্রাটের কাছে মূল্যবান ছিল তাদের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রাচীন অভিজাতদের এতে আনুগত্য নষ্ট হয় এবং যখন এই ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়, অভিজাতরা তখন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগের সন্ধান করতে থাকেন।

দুটি দক্ষিণের রাজ্যজয় করার পর সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব ২৩% বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকবরের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যের ভূমিরাজস্ব অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়। সেজন্য অভিজাতরা নির্ধারিত রাজস্বের একটি ভগ্নাংশ পেতেন নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য। এর ফলে সম্পদের পূর্ণ সৈর জায়গীর পাবার জন্য তীব্র সংঘর্ষ দেখা যায়। পরবর্তী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে কোন অজুহাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে পাইবকী জমি হিসেবে রাখা হলেও প্রকৃত কারণ ছিল যুদ্ধের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধের জন্য অভিজাতদের কোন উৎসাহ ছিল না এবং যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা সকলেই বুঝতে অক্ষম হয়।

আওরঙ্গজেবের সময়ে মনসবদারদের সংখ্যা ঠিক কত বৃদ্ধি পায় সেসম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা সঠিক নয়। আসার আলী দেখিয়েছেন যে একহাজার বা তার বেশী জাটের অধিকারী মনসবদারদের সংখ্যা মাত্র ৩১% বাড়ে। এটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনকে আওরঙ্গজেব দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নীতির দ্বারা তিনি প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করেন। এছাড়াও নবোদ্ভূত প্রশাসনিক ও সামরিক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি কোন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

জায়গীরদারী সমস্যা ক্রমবর্ধমান সামাজিক, প্রশাসনিক ও সামরিক সমস্যার অংশ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের নমনীয়তার অভাব, তাঁর ঔদ্ধত্য ও সন্দেহপূর্ণ স্বভাব এবং রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য সামরিক শক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ অলাভজনক যুদ্ধ চলতেই থাকে, যা জায়গীরদারী সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

কিন্তু এ ঘটনা সত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে আওরঙ্গজেবের শাসনে জায়গীরদারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে অত্যন্ত কৌশলী ও দ্রুতগামী মারাঠাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হলেও উত্তরভারতের সমভূমিতে মুঘল গোলন্দাজবাহিনী ও

অশ্বারোহী সৈন্যরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর যখন শক্তি ও দক্ষতার দিক থেকে মুঘল গোলন্দাজবাহিনী যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে তখনও উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের বিরুদ্ধে মারাঠারা ব্যর্থ হত। ক্রমবর্ধমান অরাজকতা, যুদ্ধ ও মারাঠাদের লুঠতরাজ দাক্ষিণাত্যে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং শিল্প ও কৃষি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, উত্তর ভারতে মুঘল প্রশাসন নিজের শক্তি অক্ষুন্ন রাখে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকে। পরবর্তী সময় পর্যন্ত জেলাস্তরে স্থানীয় প্রশাসন টিকে থাকে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুতরা মুঘলদের পক্ষে কোন সমস্যা ছিল না। তা সত্ত্বেও জায়গীরদারী সমস্যা অভিজাতদের মধ্যে এক কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে যা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

৬.১ কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা- জাঠ, সৎনামী, আফগান এবং শিখদের বিদ্রোহ ঃ

কৃষক বিদ্রোহ ঃ উপজাতীয় নেতৃত্বের অথবা গ্রামীন গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ, মুঘল শাসনের এক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল। প্রায়শই প্রতিরোধকে প্রায়শই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়। একই ভাবে উপজাতীয় বা গোষ্ঠী নেতাদের ও গ্রামীণ সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীকে প্রশাসনিক ও কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত করার জন্য উপঢৌকন, বিশেষ অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এভাবে দমন-নিপীড়ন এবং সন্ধিস্থাপনের প্রচেষ্টা একই সঙ্গে সবসময়ে চলতে থাকে। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের কৃষকবিদ্রোহের নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল তীব্র বিদ্রোহী মানসিকতা, প্রতিরোধ ও স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা গঠিত উন্নততর সংগঠন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিদ্রোহগুলিকে আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বর্ণনার প্রবণতা দেখা যায়। এসব গণসংগ্রামগুলিতে ধর্ম ও আর্থিক শোষনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তাসত্ত্বেও সমস্যাগুলির প্রকৃত কারণ বোঝার ক্ষেত্রে এই ধারণা কোন সাহায্য করে না। মধ্যযুগে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি সংগ্রাম ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ও ধর্মীয় বাণীর আশ্রয় নেয়—এটি অবশ্যই মনে রাখা উচিত। জাঠ ও শিখদের বিদ্রোহের ফলে ভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং একাজে শিখদের আগেই জাঠরা সফল হয়। একটি আলাদা উপজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের জন্য আফগানদের সংগ্রাম ধ্বংস করা হয়। পরবর্তীকালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি আফগান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। এভাবে বহু কৃষক বিদ্রোহেরই স্থানীয় কারণ ছিল।

জাঠ বিদ্রোহ ঃ যমুনার দুই তীরে বসবাসকারী জাঠেদের উপজাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ধারণা ছিল খুব গভীর, যার পরিচয় পাওয়া তাদের উপজাতীয় সংগঠনে। এই সংগঠন থেকে ছাপ (Chhaap) গড়ে ওঠে, যেটি উপজাতীয় সভার মত হলেও তাতে শ্রেণীবিন্যাস ছিল। দোয়াব ও যমুনার তীরবর্তী সমভূমিতে মাত্র কয়েকজন জমিদারের অধীনে কৃষক ছিল জাঠেরা। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র মুঘল এই কৃষকসম্প্রদায়ের জীবনযাপনে সমস্যার সৃষ্টি করে যারা এই অবিচারের প্রতিবাদে অস্ত্রধারণে উদ্যোগী হয়। এভাবে জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনকালে জাঠদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সংঘর্ষের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনে প্রথম একটি বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৬৬৭ সালের প্রথমে গোকলা নামে একজন ক্ষুদ্র জমিদারের নেতৃত্বে মথুরার জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকরা যোগ দিলে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০,০০০ হয়ে দাঁড়ায় এবং বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরের শেষদিকে জাঠদের ক্রমবর্ধমান লুঠতরাজের জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লী থেকে আগ্রায় চলে যান। এক কঠিন সংগ্রামে পরাজয়ের পর গোকলাকে বন্দী করা হয়। নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যার পর তাঁর পুত্রকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং সম্রাটের একজন উচ্চপদাধিকারী ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়।

জাঠেদের সংগ্রামে কৃষকবিদ্রোহের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল। এই সংঘর্ষে ধর্মের প্রায় কোন ভূমিকাই ছিল না।

সৎনামী বিদ্রোহ ঃ ১৬৭২ সালে মথুরার কাছে নারৌলে কৃষকদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সশস্ত্র যুদ্ধ হয়। এসময়ে সৎনামী নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয়। সৎনামীরা ছিল বৈরাগীদের একটি দল যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্মীয় আচার ও কুসংস্কারে বিরোধী। তাদের কর্তৃত্ব ও ধনসম্পদের প্রতি ঘৃণা এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল কৃষক, কারিগর ও নীচুজাতির মানুষ। একজন সমসাময়িক লেখক স্বর্ণকার, ছুতোর, জমাদার, চর্মকার এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে যুক্ত হিসেবে তাদের উল্লেখ করেছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ ও পদাধিকারের পার্থক্য তারা মানত না এবং তাদের নিজস্ব আচরণবিধি ছিল। একজন স্থানীয় কর্মচারীর সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে, এটি শীঘ্রই একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহের চরিত্র নেয়।

সৎনামীরা বহু গ্রামে লুঠ করে এবং স্থানীয় ফৌজদারকে পরাজিত করার পর নারৌল ও বৈরাট শহরের দখল নেয়। সেজন্য আওরঙ্গজেব ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠান, রদন্দাজ খান, রাজা বিষাণ সিংহ ও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তীব্র সংগ্রাম করা সত্ত্বেও এই বিশাল ও সুসংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে জাঠদের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষ ভূমিরাজস্ব দেওয়া বন্ধের রূপ নেয়। ১৬৮১ সালে প্রতিশোধ হিসেবে আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফৌজদার মুলাফত খান জাঠদের গ্রাম সিনসানী দখল করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিনসানীর জমিদার, রাজারাম ঐ অঞ্চলের জাঠদের সংগঠিত করার পর তাদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আগ্রার সঙ্গে বুরহানপুর ও আজমীরের সংযোগরক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ রাজপথে জাঠদের লুঠতরাজ শুরু হয়। এখন এই সংগ্রামের চরিত্রে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। ঐ অঞ্চল থেকে জাঠ ব্যতীত অন্য জাতের জমিদারদের বহিষ্কার এবং জাঠশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে জাঠরা। এভাবে জমিদারীর অধিকারকে কেন্দ্র করে জাঠ ও রাজপুতদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। রাজস্ব সংগ্রহকারী বেশীরভাগ জমিদার ছিল রাজপুত এবং কৃষকদের অধিকাংশই ছিল জাঠ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কচ্ছ রাজপুত শাসক রাজা বিষাণ সিংহকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আহ্বান করেন আওরঙ্গজেব। জাঠরা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ১৬৯১ সালে রাজারাম ও তাঁর উত্তরাধিকারী চূড়ামণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। জাঠ কৃষকদের অসন্তোষ বাড়তে থাকায় তাদের লুঠতরাজ দিল্লী-আগ্রার পথকে পর্যটকদের পক্ষে বিপদসংকুল করে তোলে। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘলদের গৃহযুদ্ধ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে চূড়ামণ একটি পৃথক জাঠ প্রদেশ গড়ে তোলেন। কৃষকবিদ্রোহ হিসেবে যেটি শুরু হয় পরে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং জাঠ নেতাদের শাসিত একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

আফগান বিদ্রোহ ঃ মুঘল ইতিহাসে পাঞ্জাব ও কাবুলের অধিবাসী আফগান উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা ছিল না। আওরঙ্গজেবের শাসনে ১৬৬৭ সালে মুহম্মদ শাহের নেতৃত্বে থাকা মুঘলদের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য ইউসুফজাই উপজাতির নেতার ভাগু বিদ্রোহ শুরু করে। রৌশনারী নামে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনের কঠোর নৈতিকতাপূর্ণ জীবন ও একজন পীরের প্রতি নিষ্ঠার-শিক্ষা এই আন্দোলনের চিন্তাগত পটভূমি তৈরী করে।

এই সংগ্রাম বন্ধ করা গেলেও ১৬৭২ সালে দ্বিতীয়বার আফগান বিদ্রোহ দেখা দেয়। আফ্রিদি নেতা আকমল খান মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আফগানদের আহ্বান জানায়। অবশেষে মুঘল বাহিনী তাকে পরাজিত করে।

১৬৭৪ সালে সুজাত খান নামে একজন উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারী খাইবার অঞ্চলে আফগান আক্রমণের সম্মুখীন হন। রাজপুত নেতা যশবন্ত সিংহ তাঁকে রক্ষা করেন। অবশেষে ১৬৭৪ সালের মাঝামাঝি আওরঙ্গজেব নিজে পেশোয়ারে যান এবং ১৬৭৫ সালের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। শক্তি ও কূটনীতির দ্বারা আফগানদের মধ্যেকার ঐক্য ধ্বংসের পর শান্তি স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে উপজাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কাবুলের শাসনকর্তা, আমীর খাঁ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আফগান বিদ্রোহে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র হিন্দু কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আফগান বিদ্রোহ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিবাজীর উপর মুঘলদের আক্রমণের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে।

শিখ বিদ্রোহ ঃ মুঘলদের শিখ জনগণের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। গুরু নানকের প্রেরণায় পাঞ্জাবে একটি একেশ্বরবাদী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন শিখদের মধ্যে এক নতুন স্বাধীন চেতনার জন্ম দেয়। নানকের উত্তরাধিকারী শিখগুরুদের সঙ্গে আকবরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বিদ্রোহী রাজপুত্র খসরুকে সাহায্য করায় শিখগুরু অর্জনের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু এর ফলে শিখদের উপর অত্যাচার করা হয়নি। অল্প সময়ের জন্য গুরু হরগোবিন্দকে বন্দী করে রাখা ছাড়া শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। শাজাহানের শাসনের প্রথমদিকে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে গুরু হরগোবিন্দ সিংহের কয়েক বার সংঘর্ষ হয়। শিখ আন্দোলনের উদ্ভবের মধ্যেই এই বিরোধের কারণ নিহিত ছিল। ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে এই সংঘর্ষ হয় অতি তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করে। পাঞ্জাবে গুরুর প্রতি নিষ্ঠাবান, একটি নির্দিষ্ট জাতিগত ও ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সমস্ত রকম অবিচারের প্রতিবাদ করতে দৃঢ়সংকল্প একটি ক্ষুদ্র অথচ ক্রমবর্ধমান সম্প্রদায়ের উত্থানে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে অনুগতদের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য মসন্দদের নিয়োগ, গুরু রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র অর্জনের ১৫৮১ সালে নির্বাচনের ফলে বংশানুক্রমিক দ্বারা প্রচলনের ফলে শিখ গুরুবাদের চরিত্রে পরিবর্তন এবং অর্জনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্মারক হিসেবে দু'টি তরবারী বহন সংঘাতের আরও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। একজন পাঠান ও মুঘলদের প্রতি অসন্তুষ্ট বহু ব্যক্তি শিখগুরুর সঙ্গে যোগ দেয়। শিখ গুরুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হবার পর তাদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে মুঘল সম্রাটরা সচেষ্ট হন।

শিখ গুরুদের ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবেরও একই সমস্যা ছিল। যার জন্য ১৬৭৫ সালে গুরু তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এটি ছিল স্থানীয় গণ-বিদ্রোহের সঙ্গে মুঘলদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন মুঘলরা শিখ গুরুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখে তখন শিখদের কাছে তিনি ছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী একজন ধর্মীয় নেতা।

১৬৯৯ সালে আনন্দপুরে গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা নামে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গ জেবের সঙ্গে গুরুগোবিন্দ সিংহের সংঘর্ষের সূচনা হয়। মুঘলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিজয়ী না হলেও তিনি একটি ঐতিহ্য এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র গঠনের অস্ত্র দিয়ে যান শিখদের। একটি সাম্যবাদী ধর্মীয় আন্দোলন কিভাবে গণসংগ্রামে পরিণতি লাভ করে ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় শিখদের বিদ্রোহ ছিল তার দৃষ্টান্ত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি ঃ

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি, মুঘল সম্রাটের ক্ষমতা ও সম্মানহানি জায়গীর ব্যবস্থার চরম সংকট এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রদেশের উত্থান দেখা দেয়, যেগুলি হয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে, নয়তো মুঘলদের অমান্য করে স্রেফ প্রতীকি আনুগত্য স্বীকারে রাজী আছে। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে মারাঠারা কয়েকটি আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৭৬১ সালে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে এই প্রচেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করে। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ বৈদেশিক অভিযানের জন্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দেয়। ১৭৪৮ সালে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর মুঘল রাষ্ট্র আগেকার মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়ায় পরিণত হলেও আঞ্চলিক শক্তিগুলি মুঘল শক্তি নামমাত্র আনুগত্য দেখাতে থাকে।

একক ৭ ❑ মুঘল সমাজ ও অর্থনীতি

গঠন

৭.০ মুঘলদের সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন
৭.১ শাসক সম্প্রদায়—অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী
৭.২ মধ্যবর্তী শ্রেণী
৭.৩ কৃষকদের অবস্থা
৭.৪ অকৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন
৭.৫ রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর

৭.০ মুঘলদের সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌঁছয়। এই সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয়। আকবরের শাসন থেকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু এসময়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখা যায়, গ্রামের জীবনযাপনের মান নির্ধারণের জন্য যাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়। ওইসময়ে বহু ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটক ভারতে আসেন এবং ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণত ভারতের ধনসম্পদ, প্রাচুর্য, শাসকশ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন এবং কৃষক, কারিগর, শ্রমিকদের মত সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের উপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। সাধারণ মানুষদের স্বল্প বেশভূষা দেখে বাবর অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁর মতে কৃষক ও সাধারণ মানুষ প্রায় নগ্নভাবে থাকত। তারপর তিনি লজ্জানিবারণের জন্য পরা কটিবস্ত্রের এবং নারীদের পরিধেয় শাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ তাঁর বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে। ষোড়শ শতকের শেষে র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন যে বারাণসীতে শুধু কটিবস্ত্র ছাড়া মানুষ প্রায় নগ্নভাবে চলাফেরা করত। অন্য একজন পর্যটকের বক্তব্য হল যে শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট বস্ত্র শ্রমিকদের ছিল না। র‍্যালফ ফিচের মতে ভারতের শীতকাল পাশ্চাত্য দেশের গরমকালের মত, যেসময়ে সাধারণ মানুষ মোটা সূতীর পোষাক ও টুপি পরত। একই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে চটি বা জুতোর ব্যবহার সম্পর্কে। নীকিটিনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যে মানুষ খালিপায়ে চলাফেরা করত। মোরল্যান্ড নামে একজন আধুনিক লেখক বাংলা ছাড়া নর্মদার উত্তরে জুতোর সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাননি এবং এর কারণ হিসেবে চর্মের অতিরিক্ত দামের কথা বলেছেন। গৃহ ও আসবাবপত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলার নেই। শহরের মাটীর বাড়ির সঙ্গে গ্রামের বাড়ির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সাধারণ মানুষের খাট ও মাদুর ব্যতীত অন্য আসবাব এবং গ্রামের কুমোরের তৈরী বাসনপত্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তামা ও অন্য মিশ্রধাতুর থালা ও বাসন ছিল ব্যয়সাধ্য এবং গরীব মানুষরা সাধারণত সেগুলি ব্যবহার করত না। ভাত, জোয়ার, রাগী, বাজরা, ডাল এবং পেলসার্ট ও ডি লায়েৎ যাকে খিচুড়ী বলেছেন সেটি প্রধান খাদ্য ছিল এবং বাংলায় ও উপকূল অঞ্চলে মাছ ও সুদূর দক্ষিণ ভারতে মাংস খাওয়া হত। উত্তর ভারতে গম বা অন্য খাদ্যশস্য থেকে প্রস্তুত চাপাটী, ডাল ও সব্জি প্রচলিতখাদ্য ছিল। সাধারণ মানুষ রাত্রেই তাদের প্রধান খাবার এবং দিনে ডাল বা অন্য মুড়িজাতীয় খাবার খেত। খাদ্যশস্যর তুলনায় তেল ঘি অনেক সস্তা ছিল এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। চিনি ও নুনের দাম ছিল বেশী। কাজেই অতিরিক্ত মূল্যের জন্য জামাকাপড় ও জুতো ব্যবহার না করতে পারলেও মানুষ মোটামুটি ভাল খাবার খেতে পারত।

যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি সহজলভ্য হওয়ায় বেশীসংখ্যক পশুপালন করে তারা বেশী দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য পেত। প্রকৃতপক্ষে আয় ও বেতনের উপর জীবনযাপনের মান নির্ভর করত। গ্রামে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন না থাকায় আর্থিক মূল্যের বিচারে বহুসংখ্যক কৃষকের আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। প্রথা অনুযায়ী স্থির করা সামগ্রী দিয়ে গ্রামীণ কারিগরদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। গড়ে প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তিগত জমির পরিমাপ করা ছিল অসম্ভব। প্রাপ্ত তথ্য থেকে গ্রামে যথেষ্ট আর্থিক অসাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব কৃষকের নিজস্ব লাঙ্গল ও বলদ ছিল না এবং যারা জমিদার বা উচ্চবর্ণের লোকেদের জমি চাষ করত তারা কোনভাবে বেঁচে থাকত। ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্পৃশ্যশ্রেণীর লোক ছিল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এই শ্রেণীর মানুষদেরই চরম কষ্ট ভোগ করতে হত।

যেসব চাষীদের নিজস্ব জমি ছিল তাদের খুদকস্ত বলা হত। গ্রামীণ প্রথা অনুযায়ী স্থির করা হারে তারা ভূমিরাজস্ব দিত। তাদের অনেকের অনেক লাঙ্গল ও বলদ থাকায় তারা গরীব চাষীদের সেগুলি ব্যবহার করতে দিত এবং ভূমিহীন কৃষকদের অতিরিক্ত হারে রাজস্ব দিতে হত। এভাবে গ্রামীণ সমাজে যথেষ্ট অসাম্য ছিল। খুদকস্তরা, যারা গ্রামের আদি বসবাসকারী ছিল, তারা অনেকসময়ে গ্রামের প্রতিপত্তিশালী বিশেষ কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জাতিগুলি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারই শুধু নয়, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীদের শোষণও করত। আবার পরিবর্তে জমিদারদের দ্বারা তারা শোষিত হত। গণনার পর দেখা গেছে যে সপ্তদশ শতকের সূচনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২ কোটী ৫০ লক্ষ। তা সত্ত্বেও কৃষিযোগ্য বহু জমি পড়ে থাকায় মনে করা যেতে পারে যে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে যতটুকু জমি নিজেদের সামর্থ্য ও পারিবারিক পরিস্থিতি অনুযায়ী চাষ করা সম্ভব, চাষীরা ততটাই চাষ করত। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি ছিল বহুমুখী। ভারতে গম, চাল, ছোলা, বার্লি, ডাল, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং স্থানীয় কৃষিজ শিল্পের প্রয়োজনীয় বহু ফসলের চাষ হত। এগুলির মধ্যে তুলো, নীল, চৈ, আখ, তৈলবীজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসব ফসলের জন্য নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব দিতে হওয়ায় এগুলিকে নগদ বা উন্নততর ফসল আখ্যা দেওয়া হত। দামের বৃদ্ধি ও হ্রাসের উপর নির্ভর করে চাষীরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ফসল চাষ করতনা, নতুন ধরনের শস্য চাষেও তারা আগ্রহী ছিল যদি সেটি লাভজনক হত। সপ্তদশ শতকে দুটি নতুন ফসল—তামাক ও ভুট্টার চাষ শুরু হয়। ওইসময় বাংলায় সিল্ক ও তসরের উৎপাদন এত বেড়ে যায় যে চীন থেকে সিল্ক আমদানী করার প্রয়োজন ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলু ও লাল লঙ্কার চাষ শুরু হয়। সপ্তদশ শতকে শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাদ্যের যোগান দিতে গ্রামীণ উৎপাদন সমর্থ হয়। ওইসময়ে ভারত থেকে কিছু প্রতিবেশী দেশে খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হত। শিল্পের বিস্তার, বিশেষত বস্ত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান দিতে কৃষি উৎপাদন সমর্থ হয়। মুঘল রাষ্ট্র কৃষির বিস্তার ও উন্নতির উদ্দেশ্যে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা ও কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু স্থানীয় প্রচেষ্টা ও মূলধন বিনিয়োগ ছাড়া কৃষির বিস্তার ও উন্নতি অসম্ভব ছিল। এজন্য বলা যায় যে ভারতীয় কৃষকরা সর্বদা রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিমুখ ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে নতুন উৎপাদনব্যবস্থার প্রচলন না হলেও ভারতীয় কৃষিতে ভারসাম্য থাকায় সেটি ক্রমবর্ধমান শিল্পউৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মধ্যযুগে যতদিন পর্যন্ত সে রাজস্ব দিত, সেটি ততদিন পর্যন্ত কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করা যেত না। গোষ্ঠীর অনুমতি অনুসারে এবং উপযুক্ত ক্রেতা খুঁজে পেলে সে নিজের জমি বিক্রি করতেও পারত। কৃষকের মৃত্যুর পর জমির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা। ভূমিরাজস্বের হার খুব বেশী, মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক হলেও কৃষির উন্নতি ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগের অধিকার কৃষকদের ছিল। কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন কষ্টকর হলেও সে যথেষ্ট পরিমাণে খেতে এবং জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারত। তার জীবন ধারনের ধরণ নির্ভর করত কিছুটা ঋতু, এবং কিছুটা লোকাচারের উপর— যেখানে মেলা, তীর্থযাত্রা, পার্বণ ইত্যাদির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের জীবনে ভূমিহীন কৃষক, কারিগর ও শ্রমিকদের একটি অংশের জীবন ছিল অনেক বেশী কষ্টকর। শহরের একটি বড় অংশ দরিদ্র কারিগর, ক্রীতদাস, সৈন্য ও খেটে খাওয়া মজুরদের নিয়ে গঠিত ছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বক্তব্য অনুসারে অত্যন্ত নিম্নস্তরের এক ভৃত্যের মাসিক বেতন পাঁচ টাকার কম ছিল। অধিকাংশ শ্রমিক ও সৈন্যরা প্রথম কাজে যোগ দিত মাসে তিন টাকার বিনিময়ে। মোরল্যান্ড লিখেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে কর্মচারীদের বেতন বিশেষ না বাড়ায় তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পেলেও তাদের পক্ষে বস্ত্র, চিনি কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এ থেকে মোরল্যান্ড সিদ্ধান্ত করেন যে বৃটিশ শাসনে ভারতীয়দের অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটেনি। কিন্তু এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখা উচিত। সপ্তদশ শতকে যেখানে সম্পদ ও আয় বিশেষ বাড়েনি, সেখানে বৃটিশ শাসিত ভারতে উদ্যমশীলতার অভাব এবং জীবনযাপনের মানের অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

৭.১ শাসক-সম্প্রদায়—অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী ঃ

মধ্যযুগে ভারতে শাসক সম্প্রদায় গঠন করে অভিজাতরা ও জমির মালিকেরা বা ভূস্বামীরা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল অভিজাতরা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। কাগজেকলমে মুঘল অভিজাত হবার পথ ছিল সবার জন্য খোলা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বা বিদেশী অভিজাতবংশজাত ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত। ইরান, খোরাস্তান, তুরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বেশীরভাগ মুঘল অভিজাতদের নিয়োগ করা হত। বাবর তুর্কী হওয়া সত্ত্বেও মুঘলরা কখনোই জাতিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করে নি। প্রসিদ্ধ আফগান অভিজাতদের বাবর নিজের দিকে টানার চেষ্টা করলেও তারা অশান্ত, বিশ্বাসের অযোগ্য ও আনুগত্যহীন প্রমাণিত হয়। আকবরের শাসন পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে মুঘল ও আফগানদের মধ্যে সংঘর্ষ চললেও জাহাঙ্গীরের সময় থেকে অভিজাত হিসেবে আফগানদের নিয়োগ শুরু হয়। শেখজাদা বা হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত ভারতীয় মুসলমানদের নিয়মিত নিয়োগ করা হত। আকবরের সময় থেকে রাজপুতরাও মুঘল অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মধ্যে কচ্ছ রাজপুতরা বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। কিছু গবেষকের হিসেব অনুসারে আকবরের শাসনে ১৫৯৪ সালে অভিজাতদের মধ্যে ১৬% ছিল হিন্দু। কিন্তু এই সংখ্যা থেকে হিন্দুদের অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়না। রাজা মানসিংহ ও রাজা বীরবল আকবরের বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজা টোডরমলের যথেষ্ট ক্ষমতা ও সম্মান ছিল। অভিজাত হিসেবে নিযুক্ত রাজপুতরা সাধারণত বংশানুক্রমিকভাব রাজা, অভিজাত বংশ ও রাজার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবার থেকে আসত। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের গৌরব বাড়ে। তা সত্ত্বেও সাধারণ পরিবার থেকে আসা মানুষদের অভিজাত হিসেবে পদোন্নতি ও খ্যাতিবৃদ্ধির সুযোগ ছিল। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের মধ্যে স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। উভয় সম্রাটই মনসবদারী ব্যবস্থার দ্বারা অভিজাতদের সুসংহত করা, নিয়মানুযায়ী পদোন্নতি, শৃঙ্খলা এবং রাজকীয় কার্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। অন্য কোন দেশের তুলনায় মুঘল অভিজাতদের বেতন ছিল অত্যন্ত বেশী। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটদের উদারতা এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি মুঘল রাজদরবারে আসেন। এর ফলে অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে প্রতিভার নিগর্মন দেখা দেয়। ভারতে মুঘল রাজসভায় কাজের সন্ধানে ইরানী, তুরানী ও অন্যান্যদের আগমন সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার মন্তব্য করেছেন যে, মুঘল অভিজাতবর্গ গঠিত ছিল বিদেশীদের নিয়ে। বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ভারতে আসতে থাকেন, মুঘল রাজসভায় কাজের মাধ্যমে খ্যাতিলাভ করেন এবং ভারতেই তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হয়। এভাবে মধ্যযুগে ভারতে অতীতের মতই বহু বিদেশীর আগমন ঘটে, যারা ভারতীয় সমাজের, যারা একে অপরকে এখানে আকর্ষণ করেছেন। অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের নিজস্ব কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। একই সঙ্গে মুঘল অভিজাতদের মধ্যে আফগান, ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসময়ে হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে একটি নতুন

গোষ্ঠী ছিল মারাঠারা। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন জাহাঙ্গীর তাদের প্রথম নিজের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। শা-জাহান এই নীতি বজায় রাখেন। যেসব মারাঠা সর্দাররা শাজাহানের অধীনে নিযুক্ত হন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিবাজীর পিতা শাহজী, যদিও শীঘ্রই তিনি দলত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেবও বহু মারাঠা ও দক্ষিণী মুসলমানদের নিয়োগ করেন। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের ২৪% হিন্দুরা গঠন করলেও, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগে অভিজাতদের ৩৩% ছিল হিন্দু এবং তাদের সংখ্যা দেড়গুণ বেড়ে যায়। হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলেন মারাঠী।

মুঘল অভিজাতরা অত্যধিক বেতন পেলেও তাদের খরচও ছিল যথেষ্ট বেশী। প্রত্যেক অভিজাতের ভৃত্য ও অনুচরবর্গ এবং বহু অশ্ব ও হস্তীর আস্তাবল এবং বিভিন্ন ধরনের যান থাকত। তখনকার দিনে আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তির সমৃদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে অভিজাতদের অনেকে বহু নারীকে হারেমে রাখতেন। অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অভিজাতরা মুঘল সম্রাটদের অনুকরণ করতেন। প্রবাহিত জলধারা ও ফলের গাছে পূর্ণ বাগানবাড়ীতে তাঁরা থাকতেন। অত্যন্ত দামী পোষাক এবং সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। একটি বিবরণ অনুসারে প্রত্যেকবার খাবার সময়ে আকবরের জন্য প্রায় ৪০টি পদ প্রস্তুত করা হত। সুবিধাভোগী শ্রেণীরা সমরখন্দ ও বোখারা থেকে উৎকৃষ্ট মানের ফল আনার জন্য প্রচুর খরচ করতেন। নরনারীদের ব্যবহৃত অলঙ্কার ছিল মূল্যবান সামগ্রীর অন্যতম। পুরুষদের মধ্যে রত্নখচিত কর্ণভূষণ ব্যবহারের প্রচলন করেন জাহাঙ্গীর। বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যয়নির্বাহের জন্য ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে গয়না ব্যবহার করা হত। মুঘল সম্রাটকে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় উপঢৌকন ছিল ব্যয়ের একটি ক্ষেত্র। এটি মনে রাখতে হবে যে দেয় উপহারের মূল্য একজনের ব্যক্তিগত সম্পদের উপর নির্ভর করে স্থির করা হত। মুঘল সম্রাটের কাছ থেকেও প্রতিদানে অভিজাতরা উপহার পেতেন।

যদিও সঞ্চয়ের পরিবর্তে ব্যয়ই মধ্যযুগে শাসকশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অল্প সংখ্যক ধনী ব্যক্তিই ঋণভার থেকে মুক্ত থাকতেন এবং নিজেদের সন্তানদের বিশাল সম্পত্তি দান করতেন, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনীতির অগ্রগতিতে অভিজাতরা সাহায্য করেন। সম্রাটের উপহার দেওয়া জমি কিনে যেখানে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, সেখানে তাঁরা ফলের বাগান ও বাজার স্থাপন করেন যাতে সেগুলির ভাড়া এবং বেচাকেনার দ্বারা তাঁদের আয় বাড়ে। তাঁরা ব্যবসায়ীদের সুদে টাকা ধার দিতেন ও ব্যবসায়ীদের নামে বা তাদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসায় অংশ নিতেন। তাঁর লেখার একটি বিশেষ অংশে আবুল ফজল অভিজাতদের লাভজনক বাণিজ্যে ও ব্যবসায় কিছু অর্থ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মুসলমানদের আইন অনুসারে সুদে টাকা ধার দেওয়া ঘৃণ্য হলেও, আবুল ফজল অভিজাতদের সুদের বিনিময়ে অর্থ বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত না হতে বলেছেন, যা সমসাময়িক মূল্যবোধের পরিচায়ক। ঐ সময়ের বাণিজ্যিক বিনিয়োগে নিয়োজিত অভিজাতদের সঠিক অংশ নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন। কখনো রাজপুত্ররা বা অভিজাতরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিছু বিশেষ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করত এবং স্বল্প মূল্যে নিজেদের সামগ্রী ও শ্রম বিক্রীতে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের বাধ্য করত। কিন্তু সেগুলি কারিগরদের দ্বারা পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার মত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। রাজপুত্র, রাজকন্যা, হারেমের মহিলা প্রমুখ রাজপরিবারের সদস্যদের অনেকসময় নিজস্ব জাহাজ থাকত এবং তারা সেই সব জাহাজে পণ্য পরিবহণ করে ভাড়া হিসেবে অর্থ আদায় করত। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের একজন অভিজাত মীরজুমলার পারস্য, আরব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক হারে বাণিজ্যের জন্য নিজস্ব নৌবাহিনী ছিল। অর্থ ও বাণিজ্যের প্রতি লোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে আওরঙ্গ জেবের মুখ্য কাজীও বাণিজ্যে অংশ নেন, যা তিনি সম্রাটের কাছে লুকোতে চেষ্টা করেন। এভাবে মুঘল অভিজাতদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও চিত্রশিল্পী, গায়ক, যন্ত্রবাদক, পারসী ও হিন্দী কবি, বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে অভিজাতরা একটি মিশ্র সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সফল হয়। জমিই আয়ের মূল উৎস হওয়ায়, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের হলেও ক্রমশ আমলাতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে দেখা যায়।

এভাবে মুঘল রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রতিফলিত করে। এই আর্থিক অগ্রগতি ভারতবর্ষকে ধনতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারত কিনা তা বলা কঠিন হলেও ভারতে আর্থিক উন্নতি কতটা ঘটে এবং এই পরিবর্তনের চরিত্র অনুসন্ধানই আমাদের চিন্তার মুখ্য বিষয়। সপ্তদশ শতকে অভিজাতদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত, জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের ফলে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে অভিজাতদের কর্মদক্ষতার অবনতি ঘটে ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়।

জমিদার ও গ্রামীণ ভূস্বামী সম্প্রদায়

আবুল ফজল এবং সমসাময়িক লেখকদের রচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ছিল অতি প্রাচীন। উত্তরাধিকারের উপর জমির স্বত্ব নির্ভর করত। কিন্তু সব সময়ে জমিতে নতুন মালিকানারও সৃষ্টি হত। ঐতিহ্য অনুসারে যে কোন জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসত, সেই জমির মালিকানা পেত। সেসময়ে ভারতে প্রচুর কৃষিযোগ্য জমি সহজলভ্য ছিল। একদল উদ্যমী ব্যক্তিদের পক্ষে নতুন গ্রাম স্থাপন করা বা পতিত জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা কঠিন ছিল না। ওই কৃষিযোগ্য জমির তারা মালিক হতে পারত এবং কয়েকটি গ্রাম থেকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার বংশানুক্রমে কয়েকজন জমিদার ভোগ করত। এই অঞ্চলকে তার খাস তালুক বা জমিদারী বলা হত। কেন্দ্রীয় শক্তির হয়ে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের বিনিময়ে জমিদাররা কিছু অঞ্চলে রাজস্বের ২৫% পর্যন্ত পেতে পারত। নিজের জমিদারীর সমস্ত জমির মালিক জমিদার ছিল না। নিয়মিতভাবে ভূমি রাজস্ব দিলে তাদের চাষ করা জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করা যেত না। এভাবে জমির উপর জমিদার ও কৃষক উভয়েরই বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল। জমিদারদের উপরে ছিল স্থানীয় রাজারা ছোটবড় নানা ক্ষুদ্র অঞ্চলে তারা বিভিন্ন স্তরের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করত। পারস্যদেশীয় লেখকরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধীন হিসেবে দেখানোর জন্য তাদের জমিদার আখ্যা দিলেও, ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদারদের থেকে রাজাদের স্থান ছিল উপরে। এভাবে গ্রামীণ সমাজসহ মধ্যযুগীয় সমাজ খন্ডিত এবং বহু স্তরে বিন্যস্ত ছিল। জমিদারদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তারা তাদের সমৃদ্ধির ও আশ্রয়ের প্রতীক হিসেবে গড় বা ছোট দুর্গে বাস করত। জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনী ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুসারে আকবরের সময়ে জমিদারদের ৪২, ৭৭, ০৫৭ পদাতিক ও ৩, ৮৪, ৫৫৮ অশ্বারোহী, ১৮৬৩ হস্তী, এবং ৪২৬০টি কামান ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় থাকায় জমিদাররা কখনোই একই স্থানে তাদের সৈন্য একত্রিত করতে পারত না। অধীনস্থ রাজাদের সৈন্যরাও হয়ত এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের জমিদারীতে বসবাসকারী কৃষকদের সঙ্গে জাতি, বংশ বা উপজাতীয় ভিত্তিতে জমিদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জমির উৎপাদনক্ষমতা সম্পর্কে তাদের কাছে যথেষ্ট স্থানীয় তথ্য থাকত। সমগ্র দেশ জুড়ে দেশমুখ, পাতিল, নায়ক নামে পরিচিত জমিদাররা একটি যথেষ্ট শক্তিশালী শ্রেণী ছিল। সেজন্য কোন কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে তাদের প্রতি উদাসীন থাকা বা তাদের বিরাগভাজন হওয়া সহজ ছিল না।

জমিদারদের জীবনযাপনের মান সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। অভিজাতদের তুলনায় তাদের আয় ছিল সীমিত। ক্ষুদ্র জমিদাররা কৃষকদের মত করেই জীবন কাটাত। বড় জমিদারদের জীবনধারণের মান ক্ষুদ্র রাজা বা অভিজাতদের মতই ছিল। অধিকাংশ জমিদার গ্রামে বাস করত এবং তারা একটি ঢিলেঢালা গ্রামীণ ভূস্বামী সম্প্রদায় গঠন করেছিল। জমিদাদেরা শুধুমাত্র জমির অধিকার দখলের জন্য সংঘাতে লিপ্ত থাকতেন ও নিজেদের এলাকায় কৃষকদের অত্যাচার করতেন—এই ধারণাটি যথাযথ নয়। নিজস্ব জমিদারীতে জমির মালিক কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতি ও বংশগত দিক থেকে জমিদারদের অনেকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটি সামাজিক জীবনের শুধু মান নির্দিষ্ট করা নয়, এই জমিদাররা নতুন গ্রাম স্থাপন, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ ও প্রয়োজনীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতেন।

৭.২ মধ্যবর্তী শ্রেণী

মধ্যযুগে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার বলেছেন যে ভারতে কোন মধ্যবর্তী শ্রেণী ছিল না, মানুষ হয় প্রচুর ধনসম্পদ বা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। কিন্তু এই বক্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বলতে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের বোঝালে ভারতে বিশালসংখ্যক বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিল এবং তাদের কয়েকজন সেসময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ঐতিহ্য এবং জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার নীতির উপর ভিত্তি করে এইসব ব্যবসায়ীরা নিজস্ব অধিকার ভোগ করত। কিন্তু শহরের প্রশাসন পরিচালনার কোন দায়িত্ব তাদের ছিল না। ইউরোপে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বণিকরা এধরনের অধিকার অর্জন করে। ফ্রান্স ও বৃটেনে যখন শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তখন এইসব অধিকার খর্ব করার প্রবণতা দেখা দেয়। যদি মধ্যবর্তী শ্রেণী বলতে এমন শ্রেণীকে বোঝায় যাদের জীবনযাত্রার মান ধনী ও দরিদ্রদের জীবনযাপনের মানের মধ্যবর্তী, তাহলে মধ্যযুগের ভারতে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী ছিল। এদের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র মনসবদার, দোকানদার, দক্ষ কারিগরদের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং হাকিম, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, ঐতিহাসিক, কাজী, উলেমাদের মত পেশাদারী শ্রেণী। মুঘল প্রশাসনে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারীও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ত। যেখানে সাধারণ কর্মচারীদের নগদ বেতন দেওয়া হত ও দুনীর্তির পথে তারা তাদের আয় বাড়াত, সেখানে বিদ্বজ্জন, উলেমাদের পারিশ্রমিক হিসেবে অল্প জমি দেওয়া হত। এই দান করা জমিকে মুঘল প্রশাসনের ভাষায় মাদাদ-ই-মাস এবং রাজস্থানে সামান বলা হত। মুঘল সম্রাট ব্যতীত অভিজাত, স্থানীয় শাসক ও জমিদাররা এভাবে জমি দান করতেন। এই দানগুলির জন্য প্রত্যেক নতুন শাসকের অনুমতি আবশ্যক হলেও ক্রমশ সেগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রদত্ত জমির অধিকারীরা গ্রামীণ ভূস্বামী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে। লেখক, ঐতিহাসিক ও উলেমারা একই শ্রেণীভুক্ত ছিল। বিভিন্ন অংশের স্বার্থ পৃথক হওয়ায় মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা কোন নিজস্ব শ্রেণী গঠন করেনি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও জাতি থেকে তারা আসত।

৭.৩ কৃষকদের অবস্থা

বর্তমানের মতই মুঘল যুগে ভারত প্রধানত কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল এবং জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশী মানুষ গ্রামে বাস করত। ড. এ. এন. শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে মানুষ ও পণ্যে পরিপূর্ণ এই দেশ কৃষিযোগ্য ও পশুচারণের উপযুক্ত জমি এবং জ্বালানীসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার্য অরণ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত বহু গ্রামে বিভক্ত ছিল। বসবাসের চরিত্র অনুযায়ী গ্রামগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হত। কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা স্থান পরিবর্তন করত না এবং পরিত্যক্ত গ্রামের জমি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দ্বারা অধিকৃত হলে সেই গ্রামকে দাখিলি বলা হত। তালুক ও রায়তি হিসেবেও গ্রাম ভাগ করা থাকত। রায়তি গ্রামে নিজের চাষ করা জমির মালিকানা কৃষক ভোগ করত এবং রাষ্ট্র সরাসরি তার কাছ থেকে রাজস্ব নিত। নিজের অধীনস্থ তালুক গ্রাম থেকে জমিদার ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করত।

কৃষকদের চাষের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় জলসেচের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে নদী, জলধারা, কূপ ও জলসেচের জন্য ভারতে কাটা কোন খাল ছিল না। তাঁর বর্ণনা অনুসারে কূপের কাছে থাকা কাঠের কপিকলের সাহায্যে বালতি করে জল তোলা হত। একজন লোক বলদদের চালনা করত, অন্যজন জল তুলত। বলদদের মল-মূত্র লেগে দড়িটি নোংরা হয়ে যাবার পরও সেটি কুয়োয় ফেলা হত। কিছু ফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল পুরুষ ও মহিলারা কলসী করে বয়ে নিয়ে যেত। এভাবে ফসল প্রধানত বৃষ্টির উপরে

নির্ভরশীল ছিল। অনাবৃষ্টি ঘটলে অত্যন্ত অল্প শস্য উৎপাদনের ফলে কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দুর্ভিক্ষের সময়ে কৃষক ও গ্রামের অন্যান্য মানুষদের চরম দুর্দশা ভোগ করতে হত।

'আকবরের মৃত্যুর সময়ের ভারতবর্ষ' বইয়ে মোরল্যান্ড লিখেছেন যে বৃটিশ শাসনের তুলনায় মুঘলদের অধীনে ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। প্রধানত দুটি কারণে শ্রমিকেরা খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলে যেতে পারতনা। সেসময়ে শহরে বড় শিল্প না থাকায় কাজের সুযোগ কম ছিল এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিকরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে প্রয়োজনমত তাদের শ্রম পাওয়া যাবে না ভেবে জমিদাররা শ্রমিকদের শহরে যেতে দিত না। মোরল্যান্ড আরও উল্লেখ করেছেন যে স্বাভাবিক সময়েও কৃষকদের বস্ত্র, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না এবং কখনো কখনো তাদের খাদ্যাভাব দেখা দিত। যখন প্রতিকূল আবহাওয়ায় স্বাভাবিক পরিমান ফসলের উৎপাদন হত না তখন কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উভয়েরই অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হত। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিদ্রোহের মত দুর্যোগ তাদের কষ্টকে বাড়িয়ে তুলত এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটাত। জাহাঙ্গীরের সময়ে বিদেশী পর্যটক ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট লিখেছেন যে সাধারণ মানুষ এমন চরম দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে বাস করত যে তাদের জীবন অভাব-অনটনের মূর্ত প্রতীক ছিল। পেলসার্ট মোরল্যান্ডের বক্তব্য মুঘল শাসনে কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ ছিল না। তাকে সমর্থন করেছেন। ডঃ দত্ত লিখেছেন যে শাজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচারে কৃষকরা বিপন্ন বোধ করত এবং অনেকে ভিক্ষা করার পথ বেছে নিত।

মুঘল শাসনে কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—মোরল্যান্ডের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বহু ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রতিবাদ করেছেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের যুক্তি ছিল যে আকবরের সময়ে কৃষকদের জীবনে দুর্দশার কোন প্রমাণ নেই এবং একমাত্র দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব দেখা দিত না। তারা চাঁদ লিখেছেন যে মুঘল শাসনে নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী চাষ করা সম্ভব এমন মাপের জমিই সকলের থাকত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে জমি টুকরো টুকরো করে ভাগ করা হয়নি এবং অলাভজনক জমির সমস্যা সৃষ্টি হয় নি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল আমলে কৃষকের জমির আয়তনই শুধু বড় ছিল না, তার ফলনশীলতাও উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরীদের থেকে অনেক বেশি ছিল। মোরল্যান্ডের বক্তব্যকে জাফর এবং ইরফান হাবিবও অস্বীকার করেছেন (History of the Freedom Movement in India –Vol. I Page – 185 Some Culural Aspects of Muslim Rule in India- S.M. Jaffar Chapter II Economic Conditions The Agrarian System of Mughal India– Irfan Habib).

প্রাচীনকালের ও স্বাধীনতার পূর্বের অবস্থা থেকে মুঘল যুগে গ্রামীণ জীবন কিছুমাত্র পৃথক ছিল না। কুয়োসমেত কয়েকটি মাটীর বাড়ী ও মাটীর কাঁচা পথ নিয়ে এক একটি গ্রাম যেন সবুজ প্রান্তর ও গাছগাছালিতে ঘেরা এক একটি দ্বীপ। মুঘল সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যাই ঘটুক না কেন অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্তভাবে, সুখ ও শান্তির সঙ্গে বাস করত। সাধারণ মানুষের চাহিদা ও গৃহের বিভিন্ন সামগ্রী ছিল খুবই কম। খড়ের চালযুক্ত মাটীর বাড়ীতে স্বল্প বস্ত্র ও বাসনপত্র নিয়ে অধিকাংশ মানুষ বাস করত। প্রত্যেক গ্রামে কুমোর, ছুতোর, চর্মকার এবং খাবারের কিছু দোকান থাকায় গ্রামের মধ্যেই সকলের প্রয়োজন মিটত। সরল জীবন-যাপন করায় অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যবান এবং প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করার উপযুক্ত হত। শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মসজিদ ও মন্দিরের সংলগ্ন অঞ্চলে গাছের ছায়ায় বসে মৌলভী ও ব্রাহ্মণরা ছাত্রদের পড়াতেন। সাধারণভাবে অধিকাংশ সময়ে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করলেও বিবাহ, মেলা, উৎসব উপলক্ষ্যে মানুষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। এভাবে গ্রামীণ সমাজ প্রাচুর্য না হলেও পরিতৃপ্তির সঙ্গে শান্তিতে বাস করত। গ্রামের সব প্রয়োজন গ্রামের সীমানার মধ্যেই মিটে যাওয়ায় প্রতিটি গ্রাম পরস্পরবিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল ছিল।

প্রত্যেক সমাজে যেমন কিছু বিভাগ ও স্তরবিন্যাস থাকে তেমনই মধ্যযুগে গ্রামের সমাজেও আর্থিক, সামাজিক

ও ধর্মীয় বিচারে কিছু শ্রেণীবিভাগ ছিল। ডঃ ইরফান হাবিবের মতে আর্থিক ক্ষমতা ও অধিকারের ভিত্তিতে মুঘল গ্রামসমাজকে চার ভাগে ভাগ করা যেত। জমিদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ীরা প্রথম শ্রেণীতে, ধনী কৃষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অধিকাংশ সাধারণ কৃষক তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ভূমিহীন শ্রমিক ও চামার নামে পরিচিত চর্মকার ও ধানক নামের আবর্জনা পরিষ্কারক অস্পৃশ্য জাতিরা চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল। কৃষক ও জমিদারদের বিস্তৃত জমিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই চতুর্থ শ্রেণীর মানুষরা চাষ করত এবং ফসল কাটার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কৃষক পরিবারকে এদের উপর নির্ভর করতে হত। কৃষি ব্যতীত যাদের অন্যকিছু জীবিকা ছিল তারাই এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারত। কাজেই চামার ও ধানক শ্রেণীর লোকেরাও কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করত। গ্রামে জাতিভেদপ্রথার যথেষ্ট প্রভাব থাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করা নিম্নজাতের মানুষেরা কৃষিকার্য করতে ও নিজেরা জমির মালিক হতে পারত না। এভাবে জমিদার ও এক বিশেষ জাতের কৃষকদের অধীনে তাদের প্রায় ক্রীতদাসের মত থাকতে হত। জাতিভেদের দ্বারা সৃষ্ট বংশানুক্রমিক বিভেদ কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে শ্রমের এক অপরিবর্তনীয় বিভাজন করে দেয়। গ্রামের মধ্যে নাপিত, কাঠুরে কুমোর সকলের কাজই বিশেষ জাতির, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি পরিবারের মধ্যে সীমিত ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনেই প্রত্যেক গ্রামে কিছু প্রাথমিক শিল্প থাকত। গ্রামের জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশী অংশ জুড়ে ছিল কৃষকরা। সাধারণত একজাতের হলেও অন্য জাত বা মূল জাতের কোন শ্রেণী থেকে তারা আসত। কৃষির বাইরে কিছু ক্ষেত্রেও কৃষকরা একযোগে কাজ করত এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ছিল একযোগে কাজ করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা একত্রিত হত সেটি ছিল স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আক্ষরিক অর্থে পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হলেও গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হত, যেটিকে জনস্বার্থ সংক্রান্ত সকল বিষয় পরিচালনা করত। সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ইচ্ছা অনুসারে গ্রামের মোড়ল সর্বদা কাজ করত। বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তুচ্ছ কলহের মীমাংসা করত পঞ্চায়েত যার সিদ্ধান্ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল।

রাষ্ট্র বা প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ যোগ না থাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে গ্রামীণ কর্মচারী বেশীসংখ্যক না থাকলেও, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামপ্রধান সরকার ও গ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করত। গ্রামপ্রধান উত্তর ভারতে মুকদ্দম এবং দাক্ষিণাত্যে পাতিল নামে পরিচিত ছিল। একটি গ্রামে একাধিক গ্রামপ্রধান থাকতে পারত এবং কয়েকটি গ্রামে একাধিক মোড়ল থাকার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সে নিজে সাধারণত একজন কৃষক হলেও কখনো কখনো গ্রামপ্রধানের পদ বহিরাগতদের দ্বারা ক্রয়যোগ্য হওয়ায় শহরের অধিবাসী কোন ব্যক্তিও গ্রামের মোড়ল হতে পারত। নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ রাজস্বসংগ্রহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হলে গ্রামপ্রধানকে পদচ্যুত করে একজন নতুন গ্রামের মোড়ল নিয়োগ করার ক্ষমতা ভোগ করত। যেসব গ্রামে গ্রামসমাজের ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে সেসব গ্রামে মুকদ্দমদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মুকদ্দমের প্রধান কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করা যার পরিবর্তে সমগ্র সংগৃহীত রাজস্বের $২\frac{১}{২}\%$ তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পেত। সাধারণত সন্দেহ করা হত যে নিজেদের হাতে ছেড়ে দিলে নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়াও দুর্বল চাষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করবে মুকদ্দমরা। যখন সরকার মুকদ্দমদের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দিত, তখন দালাল হিসেবে কিছু অর্থ পেত মুকদ্দমরা। কিছু প্রথানুযায়ী স্থির করা করও গ্রামবাসীদের থেকে তারা সংগ্রহ করত। গ্রামের উপর মুকদ্দমের শাসনক্ষমতা শুধুমাত্র আর্থিক ছিল না, গ্রামে সংঘটিত যেকোন অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হত। গ্রামের পাটোয়ারী বা হিসেবরক্ষক ছিল একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। সে গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখত। জমির মালিকানা ও সম্পত্তিসংক্রান্ত অন্য বিষয় সে নথিবদ্ধ করত। গ্রামসমাজের ভৃত্য হিসেবে তাদের স্বার্থে পাটোয়ারীরা কাজ করবে আশা করা হলেও সবসময়ে সেটি হত না।

শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে ডঃ তারা চাঁদের কয়েকটি পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে গ্রামগুলি তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী ছিল। প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা ছিল আত্মনির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র,

আসবাব প্রভৃতি সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তারা তৈরী করত। গ্রামের কৃষকরা খাদ্যশস্য, মশলা, তৈলবীজ, আখ, তুলো চাষ, কারিগররা কাঠ, পেতল, তামা, লোহার আসবাব, যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র তৈরী, শিল্পীরা কাপড় রং এবং চামড়ার সামগ্রী তৈরী করত ও বাড়ী বানাত। কৃষির পদ্ধতি এবং কুটীর শিল্পের যন্ত্রপাতি ছিল প্রাচীন। যন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিল না। মানুষের দৈহিক শ্রম, ঘোড়া ও গবাদি পশুরা প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিত। গ্রামে দক্ষ কারিগরদের নিজেদেরই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হত। একই গ্রামে প্রায় সমস্ত শস্যের উৎপাদন হত। নির্দিষ্ট জাতের বংশানুক্রমিক কারিগররা প্রাচীন পরম্পরাগত পদ্ধতিতে শিল্পপণ্য উৎপাদন করত। প্রথাদ্বারা স্থির করা জিনিসের দাম ও কারিগরদের পারিশ্রমিক কিছু দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া হত। মুদ্রার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত না থাকায়, বিভিন্ন সামগ্রীর বেচাকেনা হত বিনিময় ও শ্রমদানের মাধ্যমে। জমি বহুদূর বিস্তৃত হলেও অধিকাংশ মানুষ স্থিতাবস্থাই পছন্দ করত। মানুষ পরিতৃপ্ত থাকায় পরিবর্তন ও অগ্রগতির কোন প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যেত না।

৭.৪ অকৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন

অধ্যাপক এস. এম. জাফরের বক্তব্য অনুসারে, মুঘল শাসনে মানুষের জীবনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মত শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। ব্যক্তিগত এবং সরকারী উদ্যোগে শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব কারখানা গড়ে তোলে এবং জনস্বার্থমূলক কার্যের জন্য সৃষ্ট বিশেষ বিভাগের উপর এগুলির দায়িত্ব দেয়। ডঃ ইবন হাসানের মতে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসেবে আকবর প্রতিদিন বিকেলে কারখানার কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। আবুল ফজল লিখেছেন যে শিল্প উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি জনসাধারণকে শেখানোর জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক ও কারিগর নিয়োগের ক্ষেত্রে আকবর যথেষ্ট দৃষ্টি দিতেন। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আমেদাবাদের রাষ্ট্রীয় কারখানায় প্রচুর উৎকৃষ্টমানের পণ্য উৎপাদন করা হত। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধিমান কারিগরদের কর্মদক্ষতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দেশে প্রস্তুত সামগ্রীর মতই বিভিন্ন পণ্য মুঘল কারখানাগুলি উৎপন্ন করত। সাধারণভাবে সূক্ষ্ম জিনিসের চাহিদা বাড়তে থাকে। বার্ণিয়ারের বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেক মুঘল দুর্গেই কারখানার জন্য বিস্তৃত কক্ষ থাকত। সূচীশিল্পের কারিগর, স্বর্ণকার, চিত্রশিল্পী, ছুতোর, যন্ত্রের শ্রমিক, দর্জি, চর্মকার, রেশম, ভেলভেট, মসলিনের বস্ত্রশিল্পীরা কারখানায় প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করত। রেশম, ভেলভেট, মসলিন দিয়ে পাগড়ী, কটিবন্ধ, সুতোর কাজ করা মহিলাদের পোষাক তৈরী হত। শুধুমাত্র কারখানা স্থাপন নয়, শুধু উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নত মান বজায় রাখার দিকেও মুঘল সম্রাটদের দৃষ্টি ছিল। এজন্য কারখানার তত্ত্বাবধায়ককে প্রতি ছয়মাস অন্তর মুঘল সম্রাটকে প্রত্যেক কারখানার ব্যয় ও উৎপাদনের হিসেব দিতে হত। কখনো কখনো পণ্য প্রদর্শনের আদেশ দেবার পর সবচেয়ে সূক্ষ্ম দ্রব্যের কারিগরদের সম্রাট পুরস্কার দিতেন। এভাবে কারিগররা নিজস্ব শিল্পে বিশ্বের যে কোন দেশের কারিগরদের সমান পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বলা হয় যে যখন জাহাঙ্গীরকে স্যার টমাস রো একটি বৃটিশ চিত্র দিলে সম্রাট তাঁকে বলেন যে, রাজদরবারের একজন চিত্রশিল্পী ছবিটি হুবহু নকল করলে টমাস রো আসলটি চিনে নিতে অসমর্থ হবেন। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যখন আসল আর নকল রাজদূত অনেক কষ্টের পর চিনতে পারেন। শাজাহান মক্কায় ৫০,০০০ টাকার উপহার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে রাষ্ট্রীয় কারখানায় তৈরী পণ্য পবিত্র সেই তীর্থস্থানে বিক্রীর পর জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ দান করার নির্দেশ দেন।

শ্রমের বিশেষীকরণ এবং কাঁচামালের প্রাচুর্যের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পোৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাবর লিখেছিলেন যে প্রত্যেক কারিগরই পুরুষানুক্রমে কোন ব্যবসায় যোগ দিত। বার্ণিয়ারের বিবরণ অনুসারে স্বর্ণকারের পুত্র স্বর্ণকার হত এবং শহরে চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ত। পেলসার্টের মতে চাবাসপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতি শহর যেখানে শিল্পের বিশেষীকরণ ঘটেছিল সেখানে বয়ন শিল্পই ছিল প্রায় সব মানুষের জীবিকা এবং বস্ত্রের উৎকৃষ্ট মানের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

সারা দেশ জুড়ে শিল্পপণ্য উৎপাদনের উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি লিখেছেন যে মুঘল সরকারের দ্বারা নিযুক্ত না হওয়া কারিগররা রাষ্ট্রীয় কারখানায় দক্ষ প্রশিক্ষকদের কাছে যান্ত্রিক শিক্ষালাভের পর অভিজাত ও রাজাদের কাছে চাকরী পেত। এভাবে সারা দেশেই তাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষতা ও শ্রম অনুযায়ী কারিগরদের সবসময়ে বেতন দিত না অভিজাতরা, যার ফলে শুধুমাত্র পারিশ্রমিক নয়, উৎকৃষ্ট মানের সামগ্রী তৈরীর অনুপ্রেরণা থেকেও বঞ্চিত হত তারা। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি বড় শহরগুলির বিস্তারের সহায়ক হয়। ১৫৮১ সালে মনসারেট লিখেছেন যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন শহরের তুলনায় লাহোর কোন অংশে কম ছিল না। ১৫৮৫ সালে র‍্যালফ ফিচের বক্তব্য অনুসারে লন্ডনের তুলনায় আগ্রা ও ফতেপুর বেশী বড় ও জনবহুল ছিল। আগ্রা ও ফতেপুরের মধ্যে ১২ মাইল দূরত্বের সম্পূর্ণটা নিয়েই খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর বাজার গড়ে ওঠে।

মুঘলযুগের বিভিন্ন উন্নত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সূতীবস্ত্র বয়ন। প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন তাঁতী থাকত এবং দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট বস্ত্রের উৎপাদন হত। গুজরাটের পাটান, খান্দেশের বুরহানপুর, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর ও বারাণসী, বিহারের পাটনা, পাঞ্জাবের লাহোর ও শিয়ালকোট, বাংলার সোনারগাঁ ও সাতগাঁ প্রভৃতি বস্ত্রবয়নের প্রধান কেন্দ্র সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। ডঃ দত্ত লিখেছেন যে ওড়িশা থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে সূতীবস্ত্রের কারখানা মনে হত এবং উচ্চমানের অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের জন্য ঢাকার খ্যাতি ছিল। বার্ণিয়ার সূতী ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুঘল ভারতে শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী দেশে ও ইউরোপে বাংলার অদ্বিতীয় স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন।

সূতীবস্ত্রের অনুসারী শিল্প হিসেবে বস্ত্ররঞ্জন শিল্পের এমন অগ্রগতি ঘটে যে এদেশে প্রস্তুত বিভিন্ন রং দেখে এডওয়ার্ড টেরী বিস্মিত হন। আকবর রেশম শিল্পের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী ও গুজরাটে রেশমবয়ন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর, শাজাহানও রেশম শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতে রেশমের সামগ্রিক উৎপাদন বেড়ে প্রায় ২৫ লক্ষ পাউন্ড হয়ে দাঁড়ায় যার মধ্যে মধ্য এশিয়ায় প্রায় ১০ লক্ষ পাউন্ডের রেশম রপ্তানী করত ডাচ ও অন্যান্য বণিকরা। ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে জাহাঙ্গীর অমৃতসরে উলের কার্পেট ও শালবয়নশিল্প গড়ে তোলেন। আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীতে সুন্দর কার্পেট তৈরী হত। পাঞ্জাবের শিয়ালকোট তাঁবু তৈরীর জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

সূতীবস্ত্র ছাড়া ধাতুশিল্প ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বারাণসী, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, থাট্টা, ঔরঙ্গাবাদ এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা কাষ্ঠমণ্ড দিয়ে সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় কাগজ দেশে উৎপাদন করা হত। লাহোর, রাজগীর, অযোধ্যা এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। গালার খেলনা ও অলঙ্কারশিল্পের উন্নতি ঘটে গুজরাটের সুরাটে। সোনা-রূপোর উপর কাজের জন্য বিহার বিখ্যাত ছিল। পাথরে তৈরী জিনিসের জন্য খ্যাতি ছিল পাঞ্জাবের খোরীয়ার এবং জৌনপুর ও গুজরাটের সুগন্ধী তেল যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী হলেও সোমনাথের তরবারির বিশেষ খ্যাতি ছিল। কামানের গোলা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শোরা বিহার ও দাক্ষিণাত্যে উৎপাদন হত। ডঃ দত্তের মতে মুঘলযুগে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে মুঘল সম্রাটদের শাসনে শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোই শুধু নয়, বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রেও শিল্পপণ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এটি বিস্ময়কর নয় যে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের ভারসাম্য ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হয় এবং ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ভারতীয় পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়লে শিল্পের উন্নতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার আক্ষেপ করেছেন যে এভাবে ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, জাতীয় পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, যান্ত্রিক দক্ষতা ও সভ্যতার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয় এবং দেশের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে শিল্প-সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটে।

৭.৫ রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর

মুঘল ভারতে বাংলা ও গুজরাট সূতীবস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্রবয়নশিল্প। ক্রেতাদের একটি ক্ষুদ্র অংশের চাহিদা পূরণ করায় রেশমশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। আবুল ফজল বলেছেন যে আকবর এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাশ্মীরে এক বিশেষ ধরনের রেশম উৎপন্ন হলেও বাংলা ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ট্যাভার্নিয়ের হিসেব অনুসারে বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের রেশমের সূতীবস্ত্র বয়ন করা হত এবং গুজরাটের সুতো ও বাংলার মসলিনের উপর ভারতীয় সূতীবস্ত্রের খ্যাতি নির্ভর করত। লাহোর ও আগ্রা ছিল রেশমশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। রাজধানীতে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিলাসদ্রব্যের ভাল বাজার ছিল।

রেশমের মতই পশম ধনী ব্যক্তিদের পোশাকের জন্য ব্যবহার করা হত। শালবয়নে কাশ্মীর বিশেষত্ব অর্জন করে। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় লাহোরে শাল বোনা শুরু হয়। আগ্রা ও লাহোরের কার্পেট শিল্পকেও তিনি সহায়তা করেন। আবুল ফজল সাধারণ কম্বলের উল্লেখ করলেও সাধারণ মানুষ সেগুলি ব্যবহার করত না।

সারাদেশে সবচেয়ে বিস্তৃত শিল্প ছিল সূতীবস্ত্রবয়ন। অভ্যন্তরীণ বস্ত্রের বাজারে ভারতীয় তাঁতের আধিপত্য ছিল এবং এছাড়াও আরব ও তার আশেপাশে, বার্মা ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে এবং পূর্ব আফ্রিকার মত রপ্তানী বাণিজ্যের তিনটি প্রধান কেন্দ্রে ভারতীয় বস্ত্র পাঠান হত। সূতীবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি, সিন্ধের সমতলভূমিতে ক্যাম্বে, উপসাগরের তীরে, দাক্ষিণাত্যে, করমন্ডল উপকূলে এবং বাংলায় ছড়িয়ে ছিল। বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কয়েকটি স্থান খ্যাতিলাভ করে। সূক্ষ্ম মসলিনবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা। ট্যাভার্ণিয়ের বক্তব্য অনুসারে বাংলায় উৎপন্ন সূতী ও রেশমবস্ত্র মুঘল সাম্রাজ্যে শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ, এমনকি ইউরোপেও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

সূতীবস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্ররঞ্জনশিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। টেরীর বক্তব্য অনুসারে অমসৃণ সূতীবস্ত্রের উপর নিঁখুতভাবে ফুল ও অন্যান্য আকারের নকশা এমনভাবে করা হত যে কোনভাবেই সেগুলি কাপড় থেকে উঠে যেত না।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জিনিসের পরিমান ও আঞ্চলিক বিস্তৃতির বিচারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঐ সময়ে ভারতে আসা বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের ফলে পূর্বে যেসব অঞ্চলে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েনি সেসব অঞ্চলেও ভারতীয় রপ্তানীর বিকাশ হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য, সাফাভীদ ও মুঘল সাম্রাজ্যের মত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এশিয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠা।

রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর ঃ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি শুধু নয়, এই সাম্রাজ্যগুলি নগরায়ণ ও মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের সহায়ক হয়। যেমন সাধারণত আশা করা যায় তেমনই বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের উপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এই সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ দেখা দেয়।

ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঃ ধনতন্ত্র বলতে মূলধনের প্রাধান্য বোঝায়। উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য থেকে অর্থ সঞ্চয় করে মূলধন একত্রিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মুঘল ভারতে কৃষি উৎপাদনের মান সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিজাত ও অকৃষিজাত উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বাজারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কৃষিক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিশ্রমিক নিয়োগের প্রচলন থাকায় ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কুটীর শিল্পে বণিকদের মূলধন বিনিয়োগ যথেষ্ট বাড়ে এবং তারা অগ্রিম অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কারিগরদের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু কারখানা যান্ত্রিকভাবে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের বাইরে ছিল। অন্য ভাষায়

বলা যায়, মূলধন ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক মূলধন এবং অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন বাড়লেও শিল্পে আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রাধান্য ছিল।

এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন সমাজে কেন পূর্ণমাত্রায় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল না সেসম্পর্কে বহু কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। অতীতের চিন্তা অনুসারে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং জাতপাতের প্রাধান্য বাণিজ্যের বিস্তার রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি শর্ত পালনে ভারতীয় সমাজ ব্যর্থ হয়।

এক্ষেত্রে এটি চিন্তা করে দেখা উচিত যে একটি ক্ষুদ্র শাসক শ্রেণীর দ্বারা কৃষকদের প্রত্যক্ষভাবে শোষণের উপর সমগ্র বাণিজ্যিক কাঠামো নির্ভর করত। বাস্তবে শহরে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের জন্য কোন গ্রামে বাজার ছিল না। এভাবে গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য শহরে বিক্রি করার প্রয়োজন থেকেই গ্রামে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন দেখা দেয়।

অবশেষে কৃষিব্যবস্থায় যখন সংকটের সূত্রপাত হয় তখন অর্থনীতির সমগ্র কাঠামোর মধ্যে সেই সমস্যা ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষে। শুধুমাত্র বাণিজ্যের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা মূলধন নিজের জন্য কোন স্বাধীন ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। মুঘল শাসক সম্প্রদায়ের উপরই মূলধনের ভাগ্য নির্ভর করত। শাসক সম্প্রদায়ের পদ্ধতি ও সংগঠন অন্য শ্রেণীর মানুষরাও অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। এজন্য ক্রমশ শাসক শ্রেণীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

একক ৮ ❑ মুঘল নগরায়ন

৮.০ মুঘল ভারতে নগরায়নের চরিত্র
৮.১ মুঘল স্থাপত্যশিল্প
৮.২ মুঘল চিত্রকলা
৮.৩ অনুশীলনী
৮.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ মুঘল ভারতে নগরায়ণের চরিত্র—মুঘল শহরের শ্রেণীবিন্যাস

মুঘল ভারতে নগর ও নগরজীবন দেশের অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের শক্তিবৃদ্ধি, পরিবহনব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং মুঘল আইনের প্রভাবের ফলে নগরায়ণের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। রাজধানী, প্রশাসন, বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রার কেন্দ্র হিসেবে শহর গড়ে ওঠে। আকবরের সাম্রাজ্যে ১২০টি বড় নগর এবং ৩২০০টি গ্রামকেন্দ্রিক শহর বা কসবা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তম নগর ছিল আগ্রা, প্রায় ৫০০,০০০ জনসংখ্যা সমেত। সম্রাট নগরে উপস্থিত থাকলে জনসংখ্যা বেড়ে ৬০০,০০০ হত। ঢাকা, রাজমহল, মসুলীপতম ছিল অন্যান্য বড় শহর।

এই শহরগুলির চরিত্র এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে মুঘল ভারতে যথেষ্ট পরিমান নগরায়ন ঘটে। অত্যন্ত বড় নগরগুলি ক্রমবর্ধমান পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, বাণিজ্য, তেজারতি কারবার এবং শিল্পোদ্যগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে সড়কপথ ও জলপথের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত।

ইউরোপের বহু শহরের মত ভারতে শহরগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও আইনগত দিক থেকে স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল না বলে কিছু ঐতিহাসিক দাবী করেছেন। বড় শহরগুলিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার সঙ্গে বস্তির সহাবস্থান ঘটে। প্রত্যেক শহরে একটি বা দুটি প্রধান সড়ক ছিল যার সঙ্গে অন্য সব পথের সংযোগস্থলকে চক বলা হত। রাস্তাগুলি সাধারণত বাঁধান থাকত। শহরগুলি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হত এবং প্রতিটি অংশে এক বিশেষ জাতি বা পেশার লোক বাস করত।

ঐতিহাসিকরা নাগরিক সমাজের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। নগর জীবনের সব প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করাই শহরের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

৮.১ মুঘল স্থাপত্যশিল্প

সাধারণত বলা হয় যে শিল্প ও স্থাপত্য একটি সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগে জীবনের নিরাপত্তা, প্রশাসনের স্থায়িত্ব, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জনহিতৈষী ও সংস্কৃতিবান শাসকদের শাসন শিল্পস্থাপত্যের যথেষ্ট অগ্রগতির এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আওরঙ্গজেবের শাসনের পরবর্তীকালে এই অনুকূল পরিবেশের অবসান ঘটলে শিল্প ও স্থাপত্যের অবনতি দেখা দেয়। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহানের একশ বছরের শাসনকালে সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্যের অনবদ্য বিকাশের জন্য এই সময়টি মুঘল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই তিনজন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং এর পরিধির বিস্তার ঘটতে থাকে।

তানসেন সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন যে গত একহাজার বছরে এমন সঙ্গীত শিল্পী ভারতে ছিলেন না। তানসেনের সমসাময়িক মালবের রাজবাহাদুরকে সঙ্গীতশাস্ত্র ও হিন্দী সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আকবর চিত্রশিল্পীদের ছবি আঁকাকে ঈশ্বরের উপাসনার অন্যতম মাধ্যম আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে সম্রাট তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন যে আকবর চিত্রশিল্পকে শিক্ষা ও বিনোদন, উভয়েরই মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। এভাবে চিত্রকলার অগ্রগতি ঘটলে বহু চিত্রশিল্পী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। দারোগা ও করণিকরা প্রতি সপ্তাহে সমস্ত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি সম্রাটের সামনে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করত। কর্মনৈপুণ্য অনুযায়ী তিনি চিত্রশিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন বা মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিতেন। চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকায় জাহাঙ্গীর চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর রাজত্বকালে ক্ষুদ্রচিত্রের অঙ্কনশিল্প উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয়।

স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে বলা যায় যে প্রত্যেক মুঘল সম্রাট স্থাপত্যের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। মুঘলরা উন্নতমানের স্থপতি ছিল এবং বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতমানের স্থাপত্য সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং স্থাপত্যশিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। দিল্লী ও আগ্রার নির্মাণশিল্পে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বাবর কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত স্থপতি সিনার শিষ্যদের নিজের গৃহনির্মাণের কাজে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাবরের শাসনকালের প্রায় সমস্ত স্থাপত্য বিনষ্ট হলেও পানিপথের কাবুলবাগ এবং সম্বলের জামা মসজিদের এখনও অস্তিত্ব আছে। পার্সি ব্রাউন লিখেছেন যে সুযোগ পেলে বাবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুমায়ুনও একটির বেশী স্মৃতিসৌধ রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তিপূর্ণ অবসর তাঁর ছিল না। দিনপনাহ নামে একটি নতুন শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করলেও তার বাস্তব রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আগ্রা ও হিসারের ফতেবাদে দুটি মসজিদ টিকে আছে। হুমায়ুনের কাছ থেকে ভারতবর্ষ শাসন করার অধিকার যারা ছিনিয়ে নেয় সেই মুর সুলতানরা স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে। তাদের নির্মিত দুর্গ ও অন্যান্য সৌধ মধ্যযুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অন্যতম। শের শাহের শাসনকালের দুটি বিখ্যাত নির্মাণ ছিল কিলা কোহানা বা দিল্লীর পুরানা কিলা ও সাসারামে সম্রাটের স্মৃতিসৌধ। পার্সি ব্রাউন এই স্মৃতিসৌধকে ভারতের স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন। এটি খুবই দুঃখের যে শেহশাহ কিলা কোহানার নির্মাণ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, কিন্তু সেখানের কিলা-ই-কোহানা মসজিদ উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যগুলির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখা যায়। রাজনৈতিক পরিবেশে স্থায়িত্ব আসার পর আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থাপত্যশিল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আবুল ফজলের লেখা অনুসারে নির্মাণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আকবর তাঁর সহনশীলতা, হিন্দু ও ইসলামি সংস্কৃতির সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁর সৌধগুলিতে হিন্দু ও ইসলামি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সরস্বতী লিখেছেন যে আকবরের স্থাপত্য মহত্ত্ব, শক্তির পরিচায়ক ছিল এবং তাঁর বিচক্ষণ পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শিল্প আন্দোলনের সূচনা হয়। (The History and Culture of the Indian People–Vol.VII, The Mughal Empire, 1974-Page –711).

আকবরের শাসনের সূচনায় ১৫৬৫ সালে হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজি বেগমের তত্ত্বাবধানে এটি তৈরী হয় এবং এর স্থপতি ছিলেন মীরক মীর্জা গিয়াস। এতে পারসী প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। পার্সি ব্রাউন এটিকে পারসী রীতিতে তৈরী ভারতীয় সৌধ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই ধরনের নির্মাণের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বাগানের কেন্দ্রে সৌধটি স্থাপন করা। এরপর কাশিম খানের তত্ত্বাবধানে আকবর আগ্রা ও লাহোরে দুটি দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ তৈরী করেন। ১৫৬৪ সালে শুরু হয়ে আট বছর পর আগ্রায়-এর নির্মাণ শেষ হয়। এই প্রাসাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল গোয়ালিয়র দুর্গের যার প্রশংসা করেছিলেন বাবর। দুর্গের প্রাচীর প্রায় ৭০ ফুট উঁচু এবং প্রায়

$১\frac{১}{২}$ মাইল পরিধি জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা হয় যে এর আগে কখনো এমন দুর্গ নির্মিত হয়নি যাতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত লোহাদ্বারা পাথর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল। দুর্গের দুটি প্রবেশপথ ছিল— হাতিপথ এবং অমরসিংহ পথ যার মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রবেশের জন্য নিজস্ব ব্যবহৃত হত। দুর্গের মধ্যের স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস এবং জাহাঙ্গীরমহল।

আগ্রা থকে ২৬ মাইল দূরে সিক্রীর কাছে একটি টিলার উপরে আকবর একটি নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন এবং এর নাম দেন ফতেপুর সিক্রী। তাঁর স্মৃতিকথায় জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছরে বন্য পশুতে ভরা টিলাটি বিভিন্ন ধরনের বাগান, অট্টালিকা, প্রাসাদে পরিপূর্ণ এক শহর হয়ে ওঠে। ফার্গুসন শহরটিকে আকবরের মানসিকতার প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছেন। শহরটিতে বহু প্রাসাদ, কর্মশালা, সরাইখানা, দরবার এবং ধর্মীয় উপাসনাস্থল ছিল। এইসব গৃহগুলিতেই হিন্দু ও স্থানীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। স্থাপত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল জামা মসজিদ ও বুলন্দ দরওয়াজা। জামা মসজিদকে ফতেপুর সিক্রীর গৌরব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রতীক হিসেবে ১৬০২ সালে তৈরী বুলন্দ দরওয়াজা ভারতের বৃহত্তম প্রবেশপথ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রবেশদ্বারের অন্যতম। ফতেপুর সিক্রীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গৃহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল যোধাবাঈয়ের, তুর্কী সুলতানা, বীরবলের প্রাসাদ, পাঁচমহল, খোয়াবাগ। দেওয়ানী খাসের কারুকার্যখচিত থাম এবং ইবাদৎখানার নকশাও ছিল অতিসুন্দর। আকবরের শাসনকালের গৃহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এলাহাবাদের ৪০টি থামের প্রাসাদ এবং সিকান্দ্রায় সম্রাটের সমাধি। উইলিয়াম কিঞ্চের বক্তব্য অনুসারে ৪০ বছরে এলাহাবাদের প্রাসাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় কয়েক হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে। আকবর নিজেই সিকান্দ্রায় তাঁর সমাধি নির্মাণ শুরু করেন এবং জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সেটি সম্পূর্ণ হয়। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে বৌদ্ধ বিহারের আদলে এই সমাধি তৈরী হয়। অধ্যাপক জাফর সমাধিগুলির মধ্যে এটিকে অদ্বিতীয় ঘোষণা করেছেন।

আকবরের মৃত্যুর পর, জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান উভয়েই সৌন্দর্যের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। তাঁদের আমলে স্থাপত্যকলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্দৌলার সমাধি। Cambridge History of India গ্রন্থে এই স্মৃতিসৌধের প্রশংসা করে পার্সি ব্রাউন লিখেছেন যে নির্মাণের সূক্ষ্মতার এবং কারুকার্যের সূচীতার বিচারে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে এটি অদ্বিতীয়। সৌধটি প্রায় ৬৯ ফুট চওড়া এবং ধবধবে সাদা মার্বেল পাথর ও মূল্যবান পাথরের নকশায় স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। মুঘলযুগে এটিই প্রথম স্থাপত্য যেটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেলে নির্মিত এবং Pictra Dura নামে পরিচিত কারুকার্য এতে প্রথম দেখা দেয়। যান্ত্রিক দিক থেকে বিচার করলে এটি নির্মাণশিল্পের বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর, কারণ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সরল রুচি অনুযায়ী বেলেপাথরের সৌধ থেকে শাহাজানের মার্বেল ও Pictra Durar নির্মাণের রূপান্তরকে এটি সূচিত করে।

শাজাহান স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তার শাসনকালকে মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। ডঃ দত্তের মতে আকবরের সৌধের তুলনায় শাজাহানের নির্মাণগুলি ঔজ্জ্বল্য ও সৃজনশীলতার বিচারে কম হলেও, জাঁকজমক ও উন্নতমানের সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য প্রশংসনীয়। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন যে শাজাহান স্থাপত্যের উপর কারুকার্যকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যান এবং তাঁর সব নির্মাণে অলঙ্কার নির্মাতা ও চিত্রকরের শিল্পের সমন্বয় ঘটে। মার্বেলের সাহায্যে শহর গড়ে তোলার জন্য পার্সি ব্রাউন শাজাহানের প্রশংসা করেছেন। পিতৃপুরুষদের তৈরী বেলেপাথরের বহু সৌধ ভেঙে তিনি মার্বেলের প্রাসাদ তৈরী করেন। আগ্রার দুর্গের দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, খাস মহল, শিস মহল, অঙ্গুরী বাগ, মোতি মসজিদ এভাবে পুর্ননির্মিত হয়।

আকবরের মত, শাহাজান ১৬৩৮ সালে দিল্লীর কাছে শাজাহানাবাদ নামে একটি নতুন রাজধানী তৈরী করা শুরু করেন। যমুনার তীরে চারকোণা একটি শহর গড়ে তোলা হয়। প্রাসাদ ছিল যমুনার ঠিক পাশেই এবং দুর্গের প্রধান ফটক ও শহরের প্রবেশদ্বার থেকে আসা দুটি বিস্তৃত পথের সংযোগস্থলে জামা মসজিদ স্থাপিত হয়। দুর্গের প্রাচীর

লাল বেলেপাথরে নির্মিত হওয়ায় এটিকে Red Fort বলা হত। দুর্গের মধ্যে প্রাসাদ, সানগৃহ, রাজদরবার, বাগান প্রভৃতি রাজকীয় জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬৪৮ সালে এক পবিত্র দিনে সম্রাট নতুন রাজধানীর উদ্বোধন করেন বহু আনন্দপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই লাল দুর্গটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌধগুলি ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, রঙ্গ মহল, মোতিমহল, নহর-ই-শিশ। এসবের মধ্যে দিওয়ান-ই-খাস সত্যি অপূর্ব সুন্দর ছিল। এর উপর লেখা ছিল, যদি পৃথিবী কখনো স্বর্গে পরিণত হয় এটি তাই এবং অন্য কোন কিছু তা হতে পারে না।

দিল্লীর রেড ফোর্টের বাইরে জামামসজিদ ধার্মিকদের আকৃষ্ট করত এবং ইসলামের গৌরবের দ্যোতক ছিল। ধর্মীয় স্থাপত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এটি। মসজিদের ভেতরের কারুকার্য খুবই সাধারণ ছিল পাছে শিল্পের সৌন্দর্য প্রার্থনার জন্য সমবেত জনগণের মনসংযোগে বিঘ্ন না ঘটায়।

মুঘল স্থাপত্য ও শাজাহানের আমলের স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল আগ্রার তাজমহল। প্রিয় মহিষী আরজুমবানু বা মুমতাজ মহলের স্মৃতিতে সম্রাট এই সৌধটি নির্মাণ করেন। ১৬৩১ সালে রাণীর মৃত্যুর এক বছর পরে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ২২ বছরে এটি সম্পূর্ণ হয়। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাজমহল নির্মাণের মোট ব্যয় প্রায় তিন কোটি টাকা বলেছেন। আবদুর হামিদ লাহোরীর হিসেব অনুযায়ী সেটি ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। প্রথমে নির্মাণ শুরুর আগে বহু পরিকল্পনা ও নকশা করা হয়। কাঠের তৈরী একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ অনুসরণ করে স্থপতিরা এর নির্মাণ শুরু করেন। বার্ষিক একহাজার টাকা বেতনে ওস্তাদ ঈশা নির্মাণের তত্ত্বাবধান করতেন। ১৬৪১ সালে আগ্রায় আসা স্পেনীয় পর্যটক কাদার মানরিকের মতে, জিরোনিমো ভেরেনিও নামে এক ভেনিসের অধিবাসী তাজমহলের নকশা তৈরী করেন। ভারতীয় লেখকরা এই মতের বিরোধিতা করেছেন। ১৬৬৬ সালে আওরঙ্গজেবের সময়ের ফরাসী পর্যটক থিভেন্টে তাজমহল ভ্রমণের পর বলেন যে, তাজমহল প্রমাণ করে যে স্থাপত্যবিদ্যায় ভারতীয়রা অজ্ঞ নয় এবং ইউরোপীয়দের কাছে এই নির্মাণরীতি বিস্ময়কর হলেও এটি সুরুচি এবং সূক্ষ্মতার পরিচায়ক।

তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য দেখে বহু ব্যক্তি মুগ্ধ হয়েছেন। কীনের মতে তাজমহলের মত আকর্ষণ পৃথিবীর অন্য কোন সৌধের নেই। স্ট্যানলি লেনপুলের বক্তব্য, তাজমহল স্বয়ং ঈশ্বরের পরিকল্পিত এবং অলঙ্কারশিল্পীদের দ্বারা মার্বেলে রচিত স্বপ্ন। ফার্গুসন বলেছেন যে, তাজমহলের সৌন্দর্য স্বর্গীয় এবং এটিতে প্রাকৃতিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। অধ্যাপক এস. কে. সরস্বতী বলেছেন যে, তাজমহল জনগনকে মুগ্ধ করে এবং মূক মার্বেলের মধ্যে প্রকাশিত অবিনশ্বর ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয়কে ভরিয়ে তোলে। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাজমহলকে দাম্পত্য প্রেম ও বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ সৌধ আখ্যা দিয়েছেন। তাজমহলের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হল দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোণ থেকে একে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। পার্সি ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে, পূর্ণিমার রাতে তাজমহলকে দেখে মনে হয় যে প্রকৃতি এবং ঈশ্বর একত্রে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে অপূর্ব সুন্দর এই সৌধ গড়ে তুলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় এক বৃটিশ পর্যটক তাজমহল দেখার অনুভূতিকে অনন্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাজমহলকে শাজাহানের দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের অশ্রু দিয়ে তৈরী বলে বর্ণনা করেছেন। স্যার এডউইন আর্নল্ডের বক্তব্য অনুসারে তাজমহল সম্রাটের ভালবাসা, আত্মা ও মানসিকতার প্রতীক।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের পর শিল্প ও স্থাপত্যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়। তাঁর শাসনে শুধুমাত্র দিল্লীতে রেড ফোর্টের মধ্যে মোতি মসজিদ নামে একটি ছোট মার্বেলের মসজিদ, বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আরেকটি মসজিদ এবং লাহোরে বাদশাহী মসজিদ নির্মিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল স্থাপত্যশিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

৮.২ মুঘল চিত্রকলা

ডঃ এ.কে. দাস লিখেছেন যে মুঘল রীতির চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করে। যদিও পাণিপথের যুদ্ধের বাবরের বিজয়ের বহু আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে পান্ডুলিপির অলঙ্করণের জন্য ক্ষুদ্রচিত্রের প্রচলন ছিল, মুঘল শাসনে ঐতিহাসিক ঘটনা, সাহিত্যের কাহিনী, রাজ দরবারের দৃশ্য, মানুষের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষুদ্রচিত্র ভারতীয় শিল্পে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটায়। চিন্তায় ও কারুকার্যে মুঘল ক্ষুদ্রচিত্রের প্রভাব দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং উত্তরভারতে মুঘল শাসনের পরেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। বলা হয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি তিনি তার সঙ্গে ভারতে নিয়ে আসেন। সেসময়ে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল চৈনিক অঙ্কনরীতি যাতে ভারতীয়, বৌদ্ধ, পারসিক, ব্যাকট্রিয়া ও মঙ্গোলীদীয় রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাবরের সমসাময়িক চিত্রকরদের মধ্যে পারস্যের বিহজাদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, যাঁকে অন্য শিল্পীরা অনুকরণ করতেন। প্রথমে পারসিক রীতিতেই ভারতীয় শিল্পীরা ছবি আঁকার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক এস. এম. জাফরের মতে এই সময়ের চিত্রকলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পীদের নিজস্ব শৈলী। প্রত্যেক চিত্রের প্রতিটি দৃশ্যে নরনারী, পশুপাখি, ফুলফল, অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠায় যুদ্ধের দৃশ্যে যোদ্ধাদের বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের দৃশ্যে নর্তকীদের চিহ্নিত করতে কোন বিভ্রান্তি ঘটত না। এমনকী গাছের পাতাগুলি সুন্দরভাবে আঁকা হওয়ায় সেগুলি সহজেই গোনা সম্ভব হত।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিহজাদের রীতিতে অঙ্কনশিল্পের বিকাশ ঘটানোর আগেই বাবরের মৃত্যু হয়। রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতে ব্যর্থ হলেও পারস্যে বাধ্যতামূলক নির্বাসনের সময় বাবরের পুত্র হুমায়ুন সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলায় আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং শের শাহ শূরীর মৃত্যুর পর ভারতে নিজের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হলে তিনি মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আবদুস সামাদ নামে পারস্যের দুজন বিখ্যাত শিল্পীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিশ্বাস করা হয় যে সম্রাট ও তাঁর শিশুপুত্র আকবর উভয়েই এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে ছবি আঁকা শেখেন এবং একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হিসেবে আকবর তাঁর রাজত্বকালে চিত্রকলার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এভাবে ভারতীয় চিত্রকলায় এক জাতীয় রীতির উদ্ভব ঘটে। খাজা আবদুস সামাদের নেতৃত্বে চিত্রকলার জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলেন আকবর। এই বিভাগের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সম্রাটের ব্যক্তিগত উৎসাহ ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা প্রথমে চিত্রকলার বিরোধিতা করলেও পরে তাদের দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথমে ভারতীয় চিত্রের উপর চৈনিক ও পারসিক রীতির প্রভাব দেখা যেত এবং অঙ্কনশাস্ত্রের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল দাস্তান-ই-আমীর-হামজা যা হামজানামা। ডঃ দাসের মতে এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির বিশেষত্ব ছিল রঙীন ফুল, লতাপাতা, স্থাপত্যশিল্পের ও আসবাবপত্রের নিঁখুত চিত্র এবং উৎকৃষ্ট মানের রঙের ব্যবহার। মুঘল রাজসভায় তানসেনের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প একটি নতুন দিকে মোড় নেয় এবং চৈনিক, পারসিক ও হিন্দু অঙ্কনশৈলীর বিকাশ ঘটে। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফতেপুর সিক্রীর রাজসভায় বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা আসেন। আবুল ফজল গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে একশর বেশী চিত্রকর তাঁদের শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং বহুজন শ্রেষ্ঠত্বের কাছাকাছি পৌঁছন। চিত্রশিল্পে হিন্দুদের মত দক্ষ পৃথিবীতে খুব খুব কম শিল্পী আছেন। তিনি দশয়ন্ত, বাসওয়ান, কেশব, লাল, মুকুন্দ, মিশিকিন, ফারুক, মধু, জগন, মহেশ, ক্ষেমকারারি, তাবা, সানওয়ালা, হরিবংশ, রাম নামে পনেরোজন বিখ্যাত শিল্পীর উল্লেখ করেছেন যাদের অধিকাংশই হিন্দু। সব চিত্রকরই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে কাজ করতেন এবং প্রতিকৃতি, পশুপক্ষী সকল এবং পান্ডুলিপি অলঙ্করণে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। চিঙ্গীজনামা, জাফরনামা, রাজনামা, রামায়ণ, কালীয়দমন প্রভৃতি চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফতেপুর সিক্রীতে আকবরের প্রাসাদের দেওয়ালে

রাজশিল্পীরা অপূর্ব সুন্দর ছবি আঁকেন। সম্রাট এবং রাজপরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত।

তাঁর বিখ্যাত পিতার মতই জাহাঙ্গীরও সৌন্দর্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজপুত্র থাকাকালীন আকা রিজা নামে হেরাটের এক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে তিনি একটি চিত্রাঙ্কনকেন্দ্র গড়ে তোলেন। রাজকুমারান্দ গজল ও আমীর নিজামুদ্দিন হাসান দিহ্লাভীর রুবাই ছিল এসময়ের দুটি শ্রেষ্ঠ চিত্র। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয়।

ক্ষুদ্রচিত্রের ধ্রুপদী রীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জাহাঙ্গীর দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চিত্র সংগ্রহ করতেন। নিজের স্মৃতিকথার গর্বের সঙ্গে জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে ছবি আঁকা দেখেই তিনি কোনটি কোন চিত্রকরের বুঝতে পারতেন এবং একটি প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শিল্পী আঁকলে কোন অংশ কোন শিল্পী এঁকেছে বলে দিতে পারতেন। এই আত্মপ্রশংসা অর্থহীন ছিল না কারণ আকবরের সময়ে শুরু হওয়া মুঘল ক্ষুদ্রচিত্রশিল্প, জাহাঙ্গীরের শাসনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ভারতীয় শিল্পকে পারসিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ভারতীয় রীতি সৃষ্টি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে প্রতিকৃতিচিত্রে জাহাঙ্গীর আগ্রহী হন এবং সম্রাট, তাঁর পরিবারের সদস্য, উল্লেখযোগ্য সভাসদ এবং শিল্প, ধর্ম, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আঁকা হয়। রাজসভার বিখ্যাত চিত্রকর বিষণদাসকে তিনি পাঠান পারস্যের সম্রাটের পূর্ণাবয়ব এবং তাঁর সভাসদদের প্রতিকৃতি আঁকতে। প্রতিকৃতি অঙ্কন কোন নতুন ঘটনা না হলেও জাহাঙ্গীরের সময়ে এই শিল্পের উন্নতি ঘটে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বিখ্যাত মুসলমান চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আকা রাজা ও তাঁর পুত্র হেরাটের আবুল হাসান, সমরখন্দের মুহম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মানসুর। হিন্দু চিত্রকরদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বিষণদাস, মনোহর, মাধব, কেশব ভ্রাতৃদ্বয়, তুলসী, গোবর্ধন। বৃক্ষ, ফুল, পশু, পাখী আঁকায় তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহাজান চিত্রশিল্পের তুলনায় স্থাপত্য শিল্পে বেশী আগ্রহী হওয়ায় মুঘল চিত্রকলার গৌরব হ্রাস পেতে থাকে। যদিও রাজশিল্পীরা বহু সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেন, তবুও তাদের নান্দনিক উৎকর্ষ হারিয়ে যায়। সেগুলিতে কারুকার্যের বিস্তার ও বাহুল্য দেখা যায় এবং সম্রাটকে সবসময় উৎকৃষ্ট পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত অবস্থায় সম্রাটকে সবসময়ে দেখা যেত। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে রাজসভায় চিত্রশিল্পীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীরা ছিলেন মীর হাশিম, অনুপ, চিত্র, চিত্রমণি ও ফকিরুল্লা যিনি ছিলেন চিত্রকরদের প্রশিক্ষক। শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু শাজাহানের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন আওরঙ্গজেব। সমস্ত শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং শিল্পে রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার তিনি অবসান ঘটান। বলা হয় যে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার প্রাসাদের দেওয়ালচিত্র তিনি বিনষ্ট করেন এবং সিকান্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধের চিত্রের উপর সাদা রং করান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময়ে চিত্রকররা আঞ্চলিক রাজ্যগুলির রাজসভায় চলে গেলেও শিল্পের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

৮.৩ অনুশীলনী

১। শাজাহানের পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ কর। এই যুদ্ধেআওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণের বর্ণনা দাও।

২। আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির মুল উদ্দেশ্য ও তার ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ধর্মের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যগুলি কতটা জড়িত ছিল?

৩। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির বর্ণনা দাও। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এটি কতটা দায়ী ছিল?

৪। মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গীরদারী সংকটের বিবরণ দাও। এটি কিভাবে একটি কৃত্রিম সমস্যা ছিল?

৫। মুঘল ভারতে জাঠ ও সৎনামী বিদ্রোহ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। এসব গণবিদ্রোহের চরিত্রের বর্ণনা দাও।

৬। মুঘল ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

৭। বস্ত্রশিল্পের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়ে মুঘল ভারতে অকৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৮। মুঘল ভারতে ধনতন্ত্রের বিস্তারের কোন সম্ভাবনা ছিল কি?

৯। মুঘল ভারতে নগরায়নের বর্ণনা দাও।

১০। মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কে যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৮.৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Satish Chandra – Medieval India.
2. Irfan Habib – Essays in Indian History.
3. Irfan Habib – Agrarian System in Medieval India
4. Tara Chand – Society and State in the Mughal Period.
5. Irfan Habib and Tapan Raychaudhury (ed) Cambridge Economic History of India Vol. – I.

৬। গৌতম ভদ্র — মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ

৭। ইরফান হাবিব—মুঘল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস

8. Richard Halissey – The Rajpat Rebellion Under Aurangzeb.
9. P.N. Chopra – Society and Culture during the Mughal Age.
10. W.H. Moreland – Agrarian System of Moslem India.
11. Irfan Habib (ed.) – Akbar and His India.
12. Muzaffar Alam (ed.) – The Mughal State.

একক ৯ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

৯.০ প্রস্তাবনা

৯.১ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন

৯.০ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল ও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এবং ১৮০৩ সালে দিল্লী ইংরেজ সেনাবাহিনীর দখলে যায় এবং মোঘল বাদশা কেবলমাত্র বিদেশী শক্তির একজন পেনশন ভোগী হয়ে দাঁড়ান। এই পর্যায় থেকে আমরা এই বিশাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণগুলি জানতে পারি, যার পর্যালোচনা খুবই শিক্ষামূলক। এছাড়াও আঞ্চলিক শক্তির উদয়, মারাঠাদের স্বরাজ্য স্থাপন, ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপরও নজর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৯.১ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন—ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ ও অভিজাত বর্গ

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সমসাময়িক অন্য সাম্রাজ্যগুলির ঈর্ষা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল ও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে শেষদিকের মোঘল বাদশারা তাঁদের ক্ষমতা ও গৌরব হারাল এবং তাঁদের সাম্রাজ্য দিল্লীর আশেপাশে কয়েক বর্গ মাইলে সীমাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮০৩ সালে দিল্লী ইংরাজ সেনাবাহিনীর দখলে যায় এবং গর্বিত বাদশা কেবলমাত্র বিদেশী শক্তির একজন পেনশনভোগী হয়ে দাঁড়ান। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণগুলি পর্যালোচনা খুবই শিক্ষামূলক। মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠনের ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলি এই পর্যালোচনায় প্রকাশ পায়। এই দুর্বলতাগুলিই পরবর্তী সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা এই সাম্রাজ্যের পদানত হওয়ার কারণ।

ঔরাঙ্গজেবের শক্তিশালী শাসনকালেই সাম্রাজ্যের সংহতি ও স্থায়িত্বের ভিত নড়ে যায়। ঔরঙ্গজেবের অনেক ক্ষতিকারক নীতি সত্ত্বেও ১৭০৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মুঘল প্রশাসন ছিল দক্ষ ও সৈন্যবাহিনী ছিল শক্তিশালী। তখনও মুঘল বংশধরেরা দেশে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পেত।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র সিংহাসনের অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ৬৫ বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শা ক্ষমতা দখল করে।

বাহাদুর শা এক শিক্ষিত, মর্যাদাপূর্ণ এবং যোগ্য লোক ছিলেন। তিনি আপস এবং সৌহাদ্যের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঔরাঙ্গজেবের সংকীর্ণমনা কিছু নীতির তিনি পরিবর্তন ঘটান এবং হিন্দু রাজা ও অমাত্যদের প্রতি সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে কোনও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয় নি। তাঁর রাজত্বের শুরুতে রাজপুত রাজ্য অম্বর ও মেবারের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে তিনি অম্বরে জয়সিংহের ভাই বিজয় সিংহকে স্থাপন করেন এবং মেবারে অজিত সিংহকে মুঘল বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করান। অম্বর ও যোধপুর শহর দুটি মুঘল সৈন্যদ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কঠিন বাধার সামনে পড়েন এবং ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত সমঝোতার চেষ্টা করেন। এই সমঝোতায় তাঁর কোনও মহানুভবতা প্রকাশ পায়না, কারণ তিনি এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। তিনি অজিত সিংহ ও জয় সিংহকে রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেও গুজরাট, মালওয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে তাঁদের নিজস্ব

মনসবদার বা সুবেদার বসানর দাবী অগ্রাহ্য করেন। মারাঠা সর্দারদের প্রতি তাঁর সমঝোতার নীতি ছিল অসম্পূর্ণ। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সরদেশমুখী মেনে নিলেও চৌথা না মানায় তিনি তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। সাহুকে মারাঠা রাজা হিসাবে তিনি স্বীকার না করায় রাজ্যের অধিকার নিয়ে তারাবাঈ এবং সাহুর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। ফলে একই সাথে দাক্ষিণাত্যে অরাজকতা দেখা দেয় এবং সাহু এবং মারাঠা সর্দাররা বাদশার উপর অসন্তুষ্ট হয়। মারাঠা সর্দাররা পরস্পরের সাথে এবং মোঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার ফলে সেখানে শান্তি ও যথার্থ শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় নি।

গুরু গোবিন্দ সিংকে উচ্চ পদমর্যাদা দিয়ে বাহাদুর শা বিদ্রোহী শিখদের সাথে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পর বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখেরা আবার বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে। বাহাদুর শা শিখদের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করার জন্য নিজের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করে শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা আয়ত্তে এনে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হন। যদিও হিমালয়ের পাদদেশে গুরু গোবিন্দ সিং দ্বারা নির্মিত আম্বালার উত্তর-পূর্বে লোহাগড় দুর্গ এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ শিখ ঘাঁটিগুলি দখলে বাহাদুর শা সফল হয়েছিলেন, তথাপি শিখদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে তিনি ব্যর্থ হন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লোহাগড় দুর্গ শিখরা পুনরায় দখল করে।

বাহাদুর শা বুন্দেলা প্রধান ছত্রশালের সাথে সমঝোতা করেন। ফলে বুন্দেলা প্রধান তাঁর একজন বিশ্বস্ত সামন্ত হয়ে ওঠেন। একইভাবে জাঠ প্রধান চূড়ামন বাহাদুর শার সামন্ত হয়ে বান্দা বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন।

বাহাদুর শার রাজত্বকালে প্রশাসনের আরও অবনতি হয়। বহু পদোন্নতি ও বেপরোয়া ভাবে জায়গির দেবার ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। তাঁর শাসনকালে রাজকীয় সম্পদ, যা নাকি ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ কোটি টাকা ছিল তা নিঃশেষিত হয়।

বাহাদুর শা তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সময় পেলে হয়ত তিনি সাম্রাজ্যের হাল আবার ফেরাতে পারতেন, কিন্তু ১৭১২ খৃঃ তাঁর মৃত্যু তাঁর সাম্রাজ্যে আবার গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে।

এই সময় সিংহাসন উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর আগে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র রাজপুত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এবং তাতে অভিজাতরা যে কোন একজন সিংহাসনের দাবীদারের পক্ষ নিত। এখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতরা নিজেরাই ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিযোগী হয়ে ওঠে এবং রাজপুত্রদের দাবার বোড়ে হিসাবে এই কাজে লাগাতে থাকে। বাহাদুর শার মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধে তার এক দুর্বল পুত্র জাহানদার শা ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল কারণ তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী অভিজাত জুলফিকার খাঁ তার পক্ষ নেয়।

জাহানদার শা ছিল দুর্বলচিত্ত, আত্মমর্যাদাহীন, সম্পূর্ণভাবে আমোদপ্রমোদে মত্ত। তার মধ্যে সদাচার, শোভনতা এবং মর্যদার লেশমাত্র ছিল না।

জাহানদার শার রাজত্বকালে বাস্তবিকপক্ষে প্রশাসন তার ওয়াজির জুলফিকার খাঁর হাতে চলে যায়। জুলফিকার খুবই দক্ষ এবং কর্মক্ষম ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজদরবারে তার নিজের অবস্থান শক্ত এবং রাজত্ব নিরাপদ রাখার জন্য রাজপুত রাজা এবং মারাঠা সর্দার ও হিন্দু দলপতিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি দ্রুত ঔরাঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করেন। ঘৃণিত জিজিয়া কর তুলে নেওয়া হয়। অম্বরের জয় সিংহকে মিরজা রাজা সোয়াই উপাধি দিয়ে মালওয়ার শাসক করা হয়। মেবারের অজিত সিংকে মহারাজা উপাধি দিয়ে গুজরাটের শাসনকর্তা করা হয়। জুলফিকার খাঁ তার সহকারী দাউদ খাঁ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা রাজা শাহুর সাথে ১৭১১ খৃঃ যে সমঝোতা করেছিল তা স্বীকার করে নেন। এই সমঝোতার ফলে তিনি মারাঠা রাজাকে সরদেশমুখী এবং চৌথা কর দিতে রাজী হন, তবে এই শর্তে যে কর আদায় করবে মুঘল রাজকর্মচারীরা।

চূড়ামন জাঠ ও ছত্রশাল বুন্দেলার সাথে সমঝোতা করলেও বান্দা এবং শিখদের প্রতি জুলফিকার দমনের নীতি

চালু রাখেন। সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতির জন্য বেপরোয়া খরচ কমানো ও জায়গীর দান বন্ধ করেন। মনসবদারদের তাদের নির্ধারিত সৈন্যসংখ্যা প্রতিপালনে বাধ্য করান। কিন্তু তিনি জমি ইজারা দেওয়ার কুপ্রথা চালু করেন। টডোরমল প্রবর্তিত জমির নির্দ্ধারিত খাজনা আদায়ের পরিবর্তে সরকার একশ্রেণীর মধ্যভোগী লোককে কৃষকের কাছ থেকে খুশীমত খাজনা আদায়ের অধিকার দিয়ে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত টাকা নেবার ব্যবস্থা করে। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। অনেক ঈর্ষান্বিত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গোপনে জুলফিকার খাঁয়ের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। আরও উদ্বেগের কারণ এই যে সম্রাট নিজেও তার বিশ্বাস এবং সহযোগিতা পুরোপুরি জুলফিকার খাঁকে দেন নি। সম্রাটের কানে তাঁর অসৎ বশংবদরা ক্রমাগত বিষমন্ত্র দিত। তারা বলত যে জুলফিকার খাঁ এত বেশী ক্ষমতাবান এবং উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠছেন যে সম্রাটকেই উৎখাত করতে পারেন। কাপুরুষ সম্রাট ওয়াজিরকে বরখাস্ত করার সাহস না দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সুশাসনের পক্ষে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।

১৭১৩ খৃঃ আগ্রায় তার ভাইপো ফারুক শিয়ারের হাতে যুদ্ধে হেরে জাহানদার শার অপশাসনের অবসান হয়।

ফারুক শিয়ার তার এই জয়ের জন্য আবদুল্লা খাঁ ও হুসেন আলি খাঁ ভাতৃদ্বয়ের কাছে ঋণী ছিলেন। তাই তাদের যথাক্রমে উজির এবং মীর বক্সী পদ দেওয়া হয়। শীঘ্রই দুই ভাই রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ফারুক শিয়ারের রাজ্যশাসন করার মত ক্ষমতা ছিল না। তিনি কাপুরুষ, নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসের অযোগ্য ছিলেন এবং নিজের পছন্দের লোক এবং চাটুকারদের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও ফারুক সিয়ার সৈয়দ ভাইদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে রাজী ছিলেন না, তিনি চাইতেন নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করতে। উল্টোদিকে সৈয়দ ভাইদের ধারণা ছিল যে রাজ্যশাসন ঠিকভাবে চালাতে হলে, সাম্রাজ্যের পতন রোধ করতে হলে এবং তাদের নিজেদের অবস্থা সুরক্ষিত করতে হলে প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকা দরকার। এর ফলে ফারুক সিয়ার এবং তার 'উজির' ও মীর বক্সির মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। বছরের পর বছর অকৃতজ্ঞ সম্রাট সৈয়দ ভাইদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রকরে চললেন এবং ক্রমাগত ব্যর্থ হলেন। অবশেষে ১৭১৯ সালে সৈয়দ ভাইরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করেন। তার জায়গায় পর পর দুজন নবীন যুবরাজকে সিংহাসনে বসান হয় যারা ক্ষয়রোগে মারা যান। এই অবস্থায় সৈয়দ ভাইরা ১৮ বছর বয়স্ক মহম্মদ শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বানান। ফারুক সিয়ারের পরবর্তী তিনজন উত্তরাধিকারীই সৈয়দ ভাইদের হাতের পুতুল ছিলেন। এমনকি তাদের চলাফেরা করার বা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার অধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সুতরাং ১৭১৩ সাল থেকে ১৭২০ সালে উৎখাত হবার আগে পর্যন্ত সৈয়দ ভাইদের হাতেই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত ছিল।

সৈয়দ ভাইরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে হলে মুসলিম এবং হিন্দু রাজা ও অভিজাতদের একসাথে নিয়ে চলতে হবে। ফারুক সিয়ার এবং শত্রু অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তারা রাজপুত, মারাঠা এবং জাঠদের পাশে পেতে চাইল। সৈয়দ ভাইরা ফারুক সিয়ার ক্ষমতায় আসার পরে জিজিয়া কর বিলোপ করেন। একইভাবে বেশ কিছু জায়গায় তারা তীর্থযাত্রার উপর করও রদ করেন। তারা মারওয়াড়ের অজিত সিংহ, অম্বরের জয় সিংহ এবং এরকম আরো বেশ কিছু রাজপুত রাজাকে শাসনব্যবস্থার উচ্চপদ দিয়ে নিজেদের পাশে টেনে নেন। তারা জাঠ গোষ্ঠীপতি চুড়ামনের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হন। তাদের শাসনকালের শেষদিকে তারা সম্রাট শাহুর সঙ্গে এক চুক্তি করেন যার ফলে শাহু শিবাজীর রাজত্বে স্বরাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি অঞ্চলে 'চৌথ' ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার লাভ করেন। এর বদলে শাহু দাক্ষিণাত্যে ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সৈয়দ ভাইদের সাহায্য করতে সম্মত হন।

সৈয়দ ভাইরা বিদ্রোহ দমন এবং শাসনব্যবস্থাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তীব্র চেষ্টা করেন। তারা যে একাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার মূল কারণ হল তাদের ক্রমাগত রাজনৈতিক শত্রুতা, ঝগড়া এবং ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। এই ক্রমাগত সংঘর্ষ শাসনশ্রেণীর ভিতরে প্রশাসনকে ছিন্নভিন্ন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলেছিল। অরাজকতা এবং অব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বস্তরে। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল কারণ জমিদার ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা ভূমিরাজস্ব দিতে অস্বীকার করছিল, আধিকারিকরা রাষ্ট্রের আয় আত্মসাৎ করতে লাগল এবং কেন্দ্রীয় আয়ও কমে গেছিল। এর ফলে কর্মচারী এবং সৈনিকদের বেতন ঠিকমত সময়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। ফলস্বরূপ সৈন্যরা অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

যদিও সৈয়দ ভাইরা সমস্ত অভিজাত ও রাজন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও তাদের সাথে নিয়ে চলার প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন, তবুও নিজাম-উল-মুলক এবং তার বাবার জ্ঞাতিভাই মহম্মদ আমিন খান-এর নেতৃত্বে অভিজাতদের একটি শক্তিশালী দল সৈয়দ ভাইদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। এই দলটি দুই ভাইয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। ফারুক সিয়ারের অপসারণ এবং হত্যার ঘটনায় এদের অনেকে ভীত হয়ে পড়ল। সম্রাটকে যদি হত্যা করা যেতে পারে তবে সামান্য অভিজাত ব্যক্তির নিরাপত্তা কোথায়? তার উপরে সম্রাটের হত্যার ঘটনা জনগণের মধ্যেও সৈয়দ ভাইদের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। সৈয়দ ভাইদের বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘৃণা করা হচ্ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বেশ কিছু অভিজাত সৈয়দদের রাজপুত ও মারাঠাদের সঙ্গে মিত্রতা এবং হিন্দুদের প্রতি উদার আচরণ পছন্দ করছিল না। এরা প্রচার করল যে সৈয়দরা মুঘল এবং ইসলাম বিরোধী পথে চলছে। এইভাবে এরা মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে ধর্মান্ধ অংশকে সৈয়দ ভাইদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এদের প্রতি সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌র সমর্থন ছিল কারণ তিনি সৈয়দ ভাইদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে চাইছিলেন। এরা ১৭২০ সালে কনিষ্ঠ সৈয়দ হুসেন আলি খানকে চক্রান্ত করে হত্যা করতে সক্ষম হল। অন্য ভাই আবদুল্লা খানলড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি আগ্রার কাছে পরাজিত হন। এইভাবে উপর মুঘল সাম্রাজ্যের সৈয়দ ভাইদের আধিপত্যের অবসান হয়, যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সম্রাট নির্মাতা' (kingmaker) বলে পরিচিত।

মহম্মদ শাহ্-এর দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর (১৭১৯-১৭৪৮) রাজত্বকাল ছিল এই সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর শেষ সুযোগ। ১৭০৭-১৭২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মত ঘনঘন রাজ পরিবর্তন এই সময়ে ঘটেনি। তার রাজত্বকালের শুরুর দিকে মুঘল আত্মসম্মান একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি ছিল। মুঘল সৈন্যদল এবং বিশেষত গোলন্দাজ বাহিনী তখনও এক বিশাল শক্তি বলেই ধার্য্য হত। মারাঠারা তখনও দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং রাজপুতরা মুঘল বংশের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। একজন শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক আগামী দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ অভিজাতদের সাথে পেলে হয়তো অবস্থা সামলে দিতে পারতেন। কিন্তু মহম্মদ শাহএর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি এক দুর্বলচিত্ত, চপলমতি মানুষ ছিলেন এবং আরাম ও বিলাসব্যসনের প্রতি প্রচন্ড আসক্ত ছিলেন। তিনি রাজ্যচালনার ব্যাপারগুলি অবহেলা করতেন। নিজাম-উল-মুলক বা এদের মত সক্ষম উজিরদের পূর্ণ সমর্থন দেবার পরিবর্তে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ চাটুকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন। এমনকি তার পছন্দের সভাসদদের নেওয়া উৎকোচের ভাগও তিনি নিতেন।

সম্রাটের অস্থিরমতিত্ব, সন্দেহপ্রবণতা এবং রাজসভায় ক্রমাগত বিবাদে বিরক্ত হয়ে সেই সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অভিজাত নিজাম-উল-মুলক নিজের উচ্চাশা পুরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইনি ১৭২২ সালে উজির হবার পর শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এখন সম্রাট ও সাম্রাজ্যকে অন্যের হাতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭২৪ সালে তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করে দক্ষিণে চলে গেলেন এবং হায়দরাবাদ রাজ্যের পত্তন করলেন। তার প্রস্থান সাম্রাজ্য থেকে আনুগত্য ও সততার বিদায়ের প্রতীক। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভাঙনের এখানেই শুরু।

১০.০ আঞ্চলিক রাজ্যের উদয়, বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ

১০.১ মারাঠা স্বরাজ্য

১০.০ আঞ্চলিক রাজ্যের উদয়; বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ, ১৮ শতকের রাষ্ট্র, গঠনের স্বরূপ, রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি-মারাঠা স্বরাজ।

মুঘল সাম্রাজ্য এবং এর শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি স্বাধীন এবং আধা-স্বাধীন শক্তি যেমন বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং মারাঠা সাম্রাজ্য। এই শক্তিগুলিই অষ্টাদশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে কয়েকটির সৃষ্টি হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শাসকদের সায়ত্বশাসন ঘোষণা করার ফলে আর বাকিগুলি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল।

এই সমস্ত রাজ্যের শাসকেরা অর্থনৈতিক ও প্রাশসনিক দিক থেকে এক কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। এই রাজ্যগুলি সেইসব নিম্নস্তরের স্থানীয় কর্মচারী ও ছোটখাট জমিদারদের কমবেশী নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল, যারা কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়ে সর্বদাই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করত এবং কখনো কখনো ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতার স্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তুলতেও সক্ষম হত। এই সমস্ত রাজ্যগুলি সবই ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক ছিল, ওদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল একইরকম। এই শাসকরা অসামরিক বা সামরিক, কোনরকম নিয়োগের সময়ই ধর্মের ভিত্তিতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন না, এবং বিদ্রোহীরাও কোন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় তার ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না।

অবশ্য এদের মধ্যে কোন রাজ্যই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। জমিদার ও জায়গীরদাররা, যাদের সংখ্যা সবসময়েই বাড়ছিল, ক্রমহ্রাসমান কৃষি উৎপাদন নিয়ে সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করত। উল্টো দিকে কৃষকের অবস্থা ক্রমশই আরো শোচনীয় হচ্ছিল। যদিও এই রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিত, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাথমিক কাঠামোর উন্নতি ও আধুনিকীকরণের জন্য কিছুই করেনি।

হায়দরাবাদ রাজ্যটি নিজাম উল--মুলক আসফ জাহা ১৭২৪ সালে পত্তন করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান অভিজাত ছিলেন। সৈয়দ ভাইদের অপসারণে তিনি অন্যতম প্রধান ভুমিকা পালন করেছিলেন, এর পুরস্কার হিসাবে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার তাকে দেওয়া হয়েছিল। ১৭২০ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যের তার শাসনের বিরোধী সমস্ত শক্তি দমন করে নিজের শাসন সুদৃঢ় করেছিলেন এবং একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ সাল পর্যন্ত তিনি পুরো সাম্রাজ্যের উজির ছিলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টায় সম্রাট মহম্মদ শাহ বাধা দেওয়ায় তিনি এই পদের প্রতি দ্রুতই বিরাগ বোধ করতে থাকেন। ফলে তিনি দক্ষিণাত্যে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে তিনি নিরাপদে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারবেন। এখানেই তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা তিনি খুব শক্ত হাতে শাসন করেছিলেন। যদিও তিনি কখনই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তবু কার্যত তিনি স্বাধীন শাসকের মতই চলতেন। তিনি দিল্লীর সঙ্গে কথা না বলেই যুদ্ধ করেছেন, সন্ধি করেছেন, খেতাব প্রদান করেছেন বা জমির অধিকার প্রদান করেছেন। হিন্দুদের প্রতি তার আচরণ ছিল সহনশীল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তার দেওয়ান পুরান চাঁদ

ছিলেন হিন্দু। দাক্ষিণাত্যে এক সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন। তিনি 'বৃহৎ এবং বিপদজনক জমিদারদের তাঁর আধিপত্য মানতে বাধ্য করেন এবং মারাঠাদের তার রাজ্য থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হন। অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দিল্লীর মতনই বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তি হায়দরাবাদেও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কর্ণাটক ছিল দক্ষিণাত্যে একটি মুঘল 'সুবাহ', যা হায়দরাবাদের নিজামের কতৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু নিজাম যেমন প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর থেকে স্বাধীন হয়ে গেছিলেন, তেমনই কর্ণাটকের উপশাসক, যাকে কর্ণাটকের নবাব বলা হত, তিনি নিজেকে দাক্ষিণাত্যের শাসকের প্রভাবমুক্ত করে ফেলেন এবং এই পদটিকে বংশানুক্রমিক করে তোলেন। এইভাবে নবাব 'সাদুতুল্লা খান' তার ভ্রাতুষ্পুত্র 'দোস্ত আলীকে' নিজের উত্তরাধিকারী বানান উর্দ্ধতন শাসক নিজামের অনুমতি ছাড়াই। পরবর্তীকালে ১৭৪০ সালের পরে নবাব পদের জন্য ক্রমাগত লড়াই চলায় কর্ণাটকের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং ইউরোপের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি 'মুর্শিদকুলি খান' এবং 'আলিবর্দি খান' বাংলাকে প্রায় স্বাধীন করে ফেলেন। যদিও ১৭১২ সালে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্তির সময় থেকে তিনিই কার্যত বাংলার শাসক। সম্রাটকে নিয়মিত উপঢৌকন পাঠালেও তিনি দ্রুতই কেন্দ্রীয় প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন এবং বাংলাকে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিপদ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করেন। তার শাসনকালে তিনটি প্রধান বিদ্রোহ জন্ম নেয়। প্রথমটি সীতারাম রায়, উদয় নারায়ণ, গুলাম মহম্মদের দ্বারা, এরপর সুজাত খান এবং সবশেষে নাজাত খানের দ্বারা। এদের প্রত্যেককে পরাজিত করে 'মুর্শিদকুলি খান' এদের জমিদারী নিজের প্রিয়পাত্র রামজীবনকে দেন। মুর্শিদকুলি খান ১৭২৭ সালে মারা যান। তার জামাতা সুজা-উদ-দীন ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। এই বছরই আলিবর্দী খান সুজা-উদ-দীন এর পুত্র, সরফরাজ খানকে অপসারণ করে হত্যা করেন এবং নিজেকে নবাব ঘোষণা করেন।

এই তিনজন নবাবের শাসনকালে দীর্ঘসময় ধরে বাংলায় শান্তি এবং সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা ছিল যা শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে সাহায্য করেছিল। মুর্শিদকুলি খান শাসন ব্যবস্থায় অপচয় রোধ করেন। এছাড়াও তিনি গরীব চাষীদের কৃষিঋণ (টাকাভি) দেবার ব্যবস্থা করেন যাতে তাদের দুর্দশা লাঘব হয় এবং তারা সময়ে জমির কর দিতে পারে। এইভাবে তিনি বাংলার সরকারের সম্পদ বাড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু কর- ভিত্তিক জমি চাষ কৃষকের উপর বোঝা বাড়িয়ে দেয়। যদিও তিনি সমস্ত আইন-বহির্ভূত কর বন্ধ করে কেবলমাত্র নিয়মমত করই আদায় করতেন। কিন্তু এই কর জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে খুবই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আদায় করা হত। তার সংস্কারের আরেকটি ফল হল বহু পুরোন জমিদারদের সরিয়ে তাদের জায়গায় ভুঁইফোঁড় করচাষীদের বসানো।

মুর্শিদ-কুলি-খান এবং তার পরের নবাবরা হিন্দু ও মুসলিমদের কাজের সমান সুযোগ দিতেন। তারা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক এবং সৈনিক পদগুলিতে বাঙালীদের নিয়োগ করতেন, যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। কর-চাষীদের বাছাই এর জন্য মুর্শিদ-কুলি-খান স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের অগ্রাধিকার দিতেন, যারা মুখত ছিল হিন্দু। এইভাবে বাংলায় এক নতুন ভু-স্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

তিনজন নবাবই বুঝেছিলেন যে ব্যবসায়ের প্রসারে জনগণ এবং সরকার, উভয়েরই উপকার হয়। সুতরাং ভারতীয় ও বিদেশী, উভয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ যোগানো হত। থানা ও চৌকী স্থাপন করে সড়ক এবং জলপথ চোর-ডাকাতদের হাত থেকে নিরাপদ করা হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। শুল্ক প্রশাসনে দুর্নীতি রোধ করা হয়। সাথে সাথে নবাবরা বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্মচারীদের উপর কড়া নজরে রাখতেন যাতে তারা সুযোগের অপব্যবহার না করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশের আইন মানতে

বাধ্য করা হয়েছিল। অন্যান্য বণিকদের মত ইংরাজ বণিকদেরও একই শুল্ক দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলিবর্দি খাঁ ইংরাজ ও ফরাসীদের কোলকাতা এবং চন্দননগরে তাদের কল-কারখানাগুলিকে সুরক্ষিত করার অনুমতি দেননি। বাংলার নবাবরা অবশ্য একটি বিষয়ে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মনোভাবের পরিচয় দেননি। ১৭০৭ সালের পর থেকে দাবী আদায়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা তার হুমকি দেবার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তারা সেটিকে শক্ত হাতে দমন করেননি। কোম্পানীর হুমকির মোকাবিলা করার ক্ষমতা নবাবদের ছিল, কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করে চলেছিলেন যে একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী সরকারের শক্তিতে কখনও আঘাত করতে পারবে না। ইংরাজ কোম্পানীটি যে শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ীদের কোম্পানী নয়, বরং তারা সেই সময়ের সবচেয়ে বেশী আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী ও উপনিবেশবাদীদের প্রতিনিধি ছিল, তা বুঝতে তারা অক্ষম হয়েছিলেন। বর্হিবিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও তার সাথে যোগাযোগের অভাবে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। না হলে তারা জানতেন পশ্চিমের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকায় কী ধ্বংসলীলাই না চালিয়েছিল। একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়তে অনীহার জন্য বাংলার নবাবদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। যেমন, মুর্শিদকুলি খাঁর বাহিনীতে ছিল, মাত্র দু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক সৈন্য। আলিবর্দ্দী খাঁকে অহরহ মারাঠা হামলার মুখোমুখি হতে হত এবং শেষে উড়িষ্যার একটি বড় অংশ তিনি তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৭৫৬-৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন আলিবর্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর অভাবই বিদেশীদের জয়ের পথ সুগম করে দেয়। নবাবেরা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতিও বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমনকী বিচারবিভাগের কর্মচারীরা, অর্থাৎ কাজী ও মুফতিরাও উৎকোচ নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এইসব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলি সরকারি নিয়ম ও নীতিগুলির ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ঘটায়।

স্বশাসিত সবস্ব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাদাত খান বুরহান-উল-মুলক, যিনি ১৭২২ সালে অবধের প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী, উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। তাঁর নিযুক্তির সময়ে প্রদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী জমিদারেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারা জমির কর দিতে অস্বীকার করে, নিজস্ব ফৌজ তৈরী করে, দুর্গ বানায় এবং সম্রাটের শাসনকে অমান্য করে। সাদাত খাঁকে বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি এই অরাজকতা বন্ধ করে বড় জমিদারদের আয়ত্বে আনতে সফল হন এবং এর ফলে তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। বেশীর ভাগ পরাজিত জমিদারকেই অবশ্য পদচ্যুত করা হয়নি। নিয়মিতভাবে কর (জমি রাজস্ব) দিতে সম্মত হওয়ার পরে তাদের নিজেদের জমিদারিতেই রেখে দেওয়া হয়। এছাড়া, তারা অবশ্য অবাধ্য থেকেই যায়। নবাবের সামরিক শক্তি একটু দুর্বল হয়ে পড়লেই বা তিনি অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকলেই এই জমিদারেরা বিদ্রোহ করে বসত, যার ফলে নবাবের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ত। সাদাত খাঁর উত্তরাধিকারী সফদার জঙ্গ পরে লিখে-ছিলেন ঃ 'অবধের জমিদারেরা চোখের পলকে গোলমাল বাধানোর শক্তি রাখত। দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের থেকে তারা বেশী বিপজ্জনক ছিল।'

১৭২৩ সালে সাদাত খাঁ নতুন রাজস্ব ধার্য করেন। তিনি একটি যুক্তিযুক্ত ভূমি রাজস্ব চালু করেন এবং জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে সাধারণ কৃষকদের ভাগ্যের অনেক উন্নতি করেন।

বাংলার নবাবদের মত তিনিও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ করতেন না। তাঁর বহু সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিন্দু ছিল। তিনি সমস্ত অবাধ্য জমিদার, প্রধান এবং অভিজাতদের দমন করতেন এবং এই ব্যাপারে কোনরকম ধর্মীয় বৈষম্য করতেন না। তাঁর সৈন্যরা ভাল বেতন, ভাল শিক্ষা পেত এবং ভাল অস্ত্র পেত এবং তাঁর প্রশাসন যথেষ্ট দক্ষ ছিল। ১৭৩৯ সালে তার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কার্যত স্বাধীন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রদেশকে বংশ পরম্পরায় দখলে রাখা যায়, এমন ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর ভাইপো সাফদার জঙ্গ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। ১৭৪৮ সালে একই সাথে তিনি সাম্রাজ্যের ভাজির নিয়োজিত হন এবং এলাহাবাদও তাঁকে দেওয়া হয়।

১৭৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সফদার জঙ্গ অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের জনগণকে দীর্ঘকালের জন্য শান্তি এনে দিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করেছিলেন এবং মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন যাতে তাঁর এলাকা মারাঠা আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়। তিনি রোহিলা এবং বাঙ্গাস পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। ১৭৫০-৫১ সালে বাঙ্গাস নবাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিদিন ২৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে মারাঠা সমর্থন এবং প্রতিদিন ১৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে জাঠ সমর্থন লাভ করেন। পরে তিনি পেশোয়ার সাথে একটি চুক্তি করেন যার ফলে পেশোয়া আহমদ শা আবদালির বিরুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যকে সাহায্য করবেন এবং ভারতীয় পাঠান ও রাজপুত রাজাদের বিদ্রোহ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবেন। পরিবর্তে পেশোয়াকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং উত্তর ভারতের অনেকগুলি জেলার চৌথের অধিকার এবং আজমীর ও আগ্রার প্রশাসক নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এই চুক্তি ব্যর্থ হয়, কারণ পেশোয়া সফদার জঙ্গের শত্রুদের দলে চলে যান যারা তাকেঅযোধ্যা ও এলাহাবাদের প্রশাসক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সফদার জঙ্গ একটা ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়োগের বিষয়ে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজা নবাব রাই নামক একজন হিন্দু তাঁর সরকারের সর্বোচ্চ পদে বসেছিল।

দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং নবাবদের অধীনে অভিজাত সম্প্রদায়ের আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে এক সময় অযোধ্যা রাজদরবারকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র লক্ষৌ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। লক্ষৌ দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং ১৭৭৫ সালের পর অযোধ্যার নবাবের রাজধানী হয়। শীঘ্রই লক্ষৌ শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এটি হস্তশিল্পেরও এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সফদার জঙ্গ খুবই উচ্চ ব্যক্তিগত নৈতিকতা বজায় রেখেছিলেন। সমস্ত জীবন তিনি একই স্ত্রীতে অনুগত ছিলেন। বাস্তবে হায়দ্রাবাদ, বাংলা এবং অযোধ্যা, এই তিনটি স্ব-শাসিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা, অর্থাৎ নিজাম-উল-মুলুক, মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ, সাদাৎ খাঁ এবং সাফদার জং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত উচ্চ ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই মিতব্যয়ী ছিলেন ও সরল জীবনযাপন করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত অভিজাতরাই বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, এই ধারণাকে তাদের জীবনধারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কেবলমাত্র সরকারী এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে তাঁরা জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতেন।

মুঘল প্রাদেশিক সরকারের রূপান্তরের ফলে বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদে স্বশাসিত রাজ্যের জন্মকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন বলা যায়। তাদের পাশাপাশি , হিন্দুমারাঠা এবং শিখেরা সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে থেকে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছিল যাতে মোঘলদের অনেক প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাসে মুঘল শাসনকেসুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য থেকেই এই নুতন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি পরিণতি লাভ করেছিল। বাংলার স্বাধীন নবাবদের বংশগত পূর্বসূরী মুর্শিদকুলি খাঁকে এই ধনী প্রদেশের আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সম্রাট ১৭০৪ সালে পাঠান। তিনি বাংলার বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করান এবং মোঘল শাসন সুদৃঢ় করেন। এই কার্যক্রমের মধ্যে দেওয়ান ও সুবেদার পদ দু'টি পূর্ববর্তী সম্রাট আলাদা আলাদা রাখার চেষ্টা করলেও সেগুলি ধীরে ধীরে এক হয়ে যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা, বিশেষ করে নবাব আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬) নিজের লোক দিয়ে স্থানীয় অফিসগুলি ভর্তি করা শুরু করেন এবং তাদের রাজস্ব অনুদান দিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে দিল্লীর আওতা থেকে এরা বেরিয়ে যায়। ১৭৩৯ সাল এবং নাদির শার রাজধানী আক্রমণ পর্যন্ত বাংলার বিশাল রাজস্ব নিয়মিত দিল্লীতে পাঠান হত। এরপর রাজস্ব পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে। সম্রাট প্রায়শই বাংলার শত্রুদের পরামর্শমত চলতেন। দিল্লী বাংলার সুক্ষ্ম সুতীর কাপড়ের ব্যবহার বন্ধ করে

দেওয়ায় ফলে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ হয়, যার ফলে বাংলা থেকে অর্থ পাঠানো কমে যায়। ১৭৪২ ও ১৭৪৪ সালে মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলা নিজেই আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে।

১৭১২ সালের পর দিল্লীতে গোষ্ঠী সংঘাত এবং সম্রাটের অসহায়তা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রবণতাকে জোরদার করে তোলে। ১৭২০ সালে ভারতে জন্মানো নেতাদের এবং ইরান অথবা মধ্য এশীয় বংশোদ্ভূত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাত ঔরঙ্গজেবের পূর্বতন সেনাপতি আসফ্ জাকে (নিজাম-উল-মুল্ক) দাক্ষিণাত্যের উঁচু সমতলভূমিতে একটি ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল। ১৭৪৮ সালে তার মৃত্যুর সময়ে এই কেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে, যা পরবর্তী কালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের জন্ম দেয়। সাদাত খান (বুরহান-উল-মুল্ক), সম্রাটের উজির হন, এবং একই ভাবে তার রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রকে ১৭২০ সালে দিল্লী থেকে সরিয়ে নেন যখন তাঁর শত্রুরা দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করে। বাংলার মতই এই নৃপতিরা সুবেদার ও দিওয়ান পদগুলির সংযুক্তি ঘটান, যদিও মোঘলরা এইগুলি আলাদা রাখার পক্ষপাতি ছিল। শুরুতেই আসফজা এবং সাদাত খাঁ এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাতে তাদের বংশধরেরা এই নতুন সংযুক্ত পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এই পদক্ষেপ পরিষ্কার ভাবেই মোঘল ঐতিহ্যর বিরোধী ছিল। ১৭৩৯ এবং ১৭৫৯-৬১ সালে যখন দিল্লী ইরান ও আফগান হানাদারদের হাতে চলে যায় তখন এইসব ক্ষমতাশালী অমাত্যেরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়, যদিও শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাঁরা সম্রাটের দরবারে সাহায্য পাঠাত।

মুঘল প্রাদেশিক সরকারের মূল নীতি ও রূপের পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে। ১৭৪৮ সালে ঘোষিত ইচ্ছাপত্রে আসফ জাহ্ তাঁর উত্তরাধিকারীদের বাদশাকে অধিরাজ বলে মান্য করে শাসকদের শ্রেণীক্রমকে মেনে চলার পরামর্শ দেন। যেহেতু দাক্ষিণাত্য এক সময়ে ছয়টি মুসলিম রাজ্য দ্বারা গঠিত ছিল, "তাই পুরানো রাজপরিবারগুলিকে সঠিকভাবে দেখাশুনা করা উচিত," কিন্তু তাদের কাউকে কোনও সরকারী পদে বসান উচিত নয়। হায়দারাবাদের শাসক মারাঠা জমিদারদের সাথে সমঝোতা করবে' কিন্তু সে ইসলামের প্রাধান্য এবং মর্যাদা রক্ষা করবে এবং কখনই মারাঠাদের সীমা লঙ্ঘন করতে দেবে না।" প্রলোভন এবং যুক্তি পরামর্শ দ্বারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিজের পক্ষে আনার পুরানো নীতি বাদশা রাজ্যগুলিতে ভ্রমণের সময় অনুসরণ করবে। কিন্তু সৈন্যদের নিয়মিত ছুটি দেবে যাতে তারা সন্তান উৎপাদন করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছোট নৃপতিদের কৌশল ও উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী মুঘল প্রশাসকদের থেকে খুব বেশী পৃথক ছিল না। শুধুমাত্র তাদের অধিকার অনেক মজবুত ছিল এবং তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলার ক্ষমতা দিলে অনেক কমে গেছিল।

আঞ্চলিক শাসকরা তাদের পূর্ববর্তী মুঘল শাসকদের সমস্যাগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিল। বাংলার হিন্দু ভুস্বামীরা অনেক বেশী শান্তিপ্রিয় ছিল এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা অনেক উন্নত থাকায়, নবাব এবং পরবর্তী সময়ের ইংরাজরা নিয়মিত রাজস্ব ও নিয়ন্ত্রণ আশা করেছিল। কিন্তু অযোধ্যার চিত্রটা ছিল মিশ্র। দারুণভাবে স্বাধীনচেতা রাজপুত ভুস্বামীদের সাদাত খান দমন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির সাময়িক নজর সরলেই তারা আবার দ্রুত নিজেদের ক্ষমতা জাহির করত। দাক্ষিণাত্যে এবং কর্ণাটকে নতুন মুঘল শাসন হঠাৎ হঠাৎ সতেজ হয়ে উঠত এবং তা হত নানা বিপরীতধর্মী স্থানীয় তেলেগু ও মারাঠা সর্দারদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের নবাবেরা অবশ্য যথাক্রমে দাক্ষিণাত্যের এবং বিজয়নগরের স্বাধীন কতৃত্বের স্মৃতি অনন্ত কিছুটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

এই সমস্ত পরিবর্তিত প্রাদেশিক কর্তৃত্ব মোঘল অভিজাতদের কাছে যদি তারা কুশলী ও অব্যবসায়ী হত তাহলে ওই এলাকায় তাদের ক্ষমতা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে ও সাম্রাজ্যের অন্য অংশে মুঘল সামরিক কর্তাদের রাজস্বের নির্দিষ্ট ভাগ ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ক্রমাগত পরিবর্তন করা হত, যাতে এই অধিকার বংশানুক্রমিক না হয়ে দাড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে হায়দারাবাদের কিছু অংশে এই ধরনের অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা এক অধিকতর স্থায়ী ভুস্বামী

শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল, যারা তাদের রাজস্ব ও সামরিক কর্তব্য হায়দারাবাদে অবস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় ঠিক করত। অযোধ্যা এবং বাংলায় নতুন শাসকদের পরিবারবর্গ বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকার এবং রাজস্বের বিনিময়ে তা চাষ করার অধিকার অর্জন করেছিল, যা কালক্রমে বংশানুক্রমিক অধিকার হয়ে ওঠে (বাংলায় জমিদারী, অযোধ্যা ও হায়দারাবাদে তালুকদারী)। স্থানীয় সমাজে মিত্রের খোঁজে প্রাদেশিক শাসকরা স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দাদের মুঘল শাসনের শেষদিকে অর্জিত জমিগুলিকে বিনা রাজস্বে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং পরে পূর্ণ মালিকানার অধিকার দেয়। এইভাবে তারা দেশীয় (প্রধানত হিন্দু) গোষ্ঠীর ক্ষমতা সীমায়িত রাখার আশা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় মুঘলদের অনেক অনেক পূবর্তন কর্মচারীদের পরিবার গ্রামীণ সম্পদের উপর নিবিড় অধিকার কায়েম করে স্থানীয় শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আবারও সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তার সফল্যই সাম্রাজ্যের কাঠামো ধ্বংস করায় সাহায্য করেছিল।

একইভাবে, রূপান্তরিত মুঘল প্রদেশগুলিতে রাজস্ব ও ব্যবসায়ে উদ্যোগীরা যাতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, তার এক পটভূমির সৃষ্টি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হায়দারাবাদ, অযোধ্যা, বাংলা এমনকি বিপন্ন দিল্লীর প্রশাসনও মোঘলদের সামরিক রীতিনীতি ও বেতনহার বজায় রাখার চেষ্টা করে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র পদ্ধতি এবং সামরিক উপদেষ্টার ব্যবহার বেড়ে ওঠে। এসব কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ী মহাজন অথবা মুসলমান রাজস্বকৃষক (revenue farmer), যারা অর্থের যোগান দিতে পারত তারা ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। জগত শেঠের মত হিন্দু মহাজনেরা বাংলার রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে। বেনারসের রাজস্ব বিষয়ে আগরওয়াল মহাজনেরা শেষ কথা বলত। এমনকি মারাঠা রাজ্যগুলিতেও মহাজনি প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় রাজনীতির মুখ্য কুশীলব হয়ে ওঠে।

সমস্ত ভারতবর্ষে মুঘল প্রশাসনিক ছাঁচের প্রভাব ছিল। কিন্তু এই সব আধা স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সীমাবর্তি বা এই প্রদেশগুলির অভ্যন্তরেই অনেক ছোট রাজ্য ছিল যারা নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করত। মুসলমান শাসনের ইতিহাস লেখকদের মতে, ভারতে সবথেকে নীচ দ্বীপের শাসকেরা অনেক ক্ষেত্রেই ইতর শ্রেণীর গ্রাম্য জমির মালিক বা অবাধ্য গোষ্ঠীপতি ছিল। যাই হোক, তারা প্রায়শই ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার হিন্দু শাসন প্রণালীর অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি, যাদের অবলম্বন ছিল কর্তৃত্বশালী জমির মালিকগোষ্ঠীদের ক্ষমতা ও মূল্যবোধ, যারা এক সময়ে উপরতলার বিশেষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই দেশ শাসন করেছিল। তারা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিটি তারাই সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া এই সব ছোট রাজ্যগুলিকে উৎকোচ দিয়ে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে ঢুকে ইংরাজরা এই উপমহাদেশে শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল।

এইসব রাজ্যগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে গড়ে উঠেছিল এবং গ্রামীণ ক্ষমতাবিন্যাস ও উৎপাদনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে জড়িত ছিল। পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত এইরকম একটি বিশাল রাজ্যসমূহের বন্ধন গড়ে উঠেছিল যা রাজপুতদের অন্যস্থানে যাওয়া ও সম্প্রসারণের জন্য ঘটেছিল। রাজপুতরা হিন্দু যোদ্ধা সম্প্রদায়ের আদিরূপ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে এরা তেমন সংগঠিত ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ দ্বারা রক্ষিত রাজপুরুষদের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ এবং জীবনধারায় বিশুদ্ধতা রক্ষার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে এক গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক রাজপুতই ভ্রাম্যমান পেশাদার সৈন্য সম্প্রদায়ের ছিল যারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু রমণীদের এমনকী মুসলমান মহিলা বিয়ে করে নিজেদের অনুগামীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে রাজস্থানে সমবেতভাবে বেশ কিছু রাজ্য বংশানুক্রমিক টিকে ছিল মুঘলদের সাথে বিরোধ করে বা তাদের অনুগত হয়ে। এইগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীভূত বা আঞ্চলিক রাজ্য ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকরা প্রায়শই একে অপরের রাজত্বে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু পৃথকভাবে একটি রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহসুত্রে আবদ্ধ থাকার কারণে সীমিত ছিল।

দাক্ষিণাত্যে এবং সুদূর দক্ষিণে বহুপুরুষ ধরে তেলেগুভাষী যোদ্ধাশ্রেণী রাজপুতদের ভূমিকা পালন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার সব একীকরণ করে দেবার প্রবণতা এদের স্পর্শ করেনি। এইসব অধিপতিরা তিরুপতি এবং মাদুরাইএর মত বৃহৎ মন্দিরগুলি রচনা করত। তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতাদের শ্রদ্ধা করত, যারা পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্মীয় গুরু হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা দক্ষিণের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ অঞ্চলে এক শিথিল নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল এবং রাজ্য পরিচালনা, পূজা পদ্ধতি এবং ধর্মীয় শিল্পকলার এক বিশেষ শৈলীর জন্ম দিয়েছিল। মাদুরাই ও মহীশূরের নৃপতিরা এই শৈলীকে অনুসরণ করে চলতেন। কাল্লার বা মারাভা উপজাতির জঙ্গী নেতাদের উপর অবশ্য হিন্দু ধর্ম অতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, এবং তারাই তাদের তথাকথিত প্রভুদের হয়ে গ্রামের সুরক্ষা ও খাজনা আদায় করায় ক্ষমতা কোন একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

পুরানো পদ্ধতির অবশিষ্ট রূপান্তরিত হিন্দু রাজ্যগুলির পাশাপাশি যোদ্ধা অথবা খাজনা আদায়কারী চালনা উদ্যোগী দ্বারা হালফিল প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ছিল। আফগান ভারাটে সৈনিকরা তাদের সামরিক শিবিরের চর্তুদিকে সারা ভারতে সুসংবদ্ধ সুলতানী গড়ে তোলে। এর কিছু ১৬৮০ দশকে মোঘল শাসনের পূর্বে, কিছু মোঘলদের সামন্ত হিসাবে এবং আরও কিছু ১৭০৭ সালের পরে বাদশার তাদের ক্ষমতা রাখার চেষ্টা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আফগান সুলতানীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লীর কাছে রোহিলা রাজ্য, মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য ভুপাল ও মান্ডু, দক্ষিণের জিঞ্জী নেলোর। এই ধরনের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক সামরিক শক্তির তাদের আঞ্চলিক রাজার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মত অর্থ পরিচালনায় দক্ষতা এবং ধনী লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যাতে রাজাকে প্রাথমিক রাজস্ব দেওয়া যায়। সুতরাং কিছু প্রভাবশালী ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল যার সম্পদশালী যোদ্ধা নেতা রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ করত। বেনারসের রাজা পুরাতন হিন্দু রাজাদের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন পৃষ্ঠপোষকতা বা পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। অযোধ্যায় মনসারাম যে কারণে প্রথমে রাজস্বের পরিবর্তে চাষ এবং পরে মহারাজা হিসাবে টিকে ছিল (১৭৩৮ সাল থেকে) তা হল বেনারসের হিন্দু মহাজনদের আর্থিক সমর্থন এবং তার গ্রামীণ স্ব-জাতির সামরিক সমর্থন লাভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কিছু নক্ষত্র বিশেষ করে বর্দ্ধমানের বৃহৎ জমিদার মোঘলদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের বাইরেও বেশ কিছু স্থানীয় শক্তি গড়ে উঠেছিল যাদের ভিত্তি ছিল উপত্যকা ও সমতলভূমির উর্বর কৃষির জমি। হিন্দু এবং উপজাতীয় ভারতীয়দের মধ্যে সমতলভূমির কিন্তু গোটা উত্তর, মধ্যভারত এবং পশ্চিমঘাটের অবিশ্ববাদীরা মুখ্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত ছিল। এই ধরনের কিছু লোকের দলপতি থাকত যাদের বাইরের নৃপতিরা রাজা উপাধি দিত। যদিও প্রায়শই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যাযাবর বসতি বা শিকারী পরিবার মুখ্য রাজনৈতিক একক ছিল এবং রাষ্ট্রের সত্তার অস্তিত্ব ছিল না।

ছোট রাজার এবং স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তর রকমফের ছিল। কখনও কখনও দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের ত্রিবাঙ্কুর বা পূর্ব-উপকূলের মারাঠা তানজোর রাষ্ট্রের শাসকরা চাউল বা অন্য দামী শস্য উৎপাদনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত এবং রাজকীয় শস্যগোলা বা একচেটিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে তো নিয়ন্ত্রণ করত।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসকরা রাজার খাসজমির (demense) সম্পদ বাড়ানোর জন্য নিজেদের কিছু কৃষক রাখত। যাইহোক সাধারণ ঝোঁক ছিল কিছু কৃষক রাখত। যাইহোক সাধারণ ঝোঁক ছিল অনেকটা মুঘল ব্যবস্থার মতই অর্থাৎ মুদ্রার মাধ্যমে কর দেওয়া ও কৃষকদের দ্বারা চাষের প্রাধান্য। উদাহরণস্বরূপ ১৬০০ সাল থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে মহীশূরের রাজা ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করেন ১০% থেকে। ১৭৯৫ সালে টিপু সুলতানের অধীনে সেই রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় ৪০% এর মত। এটা অবশ্য সত্যি যে এই বর্ধিত করের সবটা সবসময় আদায় করা হত না যদিও যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকীয় সাড়ম্বরের জন্য গোটা উপমহাদেশ জুড়ে অর্থের প্রয়োজন বেশী করে দেখা দিতে শুরু করেছিল। এই কারণেই স্থানীয় রাজাদের আমলে শিক্ষিত ও অসংখ্য চাকুরীজীবি পরিবার স্থানীয় রাজ্যগুলির কাজকর্মের ব্যাপারে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। কুসীদজীবি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীরা রাজস্বের জামিনদার ও আদালতের অনুমোদনকারীরূপে উদ্ভূত হন।

ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব পরিচয়, ধর্মবিশ্বাস ও নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের ধরন বজায় রাখে। তা সত্ত্বেও অন্ততঃ মুঘল ব্যবস্থাপনাই বাহ্যিক রূপটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। ঠিক একইভাবে ব্যাপক সংখ্যক ধরণগুলিকে অনুসরণ করতে উৎসাহ যোগায় বহিরাগত চাকুরীজীবি মানুষের প্রভাবও শাসকশ্রেণীকে বৃহৎ পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার ধরণগুলিকে অণুসরণ করতে উৎসাহ যোগায়। তামিলনাড়ুর মারাবার ও কাল্লারের যোদ্ধা রাজারা নিজেদের হিন্দু রাজায় পরিণত করেন। তারা সুদূর দক্ষিণের বিপথে মন্দিরগুলি থেকে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেন। পশ্চিম গাঙ্গেয় সমতলভূমি ও দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে আফগান শাসকরা তাদের রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে তুললে নতুন ইসলামীয় শিক্ষাকেন্দ্র ও পাঠাগারের স্থাপনা হয়। সুফী অতীন্দ্রিয়বাদীদের নাকশ্‌বন্দী দল নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যা গড়ে ওঠে তা কোনো গোঁড়া বা কোনো প্রচলিত ধরনের ধর্মীয় অভ্যাস নয়। বরং তা হল বহিরাগত কিছু ধর্মীয় অভ্যাস, স্থানীয় দেবদেবী ও ধর্মীয় সাধকদের মধ্যবর্তী একটি সূক্ষ্ম এবং কখনো কখনো সংঘাতপূর্ণ ব্যবস্থা। এর ফলে একমাত্রিকতাকে অতিক্রম করে এক জটিলতর ও সমৃদ্ধতর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকে প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে কর্তৃত্বের যে টানাপোড়েন তার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্যাপক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা সত্ত্বেও বেশী উদ্যোগী যোদ্ধা ও তাদের পুঁজিপতি মক্কেলদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে এসব ঘটনা। জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ধরনের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য দু'টি শর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ গ্রামগুলিতে অন্ততঃ কিছুটা স্থিরতা থাকা বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ কৃষককুল ও তাদের নিয়ন্ত্রক যোদ্ধা শ্রেণীর যোগাযোগ ঘটানোর জন্য এক ধরনের কর্তৃত্বের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত নগদ অর্থ ও পরিষেবার জন্য উচ্চশ্রেণীর সর্বক্ষণের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন ও বাণিজ্য। এই অধ্যায় এখন এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করবে।

১০.১ মারাঠা স্বরাজ্য

ক্ষয়িষ্ণু মুঘল শক্তির প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এসেছিল মারাঠা রাজ্যের কাছ থেকে। এই মারাঠা রাজ্য ছিল পরবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। সত্যি কথা বলতে কি একমাত্র এই রাজ্যটিই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভরিয়ে তুলতে সক্ষম ছিল। উপরন্তু এই কাজ করার জন্য উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষ ও রাজনীতিবিদও তাদের ছিল। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁদের ছিল না। সেই কারণেই তাঁরা মুঘলদের জায়গা নিতে পারেননি। তবু তারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগতঃ যুদ্ধ করে তাকে ধ্বংস করে ফেলেছিল।

শিবাজীর নাতি শাহু ১৬৮৯ সাল থেকে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে ও তাঁর মাকে যথেষ্ট বিবেচনা, সম্মান ও মর্যাদা দিয়েই চলতেন। হয়তো শাহুর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার আশাতেই তিনি তাদের ধর্মীয়, জাতীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহু মুক্তি পান এবং খুব শীঘ্রই সাতারায় শাহু ও কোলাপুরে তারাবাইয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তারাবাই ১৭০০ সালে তাঁর স্বামী রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর হয়ে মুঘল বিরোধী যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। মারাঠা সর্দাররা, যাদের প্রত্যেকের অনুগত প্রচুর সৈন্য ছিল, তাঁরা ক্ষমতার দাবীদার যে কোন পক্ষের দিকে চলে যেতেন। এদের মধ্যে কয়েকজন দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শাহু ও তাঁর কোলহাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সংঘাতের সময়ই

শাহুর পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের অধীনে একটি নতুন মারাঠা সরকারের উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তনের সাথেই দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু হয়—মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়াদের কর্তৃত্বের সূচনা হয় যার ফলে মারাঠা রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

বালাজী বিশ্বনাথ, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এক ক্ষুদ্র রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে শুরু করে ধাপে ধাপে তিনি এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীতে পরিণত হন। শাহুর শত্রুদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেন। কূটনীতিতে তিনি দক্ষ ছিলেন এবং অনেক বড় বড় মারাঠা সর্দারকে তিনি শাহুর দিকে টেনে নিয়েছিলেন। ১৭১৩ সালে, শাহু তাকে তাঁর পেশোয়া বা মিত্‌খ্ প্রধান (মুখ্যমন্ত্রী) নিয়োগ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে মারাঠা সর্দার ও কোলাপুরের দক্ষিণে যেখানে রাজারামের বংশধররা রাজত্ব করতেন। শুধু সেটুকু ছাড়া পুরো মহারাষ্ট্রেই নিজের ও শাহুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। এই পেশোয়া নিজের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও সর্দারদের পিছনে ফেলেন দেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি এবং তাঁর পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশোয়াকেই মারাঠা সাম্রাজ্যের কার্যকরী প্রধান হিসাবে স্থাপন করেন।

বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল আধিকারিকদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মারাঠা শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি জুলফীকার খানকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য করেন। অবশেষে তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। আগে যে সব অঞ্চল শিবাজীর রাজ্য বলে পরিচিত ছিল, তার পুরোটাই শাহুর অধিকারে আসে ও তিনি দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়েরও দায়িত্ব পান। বদলে শাহু নামেমাত্র মুঘল কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সম্রাটের কাছে ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাতে সম্মত হন। এর উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে লুঠ ও বিদ্রোহ বন্ধ করা তিনি বার্ষিক দশ লাখ টাকা রাজকর দিতেও রাজী হন। ১৭১৯ এ এক মারাঠি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেন আলিখানকে সঙ্গে নিয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফারুক শিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করতে সাহায্য করেন। দিল্লীতে এই প্রথম তাঁরা নিজের চোখে সাম্রাজ্যের দুর্বলতাগুলি প্রত্যক্ষ করেন এবং এর ফলে তাঁদের উত্তরে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখীর সুষ্ঠভাবে আদায়ের জন্য বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা সর্দারদের আলাদা অঞ্চল ভাগ করে দিয়েছিলেন। এরা অবশ্য আদায়ীকৃত রাজস্বের বেশীরভাগ নিজের কাছেই রাখতেন। চৌথ ও সরদেশমুখীর এই ব্যবস্থা পেশোয়াকে পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। একগুচ্ছ উচ্চাকাঙ্খী সর্দারও তাঁর দিকে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য এই ব্যবস্থাকে এক প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ওয়াতন, সরঞ্জাম (জাগির) ইত্যাদি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই মারাঠা সর্দারদের শক্তিমান, স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রান্তগুলি তারা নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেইসব জায়গার স্বশাসিত প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের মূল রাজ্যের বাইরে মারাঠারা যখনই কোনো যুদ্ধজয় করেছে, তখন কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী মারাঠা রাজা বা পেশোয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং মারাঠা সর্দাররাও তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছে। এই যুদ্ধজয়ের পদ্ধতিতে সর্দাররা প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। এই সময়ে রাজা যদি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন, তবে তারা মুঘল বা ব্রিটিশ কারুর সঙ্গেই হাত মেলাতে ইতঃস্তত করতেন না।

বালাজী বিশ্বনাথ মারা যান ১৭২০ সালে। তার ২০ বছর বয়স্ক ছেলে বাজী রাও তাঁর উত্তরাধিকারী হন। সাহসী ও কুশলী সেনাপতি, এই উচ্চাকাঙ্খী ও বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদকে “শিবাজীর পরে গেরিলা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা” বলা হত। বাজী রাওয়ের নেতৃত্বাধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ চালান হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক অঞ্চলে চৌথ আদায়ের অধিকার হাসিল করা এবং পরে সেসব অঞ্চলকে মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত করা। বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পরে মারাঠারা মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখন্ডের কিছু এলাকার অধিকার পায়। গাইকোয়াড়, হোলকার, ভোঁসলে ইত্যাদি

পরিবার এই সময় গুরুত্ব অর্জন করে।

বাজী রাও সারাজীবনই দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্কের ক্ষমতা খর্ব করার কাজ করেন। নিজাম কোলাপুরের রাজা কিছু মারাঠা সর্দার ও মুঘল আধিকারিকদের সহায়তায় বাজী রাওয়ের সঙ্গে দুবার যুদ্ধে লিপ্ত হন ও দুবার নিজাম পরাজিত হন এবং মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দিতে বাধ্য হন। ১৭৩৩ সালে বাজী রাও জাঞ্জিরার সিদিদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন এবং তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেন। একই সঙ্গে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ শুরু করেন। পরিশেষে সলসেট দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু পর্তুগীজরা পশ্চিম উপকূলে অন্যান্য অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখে।

১৭৪০-এর এপ্রিল মাসে বাজী রাও মারা যান। মাত্র ২০ বছরের স্বল্প সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রের পটভূমির পরিবর্তন ঘটান। মহারাষ্ট্র একটি রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য তিনি সাম্রাজ্যকে কোনো শক্ত জমির ওপর রাখতে পারেননি। নতুন নতুন অঞ্চল সাম্রাজ্যে সংযোজিত হয় এবং তাদের প্রশাসনের দিকেও নজর দেওয়া হয়। সফল সর্দারদের মুখ্য চিন্তার বিষয় ছিল রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলি।

বাজী রাওয়ের ১৮ বছর বয়স্ক পুত্র বালাজী বাজী রাও (নানা সাহেব নামেই সমধিক পরিচিত) ১৭৬১ সালে পেশোয়া হন। তিনি তাঁর পিতার মতই যোগ্য ছিলেন, তবে অতটা কর্মঠ ছিলেন না। ১৭৪৯ সালে শাহুর মৃত্যুর পর পেশোয়ার হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পড়ে। এখন পেশোয়া রাষ্ট্রের সত্যিকারের শাসক হয়ে ওঠেন। এখন তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন। এরই প্রতীক হিসাবে তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় পূণায় স্থানান্তরিত করেন।

বালাজী বাজী রাও তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন ও মারাঠা শক্তিকে তার শীর্ষে নিয়ে যান। মারাঠা সৈন্য এখন পুরো ভারতকে ছারখার করতে থাকে। মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ডে তাঁদের ক্ষমতা সুসংহত হয়। বারবার বাংলা আক্রমণ করা হয় ও বাংলার নবাব উড়িষ্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দক্ষিণে মহীশূর ও অন্যান্য ছোটখাট রাজ্যও তারা লাভ করে। ১৭৬০ সালে হায়দ্রাবাদের নিজাম উদগীরের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ৬২ লক্ষ টাকা রাজস্ব সম্পন্ন একটি এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উত্তরে মারাঠারা এখন মুঘল সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ায়। গাঙ্গেয় দোয়াব ও রাজপুতানার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে তারা ইমাদ-উল-মুল্ককে দিল্লীর উজীর হতে সহায়তা করে। উজীর শীগগিরই মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। এবার তারা পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয় এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর প্রতিনিধিকে অপসারণ করে। এই ঘটনা তাদের আফগানিস্তানের এই যোদ্ধা রাজার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে নিয়ে আসে। তিনি মারাঠা শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ভারতে আসেন।

উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এক বিশাল সংঘর্ষ দেখা দেয়। আহম্মদ শাহ আব্দালী দ্রুত রোহিলখন্ডের নাজিব-উদ-দৌলা ও অযোধ্যার সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন, কেননা পূর্বেই এরা মারাঠাদের হাতে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে পেশোয়া তাঁর পুত্রের নেতৃত্বাধীনে উত্তরে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেন এবং আসল ও বিশাল বাহিনী তাঁর ভাই সদাশিব রাও ভাউয়ের নেতৃত্বে অর্পণ করেন। এই সৈন্যদলের একটি অংশ ছিল ইব্রাহিম খান গর্দির নেতৃত্বে ইওরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনী। মারাঠারা এখন অন্যান্য শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রী করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু তাঁদের আগেকার ব্যবহার ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা এই সমস্ত সম্ভাবনাই মুছে দিয়েছিল। তাঁরা রাজপুতানার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেও সেখান থেকে বিশাল পরিমাণ রাজকর ও জরিমানা আদায় করে। অযোধ্যাতেও তারা এক বিশাল অঞ্চল ও আর্থিক দাবী পেশ করে। পাঞ্জাবে তাঁদের কাজকর্ম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, জাঠ প্রধান, ভারী জরিমানা চাপানোর জন্য জাঠ প্রধানরাও তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। এইসব কারণে কোনো সাহায্য তারা পায়নি। সুতরাং একমাত্র ইমাদ-উল্-মুল্কের দুর্বল সাহায্য নিয়ে তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। মারাঠা সেনাধ্যক্ষরা এর মধ্যেও নিজেদের মধ্যে কলহ জারী রেখেছিলেন।

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী দুই শক্তি পানিপথের প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু করে। মারাঠা সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত

হয় এবং বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও ভাউ ও আরও বহু মারাঠা সেনাধ্যক্ষ্য মারা যান এবং প্রায় ২৮,০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। যারা পালাবার চেষ্টা করে, আফগান বাহিনী তাদের তাড়া করে এবং জাঠ, আহির, গুজর ইত্যাদি উপজাতিরা তাদের ওপর লুঠতরাজ চালায়।

পেশোয়া উত্তরে তাঁর ভাইকে বাঁচানর জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু এই দুঃখের খবর শুনে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ১৭৬১ সালে মারা যান।

পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় তাদের বিপর্যয় ডেকে আনে। তাঁরা তাদের সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশ হারায় ও তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। সর্বোপরি তাদের পরাজয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে সুসংহত হতে সাহায্য করে। আফগানরাও তাদের এই বিজয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পাঞ্জাবের ওপর তারা তাদের অধিকার হারায়। সত্যিকথা বলতে কি পানিপথের যুদ্ধের ফলে কে শাসক, ও কে শাসক নয় তা নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং ব্রিটিশদের উত্থানের পথ ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়।

১৭৬১-তে ১৭ বছর বয়স্ক মাধব রাও পেশোয়া হন। তিনি একজন প্রতিভাবান যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। মাত্র ১১ বছরের স্বল্প সময়ে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি মহীশূরের হায়দার আলিকে পরাজিত করেন এবং রাজকর দিতে বাধ্য করেন। এমনকী উত্তর ভারতেও ক্ষমতা কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। রোহেলা এবং রাজপুত রাজ্যগুলিও জাঠ প্রধানদের শায়েস্তা করে ১৭৭১ সালে মারাঠারা শাহ আলমকে ফিরিয়ে আনেন, যিনি এখন তাদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। তাই এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মারাঠাদের উত্থান আবার শুরু হয়েছে।

মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মারাঠা শক্তি আবার একটি ধাক্কা খায়। পুনায় বালাজী বাজী রাওয়ের ছোট ভাই ও মাধব রাওয়ের ছোট ভাই নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ১৭৭৩ সালে নারায়ণ রাও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ সন্তান সওয়াই মাধব রাও তার উত্তরাধিকারী হন, হতাশায় জর্জরিত হয়ে মাধব রাও ব্রিটিশদের দিকে যোগ দেন ও ক্ষমতা অধিকার করতে চান। এরই ফলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পেশোয়ার ক্ষমতা এখন পতনের দিকে ঢলে পড়ে।

নানা সাহেবের নেতৃত্বে সওয়াই মাধব রাও ও রঘুনাথ রাওয়ের অনুগতদের মধ্যে চক্রান্ত শুরু হয়। এর পর থেকেই মারাঠা সর্দাররা উত্তরে অর্ধস্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে থাকেন। এদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড, নাগপুরের ভোঁসাল, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ারা ছিলেন প্রধান। মুঘল প্রশাসনের ছাঁদে তারা সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন ও তাঁদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল। পেশোয়াদের প্রতি তাদের আনুগত্য ক্রমেই নামেমাত্র হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তে পুনায় তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে মিলে চক্রান্তে লিপ্ত হন।

উত্তরের মারাঠা শাসকদের মধ্যে মহাদজী সিন্ধিয়া ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ফরাসী অফিসারদের সাহায্যে সম্রাট শাহ আলমের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে সম্রাটের প্রতিনিধি (নাইব-ই-মুনাইব) উপাধি পান। অর্থাৎ মহাদজী পেশোয়ার পক্ষ থেকে কাজ চালানোর ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য মারাঠা রাজাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে নিজের শক্তির অপব্যয় করেন। তিনি ইন্দোরের হোলকারের ভীষণ শত্রু ছিলেন। তিনি ১৭৯৪ সালে মারা যান। তিনি এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা ফড়নবীসই ছিলেন শেষ দুই যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়ক যাঁরা মারাঠা গৌরবকে এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৯৫ সালে সওয়াই মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। চূড়ান্ত অপদার্থ দ্বিতীয় বাজী রাও তাঁর উত্তরাধিকারী হন। বৃটিশরা এখন তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতালাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মারাঠাদের চ্যালেঞ্জের অবসান ঘটাতে চায়। কূটনীতির সাহায্যে ব্রিটিশরা পরস্পরবিরোধী মারাঠা সর্দারদের বিভক্ত করেন এবং দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫) ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে তাদের আলাদাভাবে পরাজিত করেন। অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলিকে অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে থাকতে দেওয়া

হয়।

এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ও তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপনের মারাঠা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ ছিল এই যে মারাঠা সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের মতই পতনশীল সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত করত এবং একইধরনের অর্ন্তনিহিত সমস্যার শিকার হয়েছিল। মারাঠা প্রধানরা শেষের দিকের মুঘল অভিজাতবর্গের মতই ছিলেন, ঠিক যেমন সরঞ্জামী ব্যবস্থা মুঘল জাগীর ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। যতদিন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল এবং যতদিন একটি সাধারণ শত্রু অর্থাৎ মুঘলদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল, ততদিন তারা একটি শিথিল জোটের তলায় ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর পরে যখনই প্রথম সুযোগ আসে তারা তাদের স্বশাসন আদায় করে নেয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা ছিল মুঘলদের চেয়েও বিশৃঙ্খল। বহু মারাঠা সর্দার নতুন ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায়নি। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎসাহ দানে কিংবা ব্যবসা ও শিল্পে আগ্রহ বাড়াতে ব্যর্থ হয়। তাদের রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল মুঘলদের মতই। এছাড়াও মারাঠারা মূলতঃ অসহায় কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মোট কৃষিজ উৎপাদনের ৫০ ভাগ তারা কর আদায় করত। মহারাষ্ট্রের বাইরে একটি সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়। তাঁরা ভারতীয় মানুষকে উচ্চতর আনুগত্যে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে মুঘলদের চেয়ে বেশী সফল হতে পারেনি। তাদের রাজত্বও মূলতঃ শুধুমাত্র শক্তি ও জবরদস্তির উপর টিকে ছিল। একমাত্র যেভাবে মারাঠারা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত, তা হল তাদের রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। কিন্তু তা করতে তারা ব্যর্থ হয়।

একক ১১ ❏ বিদেশী আক্রমণ ঃ পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারত

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হল পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে ক্রমাগত আক্রমণ, যা শুধু মুঘলদের পতনেই জন্যই যে অনেকখানি দায়ী ছিল তাই নয়, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৭৩৮-৩৯ সালে নাদির শাহ যখন উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে অবতরণ করেন তখন সাম্রাজ্য এক অসহায় দর্শক মাত্র। পারস্যকে নিশ্চিত পতন ও ভাঙনের হাত থেকে বাঁচিয়ে নাদির শাহ সাধারণ রাখাল থেকে শাহ (রাজা) হয়েছিলেন। ঐ শতাব্দীর শুরুর দিকে এতদিনের শক্তিশালী ও সুদূর বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল সাফাওি বংশের অধীন হয়ে পড়েছিল। এবং অর্ন্তবিদ্রোহ এবং বিদেশী আক্রমণের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্বদিকের আবদালি উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করেছিল এবং হীরাট দখল করেছিল এবং ঘলজাই উপজাতীয়রা কান্দাহার প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। উত্তর এবং পশ্চিমেও একই ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। শিরজানে উগ্রবাদী শিয়াদের দ্বারা সুন্নীদের ওপর অত্যাচার সেখানে বিদ্রোহের সূচনা করে। সেখানে "সুন্নী মোল্লাদের মেরে ফেলা হয়। মসজিদগুলিকে অপবিত্র করা হয়, তাদের আস্তাবলে পরিণত করা হয় এবং ধর্মীয় শিল্পকে ধ্বংস করা হয়।" ১৭২১ সালে কান্দাহারের ঘাকই প্রধান মাহমুদ পারস্য আক্রমণ করেন এবং রাজধানী ইসফাহান দখল করেন। পিটার দি গ্রেটের অধীনে রাশিয়া তখনও দক্ষিণে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। পিটার ১৭২২ সালে জুলাই মাসে পারস্যে আক্রমণ শুরু করেন এবং খুব শীগগিরই কাস্পিয়ান সাগরের পাশে বাকু শহর সহ বেশ কিছু অঞ্চল ছিনিয়ে নেন। বেশীরভাগ ইউরোপীয় অঞ্চল হারিয়ে তুরস্ক তখন তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারস্যের দিকে নজর দেয়। ১৭২৩ সালের বসন্তে তুর্কী পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জর্জিয়ার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ১৭২৪ এর জুন মাসে রাশিয়া ও তুর্কী নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে সমগ্র উত্তর এবং পশ্চিম পারস্যের বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই অবস্থায় ১৭২৬ সালে নাদির শাহ তাহমস্প এর এক বড় সমর্থক এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৭২৯ সালে তিনি হীরাটের আবদালিদের পরাজিত করেন এবং ইসফাহান, মধ্য ও দক্ষিণ পারস্য থেকে ঘলজাইদের বিতাড়ন করেন। এক দীর্ঘ ও তিক্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর তিনি তুর্কীকে তার সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন। ১৭৩৫ সালে তিনি রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল আদায় করেন। পরের বছর তিনি শেষ সাফাভি শাসককে অপসারণ করে নিজেই শাহ হন। পরের কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আবার কান্দাহার প্রদেশ অধিকার করেন।

ভারত চিরকালই তার অফুরন্ত ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত হওয়ায় নাদির শাহ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একটানা যুদ্ধবিগ্রহ পারস্যকে এক রকম নিঃস্ব করে তুলেছিল। ভাড়াটে সৈন্যদলের খোরপোষের জন্য অর্থ ছিল অত্যন্ত জরুরী। ভারতবর্ষ থেকে লুন্ঠিত ধন একটি সমাধান হয়ে উঠতে পারত। একই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের দৃশ্যমান দুর্বলতা এই লুন্ঠনকে সম্ভব করেছিল। ১৭৩৮ এর শেষের দিকে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তিনি ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেন। অনেক বছর ধরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। বিপদ পুরোপুরি বোঝা যায় নি, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ লাহোর দখল করে নেয়। দিল্লীর সুরক্ষার দ্রুত চেষ্টা করা হলেও, দলাদলীতে লিপ্ত অভিজাতরা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি এসেও ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সুরক্ষার কোনো পরিকল্পনায় কিংবা সৈন্যদলের কোনো সেনাধ্যক্ষের আদেশেই একমত হতে পারলেন না। অনৈক্য, অযোগ্য নেতৃত্ব, পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস সহজেই পরাজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। দুই সেনাদল ১৭৩৯ এর ১৩-ই ফেব্রুয়ারী কামা নামক স্থানে মিলিত হয় ও আক্রমণকারীরা মুঘল সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। সম্রাট মহম্মদ শাহকে বন্দী করে নাদির শাহ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। তাঁর কিছু সৈন্যের যুদ্ধে মারা যাবার প্রতিশোধ নিতে নাদির শাহ রাজধানীর মানুষের উপর এক

ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালানোর নির্দেশ দেন। এই লোভী আক্রমণকারী রাজকীয় কোষাগার ও অন্যান্য রাজকীয় সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেন, বিশিষ্ট অভিজাতদের কাছ থেকে রাজকর আদায় করেন এবং দিল্লীর ধনীদের ওপর লুণ্ঠন চালান। তাঁর লুণ্ঠনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত। এর সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের রাজ্যকে করের বোঝা থেকে তিন বছরের জন্য মুক্তি দিতে পেরেছিলেন। তিনি বিখ্যাত কোহ-ই-নুর হীরে ও শাহজাহানের রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসনও নিয়ে গেছিলেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিম পাড়ে যাবতীয় প্রদেশ সম্রাট মহম্মদ শাহ নাদির শাহকে অর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

নাদির শাহর আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রচন্ড ক্ষতি করেছিল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্মানের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং সাম্রাজ্যের অর্ন্তনিহিত দুর্বলতা মারাঠা সর্দার ও বিদেশী বণিক কোম্পানীগুলির কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিছুকালের জন্য পুরোপুরিভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই আক্রমণ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার সর্বনাশ করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ঘটায়। দরিদ্র হয়ে যাওয়া অভিজাতরা বেপরোয়াভাবে কর চাপাতে থাকেন এবং তাদের হৃত ভাগ্যকে ফিরে পাওয়ার জন্য কৃষকদের আরও উৎপীড়ন করতে শুরু করেন। তারা এখন আগের থেকেও মরীয়াভাবে ভাল জাগীর বা উচ্চ পদ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকেন। সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিকে কাবুল ও অন্যান্য প্রদেশ হারিয়ে ফেলার ফলে আবার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভেঙে পড়ে।

আশ্চর্যজনভাবে নাদির শাহের প্রস্থানের পরে সামাজ্য তার শক্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আয়তন দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু এই পুনরুত্থান ছিল অসার ও তাৎপর্যশূন্য। ১৭৪৮ সালে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর অসৎ ও ক্ষমতালোভী অভিজাতদের মধ্যে তিক্ত সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। উপরন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষা দুর্বল হয়ে যাবার পর, নাদির শাহের সুযোগ্য সেনাপতি আহম্মদ শাহ আবদালি, যিনি তাঁর প্রভুর মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বারবার আক্রমণে সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে আবদালি বারে বারে উত্তর ভারত আক্রমণ করে দিল্লী, মথুরা পর্যন্ত লুণ্ঠন চালান। ১৭৬১ সালে তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদেরও পরাজিত করেন। এইভাবে তিনি মারাঠাদের মুঘল সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ তথা রাষ্ট্রকে শাসন করার ইচ্ছায় আঘাত হানেন। যাই হোক তিনি ভারতবর্ষে নতুন করে কোনো আফগান রাজ্য স্থাপন করেননি। তিনি বা তাঁর বংশধররা পাঞ্জাব প্রদেশকেও ধরে রাখতে পারেননি এবং শীগগিরই তা শিখ প্রধানদের কাছে খুইয়ে ফেলেন। নাদির শাহ এবং আবদালির আক্রমণে ও মুঘল অভিজাতবর্গের অর্ন্তদ্বন্দ্বে ১৭৬১ নাগাদ মুঘল সাম্রাজ্য সত্যিসত্যি একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যরূপে তার মর্যাদা হারায়। এটি শুধুমাত্র দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দিল্লী প্রতিদিনের দাঙ্গা ও বিক্ষোভের শিকার হয়ে পড়েছিল। মুঘলদের বংশধরেরা ভারতীয় সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহী হননি বরং ক্ষমতালোভী অভিজাতরা তাঁদের নামের পিছনে লুকানকে রাজনৈতিকভাবে খুব সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। এর ফলে দিল্লীর সিংহাসন নামেমাত্র ক্ষমতার বদলে দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

একক ১২ ❑ মুঘল পতনের ইতিহাস রচনা

গঠন

১২.০ মুঘল পতনের ইতিহাস রচনা
১২.১ অনুশীলনী
১২.২ গ্রন্থপঞ্জী

মুঘল পতনের ইতিহাস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বির্তকের বিষয় এবং গত ত্রিশ বছরে এই বিতর্ক একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে যে মুঘল আমলের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কোন ধারাবাহিকতা ছিল, নাকি কি আদৌ আর কোনো অস্তিত্ব ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল, এই বির্তকের একটি অত্যন্ত দীর্ঘ ঐতিহাসিক উৎস/উৎপত্তি আছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের এই পর্বের ইতিহাস মূলতঃ মুঘল শক্তির পতনের পরিপ্রেক্ষিতে থেকেই রচিত হয়েছে। এই সময়ের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন উইলিয়ম আরভাইন (William Irvine) এবং যদুনাথ সরকার। তাঁরা সম্রাটদের ও অভিজাতদের চারিত্রিক অবনমনকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেছেন। আইন ও শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে যদুনাথ সরকার ঔরঙ্গজেবকেই অপরাধী সাব্যস্ত্য করেছেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই তাঁর পতন ঘটেছিল। তিনি এমন কিছু অভিজাতবর্গকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন যাঁরা একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যের মতই রাষ্ট্রের সেবা করেছেন। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা ও তাঁদের অধীনস্থ অভিজাতরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের ছায়ামাত্র ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারেননি। এই ব্যাখ্যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত পারসিক ইতিহাস লেখকদের ব্যাখ্যার বাইরে রাঠোর, বুন্দেলা, মারাঠা এবং শিখদের মুঘলদের বিরুদ্ধে মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে পারেনি। একমাত্র পার্থক্য হল এই যে যদুনাথ 'হিন্দু প্রতিক্রিয়া'র আভাস পেয়েছেন। অন্যদিকে, সমসাময়িক রচনায় বিদ্রোহী ও বিঘ্নকারী (disturbers)-দের তাদের শ্রেণী যেমন জমিদার, বা তাদের জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলের ভিত্তিতেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। সরকারের ও তাঁর মত আরও বহু ঐতিহাসিকের বক্তব্যকে তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিতেই দেখা ঠিক হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকে বৈধ মনে হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মুঘল রাষ্ট্রকে মুসলিম গোঁড়ামির সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতাকে তাঁরা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন সঠিক হবে না যে এর ফলে সাম্রাজ্যে যে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় সেগুলি শুধুমাত্র হিন্দুদেরই প্রভাবিত করেছিল। বা হিন্দু প্রতিক্রিয়াই সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। কেননা এই সব নীতির বিরুদ্ধে মুসলমান আধিকারিক ও অভিজাতবর্গও একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। আরও বলা যায় যে মুসলিম মাদাদ-ই-মাগের মালিকরাও স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

১৯৫৯ সালে সতীশ চন্দ্রের "Parties and Politics at the Mughal Court 1707-40" বইটি আলিগড় থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই প্রথমবার মুঘল ব্যবস্থার গঠনগত ত্রুটিগুলির নীরিখে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে বিচার করার একটি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সতীশ চন্দ্রের মতে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে সাম্রাজ্যের সুস্থিরতা সপ্তদশ শতাব্দীতে mtmsab findjagir-এর দক্ষ কার্যপ্রণালীর ওপরেই নির্ভর করত। অভিজাতবর্গ (ওমরাহ) ছিল রাষ্ট্রের শ্রেণীক্রমে (hierachy) এমন একটি আধিকারিক গোষ্ঠী যাদের অবস্থান ও সম্মান তাদের মনসবের পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্ধারিত হত। তাঁদের সাধারণত ভূমিরাজস্ব (জাগির) অনুদানের মাধ্যমেই বেতন

দেওয়া হত। রাজস্বের প্রাপ্তি ও মুঘলদের দ্বারা তা সংগ্রহ করা মুঘল ব্যবস্থা পরিচালনা করার পক্ষে বড্ড জরুরী পূর্বশর্ত হয়ে পড়ে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে এই ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মুঘলদের ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল এবং তা কোনোমতেই লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

১৯৬৩ সালে ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব আলিগড় থেকে প্রকাশিত তাঁর দিশারী রচনা "The Agrarian System of Mughal India" গ্রন্থে সাম্রাজ্যের পতনের এক সচিন্তিত বিশ্লেষণ করেন। মুঘলরা রাজস্ব আদায়ের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তা ছিল সহজাতভাবেই ত্রুটিযুক্ত। যখন উচ্চ মানের সামরিক শক্তি বজায় রাখার জন্য রাজকীয় নীতি ছিল সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করা, তখন অভিজাতরা জাগীর থেকে যতদূর সম্ভব রাজস্ব নিংড়ে নিয়ে আদায় করে নিতে চাইত, তাতে যদি কৃষককুলের সর্বনাশ হত বা রাজস্ব দেবার ক্ষমতা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত সেদিকেও কোন মনোযোগ দেওয়া হত না। জাগীর যখন তখন হস্তান্তরিত হয়ে যাবার আশঙ্কায় অভিজাতরা কখনই কৃষির উন্নতিকল্পে কোন দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করেননি। কিছু এলাকার কৃষকরা তাঁদের জীবনধারণের সামান্য উপায় থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কৃষকদের ওপর করের বোঝা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছু অঞ্চলে তাঁরা পালিয়ে গেছিল বা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিল এবং মুঘল নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। মুঘল কর্তৃত্বের ক্রিয়াকলাপ প্রাক্-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পক্ষেও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। মুঘল ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতির জন্য কোনো অর্থ লগ্নী করার বা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্রের বাজার সৃষ্টি করার জন্য কৃষকদের সঙ্গতি ছিল না বললেই চলে।

১৯৬৬ সালে আলিগড় থেকে প্রকাশিত আর একটি গ্রন্থে এম. আথার আলিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল দরবারের অভিজাত ও তাদের রাজনীতি সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আথার আলি সতীশ চন্দ্রের কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই দু'টি রচনায় দক্ষিণী রাজ্যগুলি দখল, মারাঠা ও দক্ষিণী শাসকদের মুঘল অভিজাতগোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা এবং পরবর্তীকালে জাগীরের অভাব মুখ্য স্থান পেয়েছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক আলোচনাসভায় জে. এফ. রিচার্ডস, এম. এন. পিয়ারসন এবং পি. হার্ডির মত ঐতিহাসিকরা দক্ষিণ ও মারাঠাভূমিতে মুঘলদের অংশগ্রহণকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারীরা আগের দুই ঐতিহাসিকদের দেওয়া ব্যাখ্যাও সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। পিয়ারসন মুঘল ব্যবস্থায় একটি মূলগত ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিলেন। মুঘল শাসন যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যক্ষ ছিল না এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন নয়, বরং স্থানীয় বন্ধন ও রীতিনীতিই বেশীরভাগ সময় বেশীরভাগ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। শুধুমাত্র অভিজাতদের ক্ষেত্রেই অন্যান্য 'আদিম সম্পর্কের' চেয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ধারণা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই অভিজাতবর্গ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল, যে পৃষ্ঠপোষকতা সম্রাটের ক্রমাগত সামরিক সাফল্যের উপরেই নির্ভর করত। পিয়ারসন এক নৈর্ব্যক্তিক আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও মুঘল রাষ্ট্রের উপরে তার প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন এবং প্রাক্-আধুনিক যুগে এশিয়া ও আফ্রিকায় সফল রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সেই বহুপরিচিত ব্যাখ্যাই উপস্থাপিত করেছেন।

এই কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে সম্রাটদের ব্যক্তিগত সাফল্য বা ব্যর্থতা ও তাদের ক্ষয়িষ্ণু সামরিক শক্তি অভিজাতদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলত। পিয়ারসনের সূত্র অবশ্য এই সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থেকে গড়ে ওঠেনি। আমার মতে শুধুমাত্র অভিজাতদের ছোট গোষ্ঠী (উমারা) নয়, বরং আমিতুলার, গ্রামভিত্তিক কসবা-বা সেদ, মাদাদ-ই-মাশ (qasba-ba-sed-madad-i-ma'ash) অধিকারী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর আধিকারিকরা সাম্রাজ্যের কাঠামোর ভিতর গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য পরস্পরবিরোধী এই সব শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার উপর নির্ভর করেই টিকে ছিল। কিন্তু একথাও সত্যি যে রাজকীয় ব্যবস্থা কখনই জমিদারদের স্থানীয় গোষ্ঠী ও বিশেষতঃ আত্মীয়, গোষ্ঠী ও জাতির প্রতি প্রাথমিক বন্ধন

ছিড়তে বা তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। সংঘাতশীল সম্প্রদায়সমূহ ও বিভিন্ন স্তরে গড়ে ওঠা দেশজ সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। রাষ্ট্রের ভিত্তিই ছিল নেতিবাচক। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্কীর্ণ বন্ধনগুলির উর্দ্ধে উঠে একত্রিত হবার অক্ষমতার সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্য শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

মুঘল ভারতে রাজনৈতিক সংহতি নিজস্ব কারণেই সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। এই সংহতি স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত বিভিন্ন সামাজিক দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের শর্তাধীন ছিল। পদমর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য অভিজাতরা যে সম্রাট তাদের নিয়োগ করেছেন, তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁদের কোনো বংশানুক্রমিক জাগীর ছিল না যাকে তাঁরা আরও সমৃদ্ধিশালী করবেন কিংবা উত্তরাধিকারীকে দান করবেন। তাঁদের সম্পদের উপর রাষ্ট্রই নজর রাখত ও নিয়ন্ত্রণ করত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বেতনভোগী অসামরিক ও সামরিক কর্মচারী; তারা সম্রাটকে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতেন। তা সত্ত্বেও অভিজাতবর্গের নিজেদের কিছু টানাপোড়েন ছিল। জাগীর হস্তান্তরের মাধ্যমে আভিজাতদের ব্যক্তিগত প্রভাব বাড়তে না দেওয়ার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তা রাজকীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে অভিজাতবর্গের বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে তাঁরা এই ব্যবস্থা চালু করার বিরোধী ছিলেন। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি বলবৎ করা যায়নি।

সুতরাং এই যুগে অভিজাতদের কার্যকলাপ ও নিজস্ব ক্ষমতা বাড়াতে জমিদারদের সঙ্গে তাদের স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপন পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সাথে সম্পূর্ণ বেমানান ছিল না।

স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির নেতৃবর্গ, যাদের সাধারণত জমিদার বলেই আমরা চিনি, তাঁরা আসলে বংশানুক্রমিকভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মূলগতভাবে, তাদের পদমর্যাদা, শক্তি ও সম্পদ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিলনা। কিন্তু জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চল বিভেদে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট বিভক্ত ছিলেন ও প্রায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। প্রত্যেক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে ভয় পেত এবং প্রত্যেকেই অন্য গোষ্ঠীর প্রকৃত বা সম্ভাব্য দখলদারীর ভয়ে যথেষ্ট সর্তকতা ও পাহারাদারীর ব্যবস্থা করত। ওই যুগের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়কে একত্রিত হবার খুব কমই সুযোগ দিত। যে শক্তি আত্মীয়তা, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও ধর্মের উর্দ্ধে উঠে একটি জাতীয় চরিত্র দিতে পারত, সেই শক্তির অধীনে তারা চিরকালই পদানত ছিল। এমন একটি বিশাল শক্তি প্রত্যেকে গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রভাব হারাবার ভীতিকে অনেকখানি দূর করতে সক্ষম হত। সুতরাং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শর্তগুলিই মুঘল রাজকীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোনো স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যখনই মুঘল বাহিনী বিজয়লাভ করেছে, তাতে অন্য কোনো স্থানীয় বাহিনীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থানীয় দলগুলির এই একাত্ম হবার চেষ্টার ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ ও নেতিবাচক। রাষ্ট্রের প্রতি জমিদারদের এই বশ্যতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির উপরে নয়, বরং নিরাপত্তার শর্তাদি সৃষ্টির ওপরেও নির্ভরশীল ছিল। জমিদাররা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যত কোনো অঞ্চলের শাসক হয়ে উঠতেন; যে সব শর্তাদির দ্বারা তাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তাও ঐ অঞ্চলে লোকেদের শক্তি বা দুর্বলতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই সব অঞ্চলের অবস্থা একই জায়গায় আটকে ছিল না। আমরা দেখতে পাই এই সব অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল এবং এর ফলে জমিদাররা ও তাদের অনুচরবৃন্দ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বাবলম্বীভাবে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁদের পূর্বেকার নিরাপত্তাহীনতার বোধ অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল। সুতরাং সম্রাট ও অভিজাতবর্গের ব্যক্তিগত ও সামরিক ব্যর্থতার নিরিখেই মুঘল ব্যবস্থার অস্থিরতাকে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

১৬৯০ সাল নাগাদ দাক্ষিণাত্যে ব্যবহারযোগ্য জাগীরের অভাব ছিল এক কৃত্রিম ঘটনা, এই বক্তব্যের মাধ্যমে জে. এফ. রিচার্ডস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুঘল প্রশাসনের কিছু সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা রেখেছেন। দাক্ষিণাত্যে অপ্রতুলতার এক দীর্ঘকালীন ধারণাকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন যা থেকে এই বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটেছিল যে বেজাগিন (জাগিরের অভাব) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন আবিষ্কৃত দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে সতীশ চন্দ্র একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যায় বে-জাগিন ও জাগিরদারী ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য খুব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে জাগীরদারী ব্যবস্থায় সমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল এর অকার্যকারিতা—শাসক শ্রেণীর আয়তন বৃদ্ধি ও রাজস্বের পরিমাণ কমা নয়, যে জমি ইনজাগির (পাইবাকি) হিসাবে অর্পণ করা ছিল নির্দিষ্ট। সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুঘল প্রশাসনের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে "স্থানীয় যুদ্ধবাজ অভিজাততন্ত্রের" ভূমিকায় রিচার্ডস সঠিকভাবেই জোর দিয়েছেন। সতীশ চন্দ্রের মতে জাগীরদার, জমিদার ও খুদকাশ্‌ত্‌ (আবাসিক কৃষক) প্রমুখের মধ্যে বর্তমান "ত্রিমেরু সম্পর্কই" মুঘল সাম্রাজ্যের সুস্থিরতা বজায় রাখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল। অবশ্য কোথাও এই সম্পর্কের বহমানতা ঐ গোষ্ঠীগুলি অর্থাৎ জাগীরদার, জমিদার ও কৃষকদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। রিচার্ডস মাঝে মাঝে সম্রাটের সিদ্ধান্ত ও নীতির আলোকেও সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই ত্রিমেরু সম্পর্কের সমস্যাগুলির একটি পরীক্ষা আবশ্যক। উপরন্তু এক বিশাল সংখ্যক স্থানীয় গোষ্ঠীর (অযোধ্যার শেখজাদা, পাঞ্জাবের ক্ষাত্রী) মধ্যে মাদাদ-ই-মাশ (madad-i-naash) আধিকারিকদের ভূমিকাও আমাদের বিবেচনাযোগ্য। এদেরকে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল বা রাষ্ট্রের আধিকারিক কিংবা বিশাল কোনো অভিজাতর সাঙ্গপাঙ্গ হিসাবে দেখলে চলবে না, বরং তাঁদের স্থানীয় মানুষদের মধ্যে মিশে থাকা উপাদানের মত দেখতে হবে।

চিরাচরিতভাবে যেসব দলকে অ-রাজনৈতিক হিসাবে ভাবা হয়, অষ্টাদশ শতকে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণও মুঘল পতনের জন্য কম দায়ী ছিল না। ক্যানের লিওনার্ড এই যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে "দেশজ লগ্নী সংস্থাগুলি (banking firms) ছিল মুঘল রাষ্ট্রের অপরিহার্য মিত্র ছিল। অভিজাত শ্রেণী এবং রাজার কর্মচারীরা এই সংস্থাগুলির ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। ১৬৫০-১৭৫০ ব্যাপী সময়ে যখন এই লগ্নী সংস্থাগুলি যখন তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন সদ্যজাত আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও শাসকদের যেমন বাংলায় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাড়িয়ে দেয়, তখন তার ফলস্বরূপ বাংলা দেউলিয়া হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ও সাম্রাজ্যর পতন ঘটে। যে সিদ্ধান্তগুলিকে সত্যি ধরে নিয়ে লিওনার্দ তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেগুলি মুঘল রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির সমীক্ষায় যথেষ্ট সর্মথন পায়নি। তা সত্তেও তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য এবং তাকে একেবারে ফেলে দেওয়া চলে না। ফিলিপ কালকিন্‌স্‌ (Philip Calkins) প্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রাজনৈতিক সমীকরণে বণিক ও কুসীদজীবির (bankers) ভূমিকা নিয়ে নিষ্ঠাভরে কাজ করেন। গুজরাট নিয়ে পিয়ারসনের কাজেও রাজনীতিতে বণিকদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও পিয়ারসন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন যে মুঘল আর্থিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র বণিকদের ঋণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ক্যালকিন্‌স্‌ও তার মতামতকে শুধুমাত্র যে সময়কাল ও যে অঞ্চল নিয়ে তিনি সমীক্ষা করেছেন, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। পূর্ববর্তী সময়ে বা অন্য কোনো অঞ্চলে বণিকদের ভূমিকাকে তিনি সাম্রাজ্যের সুস্থিরতার জন্য দায়ী করেননি। তাঁর বক্তব্যের প্রতি নতুন কোনো প্রমাণের সর্মথন ছাড়াই, লিওনার্ড ক্যালকিন্‌স্‌ ও পীয়ারসনের মতামতকে আবদ্ধ প্রসারিত করে কুসীদজীবিদের ভূমিকার কথা অনুচিত ও অতিরঞ্জিতভাবে পেশ করেছেন। বণিকদের রাজনৈতিক অবস্থানের আসল প্রকৃতি চিহ্নিত করা খুবই মুস্কিল। কেননা যে পারসিক উপাদানগুলির ওপর এই সমীক্ষা দাঁড়িয়েছিল তাতে চিরাচরিত অ-রাজনৈতিক শহুরে গোষ্ঠীর সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়।

যাই হোক ক্ষাত্রীদের অভিজাত (উমারা) এবং বিশিষ্ট (আ'য়ন) হিসাবে উল্লেখ করার কিছু উদাহরণ পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বণিক (শাহুকার) ও কিছু হস্তশিল্পী শিখদের বিরুদ্ধে মুঘল অভিমানকে সমর্থন করেছিল। এই ঘটনাই নির্দেশ করে যে অন্ততঃ মুঘল ভারতের কিছু অংশে বণিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু এও সম্ভব যে বণিকদের স্বার্থ শাসক শ্রেণীর প্রতিপত্তি ও সুস্থিরতা ও তাঁরা যে বাজারকে জিইয়ে রেখেছিলেন, তার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের ঠিক আগে যখন তাঁদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন তাঁরা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। এমন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি শ্রেণী কখনই নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবে না, যদি তাঁরা মনে করে থাকে যে তাঁদের সমর্থন পেলে আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে। "সামাজিক সঙ্কট' হল স্মিথ, কে.এম. আসরফ, ইরফান হাবিব এবং আথার আলির রচনার মূল সুর। "Kem 73e" clinee অনুযায়ী সমাজ একটি ব্যাপক সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনীতির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট উদ্বৃত্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্য কথায় বলা যায়, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা যদি রাজনৈতিক পতনের আগে নাও এসে থাকে, তা রাজনৈতিক পতনের সঙ্গে একসাথেই এসেছিল। পতনের পর্বটি যে এক চরম বিশৃঙ্খলার সময় ছিল এই বিশ্বাস তাদের রচনাতেও স্থান পেয়েছে, যারা "পতন" শব্দটির জায়গায় "বিকেন্দ্রীকরণ" শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে সমাজ ছিল কিছুটা অস্থির। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে উঠছিল। কিন্তু এই অস্থিরতার সঙ্গে উৎপাদন ও বাজারের ক্ষেত্রের ব্যর্থতার সম্পর্কটা ঠিক স্পষ্ট নয়। ভারতীয় ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষত এর প্রথমার্ধ ছিল এক দুঃখজনক সময় কারণ মুঘলদের রাজনৈতিক গৌরব ও ঔপনিবেশিক শাসনের লাঞ্ছনার মত দুই বিপরীত ঘটনার মধ্যে এর অবস্থান। যেসব বৃটিশ ঐতিহাসিক ভারতের অতীত সম্বন্ধে প্রথম আধুনিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, এই সময়ের এক নিষ্প্রভ চিত্র আঁকার পিছনে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু আধুনিক রচনায় ব্রিটিশ বক্তব্যগুলিকে অকুণ্ঠভাবে মেনে নেবার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কিছু পারসিক ধারাবিবরণীতেও এই সময়কে একটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে শুধু যে ব্রিটিশ লেখকদেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে তাই নয়, তাঁদের ব্যাখ্যাগুলিকেও তা উৎসাহ দান করেছে। এই মতামতগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও আরও কিছু ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বোধকে এখনও প্রভাবিত করে। মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ছিল অভিজাতরা। এই ধারাবিবরণী রচয়িতারা বেশীরভাগই ছিলেন অভিজাতদের আশ্রিত ব্যক্তি। তাই তাদের রচিত ধারাবিবরণী সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। আঞ্চলিক শক্তিগুলি রাজকীয় নিয়ন্ত্রনকে প্রতিরোধ করে দিল্লী থেকে কিছুটা স্বাধীনতা আদায় করতে সক্ষম হওয়ায় এই অভিজাতবর্গকে কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাঁদের বিপর্যয়কে এইসব ধারাবিবরণীতে সমগ্র সমাজের অবক্ষয় ও পতন হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে মুঘল সিংহাসন ও সম্রাটের ব্যক্তিগত ছিল তাদের সমস্ত ধারণার কেন্দ্রবিন্দু, কাজেই রাজকীয় সৌধের পতন ও সমাজের পতন তাদের কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাণিজ্যিকীকরণ এবং গোষ্ঠীগঠনের বিষয়গুলি এই গ্রন্থে আলোচিত গোটা সময় জুড়ে অবস্থান করেছে। এরকমই আরেকটি বিষয় হল বিভেদীকৃত ও শ্রেণীবিন্যস্ত শক্তির প্রকৃতি যার সাহায্যে অঞ্চলগুলিকে ব্যাপকস্তরের কিছু পরিবর্তন থেকে আড়াল করা যায় এই বিষয়টি আমাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্যে অস্পষ্টতা ও বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। একথাও জোর দিয়ে মনে রাখতে হবে যে ভারতে "সাম্রাজ্য" ও "রাজ্য", এই দুটি ধারণাই ছিল সীমাবদ্ধ। এর কারণ এই ছিল না যে ভারতীয় সমাজ জাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যাতে রাষ্ট্র খুব গভীর শিকড় ছড়াতে পারেননি, যদিও বহু প্রাচ্যবাদী এই ধারণায় বিশ্বাসী। বরং এর কারণ ছিল রাজকীয় ক্ষমতা ও মর্যাদার অনেক দাবীদার যাদের অধিকার ও দায়িত্ব ছিল প্রায়ই একইরকম।

মুঘলরা সামগ্রিক কর্তৃত্ব দাবী করলেও, কখনো কখনো তারা শুধু রাজনৈতিক কর্তৃত্বই অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু বেশীরভাগ হিন্দু প্রজার কাছে ভারতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অর্থ ছিল মোটামুটি এক জটিল শ্রেণীক্রম মাত্র, যার সঙ্গে 'সরকার' বা 'প্রশাসনের' পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই। চেয়ে বেশী একটি জটিল শ্রেণীবিন্যাসের মতই ঠেকত। মুঘল সম্রাট ছিলেন শাহ্ আন-শাহ্ অর্থাৎ রাজার রাজা, শুধুমাত্র ভারতের রাজা নয়। তিনি ছিলেন কর্তৃত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ, আপীলের সর্বোচ্চ আদালত এবং মুসলমানদের জন্য তিনি ছিলেন পয়গম্বর মহম্মদের একজন পার্থিব উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রের লক্ষণ বলতে আমরা যা বুঝি, তা সম্রাট বা তার অনুগতদের মধ্যে নয়, তা দেখা যেত আঞ্চলিক হিন্দু রাজা বা অভিজাতদের মধ্যে, যাদের উপর গ্রামের সম্পদ ও কতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থাকত। যদি অর্থ, সৈন্য ও সম্ভ্রম আদায় করে নিতে সক্ষম হলে সম্রাট বিশাল ক্ষমতা ও সম্পদের প্রভু হতে পারতেন। তিনি ছিলেন ছোট খাট রাজাদের মালিক এবং ক্ষমতার উদ্যোগপতি। প্রধানত রাজকীয় সভা বা দরবারে সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করা হত।

রাজারা জাতি বিন্যাসের অভিভাবক ও হিন্দু ধর্মের মুখ্য যজ্ঞকর্তা হিসাবে গুরুত্ব লাভ করলেও যোদ্ধা কৃষক, যারা গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। গ্রামের এইসব ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা রাজ্যশাসনের গূঢ় বিষয়গুলিতেও যোগদান করতেন। আসলে তাঁরাই ছিলেন ভারতের মানুষ ও সম্পদের প্রধান রক্ষাকর্তা। এই ধরনের বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা অতিরিক্ত কর আদায় রোধ করতে বা নিজেদের যোদ্ধা রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারত, গাঙ্গেয় উপত্যকা ইত্যাদি অঞ্চলে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। এই জোটগুলিই মুঘলদের সর্বভারতীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করেছিল।

কিছু ঐতিহাসিক এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'ক্ষমতার স্তর' (levels of power) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বক্তব্য খুবই সুবিধাজনক, শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রমাগতঃ যোগাযোগ, মৈত্রী স্থাপন ও মৈত্রী ভাঙ্গন বিভিন্ন স্তরে হয়েই চলেছিল। এমনকী শক্তিশালী সম্রাটদের আমলেও শ্রেণীবিন্যাসের ক্রমাগতঃ পরিবর্তন হত। গ্রাম্য কৃষক-যোদ্ধারা ক্ষমতার দিক দিয়ে তাদের প্রতিবেশীদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছিল এবং রাজসভা থেকে তাঁরা রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একইভাবে রাজসভার পরিচালক, বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের কর্তৃত্ব খাটিয়ে জমিদারী দখল করে ছোট শহর বা গ্রামে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারত। এম. আলামের গবেষণামূলক রচনা "The Crisis of the Mughal Empire" প্রকাশিত হবার পর এই বিতর্ক এখনও চলছে।

১২.২ অনুশীলনী

১. কৃষি ও শিল্পের নিশ্চলতা মুঘল রাষ্ট্রের কাজকর্ম কিভাবে ব্যাহত করে? এটি কীভাবে রাষ্ট্রের ভাঙন ঘটায়?

২. তুমি কি মনে কর মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক ঘটনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কিছু প্রভাব থেকে গেছিল।

৩. আঞ্চলিক রাজ্যগুলির উদ্ভব কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল? তুমি কি মনে কর যে এর ফলে জাতীয়তাবাদ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?

৪. মুঘল রাষ্ট্রকে কতদূর একটি ভারতীয় রাষ্ট্র বলা চলে? অষ্টাদশ শতকের সমস্যার প্রসঙ্গে তা ব্যাখ্যা কর।

৫. তুমি কি মনে কর নাদির শাহের ভারত আক্রমণের কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক ছিল? এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬. মুঘল পতনের ইতিহাস-রচনা (Historiography) সম্পর্কে আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যে কি সত্যিই কোনো সমস্যা ছিল?

৭. মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সূত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বির্তকগুলি আলোচনা কর।

৮. অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত মারাঠা স্বরাজ্যের প্রকৃতি আলোচনা কর। এই ধারণা বিকাশে আঞ্চলিক রাষ্ট্র ভাবনা কতদূর সহায়ক হয়েছিল?

১২.৩ গ্রন্থপঞ্জী

1. M. Athar Ali– The Mughal Nobility under Aurangzeb.
2. Barnett Richards–North India between empires, Awadh, the Mughals and the British.
3. Bayly, C.A.–Rulers, Townsmen and Bazars : North Indian Society in the Age of British Expansion, 1700–1870.
4. Chandra Satish – Party and Politics in the Mughal Court.
5. Duff. I.G. – A History of the Marathas.
6. Habib Irfan – The Agrarian system of Mughal India.
7. Owen S.G. – The fall of the Mughal Empire.
8. Sarkar J.N. – A Study of Eighteenth Century India.
9. C.A. Bayly– The New Cambridge History of India – Vol.-II.
10. Alam M. – The crisis of empire in Mughal North India.

একক ১৩ ❑ অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি

গঠন

১৩.০ প্রস্তাবনা, অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতে

১৩.১ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে এই পর্যায়ে, ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে ক্রমশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষমতা দখলের সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোম্পানী মুঘলদের উত্তরাধিকারী হিসেবে কেন্দ্রীয় শক্তির শূন্যস্থান পূরণ করতে উদ্যোগী হয়। এছাড়াও বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ ও পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

১৩.১ অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো

প্রায় চারশ বছর আগে জাভার বান্টাম বন্দরে চারটি বৃটিশ জাহাজ উপস্থিত হয়। পরের বছর গ্রীষ্মকালে জাহাজ বোঝাই করা মরিচ নিয়ে তারা দেশে ফিরে যায়। একটি স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র বা কারখানা স্থাপনের জন্য অল্প কিছু সৈন্য তারা রেখে যায়। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করার জন্য লন্ডনের বণিকদের কোম্পানীকে রানী এলিজাবেথের সনদ দান করার দু-বছর পর ভারত মহাসাগর ও দূর প্রাচ্যে বৃটিশদের আগমনের সূত্রপাত হয়।

পরবর্তী প্রায় ২৩৩ বছর, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর কোম্পানী আধিপত্য বিস্তার করে এবং লন্ডন থেকে প্রায় ৪,৬০০ বার সমুদ্র যাত্রা করা হয়। ১৬২০ এবং ১৭০০ সালের মধ্যে যাওয়ার সময় চওড়া কাপড়, লোহা, রূপা এবং ফিরে আসার সময় মরিচ নিয়ে বছরে প্রায় ৮টি জাহাজ যাতায়াত করত। ১৮০০ সালের পর বছরে গড়ে ৪২টি জাহাজ আসাযাওয়া করত। জাহাজবাহিত পণ্যের পরিমাণও খুব বেড়ে যায় যার মধ্যে প্রধান ছিল চা। এই কাজের মাধ্যমে কোম্পানী বৃটেনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এশিয়ার সামগ্রিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণের তুলনায় কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল যথেষ্ট অল্প।

এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল এক অন্যতম ঐতিহাসিক শক্তি যা আধুনিক বিশ্বায়নের উন্মেষ ঘটায়। একবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য বৃটিশ চেতনা থেকে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রায় হারিয়ে গেছে। এই কোম্পানীর কিছু কিছু চিহ্ন অবশ্য এখনও লন্ডন শহরে থেকে গেছে। যেমন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শূন্য পোতাশ্রয়, যেটি এখন গগনচুম্বী আধুনিক অট্টালিকাবেষ্টিত এবং বিশাল একটি পণ্য রাখার গুদাম, যা এখন কিছু কোম্পানীর কার্যালয় এবং কয়েকটি বাসগৃহে পরিণত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রভাব আমাদের রুচি, ভাষা ও ইতিহাসে থেকে গেছে।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন নতুন বিশেষত্ব ছিল না। প্রায় একশ বছর আগে থেকেই পর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করছিল এবং প্রায় ছয় বছর আগেই ডাচরা বান্টামে উপস্থিত হয়। অন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির মতই, ইংরেজরাও জটিল ও উন্নত বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ছাড়াই ভারত মহাসাগরে আসে। যদিও নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তারা সামরিক শক্তির সাহায্য নেয় তবুও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের এশীয়দের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

১৬১৪ সালে বৃটিশরাজ প্রথম জেমস তাঁর ব্যক্তিগত রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রোকে গুজরাটে কোম্পানীর ব্যবসার জন্য সুযোগসুবিধা আদায় করতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পাঠান। কুড়ি বছর পর একজন হিন্দু রাজপুত্র মাদ্রাজে কোম্পানীকে আমন্ত্রণ জানালে, সেখানে কোম্পানী তাদের প্রথম দুর্গ সেন্ট জর্জ স্থাপন করে। ১৬৬১ সালে পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বে লাভ করেন। ১৬৯৬ সালের পর কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পেলে বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য সুসংগঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে তিনটি শক্তিশালী দুর্গ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যেই ভারতে ইংরেজদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় শাসকদের অনুমতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সহযোগিতার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করত।

ভারতীয় বাণিজ্যে সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য ছিল দক্ষ তাঁতীদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র। তাঁতে কিছু কাপড় বুনে সোনালি ও রূপালি সুতো দিয়ে তাদের উপর কাজ করা হলেও ভারতীয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল বস্ত্ররঞ্জন পদ্ধতিতে এবং হাতে আঁকা বা কাঠের টুকরোর মাধ্যমে সুন্দর নকশা ও বর্ণবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় প্রত্যক্ষভাবে চীনের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য ইংরেজ কোন চেষ্টা করে নি কারণ চীন একমাত্র ম্যাকাও দ্বীপে পর্তুগীজদের ছাড়া অন্য কোন বন্দরে ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার দিত না। কিন্তু ১৬৭২ সালে ইউরোপীয়রা তাইওয়ানে প্রবেশ করে এবং শতাব্দীর শেষে মূল ভূ-খন্ডের অন্তর্গত ক্যান্টনে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। যেখানে কঠোর শর্তের অধীনে থেকে ব্যবসা চালাত। চৈনিক রাষ্ট্র বিদেশী বর্বরদের প্রতি ঘৃণার কনফুসীয় নীতি সমর্থন করত এবং ইউরোপীয়রা বিপজ্জনক হতে পারে এই ধারণায় তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখত। ক্যান্টনে শহরের প্রাচীর ও নদীতীরের মধ্যবর্তী স্থানে ইউরোপীয়দের কারখানাগুলি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কারখানায় বসবাসের অনুমতি পেলেও মূল শহরে ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। বাণিজ্যকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত হপ্পো নামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের একজন প্রতিনিধি এবং হং নামে সরকার অনুমোদিত পাইকারী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায়।

প্রথমদিকে চৈনিক বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল চা। ফোটান জলে মিশ্রিত চা পাতা মদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চায়ের স্বাস্থ্যকর উপাদান এবং তার প্রাচ্যদেশীয় অভিনবত্বের গুণে পাশ্চাত্যে চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ক্যান্টনের সমগ্র বাণিজ্যের ৬০% দখল করে চা এবং প্রায় একশ বছর পর চায়ের উপর ধার্য শুল্ক থেকে বৃটিশ সরকারের বার্ষিক রাজস্বের প্রায় ১০% আসত। চায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চীনামাটির আমদানী শুরু করে কোম্পানী। অত্যাধিক চাহিদার জন্য চীনে অভূতপূর্ব মাত্রায় রৌপ্যমুদ্রা আসতে থাকে।

ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময়ে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে বাণিজ্যিক সংস্থার ভূমিকা ছেড়ে কোম্পানী ক্ষমতা দখলের লড়াইতে লিপ্ত হয়। ১৭৬৫ সালে ভারতের সবচেয়ে ধনী রাজ্য বাংলার প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় এবং রাজস্বসংক্রান্ত দায়িত্ব পেয়ে কোম্পানী একটি আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয় বাংলা দখল করে চীনে ক্রমবর্ধমান আফিমের চাহিদা মেটাতে সেখানে আফিমের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায় কোম্পানী। ১৭৭৩ সালে মুঘলদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছু পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানী। বাংলায় আফিম উৎপাদনের উপর এই অধিকার করা হয়। কলকাতায় জনসমক্ষে নীলামে বিক্রি হবার পর চীনে নিষিদ্ধভাবে আফিম সরবরাহ করা হত। ১৮২৮-২৯ সালে আফিম ভর্তি ১২,৬৬৫টি বাক্স চীনে পৌঁছয়। ক্যান্টনের প্রশাসকদের সঙ্গে বিরোধ এড়ানোর জন্য কোম্পানীর জাহাজে আফিম বহন নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবর্তে কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী এই আফিম সংগ্রহ করত এবং পার্ল নদীর মোহনায় লিন্টিন দ্বীপের কিছু বেপরোয়া বাণিজ্যিক সংস্থা সেই আফিম জাহাজে থেকে নামাত। আফিমের ব্যবসায় দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু চৈনিক আমলা ও শুল্কবিভাগের

কিছু কর্মচারীদের সমর্থন ছিল। লিন্টিনে আফিম বিক্রী করে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টনে কোম্পানীর কারখানায় দেওয়া হত। এর ফলে এই অর্থ কলকাতা ও লন্ডনে পাঠিয়ে কোম্পানীর বৈধ কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয়।

ভারতে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হলে দেশের সম্পদ প্রবাহের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ১৭৫৭ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকারী ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিছক একটি ভারতীয় রাজ্য ছিল না। কোম্পানীর শাসন শুরু হলে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা দেয় সেটি হল ভারত ও বৃটেনের মধ্যে অসাম্যমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কোম্পানী বাংলার রাজস্ব ব্যবহার করত। বৃটেন থেকে ভারতে সোনারূপ রপ্তানী ক্ষীণ হতে থাকল। পরিবর্তে বাংলার রাজস্ব ব্যবহার করেই বৃটিশরা ভারতীয় পণ্য কিনত। প্রথমদিকে বাংলা ও পরে উত্তর ভারতের বহু রাজ্যের রাজস্ব শুধু বৃটিশ শক্তি নয়, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হত। বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের পর ভারতে সোনারূপ পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের কাঁচামাল বৃটিশ শিল্পের জন্য রপ্তানী করা হত এবং ভারত বৃটিশ পণ্যের একটি বাজারে পরিণত হয়। সম্পর্কের এই অসাম্য বৃটেনের সঙ্গে নিছক এক কেজো বা ব্যবহারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। ভারতে কর্মরত বৃটিশ কর্মচারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসত। ভারত তাদের বাসস্থানে পরিণত হয়নি। এখানে মুঘল অভিজাতরাও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। এভাবে ভারতে বৃটিশদের বেতন ও অবসরগ্রহণের ভাতা বৃটেনেই হস্তান্তর করা হত। বৈধ ও অবৈধভাবে সংগৃহীত বৃটিশদের সম্পদের পরিমাণ কোন অংশেই কম ছিল না। তারা অনেকসময় প্রাচ্যের নবাব আখ্যা পেত। এই উপাধি শুধুমাত্র ভারতীয় রীতিতে জীবনযাপন নয়, প্রাচ্যের রাজপুরুষদের দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ও সম্পদ সম্পর্কে বৃটিশদের মনোভাবকেই পরিস্ফুট করত।

এই প্রসঙ্গে এটির উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ ১৭৬০ সালে যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান তখন তাঁর কাছে ছিল ডাচ কোম্পানীর নামে দুলক্ষ ত্রিশহাজার পাউণ্ড, বৃটিশ কোম্পানীর নামে একচল্লিশ হাজার পাউণ্ড, ত্রিশহাজার পাউণ্ডের হীরে, কোম্পানীর কর্মকর্তা হিসেবে সাতহাজার পাউন্ড এবং বম্বেতে কোম্পানীর নামে পাঁচহাজার পাউণ্ড। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর অধস্তন কর্মচারীরাও প্রায় পাঁচহাজার পাউণ্ড পায়। ভারতবর্ষের সম্পদ নিঃশেষ করেই এই অর্থ তারা উপার্জন করেছিল।

বৃটেনে স্থানান্তরিত করা বৃটিশদের অর্থ আসত বিভিন্নভাবে। উদারচেতা ভারতীয় শাসকদের দেওয়া উপঢৌকন ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালে বাংলায় বৃটিশরা যখন নবাব বদলের খেলায় মেতে উঠেছিল তখন নবাব হতে ইচ্ছুক ভারতীয়রা বৃটিশদের প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা দেয়। বাংলার বার্ষিক রাজস্ব থেকে বৃটিশদের আয় হত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। উপঢৌকন ছাড়াও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমেও বৃটিশরা নিজেদের আয় বাড়াত। লক্ষ্ণৌতে বৃটিশ কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত অল্পবয়স্ক বালকরাও তিন হাজার বা পাঁচহাজার টাকার ঘুষ বিরক্তির সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত। বাংলার নগরাধ্যক্ষ জেমস জনস্টন, বিচার্ড স্মিথ ও স্যার টমাস রামবেণ্ডি যথাক্রমে রিচার্ড স্মিথ ও স্যার টমাস রামবোল্ড যথাক্রমে তিনলক্ষ, আড়াই লক্ষ, দুই লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে অবসরগ্রহণের পর দেশে ফিরে যান।

পূর্ব এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য চৈনিক মাদকাসক্তদের কাছে লোভনীয় ও অনৈতিক মাদক সরবরাহের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চীনের বিলম্বিত প্রচেষ্টার ফলে ১৮৪০ সালে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং এই যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর বৃটিশরা হংকং দ্বীপ দখল করে নেয়। উনবিংশ শতকের শেষে ভারতে আফিম উৎপাদন থেকে ভারত সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব আসায় এবং ওষধি হিসেবে আফিম ব্যবহারের বহুল প্রচলন থাকায় এক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের বিশেষ প্রভাব ছিল না।

বৃটেনে এশীয় বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বৃটিশদের রুচির ক্রমশ পরিবর্তন ঘটে এবং অপরিচিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। মরিচ ও মশলা নতুন কোন পণ্য না হলেও কোম্পানীর বাণিজ্য সেগুলিকে সহজলভ্য এবং সস্তা করে তোলে। বৃটেনে প্রথম ভারতীয় বস্ত্রের অত্যাধিক চাহিদা দেখা দেয় এবং পরে চা ও কফি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোম্পানীর ক্রমাগত সম্পদবৃদ্ধির চিহ্নগুলি লন্ডন শহরে ফুটে উঠতে থাকে। বিভিন্ন নির্মাণের পরিকল্পনায় এই সম্পদের বিনিয়োগ হয়। এর ফলে ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয়ার ক্রমশ বৃটিশ সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন বন্দরে ভারতীয় ও চৈনিক নাবিকদের কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে ফিরে আসা হাজার নাবিকদের মধ্যে কয়েকজন থেকে যায়। কোম্পানীর কার্যকলাপের ফলে প্রাচ্যদেশীয় রুচির সৃষ্টি হয়। ১৭৯০ সালে খবরের কাগজে ভারতীয় 'কারি পেষ্ট'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যেত। ১৮০০ সালে বাংলায় কোম্পানীর সৈন্যবিভাগের এক প্রাক্তন কর্মচারী দিন মুহম্মদ ওয়েস্ট এন্ডে একটি হিন্দুস্থানী কফির দোকান গড়ে তোলে এবং পরে ব্রাইটনে কেশ পরিচর্যার ব্যবসা শুরু করে।

১৮১৩ সালে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। ১৮৩৩ সালে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় কোম্পানী বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে তার অস্তিত্ব হারায়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের প্রশাসনের দায়িত্বও হারায় কোম্পানী। ভারত বিভাগের কার্যালয়ে কোম্পানীর নথিপত্র স্থানান্তরিত হয় এবং কোম্পানীর সংগ্রহশালায় রাখা বিভিন্ন সামগ্রী ১৮৭০ সালে সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত বিভাগের গ্রন্থাগার এখন বৃটিশ গ্রন্থাগার দ্বারা অধিগৃহীত, যা ট্রেডিং প্লেসেস ঃ দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড এশিয়া' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। এশিয়া এবং বৃটেনে জীবনযাপনের পদ্ধতি কোম্পানী কিরকম অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যের নানা সমস্যা, ১৬১৪ সালের ইংরেজী থেকে মালয়ী ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি অভিধান, অষ্টাদশ শতকের সূচনায় ইউরোপে আনা রেশমের মত বিলাস দ্রব্য, পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জটিল আদান-প্রদান এই প্রদর্শনীতে দেখানর ব্যবস্থা হয়।

অষ্টাদশ শতকে ভারতে বৃটিশদের উপস্থিতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি শতকের মধ্যভাগে শেষ হয় এবং অন্যটি মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উপকূলের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃটিশদের উপস্থিতি অনুভূত হত। ১৭৫০ সালের পর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য বাংলার মত সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে বৃটিশরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষে বৃটিশ শাসন শক্তিশালী হয় এবং দিল্লী সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ওই সময়ের মধ্যে বৃটিশরা এমন এক সামরিক আধিপত্য স্থাপন করে যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে অবশিষ্ট ভারতীয় রাজ্যগুলিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। বৃটিশরা ওই রাজ্যগুলি জয় করে অথবা তাদের শাসকদের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকারে বাধ্য করে।

অষ্টাদশ শতকে সূচনায় ভারতে বৃটিশদের বাণিজ্যের একশ বছর পূর্ণ হয়। ১৬০০ সালে গড়ে ওঠার পর থেকে এশিয়ায় বৃটিশ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এর দায়িত্বে ছিল। অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজদের প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৩০০০ অংশীদার কোম্পানীকে মূলধন হিসেবে প্রায় ৩২ লক্ষ পাউন্ড দেয় এবং স্বল্প মেয়াদী সুদে আরো ৬০ লক্ষ পাউন্ড ধার নেওয়া হয়। এশিয়ায় প্রতিবছর প্রায় ত্রিশটি জাহাজ যেত এবং লণ্ডনে বার্ষিক বেচাকেনা প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছয়। কোম্পানীর মূল কার্যালয় ছিল লণ্ডন শহরে যেখানে অংশীদারদের দ্বারা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্বাচিত কোম্পানীর ২৪ জন পরিচালক সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

১৭৫০ সালে শুরু হওয়া ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব শেষ হয় ১৭৬৩ সালে, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত ও বাংলায় বৃটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর। ১৭৫৬ সালে স্থানীয় এক শাসক কলকাতায় কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র দখল করলে লর্ড রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁকে বিতাড়িত করে। পরের বছর পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশদের জয়ের পর তাদের মনোনীত একজন নবাব ক্ষমতায় আসেন। বাংলায় প্রাধান্য ক্রমাগত বৃদ্ধির পর অবশেষে বৃটিশ শাসনের সূচনা হয় ১৭৬৫ সালে যখন সামরিক শক্তিবিহীন অথচ প্রতীকী মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ মুঘল সম্রাট ক্লাইভের হাতে বাংলার শাসনভার তুলে দেন।

ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন থাকে। বৃটেনের জাতীয় দায়িত্ব বলতে বৃটিশ রাষ্ট্রের দ্বারা কোম্পানীর কার্যের নিয়মিত তত্ত্বাবধান এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃটিশ আইনসভার নেওয়া খোঁজখবরকে বোঝাত। ভারতে কোম্পানীর বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কর্মচারীরা প্রাদেশিক শাসনকর্তায় পরিণত হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকলেও বৃটিশদের বিজিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসকের দায়িত্ব পায় কোম্পানীর কর্মচারীরা। কিছু বৃটিশ ও প্রধানত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। কোম্পানীর বিভিন্ন অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা, প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যগুলি দখল এবং অভ্যন্তরীণ যেকোন বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য এই সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করা হত।

যেসব ভারতীয় রাজ্য কোম্পানী দখল করে তাদের পূর্বের অনুকরণেই কোম্পানীর নতুন সরকার প্রশাসনের স্থাপিত হয় এবং প্রশাসনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রথমদিকে করত ভারতীয়রাই। সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হত যা মধ্যবর্তী ভূস্বামীশ্রেণীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছত। মধ্যবর্তী ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর নিজেদের জন্য ফসলের একটি অংশ রাখার অধিকার ছিল।

তাদের সৈন্য প্রতিপালন এবং বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া ছাড়াও, প্রশাসনকে কৃষকদের এবং ভূ-স্বামী শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। বৃটিশ বিচারকেরা হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে বিচার হওয়া আদালতগুলিতেও উপস্থিত থাকতেন। সম্পূর্ণ নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। ওয়ারেন হেস্টিংস, যিনি ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন, বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নতুন বৃটিশ সরকার একটি প্রাচীন সংবিধান পুনস্থাপনের চেষ্টা করবে যেটি অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদি এটি করা হয় তাহলে বাংলার মত রাজ্যগুলি তাদের পূর্বের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধি ফিরে পাবে। কিন্তু এই শতকের শেষে চিত্রটি পালটে যেতে থাকে। সাম্প্রতিক বিপর্যয় শুধু নয়, এক মজ্জাগত পশচাদপদতায় ভারত নিমজ্জমান বলে অনেকের মনে হয়। ভারতের অগ্রগতির জন্য দৃঢ় অথচ সদাশয় বৈদেশিক শাসনের প্রয়োজন বলে দাবী করা হয়। উন্নতির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জমির মালিকানাকে অধিকতর নিরাপত্তা দেবার জন্য সম্পত্তির লেনদেন প্রক্রিয়ার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়। বৃটেন ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করে ইউরোপের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের সূচনা করা হয়। শিক্ষার কাঠামোকে নতুনভাবে সাজানো হয়। এশীয় ধর্মগুলির দ্বারা প্রচারিত তথাকথিত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য খৃস্টধর্মের যুক্তিবাদ প্রচারে মিশনারীরা উদ্যোগী হন। ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উন্নতির পরিকল্পনা করা হলেও ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসন করার প্রতিশ্রুতি দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকে।

১৭৫০ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করা বৃটেন অনুমোদন করে নি এবং জাতীয় সরকার ও কোম্পানীর পরিচালকগণ উভয়েই ছিলেন রাজ্যবিস্তারের বিপক্ষে। কিন্তু এই আশা ব্যর্থ হয়। মুঘল পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোম্পানী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সম্ভাব্য শত্রুদের প্রতিহত করতে কোম্পানী সচেষ্ট হয়। এই সম্পর্কের ফলে ওই রাজ্যগুলিতে কোম্পানীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানী যুদ্ধে যোগ দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে বিভিন্ন প্রান্তরে বহু ব্যয়সাধ্য এবং গুরুত্বহীন যুদ্ধে বৃটিশরা লিপ্ত হয় যা কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায় এবং বৃটেনে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল রিচার্ড ওয়েলেসলী সীমিত হস্তক্ষেপের নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের প্রতিটি শক্তিশালী রাজ্যের উপর বৃটিশদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে এক ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমে আফগানিস্তানের পর্বতমালা থেকে পূর্বে বার্মা পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়।

একক ১৪ ❑ কোম্পানী ও ভারতীয় বণিকরা

গঠন

১৪.১ কোম্পানী ও ভারতীয় বণিকরা ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারত কোম্পানীর ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতীয় তাঁতীদের বোনা সূতীবস্ত্র বৃটেন প্রচুর পরিমাণে আমদানী করত বস্ত্র ও আসবাবের আচ্ছাদন তৈরীতে প্রয়োজনীয় সস্তা, হাল্কা কাপড়ের পৃথিবীব্যাপী চাহিদার যোগান দেবার জন্য। বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতায় কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র এমন স্থানে গড়ে ওঠে যেখানে রপ্তানীর জন্য সুতীবস্ত্র সহজলভ্য ছিল। কোম্পানীর কারখানা থেকে এই স্থানগুলি প্রধান বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয় যখন ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কারিগররা কোম্পানীর এবং সেখানকার অধিবাসী বৃটিশদের সঙ্গে ব্যবসার প্রয়োজনে ওই জায়গাগুলিতে বসবাস শুরু করে।

ভারতের এক উন্নত অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে বৃটিশ-ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা শুরু হয়। বিদেশী বণিকদের জন্য ভারতে মজুত ছিল বস্ত্রবয়নে এবং রেশমবয়নে দক্ষ কারিগরদের কর্মনৈপুণ্য, চিনি, নীলরঙ, আফিম প্রভৃতি রপ্তানীর উপযোগী কৃষিজাত দ্রব্য এবং তেজারতির কার্যে নিযুক্ত ধনী ব্যক্তি ও এক শক্তিশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। অনুন্ন সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের সুদক্ষ শাসনে সমগ্র ভারত জুড়ে নিরাপদে ব্যবসা করার পরিবেশ বজায় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোম্পানীর ভারতীয় ব্যবসা সুস্থির ও লাভজনক হয়ে ওঠে। লণ্ডনে যাঁরা কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করতেন তাঁরা স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। ১৭৫০ সাল থেকে ব্রিটিশরা ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ভারতে তাদের ভূমিকায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং স্থানীয় বৃটিশদের ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়।

ভারতবর্ষে পরিস্থিতির অবশ্যই পরিবর্তন ঘটছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল এবং কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটছিল। এর ফলে সাধারণ আশঙ্কা অনুযায়ী অশান্তি ও অরাজকতার পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের শাসন স্থিতিশীল ছিল। সমগ্র ভারত জুড়ে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা যায় নি।

কয়েকটি নতুন রাজ্যের মধ্যে অবশ্য সংঘর্ষ দেখা দেয়। উপকূল অঞ্চলের কিছু রাজ্যে ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ইউরোপীয়দের সমর্থন আদায় করতে উদ্যোগী হয় এবং এতে ইউরোপীয়রাও অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। অংশত তাদের কোম্পানীর পক্ষ থেকে তারা কাজ করত। ১৭৪০ সালে বৃটিশ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ে দেরীতে নিযুক্ত ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতে মুঘলদের উত্তরাধিকারী আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নিজস্ব কোম্পানীর জন্য বিভিন্ন অতিরিক্ত সুবিধা আদায় ও বিরোধীদের দুর্বল করতে বৃটিশ ও ফরাসীরা সচেষ্ট হয়। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এক্ষেত্রে জড়িত ছিল। সিংহাসনলাভে ভারতীয় শাসকদের সফলভাবে সাহায্য করলে ইউরোপীয় সেনানায়কদের অঢেল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। অন্যকে রাজপদে বসানোয় যিনি সিদ্ধহস্ত, সেই রবার্ট ক্লাইভের মত একজন মানুষ অতি সহজেই অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠতে পারতেন।

১৯৫০ সালে প্যারিসে প্রকাশিত 'History of the Universe' গ্রন্থে জে পিরীন লিখেছেন যে, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেও বিশ্বে এশিয়ার স্থান ইউরোপের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় এশিয়ার ধনসম্পদ

বেশী ছিল। তার শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও ঐতিহ্য ইউরোপের কুটীরশিল্পের ছিল না। পাশ্চাত্যের দেশগুলির বণিকরা এমন কোন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করত না যাতে এশিয়দের ঈর্ষার উদ্রেক হতে পারে। ঋণ, অর্থের স্থানান্তর, বীমা ও শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারত, পারস্য, অথবা চীনের ইউরোপের কাছে কিছু শেখার প্রয়োজন ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে। প্রথমে ইউরোপে সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃটিশ দ্রব্য চওড়া কাপড় বিক্রীর আশায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে আসে এবং এর অত্যন্ত স্বল্প চাহিদা দেখে হতাশ হয়। পরিবর্তে, পর্তুগীজদের মত তারা কী বৃটেনে লাভের সঙ্গে বিক্রী করার মত কিছু ভারতীয় পণ্য খুঁজে পায়। অন্য ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে মিশরের মধ্যে দিয়ে লোহিত সাগরের পথে, ইরাকের মধ্যে দিয়ে পারস্য উপসাগর ধরে এবং তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তরের স্থলপথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ায় বৃটিশ বণিকদের প্রাধান্য স্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না। তাদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সব সুযোগ-সুবিধা চাইতে হত এবং স্থানীয় শাসক ও ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু সংস্থান রেখে বাণিজ্যিক প্রস্তাব পেশ করতে হত। ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান সুযোগসুবিধা এবং স্থলপথে বাণিজ্য থেকে ক্রমহ্রাসমান রাজস্বের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করে আওরঙ্গজেব বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হলেও, সব ভারতীয় শাসকের বাণিজ্যিক সুবিধা দানের ক্ষেত্রে বিশেষ আপত্তি ছিল না। এছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবিধা পাবার জন্য ধৈর্য্য ধরতে, লড়াই করতে, মিনতি করতে প্রস্তুত ছিল এবং ভারতের দীর্ঘ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে এইভাবে তারা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

এইসময়ে ভারতীয় ও বৃটিশদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উভয় দেশ থেকেই কর্মচারী নিয়োগ করত। বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শুধু নয়, বিবাহসূত্রেও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। বৃটিশ ভদ্রসমাজের রীতিনীতির কাঠিন্য থেকে মুক্ত হয়ে হালকা ও আরামদায়ক ভারতীয় পোষাক পরে, ভারতীয় কায়দায় অবসরজ্ঞাপন এবং নিজেদের ভাষায় স্থানীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্মচারীরা ভারতে জীবনকে যথেষ্ট উপভোগ করত। বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিমুক্ত বৃটিশ বণিকরা ভারতীয় পণ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হত এবং বৃটেনে ও ফ্রান্সে তাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সুযোগ নিত। এই ব্যবসা এত লাভজনক ছিল যে ভারত সোনারূপা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করলেও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধনী হয়ে উঠছিল।

ইংল্যাণ্ডে পৌঁছনর জন্য আফ্রিকা ঘুরে দীর্ঘ পথ যেতে হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশরা বিস্ময়করভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। অন্যান্য কিছু কারণে অবশ্য এই অসুবিধা অনেকটাই দূর করা যেত। প্রথম, আইনগতভাবে একচেটিয়া অধিকার থাকায় বৃটিশ বাজারের উপর তাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনস্থল থেকে সরাসরি কেনায় ইউরোপে প্রবেশ করার পর ভারতীয় পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি থেকে তারা অব্যাহতি পেত। তৃতীয়ত, ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজগুলি আকারে বৃহত্তম হওয়ায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়ার অর্থের সাশ্রয় হত। এছাড়াও আফ্রিকা ও আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম হয়েছিল।

'Europeans and the Textile Trade' (Arts of India 1550-1900) গ্রন্থে ভেরোনিকা মারফি লিখেছেন যে, যদিও আটলান্টিক মহাসাগরে দাস ব্যবসায়ে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি যোগ দেয় নি তবুও তাদের কাছে এটি অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে একসঙ্গে বিচার করলেও আটলান্টিক মহাসাগরের দাস ব্যবসায়ে বৃটিশদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ১৮৫০ সালে 'The Slave Trade, Domestic and Foreign' গ্রন্থে হেনরী কেরী লিখেছেন যে, বৃটিশ দাস ব্যবসা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ ছিল এবং ইংল্যাণ্ড যেসব দেশের উপর প্রাধান্য স্থাপন করত সেসব দেশ থেকে স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হত। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল আটলান্টিক মহাসাগরে দাস ব্যবসা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এমন কী তুরস্কে ভারতীয় পণ্য পুর্নরপ্তানী করছিল। এর ফলে তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যেহেতু ভারতীয় বাণিজ্য থেকে ওই দেশগুলির রাজস্বের এক বড় অংশ আসত। মুঘলদের রাজস্বের উপরও এর বিশেষ প্রভাব পড়ে এবং আরব ও গুজরাটী বণিকদের ব্যবসা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও এই ব্যবসার পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে ও এশিয়ার মধ্যে এই ব্যবসা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কেন্দ্রবর্হির্মুখী শক্তিকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে মুঘল রাষ্ট্র ক্রমশ ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলে। এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি বাড়ে, কার্যকলাপ বিস্তৃত হয় এবং ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে কোম্পানী অধিকতর সুযোগসুবিধা দাবী করতে থাকে।

যদিও ভারতীয় শাসকরা কোম্পানীকে অধিকতর সুযোগসুবিধা দেন তবুও ইউরোপীয় রৌপ্যমুদ্রা এশিয়ায় চলে আসার বিরুদ্ধে আক্ষেপ দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রেশম ও পশম ব্যবসায়ীরা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের উপর শুধু নিয়ন্ত্রণ নয় তারা নিজেদের দেশে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা দাবী করে। এই নিষেধাজ্ঞা যদিও ভারতীয় পণ্যের চোরাচালান বন্ধ করতে পারে নি তবুও এতে ভারতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাংলা প্রথম এর কুফল ভোগ করে।

ভারতীয় বস্ত্রের বাণিজ্য থেকে লাভের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। ১৬১৬ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত স্যার টমাস রো মুঘলদের কাছে ঘোষণা করেন যে বাণিজ্য ও যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৬৬৯ সালে, বস্ত্রব্যবসায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর পূর্বে, বম্বেতে কারখানার প্রধান জেরাল্ড আঙ্গিয়ার পরিচালকদের বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ১৬৮৭ সালে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ভারতে গোয়ার মত এক বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লেরও একই মত ছিল। অগস্ট তুঁসের 'History of the Indian Ocean' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৬১৪ সালে ওলন্দাজ জাঁ পিটারজুন কোয়েন অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে বাণিজ্য পরিচালনার প্রস্তাব দেন পরিচালকদের। অষ্টাদশ শতাব্দীর আফিমের বাণিজ্য (যার ফলে অহিফেন যুদ্ধ হয়) যাতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় বৃটিশ নৌবাহিনী সচেষ্ট হয়, সেটিই হল যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্যের সম্পর্কের এক উদাহরণ। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিচারে ঔপনিবেশিকতা অবশ্যই ছিল এর পরবর্তী পদক্ষেপ। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের পরিবর্তনের এক বিপজ্জনক সত্ত্বেও ছিল পলাশীর যুদ্ধ।

ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থকরা এশিয়দের দুর্বল চরিত্র এবং নিজেদের শাসন করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অক্ষমতার উল্লেখ করলেও 'Rise and Fall of the East India Company' গ্রন্থে আর. কে. মুখার্জী সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে অর্থনৈতিক প্রয়োজনই ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের পথে নিয়ে যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে একচেটিয়া অধিকার ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে থাকলেও এটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সস্তায় পণ্য কেনার সুযোগ দেয় নি। সেজন্য রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল অবশ্য প্রয়োজন।

ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর একটি দ্বিতীয় সমস্যা ছিল লাভের ক্ষেত্রে অন্য বৃটিশ কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা। লাভের উদ্দেশ্য যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তখন পলাশীর যুদ্ধ ও অহিফেন যুদ্ধকে তৎকালীন পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গ ত পরিণতি বলা চলে কারণ বৈধ ও সম্মানজনক উপায়ে মুনাফা করে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকজন ঐতিহাসিকদের দাবী অনুসারে, বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি "ভদ্র ব্যবসায়ীদের" নিয়ে গঠিত হত তাহলে বস্ত্র ও চায়ের ব্যবসা থেকে আফিমের মত মাদকের ব্যবসায় চলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যদি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হতেন, তাহলে ক্ষতি স্বীকার করে তারা দেউলিয়া হয়ে যেতেও রাজী হতেন।

এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ যে আফিমের ব্যবসায়ে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর লাভ করলেও তারা যুদ্ধের পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। একবার ক্ষমতার স্বাদ পাবার পর তারা বারবার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট পরিমাণে আফিম উৎপাদনে ভারতীয় কৃষকদের বাধ্য করে এবং এভাবে বৃটিশ-বাজারের জন্য প্রচুর চা সংগ্রহের পর প্রচুর লাভ করে। তবুও এশিয়ায় বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয় জাহাজের উপর সামরিক আক্রমণ শুরু করে কোম্পানী। করমণ্ডল উপকূলের শাসকগণ ও মারাঠারা, যাদের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কমতে থাকে, এই আক্রমণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ভিত্তিভূমি রচনা করে। যদিও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, পরবর্তী যুদ্ধগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কিছু ঐতিহাসিকের মতে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু এক ফরাসী বিশেষজ্ঞই এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

'Les Jrois Ages des Colonies, Paris, 1902' গ্রন্থে Abbe de Pradt লিখেছেন যে, পলাশীতে বিজয় এবং সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংলণ্ড সমগ্র ইউরোপে দেখায় যে আমেরিকা থেকে সংগৃহীত মূল্যবান ধাতু ভারতে পাঠানর তার আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রজাদের থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব ও পণ্যের উপর ধার্য শুল্কের সাহায্যে বৃটিশরা ব্যবসা করতে পারত, যেখানে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে ধাতুর মুদ্রা ব্যবহার করতে হওয়ায় তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হত। ভারতে বৃটিশদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপ থেকে ভারতে মূলধন পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। Abbe de Pradt নির্দিষ্টভাবে লিখেছেন যে, ইউরোপ থেকে ধাতুমুদ্রা এশিয়ায় পাঠান উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর মত ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃটিশদের ছিল যাতে ইউরোপও যথেষ্ট লাভবান হয়। এই সাম্রাজ্য যতটা বেশী বৃটিশ তার চেয়ে বেশী ইউরোপীয় ছিল। এই সাম্রাজ্যের বিস্তারে ইউরোপের সুবিধা হয় এবং ব্রিটিশদের জয় ইউরোপেরই জয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় বিরোধীদের ভর্ৎসনা ব্রিটিশ কতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এক বিকারগ্রস্ত আর্তনাদ এবং তিনি বলেন যে, ভারতের উপর তারা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ-বিরোধী করে।

প্রকৃতপক্ষে এই মত পরবর্তীকালের বহু বিশ্লেষকের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যায় যাঁরা মনে করেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দেশগুলির প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ হ্রাস পায় এবং পলাশীর যুদ্ধের পর তা আরো কমে যেতে থাকে। মোদ্দাকথা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় বৃটিশদের জয় হয়। Abbe de Pradt এর মতে বৃটিশদের কাছে হারান কিছু বিশেষ সুবিধার জন্য আক্ষেপ না করে ফরাসীদের সূচিত এই জয়ের সামগ্রিক সুফল ভোগ করা।

'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ এন. কে. সিংহ লিখেছেন যে প্রায় দুশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইউরোপীয়রা দেখে যে কোম্পানী, অথবা স্বাধীন বণিকদের ব্যক্তিগত বা অবৈধ ব্যবসা দুই-ই সবসময়েই বাংলার পক্ষে সুবিধাজনক থাকায় ইউরোপ থেকে ধাতুমুদ্রা সরবরাহ করতে হত। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার জনগণের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা রাজস্বের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে এভাবে বাণিজ্য ছাড়াই অন্যভাবে বাংলায় মূলধন পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়াছল। আর্মেনীয়, মুঘল, গুজরাটী এবং বাঙালী ব্যবসায়ীদের স্বাধীন ব্যবসা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। রপ্তানী, আমদানী, পণ্য উৎপাদন স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাড়া করা মধ্যবর্তী বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিল। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিযোগী ভারতীয় বণিকদের কারখানা ধ্বংস করার জন্য কোম্পানীর সৈন্যদের পাঠান হত। যেসব স্বাধীন তাঁতী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া স্বল্প বেতনের বিনিময়ে কাপড় বোনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত। তাদের হাত কেটে দেওয়া হত। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থলপথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপরও তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। পলাশীর যুদ্ধের ত্রিশ বছরের মধ্যে পূর্ব ভারতের

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক নাগপাশে আবদ্ধ করে ফেলে।

Abbe de Pradt-এর দেওয়া পূর্বাভাস অনুসারে ঔপনিবেশিকতার সুবিধা শুধুমাত্র বৃটিশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারের সুবিধা গ্রহণ করতে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার বণিকরাও উদ্যোগী হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থার অবনতির সুযোগ নিয়ে তারা অল্প দামে ভারতীয় পণ্য কিনে নেবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা অন্যায্যভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতারণা ও লুণ্ঠপাঠ শুরু করে। বেআইনীভাবে সংগৃহীত এই সম্পদ ভারত থেকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ও শুল্ক এড়ানোর জন্য তারা ফরাসী ও ওলন্দাজদের সাহায্য নিত। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় প্রতিযোগীরা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

মার্কিন ঐতিহাসিক ফার্বার ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬৯ এবং ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রতিযোগীরা সক্রিয় ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুসারে এটি ছিল একটি প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর মূলধন ৩২ লক্ষ পাউণ্ডের এক পঞ্চমাংশ ছিল ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণে এবং আমস্টারডাম, প্যারিস, কোপেনহেগেন, লিসবনের বিনিয়োগকারীরা, যারা কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তারা মূলধনের এক বৃহৎ অংশ বিনিয়োগ করত। ফার্বারের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী প্রমাণ করে যে স্বদেশে বা বিদেশে থাকা সমস্ত ইউরোপীয় তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে ভারতে একটি বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাছে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহুজাতিক চরিত্র নয়, কোম্পানীর আন্তর্জাতিক পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের উপরও ফার্বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এভাবে পলাশীর যুদ্ধ ছিল কোম্পানীর কয়েকটি আক্রমণের মধ্যে প্রথম যেগুলি ভারতের কোন আঞ্চলিক শক্তিই সফলভাবে প্রতিহত করতে পারে নি। ঐক্যবদ্ধ ভারত ইউরোপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সক্ষম হলেও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপকে প্রতিহত করার ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন ভারতের ছিল না। ১৮১৮ সালে মারাঠাদের, ১৮৪৮ সালে শিখদের পরাজয় এবং ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা দখলের মধ্যে দিয়ে ভারতে কোম্পানীর সাম্রাজ্যবিস্তার চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলেও এর ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত বৃটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয় এবং ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের শুরু হয়। বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চললেও ১৯৪৭ সালে আগে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

এভাবে প্রায় ২০০ বছর ধরে ভারত থেকে ইউরোপে সুপরিকল্পিতভাবে সম্পদ নির্গমন হতে থাকে। এতে প্রধানতঃ বৃটেন লাভবান হলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় বৃটেনের সহযোগীদেরও যথেষ্ট লাভ হয়। ভারতীয় মূলধন ব্যবহার করে বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলি আমেরিকা, জার্মানী ও ইউরোপের অন্য অংশে শিল্প গড়ে তোলে। ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপনের উপর ভিত্তি করে শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটে। উপনিবেশ দেশগুলির দারিদ্র্য বৃটেন ও আমেরিকার আধুনিকতা ও শিল্পবিকাশের সহায়ক হয়। আধুনিক ধনতন্ত্রের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে এটি মনে রাখা উচিত।

একক ১৫ ⌟ পলাশী যুদ্ধের পটভূমি

গঠন

১৫.০ বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ এবং পলাশী যুদ্ধের পটভূমি

১৫.১ অনুশীলনী

১৫.২ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি ঃ কর্ণাটের ঘটনাবলী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলার নবাবদের সঙ্গে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সূচিত করে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি উত্তরণের সূচনা করে। শুধুমাত্র একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সময়টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই বিরোধের ইতিহাস এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে রজত কান্ত রায়ের বই প্রকাশিত হওয়ায় এই বিতর্কে কিছু নতুন মোড় দেখা দেয়। আলোচনা শুরু করার জন্য আমরা সেই সময়ের সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

১৭০৫ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হন। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের দেওয়া ফর্মান অনুসারে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা, কলকাতার পাশে ৩৯টি গ্রাম কেনা এবং কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে জমিদারী স্থাপনের অধিকারও পায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় দস্তক দেবার অধিকারও পায় কোম্পানী। নবাব আলীবর্দী খাঁ কোম্পানীর উপর কয়েকবার যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব ধার্য করেন এবং পরিবহনের সময় কোম্পানীর পণ্য আটক করে তাদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। পণ্যসামগ্রী প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর নিজস্ব, বাংলা থেকে কোম্পানীকে বিনা শুল্কে রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি দেন বাংলার নবাবরা। দ্বিতীয়ত কোম্পানীর ও তার কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাংলার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা চালান নিষিদ্ধ করেন তাঁরা। ১৭১৭ সালের ফর্মান ও দস্তকের অপব্যবহার করত কোম্পানীর কর্মচারীরা। দস্তকের সাহায্যে তারা বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাত এবং বাংলার নবাবকে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করত। দস্তকের এই অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হলেও কোম্পানীকে তোষণ করার জন্য আলীবর্দী খাঁ এটি উপেক্ষা করেন। মৌমাছিদের সঙ্গে ইংরেজদের তুলনা করে তিনি বলেন যে, ইংরেজদের সন্তুষ্ট রাখলে তারা মধু দেবে কিন্তু বিরক্ত করলে তারা হুল ফোটাবে। এই মন্তব্য বৃটিশদের সম্পর্কে বাংলার নবাবদের মানসিকতার পরিচয় দেয়।

১৭৫৬ সালে আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজদৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। দক্ষিণ ভারতের আর্কটে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানোর পর বাংলাতেও কোম্পানী একই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল। ওরমের বক্তব্য অনুসারে আলীবর্দীর শাসনকালে মাদ্রাজে এই পরিকল্পনা করা হয়। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর, অনভিজ্ঞ, উগ্রমস্তিস্ক তরুণ নবাব কোম্পানীর আক্রমণাত্মক কৌশলের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ান। তরুণ নবাবের সিংহাসন লাভের বিরুদ্ধে সিরাজের মাসী ঘষেটি বেগমের বিদ্রোহ কোম্পানীকে সন্তুষ্ট করে। আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে নতুন নবাবকে নজরানা না পাঠিয়ে কোম্পানী নবাবের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত বিরোধের নীতি গ্রহণ করে সিরাজ। সিরাজ তৎক্ষণাৎ ঘষেটির ষড়যন্ত্র দমন করেন এবং তাকে মতিঝিল প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইংরেজরা

কলকাতা কাউন্সিলের সভাপতির অসুস্থতার অজুহাত দেয় হিসাবে তাদের উপঢৌকন না পাঠানোর কারণ হিসেবে। সিরাজের সন্দেহ হয় যে ঘষেটি বেগমের বিদ্রোহের পেছনে ইংরেজদের হাত থাকতে পারে।

ঢাকার সহকারী দেওয়ান রাজবল্লভ ঘষেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যিনি যুক্ত ছিলেন তাঁকে হিসেব ও বাকী থাকা টাকা নিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজসভায় উপস্থিত হবার আদেশ দেন নবাব। ছেলে কৃষ্ণবল্লভের দায়িত্বে নিজের পরিবার ও সঞ্চিত সম্পদ কলকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন রাজবল্লভ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুর্শিদাবাদের রাজসভায় উপস্থিত হন। প্রচুর উপঢৌকন পাবার পর কলকাতার গভর্ণর ড্রেক কৃষ্ণবল্লভ ও তাঁর পরিবারকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজী হয়। কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যর্পণের জন্য সিরাজ ড্রেককে বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কৃষ্ণবল্লভকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার অধিকার কোম্পানীর আছে এই অজুহাতে ড্রেক সিরাজের দাবী প্রত্যাখ্যান করে। নবাব সঠিকভাবেই উল্লেখ করেন যে মুঘল ফর্মান অনুযায়ী কোম্পানী মুঘল সম্রাটের অধীনে কলকাতার জমিদার। মুঘল আইন অনুসারে কোন জমিদারের কোন আসামীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার অধিকার নেই। নবাবের যুক্তি কলকাতা কাউন্সিল মানতে অস্বীকার করে।

এইসময়ে সিরাজ খবর পান যে কোম্পানী কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে তাঁর অনুমতি ছাড়াই পুনর্নির্মাণ শুরু করেছে। নবাবের চিঠির উত্তর দেবার সময় ড্রেক কোন নতুন নির্মাণের কথা অস্বীকার করেন। পরে তিনি যুক্তি দেখান যে ফরাসীদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে নিরাপত্তার জন্য কোম্পানী নির্মাণ শুরু করে। এই যুক্তি অস্বীকার করে নবাব কোম্পানীকে নির্মাণ বন্ধের আদেশ দেন। নির্মাণের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কোম্পানীর সঙ্গে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সিরাজ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। গুপ্তচর হিসেবে গভর্ণর ড্রেক নবাবের দূত নারায়ণ দাসকে হেনস্থা ও অপমানের পর কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেন। এতে নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ব্যক্তিগত দূতের অপমানের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন।

রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়া অর্থনৈতিক প্রশ্নও কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের প্রচলিত আইন অনুসারে কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেন সিরাজ। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের যোগ দেওয়া এবং বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা দস্তকের অপব্যবহারের তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল নবাবের আপত্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। বাংলার অন্য স্থান থেকে আসা পণ্য কলকাতায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কোম্পানী অধিক হারে শুল্ক দাবী করতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসা এতটাই বেড়ে যায় যে বাংলার বাণিজ্যের ৩৪.৩% চলে যায় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারে। এইসব পণ্যের উপর ন্যায্য শুল্ক আদায়ের অধিকার থেকে নবাব বঞ্চিত হন।

সিরাজ উপলব্ধি করেন যে কোম্পানী তাঁর রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করছে। অবৈধ দুর্গ নির্মাণ, কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেন, বিনা শুল্কে অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল। কোম্পানীর ক্ষমতাবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়া হলে দক্ষিণ ভারতের আর্কটের মত বাংলাকেও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল। নবাব বহু চিঠি লেখা সত্ত্বেও উদ্ধত কলকাতা কাউন্সিল নবাবের চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। সেজন্য শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় তাঁর ছিল না।

সিরাজকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমালোচনা করেছেন বহু ঐতিহাসিক। কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধের জন্য এস.সি. হিল সিরাজকে দোষী করেছেন। তাঁর মতে সিরাজের ঔদ্ধত্য ও লোভ সংঘর্ষের জন্য দায়ী ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কারকে একটি সাম্মানিক বিষয় হিসেবে তিনি গণ্য করেছেন। কোম্পানীর সম্পদের লোভে সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেন। হিলের মত ড. বি গুপ্ত অস্বীকার করেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কোম্পানীকে আক্রমণাত্মক ও সাম্রাজ্যবাদী করে তোলে। বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য আর্কটের মত বাংলার সিংহাসনে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে বসাতে উদ্যোগী হন কোম্পানী। সিরাজ কোম্পানীর

ক্রীড়নকে পরিণত হতে রাজী না হলে এবং নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করলে কোম্পানী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষ্ণবল্লভ, দুর্গনির্মাণ এবং দস্তকের প্রশ্নে নবাবের ন্যায্য দাবী ইচ্ছে করেই কোম্পানী প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত মত অর্থনৈতিক বিষয় এই বিরোধের মুখ্য কারণ ছিল।

কলকাতা কাউন্সিলকে তাদের নীতির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ১৭৫৬ সালে নবাব কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন। এরপর ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তিনি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করেন। দুর্গের নাম পরিবর্তন করে তিনি আলীনগর দুর্গ নাম রাখেন। গভর্ণর ড্রেক এবং অধিকাংশ বৃটিশ নরনারী দক্ষিণে পালিয়ে গিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবাব ১৪৬ জন বৃটিশকে বন্দী করে একটি ঘরে আটকে রাখেন। ঘরটি ছোট এবং বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় কয়েকজন ইংরেজের মৃত্যু হয়। অন্ধকূপ হত্যা নামে এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হলওয়েলের কল্পনাপ্রসূত। নবাব এই ঘটনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না।

কলকাতায় বিপর্যয়ের এই খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে গভর্ণর সন্ডার্স কলকাতা উদ্ধার করতে এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিকল্পনা সফল করতে লর্ড ক্লাইভ ও নৌবাহিনীর প্রধান ওয়াটসনকে সৈন্যদলসহ কলকাতায় তিনি পাঠান। নবাবের সেনানায়ক মাণিকচাঁদকে ঘুষ দেবার মাধ্যমে ক্লাইভ কোন বিরোধিতা ছাড়াই কলকাতা পুনর্দখল করেন। তিনি নবাবের হুগলী বন্দর ধ্বংস করেন এবং কলকাতায় ইংরেজদের আক্রমণের জন্য দ্বিতীয়বার ক্ষতিপূরণ দিতে নবাবকে বাধ্য করেন। নবাবের অধিকাংশ সেনাধক্ষ্য ও সভাসদরা ইংরেজদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে শহর আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন নবাব। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের সঙ্গে স্বাক্ষরিত আলীনগরের সন্ধির অপমানজনক শর্ত অনুসারে নবাব কোম্পানীর স্বাধীন, সার্বভৌম ক্ষমতা এবং কলকাতায় কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার মেনে নেন।

অলীনগরের সন্ধিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেবার মানসিকতা ক্লাইভের ছিল না। বৃটিশদের বিরুদ্ধে নবাব ও চন্দননগরের ফরাসীদের একত্রিত হওয়াকে ঠেকানোর জন্য ক্লাইভ এই সন্ধি স্বাক্ষর করেন। সিরাজ নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার পর ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ ও দখল করেন। ফরাসী সৈনাধক্ষ্য এম ল এবং অন্য ফরাসীরা পালিয়ে গিয়ে নবাবের রাজসভায় আশ্রয় নেন। নবাবের প্রধান সেনাধক্ষ্য মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করেন যাতে ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন এবং এর বিনিময়ে নবারের উপর ক্লাইভের আক্রমণের সময়ে মীরজাফর নবাবের সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখতে স্বীকৃত হন। ক্লাইভ ও কলকাতা কাউন্সিলের অন্য সদস্যদের প্রচুর উপঢৌকন দেবার আশ্বাস দেন তিনি।

এই ষড়যন্ত্রের পর ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার অভিযোগে নবাবকে আক্রমণ করেন। গঙ্গার তীরে পলাশীতে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব কোম্পানীকে প্রতিহত করার উদ্যত হন। সংঘর্ষের পর তাঁর প্রধান সেনানায়ক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নবাব পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সিরাজকে বন্দী করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে বসেন।

'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে কবি নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর পরাজয়ের পর ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পলাশীর পরাজয়ের পর বাংলার নবাবের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এরপর বাংলার নবাবরা কোম্পানীর ক্রীড়নকে পরিণত হন। বাংলার আইনগত শাসক মীরজাফর হলেও কোম্পানী প্রকৃত শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজত্বের শেষদিকে বৃটিশদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন মীরকাশিম। যদি বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে কোম্পানী ব্যর্থ হত, তবে বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে পারত। দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বৃটিশদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেনি পলাশীর যুদ্ধ। স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন

যে সীমিত প্রভাব সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধ প্রমাণ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য সংঘর্ষে পরাজিত করতে পারে। পলাশীর জয়ের ফলে ইংরেজদের সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

এই জয়ের ফলে বাংলায় কোম্পানী সিংহাসনের পেছনে প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হয়। নৌশক্তির দ্বারা এই উপকূলবর্তী প্রদেশে তারা প্রাধান্য স্থাপন করে। ক্রমশ উত্তর ভারতে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে। বাংলা থেকে সংগ্রহ করা সম্পদের উপর ভিত্তি করে কোম্পানী একটি বড় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে যা তারা ফরাসীদের এবং অন্যান্য দেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহারের পর ভারতের অধীশ্বরে পরিণত হয়। পি. জে. মার্শালের মতে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারত থেকে বৃটেনে সম্পদ নির্গমন শুরু হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্শাল যুক্তি দেখিয়েছেন যে বৃটিশরা শুধুমাত্র বাংলাকে বিশৃঙ্খলতা মুক্ত করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করে।

দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকের ঘটনাবলীর মধ্যেবৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী স্বাভাবিকভাবে ছিল পরস্পরের শত্রু। ভারতে অন্য দলকে বঞ্চিত করে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দখল ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েরই লক্ষ্য ছিল। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মার্কেন্টাইল মতবাদের উন্মেষের পর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দখলের মনোভাব দেখা দেয়। মার্কেন্টাইল নীতি অনুসারে সমৃদ্ধিশালী হতে গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর একটি দেশের একচেটিয়া অধিকার দখল এবং অন্য দেশকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভারতে মুঘল সম্রাট দেশীয় বণিকদের রপ্তানী বাণিজ্যকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে বিদেশী বণিকদের সুবিধা হয়। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ ভারতবর্ষের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তোলে। পন্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর যোশেফ ডুপ্লের মধ্যে প্রথম ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইংরেজরাও ভারতে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতে ১৭৭০ সালে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ শুরু হয়। এসময়ে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। নবাব আনোয়ারউদ্দিনের শাসিত আর্কট রাজ্যে বৃটিশ বন্দর মাদ্রাজ ও ফরাসী বন্দর পন্ডিচেরী অবস্থিত ছিল। বৃদ্ধ নবাবের অনুমতি না নিয়েই পন্ডিচেরীর গভর্ণর ডুপ্লে ফরাসী সৈন্য পাঠিয়ে মাদ্রাজ দখল করেন। ক্রুদ্ধ নবাব মাদ্রাজ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু সেন্ট থোমে অল্প কয়েকজন ফরাসী সৈন্য নবাবের সৈন্যদলকে পরাজিত করে। ১৭৪৮ সালে আই-লা-চ্যাপের সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপে বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতেও তাদের সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সন্ধির মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও অশান্তি চলতেই থাকে। ডুপ্লে আর্কটের সিংহাসন থেকে আনোয়ারউদ্দিনকে পদচ্যুত করে সিংহাসনে। চাঁদ সাহেব বা হুসেন দোস্ত খান, যাঁরা সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাঁদের সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন। আওরঙ্গাবাদের যুদ্ধে আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও হত্যা করার পর চাঁদা সাহেবকে সিংহাসনে বসায় ডুপ্লের সৈন্যবাহিনী। এভাবে দক্ষিণ ভারতে ফরাসীরা একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

ফরাসী একচেটিয়া অধিকার স্থাপন বৃটিশ কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করে। মুহম্মদ আলীকে সাহায্যের জন্য ত্রিচিনোপল্লীতে বৃটিশরা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠায়। ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ অবরোধের সময়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হন ডুপ্লে। কিন্তু কর্ণেল ক্লাইভের বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনায় ইংরেজদের হাতে চাঁদা সাহেব বন্দী হন। এতে দক্ষিণ ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ১৭৫৪ সালে মুহম্মদ আলী আর্কটের নবাব হন। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বৃটিশ-কোম্পানী বিজয়ী হয়।

এই সময়ে ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সূচনা হলে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফরাসীরা বৃটিশ বন্দর মাদ্রাজ আক্রমণ করলে ইংরেজরা এই আক্রমণ প্রতিহত করে। ইংরেজরা ফরাসী শহর পন্ডিচেরী দখল করে। বাংলায়

ক্লাইভ ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করেন। অবশেষে নন্দীবাসের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি আয়ারকূট ফরাসীদের হারিয়ে দেন। এসময়ে প্যারিসের সন্ধির মাধ্যমে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শেষ হলে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ফরাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়। কর্ণাটের ঘটনাবলীর মাধ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যে বৃটিশ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়।

বাংলা ও কর্ণাটের ঘটনাবলী ভারতের রাজনীতিতে বৃটিশদের চালিকাশক্তিতে পরিণত করে। এইসময়ের ভারতীয়দের মানসিকতার বিশ্লেষণ করলে এটি একটি জটিল কাহিনী। ডঃ রজত রায় কোম্পানীর সঙ্গে অভিজাতদের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। সম্পর্কের এই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সাহায্যেই কোম্পানী ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা করে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতেও আমূল রূপান্তর এনে দেয়। এই পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন জটিলতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৫.১ অনুশীলনী

১. তুমি কি মনে কর অষ্টাদশ শতকে ভারতে ইংরেজদের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থপ্রণোদিত ছিল? তোমার যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাও।

২. অষ্টাদশ শতকে মার্কেন্টাইল নীতির দ্বারা প্রভাবিত ইউরোপীয় অর্থনীতি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলে?

৩. অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ইউরোপীয় বণিকদের সুযোগ করে দেবার মত কি তা দুর্বল ছিল?

৪. অষ্টাদশ শতকে কীভাবে ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাধান্য স্থাপন করে তার বর্ণনা কর। এটি কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?

৫. ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপকে শুধুমাত্র মার্কেন্টাইল নীতির প্রয়োগ আখ্যা দেওয়া যায় কি? কিভাবে বণিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

৬. বাংলার নবাব ও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও। তুমি কি মনে কর যে অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্যই কোম্পানী যুদ্ধে জয়লাভ ধরার ও বাংলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়?

৭. তোমার কি ধারণা যে বাংলার রাজনীতির আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বৃটিশ কোম্পানীকে বাংলায় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়? স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাও।

৮. কীভাবে ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি কর্ণাটে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষকে প্রভাবিত করে? তোমার কি মনে হয় যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সংঘর্ষ দেখা দেয়?

১৫.২ গ্রন্থপঞ্জী

১. পলাশীর ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—রজত রায়
2. Thomson and Garrat–Rise and Fulfilment of British Empire in India.
3. H.V. Bayley– Indian Society and the Making of British Empire.

4. II.V. Borsen– Revenue and Reform : The Indian Problems in British Politics. (1757-1813)
5. K.N. Chaudhury–The Trading World of Asia and the British East India Company (1600-1760)
6. Philip Lawson – The East India Company.
7. P.J. Marshall– Bengal : The British Eastern India (1740-1823)
8. P.J. Marshall (ed) : The New Cambridge History of India Vol.-II.

Paper-II

একক ১ ❑ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

১.২ অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

১.৩ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

১.৪ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন

১.৫ শিখদের উত্থান ঃ রঞ্জিত সিংহ

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.৭ অনুশীলনী

১.০ প্রস্তাবনা

বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতায় এই মর্মে খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে এই যুদ্ধের পরিণতিতে 'ভারতের বুকে দুর্দিনের অমাবস্যার সূত্রপাত হয়েছিল।' তিনি এই যুদ্ধকে স্বাধীন ভারতের শেষ এবং বিদেশী আধিপত্যের সূচনা রূপে দেখেছিলেন। শুধু কবি নবীনচন্দ্র সেনই নন, পরবর্তীকালে অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় পরাজয়কে ঘিরে আবেগ অনুভূতি রোমান্টিকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। আর এই রোমান্টিকতাবাদের মাধ্যমেই বাংলায় উপজাতীয়তাবাদের এক প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব ঘটেছিল। পলাশীর যুদ্ধকে সামরিক প্রেক্ষিতে আমরা কোনো বড় মাপের যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করতে পারি না। তবে তাই বলে এই যুদ্ধের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালেও আমরা সেই প্রবণতাও পরিলক্ষিত হতে দেখি। একথা বলা হয়ে থাকে যে পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা ভারতে কিন্তু ব্রিটিশ বিজয়ের পালা সাঙ্গ হয় নি। যদি ব্রিটিশরা সমসাময়িক অন্য কোনো যুদ্ধে পরাজিত হত তাহলে বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের সেভাবে কোনো গুরুত্ব থাকত না। এমনকী একথাও বলা হয়ে থাকে যে বক্সারের তুলনায় পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব কম ছিল। বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশরা তাদের উন্নততর সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। গোড়ার দিকে ঐতিহাসিকরা অষ্টাদশ শতককে ভারতীয় ইতিহাসের এক অবনমনকাল রূপে চিহ্নিত করেছেন। Bolts (Considerations of Indian Affairs, 1772) কিম্বা Holwell (Historical Events 1766) এর ন্যায় তৎকালীন ইংরেজ লেখকরা এই যুগকে এক সার্বিক বিশৃঙ্খলার যুগ বলে অভিহিত করেছেন, যা থেকে ভারতীয়রা নিষ্কৃতি পায় ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে। এই ব্যাপারে উত্তরোত্তর ইতিহাস চর্চা যেভাবে এগোয় তার ফলে উপরোক্ত মতকে খুবই সরলীকরণের দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা এখানেও আলোকপাত করেছেন যে বাস্তবতার নিরীখে সেই যুগকে আমরা খুব সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি না, এবং সেই যুগের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরণের ধারা ছিল পূর্ববর্তীকাল অপেক্ষা জটিল। নব্যগবেষণার আলোকে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে ওঠে যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও কিছু বিচ্ছিন্ন প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের বীজ বপন করা হয়েছিল। অনেকে একথাও ভাবেন যে এই যুগ ছিল ভারতীয় ইতিহাসের মরূদ্যান স্বরূপ। এই ধরনের প্রেক্ষিতকে আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমর্থন করতে পারি, যেখানে পলাশী বা বক্সারের যুদ্ধ কোনো সীমারেখা নির্দেশ করতে সক্ষম হয় না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা মনে

করেন যে অষ্টাদশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধারাবাহিকতা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও প্রাদেশিক রাজ্য বা রিয়াসতের উত্থান এবং তাদের ক্রমান্বয়িক সামরিক কার্যকলাপ সেভাবে অর্থনীতি ও সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি, যার কথা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা বলে থাকতেন। মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেই সময় অষ্টাদশ শতকে একাধিক স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। যেমন— বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশুর। মারাঠা, শিখ ও জাঠরা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর স্বশাসিত রাজ্য গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একথা ভাবলে ভুল হবে যে 'রিয়াসৎ' শব্দটিকে রাজ্য বা State হিসাবে দেখা ঠিক নয়, যেখান ভারতে নবাবী 'রিয়াসৎ'গুলি তত্ত্ব বা কার্যগত দিক থেকে কোনোদিনই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। রিয়াসতের প্রধানরা নিজেদের নবাব রূপে অভিহিত করতেন (Satish Chandra—'The 18th Century in India, 1986)। এই রিয়াসৎগুলি গড়ে তুলেছিল মুঘল সুবাদার বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতরা যারা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই তাদের ক্ষমতা বিস্তার করেছিল, সাধারণত এই প্রতিটি রাজ্যের অভিষেক সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকত, যেক্ষেত্রে সম্রাটকে কিছু নজরানা দেওয়া হত ও এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক প্রভাবও সক্রিয় ছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের কিলাদার বা দুর্গাধিপতি, কাজী প্রভৃতির নিযুক্তির জন্য সম্রাটের অনুমোদন লাগত। আধুনিক কালের ইতিহাস চর্চা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উত্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের আধুনিক পন্ডিতরা এই অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন যে আলোচ্য যুগ ছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ যা থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিল ব্রিটিশরা। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এক বিশাল প্রতিক্রিয়ার ঝড় তুলেছিল যা সংশ্লিষ্ট কালকে আকার ও চরিত্র দান করেছিল।

১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

মুঘল সাম্রাজ্যের খ্যাতি সমগ্র বিশ্বপ্যাপী। ১৭০৭ খ্রীঃ যখন ঔরঙ্গজেব মারা যান তখন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রস্বরূপ এই সাম্রাজ্য ছিল বিরাজমান। এর শাসকরা বিশ্বস্ত ও সামরিক বাহিনী ছিল অপরাজেয় ও তার বিস্তৃতি ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর এক শতকের মধ্যে উত্তরাধিকারী মুঘলরা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং বিদেশী শক্তি সেই সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে বিদ্যমান শাসকদের ক্রীড়নকে পরিণত করে।

১৭৪০ খ্রীঃ এরপর মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লীর সুবাদে সীমিত হয়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আগ্রার কিছু অংশ থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতে এমন এক সাম্রাজ্যের অধিকর্তায় পরিণত হয় যার ব্যাপ্তি ছিল মুঘলদের মতন। তবে সকল ঐতিহাসিকরা এই পরিবর্তন ও সাংঘাতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে একমত নন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ কী তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঠিক কী কী কারণ দায়ী ছিল সে সম্পর্কে অবিশ্যক রূপে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন আছে।

১.২ অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঃ

মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন একাধিক স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে— বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর। মারাঠা, শিখ ও জাঠরাও এই সময় নিজেদের স্বাধীন রাজ্য

স্থাপনের প্রয়াস নেয়। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান ছিল তার প্রকৃতিও আমাদের অজানা নয়। সেদিক থেকে বলা যায় এভাবে উদ্ভুত রাজ্যগুলির কিছু ছিল অভিজাতদের দলাদলি ও স্বার্থপরতার ফসল ও অন্যান্যরা ছিল মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিণামস্বরূপ।

আমরা আগেই দেখেছি যে মুঘল সুবাদার বা উচ্চাভিলাষী অভিজাতদের একাধিক রিয়াসৎ বা রাজ্য গড়ে তুলেছিল যেখানে তারা প্রায় স্বাধীন শাসকের মতই ক্ষমতা ভোগ করত। এই সকল রাজ্যের অভিষেক সম্রাটের সম্মতি প্রসূত ছিল, যেক্ষেত্রে তাকে নজরানা দিতে হত বা নেপথ্যে কোনো রাজনৈতিক খেলাও কাজ করত। কিলাদার, কাজী প্রভৃতি পদাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও সম্রাটের ভূমিকা ছিল। সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উত্থান তাৎপর্যপূর্ণ। আর এরূপ প্রেক্ষিতেই ঐতিহাসিকরা এহেন অভিযোগ খন্ডন করতে বদ্ধপরিকর যে, এই যুগ বিশৃঙ্খলার যুগ ছিল যেখানে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ব্রিটিশরা।

এই সকল উদীয়মান রাজ্যগুলির অবস্থান থেকে মনে হয় যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না ও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা কষ্টকর। এই রাজ্যগুলি যুগপ্রসূত অর্থ ও বাণিজ্যিক সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা কিছুটা সাফল্য সহকারে শক্তিশালী প্রশাসন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা আর্থিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। বস্তুত বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদের ন্যায় উন্নত রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার পরিসরে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ প্রতিফলিত হয়েছিল যা স্থানীয় ভূস্বামী, সাধারণ কর্মচারী ও বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রধানদের আনুগত্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এই সকল রাজ্যগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্ররূপেও পরিগণিত হয়েছিল, যেখানে তারা শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকত। এই রাজ্যের শাসকরা সাধারণত যে নীতি গ্রহণ করতেন তা চরিত্রের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল এবং ধর্ম সেখানে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছিল। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে রাজারা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করতেন না এবং সবই ছিল আধুনিকতার চিহ্ন— যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অষ্টাদশ শতক সম্পূর্ণ অবক্ষয় ও অবনমনের কাল ছিল না, যেখানে সংস্কার ও পুনর্জাগরণের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে কী ধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— এখানে উচ্চমানের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হত, যেক্ষেত্রে কারিগরদের একটা বড় ভূমিকা ছিল, তখন মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ হয় এবং গ্রামের পণ্য উৎপাদকদের সঙ্গে শহরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এবং বহুলাংশে উপমহাদেশের আঞ্চলিক বাজারের একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রাক্-ঔপনিবেশিক রাজ্য বিভিন্ন আধুনিক প্রকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবসার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণা আলোচ্য বিষয়ের উপর নতুন আলোকপাত করে থাকে। C.A Bayly, David Washbrook, Frank Pertin এর ন্যায় দক্ষ ঐতিহাসিকরা যারা অষ্টাদশ শতকের ভারত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তারা এই মর্মে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের চ্যালেঞ্জ জানান যে একদা এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা লিখেছিলেন যে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে একটি জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল ও ব্রিটিশ শাসন এই প্রাক্-ঔপনিবেশিক জাতীয় অর্থনীতিকে একটি আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পথে অগ্রসর হতে দেয়নি।

যাইহোক একথা বোঝা যায় যে যদি বাংলা, মহীশূর, অযোধ্যার ন্যায় রাজ্যগুলি টিকে থাকতে সমর্থ হয় তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্য সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যমান থাকতে পারত, সেদিক থেকে অষ্টাদশ শতক ছিল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক সংঘবদ্ধ ধারাবাহিকতার নামান্তর যে ধারাবাহিকতার ধারা সপ্তদশ শতকেই দৃষ্ট হয়েছিল, আর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জন্য প্রস্তুতি অনেক পরের ঘটনা ছিল।

১.৩ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবয়ব

অষ্টাদশ শতকে কিছু দেশীয় নবাবী রিয়াসৎগুলিতে যে ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের কিন্তু গোড়ার দিকের ঐতিহাসিকদের মত আমরা অন্তঃসারশূন্য হিসাবে দেখব না। সাম্প্রতিক গবেষণার পরিণতিতে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই যুগ অবক্ষয় ও বিনাশের কারণ ছিল না। তারা মনে করেন যে যদি হায়দার ও টিপুর অধীনে মহীশূর তার প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়, তবে সেই পদ্ধতি অন্যত্র অনুসরণ করা যেত। যদিও শেষ পর্যন্ত মহীশূর ব্রিটিশের করতলগত হয়, তবু ও তার একক বিদ্যমানতাও আমরা অপসৃত হতে পারি না। হায়দার ও টিপুর অধীনে মহীশূরে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বৈরতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। বলা যায় সামন্তপ্রভু থেকে শুরু করে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত যে ধরণের আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো উপস্থিত ছিল তার সহযোগিতাতে কেন্দ্রে ক্ষমতার বিন্যাস অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে হয়েছিল। স্বৈরাচারী হওয়া সত্ত্বেও হায়দার ও টিপু জনকল্যাণকামী ছিলেন, আর সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে আমরা অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের তুলনা করতে পারি।

মহীশূর রাজ্য বেশ কিছু জনকল্যাণকামী কার্যকলাপে রত হয়েছিল, যথা— খাল খনন, জলসম্পদের সুব্যহার, রাস্তা নির্মাণ, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন। বিশেষতঃ টিপু সুলতান মদ্যপান ও মহিলাদের উপর নির্যাতন রোধের প্রসঙ্গে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে সমাজ সংস্কারের পথ মসৃণ করেছিলেন। টিপুর মনীষা ছিল সুবিস্তৃত এবং তিনি শাসন কাঠামোর উপর নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তবে ইংরেজদের শত্রুতার দরুণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্নির্মাণের প্রয়াস টিপুর সফল হয়নি এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যগুলিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

সামরিক বাহিনীকে নতুন করে সাজানোর ব্যাপারে হায়দার ও টিপুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বস্তুত মহীশূরের শাসকরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন ও তা পূরণের জন্য অপরিহার্য রূপে একটি উৎকৃষ্টতর সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও জানতেন। হায়দার আলী তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে সেরা অশ্বারোহী বাহিনীতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন এবং হায়দার ও টিপু উভয়েই ইউরোপীয়দের ন্যায় তাদের গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীকে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তারা ফরাসীদের সাহায্য নিতেও কসুর করেননি।

হায়দার ও টিপুর আমলেও যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা স্বাভাবিকভাবেই অলোচনার দাবী রাখে। শাসকরা শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নয়ন চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে যাবতীয় পরিকল্পনা ছিল হায়দার আলীর মস্তিষ্ক প্রসূত, যে ঐতিহ্য বহন করেছিলেন তাঁর পুত্র। জলসেচ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা তারা উৎপাদকদের দান করেছিলেন। এর পাশাপাশি সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানও দিয়েছিল। দুর্দিনে কৃষকদের ঋণ দেওয়া হত টিপুর পৃষ্ঠপোষণায় বিভিন্ন স্থানে নানা দ্রব্য উৎপাদনকারী 'Unit' বা একক গড়ে উঠেছিল। বিদেশের প্রযুক্তি স্বরাজ্যে প্রয়োগ প্রসঙ্গে টিপুর কোনো দ্বিধা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মহীশূরের শিল্প অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর জন্য ফ্রান্স ও তুরস্কের সহযোগিতা টিপুর একান্ত কাম্য ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ, স্থানীয় ও উপমহাদেশের বাজারের মধ্যে সংহতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ছিল মহীশূর অর্থনীতির সদ্যোত্থিত বৈশিষ্ট। সাম্প্রতিক অর্থনীতিক ঐতিহাসিকরা এরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন যে টিপুর মহীশূর বৃহত্তর শিল্পায়নের পথে এগিয়ে ছিল। টিপু নানা পরিস্থিতির সুযোগে মহীশূরের অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তবে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং বর্ধিত সামাজিক ব্যয়— এই দুয়ের মধ্যে সংহতি স্থাপনের সমস্যা অন্যান্য রাজ্যগুলির মত মহীশূরকেও ভুগিয়েছিল।

১.৪ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন

ছত্রপতি কিম্বা রাজা ছিলেন এমন এক আধার যাকে কেন্দ্র করে শিবাজীর সময় যাবতীয় ক্ষমতার প্রয়োগ হত। কিন্তু একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন যে মারাঠাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি গুণগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের অধীনে ছাত্রপতি বা রাজার হাতে কোনো ক্ষমতাই ছিল না। বলা যায় যে এই সময় যে সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল সেই প্রক্রিয়ার হাত ধরে মারাঠাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত আমরা দেখি বালাজী বিশ্বনাথের সময়, যিনি মারাঠা সর্দারদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল 'ওয়াতন' কিম্বা (জাগীর) হিসাবে দান করেছিলেন। এই রাজনৈতিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পেশোয়া মারাঠা সর্দারদের আনুগত্য আদায় করতে চেয়েছিলেন। তবে ভবিষ্যতে এই প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ রূপে চিহ্নিত হয়। এই ব্যবস্থায় পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যে প্রকৃত শাসকে পরিণত হন এবং ছত্রপতি কিম্বা শিবাজীর উত্তরপুরুষেরা প্রতীকী প্রধানরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক সামন্ততন্ত্রীকরণের এই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশ নিশ্চিত করে। যে সকল মরাঠা প্রধানদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক প্রধানরূপে জাঁকিয়ে বসে। তারা সর্বক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যেই গড়ে ওঠে আর একটি রাষ্ট্র যার স্থপতি হলেন এই মারাঠা সর্দাররা। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনো একক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না। বরং তা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মারাঠাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বন্ধন খুব শিথিল হয়ে পড়ে। এবং তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ফলে মারাঠা সাম্রজ্য এমন এক মিত্রসঙেঘ পরিণত হয় যেখানে স্বাধীন মারাঠা প্রধানদের কৃতিত্বই ছিল সবচেয়ে বেশী।

পেশোয়া পুণাতে থাকতেন এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব তৎসংলগ্ন অঞ্চলেই সীমিত ছিল। যদিও পেশোয়া পদ ছিল বংশানুক্রমিক, তাহলেও তিনি তাঁর অনুগত সামন্তপ্রভুদের উপর উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন। যে সকল মারাঠা প্রধান ওয়াতনের অধিকারী ছিলেন তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পরিবর্তে অস্ত্র ধরেন এবং এভাবে তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নেন। পেশোয়ার কোনো নিজস্ব সামরিক বাহিনী ছিল না এবং তিনি যুদ্ধের সময় সর্দারদের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন যাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকত। সর্দারদের পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ সামরিক শক্তি হিসাবে মারাঠাদের গৌরব অনেকটাই স্তিমিত করে দেয়, আর পেশোয়ার প্রতি তাদের আনুগত্য নামমাত্রে পরিণত হয়। এমনকী তারা পুণাস্থিত নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলিত হয় এবং মারাঠাদের যারা শত্রু ছিল তাদের সঙ্গে ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে। পেশোয়া সর্দারদের উপর কোনো কারণে চাপ সৃষ্টি করলেই তারা মারাঠা সংগঠন ত্যাগ করে অন্য শক্তির দলে যোগ দিয়ে থাকত। যদি পেশোয়া অপরাপর মারাঠা শক্তি, যেমন— নাগপুরের ভোঁসলে, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকারের মত যদি সুদৃঢ়ভাবে নিজের আধিপত্য কায়েম করতে পারতেন তবে হয়ত ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিরোধ অনেক জোরদার হত। যেহেতু মারাঠাদের বিভিন্ন শাখা আলাদা আলাদা ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল তারা সেভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর এরূপ পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে ভারতের বুকে স্থাপন করে।

১.৫ শিখদের উত্থান— রঞ্জিত সিংহ

শিখ ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন গুরু নানক এবং এই ধর্মের বিকাশ হয় পঞ্চদশ শতকে। জাঠ এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য নিম্নবর্গের ব্যক্তিরা এই ধর্ম গ্রহণ করে ও শিখরূপে পরিচিত হয়। শিখদের দেশপ্রেম ছিল সর্বজনবিদিত এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে যে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা ছিল প্রশংসনীয়। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর উষালগ্নে পাঞ্জাবের বুকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল শিখেরা তার সুযোগ নেয় এবং তাদের সামরিক শক্তির সুদৃঢ়ীকরণ ঘটায়। ১৭৬৫-১৮০০ খ্রীঃ এর মধ্যবর্তী সময় পাঞ্জাবের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেখানকার শাসকগোষ্ঠীরূপে স্বীকৃত হয়। তারা ১২টি মিশলে বা গণতান্ত্রিক সংগঠনে পাঞ্জাবকে ভাগ করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিগ্রহণের কালে শিখদের মধ্যে যে 'খালসা' বা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ছিল তার বিনাশ ঘটে এবং তার স্থানে পারস্পরিক শত্রুতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সুকারচাকিয়া মিশনের রঞ্জিত সিংহ তাঁর নেতৃত্বগুণে, কায়িকশক্তি বলে এবং চারিত্রিক কাঠিন্যে শিখ মিশলগুলিকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। রঞ্জিত সিংহের জন্ম হয় 1780 খ্রীঃ মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি সুকারচাকিয়া মিশলের অধিপতি হন। 1799 খ্রীঃ লাহোর ও 1802 খ্রীঃ অমৃতসর জয়ের মাধ্যমে তিনি আলোচনার পাদপ্রদীপে আসেন। এর কিছুকাল পরে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখন্ডের শিখ সর্দারদের রঞ্জিত সিং বাধ্য করেন তাঁকে পাঞ্জাবের অধিপতি বলে মেনে নিতে। তিনি পরিচিত হন পাঞ্জাব কেশরী রূপে। কাশ্মীর, পেশোয়া ও মুলতান জয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। সামরিক নেতা হিসাবে রঞ্জিত সিংহের পারদর্শিতা ছিল তুলনাতীত। তিনি জানতেন যে ক্ষমতালাভের একমাত্র চাবিকাঠি হল সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি আধুনিক ভাবে একটি সশস্ত্র ও শৃঙ্খলাপরয়াণ সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁর সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ইউরোপীয় সেনাদের মোতায়েন করেছিলেন। কামান নির্মাণের জন্য তিনি আধুনিক উৎপাদনশালা ও গড়ে তোলেন। রঞ্জিত সিংহ তাঁর সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনে হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই স্থান দিয়েছিলেন।

শতদ্রুর পশ্চিম তীরে সাফল্যমন্ডিত ভাবে শিখদের ঐক্যবদ্ধকরণের পর রঞ্জিত সিং শতদ্রুর সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দেন। এবং দুটি অভিযানের মাধ্যমে লুধিয়ানা জয় ও অদম্য প্রয়াসের পর পূর্বদিকে তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তবে শতদ্রুর পূর্বতীরের রাজ্যগুলি তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এবং তারা সাহায্যের জন্য ইংরেজ East India Co. র নিকট আবেদন জানান। ইংরেজরা রঞ্জিতের সম্প্রসারণবাদী নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল এবং এর ফলে তারা পাঞ্জাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। তারা খুব শীঘ্রই পূর্বতীরের রাজ্যগুলির আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং এভাবে পাঞ্জাবে তাদের অনধিকার প্রবেশের রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল। যেহেতু এই সময় আফগানিস্তানের মাধ্যমে ভারতে নেপোলিয়নের আক্রমণ সম্ভাবনা ছিল তাই অবস্থানগত দিক থেকে তখন পাঞ্জাব ব্রিটিশদের নিকট যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রঞ্জিত সিং-এর সঙ্গে সমঝোতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো চার্লস মেটকাফকে দৌত্য সাধনের জন্য লাহোরে প্রেরণ করেছিলেন। মেটকাফ ও রঞ্জিত সিংহের কূটনৈতিক দৌত্য পরিণতি পায় অমৃতসর সন্ধির (১৮০৯) মাধ্যমে। এই সন্ধির ফলে রঞ্জিত সিংহ শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যগুলির প্রতি তাঁর দাবী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন, যেগুলিকে এখন ব্রিটিশরা নিরাপত্তা দিতে থাকে। এর বিনিময়ে ব্রিটিশরা অবশ্য শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ ভুখণ্ডের উপর রঞ্জিত সিংয়ের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। রঞ্জিতও ব্রিটিশের সঙ্গে কোনো সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চাননি, তাই তাদের শর্তগুলি তিনি মেনে নন। অমৃতসর সন্ধি সাক্ষরের জন্য এই মর্মে তাঁর সমালোচনা করা হয় যে এই সন্ধির কালে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা অস্তমিত হয়নি এবং তা তাঁর উত্তরাধিকারীগণের নিকট এক চিরস্থায়ী

সমস্যা রূপে গণ্য হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় তিনি ব্রিটিশদের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ছিল এবং তিনি তাঁর এরূপ দূরদর্শিতার জন্য অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও তাঁর রাজ্যকে ইংরাজ আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং রঞ্জিত সিংয়ের সমালোচনার পাশাপাশি কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

A. Embree—Charles Grant and the British Rule in India.

A. M. Khan—The Transition in Bengal.

Sirajul Islam—Banglar Oupanibeshik Sasankathamo.

১.৭ অনুশীলনী

১। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরকম ছিল? বিশেষ করে উল্লেখ করো হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও পাঞ্জাবের কথা।

২। অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। মহীশূরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

৪। শিখদের উত্থানে রঞ্জিত সিংহের ভূমিকা আলোচনা কর।

একক ২ ❑ বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির সুদৃঢ়ীকরণ

গঠন

২.০ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার নবাবগণ
২.১ সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী
২.২ পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য
২.৩ বক্সারের যুদ্ধ
২.৪ ব্রিটিশদের দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)
২.৫ গ্রন্থপঞ্জি
২.৬ অনুশীলনী

২.০ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার নবাবগণ

আমরা অগেই দেখেছি যে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন রাজ্য বা রিয়াসৎ গড়ে ওঠে। এই সময় কেন্দ্রে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল চোখে পড়ার মত, যার পরিণতিতে মুঘলদের বাংলা সুবা বা প্রদেশেও একটি নববী রিয়াসতে পরিণত হয়। ফারুখসিয়ার ১৭১৭ খ্রীঃ মুর্শিদকুলী খাঁ-কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, আর এভাবেই বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন, আর এভাবেই বাংলায় আধা-স্বাধীন নবাবী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মুর্শিদকুলী সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাবীর শাসনকর্তারা বংশানুক্রমে নবাবরূপে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা প্রদেশের দেওয়ান হিসাবে ১৭০০ খ্রীঃ থেকে মুর্শিদকুলী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনি এখনকার সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।

একটি কাকতালীয় ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে ১৭১৭ খ্রীঃ ইংরেজ East India Co.-র বণিকেরা যারা কলকাতায় তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল তারা সম্রাট ফারুখসিয়রের কাছ থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফর্মান লাভ করে যার ভিত্তিতে তারা বার্ষিক ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাংলায় ব্যবসা করার অধিকার পায়। আর এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ উপ্ত হয়। ফর্মান লাভের ফলে ইংরেজরা যেন হাতে স্বর্গ পায়, কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগে না। বস্তুত বাংলার নবাবরা দিল্লির দুর্বল সম্রাটদের অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিধর ছিলেন এবং তারা কখনোই মুঘল ফর্মান অনুযায়ী ইংরেজদের সবধরণের সুযোগসুবিধা দিতে চায় নি এবং তাদের প্রতিপত্তি বাণিজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত করে রাখতে চেয়েছিল।

বিদেশী সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে মুর্শিদকুলি খাঁ যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ ধরণের বাণিজ্য বাংলার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বহন করে আনবে। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হল তখন, যখন ১৭১৭ খ্রীঃ ফর্মান দ্বারা ইংরেজদের বিশেষ সুযোগসুবিধা দেবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে মুর্শিদকুলী এবং পরবর্তী বাংলার নবাবদের ব্রিটিশ বিরোধিতার একটি অন্যতম কারণ হল ফর্মানের অপপ্রয়োগ করে ব্রিটিশ বণিকেরা যে ধরনের ফায়দা লুটেছিল তা কাঙ্খিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ফর্মানের অপপ্রয়োগ করে দস্তকের নামে কোম্পানীর কর্মচারীরা যে শুল্কমুক্ত ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাচ্ছিল তা নবাবদের শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। মুর্শিদকুলী খাঁ স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে দস্তকের নামে এরূপ শুল্কমুক্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার দরুণ বাংলার কোষাগার তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় তিনি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত ইংরেজদের কিছু শুল্ক প্রদানে বাধ্য করেন।

১৭৪০ খ্রীঃ আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হন এবং তিনিও ইংরেজ East India Co.-র বিরুদ্ধে একই নীতি নেন, যদিও এক্ষেত্রে মুর্শিদকুলীর মত তিনি এতটা কঠোর ছিলেন না। মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দী উভয়েই অনেক সময়ই বেদিশী ব্যবসায়ীদের পণ্য চলাচলের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন ও তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। তবে সামগ্রিকভাবে নবাবরা ইংরেজদের সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে যেতে চাননি। এবং কোম্পানী বাংলা থেকে শুল্কমুক্ত যে রপ্তানী বাণিজ্য চালাত তা তারা মেনে নেন, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী নন, শুধুমাত্র East India Co.র মালই বাইরে যেত। একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী Scrafton ইংরেজদের প্রতি আচরণ প্রসঙ্গে এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন যে আলিবর্দী ইউরোপীয়দের মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যার মধু মানুষের উপকারে লাগলেও তাদের বিরক্ত করলে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়।

কোম্পানীর অর্থনৈতিক সুবিধাকে বাংলার নবাবরা ব্যাহত করতে চাননি—এই আশায় যে তাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বাংলায় সম্পদের বাড়বাড়ন্তের সূচনা করবে। তবে আলিবর্দী খাঁ কখনোই চাননি যে কোম্পানী এখানে তাদের সামরিক শক্তিকে মজবুত করে গড়ে তুলুক। দাক্ষিণাত্যে যখন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন আলিবর্দী বাংলায় এই দুই যুযুধান পক্ষকে সংযত করার সংকল্প নেন। এমনকী তাদের সামরিক শক্তির সুদৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে তিনি নারাজ ছিলেন।

২.১ সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ তাঁর পিতামহ আলিবর্দী খানের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাংলার মসনদে বসেন। তিনি ছিলেন আলিবর্দীর কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র। সিরাজ ছিলেন তরুন, অনভিজ্ঞ, বদমেজাজী ও স্বাধীন। এমনকী তাঁর পরিবারের অনেকেই নবাব হিসাবে তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। সিরাজের মাসী ঘসেটি বেগম, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খুব সত্বরই এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পান এবং ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী করে রাখেন মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে। এই ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে ইংরেজদের হাত ছিল বলে তিনি মনে করতেন।

ইংরেজ East India Co.-র সম্পর্কে সিরাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক ছিল না। তিনি এটা পরিষ্কার করে দেন যে বাংলায় ইংরেজদের আবশ্যিক রূপে মুর্শিদকুলী খাঁ-র শর্তানুযায়ী বাণিজ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আলিবর্দী খাঁ-র মত তার মনোভাব যে খুব একটা নরম ছিল না তা বলাবাহুল্য। দস্তকের অপব্যবহার এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনাশুল্কে যে বেআইনী ব্যবসা চালাত সিরাজ তার বিরোধী ছিল। সিরাজ প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে তাদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের পরাজিত করে ইংরেজদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে উঠেছিল এবং তারাও তরুণ নবাবের এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না।

এই ব্যাপারে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজরা এই সময় বাংলার মসনদে এমন এক পুতুল নবাবকে বসাতে চেয়েছিলেন যে তাদের স্বার্থে আঘাত করবে না। এই বিষয়ে দঃ ভারতে তারা সাফল্য লাভ করে এবং বাংলাতেও সেই একই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহী হয়। সুতরাং সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পথ প্রস্তুত হয়।

দস্তকের অপব্যবহার ছাড়াও কিছু অন্যান্য কারণ ছিল যেগুলি সিরাজ ও ইংরেজের মধ্যে তিক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল। প্রথমতঃ, সিরাজ যখন সিংহাসনে বসেন তখন এই নতুন নবাবকে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ ইংরেজরা কোনো প্রথানুগ নজরানা পেশ করেনি, যেখানে অন্যান্য বিদেশী বণিকরা নবাবের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করতে কসুর করে নি। ইংরেজদের এই ধরণের উন্নাসিক আচরণ নবাবের পছন্দ হয় নি। এবং তার মনে এরূপ সন্দেহ দেখা যায়

যে ইংরেজরা তাঁর শত্রুদের সমর্থনকারী। **দ্বিতীয়তঃ**, সিরাজের অনুমতি ব্যতীত-ই ইংরেজ East India Co.-র ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে, যার পশ্চাতে ছিল চন্দননগরস্থিত ফরাসী আক্রমণের ভীতি। সিরাজ একে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখেন। এবং ইংরাজ ও ফরাসী উভয়কেই তাদের দুর্গ নির্মাণের প্রয়াস রদ করতে আদেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের নির্দেশ মেনে নিলেও ইংরেজরা তা মানতে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই সমস্যার উৎস ছিল অতীতে নিহিত। বিপানচন্দ্র যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে সামরিক শক্তি হিসাবে ইংরেজদের বৃদ্ধি রোধ প্রসঙ্গে আলিবর্দী কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি এবং ইংরেজরা তাদের দাবী চরিতার্থ করণের জন্য এরূপ শক্তির সাহায্য নিয়ে থাকত। মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দী উভয়েই কোম্পানীর সামরিক ক্ষমতা প্রতিহত করতে পারত, যদিও তাদের শক্তি তখন তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এরা ইংরেজদের যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় ও তাদের সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। এক্ষেত্রে সিরাজ ছিলেন সেই প্রথম নবাব যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তবে তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। **তৃতীয়তঃ**, সিরাজের রোষাগ্নি আরো জ্বলে ওঠে যখন তিনি জানতে পারেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম সমর্থক ঘসেটি বেগমের একান্ত অনুগত কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দিয়েছে। সিরাজ বারংবার কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণের দাবী জানালেন। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক তাতে আমল দেননি। ফলে নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়। কেননা মুঘল অনুশাসনের অধীনে তখনো পর্যন্ত কোম্পানীর মর্যাদা নিছক একজন জমিদারদের সমতুল্য ছিল। এর ফলে সিরাজের এরূপ ধারণা ঘনীভূত হয় যে সিরাজকে সরানোর জন্য ঘসেটি ও অন্যান্যরা ষড়যন্ত্র করেছিল তাতে কোম্পানীর হাত ছিল। সর্বোপরি এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নবাবের আদর্শ অমান্য করে ইংরেজরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বাণিজ্য চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা শুধু বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দিতে অস্বীকৃত ছিল তা নয়, তার পাশাপাশি তাদের যে সকল পণ্য কলকাতায় প্রবেশ করত সেক্ষেত্রেও ধার্য কর দিতে বিরূপ ছিল। সিরাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজরা তার রাজ্যের মধ্যেই আর একটি রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে যেখানে নবাবের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। এমতাবস্থায় ইংরেজদের উচিৎ শিক্ষা দিতে সিরাজ সংকল্পবদ্ধ হলেন।

সিরাজ ইংরেজদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতেন না এবং যথেষ্ট বিবেচনা ব্যতীতই নানা ইংরাজ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠী দখল করেন এবং তারপর কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। ১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ অনায়াসেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করেন এবং কলিকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন। নবাব ইংরেজদের নৌকা করে কলিকাতা থেকে পালাতে দেননি, যাকে তাঁর তরফে একটি বৃহত্তর ভুল হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কেননা পলায়নরত ১৪৬ জন ইউরোপীয়কে গ্রেপ্তার করে তিনি একটি স্বল্পায়তন কক্ষে বন্দী করে রাখেন যে কক্ষটিতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস চলাচলের সুযোগ ছিল না এবং এত সংখ্যক মানুষকে ধারণ করার মত পরিকাঠামো ছিল না, ফলে দমবন্ধ হয়ে সেখানে কিছু লোক মারা যায়। সমসাময়িক ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা এই মর্মান্তিক ঘটনাকে 'ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি' রূপে উল্লেখ করেন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকরা ভারতীয় শাসকদের ভালো চোখে দেখতেন না। এবং তারা তাদের নিষ্ঠুরতার প্রতীক রূপে গণ্য করতেন। তাই মনে করা হয় যে হলওয়েল প্রকৃত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন যাতে সিরাজকে খলনায়ক রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ছিল। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকরা চুলচেরা অনুসন্ধান ব্যতীত 'ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি'কে গ্রহণ করতে সম্মত নন।

ড্রেকের তত্ত্বাবধানে যে ব্রিটিশ নৌবহর কলিকাতা ছেড়ে কলকাতায় পৌঁছেছিল তা মাদ্রাজ থেকে আগত সাহায্যের অপেক্ষায় দিনগুণতে থাকে। এমতাবস্থায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীসহ নৌবহর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভের নের্তৃত্বে কলিকাতা পুণরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ক্লাইভ কলিকাতা জয় করেন

এবং নবাবের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। ফলে নবাব দ্বিতীয়বারের জন্য কলিকাতা আক্রমণ করেন। তবে এক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য সংঘর্ষে না গিয়ে কলিকাতায় পদার্পণ করে তিনি তাদের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেখানে ক্লাইভ বলপূর্বক নবাবকে দিয়ে আহমেদনগরের সন্ধি (১৭৫৭) স্বাক্ষর করান। এবং এই সন্ধির দ্বারা সিরাজ ইংরেজ কোম্পানীর আধিপত্য স্বীকার করে নেন এবং তাদের কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।

তবে ইংরেজরা এতে সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল গগনচুম্বী। তারা উপলব্ধি করে যে যতদিন না বাংলায় পুতুল নবাবের শাসন কায়েম হচ্ছে ততদিন তাদের চূড়ান্তভাবে স্বার্থ সিদ্ধি ঘটবে না। ক্লাইভ এ বিষয়ে তাঁর তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন এবং নবাবের প্রধান সামরিক সেনানী মীরজাফরের সঙ্গে একটি গোপনচুক্তিবদ্ধ হন। ক্লাইভ যদি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন তাহলে নবাববাহিনীর একাংশকে নিজের দলে টানতে পারবেন বলে ইংরেজদের নিকট মীরজাফর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যার বিনিময়ে পরবর্তী নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে ক্লাইভ মীরজাফরকে অভিষিক্ত করার আশ্বাস দেন। ক্লাইভ ও মীরজাফরের এই ষড়যন্ত্রের অপরাপর শরিক ছিলেন মানিকচাঁদ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ এবং সিরাজের অন্যান্য শত্রুরা। যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ২২ মাইল দূরে পলাশী নামক স্থানে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাঁধে (২৩ শে জুন, ১৭৫৭)। সিরাজের তরফ থেকে সামান্য হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, যদিও মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নির্দেশে তার বাহিনীর বেশীরভাগ সৈন্যই নীরবদর্শকের ভূমিকা পালন করে। মীরমদন ও মোহনলালের নেতৃত্বে সৈন্যদলের একটি ছোট অংশ সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। তাঁর অনুগত সহযোগীদের পরামর্শে সিরাজ রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন, কেননা তাঁর পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিছুকাল পরে সিরাজ গ্রেপ্তার হন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আর এইভাবে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

২.২ পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য

বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতায় এই মর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে এই যুদ্ধ ভারতের বুকে দুর্দিনের অমাবস্যা বয়ে নিয়ে আসে। এই যুদ্ধকে তিনি স্বাধীন ভারতের শেষ ও বিদেশী আধিপত্যের সূচনাকাল হিসাবে দেখেছিলেন। শুধু কবি নবীনচন্দ্র সেনই নন, অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় পরাজয়ের বিষয়ে তাদের আবেগকে প্রশমন করতে পারেননি, এই সম্পর্কে তাদের মনে যে রোমান্টিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ নিহিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধকে সামরিক দিক থেকে একটি বড় মাপের যুদ্ধ বলা যায় না। ক্লাইভের ক্ষুদ্র বাহিনী নবাবের তরফ থেকে কোনো গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। তবে এই যুদ্ধের একমাত্র গুরুত্ব এই যে এর মাধ্যমে ভারতীয় সামরিক বাহিনী অপেক্ষা পশ্চিমী সামরিক প্রযুক্তির উৎকর্ষ ফুটে ওঠে। এবং প্রমাণ হয় যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকদের একটি সামান্য অংশ সংখ্যাবহুল ভারতীয় বাহিনীকে পারজিত করতে পারে। ফলে ভারতীয় সৈনিকদের দুর্বলতার দিকটি দষ্টিগোচর হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** পলাশীর যুদ্ধের পরিণতিতে ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের সুচনা ঘটে এবং ব্রিটিশরা মুর্শিদাবাদের তক্‌ত-এ মীরজাফরকে বসিয়ে এক পুতুল সরকারের প্রচলন করেন। বাস্তবিকভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা সারা বাংলার প্রভুতে পরিণত হয়। তাদের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক অবস্থান সাফল্য সহকারে ব্যপ্ত হয়। **তৃতীয়তঃ,** ইংরেজদের এই বিজয় ছিল বাংলার অর্থনৈতিক সম্পদ নির্গমনের দ্যোতক, যা ইতিহাসে 'পলাশীর লুণ্ঠন' নামে খ্যাত। কোম্পানী মীরজাফরের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৭৭,০০,০০০ টাকা আদায় করে। নতুন নবাবের

কাছ থেকে রবার্ট ক্লাইভ দুই মিলিয়ন অর্থ আদায় করেন। এছাড়া চব্বিশপরগণার জমিদারী ইংরেজদের হয়। বস্তুত পলাশী-পরবর্তী দিনগুলিতে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাচার হয়, যার ফলে বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বাংলার সম্পত্তির মূল্যে ব্রিটিশরা ভারতের বাকি অংশ জয় করে। এমনকী ফরাসীদের পরাজিত করার জন্য ইংরেজদের পক্ষে প্রয়োজনীয় রসদ বা তহবিল বাংলা থেকেই যায়।

তবে সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় পলাশীর যুদ্ধকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। একথা বলা হয়ে থাকে যে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয় নি। যদি ইংরেজরা সেই সময় ভারতে অন্য কোনো যুদ্ধে পরাজিত হত তবে পলাশীর যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় রূপে বিবেচিত হত। পলাশী অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অধিক, যেখানে কোম্পানীর সামরিক বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে উচ্চতর সামরিক কৌশল অবলম্বনের সুযোগ পেয়েছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পলাশী বক্সার অবশ্য কোনো বিভেদরেখা গড়তে পারে না। সর্বোপরি একথা স্বীকার করতেই হয় যে ব্রিটিশদের ভবিষ্যৎ ভারত জয়ের পথ পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক মসৃণ হয়ে ওঠে। আর এখানেই এই যুদ্ধের তাৎপর্য নিহিত ছিল।

২.৩ নবাব মীরজাফর (১৭৫৭-'৬০)— নবাব মীরকাশিম (১৭৬০-'৬৩)—বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

ক্লাইভ ও মীরজাফরের মধ্যে গোপন চুক্তি অনুসারে ইংরেজ East India Co. পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসায়। তবে তাঁর ভূমিকা একজন ক্রীড়নক অপেক্ষা বেশী ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীদের মীরজাফর প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন, যেক্ষেত্রে ক্লাইভ পরবর্তীকালে হিসাব করে দেখেছিলেন যে এই পুতুল নবাবের নিকট থেকে ইংরেজরা 30 মিলিয়ন অর্থ আদায় করেছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের দাবী মেটাতে গিয়ে মীরজাফরের কোষাগার শূন্য হয়ে যায় এবং তিনি শীঘ্রই তাঁর ভুল বুঝতে পারেন ও অনুতপ্ত হন। এই সময় East India Co. নিছক নৌবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং কোম্পানী নবাবদের উপর তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আরোপ করতে সক্ষম হয়েছিল ও বাংলার সম্পদ শোষণে রত ছিল। ক্লাইভ উল্লেখ করেছিলেন যে এই সময় বাংলায় যে অরাজকতা, বিভ্রান্তি, দুর্নীতি, শোষণ এবং উৎকোচ গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা অন্যত্র দেখা যায় না। কোম্পানীর কর্মচারীদের নবাবের নিকট প্রত্যাশা ছিল অনেক। তবে নবাব শীঘ্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে কোম্পানীর কর্মচারীদের চাহিদাপুরণের মত আর আর্থিক সামর্থ তাঁর নেই। এদিকে ইংরেজরা মীরজাফরের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল এবং নবাব বারংবার তাদের দ্বারা অপমানিত ও অপদস্ত হতে লাগলেন। ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য মীরজাফর গোপনে চুঁচুড়াস্থিত ডাচদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং তাদের সঙ্গে নবাবের একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল। মীরজাফরের পূর্বানুমতি ছাড়াই নেদারল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা ১৭৫৯ খ্রীঃ হুগলী আক্রমণ করল। এবং বিদেরার নৌ যুদ্ধে ডাচবাহিনী ইংরেজদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরজাতি হল। ডাচদের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক তার প্রতি ইংরেজদের অসন্তোষ অনেকটা বাড়িয়ে দিল। এবং তাদের উপর ডাচ আক্রমণের জন্য নবাবকেই দায়ী করল, তবে এ ব্যাপারে তাদের হাতে কোনো অকাট্য প্রমাণ অবশ্য ছিল না। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর ভ্যানিসটার্টের পদ লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থলে তার জামাতা মীরকাশিমকে নবাবরূপে অভিষিক্ত করেন। আর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী তারা মীরকাশিমের কাছ থেকে লাভ করে। এছাড়া ইংরেজরা প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার উপহার নতুন নবাবের কাছ থেকে পায়, যেখানে ভ্যানিসস্টার্ট ও তার পরিবার পেয়েছিল ২,০০,০০০ টাকার পরিমাণ অর্থ। ভ্যানিসস্টার্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের

লোভ ও অর্থলিপ্সা স্যার আলফ্রেড লায়াল শব্দের মাধ্যমে এরূপে ফুটিয়ে তোলেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় এই একটিমাত্র অধ্যায় ইংরেজরা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয়।

ইংরেজরা এই মর্মে মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসায় যে তিনি তাদের ইচ্ছা ও স্বার্থনুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলি তাদের কল্পতিপথে এগোয়নি। মীরকাশিম ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ত। তিনি বিদেশী আধিপেত্যের কবল থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন আর একথা উপলব্ধি করেন যে স্বাধীন ও ক্ষমতাশালী হবার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ কোষাগার ও সুদক্ষ সামরিক বাহিনী।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে তত্ত্বগতভাবে শাসনক্ষমতা নবাবের হাতে থাকলেও কোম্পানীর হাতে ছিল সামরিক শক্তি ও নবাব কোম্পানীর ব্যবয়াসীদের এদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ঢালাও সুযোগ দান করেছিল। যখন কোম্পানীর প্রতিপত্তি নবাবকেও ছাপিয়ে গেল তখন শহরতলীর উৎপাদকরা কোম্পানীর এজেন্টদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। কোনো ব্যবসায়ী দুর্বত্তদের সাহায্য নিয়ে অনেক সময়ই নবাবের কর্মচারীদের নিষ্ক্রিয় করতে পারত। আর যেহেতু কোম্পানীর হাতে কোনো প্রত্যক্ষ শাসনক্ষমতা ছিল না তাই তার বণিকেরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাচার করে বেড়ালেও এর দায়িত্ব কোম্পানীর উপর বর্তাত না। মীরকাশিম পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে চান ও পুনরায় শান্তি শৃঙ্খলা আপন করতে চান, যাতে করে কোষাগারের রাজস্ব সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় ও সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্ভব হয়। ইংরেজ ও নবাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণরূপে পুনরায় চিহ্নিত হয় ব্যক্তিগত অবাধ বাণিজ্য ও দস্তকের অপব্যবহার। নবাব দাবী করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 1717-র ফর্মান অনুযায়ী সাধিত হবে, যেক্ষেত্রে কোনো নড়চড় থাকবে না। মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন শুল্কমুক্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বিরোধী ছিলেন, যার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছিল, কেননা ভারতীয়দের কর বাবদ অর্থ প্রদান করতে হলেও বিদেশী বণিকরা এ ব্যাপারে পূর্ণ অব্যাহতি ভোগ করতেন। মীরকাশিম এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যা বিফলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নবাব তখন দেশীয় বাণিজ্যের উপর সব ধরণের শুল্ক তুলে নেন আর এভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ছাড় পায় এবং ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার ব্যহত হয়। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে দেশীয় বণিকদের এই সমকক্ষতাকে মেনে নিতে পারে নি।

দেশীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের মনোমালিন্য দেখা দেয়। মীরকাশিম তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন, যা ছিল কোম্পানীর ক্ষমতাকেন্দ্র কলকাতা থেকে বেশ দূরে। মুঙ্গেরে নবাব একটি সৈন্যদল গঠন করেন, এবং তাদের দক্ষ ইউরোপীয় সেনানীদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেন। মীরকাশিম বৈধ শাসকরূপে যেভাবে দিল্লীর মুঘল সম্রাটের রাজনৈতিক অনুমোদন আদায় প্রসঙ্গে উঠে পড়ে লাগেন তা ইংরেজদের ঈর্ষার কারণ হয়। কারণ একসাথে বাংলায় দুজন সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবস্থান অসম্ভব ছিল। মীরকাশিম নিজেকে একজন স্বাধীন শাসক হিসাবেই দেখতেন, যেখানে ইংরেজরা আশা করেছিল যে তিনি তাদের হাতের পুতুল হবেন। ফলতঃ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক একপ্রকার অনিবার্য হয়ে ওঠে ও গিরিয়া, উদয়নালা প্রভৃতি যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন ও অযোধ্যায় আশ্রয় নেন।

অযোধ্যায় সমকালীন মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সমর্থন আদায় করে মীরকাশিম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরণের চক্রান্তের রূপকার হন, কিন্তু উপরোক্ত তিনজনের সম্মিলিত বাহিনী ১৭৬৪র ২২ সে অক্টোবর বক্সারের প্রান্তরে জেনারেল হেক্টর মুনরোর অধীনস্থ ইংরেজ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বক্সারের যুদ্ধ ভারতের ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের ইতিহাসে বিস্তৃত অধ্যায়ের পটভূমিকায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ রূপে গণ্য হয়। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের সেনাবাহিনী নবাবের তরফ থেকে সেরূপ কোনো গুরুতর

প্রতিরোধের সম্মুখীন না হলেও বক্সারে ব্রিটিশরা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পায়। এখানে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী ও বৃহৎ এবং তারা পলাশীর সৈন্যদের মত নীরব দর্শক ছিল না। বক্সারের যুদ্ধের পরিনতিতে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশীয় বাহিনীর অপদার্থতা প্রতিপন্ন হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, পলাশীর মাধ্যমে নবাব ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল সেখানে ইংরেজরা বিজেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর বক্সারের পর সামরিক শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত নবাব ব্রিটিশদের নিছক এজেন্টে পর্যবসিত হন। এই সময় নবাবের অস্তিত্ব এতটাই হ্রস্বীকৃত হয়ে পড়ে যে তার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। **তৃতীয়তঃ**, এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবল মীরকাশিমকেই পরাজিত করেনি, মুঘল সম্রাটও তাদের হাতে পরাস্ত হন। ফলে এর প্রতীকী গুরুত্ব ও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে বক্সারের পরিণতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে তা হল নবাবের হাত থেকে কোম্পানীর হাতে সরকারী ক্ষমতার হস্তান্তকরণ। এই সময় কোম্পানী তার নৌবাণিজ্যিক শক্তিরূপে যে ভাবমূর্তি তা ঝেড়ে ফেলে রাজ্যাধিপতির ভূমিকা নেয়। বক্সারের অর্থনৈতিক পরিণাম ও ছিল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে কোম্পানী বাহাদুরের মর্যাদা পায়।

২.৪ ব্রিটিশদের দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৭৬৩ তে মীরজাফর ইংরেজরা বাংলা মসনদে বসায় ও ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ গভর্নর হিসাবে কলকাতায় আসেন। এই সময় পরিস্থিতি Co র পক্ষে আনার জন্য ক্লাইভ অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং Co-র আধিপত্যের ভিত মজবুত করে গড়তে উৎসাহী হন। মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ইতিমধ্যেই বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সুজা-উদ-দৌলা অযোধ্যায় ফিরে যান, শাহ্-আলম এলাহাবাদ। অবশ্য এর বিনিময়ে ক্লাইভ তাঁর থেকে বার্ষিক ২৬,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার বা দেওয়ানী লাভ করেন।

এর অর্থ হল কোম্পানী বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের আইনগত স্বীকৃতি লাভ করল। দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলার রাজস্ব প্রসঙ্গে কোম্পানী কোনো আইনগত সুবিধা ভোগ করত না, সেক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে তাদের অবস্থান ছিল ১৭১৭-য় প্রণীত মুঘল ফর্মানের নির্দেশাবলীর ন্যায় যার বলে তারা বাংলার বুকে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। কিন্তু দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কিছুটা বৈধতা লাভ করে, আর এর মধ্যেই দেওয়ানীর তাৎপর্য নিহিত থাকতে দেখি। এখন কোম্পানী বাহাদুর বাংলা সুবার সার্বভৌম কর্তায় পরিণত হয়, যাদের কর্তৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এই সময় বাংলার নবাব কোম্পানীর অধস্তন ভৃত্য ব্যতীত আর কোনভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেনি। ক্লাইভ চাইলে দিল্লীতেও তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোম্পানীর কর্তৃত্ব সীমিত রাখতে মনস্থ করলেন।

ক্লাইভ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে অলোচ্য সময়ে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মত শক্তি কোম্পানীর নেই, আর তাই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে বাংলার শাসনভার, দেওয়ানী লাভের পর, কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে না। কোম্পানীর মনোনীত একজন ডেপুটি নবাব রাজস্ব আদায় করবে। এই সময় ইংরেজরা মীরজাফরের পুত্র নিজাম-উদ্-দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ডেপুটি সুবাদার বা নবাব কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ এবং কোম্পানীর পক্ষ থেকে বাংলা সুবার রাজস্ব আদায় করবে। বস্তুত তখন বাংলার বুকে এক দ্বৈত শাসনব্যবস্থা দেখা যায়— নবাব পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব সামলাবে আর কোম্পানী রাজস্বজনিত ক্ষমতা ভোগ করবে। বাস্তবে

কোম্পানী বাংলায় শাসনকর্তায় পরিণত হয়, কেননা তার সামরিক ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। নবাব শুধুমাত্র বিচারবিভাগীয় প্রশাসনই দেখতেন, তবে কোম্পানীর মনোনীত ডেপুটি নবাবকে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নবাবের উপর চাপ দেওয়া হয়। ক্লাইভ এর মস্তিষ্ক প্রসূত এই ব্যবস্থা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Diarchy বা Dual Govt.) নামে পরিচিত। এর অর্থ দাঁড়ায় ডেপুটি নবাব কোম্পানীর পক্ষ থেকে রাজস্বের পাশাপাশি বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে আর এরূপে নায়েব-দেওয়ান এবং নায়েব-নাজিমের ক্ষমতার সমন্বয়সাধন করা হয়।

মুঘলদের অধীনে প্রাদেশিক সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল— দেওয়ানী ও নিজামত। রাজস্ব সংগ্রহ এবং পৌর বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব থাকত দেওয়ানের ওপর, যিনি ছিলেন দেওয়ানী বিভাগের প্রধান। অপরদিকে ফৌজদারী বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন নিজামৎ নামক বিভাগটি যার প্রধান কর্তা ছিলেন সুবাদার বানাজিম। দেওয়ানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল যে এই সময় কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে, আর এরূপ নায়েব-দেওয়ান এবং নায়েব-নাজিমের ক্ষমতার সমন্বয়সাধন করা হয়।

মুঘলদের অধীনে প্রাদেশিক সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল— দেওয়ানী ও নিজামৎ। রাজস্ব সংগ্রহ এবং পৌর বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব থাকত দেওয়ানের ওপর, যিনি ছিলেন দেওয়ানী বিভাগের প্রধান। অন্যদিকে ফৌজদারী বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন নিজামৎ নামক বিভাগটি যার প্রধান কর্তা ছিলেন সুবাদার বা নাজিম। দেওয়ানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল যে এই সময় কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি পৌর বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব লাভ করে আর এইভাবেই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এর বলে ইংরেজরা দেওয়ানী ও নিজামৎ উভয় বিভাগের উপরই তাদের ক্ষমতা হারায় বা তারা তাদের প্রয়োগের সুযোগ পায় না। ক্লাইভ প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীকে বাংলার শাসনে নিযুক্ত করতে চায়নি, যে দেওয়ানী প্রশাসন চালাবার জন্য এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, **দ্বিতীয়তঃ**, ভারতের জটিল এবং অভিনব রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার মত যথেষ্ট জ্ঞান ব্রিটিশ কর্মচারীদের ছিল না, পার্সিভাল স্পীয়ার যথার্থই মনে করেন যে প্রশাসন যন্ত্র মুঘল খেতাব ইত্যাদি অলঙ্করণ সহ ভারতীয়রূপেই থেকে যায়, কিন্তু আসল ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানীর হাতে।

১৭৬০—'৬৫ পর্যন্ত ক্লাইভ ভারতে ছিলেন না এবং তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে বাংলার বুকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে। ১৭৬০ মীরজাফর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ক্লাইভ এর উত্তরসূরী এই ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের জমিদারী এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার প্রেক্ষিতে বাংলার নবাবী বিক্রী করে দেন। **দ্বিতীয়তঃ**, বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় ইংরেজদের অবস্থান অনেক বেশী মজবুত করে তোলে এবং তাদের সামরিক উৎকর্ষ সবাইকে ছাপিয়ে যায় এবং বাংলার নবাবের পক্ষে তাদের শক্তিরোধ করা অসম্ভবরূপে প্রতিপন্ন হয়। ব্রিটিশদের এই সুদিনে ক্লাইভ কলকাতায় পদার্পন করে।

এই ধরণের সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ক্লাইভ তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বাংলাকে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখতে মনস্থির করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতি সুবিধাজনক হলেও কোম্পানীর কার্য-কলাপের লক্ষ্য তখনো স্থির হয়নি।

ক্লাইভ এর পূর্বে কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মচারীরা অনেক কথাই ভেবেছিলেন এবং দেওয়ানী লাভের পর তাদের নিকট সেই সুবর্ণ সুযোগ এল, যার বলে কোম্পানীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। তবে বিচক্ষণ ক্লাইভ কোম্পানীর ক্ষমতা সেই সময়ের মত সীমিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। এবং দেওয়ানীর তাৎপর্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। দেওয়ানী লাভের ফলে কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল। তবে প্রশাসনিক ক্ষমতাগ্রহণের

চরমক্ষণ যে এখন আসেনি তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলত কোম্পানীর মনোনীত ডেপুটি নবাব রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। বাস্তবিকভাবে এই নতুন দ্বৈত শাসনে বাংলার নবাবের হাতে রইল বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা, আর কোম্পানী পেল রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা Diarchy রূপে ইতিহাসের বুকে খ্যাত হয়ে আছে। এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাতে কোম্পানী যে ধরণের ক্ষমতা ভোগ করত তা সীমাহীন ছিল। বলা যেতে পারে এইভাবে যে ইঙ্গ-মুঘল শাসন কাঠামো জন্ম নিল সেখানে কোম্পানী চরম কর্তৃত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করল। সর্বোপরি দ্বৈতশাসনব্যবস্থাই ক্লাইভ শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। কারণ তিনি জনসমক্ষে কোম্পানীর প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটন করতে চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির ইংল্যান্ডের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও এতে বাংলা বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির রণক্ষেত্রে পরিণত হবে।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ইংরেজদের নিকট যথেষ্ট লাভজনক রূপে বিবেচিত হয়। তারা দায়িত্ব ছাড়াই ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা আমরা সফল বলতে পারি না। ঐতিহাসিক র‍্যামসে ম্যুর মনে করেন দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বা diarchy ব্যর্থতার দিকে এগিয়েছিল। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উৎপাদকরা, কারণ তাদের কথা নবাব বা কোম্পানী কেউই ভাবত না। কোম্পানী নিযুক্ত লোভী রাজস্ব কর্মচারীরা তাদের যারপরনাই অপদস্ত করত। আর এইভাবে যে ব্যাপক লুণ্ঠন বাংলার বুকে চলেছিল সেকথা পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন। কোম্পানীর বেআইনী ব্যবসা দ্বিগুণ বেড়েছিল আর গবীর বাঙালী তাঁতীরা কমদামে তাদের উৎপাদিত পণ্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বিক্রী করতে বাধ্য থাকত। বাংলার রাজস্ব থেকে ভারতীয় দ্রব্য খরিদ করে তা বিদেশে বেচে ইংরেজরা চড়া মুনাফা লাভ করে। ১৭৬৬—'৬৮র মধ্যে প্রায় £ ৫.৭ মিলিয়ন অর্থ বাংলা থেকে শোষিত হয়েছিল। এদেশ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নির্গমন হত তার ভয়াবহতা ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত জনক ক্লাইভেরও নজরে পড়েছিল। এবং তিনিও এই ব্যাপারে এই মর্মে খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো দেশে লুণ্ঠন ও শোষণের এহেন তান্ডবলীলা চলেনি। দ্বৈতশাসনব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফুটে ওঠে ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ; যাকে মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। দ্বৈতশাসনব্যবস্থায় যে কুফলগুলি পরিদৃষ্ট হয়েছিল তার ফলে ইংরেজরা রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা লোপ পায় এবং কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব প্রশাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বীকার করে। এই সময় কোম্পানী তার বাণিজ্যিক ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গঠনে মন দেয়।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

A. M. Khan — The Transition in Bengal.
Sirajul Islam — The Permanent Settlement in Bengal.
P. J. Marshall — Bengal, the British Bridgehead.
Sekhar Bandyopadhyay — From Plassey to Partition.

২.৬ অনুশীলনী

১। নবাব সিরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের কারণ আলোচনা কর।

২। পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পার্থক্য কোথায়।

৩। পলাশীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখ।

৪। বক্সারের যুদ্ধের প্রধান কারণ আলোচনা কর।

৫। দিওয়ানী— লাভের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। দিওয়ানী লাভের ফলাফল এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

একক ৩ ❑ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমান্ত বিস্তার নীতি

গঠন

৩.০ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব
৩.১ ইঙ্গ-মহীশূরের সম্পর্ক
৩.২ মহীশূরের পতনের কারণ
৩.৩ ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক
৩.৪ মারাঠাদের পতনের কারণ
৩.৫ রঞ্জিত সিংহের পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-শিখ দ্বন্দ্ব
৩.৬ শিখদের পতনের কারণ
৩.৭ ১৭৭৩ রেগুলেটিং আইন এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)
৩.৮ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি
৩.৯ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক গৃহীত রাজ্য বিস্তার নীতি
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি
৩.১১ অনুশীলনী

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার— অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও ব্রিটিশ রাজের উত্থান— রেগুলেটিং ও পিটের ভারত আইন, ১৭৯৩ ও ১৮১৩ খ্রীঃ র চার্টার আইন— অধীনতামূলক মিত্রতা থেকে সম্প্রসারণ নীতি— হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী।

৩.০ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

ইউরোপীয়দের পদার্পনের ফলে ভারত ইউরোপীয় রাজনীতির এক ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স, সারা বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত ছিল। ১৭৪০—’৬৩ খ্রীঃ-র মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড লিপ্ত ছিল সেই সূত্রে ভারতেও তাদের মধ্যে লড়াই লাগে। ১৭ শতকের শেষার্ধে ইংরেজরা ভারতের বুক থেকে পর্তুগীজ ও ডাচদের সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং তখন তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। উভয় দেশের লক্ষ্য বণিকেরাই ভারতে বাণিজ্য ও সম্পদের উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। তাদের উভয়ের লক্ষ এক হওয়ায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজ ও ফরাসীরা ভারতে দুর্গ নির্মাণ ও আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য সঞ্চয়ে মন দিয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মুঘল সাম্রাজ্যে যে পতন ঘটেছিল তাতে ফরাসী ও ব্রিটিশরা তাদের লক্ষ পূরণের সুবর্ণ সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল। যখন ভারতীয় অভিজাতরা কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে চেয়েছিল তখন তারা এই সকল বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয়। কারণ এদের যুদ্ধনৈপুণ্য প্রশ্নাতীত ছিল। ইংরেজ ও ফরাসীরাও ভারতীয় রাজাদের এই আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেনি। কারণ তারা জানত যে তাদের মদতপুষ্ট যে পক্ষ জিতবে তাদের নিকট থেকেই তারা সুবিধা নিতে তৎপর হবে।

১৭৪২ খ্রীঃ ইউরোপ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ভারতেও ১৭৪২-৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চোখে পড়বে। দঃ ভারতের কর্ণাটক ছিল তাদের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রস্থলস্বরূপ। দঃ ভারতে ইংরেজরা মাদ্রাজ

ও ফরাসীরা পন্ডিচেরীতে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা উভয়েই স্থানীয় রাজনৈতিক চালচিত্রে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিল। এখানে এদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল এবং ১৭৪৫ ইংরেজ নৌবহর যখন ফ্রান্সের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ধ্বংস করেছিল তখন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল। এই সময় ফরাসীদের নেতা ছিলেন অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিচেরীর শাসক দুপ্লে। এমতাবস্থায় ফরাসীরা ব্রিটিশদের হারিয়ে মাদ্রাজ দখল করে এবং ব্রিটিশদের সাহায্যের জন্য কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের নিকট আবেদন জানায়। কিন্তু ১৭৪৪ সালে সেন্ট থোম-এর যুদ্ধে ক্ষুদ্র ফরাসী বাহিনীর নিকট নবাব বাহিনী পরাজিত হয়।

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ পাশ্চাত্যে সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনীগুলির নিকট সংখ্যাবহুল অদক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপদার্থতা প্রতীয়মান হয়। প্রথম ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্বের পরিনতিতে ফরাসীরা ভারতের বুকে একটি প্রাদেশিক ও নৌ শক্তিরূপে মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ১৭৪৮ খ্রীঃ আই-লা-স্যাপল সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে ইউরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে ভারতেও ইঙ্গ -ফরাসী দ্বন্দ্বের সাময়িক বিরাম ঘটে।

তবে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পারস্পরিক বিরোধিতার অবসান হয় নি এবং দুপ্লে ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে নারাজ ছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের নির্দেশে তিনি তা করতে বাধ্য হন। বাণিজ্য ও বাণিজ্য কেন্দ্রকে ঘিরে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা ছড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় ফরাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে আর একটি সংঘাতে যেতে উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে এই সুযোগ তাদের কাছে আসে। বস্তুত কর্ণাটকের চাঁদা সাহেব নবাব আনোয়ারউদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ও অন্যদিকে হায়দ্রাবাদে সিংহাসনের দাবীকে কেন্দ্র করে নাসির জঙ্গ ও মুজাফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে লড়াই বেঁধেছিল। ডুপ্লে কর্ণাটকের চাঁদা সাহেব ও হায়দ্রাবাদের মুজফ্‌ফর জঙ্গকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং তিনি তাঁর এই পরিকল্পনায় সাফল্যও লাভ করেন। এর বিনিময়ে ফরাসীরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে পন্ডিচেরী সংলগ্ন ৮০টি গ্রাম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শক্তির দ্রুত বিস্তার ইংরেজদের শঙ্কার কারণ হয়। তারা মৃত আনোয়ারউদ্দিনের পুত্র মহঃ আলি যিনি ত্রিচিনোপল্লীতে ফরাসী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে উদ্যত হয়। এর পাশাপাশি নাসির জঙ্গকে ব্রিটিশরা সমর্থন দান করেন। আর এইভাবে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের যুদ্ধে তারা লিপ্ত হয়। এই সময় কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল তা নজিরবিহীন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জন্ম হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ(১৭৪৯) এবং রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেন কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট আক্রমণের, যা ছিল ফরাসীদের একটি অন্যতম ঘাঁটি। ক্লাইভের এই সামরিকনীতি ব্রিটিশদের সাফল্য জয়যুক্ত করে এবং ফরাসীবাহিনী ত্রিচিনোপল্লীতে অন্যত্র ক্রমাগত ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হতে থাকে। চাঁদাসাহেব ধৃত হন ও তাকে হত্যা করা হয়। এই অবস্থায় ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ১৭৫৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হয়। ইংরেজদের চাপে ফরাসী সরকার ডুপ্লেকে প্যারিসে ফিরে আসতে নির্দেশ দেয় এবং ভারতের জন্য এক নতুন গভর্নর নিয়োগ করে।

১৭৫৬ খ্রীঃ ইউরোপে পুনরায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় যার পরিনতিতে ১৭৫৮ খ্রীঃ পুনরায় ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এই সময় পলাশীর যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশদের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে, অন্যদিকে ফরাসীদের জয়লাভের আশা ছিল খুবই কম। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা মুর্শিদাবাদ থেকে প্রেরিত রসদের উপর নির্ভর করে জোরকদমে লড়াই চালায়, আর ফরাসীরা কাউন্ট ডি লালির নের্তৃত্বে শেষ চেষ্টা চালাতে থাকে। তারা বারংবার ইংরেজদের হাতে

পরাজিত হয় আর এই যুদ্ধের রেশ ধরে বঙ্গদেশে ফরাসীদের বাণিজ্য ঘাঁটি চন্দননগর দখল করে। সর্বোপরি ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকূট বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ফরাসীদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে ও তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে ইউরোপে প্যারিসের সন্ধি নিয়ে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধেব অবসান হয়। এই সময় ব্রিটিশদের দ্বন্দ্বের অবসান হয়। এই সময় তাদের ছত্রছায়ায় ফরাসীদের বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়। তারা এদেশে তাদের ঘাঁটিগুলি বজায় রাখতে পারে এই শর্তে যে আর কখনো দুর্গ নির্মাণ বা সৈন্য সঞ্চয়ে উদ্যোগ নেবে না। ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে ফরাসীরা রাজী হয় আর এই মর্মে ভারতে ফরাসীর সাম্রাজ্য স্বপ্ন চিরতরে লোপ পায়। ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব লাভের পথে আর কোনো বাধা থাকে না।

ভারতে ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য কতগুলি কারণ দায়ী ছিল, **প্রথমতঃ,** ইংরেজরা ফরাসীদের তুলনায় সম্পদ, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহে অনেকগুণ এগিয়ে ছিল। শিল্পবিপ্লবের পরিণতিতে ইংল্যান্ড ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তখন ভারতের বুকে নিজেদের জায়গা করে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা ভারতকে তাদের কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর ক্ষেত্ররূপে দেখেছিল। **দ্বিতীয়তঃ,** ফরাসী কোম্পানীর কিছু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এদেশে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিপন্থী ছিল। বস্তুত অর্থের ব্যাপারে ফরাসী কোম্পানী ফরাসী সরকারের উপর অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। এককভাবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে ফরাসী কোম্পানীকে সর্বদা প্যারিসের মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হত। **তৃতীয়তঃ,** নেতৃত্বজনিত সমস্যাও ভারতে ফরাসী ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। ডুপ্লেকে বাদ দিলে ফ্রান্সের তরফে সেরকম কোনো দক্ষ সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে নি। আয়ারকোর্ট ও ক্লাইভের ন্যায় সেনানীরা ফরাসী সেনাধ্যক্ষদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়েছিলেন। তাছাড়া তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ববিবাদও ভারতে ফরাসীদের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছিল। সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুর্শিদাবাদের রাজকোষের এক বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ফলে তারা ফরাসী অপেক্ষা সম্পদে যথেষ্ট বলীয়ান ছিল। এর পাশাপাশি তাদের গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস ও ফরাসীদের পতন ত্বরান্বিত করে।

৩.১ ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক

১৭৬০-'৯৯র মধ্যে যেরূপে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক বর্ধিত হয়েছিল তাকে বুঝতে গেলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। যথা— হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের ফরাসী প্রীতি, আর্কট, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের পারস্পরিক শত্রুতা, একটি ভারতীয় শক্তিকে অপর ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে সমর্থন যোগাবার ব্রিটিশ নীতি, বিশ্বব্যাপী ইংরেজ ও ফরাসীদের শত্রুতা, সর্বোপরি মহীশূরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্রিটিশ প্রয়াস।

হায়দার আলী ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী সেনানী, যার জন্ম হয় খুব সাধারণ পরিবারে। তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং নিজেকে মহীশূরের স্বাধীন নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল যার উৎস ছিল ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হায়দারকে তার শক্তি সংহত করার সুযোগ দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাকালে হায়দার ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন। এবং এইভাবে ইংরেজদের নজরে পড়েন। মহীশূরের সামরিক নৈপুণ্য ও ফরাসী প্রীতিতে ব্রিটিশরা শঙ্কিত হয়, যার মধ্যে নিহিত ছিল ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের বীজ। সামরিক শক্তি হিসাবে মহীশূরের চমকপ্রদ উত্থান ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের পথে অন্তরায় রূপে গণ্য হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজাম, আর্কটের নবাব এবং মারাঠারাও হায়দারের রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজরা এই ত্রয়ীর আতাতে যোগ দেয় এবং মহীশূরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর পরিণতিতে ১৭৬৭-

৬৯ খ্রী-র মধ্যে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঘটে। যদিও হায়দার নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তার সামরিক পারদর্শিতা ছিল তুলনাতীত, যা মহীশূরের পক্ষে লাভজনক রূপে বিবেচিত হয়েছিল। মাদ্রাজের সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় ও এই সন্ধির বেশীরভাগ শর্তই হায়দারের পক্ষে গিয়েছিল। এর ফলে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নেওয়া হয় অপরের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে। এই সন্ধির একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল এই যে, যদি সন্ধি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষের কোনো পক্ষ তৃতীয় পক্ষর সামরিক আগ্রাসনের সম্মুখীন হয় তাহলে তাকে সাহায্য করতে সন্ধির অপর পক্ষ-ও এগিয়ে আসবে এবং সেই তৃতীয় পক্ষ তাদের সাধারণ শত্রুতে পরিণত হবে। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরিণতিতে, বিশেষত মাদ্রাজের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে (১৭৬৯) ভারতে ব্রিটিশদের মর্যাদা হানি হয় ও এই যুদ্ধের তাৎপর্য এই যে ব্রিটিশরা সাময়িকভাবে হলেও হঠতে বাধ্য হয়। ফলে হায়দারের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ইঙ্গ মহীশূর দ্বন্দ্বের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এর এক দশক পরে ১৭৮০ খ্রীঃ শুরু হয়। ১৭৭১ খ্রীঃ মারাঠারা যখন মহীশূর আক্রমণ করে তখন হায়দারের আবেদনে ইংরেজরা সাড়া দেয় নি। ইংরেজদের এই বিশ্বাসঘাতকতা হায়দারকে ব্যথিত করে। কারণ মাদ্রাজের সন্ধি অনুযায়ী তাদের উচিৎ ছিল মারাঠা আক্রমণকালে মহীশূরকে সাহায্য দান করা। এই সময় হায়দার সাময়িকভাবে হলেও নিজাম ও মারাঠাদের তাঁর পক্ষে আনতে সমর্থ হন। এদের সম্মিলিত শক্তি দঃ ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে একের পর এক যুদ্ধে পরাস্ত করতে থাকে। তার শক্তির প্রধান উৎস ছিল অশ্বারোহী বাহিনী ও মোটামুটি গেরিলা ধরণের যুদ্ধ পদ্ধতি। হায়দার কর্ণাটকের প্রায় পুরোটাই তার দখলে আনতে সমর্থ হন। তবে ১৭৮২ খ্রীঃ ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সানবাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে স্রোত অন্য খাতে বইতে শুরু করে। মারাঠাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পরিণতিতে ব্রিটিশরা মহীশূরের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দানে সমর্থ হয়। এর পাশাপাশি দেশীয় শক্তিগুলির সম্মিলিত বাহিনীর হাত থেকেও তারা রেহাই পায়। নিজামকে গুণ্টুর জেলা দান করে ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে নিরপেক্ষ রাখেন। ১৭৮১-র জুলাইতে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকূট হায়দারকে পোর্টো নোভার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং মাদ্রাজ অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৮২ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় হায়দার মৃত্যু বরণ করেন।

হায়দারের মৃত্যু বা পোর্টোনোভার যুদ্ধে পরাজয় মহীশূরের শক্তিকে খর্ব করতে পারে নি। হায়দারের পর তাঁর পুত্র টিপু মহীশূরের নবাব হন। বিদানুরের এবং অন্যত্র ইংরাজ শক্তি তার নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দুটি পক্ষই ছিল দুর্দমনীয়। ইতিমধ্যে ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হলে মাদ্রাজে ইংরাজ সরকারও যুদ্ধস্বরূপ কোনো আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চায় নি। মাদ্রাজের লর্ড ম্যাকার্টনে (Macartney) এই সময় মহীশূরের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সাক্ষরে উদ্যত হল ও ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির পরিণতিতে টিপু তাঁর রাজ্য ও সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর পক্ষে যে তখন টিপুকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বিচার করলে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ছিল তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের শীর্ষবিন্দু। তবে এই সন্ধির মেয়াদ ছিল সীমিত এবং পুনরায় ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ইংরেজদের হতাশ করে। তারা দঃ ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের পথে টিপুকে প্রধান শত্রুরূপে দেখে। অন্যদিকে টিপু ভারত থেকে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন এবং তাঁর পিতার অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। ইংরেজরদের পুরনো মিত্র ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকে যখন টিপু আক্রমণ করেন তখন তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই সময় ব্রিটিশরা হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের নিজপক্ষে আনতে সমর্থ হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় শক্তিগুলিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রয়াসের সার্থকতা পুনরায় প্রতিফলিত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নিজাম

ও মারাঠাদের থেকে টিপুকে বিচ্যুত করে তাঁর উপর ক্রমাগত সামরিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। টিপুর সঙ্গে তাদের যে তৃতীয় লড়াই হয়, তাতে 'মহীশূরের বাঘের' বিরুদ্ধে কর্ণওয়ালিশ নিজে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং শ্রীরঙ্গ পত্তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যা ছিল টিপুর রাজধানী। টিপু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ, মারাঠা ও নিজামের এই সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না। তাই তিনি সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেন ও ১৯৭২ খ্রীঃ শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করেন ইংরেজদের সঙ্গে। এই সন্ধির শর্তগুলি টিপুর জন্য চরম অবমাননা বহন করে আনে। তিনি তাঁর অর্ধেক রাজ্যাংশ ব্রিটিশদের সমর্পন করেন ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এছাড়া তাঁকে বাধ্য করা হয় তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের নিকট জামিন রাখার জন্য। এই সন্ধির পরিনতিতে দঃ ভারতে মহীশূরীয় আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে অস্তমিত হয়।

১৭৯৮ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলী ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন এবং ব্রিটিশদের সম্প্রসারণ নীতি এক নতুন মাত্রা পায়। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি যেসব শক্তি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি তাদের প্রতি তিনি কড়া মনোভাব নেন, মহীশূরও এর থেকে বাদ যায়নি। তবে টিপু এই সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন না ও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। আর টিপুকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভারতীয় শক্তিও তখন ব্রিটিশ বিরোধীতার পথ বেছে নেয়নি। এমতাবস্থায় টিপু সাহায্যের জন্য বর্হিভারতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে তার সমঝোতা হয়। মরিশাসের শাসন কর্তার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এছাড়া তিনি তুরস্ক ও আফগানিস্তানে দূত প্রেরণ করেন। তবে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় শেষমেধ্য, তদুপরি এই সময় পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা টিপুর ফরাসী প্রীতি ভালোচোখে দেখেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে টিপুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা ব্রিটিশদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা ভারতে পুনরায় ফরাসী শক্তির পুনঃ অভ্যুত্থানের পথও রুখে দিতে চেয়েছিল। ফলতঃ ১৭৯৯ খ্রীঃ ব্রিটিশরা শ্রীরঙ্গপত্তম আক্রমণ করে।

লর্ড ওয়েলেসলী টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে টিপু তা প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে যুদ্ধ এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে ভারতীয় রাজাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদের ব্রিটিশ সামরিক নিরাপত্তাদানের কথা বলা হয়েছিল। টিপু অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। তিনি পরাধীনতা অপেক্ষা সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হলেও তার ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী সামরিক সাহায্য লাভের পূর্বেই টিপুকে শ্রীরঙ্গপত্তম হারাতে হয়। এবং মহীশূরের ব্যঘ্রচিত বীর নায়ক টিপু ১৭৯৯ খ্রীঃ অসম সাহসীকতার সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন।

টিপুর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্রিটিশ ও হায়দ্রাবাদের নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং হায়দার যে হিন্দু রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন তার বংশধর মহীশূর রাজ্যের খুব সামান্য অংশে নিজের শাসন কায়েম করল, যার সঙ্গে ইংরেজদের মিত্রতা নীতি স্বাক্ষরিত হয়। মহীশূরের পতন ফরাসীদের মস্তকোত্তলনের সম্ভাবনা চিরতরে নিবষ্ট করে ও ব্রিটিশরা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, যাদের চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা দেশী বিদেশী কোনো শক্তিরই তখন ছিল না।

৩.২ মহীশূরের পতনের কারণ

কিছু লেখকের মতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেবার ব্যাপারে টিপু সুলতানের অযোগ্যতাই মহীশূরকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পিতা হায়দারের ন্যায় পারদর্শী ছিলেন না। তবে এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। হায়দারের সময় ভারত ও বর্হিভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি গুণগত

রূপান্তর ঘটেছিল। হায়দার তাঁর আমলে চলাকালীন ইঙ্গ-ফরাসী ও দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-মারাঠা সামরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু টিপু সুলতানের আমলে ব্রিটিশরা মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে এবং পুরোপুরি তাঁকে গমনের ব্যাপারে নজর দেয়। আর টিপু যখন নবাব হন তখন ফরাসীদের ইংরেজরা ভারত থেকে বিতাড়িত করেছে। **দ্বিতীয়তঃ,** টিপুর ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, যেখানে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠারা ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় টিপুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেখানে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। **তৃতীয়তঃ,** ব্রিটিশদের কূটনৈতিক চালে ভারতীয় শক্তিগুলি তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। মহীশূরের পতনের একটি অন্যতম কারণ হল টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের যোগদান, আর এইভাবে ব্রিটিশ, মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজামের সম্মিলিত শক্তি টিপুকে ক্ষমতাচ্যুত করে মহীশূরের পতনকে ত্বরান্বিত করে। **চতুর্থতঃ,** ব্রিটিশরা বিভিন্ন দেশীয় শক্তির সাহায্য লাভ করলেও টিপুর ফরাসী সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। টিপু একাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েন। **পঞ্চমত,** ১৭৯০ এর দশকে ব্রিটিশ ক্ষমতা তার শিখরে পৌঁছেছিল। যুদ্ধে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ তথা রসদের ব্যাপারে ব্রিটিশ শিবিরে কোনো ঘাটতি ছিল না। তারা উন্নত ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত। হায়দার আলি অশ্বারোহী বাহিনীর উপর নির্ভর করে গেরিলা পদ্ধতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে টিপু তার গোলন্দাজ বাহিনীর উপর ভরসা করেন, যারা সরাসরি ব্রিটিশদের আক্রমণের নীতি নেয়। এক্ষেত্রে টিপুর সৈনিকরা যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রের ব্যাপারে ইংরেজেদের অপেক্ষা যথেষ্ট কম সুদক্ষ ছিল। সর্বোপরি মহীশূরের পতন অনিবার্য ছিল। টিপু ইতিহাসের গতি পাল্টাতে পারতেন না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ামানুযায়ী টিপুর মতন লঘু হৃদয় ব্যক্তিকেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের নিকট হার মানতে হয়েছিল। এই সময় প্রায় সকল ভারতীয় রাজাই ব্রিটিশদের পদানত হয়েছিল। একা টিপুর পক্ষে কোনোমতেই নিজের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

৩.৩ ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক

আহম্মদ শাহ আবদালী একটি নতুন আফগান সাম্রাজ্য স্থাপনের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন না। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) তিনি মারাঠাদের যেভাবে পরাজিত করেন তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পর ভারতের বুকে কোনো দেশীয় স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে অস্তমিত হয়। এই যুদ্ধের পর মারাঠাদের সামরিক শক্তি ভেঙে পড়ে এবং ব্রিটিশরা মারাঠা ও দঃ ভারতে তাদের আধিপত্য কায়েমের সুযোগ পায়। জনৈক ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন যে 'প্রকৃতপক্ষে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এটা স্থির করেনি যে ভারতের বুকে কে রাজত্ব করবে বা ভারতের বুকে কার রাজত্ব করার সামর্থ আছে। তবে তা ভারতে ব্রিটিশ উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।' তবে মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধে তাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা দ্রুত পূরণে সমর্থ হয় ও ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে কে তাদের আধিপত্য কায়েম করবে এ নিয়ে ব্রিটিশ ও মারাঠাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিভিন্ন দেশীয় শক্তিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহারের যে নীতি ব্রিটিশরা নিয়েছিল তার পরিণতিতে তারা বাংলার বুকে জাকিয়ে বসে। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয় তখনই যখন মারাঠাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ব্রিটিশরা হস্তক্ষেপ করে।

এই সময় একদিকে রঘুনাথ রাও ও অন্যদিকে পুনাদেরকার প্রতিপত্তিশালী নেতৃবর্গ যারা দ্বিতীয় মহাদেব রাও-এর পক্ষে ছিলেন, এই উভয় দলের মধ্যে পেশোয়া পদের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রঘুনাথ রাও তার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় মহাদেবরাওকে সরানোর জন্য বম্বেস্থিত ব্রিটিশদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। ইংরেজরা এতে সানন্দে সাড়া দেয় ও ১৭৭৫ খ্রীঃ সুরাটের সন্ধি সাক্ষর হয়। আর এভাবেই ইংরেজরা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (১৭৭৫)। বস্তুত সুরাটের সন্ধি কলকাতাস্থিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়নি, যারা রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে উচ্চতর

মর্যাদা ভোগ করে থাকে। কলিকাতা কাউন্সিল মারাঠাদের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করেছিল। তার ফলে সুরাটের সন্ধিকে স্বীকৃতি দিতে তারা ইচ্ছুক ছিল না। পুরন্দরের সন্ধির পরিনতিতে দ্বিতীয় মহাদেব রাওকে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, আর এই সন্ধির নেপথ্যে ছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কোর্ট অফ ডিরেকটরস। যখন সুরাটের সন্ধিকে বৈধ বলে গ্রহণ করা হল তখন ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। এই যুদ্ধ চলে ৭ বছর ও ১৭৮২ তে সলবাই এর সন্ধি সাক্ষরিত হলে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ চলাকালে সকল মারাঠা প্রধান তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল পেশোয়া ও তার প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশের প্রতি। এই সময়টা ব্রিটিশদের পক্ষে তেমন ভালো ছিল না। কারণ তাদের তখন মারাঠা, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের সম্মিলিত শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে দুই পক্ষই অবিজিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সলবাইয়ের সন্ধির তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে— (১) এই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে মারাঠাদের ২০ বছরের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়, যার ফলে ব্রিটিশরা তাদের ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ পায়। (২) এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা মহীশূরের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ হয়। (৩) কিছুটা হলেও মারাঠাদের হৃত সামরিক গৌরব উদ্ধার করা সম্ভব হয় ও তাদের চরম বিপর্যয় কুড়ি বছর পিছিয়ে যায়। এই কুড়ি বছরব্যাপী ইংরেজরা যখন তাদের ক্ষমতা বিস্তারে মন দিয়েছিল তখন মারাঠারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিবাদে মগ্ন ছিল। সেদিক থেকে, অনেকের মতে, সলবাইয়ের সন্ধি একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধোচিত সন্ধি।

সলবাইয়ের সন্ধির পরবর্তী দুই যুগকে মারাঠা ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় অন্যতম মারাঠা নেতা মহাদজী সিন্ধিয়া ফরাসী কর্মচারীদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে মন দেয়। তাঁর প্রতিভা ছিল তুলনাতীত। কিন্তু তিনি তাঁর বেশীরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন নানা ফড়নবীশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে। ইন্দোরের হোলকার তাঁর শত্রু ছিল। ১৭৯৪ তে সিন্ধিয়ার মৃত্যু ও ১৮০০ খ্রীঃ নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হলে মারাঠাদের সামগ্রিক বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়। এই সময় কোনো শক্তিশালী মারাঠা নেতাকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়নি ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। মারাঠা নেতাদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা মারাঠা নেতাদের দুদলে ভাগ করে কোনো মাধবরাও এরপর যখন পেশোয়া পদে দ্বিতীয় বাজীরাও অভিব্যক্ত হন তখন মারাঠাদের দুর্বলতা প্রকটিত হয় এবং শাসনকর্তা হিসাবে মাধবরাও ছিলেন যথেষ্ট অযোগ্য। ফলতঃ তিনি চাপে পড়ে অধীনতামূলক মিত্রতার মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। এর পূর্বেও ইংরেজরা বারংবার অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের জন্য মারাঠাদের চাপ দিয়েছে, কিন্তু বিচক্ষণ নানা ফড়নবীশ সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন, তবে ১৮০২ তে যখন পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী হোলকারের কাছে পরাজিত হয় ও ব্যক্তিগত সামর্থ রক্ষার স্বার্থে দ্বিতীয় বাজীরাও ব্রিটিশদের নিকট আত্মসমর্পন করে, তখন পূর্বের মারাঠা গৌরব প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। বেসিনের সন্ধি (১৮০২) দ্বারা ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তানুসারে বাজীরাও-এর রাজ্যাংশে ঠাঁই পায়।

ব্রিটিশরা ভেবেছিল বেসিনের সন্ধি মারাঠা শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে এবং মারাঠা প্রধানরা আত্মসমর্পন করবে। তবে মারাঠা প্রধানরা অত সহজে হার মানতে রাজী ছিলেন না এবং তাদের এই অদম্য মনোবলই দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা করে। তবে এই বিপদের সময়েও মারাঠারা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করেনি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনী আসাই, আরগন ও লাসোয়ারীর যুদ্ধে ১৮০৩ খ্রীঃ ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়, ফলে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে কেউই আর পুনর্বার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি এবং তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হয়। যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তখন হোলকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল আর গাইকোয়াড় নিজের জাত ভাইদের নয়, বরং বিদেশীদের সাহায্যদানে অগ্রণী হয়।

যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের কাছে হার মেনে নিয়েছেন তখন হোলকার ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে। একস্থান থেকে অপর স্থানে দ্রুত গমনশীল মারাঠা বাহিনীর পুরনো ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে হোলকার ব্রিটিশদের সাময়িক ত্রাসে পরিণত হন। তবে ব্রিটিশরা হোলকারের মিত্র ভরতপুরের রাজাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। তবুও হোলকার সাফল্য সহকারে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে এই সময় লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসন নীতি নিয়ে পুনর্বার ভাববার অবকাশ দেখা দেয়, কেননা ব্রিটিশদের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের পরিনতিতে তাদের অর্থ টান পড়েছিল। তৎকালে ইউরোপে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তার বলে লন্ডনের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দেশীয় শক্তির উপর তাদের সামরিক বিজয় লাভের নীতি থেকে সরে আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নেপোলিয়নের ক্ষমতা লাভও ইউরোপীয় পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিবর্তনে দায়ী ছিল। এমতাবস্থায় ওয়েলেসলীকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রিটিশরা হোলকারের সঙ্গে সমঝোতা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়।

বারংবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিণতিতে মারাঠা নেতাদের সামরিক ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায়। তবে তবুও স্বশাসন কায়েম রাখার অভিলক্ষ ছিল অটুট। তাদের এরূপ চরম বিপর্যয়ের কালে ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা, অর্থাৎ অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। আর এই মিত্রতার অধীনে তাদের যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তবে তারা পুনরায় মস্তকোত্তলনের প্রয়াস নেয়। আর এদিকে ব্রিটিশরা পুনাদরবারের নানা কার্যকলাপে অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছিল যা অধীনতামূলক মিত্রতার বিপরীত ছিল। দ্বিতীয় বাজীরাও প্রায়শই নানাভাবে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে নানাভাবে প্রশাসনিক ব্যাপারে অপমানিত হতেন এতে মারাঠাদের গৌরব লুণ্ঠিত করেছিল। ১৮৭১ তে পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা প্রধানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেষ চেষ্টা চালায়, যার পরিণতিতে দেখা দেয় তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের তরফ থেকে সর্বান্তঃকরণে প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং বারংবার পেশোয়া, হোলকার ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। পেশোয়াকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তার রাজ্য দখল করা হয় ও তাকে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্দী জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়ার কপালেও একই পরিণাম জোটে। মারাঠাদের আবেগ অনুভূতিতে যাতে উত্তরোত্তর আঘাত না লাগে তাই ব্রিটিশরা সাতারায় একটি রাজতন্ত্রের সূচনা করে যেখানে পুতুল শাসক হয়ে বসেন শিবাজীর উত্তরাধিকারীরা। ফলে দুর্ধর্ষ মারাঠা প্রধানরাও শেষ অব্দি ঔপনিবেশিক শাসনের বলী হন।

৩.৪ মারাঠাদের পতনের কারণ

মারাঠা শক্তি কখনোই নিজেদেরকে মুঘল শাসনের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরতে পারেনি। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করে ব্রিটিশ শক্তি। ফলে মারাঠাদের সর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন কল্পনাই থেকে যায়। শিবাজী ও প্রথম তিনজন পেশোয়ার আমলে মারাঠাদের অসাধারণ রাজনৈতিক সাফল্যের মূলে ছিল তাদের দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলায় মারাঠারা পরাজিত হয় ও চিরতরে তাদের প্রাধান্য হারায়। নিম্নে তাদের পতনের কারণ অলোচিত হল—

প্রথমতঃ, মারাঠাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা মুঘলদের অপেক্ষা কম ছিল না এবং মারাঠা সর্দাররা অনেকটাই পরবর্তীকালের মুঘল অভিজাতদের ন্যায় ছিলেন। শিবাজীর অধীনে যে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটেছিল, তার ফলে মারাঠা নেতারা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ নির্বিশেষে একত্রিত হয়েছিল। শিবাজীর পরে মারাঠা অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের যে প্রাধান্য দেখাদিয়ে ছিল তা রাজনৈতিক সামন্তীকরণের পথ মসৃণ করে দেয়। মারাঠা সর্দাররা কার্যত

স্বাধীন ছিলেন এবং তারা মারাঠা সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে নিজ নিজ রাজ্য গড়ে তোলেন। এই সকল বিবাদমান স্বাধীনতা মারাঠা নেতৃবর্গ যেরূপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিলেন তার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য একটি শিথিল মিত্র সংঘে পরিণত হয়।

বস্তুত মারাঠাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনশীল ছিল না মারাঠারা প্রায়ই দস্যুবৃত্তি ও লুঠতরাজের মাধ্যমে অর্থনীতিকে চালু রাখার প্রয়াস নিত। তারা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের থেকে চৌথা নামে এক প্রকার কর নিত। পুরাকালীন রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় মারাঠারাও বাইরে থেকে আসা অর্থের যোগানের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। কেননা তাদের অর্থনীতি ছিল অউৎপাদনশীল। এ ধরণের ব্যবস্থায় পতন অনিবার্য ছিল। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই নেতিবাচক প্রভাব সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করছিল।

তৃতীয়তঃ, মারাঠা মিত্রসঙ্ঘে প্রধান ছিলেন ৫ জন বড় মাপের মারাঠা নেতা; পুনাস্থিত পেশোয়া, বরোদার গাইকোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ও নাগপুরের ভোঁসলে। তবে এরা কখনোই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো সংহত প্রতিরোধ গড়তে পারেননি, বরং তারা আলাদা আলাদা ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তখন হোলকার নীরব ছিলেন। আর ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া যখন ব্রিটিশদের হাতে পর্যুদস্ত তখন হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। বলাবাহুল্য এই একতার অভাবই মারাঠাদের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

চতুর্থতঃ, শিবাজীর সময় থেকে মারাঠাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল ছিল তাদের নেতৃবর্গের ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো উল্লেখযোগ্য নেতার আবির্ভাব হয় নি। মোটামুটি ১৮ শতকের শেষার্ধে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিভাধর নেতা, যথা— মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকজী হোলকার, নানা ফড়নবীশ পরলোকগমন করেছিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন স্বার্থপর ও বিশ্বাসের অযোগ্য। সুতরাং ডুবন্ত মারাঠা তরণীর হাল ধরার মত কোনো যোগ্য ব্যক্তিত্ব তখন অনুপস্থিত ছিল।

পঞ্চমতঃ, গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ও অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যবহারে মারাঠাদের যে পটুতা ছিল, যা ছিল তাদের ঐতিহ্যিক যুদ্ধনীতি স্বরূপ, তা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের উৎসরূপে বিবেচিত হত। কিন্তু পরবর্তী মারাঠা নেতারা দেশীয় পদ্ধতি ছেড়ে রণক্ষেত্রের পাশ্চাত্য নীতির দিকে ঝোঁকেন ও তারা দেশী বিদেশী উভয় প্রকার যুদ্ধনীতির মধ্যে সাযুজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হন। এর পদ্ধতিতে মারাঠা যুদ্ধনীতি আংশিক দেশী ও আংশিক বিদেশী থাকে, যার ফলে খুব একটা ইতিবাচক হয়নি। মারাঠারা যে ধরণের কামানের গোলা ব্যবহার করত তা ভারী ও সেকেলে ছিল, অন্যদিকে ব্রিটিশরা যে ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ও কামানের গোলা ব্যবহার করত তা গুণগত দিক থেকে অনেক উন্নত ছিল।

সর্বোপরি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মারাঠারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি ও মারাঠা নেতারা নিজেদের একটি সফল অর্থনীতির জনক হিসাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। খাল খনন ও জলাধার নির্মাণ করে জলসেচের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের উষর জমিতেও ফসল ফলানো যেত। কিন্তু মারাঠা নেতারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করেনি ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসঙ্গে নিরুৎসাহ ছিলেন। তারা অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলো। মহারাষ্ট্রের এই পশ্চাদপদ ও বন্ধ্যা চরিত্রই মারাঠা শাসকদের বাধ্য করেছিল আশপাশের রাজ্যগুলিতে লুঠপাট চালাতে। মারাঠা সামন্তরা যে সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছিল তাতে জনগণ তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং এভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও মারাঠা নেতারা তাদের রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পারতেন তবেই হয়ত ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলায় জয়যুক্ত হওয়া যেত।

৩.৫ রঞ্জিত সিংহের পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-শিখ দ্বন্দ্ব

যদিও রঞ্জিত বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা সমূলে প্রতিহত করতে পারেননি, তবে তিনি পাঞ্জাবের জনতাকে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী প্রশাসন দান করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ রঞ্জিত সিংহের মৃত্যু হলে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার ফরে অবতীর্ণ হয়। রঞ্জিতের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন দুর্বল, ফলে স্বার্থলোভী নেতারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপে আসার সুযোগ পায়। পাঞ্জাবের রাজদরবারে শিখ নেতারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করণের যে খেলায় মেতে ওঠেন তার ফলে এক অপরিসীম রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতাপূরণ করে দেশপ্রেমী পাঞ্জাবী সামরিক বাহিনী যারা যাবতীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়। এই বাহিনী সাহসী ও ঋজু হলেও বিশৃঙ্খল ছিল। আর এই আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক চাপান-উতোরের সুযোগটা গ্রহণের অপেক্ষায় ব্রিটিশরা দিন গুনতে থাকে। তারা রঞ্জিত সিংহের সময় থেকে শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ রাজ্যগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল এবং এখন তা পরিপূরণের সুযোগ আসে।

কয়েকটি কারণের জন্য ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৮৪৪ খ্রীঃ পাঞ্জাবে ব্রিটিশ এজেন্টরূপে মেজর ব্রডফুট মনোনীত হন যিনি শিখদের সম্পর্কে যথেষ্ট সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। মেজর, শিখ সর্দার ও সামরিক কর্মচারীদের বারংবার অপমান করে খালসা বাহিনীকে উত্তেজিত করে তোলেন। **দ্বিতীয়তঃ,** শতদ্রু নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ব্রিটিশরা পাঞ্জাব সীমান্তে বাড়তি ফৌজ পাঠাতে থাকে। ব্রিটিশ বাহিনীর এহেন সংখ্যা বৃদ্ধি শিখ সামরিক বাহিনীকে শঙ্কিত করে তোলে এবং তারা ব্রিটিশ আক্রমণের আঁচ পেয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। **তৃতীয়তঃ,** খালসা বাহিনীর ক্ষমতা লাভ আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারাই রাজদরবারের দৈনন্দিন প্রশাসনেও অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সামরিক নেতারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার নজীর রাখে। সামরিক বাহিনীর দৌরাত্মে প্রধান রাজকীয় কর্তাব্যক্তি ও কর্মচারীদের জীবন দূর্দশাগ্রস্ত হয় এবং তারা যেন তেন প্রকারেণ খালসা বাহিনীর প্রতিপত্তি খর্ব করতে উদ্যত হয়। আর তাই রাণী ঝিন্দন কিছু শিখ কর্তা ব্যক্তির প্রভাবে খালসা বাহিনীকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে।

ইংরেজ ও শিখদের লড়াই শুরু হয় ১৮৪৫-এর ১৩ ডিসেম্বর। খালসা বাহিনী নায়কোচিত লড়াই করে। কিন্তু ইংরেজবাহিনী মুডকি, আলিওয়াল, ফিরোজশাহ প্রভৃতি সব লড়াইয়ে শিখদের পরাজিত করে। শিখরা এই অবস্থায় ব্রিটিশদের সঙ্গে লাহোরের সন্ধি (১৮৪২) সাক্ষরে বাধ্য হয়। এর ফলে খালসা বাহিনীর আয়তন হ্রাস পায়, ব্রিটিশরা জলন্ধর, দোয়াব ও কাশ্মীর লাভ করে ও যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ এক বিশাল অঙ্কের টাকা পায়। এই সময় থেকে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লাহোরের রাজদরবারে নিযুক্ত হয়। এরূপেই প্রথম ইঙ্গ-শিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

লাহোরের সন্ধি ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা মেটাতে পারেনি এবং তারা পাঞ্জাবকে নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনে আনতে তৎপর হয়। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা শিখরা লাহোরের সন্ধি মেনে নেয়নি। ফলে আর একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট প্রায়ই দরবারের কার্যকলাপে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতেন। এমনকী জন লরেন্স নামে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বহু প্রভাবশালী শিখ প্রধানদের অপদস্ত ও ক্ষমতাচ্যুত করে ছিলেন। তবে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থিতিই শিখদের বেশী করে ভাবায়, আর ব্রিটিশরাও কখনোই বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়নি। রাণী ঝিন্দন শিখ রাজ্যাংশের এক্তিয়ারে যে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্যমান ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হন এবং ব্রিটিশরা তাকে গ্রেপ্তার করে চুনারে প্রেরণ করে, এ সবের ফলে ১৮৪৮ খ্রীঃ শিখরা বিদ্রোহ করে এবং মূলরাজ ও চত্বর সিংহের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে মূলতান ও লাহোরের বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও এভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূচনা হয়। বিনিওয়ান ওয়ালার যুদ্ধে (১৮৪৯) ব্রিটিশরা শিখদের সমূলে

উৎপাটিত করে। এবং কিছুকাল পর ১৮৪৯ এর মার্চে ঘোষিত সরকারী নির্দেশনামার বলে ডালহৌসী পাঞ্জাবকে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনেন। এই সময় খালসা বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় ও রাজা দিলীপ সিং ব্রিটিশের হাতে বন্দী হন। এভাবে ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩.৬ শিখদের পতনের কারণ

এই অনুসন্ধান করতে হবে রঞ্জিত সিংহের সময় থেকে। এই কথা সত্য যে তিনি শিখদের একটি জাতীয় রাজতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তিনি সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশে উৎসাহ দেন। যেহেতু শিখরাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল ছিল, তাই রঞ্জিত সিং বিশাল সংখ্যক সামরিক বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করার সুযোগ পাননি। তাই তিনি বেতনের বদলে সেনাদের জাগীর দান করে থাকেন। আর এইভাবে ভূমিভিত্তিক সামরিক অভিজাতদের একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখ সামন্তরা পরবর্তীকালীন মুঘল অভিজাতদের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি ন্যূনতম বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। **দ্বিতীয়তঃ,** রঞ্জিত সিংহের ন্যায় শক্তিশালী শাসকের অধীনে শিখ সর্দাররা তাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশদের দমনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কিন্তু রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরাধিকারীরা ছিল দুর্বল। ফলে সমস্যা দেখা দেয় তখন। এই সময় সর্দারদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দরবারের রাজনীতির প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। **তৃতীয়তঃ,** জাগীর ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর মজবুত ভিত্তিতে ফাটল ধরায় এবং এই বাহিনীর বিশৃঙ্খল চরিত্রে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে তা সরকারের সম্পদ নয়, বোঝা হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ,** রঞ্জিত সিংহ খালসা বাহিনীকে নায়কোচিত সাহসিকতা ও মর্যাদার প্রতীকরূপে প্রতিপন্ন করেছিলেন। এই বাহিনী ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে চূড়ান্ত দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। কিন্তু সামরিক অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে ব্রিটিশদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। সর্বোপরি রঞ্জিত সিংহ ব্রিটিশ আগ্রাসনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রতিহত করতে পারেননি। অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরের ফলে তিনি তার উত্তরাধিকারীদের স্কন্ধে এক গুরুতর সমস্যার ভার অর্পন করেন। তিনি নিজ রাজ্যকে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ আগ্রাসনের থেকে রক্ষার জন্য এই সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তবে এ ব্যাপারে তিনি যদি আর একটু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতেন ও দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতেন তবে হয়ত পাঞ্জাবের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

৩.৭ ১৭৭৩ রেগুলেটিং আইন এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোঃ যখন ভারতে রাজ্যজয়ের প্রকল্পে নিয়োজিত হয় তখন ব্রিটিশদের এই নতুন সাম্রাজ্যে কীভাবে ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোম্পানী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কিন্তু অপ্রিয় প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং ব্রিটেনে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একটি বেসরকারী কোম্পানী কোনো সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা হবে তা ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মনঃপুত হয়নি। ১৮৩৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ পুণর্নবীকরণের সময় টমাস মেকলে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে সকল প্রকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিরল নিদর্শনরূপে দেখেছেন। **দ্বিতীয়তঃ,** ব্রিটিশরা ভারতে তাদের আধিপত্যকে বৈধতা ও যথার্থতা দান করতে চেয়েছিল, কেননা তাদের বিজেতা ভাবমূর্তি গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদের পরিপন্থী ছিল। **তৃতীয়তঃ,** ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কোম্পানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্যাংশ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট চিন্তা ছিল। ফলে ভারতে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ

অপরিহার্য হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ, ইষ্ট ইন্ডিয়া** কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ইংল্যান্ডে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোম্পানীর যেসব কর্মচারীরা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ভারত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেন 'নবাব' রূপে পরিচিত হতেন, সেই সময় ব্রিটিশদের মনে এরূপ ভীতির উদ্রেক হয় যে এই নবাবরা তাদের অর্থবলে সংসদীয় রাজনীতিতে নাক গলাবে এবং ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বিশেষতঃ, অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকরা ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরোধী ছিল। এই অবাধ বাণিজ্যকারীরা ভারতীয় ব্যবসা এবং ভারতীয় ধনসম্পদে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, সে ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এরূপ প্রেক্ষাপটে রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

১৭৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সংসদ কোম্পানীর ক্ষমতা সীমিত করতে চায়। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানীর ডাইরেক্টররা ভারতের বেসামরিক, সামরিক ও রাজস্বজনিত ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হাজিরা দিতে বাধ্য হয়। পূর্বে গভর্নর জেনারেল ও চার সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ বাংলার শাসনভার যেভাবে পরিচালনা করত, বর্তমানে তা বাতিল করা হয়। এই সময় অন্য দুই প্রেসিডেন্সীর সরকারকেও বাংলা সরকারের অধীনস্থে পরিণত করা হয়। এর পাশাপাশি বম্বে বা মাদ্রাজের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন বা যুদ্ধ করার অধিকার হারায়। এই আইনানুযায়ী ইউরোপীয় ও তাদের কর্মচারীদের প্রতি ন্যায়বিচার পোষণের আশায় কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের প্রস্তাবনা নেওয়া হয় ও ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় প্রথম সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রথম সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পে। এই সময় থেকে বাংলার গভর্নর, গভর্নর জেনারেলরূপে পরিচিত হতে থাকেন এবং হেস্টিংস ছিলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল। বস্তুত গভর্নর জেনারেল তাঁর কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলায় শাসনভার পরিচালনা করে থাকতেন, তার কাউন্সিলের যেকেনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্ণীত হত। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অমান্য করার কোনো ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের ছিল না। যদিও তিনি অনেক সময় নির্ণায়ক ভোট দিতে পারতেন।

কোম্পানীকে পরিচালনা করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এহেন পদক্ষেপগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর উপর সেভাবে তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি। এই আইনের কিছু ত্রুটী ছিল, যার ফলে সেই অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনায় সমস্যা দেখা যায়, এই আইনের অধীনে গভর্নর জেনারেলের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তিনি পুরোপুরি কাউন্সিল-এর দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কাউন্সিল-এর তিন সদস্য একত্রিত হলে তারা গভর্নর জেনারেলের যেকোনো সিদ্ধান্ত রুখে দিতে পারত। প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংসের সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের মধ্যে মতানৈক্য হয়। ফলে শাসন পরিচালনা দুস্কর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীকে বাংলার অধীনে আনার চেষ্টা হল, বাস্তবে বাংলার গভর্নর জেনারেল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ওপর সেভাবে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে নি। অনেক সময়ই প্রয়োজনের খাতিরে আলোচ্য প্রেসিডেন্সী দুটির শাসকরা বাংলায় গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করতেন।

তৃতীয়তঃ, রেগুলেটিং আইনের মাধ্যমে কোম্পানী ও তার ইংল্যান্ডস্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় নি। কোম্পানীর সমালোচক গোষ্ঠীরা তখনো পর্যন্ত কোম্পানীর পরিকাঠামোয় শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ব্রিটিশ সংসদের উপর চাপ দিতে থাক। সর্বোপরি রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হলে তার দ্বারা স্পষ্টভাবে এই আদালতের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট হয়নি, এমনকী গভর্নর জেনারেল ক্ষমতার কিরূপ বিস্তার ঘটাবেন তাও অনির্দিষ্ট

ছিল। যেহেতু সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার নির্দিষ্ট রূপে ধার্য ছিল না, তাই সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। এই আইনের সীমাবদ্ধতাগুলি তার কার্যকারণের পরে পরেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

রেগুলেটিং আইন জনিত বিবিধ সমস্যা এবং কোম্পানীর বিরোধী গোষ্ঠীগুলির চাপে পড়ে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৪ খ্রীঃ পিটের ভারত আইন প্রণয়ন করে। এই আইনটি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটের নামে পরিচিত হয়। এই আইনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকার শেষ অব্দি ভারতীয় প্রশাসনের উপর তার আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়। এই আইনানুযায়ী ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হয়, যার হাতে তত্ত্বধানমূলক ক্ষমতা ছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোল, ভারতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং কোম্পানী সরকারকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ভোগ করত। এমনকী আপদ্‌কালীন সময়ে ডাইরেক্টরদের একটি গোপন কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ভারতে নির্দেশ প্রেরণ করতে পারত। ফলে ভারতের উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হল, যা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে বলবৎ হয়ে থাকত। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থা চলেছিল এবং ঐ বছর ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতীয় উপনিবেশের দায়িত্ব নিয়েছিল। পিটের ভারত আইন প্রণীত হলে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, কেননা পূর্ববর্তী রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর পক্ষ ছেদন করা হয়েছিল। পিটের ভারত আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অধিকার কাউন্সিল হারায়। এই সময় থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাউন্সিলের একজন মাত্র সদস্যের সমর্থনই গভর্নর জেনারেলের কাম্য ছিল। এছাড়া যুদ্ধ, কূটনীতি ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয় বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বাংলা প্রেসিডেন্সীর অভিভাবকত্ব লাভ করে। পিটের ভারত আইনের তাৎপর্য হল এই যে এরপর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বৃহত্তর ব্রিটিশ স্বার্থ পূরণের একটি মাধ্যমে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অভিলাষ পূরণের জন্য ভারতের সহস্রাধিক জনগণকে বঞ্চিত করা হয়।

পিটের ভারত আইন অনুযায়ী প্রশাসন সম্পর্কে যে বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। যদিও মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৬ সালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত অমান্য করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৯৩ তে সনদ আইননুযায়ী গভর্নর জেলারেলের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীও মোটামুটি সমস্যাবিহীনভাবে কাজ চালাতে পারে। তবে ১৮৩৩-এর সনদ আইনানুযায়ী বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আইনী ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং একমাত্র বাংলার গভর্নর জেনারেলই আইনী ক্ষমতা ভোগের চূড়ান্ত অধিকার পায়। ১৮৩৩ এর সনদ আইন বাংলার গভর্নর জেনারেলের নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ তিনি এখন থেকে বাংলার গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে ভারতের গভর্নর জেনারেলরূপে পরিচিত হন, যার হাতে যাবতীয় সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ছিলেন ১৮৩৩ এর সনদ আইনানুযায়ী ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। গভর্নর জেনারেলের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, বস্তুত এই সময় ভারতে একটি নতুন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিকাশ ঘটে। ইংল্যান্ডের সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আইনী পদক্ষেপের মূলে ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর ক্ষমতা সঙ্কোচন এবং কোম্পানীকে বাধ্য করা হয় ব্রিটেনের বিবিধ বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক স্বার্থের সমপূরক হতে। ১৮৩৩ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রশ্নে ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পূর্বের ছায়ায় পর্যবসিত হয়। সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার কখনোই প্রকৃত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়নি।

৩.৮ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

ভারতে কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ও অধিকৃত রাজ্যাংশের নিরাপত্তার দরুণ যেরূপ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে, তা ছিল তাদের আগ্রাসনাত্মক নীতি গ্রহণের পটভূমি। তারা যখনই প্রয়োজন পড়ত তখনই পাশব শক্তি প্রয়োগ করে থাকত, আবার অনেক সময় অধীনতামূলক মিত্রতা বা স্বত্ব বিলোপের মাধ্যমে বিনারক্তপাতের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করত। আগ্রাসনাত্মক নীতির চেহারা যাই হোক না কেন তার লক্ষণ প্রথম পরিস্ফুট হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, তবে লর্ড ওয়েলেসলীর হাতেই তা চূড়ান্ত রূপ পায়। তিনি অতি দ্রুত সংখ্যাধিক ভারতীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ ছত্রছায়া তলে আনতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ইংল্যান্ডের সমাজ ও অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে ভারতে ব্রিটিশ নীতির ভাঙা গড়া চলে।

এই সময় ব্রিটেনে শিল্পপতি শ্রেণীগুলির নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের আদর্শ বাজার হলে ভালো হত। সুতরাং ভারতের বাজার দখলের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজ্য দখলের নীতি। **দ্বিতীয়তঃ,** ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল ও সেই সূত্রে ভারতে ফরাসী আধিপত্য প্রসার ব্রিটিশরা প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফরাসীরা যাতে এখানে কোনো সামরিক ঘাঁটি তৈরী করতে না পারে বা দেশীয় রাজ্যগুলি যাতে তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয় তাই ওয়েলেসলী অনেক ভেবেচিন্তেই সামরিক শক্তির প্রয়োগ ছেড়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি বেছে নেন। এই নীতির মাধ্যমে বিনা রক্তপাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল। এই নীতির মুখ্য শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) একমাত্র অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের মাধ্যমেই কোনো দেশীয় রাজ্য কোম্পানী সরকারের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। (২) কোম্পানীর সেই মিত্ররাজাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার সামরিক বাহিনী ভেঙে দিতে হবে। (৩) কোম্পানীর সশস্ত্র বাহিনী সেই মিত্র রাজ্যকে সামরিক সুরক্ষা দেবে, (৪) নিজ রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে কোম্পানীর বাহিনী মোতায়েনের দরুণ মিত্র রাজাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে বার্ষিকরূপে অর্থ প্রদান না করে তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর জন্য ছেড়ে দিলেও এই শর্ত পূরিত হবে। (৫) ইংরেজ কোম্পানীর অনুমোদন ব্যতীত মিত্ররাজা কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না, বা তাঁর রাজ্যে কোনো বিদেশীকে কর্মচারী রূপে নিযুক্ত করতে পারবেন না। (৬) অধীনতামূলক মিত্রতা অনুযায়ী মিত্ররাজা তার দরবার বা রাজসভায় একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মোতায়েনে বাধ্য থাকবেন। (৭) কোম্পানী এহেন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে মিত্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেকোনো ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না, তবে এই প্রতিশ্রুতি সে কোনোদিনই পালন করেনি।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির পশ্চাতে ব্রিটিশদের যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই নীতি যেসব দেশীয় রাজা গ্রহণ করে তাদের সার্বভৌমত্ব বলতে আর কিছুই ছিল না। তারা আত্মনিরাপত্তার পাশে পাশে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে নিজেদের বিবাদ মেটানোর অধিকারও হারিয়েছিল। সর্বোপরি ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিতির জন্য স্বাধীনভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজামই সর্বপ্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন। মারাঠা ও মহীশূরের অধিপতিরা এই নীতি গ্রহণে অসম্মত হন বলেই তাদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামরিক এই নীতি ব্রিটিশদের পক্ষে খুবই লাভজনক বিবেচিত হয়।

৩.৯ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক গৃহীত রাজ্যবিস্তার নীতি (১৮৪৮-'৫৬)

১৮৪৮ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসী গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে পদার্পন করেন। তিনি অতি উৎসাহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন, যার পরিণতিতে অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ— ভারতীয় সাম্রাজ্য সর্বোচ্চোরূপে বিস্তার লাভ করে। ১৮ শতকের শেষার্ধ্বে ও ১৯ শতকে দেশীয় রাজাদের প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকরা খুবই নির্দয় মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মধ্যে সেই রাজারা ছিলেন অরাজকতা ও করুনাহীনতার প্রতীক। ডালহৌসীও দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন না এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার থেকে ভারতকে রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তার এরূপ আপাত উদারনৈতিক চিন্তাধারার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদের অন্তহীন লালসা লুকিয়েছিল। এই সময় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব তার তুঙ্গে পৌঁছেছিল। ও ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা তাদের ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর জন্য ভারতের বাজার প্রশস্ত করতে চেয়েছিল। দেশীয় রাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে ডালহৌসী এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছিলেন।

ডালহৌসী ছিলেন স্বতঃবিলোপ নীতির জনক। এই নীতির পরিণতিতে দেশীয় রাজারা পুরুষ সন্তান দত্তক নেবার অধিকার হারান। এই নীতির মাধ্যমে একথা বলা হয়েছে যদি কোনো রাজা পুত্রসন্তান না থাকে তবে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশরা অধিগ্রহণ করবে। পূর্বে অপুত্রক রাজারা তাদের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকার পেতেন এবং পুত্র সন্তান দত্তক নেবার প্রথা খুবই প্রাচীন ছিল। এমনকী হিন্দু ধর্মেও পুত্র দত্তক নেবার কথা বলা আছে। এবং ধর্মানুযায়ী সেই দত্তক পুত্র পিতার মৃত্যুর পর তার পারলৌকিক কাজ করতে পারবে। এদিক থেকে, স্বত্ববিলোপ নীতি ছিল দেশীয় রাজার ঐতিহ্যিক অধিকার খর্ব করার প্রয়াস। এমনকী পূর্বে ব্রিটিশরা যেসব রাজাকে দত্তক নেবার অনুমতি দিয়েছিল বর্তমানে সেই দত্তক পুত্রের অধিকারও বাতিল করা হল। স্বত্ববিলোপ নীতি কোম্পানীর লাভের কড়ি পূর্ণ করেছিল ও তারা এরূপে সাতারা, নাগপুর ও ঝাঁসির রাজ্য গ্রাস করেছিল।

স্বত্ববিলোপনীতি ছাড়াও ডালহৌসীর পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেলদের অনুসৃত সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অবলম্বন করেন। এরই পরিণতিতে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর, ১৮৪৯ খ্রীঃ ব্রিটিশরা পুরোপুরি পাঞ্জাব দখলে সমর্থ হয়। ১৮৫২ তে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়লাভের ফলে সাম্রাজ্যের পূর্বসীমানা সালউইন নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উত্তরে সিকিম ডালহৌসির হস্তগত হয়। এবং তিনি নিজামের থেকে বেরার দখল করেন। বলা যায় এরূপে ডালহৌসির আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বোচ্চো সীমান্তে পৌঁছায়।

কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে ডালহৌসী অনেক দেশীয় রাজার রাজ্য কেড়ে নেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীর কথা বলতে পারি, যাকে এই অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত করা হয়। একথা বলা বোধহয় অযৌক্তিক নয় যে বিভিন্ন দেশীয় রাজার রাজদরবারে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরাই রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি তথাকথিত জনহিতৈষণা থেকে ডালহৌসী যে ভারতে ব্রিটিশ বাজার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন এরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল। বস্তুত জনহিতৈষণা দূরে থাক, বরং ভারতকে ব্রিটিশ দ্রব্যের বাজার ও ব্রিটেনে সরবরাহকৃত কাঁচামালের উৎসরূপেই শাসকরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলা যায় প্রজাকল্যাণের নামে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন দেশীয় রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল। তবে উপরমহলে এমন কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি যা ভারতীয় জনতার উপর চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। বরং ব্রিটিশদের অবলম্বিত নীতি ভারতীয় রাজা, মহারাজা ও তাদের পরিবারের উপর বিধ্বংসী ঘূর্ণবাতের মত আছড়ে পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

T. R. Metcalfe — Ideologies of the Raj.
Sekhar Bandyopadhyay — From Plassey to Partition.
Sumit Sarkar — Modern India.
Peter Robb — A History of India.
Bipan Chandra — India is struggle for Independence.

৩.১১ অনুশীলনী

১. ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ ও পরিণাম সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. হায়দর আলীর কৃতিত্ব নিয়ে অলোচনা কর।
৩. ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সম্পর্ক আলোচনা কর। এবং মহীশূরের পতনের কারণ উল্লেখ কর।
৪. ইংরেজ ও মারাঠাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কর।
৫. শিখ জাতির অভ্যুত্থানের পিছনে রণজিৎ সিংহের ভূমিকা আলোচনা কর।
৬. শিখদের পতনের কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. 'Doctrine of Lapse' ডক্ট্রিন অফ্ ল্যাপ্স' বলতে কি বোঝ? এই নীতি প্রবর্তনের ফলাফল আলোচনা কর।
৮. 'Subsidiary Alliance' 'সাবসিডিয়ারী এ্যালায়ান্স' প্রবর্তনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কতটা সম্ভব হয়েছিল।
৯. মারাঠা শক্তির পতনের কারণ আলোচনা কর।

একক ৪ ❑ মহা বিদ্রোহ (১৮৫৭)

গঠন

৪.০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ

৪.১ সামরিক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান এবং কৃষক বিদ্রোহ

৪.২ রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ

৪.৩ কোল বিদ্রোহ

৪.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)

৪.৫ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

৪.৬ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

৪.৭ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উৎপত্তি

৪.৮ মহাবিদ্রোহের ইতিহাস

৪.৯ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি

৪.১০ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

৪.১১ মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১৩ অনুশীলনী

৪.০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ—১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কিত বিতর্ক

ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণ ও আধিপত্য স্থাপনের চরিত্র ছিল পূর্ববর্তী সকল বৈদেশিক চরিত্রের থেকে ভিন্ন। পূর্বে বৈদেশিক অধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে কেবল সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হয় কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন প্রভাব সাধারণ ভারতীয়ের ওপর পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণের চরিত্র গুণগতভাবেও ভিন্ন ছিল । এই অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত করা হয় ব্রিটেনের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গিকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল আমদানী ও তার অন্তঃপ্রবাহ ভারতীয় হস্তশিল্পের পরিসরে যেমন দুর্ভাগ্যের সংকেত বয়ে আনে তেমনি কৃষি পরিসরও যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐতিহ্যিক শিল্পের পতনের ওপর, পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় নতুন শিল্পের প্রতিস্থাপন হয়নি। ফলে শিল্পবিচ্যুত কারিগররা অবধারিত ভাবেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে যার দ্বারা জমি এবং কৃষক উভয়েই চাপের সম্মুখীন হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধগুলিকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—১. অসামরিক বিদ্রোহ, ২. উপজাতীয় উত্থান এবং ৩. কৃষক বিদ্রোহ।

৪.১ সামরিক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান এবং কৃষক বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনতার অসন্তোষ প্রাথমিকভাবে অসামরিক বিদ্রোহের রূপ নেয় যা পরিচালিত হয়েছিল ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা পদচ্যুত ভারতীয় রাজকর্মচারী, জমিদার, কর্মবিচ্যুত মুঘল সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা। ভারতীয় কৃষক এবং কারিগরদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজ শাসন সৃষ্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কথা বলা যায়, যাকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলা হয়। এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও বাংলার অধিকারচ্যুত জমিদারদের দ্বারা (১৭৬৩—১৮০০) এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কর্মবিচ্যুত সেনাগন, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক শ্রেণী, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যারা কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। চুয়াড় বিদ্রোহও ছিল একটি অসামরিক অভ্যুত্থান যা বাংলা এবং বিহারের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উত্থিত হয়। (১৭৬৬-১৭৭২)। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এইরূপ অভ্যুত্থান সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল ঐতিহ্যিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন। ঔপনিবেশিক শাসকের সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের পন্থা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি আলগা করে দেয়। ফলে ঐতিহ্যিক অর্থনীতিকে পুনর্বহাল করার তাগিদে জমিদার, কৃষক সকলেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধের ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতা এত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে, ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজ কোম্পানী শাসনের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ১৮৫৭ খ্রীঃ এর মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত তা বারে বারে দেখা যায়। তবে ১৮৫৭-র পর কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কারণ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজারা হয় পুরোপুরি ধ্বংস হয় নয়ত কোন কোনও ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রধান শক্তি হিসেবে কৃষকরাই বিদ্রোহ পরিচালনা করে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। এই উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় হলেন ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ। তারা সাধারণত অরণ্যপার্বত্য অঞ্চলে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে জমি চাষবাস এবং জঙ্গলের কাঠ, ফল-মূল প্রভৃতি ভোগ করতেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কোম্পানী এই সকল অঞ্চলে তাদের পরিকল্পনা মত ভূমি বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করে। এই কাজে তারা জমিদারদের ব্যবহার করে। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা ও মিশনারীদের কার্যকলাপ আদিবাসী অঞ্চলে চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিদা আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ ও মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হন। ফলে তাদের ক্ষোভ বিদ্রোহের পথে পরিচালিত হয়। তাদের অসংখ্য বিদ্রোহের মধ্যে কোল বিদ্রোহ (১৮২০-১৮৩৭) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এদেশীয় কৃষক শ্রেণী। ফলে প্রথমদিকের অসামরিক বিদ্রোহগুলির মেরুদন্ড ছিলেন এই কৃষক শ্রেণী। তবে বিশেষ সরকারি নথিপত্র না থাকায় সকল কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারিনা। কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহ আবার ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ওয়াহাবী আন্দোলন। ফরাজী আন্দোলন, কুকা আন্দোলন প্রভৃতি।

৪.২ রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের ফলে গোটা রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা ছারখার হয়ে যায়। এই অঞ্চলের পুরাতন জমিদাররা দেবী সিংহের বাড়তি রাজস্ব

দিতে না পারায় তাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর দেবী সিংহ প্রজাদের যথাসর্বস্ব রাজস্বের জন্য লুঠ করতে থাকেন। এর প্রতিবাদে প্রজারা নুরুলউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে নবাব ঘোষণা করে সরকারকে খাজনা প্রদান বন্ধ করে। গোটা উত্তর বাংলায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে হেস্টিংসের নির্দেশে সেনা মোগলাহাটের যুদ্ধে নরুলউদ্দিনকে বন্দী করে এবং পাট গ্রামের যুদ্ধে বহু কৃষক বিদ্রোহীদের নিহত করে। দেবী সিংহ বহু রাজস্ব আত্মসাৎ করায় তাকে পদচ্যুত করে অন্য লোককে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। হেস্টিংস তার আশ্রিত দেবী সিংহকে 'রাজা' উপাধি দেন। লুঠ করা অর্থের দ্বারা জমিদারী কিনে দেবী সিংহ নসীপুরের জমিদারীর পত্তন করেন।

রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অবশ্যই অনুধাবন যোগ্য। প্রথমতঃ দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা একটি জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষক বিদ্রোহ। তৃতীয়তঃ, এই বিদ্রোহ ইজারাদারদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্তি দিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীর দমন সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা তাদের দাবীর প্রতিই অনুগত ছিল। শেষাবধি এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত অর্থে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজস্ব নীতির ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার প্রকাশ ঘটেছিল ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে।

৪.৩ কোল বিদ্রোহ (১৮৩২)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। এই উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় হলেন ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ। ভারতবর্ষে এই আদিবাসী সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁ, মুন্ডা প্রভৃতি। এঁরা সাধারণত অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে জমি চাষআবাদ এবং জঙ্গলের কাঠ, ফলমূল প্রভৃতি ভোগ করতেন। ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কোম্পানী এই সকল অঞ্চলে তাদের পরিকল্পনামত ভূমি বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করে। এই কাজে তারা জমিদারদের ব্যবহার করে। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিদে আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ এবং মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হন। তার উপর ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। ফলে আদিবাসীদের ক্ষোভ প্রকাশ পায় এবং সেই ক্ষোভ বিদ্রোহের পথে চালিত হয়।

ছোটনাগপুর অঞ্চল ১৮২০ খ্রীঃ এ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় আসে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় কোলদের ঐতিহ্যিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। কোম্পানী সরকার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলের জমিগুলি ইজারা দেয়। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ছিলেন প্রধানত হিন্দু, শিখ অথবা মুসলিম মহাজন। কোল সম্প্রদায় এদের বহিরাগত ডিকু নামে সম্বোধন করতেন। ভূস্বামী এবং ইজারাদাররা কিভাবে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করা যায় কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সচেতন ছিলেন। ফলে কোলদের ওপর রাজস্বের চাপ বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কোলরা তাদের বহু জমি হারায় কেবল রাজস্ব না দিতে পারার পরিণামে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইজারাদাররা নানারকম আইনী বেআইনী উপরিকর আদায় করত কোলদের কাছ থেকে। অন্যথায় জমিদার ও তার প্রতিনিধিদের অত্যাচার ছিল অবধারিত। সরলমতি কোলদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হয়। তাদের ঠিকাদার হিসেবে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয় কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কোন পারিশ্রমিক পেত না। এই উপাজতি সম্প্রদায় ছিলেন মাদকাসক্ত, যা তারা স্বগৃহে উৎপাদন করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার মদের ওপর কর আরোপ করে। কোলদের জমিকে ইংরেজ সরকার আফিমের মত লাভজনক পণ্যশস্য উৎপাদন করতে থাকে, যা চাষ করতে কোলরা প্রত্যাখ্যান

করেছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কোলরা অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। কোল নেতা বুদ্ধু ভগৎ, জোয়া ভগৎ, ঝিন্দরাই মানাকি এবং সুই মুন্ডা কোলদের সংগঠিত করে। ১৮৩২ খ্রীঃ রাঁচীর মুন্ডা ও ওরাওঁ সম্প্রদায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়। ক্রমশ সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কোলরা বহিরাগত ডিকুদের ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। J. C. Jha মন্তব্য করেছেন কোল বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতির দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহ দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে সিংভূম, মানভূম হজারিবাগ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে। যদিও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে উপজাতিদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা তথাপি এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেত্রে আঘাত হেনেছিল। কোলরা ভূস্বামী, ইজারাদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ী এবং ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। কোলদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য ক্যাপটেন উইলকিনসনের অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করা হয়। প্রবল বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে কোলরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ কৌশল ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের কাছে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রায় দুবছরের প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণী এই অঞ্চলের স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ শাসকরা বহু কোল প্রাণের বিনিময়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কোল বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় আদিবাসী শ্রেণীর প্রতি তাদের প্রশাসনিক নীতিকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উপলব্ধি করেন, সাধারণ আইন উপজাতীয় প্রেক্ষিতের সঙ্গে সাজুয্য রেখে চলতে পারে না। এই অঞ্চলগুলি ভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাবী করে। মহাজন ও ভূস্বামীর হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষার জন্য কিছু নিশ্চিৎ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারমূলক চরিত্র কিন্তু কোল বিদ্রোহের পরেও স্বমহিমায় উপস্থিত ছিল।

৪.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ—১৮৫৫

সাঁওতালরা ছিল পরিশ্রমী, সরলমতি, কৃষিজীবী উপজাতি বা আদিবাসী শ্রেণী। এরা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যভাগে 'দামিন-ই-কো' নামক অঞ্চলে বাস করত। পরে এরা প্রধানত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ব্রিটিশ ক্ষমতার বিস্তৃতির সাথে সাথে সাঁওতালদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। তারা জমি হারাতে হারাতে ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরতে থাকে এবং সেখানেই তাদের নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই অঞ্চলটিকে তারা 'দামিন-ই-কো' নামে সম্বোধন করত। ১৮৫১ সালে এই 'দামিন-ই-কো' অঞ্চলে প্রায় ১৪৩৭টি সাঁওতাল গ্রাম ছিল এবং প্রায় ৮২,৭১৫ জন সাঁওতাল আদিবাসী এখানে বাস করত।

১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতালরা ডিকু বা বহিরাগতদের বিতাড়িত করতে দৃঢ় সংকল্প হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণগুলি শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, সেগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালরা ভূমিউদ্ধার বা সংস্করণের কাজ খুব সাফল্যের সঙ্গে করত। তারা পরিশ্রমের জোরে অনুর্বর জমিকে উর্বর করে তুলেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগী এদেশীয় জমিদাররা বেআইনীভাবে সাঁওতালদের জমি দখল করতে থাকে। কিন্তু এই দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায় কোনক্রমেই ব্রিটিশ শাসনের বজ্র আঁটুনী থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। এমন কি 'দামিন-ই-কো' পরিত্যাগও তাদের মুক্তি দেয়নি। **দ্বিতীয়তঃ**, ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের ওপর উচ্চ ভূমিকর আরোপ করে যা বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে ইজারাদার, জমিদার, এবং মহাজনরা, যাদেরকে সাঁওতালরা ডিকু নামে সম্বোধন করত। ব্রিটিশ সরকারকে উচ্চ রাজস্ব প্রদান করতে গিয়ে সাঁওতালদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার

করতে হত। একবার এই ধারের কবলে পড়লে তার থেকেমুক্তির আর কোন উপায় ছিল না। কারণ সুদের হার ছিল অস্বাভাবিক বেশী, যা সাধারণত ৫০ শতাংশ থেকে ৫০০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। এই ঋণের সুযোগে মহাজনরা তাদের জমিতে সাঁওতালদের বেগার খাটিয়ে নিত। সুতরাং তারা মহাজনের অধীনে দাসে পরিণত হত। এইভাবে সাঁওতালদের অবস্থার অবনতি ঘটতে ঘটতে তারা ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। **তৃতীয়তঃ,** প্রাত্যহিক জীবনেও সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যা আগে কখনও তা হয়নি। যেহেতু তারা পরিমাপের নিয়ম নীতি এবং আধুনিক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না তাই তাদের বিভিন্নভাবে ঠকানো হত। **চতুর্থতঃ,** সাঁওতালরা ডিকুদের বর্বরতার শিকার হয়। প্রায়ই তাদের মারধোর করা হত, অপমানের শিকার হতে হত। নারীদের ওপর মহাজনদের প্রতিনিধি, ইজারাদার, ইওরোপীয় রেলকর্মী ও অন্যান্যরা অত্যাচার চালাত। **পঞ্চমতঃ,** ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সাঁওতালদের জীবনযাত্রার গুনগত মাপের অবনতি ঘটে। কারণ তারা যে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় অভ্যস্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন আইন আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কোন খামতি ছিল না। **ষষ্ঠতঃ,** সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপকে সাঁওতালরা প্রশ্রয় দিতে পারেনি। সর্বোপরি সাঁওতালরা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল। ঈশ্বর সর্বদা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে এই বিশ্বাসই সাঁওতালদের আন্দোলনমুখী হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগায়। 'Calcutta Review' নামে সমসাময়িক একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"Zamindars, the police, the revenue and court amlas have exercised a combined system of extortions, oppressive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. Usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 percent; false measures at the haat and the market; wilful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered cattle, tattoos, ponies and even elephants, on the growing cropes of the poorer race; and such like illegalities have been prevalent.

প্রথমে সাঁওতালরা চুক্তির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থাই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তারা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ফলপ্রসু না হওয়ায় সাঁওতালরা বিদ্রোহের পন্থা গ্রহণ করে। ১৮৫০ সালের ৩০ শে জুন ভাগনাডিহির সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা সংগঠিত হয় এবং ১০,০০০ সাঁওতালকে নিয়ে তারা একটি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গড়ে তোলে। তারা বিশ্বাস করত শুভ ও অশুভের যুদ্ধে শুভশক্তিরই জয় হয়। সিধু, কানু ঘোষণা করেন যে, "ঈশ্বরের নির্দেশ তারা পেয়েছেন। শক্তির বিনাশের জন্য সাঁওতালদের বিদ্রোহ করা দরকার"। "হুল-হুল" অর্থাৎ বিদ্রোহের ঘোষণা জারি হলে সাঁওতালদের মধ্যে এক অসাধারণ উন্মাদনা ও একতা দেখা দেয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সাঁওতালদের প্রতি সমর্থন জানায়। দিঘী থানার দারোগা মহেশ দত্ত সিধুকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় নিহত হন। এরপর বিদ্রোহী সাঁওতালরা জমিদার মহাজনদের গৃহে ব্যাপক লুঠপাট করেন, সরকারী শাসনকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেন। বহু কুঠী ও নীলের ফ্যাক্টরী ধ্বংস করা হয়। সাঁওতালদের দমনের জন্যে ভাগলপুর থেকে মেজর বারোচাকে পাঠান হলে পীরপাইতির যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। পাকুড়ের রাজপরিবার সাঁওতাল কৃষকদের শোষণের জন্যে কুখ্যাত ছিল। সাঁওতালরা ১৮৫৫ খ্রীঃ ১২ই জুলাই স্থানীয় কৃষকদের সাহায্যে পাকুড় রাজবাড়ী লুঠ করেন। এরপর মুর্শিদাবাদ, রাজমহল সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। লর্ড ডালহৌসী সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক আইন জারি করেন। এবং দানাপুর প্রভৃতি সামরিক ঘাঁটি থেকে সৈন্য আনেন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা পরিচালিত এক বাহিনী সাঁওতাল পরগণার বারহাইতের যুদ্ধে সাঁওতালদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। চাঁদ ও ভৈরব নিহত হন। ইংরাজ সেনাদলের আক্রমণে বীরভূম থেকে সাঁওতালরা পালাতে বাধ্য হন। সিধু ও কানু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। বহু সাঁওতাল বীরের মত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ দমিত হয়। সরকার অধিকাংশ

সাঁওতালদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সিধু ও কানু ইংরাজ সেনার গুলিতে নিহত হন। সরকার সাঁওতালদের সুশাসনের জন্য ভাগলপুর ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামক অঞ্চল গঠন করেন। সরকারী কর্মচারীদের জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রাম প্রধান বা গাঁও মাঝিকে সম্মান দেওয়া হয়। তবে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। রণজিৎ গুহ তাঁর "Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India"-তে মন্তব্য করেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিরোধ স্বরূপই এই বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল। যদিও এই বিদ্রোহ ছিল এক দুর্বল শ্রেণীর বিদ্রোহ তথাপি অপরাপর শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল। রঞ্জিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে—একদল ডাকাতদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ অগ্রবর্তী হয়েছিল। ১৮৫৪-র বিরাট সংখ্যক এদেশীয় ডাকাত মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং সাঁওতালদের পক্ষে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় চরিত্র দান করতে চেয়েছেন, তথাপি এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র ছিল অর্থনৈতিক। যদিও সাঁওতালদের দ্বারা এই বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে নিষ্পাপী ও পাপীর দ্বন্দ্বরূপে, তথাপি এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল কৃষি অসন্তোষ। শেষাবধি এই বিদ্রোহকে চরিত্রের দিক থেকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের আখ্যা দেওয়া যায়।

সাঁওতাল বিদোহ ছিল ভারতের কৃষক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়। এই বিদ্রোহ প্রবল পরাক্রান্ত আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে সামান্য টাঙ্গি ও তীর ধনুকসহ সাঁওতালরা যে লড়াই চালায় তার তুলনা নেই। আত্মসমর্পণ কাকে বলে সাঁওতালরা জানতেন না। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধুমাত্র কৃষক বিদ্রোহ ছিলনা এটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ যার মাধ্যমে সাঁওতালরা স্বাধীন, শোষণমুক্ত, মহাজনী চক্রান্ত বিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক K. K. Dutta মন্তব্য করেছেন—সাঁওতাল বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলা ও বিহার ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। ভারতীয় উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পথ তৈরী করে দিয়ে যায়।

৪.৫ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

প্রাক্ পলাশী পর্বে মুসলমানরা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত অন্যদিকে কৃষি ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল হিন্দুদের ওপর। যেহেতু রাজনীতি এবং প্রশাসনের গুরু দায়িত্ব বহন করত মুসলমানরা, সেহেতু হিন্দুদের হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক শান্তি কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর ব্রিটিশদের এদেশে দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কর্মক্ষেত্রে পার্শীর বদলে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার (১৮৩৭ সাল থেকে) ক্রমশ হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। কারণ এই সময়—ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মত। ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক ধরনের নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যারা ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দু যেখানে কৃষকদের একটি বিরাট অংশ ছিল ভগ্নোদ্যম হিন্দু ও মুসলিমরা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূস্বামী ও রায়তের দ্বন্দ্ব অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। যদিও কৃষকদের দুর্দশার চরিত্র ছিল মূলত অর্থনৈতিক। মুসলিমরা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতাকে ধর্মের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়। অন্যদিকে ইসলামের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন ছিল ঊনবিংশ শতকীয় ভারতীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনগুলি ছিল কৃষক আন্দোলন যাদেরকে ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১. বাংলায় ফরাজী আন্দোলন, ২. দিল্লীতে

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া, ৩. আরবের ওয়াহাবি আন্দোলন। আরবে ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩—১৭৮৭)। ভারতে অনুরূপ একটি বিদ্রোহ তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া পরিচালিত হয়েছিল দিল্লীর শাহ, ওয়ালি আল্লাহ্-র দ্বারা। তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ও শিখদের বিতাড়িত করে এদেশকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। জানা যায়. ১৮২০ খ্রীঃ কলকাতায় পরিদর্শনে এসে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যার ইতিবাচক ফলস্বরূপ ১৮২৭ খ্রীঃ বাংলায় তিতুমিরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করে।

ফরাজী আন্দোলন ঃ ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলায় সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনটি বাংলায় প্রবর্তিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ হাজি শারিয়ত আল্লার দ্বারা। ১৭৯৯ খ্রীঃ শারিয়ত মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন এবং সেখানকার ওয়াহাবি আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। গ্রামবাংলায় দরিদ্র কৃষকদের কাছে ফরাজী ভ্রাতৃত্ববোধ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ফরাজী মতে সকল ফরাজী ছিল সমান। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দেননি। এর মাধ্যমে যে সত্যটি প্রকাশিত হয় তা হল ফরাজী আন্দোলন কিছু অর্থনৈতিক শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাজীরা ব্রিটিশদের দার-উল-হার্ব হিসেবে দেখতেন। সুতরাং প্রথমদিকে এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক রূপরেখাকে অনুধাবন করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি কৃষি চরিত্র ধারণ করে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। James Wise এবং H. Beveridge শরিয়তকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মানতে অসম্মত হয়েছেন। তারা এটাও মানেন না যে শরিয়তের ফরাজী আন্দোলন ছিল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ। শরিয়তের পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

শরিয়ত উল্লাহের পুত্র দাদু মিঞার আমলে (১৮১৯-১৮৬২) ফরাজী আন্দোলন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। পূর্ব বাংলায় দাদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যখনই মুসলমান কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে তখনই জমিদার ও নীলকর সাহেবরা সচেতন হতে শুরু করে। ফরাজী কেন্দ্র থেকে লাঠিয়াল বাহিনী আত্মরক্ষার জন্যে গড়া হয়। দাদু মিঞা সর্বত্র এই মত প্রচার করেন যে "জমি আল্লাহের দান। সুতরাং জমিদারদের কর ধার্য করার অধিকার নেই।" তিনি কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন সরকারের নিয়ন্ত্রিত খাসমহলে বসবাসের জন্য। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দাদু মিঞা একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন। তার অনুগামীদের সুবিচারের তাগিদে দাদু মিঞা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পনর্বহাল করেন। এই থাকবন্দী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ছিলেন দাদু মিঞা।

কানাইপুরের সিকদারদের বিরুদ্ধে এবং ফরিদপুরের ঘোষদের বিরুদ্ধে দাদু মিঞার প্রাথমিক সাফল্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। অবদমিত কৃষকদের কাছে দাদু মিঞার ভাব মূর্তি উজ্জ্বল হতে থাকে। ক্রমশ ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে দাদু মিঞার জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে থাকে। জমিদার ও নীলকর সাহেবরা ফরাজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু বিফল হয়। ইওরোপীয় আবাদকারী মি. ডানলপ ছিলেন জমিদারদের বন্ধু এবং দাদু মিঞার শত্রু। ১৮৪৬ সালে দাদু মিঞা মেদিনীপুরে ডানলপের নীলকুঠী আক্রমণ করলে তাকে এবং তার কয়েকজন অনুচরকে ১৮৪৭ খ্রীঃ গ্রেপ্তার করে আদালত অভিযুক্ত করে। দাদু মিঞার পক্ষ থেকে জমিদারদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। উচ্চতর আদালতের নির্দেশে দাদুমিঞা মুক্তি পান। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় সরকার পুনরায় দাদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে

দাদু মিঞার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ খ্রিঃ এই বিদ্রোহী নায়কের মৃত্যু হলে ফরাজী আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিংশ শতকেও এই আন্দোলন বহাল ছিল তবে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে। ফরাজী আন্দোলন কৃষক আন্দোলন হলেও সচেতনভাবে তাকে একটি ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। বিনয় ভূষণ চৌধুরী এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন আখ্যা দিতে রাজী নন। তিনি আন্দোলনের অস্পষ্ট চরিত্রের দিকে আলোকপাত করেছেন। যার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই আন্দোলনকে সফল হতে দেয়নি।

ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ ঃ বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর, যার আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি খান। ১৭৭২ খ্রীঃ ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামে তিতুর জন্ম হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ তিনি মক্কায় যান এবং সেখানে সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দীক্ষিত হন। এবং বাংলায় ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন। ওয়াহাবী আদর্শের মূল কথা ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। তিতুমীর বাংলার মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে ঐস্লামিক শুদ্ধি আন্দোলনের প্রচার চালান। তিনি ফরাজী আন্দোলনের সমর্থকদের শুক্রবার ও ঈদে নামাজ পড়ার বিরোধী ছিলেন। তবে ফরাজী আন্দোলনের মতই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সংস্কার, কৃষি অসন্তোষ ও ব্রিটিশ শাসনকে অবমাননার একটি মিশ্রিত রূপ। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। সুতরাং মুসলিমদের উচিত সেই সকল অমুসলিমদের সাহায্য করা যারা দুর্বল অবদমিত। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং তাঁর বক্তব্য অনেক হিন্দুকেও আকর্ষণ করেছিল। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন—হিন্দু ও মুসলিম, দুই ধর্মেরই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত অত্যাচারি ভূস্বামী সম্প্রদায় ও আবাদকারীদের বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি একজন মুসলিম হওয়ায় মুসলিম দমনকারীর সম্মুখে নিরব থেকে ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্রই হিন্দু মুসলিম ঐক্যকরণকে বাধা প্রদান করেছিল। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে তিতুমীর প্রথমে তার আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে জমিদারদের অত্যাচার তার গৃহীত নীতির পরিপন্থী তখনই তিনি শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তন সাধন করলেন। এই আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু জমিদার ও নীল কর সাহেবদের কার্যকলাপ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। এবং একধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, মালদা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসার লাভ করে।

তারাশুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নাগরপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুরাশের কৃষ্ণদেব রায় প্রমুখ জমিদাররা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তিতুমীরের বিদ্রোহকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। হানাফি মতের অনুরাগী মুসলমানরা তিতুমীরের মতের বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এই হানাফি মতের অনুরাগীদের সাহায্য নেয়। তিনি এও প্রচার করেন যে তিতুমীরের অনুরাগীদের দাঁড়ির ওপর, মসজিদ নির্মাণের ওপর, এবং বাঙালীদের নাম আরবীতে পরিবর্তনের ওপর কর আরোপ করা হবে। গোহত্যার শাস্তি স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত ছেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। হিন্দু জমিদাররা, হিন্দু রায়তদের স্বপক্ষে আনার প্রচেষ্টা করেন। অতএব সাম্প্রদায়িক চরিত্র এক্ষেত্রে স্পষ্ট। কৃষ্ণদেব রায়কে একটি চিঠিতে তিতুমীর লেখেন ঃ "আমি দীন ইসলাম জারী করিতেছি ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে? আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ বিধি নিষেধের ওপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।" কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার কৃষ্ণদেব রায় কোনরকম প্রত্যুত্তর প্রদান না করে চিঠি বাহককে বন্দী করেন এবং পরে জেলেই তার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা তিতুমীর ও তার অনুগামীদের যারপরনাই বিদ্রোহী করে তোলে। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এই আন্দোলন একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। কলকাতার জমিদাররা সকলেই কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষাবলম্বন করে। ডঃ এস. বি. চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—যদিও এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল একটি কৃষক অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে তথাপি পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকটিত হয় ওঠে।

নারকেলবেড়িয়া এবং তার পাশাপাশি গ্রামগুলি তিতুমীরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তিতুমীরের

অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ। যেমন—হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে আগুন লাগানো, গোহত্যা প্রভৃতির ভয়ে মানুষ গ্রামছাড়া হয়। লোকজন যোগাড় করে তিতুমীর পুঁড়া গ্রামে কৃষ্ণদেব রায়ের গৃহ আক্রমণ করেন। অভিযান চালানোর সময় তিতুমীরের অনুগামীরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ও হিন্দু পুরোহিতদের হত্যা করে। পুঁড়ার দাঙ্গার পর তিতুমীর ঘোষণা করেন যে বাংলায় কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে। তিনি একটি সমান্তরাল সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। তিনি নারকেল বেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা গড়ে তোলেন। যেহেতু নারকেল বেড়িয়ায় বারাসতের প্রশাসনিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই এই আন্দোলন বারাসাত আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। জমিদার, নীলকর সাহেব ও ইংরেজদের অন্যান্য সহযোগীদের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ সাহায্যের অনুরোধ আসতে থাকায় ইংরেজ সরকার সেনাবাহিনী সহযোগে প্রতিরোধে তৎপর হয়। তিতুমীর ১৮৩১ খ্রীঃ এর ১৯ নভেম্বর গোলার আঘাতে প্রাণ হারান। ইংরেজ কামানের সামনে বাঁশের কেল্লা ভেঙে পড়ে। এভাবে তিতুমীরের ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান হয়। তবে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার অনুপ্রেরণা তখনও তার মহিমা প্রচার করতে সক্ষম ছিল।

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে অনেক সময় ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে কিছু অভিন্নতা থাকলেও এদের যোগসূত্র কোনও ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা সমর্থিত হয় না। ওয়াহাবীরা অতীন্দ্রিয়বাদকে অঐস্লামিক বলে বর্ণনা করেছেন তিতুমীর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিতুমিরের বিদ্রোহের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা চোখে পড়লেও তিতুমীর কোনভাবেই ভারতকে স্বাধীন করার বাসনা পোষণ করেননি। বরং ভারতে মুসলিম শাসন পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন। R. C. Majumdar মন্তব্য করেছেন—"It was a movement of the Muslim, by the Muslim and for the Muslim." কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হিন্দু জনসাধারণ কিন্তু বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তথাপি এর সাম্প্রদায়িক চরিত্রটিকে অস্বীকার করা যায় না, যার প্রভাব দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলিম বিভাজনের মধ্যে।

৪.৬ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

লর্ড ক্যানিং-এর রাজত্বকালে উত্তর ও মধ্যভারতে ১৮৫৭ খ্রীঃ-এ যে বিদ্রোহ ইংরেজ কোম্পানী শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয় তাই ভারতীয় ইতিহাসে মহাবিদ্রোহ নামে অভিহিত। এই অভ্যুত্থান ছিল চরিত্রের দিক থেকে বৃহদায়তন। এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী বা সিপাহীদের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ একটি জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করে। যদিও প্রথম দিকে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন, তথাপি বলা যায়, পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ছিল এই বিদ্রোহ। ভারতীয়রা কখনওই ইংরেজ শাসনকে অভিবাদন জানাতে পারেনি। আর অর্থনৈতিক অসন্তোষ এই পরিস্থিতির আরও অবনত ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ ক্ষমতা এদেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যতই বদ্ধমূল হতে থাকে, এদেশীয় মানুষের অসন্তোষ ততই প্রকট হতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই অসন্তোষ মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে। এইরকমই একটি জনপ্রিয় বিদ্রোহ, হল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ শাসনের ভিত আলগা করে দেয়।

৪.৭ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উৎপত্তি

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পশ্চাতে অনেক কারণ দায়ী ছিল, যারা একত্রিত হয়ে এই বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পায়। এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কারণগুলিকে আমরা বিভিন্ন

দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি, যেমন— অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামরিক,— যে কারণটিকে আমরা সাধারণত মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রধান কারণ রূপে অভিহিত করে থাকি।

এদেশের অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশদের অত্যাচার এবং এদেশের ঐতিহ্যিক অর্থনীতির ভাঙন ছিল মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় পুরাতন জমিদারদের জমি থেকে বিচ্যুত করে। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যায়। এই নীতি প্রাক্ ব্রিটিশ কৃষি অর্থনীতিতে আঘাত হানে। কৃষকরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে মহাজনদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলস্বরূপ গ্রামীণ মানুষরা, যাদের মধ্যে কারিগর ও হস্তশিল্পীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের জীবনযাত্রার অবনমনের সম্মুখীন হয়। অবস্থার অবনতি তাদের জীবনে অনাহারকে ডেকে আনে।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ভারতীয় কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ থেকে বিচ্যুতির ফলে বেকারত্বকে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রশ্রয় দিয়েছিল তার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার আরও অবনতি হয়। জনসাধারণ ব্রিটিশ এজেন্সিগুলি যেমন—পুলিশী ব্যবস্থা, আইন আদালত, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দ্বারা অবদমিত হতে থাকে। ভারতীয় জনসাধারণের, দুঃখ দুর্দশার সুবিচারের আশায় আদালতে প্রবেশের কোন অধিকারই ছিল না। আইনের শাসনব্যবস্থা আইনের দরবারে সকলের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। অন্যদিকে দরিদ্রদের দমন করার কাজে এই আইন ধনীদের সাহায্য করেছিল। এইভাবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও নিঃসহায়তা জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। অন্যদিকে ভারতের কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি, যারা পশ্চিমী উদারনীতির ফলে আনিত পরিবর্তনগুলির প্রতি সদয় ছিলেন না তারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার ভারতীয় জনসাধারণের মতো ক্ষোভ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ভারতের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র মিশনারীরা প্রচার চালাত। বিদ্যালয়, হাসপাতাল এমনকি জেলখানাতেও মিশনারীরা প্রচার চালাত। সাধারণ লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। লোকে মনে করত যে, সরকার এই সকল মিশনারীদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে জনসাধারণকে দীক্ষিত করাকে সমর্থন করেন। কারণ শাসকশ্রেণীর ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের ধর্ম ছিল এক। মিশনারীদের পুলিশী নিরাপত্তা দেওয়া হত। সরকারী কর্মচারীরা মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করত। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করা হত। মিশনারীরা দরিদ্র লোকের দুরবস্থার সুযোগ দিয়ে খ্রীষ্টধর্মে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। ১৮৩৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সুযোগে উত্তর পশ্চিম ভারতে বহু শিশুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ সরকার এক আইন দ্বারা নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও পিতার সম্পত্তিতে সেই ব্যক্তি বঞ্চিত হবে না। এই আইনকে সাধারণ লোকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর আঘাত বলে মনে করে।

কোম্পানী নির্বিচারে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধিগ্রহণ, ইংরেজ সরকারের আগ্রাসী মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজ্যগুলি অধিগ্রহণ করায় দেশীয় রাজা এবং তাদের পরিবারবর্গ ও আশ্রিত সামন্তশ্রেণীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। সাধারণ প্রজাদের মনেও অনুরূপভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যকে ইংরেজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অধীনতার জালে আবদ্ধ করেন। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আত্মপ্রকাশ। এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা ডালহৌসী কোম্পানী আশ্রিত দেশীয় রাজাদের পুত্রসন্তান না থাকলে দত্তক গ্রহণ দ্বারা উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করার চিরাচরিত অধিকার নাকচ করেন। দত্তক গ্রহণ ছিল হিন্দু সমাজের প্রাচীন প্রথা। এই অধিকার লোপ করায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মনে তীব্র বিদ্বেষ দেখা দেয়। বহু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কোম্পানীর দ্বারা

বাজেয়াপ্ত হয়। সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসী, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্য অধিগ্রহণ করা হয়। এমনকি পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেবের প্রাপ্য ভাতা লোপ করা হয়। নাগপুরের বিখ্যাত মারাঠা অধিপতি ভোঁসলের উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর রাজ্য ও রাজপরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইংরেজের এই অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আচরণ দেশীয় রাজা এবং সামন্তদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

এভাবে যখন ভারতীয় জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভের বারুদ জমা হচ্ছিল তখন অকস্মাৎ সিপাহীদের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বলে ওঠে। কোম্পানীর অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যরা সামরিক বিভাগের সকল উচ্চপদগুলি দখল করে রেখেছিল। ভারতীয় সিপাহীদের সেই পদ লাভের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে ভারতীয়দের দূরত্ব এবং পার্থক্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। গুজব ছড়াতে থাকে যে হিন্দু, শিখ এবং মুসলিম সিপাহীদের ধর্মান্তরিত করা হবে। ইতিপূর্বে কিছু ভারতীয় সিপাহীকে আফগানিস্থানে পাঠানো হয় তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। এবার ঘোষণা করা হয় হিন্দু সিপাহীদের কালাপানি পার হতে বাধ্য করা হবে, যা হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ। ১৮৫৬ খ্রীঃ জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট রুল দ্বারা সিপাহীদের কোম্পানীর সেনা না বলে ব্রিটিশ সরকারের সেনা হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ব্রিটিশদের স্বার্থে তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এতে হিন্দু সৈনিকদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানে। তারা জাতিনাশের আশঙ্কা করে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ এনফিল্ড রাইফেলের নতুন টোটা বা গুলি বারুদের স্তূপে অগ্নিসঞ্চার করে। এই নতুন ধরনের বন্দুক কোম্পানী সিপাহীদের মধ্যে প্রথম চালু করেন। এই বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার সময় সিপাহীদের দাঁত দিয়ে গুলি বা টোটার আচ্ছাদন ছিঁড়ে বন্দুকে ভরতে হত। আচ্ছাদনটিকে নরম রাখার জন্যে তা গরু ও শূয়ারের চর্বিতে ভেজান থাকত। এই দুটি প্রাণীর মাংস ছিল হিন্দু-মুসলিমদের নিকট নিষিদ্ধ খাদ্য। এর ফলে সিপাহীদের মনে ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। কলিকাতার উত্তরে ব্যারাকপুরের ছাউনিতে মঙ্গল পান্ডে নামে একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী এজন্য উত্তেজিত হয়ে ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৯ শে মার্চ তাঁর ঊর্ধ্বতন ইংরেজ অফিসারকে আক্রমণ করেন। শুরু হয়ে যায় সিপাহী বিদ্রোহ।

৪.৮ মহাবিদ্রোহের ইতিহাস

১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত হয় প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে গঙ্গা তীরে ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনীতে। যুবক সৈনিক মঙ্গল পান্ডে চর্বি মেশান কার্তুজের জন্যে উত্তেজিত হয়ে তাঁর ঊর্দ্ধতন ইংরেজ অফিসারকে আক্রমণ করেন। ২৯ শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রীঃ মঙ্গল পান্ডের সামরিক আদালতে বিচারে ফাঁসী হয়। এরপর ২৩ শে এপ্রিল মীরাটের সিপাহী ছাউনীতে চর্বি মাখান কার্তুজ নিয়ে ৯০ জন সিপাহী অস্বীকার করায় তাদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১০ই মে ১৮৫৭ খ্রীঃ মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁদের বন্দী সহকর্মীদের মুক্ত করে। ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়। মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীতে এলে, দিল্লীর সিপাহীরা মেজর উইলেবিকে পরাস্ত করে দুর্গ ও অস্ত্রাগার দখল করে এবং দিল্লী নগরী দখল করে নেয়। দিল্লী ও মিরাটের সিপাহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট রূপে ঘোষণা করে। মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরে। এরপর দিল্লী নগর বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয়। ক্রমে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং জনসাধারন বিদ্রোহে সামিল হয়। অযোধ্যা, রোহিলখন্ড, দোয়াব, বুন্দেলখন্ড, মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র, বিহারের বিরাট অংশ ও পূর্ব পাঞ্জাব নিয়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক স্থানে মানুষ সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। বাহাদুর শাহের

ডাকে দেশীয় রাজারা সাড়া দেয় এবং তাদের হস্তচ্যুত ক্ষমতাকে হস্তগত করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কানপুরের নানাসাহেব এবং তার অনুচর তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং বিহারের কুনওয়ার সিং। বহুদিন বিদ্রোহের প্রতিরোধ গড়তে গড়তে ব্রিটিশদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। তথাপি শেষ পর্যন্ত আধুনিক রণকৌশল ও রণ পরিকল্পনা প্রয়োগ দ্বারা মহাবিদ্রোহীরা অবদমিত হয়। ১৮৫৭ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন হয়। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। লেফটেন্যান্ট হডসন বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলি করে হত্যা করেন। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনারা হাতাহাতি যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। হ্যাভলক্ও আউট্রাম রেসিডেন্সী উদ্ধারে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করেন। নানাসাহেব পালিয়ে যান। ১৮৫৮-র ১৭ই জুন সেনাপতি ইউরোজ ঝাঁসীর রানীকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৮৫৮-৭ ১৯ শে জুন গোয়ালিয়রের পতন হয়। গোয়ালিয়রের পতনই মহাবিদ্রোহের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বহু ভারতীয় প্রাণের বিনিময়ে পুনরায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের বুকে।

৪.৯ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি

মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক J Kaye (A History of the Sepoy War in India) এবং W. Malleson (History of the Indian Mutiny) এই বিদ্রোহের সামরিক চরিত্রের দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলনকেই বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এই সকল ঐতিহাসিকদের একমাত্র প্রচেষ্টা যে মহা বিদ্রোহের গুরুত্বকে খর্ব করা তা সহজেই অনুমেয়। Kaye এবং Malleson এই বিদ্রোহের চরিত্রকে একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিকও এই বিদ্রোহের চরিত্রকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। R. C Mazumdar (The Sepoy Mutiny and the Revolt of ১৮৫৭ মন্তব্য করেছেন—এই বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিলনা বরং একটি সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামরিক অভ্যুত্থান ছিল। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহাবিদ্রোহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। S. Sen (Eighteen Fifty Seven) এই বিদ্রোহের সামরিক দিকটিকেই আলোকপাত করেছেন। Rajani Kanta Gupta (Sipahi Yuddher Itihas) এই বিদ্রোহকে প্রথম জাতীয়তাবাদী মহিমা দান করেন। তবে V. D/ Savarkar (History of the War of Independence) সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমান গবেষণায়রত ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন যে প্রাথমিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও এটি একটি জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করেছিল। এই গবেষণার ভিত্তিতেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা হয়। একদল ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলতে আগ্রহী অন্যদল এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত এই দুটি চরমপন্থার মধ্যেই এই বিদ্রোহের আসল চরিত্র নিহিত আছে। প্রথমদিকে এই বিদ্রোহ ছিল কেবল সামরিক বিদ্রোহ। সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই সামরিক অভ্যুত্থানের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। আমাদের হাতে প্রচুর প্রমাণ আছে যার সাহায্যে আমরা প্রমাণ করতে পারি কৃষকরা যেমন এই সুযোগে জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সাধারণ মানুষ সৈইরকম আইন আদালত, রাজস্ব ব্যবস্থা ও পুলিশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অন্যদিকে সাধারণ গ্রামবাসী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় এই বিদ্রোহ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য প্রত্যেক জায়গায় এই বিদ্রোহের চরিত্র অনুরূপ ছিল না। Dr Rudrangshu Mukherjee দেখিয়েছেন অযোধ্যায় এই বিদ্রোহ একটি

জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করেছিল। পুরো উত্তর ভারতে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানে এই বিদ্রোহ ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী চরিত্র প্রদান করেছিল তা হল তাদের 'দিল্লী চলো' স্লোগান এবং মুঘল শাসনের প্রতি আনুগত্য। মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে বাহাদুর শাহও এই বিদ্রোহের পক্ষাবলম্বন করতে দেশীয় রাজাদের অনুপ্রাণিত করেন। এই বিদ্রোহ যে গতিতে উত্তর ভারতে প্রসারিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে একধরনের সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র এই বিদ্রোহের পশ্চাতে লুকিয়েছিল। তথাপি স্বীকার করতে হয় বিদ্রোহী কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক ধারণা ছিল না। এই বিদ্রোহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল বিদ্রোহের নেতাদের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র। ভারতীয় রাজারা যারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তারা সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, যদিও এই বিদ্রোহের একটি মিশ্রিত চরিত্র ছিল তবুও এর জাতীয়তাবাদী চেতনাটি ছিল খুব উজ্জ্বল। এমনকি এই বিদ্রোহের সামরিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ঐতিহ্যিক চরিত্র জাতীয়তাবাদী চরিত্রের কাছে কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে একটি সত্য প্রকাশিত হয় যে যদিও এই বিদ্রোহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও সারা উত্তর ভারতে এর ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছিল।

৪.১০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

১৮৫৭ খ্রীঃ এর মহাবিদ্রোহ প্রথম দিকে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। মহাবিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই বিফলতার কারণ জানা যায়। সামরিক দিক থেকে বিদ্রোহীদের বহু ভুল ত্রুটি হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সংগঠন ছিল না। বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ শাসন ধ্বংস করার পর তার স্থলে কি ধরনের শাসন প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিদ্রোহীদের কোন ধারণা ছিল না। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন যোগ না থাকায় সংগঠিতভাবে বিদ্রোহকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। কোন সেনাপতির অধীনে সমগ্র রণ-পরিকল্পনা রচনা না করে ইতস্ততঃ ভাবে বিদ্রোহ করার ফল তাদের ভুগতে হয়। ব্রিটিশ সেনা পাল্টা আঘাত হানার সময় সিপাহীদের সামগ্রিক রণ পরিকল্পনা না থাকার সুযোগ নেয়।

বিদ্রোহীদের দিল্লী রক্ষা করার ব্যর্থতার ফল ছিল মারাত্মক। দিল্লীর পতনের ফলে সিপাহী ও জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যায়। বাহাদুর শাহ বন্দী হলে অনেকের কাছে বিদ্রোহ পরিচালনা করা নিস্ফল বলে মনে হয়। কারণ বাহাদুর শাহ ছিলেন ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতীক। যদি সিপাহীরা বাংলা ও পাঞ্জাব থেকে দিল্লী দখলের জন্য ইংরেজ সেনা আনা বন্ধ করতে পারত তাহলে এত সহজে দিল্লীর পতন হত না। বিদ্রোহী জনসাধারণ ও সিপাহীদের হাতে কোন উন্নতমানের অস্ত্র ও কামান না থাকায় ইংরেজ সেনার মোকাবিলা করা সহজ ছিল না।

বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উপযুক্ত নেতা বা সেনাপতি না থাকায় ইংরেজ সেনার মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। বাহাদুর শাহ ছিল অক্ষম অপদার্থ। নানাসাহেব প্রধানতঃ নিজ ব্যক্তি স্বার্থকে জাতী স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। ইংরেজ সেনাপতিরা যেরূপ শৃঙ্খলা ও মনোবল দেখান কোন বিদ্রোহী নেতার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোহ থেকে মুক্ত থাকায় সেই সকল অঞ্চল থেকে সেনা ও রসদ এনে ইংরাজ শক্তি যুদ্ধ চালাবার সুযোগ পায়। পশ্চিম পাঞ্জাব, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বৃহৎ অংশ ছিল

বিদ্রোহ থেকে মুক্ত। দেশীয় রাজাদের অনেকে বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা ইংরেজের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে নিজ নিজ সিংহাসনের রক্ষার কাজকে সহজ করতে চেয়েছিলেন। সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে ইংরাজ শিবিরে আশ্রয় নেন। নিজামও ইংরাজের প্রতি আনুগত্য দেখান। জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ বিরোধিতা থাকলেও বেশীর ভাগ দেশীয় রাজাদের স্বার্থপর দাস মনোবৃত্তি বিদ্রোহীদের উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি দেখায় নি। জমিদার, মহাজনরা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিল। ভারতীয়দের এই অনৈক্য বিদ্রোহের পতন ঘটায়।

মোটকথা বিদ্রোহের লক্ষ্য স্থির থাকলে অনেক বেশী মানুষ অনুপ্রাণিত হত। তারা মরণপন লড়াই করত। কিন্তু লক্ষ্য বিচ্যুত বিদ্রোহ মানুষের মনে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেনি।

৪.১১ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব

১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ ছিল বহুক্ষেত্রে নতুনের বিরুদ্ধে পুরাতনের বিদ্রোহ। Sir Lepel Griffen মন্তব্য করেছেন— "The Revolt of 1857 swept the Indian sky clear of many clouds." একাধিক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ পরিবর্তন আনয়ন করেছিল **প্রথমতঃ,** ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয়দের শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। ভারতীয়দের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, বিশেষত সেই সকল প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর প্রতি যারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভারতবাসী ধর্মীয় চেতনা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় ব্রিটিশরা সে বিষয়ে সচেতন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের তিক্ততা যত প্রমাণিত হতে থাকে তত মানুষের মন থেকে ঐতিহ্যিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি টান আলগা হতে থাকে। দিগন্তে, জাতীয়তাবাদের সূর্যের উদয় স্পষ্টতর হতে থাকে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা এদেশীয় দুঃখ দুর্দশার প্রতি সচেতন হতে থাকে। রাজা মহারাজদের আধিপত্যের স্থান দখল করে পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে তাদের শাসন পদ্ধতির নিশ্চিত কিছু ত্রুটির জন্যেই এই বিদ্রোহের প্রকাশ। সুতরাং তারা ত্রুটি সংশোধন করতে উদ্যোগ নেয়। ব্রিটিশরা বুঝতে পারে ভারতের মত বৃহৎ দেশের শাসনভার ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। ভারত থেকে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার খর্ব করা হয় এবং ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আনা হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ এর ভারতশাসন আইনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভারতে গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় হিসেবে পরিচিত হয়। এছাড়াও বলা হয় যে সরকারের চাকুরীতে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের নীতি নেওয়া হবে। আই-সি-এস চাকুরীতে নিয়োগের জন্যে ১৮৬১ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম চালু করা হয়। ব্রিটিশ শাসন আগের থেকে অনেক বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, যাতে দেশীয় রাজারা ভবিষ্যতে ব্রিটিশ বিরোধী না হয়ে ওঠে সেজন্যে ভেদনীতি খাটিয়ে দেশীয় রাজাদের রাজ্য রক্ষা, তাঁদের মর্যাদা ও খেতাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করা হয়। এমনকি অযোধ্যার তালুকদারদের ও তালুক ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এঁরা ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সম্রাটের একনিষ্ঠ অনুগত প্রজার ভূমিকা পালন করেন।

সর্বোপরি পার্সিভ্যাল স্পীয়ারের মতে মহাবিদ্রোহের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদ রেখা স্পষ্টতর হতে থাকে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা জাতি বৈষম্যের নীতি নেয়।

ইংরেজ শাসকরা এবার 'গাজর এবং লাঠি'-র (Carrot and Sticks) দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে অনুমোদন এবং দমনের নীতি গ্রহণ করে। তারা এইরূপ ভাবমূর্তি প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে তাদের সকল নীতি জনসাধারণের কল্যাণার্থে গৃহীত হয়। তাদের অনুমোদন নীতি প্রতিফলিত হয় ১৮৬১ তে 'Indian Council Act' পাশের মধ্যে দিয়ে, যার মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে কিছু মনোনীত ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। Penal Code বা ভারতীয় দন্ড আইনের প্রচলন করা হয়। তথাপি মহাবিদ্রোহের ফলে মানুষের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। এখন থেকে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উদ্যোগ নেয়। ফলে ইংরেজ শাসকশ্রেণী সচেতন হয় এবং জাতীয়তাবাদ প্রশমনের তাগিদে 'Divide and Rule' বা ভারতীয়দের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা অনৈক্য সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করার নীতি নেয়। এই ভেদ নীতির মাধ্যমে মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলিমের দৃঢ় ঐক্যে চিড় ধরে। এবং ক্রমশ সেই চিড় ভাঙনে পরিণত হয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারী ফল স্বরূপ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মাধ্যমে একটি যুগের অবসান হয় এবং একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। যে যুগ অনুধাবন করে আধুনিকতাকে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এখানেই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য নিহিত। সাভারকার তাই মহাবিদ্রোহকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sumit Sarkar — Modern India.
2. Bipan Chandra — India's Struggle for Independence.
3. Dipak Kumar Aich — Emergence of Modern Bengali Elite.
4. R. Chakrabarti — Authority & Violence in Bengal.

৪.১৩ অনুশীলনী

১. সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ লেখ।

২. মহাবিদ্রোহের উৎপত্তির কারণ আলোচনা কর।

৩. মহাবিদ্রোহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে তা আলোচনা কর।

৪. মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখ।

একক ৫ ❑ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

গঠন

৫.০ প্রস্তাবনা

৫.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

৫.২ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

৫.৩ মহলওয়ারী বন্দোবস্ত

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৫.৫ অনুশীলনী

৫.০ প্রস্তাবনা

বাংলা জয় করার পর লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনাধীনে প্রত্যক্ষ শাসন চালু করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের দৃষ্টি ফেরায় ভূমি রাজস্বের সর্বাধিকরণের দিকে। রাজস্বের সুরক্ষা ব্রিটিশ সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ একদিকে শাসনব্যবস্থা ও অন্যদিকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে। মূলগতভাবে যা প্রাথমিকভাবে ভারতবর্ষ তার চরিত্রের দিক থেকে কৃষিপ্রধান এবং কৃষিকার্য হচ্ছে জনগণের প্রাথমিক কাজ বা জীবিকা। যদি ভারতবর্ষ শোষিত হতো তাহলে এর পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল গ্রামীণ উদ্বৃত্তের সর্বাধিক নিয্যাস শোষণ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় সরকার অতঃপর সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়েছিলো ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের, বাংলার ক্ষেত্রে এটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে জমিদারের সঙ্গে। প্রধানত এর উদ্দেশ্য ছিল রাজস্বের সুরক্ষা এবং গ্রামীণ অভিজাতদের একত্রিত করা। জমিদারদের এই ভাবনার পক্ষে আনয়ন করা।

৫.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

জমিদারীর নির্ধারিত সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার পর, বস্তুত, ভূমি রাজস্ব পৌঁছেছিল সার্বিক মূল্যের ১১ ভাগের ১০ ভাগে। কিন্তু ওটি স্থায়ীভাবে নির্ধারিত ছিল। তথাপি জমিদারগণ রাজস্ব দিতে বাধ্য ছিল যথাসময়ে বা নির্দিষ্ট দিনে চুক্তি অনুসারে, সূর্যাস্ত আইন হিসেবে সূর্য ডোবার আগে। এই ভয়ানক কঠোর আইনের ব্যাপারে পুরোনো স্থায়ী জমিদারগণ ছিলেন অনভ্যস্ত। ফলে তাঁরা ক্রমশ আইনের খেলাপকারী হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের জমিদারী নিলামে বিক্রি হয়ে গেল, নতুন প্রজন্মের জমিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের হাতে। যারা সংগ্রহ করতো সর্বাধিক রাজস্ব তাদের নায়েব গোমস্তা এবং লাঠিয়ালদের সাহায্যে, গরীব রায়তদের কাছ থেকে। এ-ব্যাপারে সরকার তাদের সবরকম ছাড় দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে, রাজস্বের সুরক্ষা ছিল একটি চরম প্রয়োজন, কিন্তু ১৮২০'র দশকে, সরকার ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল এবং নতুন ভূস্বামী শ্রেণী লাভবান হয়েছিল কেন না অনুপার্জিত বৃদ্ধির ফলে, সংশোধনের কারণে এবং জমির চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বেড়ে গিয়েছিল।

বহু বড় জমিদার'রা যেমন, বর্ধমানের মহারাজা তাঁর রাজ্যকে উপ-জায়গীরে বিভক্ত করেন আর সৃষ্টি করেন

একধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীদের। যারা পরিণত হয়েছিল পরজীবীতে। সমগ্র জমির আসল সরটাই তারা খেয়ে নিচ্ছিল। এদের বেশীরভাগই অসৎপথে উপার্জিত টাকা-পয়সা কলকাতা শহর কিম্বা জেলা শহরগুলিতে গিয়ে, নানা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে ব্যয় করে ফেলত। যাইহোক জমিদাররা কখনই পুরোপুরি তাদের মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার সূর্যাস্ত আইন, ভাড়ামুক্ত রায়তী স্বত্বের পুর্ণাগ্রহণ, অতিশক্তিশালী নীলকর সাহেবদের বলপ্রয়োগ, পরবর্তী সময়ে গৃহীত ভাড়া, প্রজাস্বত্ব আইনের জন্য উপভোগ করতে পারতো না।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো যথার্থ রায়তদের ওপর প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েছিল, এবং যারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল অনাহারের ভূমিতে, রায়তরা শেষ পর্যন্ত মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছিল জমিদারকে দেওয়ার জন্য এবং ক্রমে এই রায়তরা পরিণত হয়েছিল ভূমিহীন ভাগচাষী ও কৃষিশ্রমিকে। এদের এই দুর্দশা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। এঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং রমেশচন্দ্র দত্ত। উনিশ শতকের শেষদিকে একটা সময় এলো, এমনকি যখন জমিদার'রা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাদের সম্পত্তি বিভক্তিকরণের ফলে আর রায়তরা উপবাসে কষ্ট পাচ্ছিল এবং যখন কোনরকম উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পিছনে যে উন্নতির যুক্তি ছিল, তা এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল উড়িশা, উত্তর সরকার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে, একই পরিণতিতে।

৫.২ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

ব্রিটিশরা তাদের রাজস্ব নীতি সুবিন্যস্ত করেছিল মূলতঃ প্রত্যেকটি অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক কাঠামোর চরিত্রকে মাথায় রেখে। ব্রিটিশরা সন্ধান পেয়েছিল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কোনও জমিদার-ই বিরাট জমিদারীর মালিক নয়। যাদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত যথার্থভাবে হতে পারে। অধিকন্তু সরকারও ততটা জোরালো ভাবে আরোপ করেনি কোনও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত কৃষি কাঠামোর ওপর। বাংলার ক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুরক্ষার জন্য চিরস্থায়ীতে পরিণত করে। নতুন নিয়মে জমিদাররা অতিক্রম করতে পেরেছিল সূর্যাস্ত আইনের আঘাত এবং শুরু করেছিল অনুপার্জিত রাজস্ব বৃদ্ধি উপভোগ করতে, যেখানে সরকারী ঈর্ষা পরিলক্ষিত হয়। যে রাজস্ব তারা বেঁধে দিয়েছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় তাকে হ্রাস করার কোনও ইচ্ছা সরকারের ছিল না।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির পুরনো রাজস্ব কর্মচারীরা যেমন, রীড এবং মুনরো দেখেননি কোনও বাংলার জমিদারদের মতো গ্রামিণ অভিজাতদের এবং তারা সুপারিশ করেছিলেন যে, ওই ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হবে প্রকৃত কৃষক ও রায়তদের সঙ্গে। ১৮০৫ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে রায়তরা চিহ্নিত হয়েছিল তার নিজের জমির মালিক হিসেবে আর তারা দায়ী থাকতো ঠিক সময়ে রাজস্ব দেওয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ রাজস্বের পরিমাণ যেটা দিতে হবে তা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বরীকৃত ছিল না এটা ছিল একটা পর্য্যায়ক্রমিক বিষয় এবং মোট উৎপাদনের ৪৫% থেকে ৫৫% সরকারের দাবী ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১২ বছর অন্তর অন্তর। ব্যাপারটা ছিল গ্রামীণ উদ্বৃত্তকে ধ্বংস করে দেবার প্রচেষ্টা এবং সরকার ক্রমেই প্রকৃত জমিদার হয়ে ওঠে। কৃষকদের কোনওরকম ছাড় ছিল না প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কম শশ্য সংগ্রহের জন্য। বার্নস্টেনের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় যে এটি কোনওভাবেই কৃষকদের পক্ষের বন্দোবস্ত ছিল না আর মুনরো'ও কোন সাধুপুরুষ ছিলেন না, পারিয়াররা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল ভূমিদান।

সেচ ব্যবস্থার ব্যাপারে সরকারের খুব কমই অবদান ছিল। এটা কৃষক সম্প্রদায়ের চরম দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। একমাত্র ধনী কৃষকরাই আরও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। বৃটিশ রাজত্বের ক্ষেত্রে তারাই হয়ে উঠেছিল নগদ শস্যের প্রধান কারবারী।

এই একই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২০-'র পরবর্তী সময় গভর্নর জেনারেল এলফিনস্টোনের শাসনকালে এই পদ্ধতি বোম্বে প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাজনরা গবীর কৃষকদের নিজেদের আওতায় নিয়ে এসেছিল সরকারী খাজনা অগ্রিম দেওয়ার মধ্যে দিয়ে চড়া সুদে।

৫.৩ মহলওয়ারী বন্দোবস্ত

মহলওয়ারী পদ্ধতি ছিল মহল ভিত্তিক বা জমিদারী ভিত্তিক ব্যাবস্থা, যা কিনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলি মধ্যভারত এবং পঞ্জাবে দেখা গিয়েছিল। ভায়চারা গ্রামীণ ঐতিহ্যের ওপর যা দাঁড়িয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে ১৮২৩-১৮৩৩ এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথম দুটি এবং শেষেরটি। এখানে চুক্তিটা দেখা গিয়েছিল গ্রাম প্রধানের সঙ্গে, যাঁকে গ্রামের পক্ষ থেকে রাজস্বের একটি বড় অংশ সরকারকে দিতে হতো, যা কিনা পর্য্যায়ক্রমে উৎপাদনের ভিত্তিতে পুনরায় দিতে হতো। এই সকল গ্রামপ্রধানরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রতারনাও করতো। এরা খুব দ্রুত মহাজনদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে যেত।

নগদ অর্থের বন্ধনে এই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা দরিদ্র কৃষকদের জড়িয়ে ফেলেছিল। যে টাকা তাদের ভাড়া হিসেবে দিতে হতো, তা তারা সংগ্রহ করতো অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে। যদি তারা ব্যর্থ হতো মহাজন অথবা সরকারকে ধার শোধ করতে কিংবা খাজনা দিতে, ফলস্বরূপ জমি থেকে উৎখাত হতে হতো, এই পদ্ধতিতেই ভূমিহীন ভাগচাষী এবং কৃষিশ্রমিকদের জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যাবস্থা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছিল মুঘল যুগের সমগ্র উপশম বা যন্ত্রনার লাঘবকে, পরম্পরাগত দুর্ভিক্ষ, অনাহার, ক্ষুধা কৃষকদের উপর এসে পড়েছিল।

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. বি. এইচ. ব্যাডেন পাওয়েল—দি ল্যান্ড সিস্টেমস্ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া

২. সিরাজুল ইসলাম—পারমানেন্ট সেটলমেন্ট ইন বেঙ্গল

৩. চিত্তব্রত পালিত— টেনশনস্ ইন বেঙ্গল রুর‍্যাল সোসাইটি

৪. নীলমনি মুখার্জি—দি রায়তওয়ারি সেটলমেন্ট ইন ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সী

৫. বারর্টেইন স্টেইন—থমাস মুনরো

৬. আসিয়া সিদ্দিকী—ল্যান্ড রেভেনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইউ পি

৭. ই হোয়াইট কম্ব—আগ্রারিয়ান কনডিশন ইন নর্থ ইন্ডিয়া

৮. হিমাদ্রি ব্যানার্জী—অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি অব পঞ্জাব

৯. এম. ডাবলিং—পঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রপার্টি অ্যান্ড ডেট

১০. আর. কুমার—ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্যা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি

১১. সুনীল সেন—অ্যাগ্রারিয়ান রিলেশন্স ইন ইন্ডিয়া

৫.৫ অনুশীলনী

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন জমিদারদের ওপর আরোপ করা হয়? এবং কৃষকদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

২. রায়তওয়ারী ব্যবস্থার পটভূমিকা এবং শর্ত-আরোপন (Background & Provisions) কি ছিল এবং কৃষকদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

৩. মহলওয়ারী ব্যবস্থা কি? এবং তা কি ভাবে N.W.P এবং Punjab এর কৃষকদের প্রভাব ফেলে?

৪. বঙ্গের রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কি ভাবে গ্রামীণ ঋণভার (rural indebtedness) বাড়িয়ে দিয়েছিল?

একক ৬ ❑ কৃষক বিদ্রোহ

গঠন

৬.০ ভূসম্পত্তি বিষয়ক নীতিসমূহ, কৃষক এবং উপজাতি আন্দোলন সমূহ
৬.১ নীল বিদ্রোহ
৬.২ পাবনা বিদ্রোহ
৬.৩ ডেকান বিদ্রোহ
৬.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ
৬.৫ মুন্ডা আন্দোলন
৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি
৬.৭ অনুশীলনী

৬.০ ভূসম্পত্তি বিষয়ক নীতিসমূহ, কৃষক এবং উপজাতি আন্দোলন সমূহ

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্বের আয়কে সুনিশ্চিত করেছিল ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে, কিন্তু এর বেশীরভাগটাই ব্যয়িত হয়েছিল প্রশাসন ও মূলধন, এবং সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানে ছিল না কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিধিসমূহ, লাভজনক ব্যবসার জন্য একমাত্র আফিম এবং লবণের একচেটিয়া ব্যাবসা ছাড়া। সরকার স্থির করেছিল লাভজনক ব্যবসার জন্য অন্য কোন লগ্নিকরণের সন্ধান। নীল ছিল এমন একটি শস্য যার চাষ ইংলন্ড থেকে আসা বেআইনী নীলকর সাহেবদের দ্বারা অপরাধজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মুক্ত-বাণিজ্য প্রসারের পক্ষাবলম্বীদের নেতৃত্বে ১৮৩৩ সালের সন্দ আইন সংশোধিত হয়, যা কিনা মুছে দেয় কোম্পানীর ব্যাবসায়িক কর্মকান্ডএবং অনুমতি দেয় মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবসায়ীদের ভারতে ঢুকতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের উপযোগিতাবাদী প্রশাসন (১৮২৪-৩৬) এরই মধ্যে ১৮৩০ সালে স্থির করেছিল বাংলায় নীলকরদের অনুমতি দেবে। যেভাবে তারা গঠন করে একধরনের উন্নতিচক্র। ১৮৩৪ সালের মধ্যে যেখানে তারা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রত্যন্ত বাংলায়। তারা অনুমতি পেয়েছিল জমিগুলিকে পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত তাদের নিজেদের নামে ধরে রাখতে। এটি সৃষ্টি করেছিল লগ্নিকরণের আবহাওয়া এবং নীলকর সাহেবরা তাদের ব্যবসার মূলধন সংগ্রহ করেছিল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল আর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর কর্মচারীদের সঞ্চিত অর্থ আর ব্রিটিশ এজেন্সী হাউসগুলি থেকে।

৬.১ নীল বিদ্রোহ (১৮৬০)

ব্যবসায়ী কৃষির ক্ষেত্রে নীল ক্রমশ একটি সমৃদ্ধশালী দিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮০০ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। নীল গাছগুলি ছিল সূতি বস্ত্র নীল রঙয়ে ছোপানোর ক্ষেত্রে একটি প্রাকৃতিক উৎস। এই বিশাল নীল ব্যবসা খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল ইংলন্ডের দ্রুত বেড়ে ওঠা সুতি বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে, যা কিনা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বিবেচনা অনুযায়ী ৪৬% মূল্যের জিনিসপত্র রপ্তানী করা হতো কলকাতা থেকে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে নীল ছিল জমিদার এবং রায়তদের কাছে আশীর্বাদের মতো, কেন না নীলকররা এর জন্য জমিদারদের প্রচুর ভাড়া দিত এবং রায়তরাও নীলের চাষ করবার জন্য ভালো অর্থ পেত। কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে

নীলের চাহিদা ইওরোপীয় বাজারে প্রচন্ডভাবে পড়ে গেল আর অবিক্রিত প্রচুর পরিমাণ নীল গুদামে পচতে থাকলো। নীলকররা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'কে তাদের ধার শোধ করতে ব্যর্থ হলো এবং ১৮৪৭ সালে এটি বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই দিন থেকেই নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শুরু হ'ল রায়তদের ওপর, যাতে তারা নীলচাষ করে, এবং অর্থ ছাড়াই তাদের এই চাষ করতে বাধ্য হয়ে হয়। নীল জোর করে এমনকি ধানের জমিতেও বপন করা হতে লাগলো। নীল চাষের সঙ্গে ধান উৎপাদনের সংঘর্ষ শুরু হলো। যা ছিল এই সময় অনেকবেশী লাভজনক। নীলকররা কৃষি কাঠামোর ওপর সবরকম আক্রমণ নামিয়ে আনলো। বেআইনীভাবে রায়তদের বন্দী করে রাখা; শারিরীক অত্যাচার করা, কারখানা ও গুদামঘরে শিশু ও নারীপীড়ন, লুটপাঠ, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নীলকররা তাদের সন্ত্রাসের রাজত্বে কায়েম করেছিল। সরকার কিন্তু তখনও এই সমস্ত নীলকরদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশকর্তারা সমস্ত ব্যাপারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আর একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজের সমস্ত শ্রেণী বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এই নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য। ছোট জমিদার, জোতদার অথবা বৃহৎ চাষীরা নীলকরদের মুখোমুখি হয়েছিল তাদের নিজেদের ধান উৎপাদনের জন্য, আর রায়তরা একত্রিত হয়েছিল তাদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসার জন্য। তারা একত্রিত হয়েছিল বৈদেশিক শক্তিকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাদের মুখপত্র হিসেবে যে পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে নিজেদের দাবি দাওয়া উপস্থাপিত করেছিল সেগুলি হল—হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গল ম্যাগাজিন ইত্যাদি। দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদর্পণ নাটক নীলকরদের স্বৈরাচারের আয়না হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছিল আর সমগ্র মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বস্তুত মধুসূদন দত্ত এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য। কিন্তু কারাবাস করেছিলেন বইটি প্রকাশনার জন্য রেভারেন্ড লং। যেমন, মনস্বী শিশির ঘোষ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর "কৃষক বিদ্রোহের গল্প"। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন বাঁশবেড়িয়ার নীলকর সাহেব জন হোয়াইটের কর্মচারী। যাঁরা ধান চাষ ও ব্যবসা করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং নদীয়ায় যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে এসেছিলেন। নড়াইলের জমিদার রামরতন রায় রানাঘাটের পালচৌধুরী, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি প্রমুখ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষনায় এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল।

রায়তরা উৎসাহিত হয়েছিল অস্ত্র ধারণ করতে নীলকরদের বিরুদ্ধে, যখন তারা শেষপর্যন্ত রায়তদের বাধ্য করেছিল ধানের জমিতে নীল বুনতে। অতঃপর সরকার তাঁর মনোভঙ্গি পাল্টে ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে এবং একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিল রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষ করানোর চেষ্টা হলে তারা তা প্রত্যাখান করতে পারে। ইডেন বিজ্ঞপ্তি ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ যা অগ্নি প্রজ্বলনে সাহায্য করেছিল। রায়তরা এই সময় থেকে নীলের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করলো এবং যৌথভাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ্ হোসেন, ডেপুটি এবং সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গিরীশ ঘোষ দারোগা হিসেবে বিদ্রোহের সময় প্রচুর নীলকরকে গ্রেফতার করেছিলেন। সরকার শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহ শান্ত করেন এবং বুদ্ধিজীবীদের দাবীদাওয়াকে কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন, যেমন এঁদের মধ্যে ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশন বসে, যারা নীলচাষীদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সম্যক অনুসন্ধান শুরু করেন এবং এঁদের রিপোর্টে বা প্রতিবেদনে নীলচাষ এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় আর সেইসঙ্গে রায়তদের মুক্তির কথা বলা হয়। ইংরেজ আগমনের পর বাংলার প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলে শিশিকুমার ঘোষ একে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সরকার এবং জাতীয়তাবাদী এই বিদ্রোহ থেকে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, কৃষকদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে।

অতঃপর নীলকর সাহেবরা বাংলা ছেড়ে উত্তর বিহারে সহজে বশ করা যায়, এমন কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করে।

৬.২ পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩)

নীল বিদ্রোহ জেগে ওঠার পর, সরকার ১৮৫৯ সালের ভাড়া আইন পাস করেছিল। যা কৃষকদের ১২ বছরের অধিকারকে রক্ষা করেছিল এবং যেটি আকস্মিক ভাড়া বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়েছিল। জমিদারগণ এই প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে গ্রহণ করেছিলো নানান কৌশলের সাহায্যে। ধনী কৃষকরা আইনী যুদ্ধে জমিদারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং বহু মামলায় জয়লাভ করে জমিদারদের বিরুদ্ধে। কার্যক্ষেত্রে এটি অতি দ্রুত জ্বলে উঠেছিল। এই কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল পাবনা জেলা। সংশোধনের জায়গা হিসেবে জমিদারগণ ভাড়া কমিয়ে দিয়েছিল; এই বন্দোবস্তের কালে। কিন্তু এটির নির্মাণ ঘটেছিল অতিরিক্ত ভাড়া বা মাশুলের চাহিদার জন্য। এই পথ বন্ধ হয়েছিল লেঃ গভর্নর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের ১৮৬৯ এর সিদ্ধান্তে। যা আবওয়াব নামক করটিকে মুছে দিয়েছিল। পাবনার জমিদাররা যেমন ব্যানার্জী, ঠাকুর, সান্যাল, ভাদুড়ী'রা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভাড়ার সঙ্গে আবওয়াবকে একত্রিত করতে এবং স্থির করেছিলেন নতুন ভাড়া যা ৬ গুণ বেশী পুরনো ভাড়ার তুলনায় রায়তরা এই বর্ধিত ভাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল। ভাড়া বৃদ্ধি মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে ভয়ানক— অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এবং বিহারের ক্ষেত্রেও বিলম্ব হচ্ছিল। জমিদাররা বলপ্রয়োগ করছিল নতুন ভাড়া সংগ্রহের জন্য। কৃষি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে রায়তরা সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। যা মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে রায়তদের সচেতন করে তুলেছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে। নতুন প্রজন্মের মুক্তিয়ার্সরাও আসলে ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং পাট ব্যবসায়ীরা তাদের মামলা গ্রহণ করেছিল অর্ধেক মূল্যে এবং ঈশানচন্দ্র রায় এঁদের মধ্যে একজন যিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী রাজা বা প্রধান নেতা। ব্যানার্জীর সঙ্গে রায়ের সংঘর্ষ বাধল জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে এবং তিনি শপথ নিয়ে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে লাগলেন। কৃষকরা একত্রিত হয়েছিল ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে জমিদারদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষার জন্য সরকার বহু সময় মধ্যস্থতা করেছিলেন, এই ধরনের প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে। কিন্তু আইনত যুদ্ধ চলতেই থাকে। অর্থবান কৃষকরা পাটের ব্যবসা থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ করে। জমিদারদের বিরুদ্ধে শেষ বিন্দু পর্যন্ত তারা তাদের মকদ্দমা চালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সমস্ত জমিদাররাই শেষ পর্যন্ত এদের সঙ্গে আপস করেছিল। একমাত্র ঈশানচন্দ্র ব্যানার্জী ছাড়া। পাবনা বিদ্রোহ ছিল একটি অমীমাংসিত খেলা।

এই বিদ্রোহ রেখে গিয়েছিল শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য মূল্যবান শিক্ষা। কৃষক সংঘ অথবা রায়ত সভাগুলি গড়ে উঠেছিল নানা জেলায়। মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদ্‌রা খুব দ্রুত এদের সংযুক্ত করে নিয়েছিল, তাদের নতুন গঠিত রাজনৈতিক কাঠমো 'ভারতসভা'র মধ্যে। তাঁরা দৃঢ়রূপে রায়তদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং তাদের জন্য অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরোধা ব্যক্তিরা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সঞ্জিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রেভারেন্ড লাল বিহারী দে এবং অভয়চরণ দাস। আর.সি দত্ত সরাসারি ভাবে পাবনা বিদ্রোহীদের জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় যা লালবিহারী দে'র দ্বারা পরিচালিত ছিল। ভারত সভা এইভাবে আরও বড়ো অবস্থায় পরিনত হয়েছিল এবং তারা বেরিয়ে এসেছিল ব্রিটিশ ভারতসভার ভূমি রাজনীতি থেকে। সেইসঙ্গে তারা তুলে ধরেছিল অন্যান্য জনমত সম্পর্কিত প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলিকে।

৬.৩ ডেকান বিদ্রোহ (১৮৭৫)

ডেকান বিদ্রোহ (১৮৭৫) ছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব ব্যাবস্থা এবং সুদখোর মহাজনদের শ্বাসরুদ্ধকারী অবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিশালী কৃষকবিদ্রোহের উদাহরণ। এলফিনস্টোন গভর্নর থাকাকালীন সময়ে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ডেকানে, যা কিনা ধনী কৃষকদের উত্থানে সাহায্য করেছিল। যেমন— বাংলায়, যেখানেও ব্রিটিশ নীতি

ছিল রাজস্ব বাড়িয়ে তোলা এবং রায়তদের ঠেলে দেওয়া, মূল্যবান নগদ শস্যের চাষ বাড়িয়ে তোলা, যেমন—সূতী বস্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের পরে, সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত সূতি বস্ত্র, ইংলন্ডে করার ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল খুবই অনিশ্চিত। ব্রিটিশ সূতিবস্ত্র শিল্প ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় সূতীর কাছে। এর ফলে সূতীবস্ত্রের বিশাল চাহিদা বা মূল্য বৃদ্ধি শুরু হ'ল। ফলে মারাঠা চাষীরা শুরু করলো প্রচুর পরিমাণ সূতির চাষ অকর্ষিত জমিতে। সরকারের কোনও শর্তই ছিল না। গ্রামীণ ঋণের ব্যাপারে। গুজরাঠি, সিন্ধি এবং মাড়োয়ারী বেনিয়ারা পতঙ্গের পালের মতো এই অঞ্চলে এসে জুটেছিল, এবং ৫০ শতাংশ সুদে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ঋণ দান করেছিল। এই আকস্মিক উন্নতি বা মূল্যবৃদ্ধির সময়কাল বেশ কিছুকাল চলছিল এবং কৃষকদের ধার শোধ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি, সেইসঙ্গে প্রচুর লাভও হচ্ছিল। ১৮৬৪ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারও বাড়িয়ে তুলেছিল রাজস্বের চাহিদা। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর আমেরিকান সূতী ফিরে এসেছিল বিশ্ববাজারে আর তুলনায় নিম্নমানের ভারতীয় সূতী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ঋণী কৃষকরা ব্যর্থ হয়েছিল মহাজনদের কাছে তাদের ধার শোধ করতে। এরা ব্যর্থ হয়েছিল বকেয়া ঋণ শোধ করতে ও খুব তাড়াতাড়ি শুল্কাধীন শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। মহাজনরা যে জাল খতিয়ান রাখতো তাতে দেখা যেতো ধার কখনই শোধ হতো না। সরকার আইন পাস করেছিল এই দুর্নীতি প্রতিরোধের কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

যেমন সূতী ব্যাবসার দর পরে গিয়েছিল। ফলে কৃষকরা সমস্ত অসুবিধাকে তুচ্ছ করে সরকার এবং মহাজনদের চাহিদা মেনে নিয়েছিল। কোনরকম সরকারী উপশম যেমন তকভী লোন মঞ্জুর হয়নি, তাদের নিঃসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা ভয়ংকর বিদ্রোহে পৌঁছে ছিল, যার ফল মহাজনদের হত্যা, তাদের হিসেবের কাগজ পোড়ানো, এবং সার্বিকভাবে লুঠ করা হয়েছিল তাদের দোকানপত্র। এই বিদ্রোহ ৩৩টি তালুকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ৩ মাস ধরে চলেছিল, শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এই বিদ্রোহের পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছিলেন। সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, পুরনো ঋণ মকুব আইন করে কৃষকদের যন্ত্রনা উপশম করার চেষ্টা করেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে নীল চার্লসওয়ার্থ দেখেছিলেন মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে সামান্য কলহের ছবি। সরকারের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তিকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন একটি অতিকথা (Myth) হিসেবে। যাইহোক আয়ান ক্যাটানাথ সমর্থন করেছেন গ্রামীণ ঋণের ব্যাপারে সরকারী ঋণের ঔদাসীন্য। অন্যদিকে ঐতিহাসিক রবীন্দ্র কুমার বলেছেন, এই ব্যাপারে কোনও পক্ষকেই দোষ না দিয়ে বরং পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু ডঃ চিত্তব্রত পালিত-এর মতে, বিদ্রোহের জন্য সমানভাবে দায়ী ছিল সরকার এবং মহাজনরা। এটা উত্তেজিত করে তুলেছিল জনমতকে দীর্ঘকালের জন্য এবং শেষপর্যন্ত পুনা সার্বজনিক সভার কারণে জনগনের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৬.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতক জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিরোধ ভারতবর্ষের সকল দিক থেকে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে। সাঁওতাল বিদ্রোহ বা আন্দোলন ছিল মহাবিদ্রোহের একটি সহায়ক অবস্থা। ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং রাজস্ব ব্যাবস্থা ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলেছিল ঐতিহ্যগত স্বনির্ভর সম্প্রদায়গুলিকে। উপজাতি এলাকাগুলিও বলপূর্বক ব্রিটিশ প্রাধান্যে আনা হয়েছিল। সাঁওতালরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না; তারা সরে এসেছিল তাদের নিজস্ব স্থান হাজারীবাগ থেকে; ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাড়ার কারণে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে কৃষিকার্যের পদ্ধতির কারণে। সাঁওতালরা ভাগলপুরে চলে গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের সাঁওতাল রাজ তৈরি করেছিল। যখন মুঘলরা এখানে কর্তৃত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাদের ওপর, তখন তারা মুঘলদের করদ হিসেবে বার্ষিক রাজস্ব দিতে রাজি হয়েছিল নিজেদের স্বায়ত্ত শাসন ধরে রাখার জন্য। কিন্তু যখন ব্রিটিশ বক্সারের যুদ্ধের পর জোর দিয়েছিল তাদের

কর্তৃত্বে, তারা দাবী করেছিল বার্ষিক রাজস্ব সাঁওতালদের কাছ থেকে। এটা শেষপর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল সাঁওতাল ও ব্রিটিশদের সরাসরি সংঘর্ষে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য প্রথম লড়াই সমাপ্ত হয় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বীর (Tilaka Majhi) তিলকা মাঝির শহীদত্বের মধ্যে দিয়ে।

সাঁওতালরা এরপর চলে এসেছিল পূর্ব রাজমহলে কিন্তু মালপাহাড়ীরা তাদের সেখানে থাকতে অনুমতি দেয়নি। তারা এরপর যখন নতুন বাসস্থানের সন্ধান করছিল; সেই সময় ১৮১৯ সালে ভাড়া বাতিল (Quit Rent) অনুসারে রাজমহলের সুপারিনটেনডেন্ট জেমস পনটেট তাদের দামিনিকোতে থাকার অনুমতি দেন। সাঁওতালরা জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং প্রায় ২৫০০ একর পতিত জমিকে চাষের যোগ্য ভূমিতে পরিণত করে, আর সেখানে তাদের গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠা করে, ধান, শস্য, তামা, সর্ষে এবং অন্যান্য কৃষিজাত শস্য থেকে উৎপাদিত গ্রামীণ উদ্বৃত্তকে মুছে ফেলার জন্য ১৮৫১ সালের মধ্যে রাজস্বকে দশগুণ বাড়িয়ে ৪৩,০০০ হাজারের ওপরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার তাদের পক্ষে। তাদের মুক্তিবোধের যা সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্রিটিশ সরকার মারওয়ারী এবং ভোজপুরী মহাজনদের এই জায়গায় আসতে অনুমতি দিয়েছিল। তারা সাঁওতালদের রাজস্ব দিয়েছিল সরকারের কাছে এবং প্রবেশ করেছিল তাদের ৫০ শতাংশ সুদ পরিশোধের ভিত্তি'র চুক্তিতে। মহাজনরা আগ্রহী ছিল তাদের মূল্যবান নগদ শস্যের প্রতি যা তারা প্রচুর লাভের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ এজেন্সী হাউসগুলির কাছে বিক্রি করতো। এমন কি তাদের সমস্ত শস্য সমর্পন করার পরও ধার কিন্তু কখনই মহাজনদের হিসাবের খাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তারা বাধ্যতামূলক শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অঞ্চলটিকে তিনটি স্বতন্ত্র বিচারালয়ের অধীনে রেখেছিল যেমন; সুরী, দুম্‌কা এবং মুর্শিদাবাদ। আর সেইসঙ্গে কিছু থানাও। ভুক্তভোগীরা কোনওমতেই এজলাসে উপস্থিত হতে পারতো না এবং দারোগারা অত্যাচার করছিল মহাজনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। সেখানে ছিল অন্যান্য অত্যাচারীরা যেমন; ক্ষুদ্র বাঙালী ব্যবসায়ী এবং সাহা উপাধিধারী দেশী মদের ব্যাবসায়ীরা। কিছু জমিদার এবং নীলকররাও তাদের হয়রান করেছিল। এমনকি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠিকাদাররা তাদের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে নিয়েছিল, অত্যাচার করেছিল এবং সাঁওতাল মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছিল, সাঁওতালরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সিধু এবং কানহু নামে দুজন নেতা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল যেন স্বর্গীয় বিভাগ দ্বারা বিভূষিত হয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। তাঁরা সমর্থ হয়েছিল ১০ হাজার সাঁওতালকে একত্রিত করতে বিদ্রোহের পক্ষে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল যখন দুম্‌কার দারোগা মহেশলাল দত্ত ভাগলপুর জেলে কার্যোপলক্ষে যাচ্ছিলেন তখন এক সাঁওতাল মাঝিকে তার ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি বারহাইতের কাছের মাঠ পেরোচ্ছিলেন, তখন সাঁওতালরা তাকে আক্রমণ করে এবং তার শিরোচ্ছেদ করে আর মাঝিকে মুক্ত করে। এরপর তারা ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং মেরে ফেলে অনেক অত্যাচারীদের, যাদের মধ্যে কিছু দারোগাও ছিল। ব্রিটিশরা এরপর তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে আসে এবং তিন দিক থেকে আক্রমণ শানায় এবং সম্পূর্ণভাবে সাঁওতালদের পরাভূত করে। বহু সাঁওতালের মুন্ড মাটিতে গড়ায় আর সিধো কানহু এই সংঘর্ষে মারা যায়। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ ছিল চূড়ান্ত সংগ্রাম ব্রিটিশ আর্থ-রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহের পরে সাঁওতালদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করেছিল। সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সাঁওতাল জেলা। ১৮৬৪ সাল থেকে আমরা দেখতে পাই তাদের জমির খাজনা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এই সম্প্রদায়টিকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছিল। সাঁওতালরা মানিয়ে নিতে পারেনি চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের সঙ্গে কিংবা বলা যেতে পারে বাঙালী রায়তদের প্রথাগত কৃষি ব্যাবস্থার সঙ্গে তারা ক্রমশ কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিল আর তাদের গ্রামগুলি ভেঙে পড়েছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তারা শুরু করেছিল ঘেরওয়ার বা শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এর ফলস্বরূপ ১৮৮০-তে দেখা দিয়েছিল মাঝি আন্দোলন। যেখানে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল জনসংখ্যা গণনা ও জমি জরিপের

কাজকর্মকে। তাদের আন্দোলনের কখনও মৃত্যু হয়নি এবং যা পরবর্তীকালে বর্তমানের ঝাড়খন্ড আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

৬.৫ মুন্ডা আন্দোলন

মুন্ডারা হলো আর একটি আদিম উপজাতি সম্প্রদায়। যারা বিহার প্রদেশেব রাঁচি এবং হাজারিবাগ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতো। এদেরও একইরকম প্রাচীন সম্প্রদায়গত পদ্ধতি ছিল। এরাও ছিল ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যাবস্থার কঠোরতার শিকার। অরণ্য আইন তাদের জঙ্গল এবং অরণ্য জীবন থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। এবং আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল মিশনারী সাহেবরা সক্রিয় ছিল তাদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে এবং একইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নতজানু হতে শেখাতে। উপজাতি পরম্পরা অনুসারে মুন্ডারা তাদের যৌথ জমি চাষ করতো, যার নাম ছিল খুন্তাকাতি (Khuntakatii)। কিন্তু এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে লাগলো নতুন জায়গীরদার, ঠিকাদার এবং মহাজনদের অনধিকার প্রবেশের ফলে। মহাজনরা ধীরে ধীরে তাদের চিরস্থায়ী ঋণের জালে মুন্ডাদের জড়িয়ে ফেললো এবং তারা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো। মুন্ডায় তাদের মকদ্দমা বিচারালয় বা এজলাসে নিয়ে গেল কিন্তু কোনওরকম সুবিচার পেল না। মিশনারী সাহেবরা মুখে সমবেদনা জানালেও এতে কোনও কাজ হলো না। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে সমগ্র রাঁচীতে বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ বা উলগুলান সংগঠিত হলো।

১৮৭৪ সালে বীরসা মুন্ডার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন ভাগচাষীর সন্তান। কিন্তু তিনি কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে। তাঁরও ছিল সিধো-কানহো'র মতো এক গভীর দৃষ্টি। এবং তিনি মুন্ডাদের মুক্তি আন্দোলনে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মুক্তিদাতায় পরিণত হয়েছিলেন। মুন্ডারা তাঁকে ঘিরে সমবেত হয়েছিল এবং ঈশ্বর বলে চিহ্নিত করেছিল। বীরসা খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়েছিলেন কৃষি এবং রাজনৈতিক অসুবিধাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমে পরিণত হয়েছিল অত্যাচারীতদের প্রতি মুন্ডাদের গেরিলা যুদ্ধ। এরা ছিল ভূস্বামী, মহাজন, জেলা বিচারক, এবং খ্রীষ্টানগন। তারা বন্ধ করে দিয়েছিল খাজনা দেওয়া এবং তাদের সীমানা থেকে ব্রিটিশ অপসারণ চাইছিল। ১৮৯৯ সালর ২৪ ডিসেম্বর মুন্ডারা আক্রমণ করেছিল রাঁচি এবং সিংভূম জেলার চার্চ, সরকারী কার্যালয় এবং পুলিশ চৌকি। এছাড়াও মুন্ডা সেনারা ভূস্বামী এবং মহাজনদের আক্রমণ করেছিল। যাইহোক তারা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। বীরসা মুন্ডা ধরা পড়েন এবং পরে জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুন্ডা বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়।

যাইহোক এই আন্দোলনের প্রভাব সরকারের ওপর পড়েছিল। ১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জরিপ ও বন্দোবস্তের কাজে এবং ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর ''Tenancy' আইনে। মন্ডাদের 'Katti' অধিকারের মধ্যে দিয়ে যা চিহ্নিত হয়েছিল। জবরদস্তি মূলক শ্রম ব্যাবস্থা বা 'বেথ-বেগারি' মুছে দেওয়া হয়েছিল। এই মুন্ডা বিদ্রোহের স্মৃতিতেই পরবর্তী সময় ছোটনাগপুরের ওঁরাওদের মধ্যে 'থানা ভাগথ' আন্দোলন প্রেরনা পেয়েছিল। মুন্ডাদের মধ্যে বীরসামুন্ডা ঈশ্বররূপে পূজিত হতে লাগলেন। তিনি মুন্ডা তথা সমগ্র মানুষের স্মৃতিতে লোকসংগীত আর লোকগল্পের মধ্যে দিয়ে বেঁচে রইলেন। মুন্ডা বিদ্রোহকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন, জাতীয়তাবাদী, নিম্নবর্গীয়, অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খন্ড আন্দোলন— ব্যাখ্যা যাইহোক না কেন এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকাকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. আর. দেশাই—পেজেন্ট স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া

২. ডি. এন. ধানাগারে—পেজেন্টস্ মুভমেন্ট ইনি ইন্ডিয়া

৩. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের গণতান্ত্রিক কৃষক সংগ্রাম (বাংলা বই)

৪. ব্লেয়ার কিং—দি ব্লু মিউটিনি

৫. চিত্তব্রত পালিত— টেনশনস্ ইন বেঙ্গল রুর‍্যাল সোসাইটি

৬. কে. কে. সেনগুপ্ত— দি পাবনা আপরাইজিং অ্যান্ড পলিটিকস্ অফ রেন্ট

৭. চিত্তব্রত পালিত— পারসপেকটিভস্ অন্ অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল

৮. এন. চার্লসওয়ার্থ—পেজেন্টস্ অ্যান্ড ইমপিরিয়াল রুল

৯. আর. কুমার—ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্যা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী

১০. সি. পালিত—রিভোল্ট স্টাডিজ, দ্বিতীয় খণ্ড

১১. কে. কে. দত্ত— দি সানতাল ইনসারেকশন

১২. আর. গুহ—এলিমেন্টারী অ্যাসপেক্টস অব পেজেন্ট ইনসারজেন্সী ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া

১৩. এস. মল্লিক—ট্রানসফরমেশন অব সানতাল সোসাইটি

১৪. ডি. এন. বাস্কে—সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস (বাংলা বই)

১৫. কে. এস. সিং—ডাস্ট স্টর্ম এ্যান্ড দি হ্যাংগিং মিস্ট

১৬. কে. এস. সিং—দি বীরসা মুভমেন্ট

৬.৭ অনুশীলনী

১. নীল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এবং এই বিদ্রোহে কৃষক ও জমিদারদের ভূমিকা কি ছিল?

২. কি Politics of rent. শেষ হয়েছিল পাবনা বিদ্রোহে? এবং এই প্রসঙ্গে Agrarian League (কৃষক সংঘের) ভূমিকা কি ছিল?

৩. ব্রিটিশরা কতটা দায়ী ছিল ডেকান বিদ্রোহে? এটা কি শুধুই মহাজনদের বিরুদ্ধে একটি সংঘাত?

৪. সাঁওতাল বিদ্রোহ কি ভাবে ওপেনিবেশিকবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল?

৫. মুন্ডা বিদ্রোহে বিরসার ভূমিকা আলোচনা কর?

একক ৭ ❑ সম্পদ নিষ্কাশন নীতি

গঠন

৭.০ সম্পদ নিষ্কাশন
৭.১ অবশিল্পায়ন এবং বিতর্ক
৭.২ গ্রন্থপঞ্জি
৭.৩ অনুশীলনী

৭.০ সম্পদ নিষ্কাশন

সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্বকে দুটি ধাপে পড়া যায়—

(ক) Company-র শাসনে ভারতবর্ষ

(খ) British সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে company'র সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌল্লার চরম পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে কোম্পানীর শাসন শুরু হয়েছিল। মীরজাফর সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পরবর্তী নবাব হিসেবে কোম্পানীকে ১৭ কোটি টাকার বিনিময়ে নবাবপদে আসীন হয়েছিলেন। কোম্পানী ক্রমেই হয়ে উঠলো সর্বেসর্বা এবং মীরকাশিম থেকে মীরজাফর বারবার একই পদ্ধতিতে তারা সম্পদ নিষ্কাশিত করেছিল। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর বিশাল অঙ্কের লাভ উঠে এসেছিল রাজস্ব সংগ্রহের ভিতর দিয়ে। কোম্পানী ভোগ করছিল কর্তব্যযুক্ত অন্তঃর্দেশীয় বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আর এমনকি কোম্পানীর কর্মচারীরাও দস্তকের অপব্যাবহার করছিল তাদের নিজস্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ক্লাইভ এবং হেস্টিংস-এর মতো গভর্নরগণ অগাধ সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং একই পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তখন থেকেই প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে যান। সরকারের বাহ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যাবসা ধরে রেখেছিল এবং আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রচুর লাভ করেছিল। সনদ আইন কোম্পানীর ব্যাবসা শাখাকে ছেঁটে দিয়েছিল। ততদিনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল, মূল্যের হিসেবে যা ৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

ইংলন্ডে সরাসরি সম্পদ নিষ্কাশণ ছাড়াও গোপন পথেও তা নিষ্কাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রসারণের মূল অর্থকরী শক্তি, বাংলার রাজস্ব আয়ের ওপর নির্ভর করতো। এমনকি অর্থ যোগান দেওয়া হতো, মাদ্রাজ এবং বোম্বের কোষাগারে আর বহুদূরের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশে।

যখন ভারতবর্ষ কোম্পানী সরকারের হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশি রাজতন্ত্রের আওতায় এলো তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষ বিদেশী প্রশাসনের অধীনে এসেছিল, সেক্রেটারী অব স্টেট এবং তার সেক্রেটারিয়েটের মারফত। এর অর্থ হ'ল বিরাট সম্পদের নিষ্কাশন। সরকার জবরদস্তি মূলক হোম চার্জ আদায় করেছিল এবং বিশাল পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং ধার্য করেছিল প্রশাসন চালানোর জন্য যা আর. সি. দত্তের ১৯০২-১৯০৩ সালের লেখায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব দূরবর্তীস বিষয়গুলি ছিল যেমন, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মচারীদের পেনসন আর বকশিস্ লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে, তাছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে। ৫% নিশ্চিত সুদ ভারতীয় রেলের দেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের লাভ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি।

এই সমস্ত খাতে সম্পদের নিষ্কাশন ভারতবর্ষকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছিল এবং সম্পদশালী ভারতের সম্বন্ধে কথিত অতিকথা (Myth) প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের ফলে খন্ড খন্ড হয়ে পড়েছিল, ভারতীয় জনসমাজের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের উন্মেষে যা আমরা উইলিয়াম ডিগ্‌বির 'সমৃদ্ধশালী ব্রিটিশ ভারত' নামক গ্রন্থে দেখতে পাই। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত দাদাভাই নৌরজী একই সঙ্গে তাঁর লেখা বা বক্তৃতায় British Parliament-এ ভিতরে বা বাইরে তাঁর প্রিয় সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র নিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাইহোক তাঁর গ্রন্থের নামটা ছিল অত্যন্ত মধ্যপন্থী অর্থাৎ "Poverty and Unbritish rule in India" এই কাজটির বিষয়বস্তু ছিল প্রগতিশীল। ভারতীয়দের মাথাপিছু গড় আয় এবং তাদের দেয় রাজস্ব এবং ভারতীয় অর্থ যা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে চলে গিয়েছিল তার পরিসংখ্যান। তিনি এটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছিলেন এবং একই সময়ে আর. সি. দত্ত ১৯০২ থেকে ১৯০৩-এ ভারতবর্ষের জনগণের দারিদ্র ছিল বস্তুত, সম্পদ নিষ্কাশনের প্রত্যক্ষ ফল। ভারতের প্রগতিশীল ব্রিটিশ ভাবমূর্তি, পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর সওয়ালের কোনও উত্তর দেন নি। কিছু কিছু ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ যেমন, থিওডোর মরিসন এবং ভেরা অ্যানস্টে চেষ্টা করেছিলেন সওয়াল করার, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগ অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল তার অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনায়। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে দিয়েছিল অত্যন্ত উন্নত প্রশাসন, সেনাবাহিনী, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রেলওয়ে, ডাক ও তার ব্যবস্থা, যা ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগে উন্নীত করেছিল। ব্রিটিশ লগ্নীকারীরা ভারতবর্ষে প্রচুর শিল্প গড়ে তুলেছিল। অর্থ যোগান দিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ব্যাবস্থাকে উন্নত করার জন্য ঝুঁকি নিয়ে তার পরিচালনা করেছিল। ভারতীয় সাংবাদিক এম. ডি. রাণাডে এবং জি. সি. যোশী এই বিশেষজ্ঞদের বলা কথাগুলির মধ্যে তার কারণ খুজে পেয়েছিল। তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন ইংলন্ডের কাছে ভারতের ঋণ, কিন্তু আর.সি. দত্ত ভারতের কাছে ইংলন্ডের যে ঋণ তা দেখান নি। পুনঃপুনঃ ঘটিত দুর্ভিক্ষ এবং গন-দারিদ্রের প্রসঙ্গে তংাদের অবস্থান হয়ে উঠেছিল ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক একজন রাজতন্ত্র এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। দাদাভাই দেখিয়েছিলেন তাঁর সম্পদ নিস্কাশন তত্ত্বে, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতীয় দারিদ্র অত্যন্ত গভীরভাবে অন্যান্য দৃষ্টিকোণগুলি থেকে। এটি ছিল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন যা শেষ পর্যন্ত ছিল সম্পদ নিষ্কাশন এবং দারিদ্র্যের কারণ। ব্রিটিশ শাসনের দু-দিক থেকে এদেশ ছেড়ে যাওয়ার একটি ছিল কারণ।

৭.১ অব-শিল্পায়ন এবং অব-শিল্পায়ন বিতর্ক

ইওরোপীয়দের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের ধনসম্পদ নিয়ে বাণিজ্যিক বিশ্বে এক বিরাট কিংবদন্তী চালু ছিল এবং দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের উত্তেজিত করতো 'সব পেয়েছির দেশ' ভারতবর্ষের ধনসম্পদ আহরনের কল্পনাতে। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন এবং 'Nabobs' দের অবিশ্বাস্য ধন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে যাওয়া, বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির প্রতিযোগিতা এবং মুক্ত ব্যবসায়ীদের কল্পনার প্রজ্জ্বলন ঘটেছিল। অতিরঞ্জন সত্ত্বেও ঘটনা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ ছিল সার্বিকভাবে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ যদিও সেই সম্পদ ছিল কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রিভূত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন করেছিলেন এবং এই শহর সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক গান গেয়েছিলেন যে 'এই শহর ব্যাপক জনসমৃদ্ধ আর ধনী অনেকটা যেন লন্ডনের প্রায়, সঙ্গে এই তফাৎ যে সেখানে ছিল ব্যক্তিগত অসীমত্বের প্রথম অধিকার, পূর্বের শহরের থেকে আরও প্রবল সম্পদ। মানুচ্চি তাঁর স্মরনিকায় লিখেছিলেন, মুঘলদের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা ছিল ফ্রান্স-এ সর্বাধিক পরিচিতি। সেখান থেকে বিশাল ধনীদের ইউরোপে আসাই প্রমাণ করে এর বিশাল সমৃদ্ধির কথা। আমরা একটু ঝুঁকি নিয়ে বলতে পারি যে, এটা কোনও অর্থেই ইজিপ্ট-এর তুলনায় নিম্নতর নয়, এমনকি এটা ছাপিয়ে গিয়েছিল, সিল্ক, সুতী, চিনি, ও নীল উৎপাদনে যেই দেশকেও সমস্ত জিনিস এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। যেমন ফল, মটর, শিম ইত্যাদি। শস্যদানা, মসলিন, বস্ত্রাদি সোনা এবং সিল্ক। ভারতবর্ষের

বহিঃর্দেশিয় বাণিজ্যের বিস্তার ধরতে পারা যায়, নিচের কয়েকটি পংক্তি থেকে। সপ্তদশ শতকের শেষে বিশাল পরিমাণ সস্তা ছিট-কাপড় মসলিন এবং উজ্জ্বল ভারতীয় ছাপানো সুতির কাপড় ইংলন্ডে আমদানী করা হতো। তারা দেখেছিল সিল্ক এবং উল-এর নির্মাণকারীরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠেছিল। তদনুসারে বলা যেতে পারে পার্লামেন্ট-এর আইন পাস হয়েছিল ১৭০০ এবং ১৭২১-এর মধ্যে যা পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কতগুলি বিশেষ স্বতন্ত্র বিষয়ে। বলা হয় পোষাক পরিচ্ছদ অথবা আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে ইংলন্ড-এ রং করা সুতির কাপড় বা ছাপনো কাপড়ের নিযুক্তি এবং রঙ করা জিনিস বা ছাপানো জিনিসের যে কোনও ব্যবহার যার মধ্যে সুতি তৈরী ছিল সবচেয়ে বেশী।

I.C.A. Knowles দেখিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে ইংলন্ড-এর বাণিজ্য সমস্যা। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের কঠিন সমস্যা শায়িত ছিল। বস্তুত এই যে, ইওরোপ খুব কম সংখ্যক জিনিসই পাঠিয়েছিল যা প্রাচ্য চেয়েছিল। সামান্য বিলাসিতার উপকরণ রাজ্যসভার জন্য—তামা, দস্তা, টিন, পলা, সোনা ও গজদন্ত, রূপো বাদ দিয়ে এগুলি একমাত্র পণ্যদ্রব্য ছিল যা বিশ্ব গ্রাস করেছিল। অতঃপর এটি ছিল প্রধানত রূপো যা নিস্কাশিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পগুলির গুণগত মান এবং শৈল্পিক দক্ষতা ১৯১৬ থেকে ১৯১৮-র "Indian Industrial Commission" রিপোর্টে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর ভূমিকায় আমরা পড়ি—একটা সময় যখন ইওরোপের পশ্চিম, আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার জন্মভূমি অধিকৃত হয়েছিল অসভ্য উপজাতিদের দ্বারা, ভারত তখন বিখ্যাত ছিল তার শাসকদের সম্পদের জন্য এবং কারিগরদের উচ্চ-শৈল্পিক দক্ষতার জন্য। এমনকি অনেক পরবর্তীকালে যখন পশ্চিম থেকে দুঃসাহসিক ব্যবসায়ীরা প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন এদেশের শিল্পের উন্নতি কোনওভাবেই ন্যূনতম ছিল না। অনেক বেশী অগ্রগতি সম্পন্ন ইওরোপীয় দেশগুলির তুলনায়।

আর. এম. মার্টিনের সাক্ষ্য ১৮৪০ সালের 'Parliamentary Enquiry Committee'-র ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য—আমি মানতে পারি না যে, ভারতবর্ষ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারতবর্ষ যতখানি শিল্পভিত্তিক দেশ ঠিক ততখানি কৃষিভিত্তিক এবং যে যে কিনা সন্ধান করছে, যে তাকে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিণত করতে চায় তাকে সভ্য দেশগুলির থেকে নিম্নে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল তাদের, আমি স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে ইংলন্ড-এর কৃষিকর্মের ক্ষেত্র। যে একটি শিল্প নির্মাণকারী দেশ। তাঁর শিল্প নির্মাণকারীরা নানারকমভাবে অস্তিত্বময় ছিল বহুদিন ধরে এবং কখনই সমর্থ ছিল না কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যেখানে পরিস্কার কার্য তাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল। আমি এখন তার কাশ্মিরী-শাল কিংবা ঢাকা মসলিনের কথা বলছি না। বরং আরও নানা জিনিসপত্র সে নির্মাণ করেছিল, যা কিনা পৃথিবীর যে কোন অংশের থেকে গুনগত মানে উচ্চ। এখন তাকে নিম্নতর অবস্থায় এনে শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক দেশ বললে, ভারতের পক্ষে তা অবিচার করা হবে।

উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ, সমস্ত আবশ্যকতাসহ পরিণত হয় নির্মাণকারী বাণিজ্যিক রাষ্ট্র হিসেবে। ভারতবর্ষ গর্ব করতে পারতো তার সমৃদ্ধশালী সম্পদের জন্য, যা তাকে স্থাপন করেছিল ভুলের উর্ধ্বে 'Indian Industrial commission-এর প্রতিবেদনে। এর ছিল সম্পদ ও দক্ষতা, এর ছিল ব্যাঙ্ক ও জাহাজ ব্যবসা, ছোট ও বড় ব্যবসায়ী যারা সমাবেশ ঘটিয়েছিল উৎপাদনের জন্য সম্পদের; এর ফলে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত হয়েছিল। ব্যাঙ্কারদের তালিকায় প্রথম স্থানেই ছিল জগৎ শেঠের গদি। সরকারী খাজনার বা রাজাদের সংরক্ষক হিসেবে, বাণিজ্যিক ঋণের ব্যাবসায়ী, বুলিয়নের আড়তদার এবং প্রচলিত মুদ্রার নিয়ন্ত্রক হিসেবে। এটি কার্যত শ্রান্ত ও লালিত হয়েছিল বাংলার বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে। এর গুরুত্ব ও যোগ্যতা স্থাপন করেছিল দেশীয় ব্যাঙ্কিং বৈশিষ্ট্যের সমহারে যে কোনও ইউরোপীয় প্রতিরূপ। অধিকন্তু ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশ কিছু 'সরফস্' যাঁরা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে ছিল। সুরক্ষার বদলে সমমূল্যে অর্থলগ্নী যারা করতো, অন্তঃর্দেশিয় বাণিজ্যের বৃহত্তর সচলতাকে নিশ্চিত করার জন্য। বাংলা এবং বোম্বের বাঙালি ও পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু খ্যাতনামা জাহাজ ব্যবসায়ী ছিলেন যাঁদের নিজস্ব ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন

বাণিজ্য জাহাজ ছিল। ভারতীয় জাহাজ সমূহ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে শঙ্কার কারণ ছিল। যা জানা যায়, বিদেশ থেকে, আসা জিনিসপত্র যা ভারতীয় নাবিক, লস্কর ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত ছিল, সেই সকল জিনিসপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা থেকে। (54 George III, C 136, 1814)

এইভাবে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সন্তোষজনকভাবে উন্নতি করছিল এবং তার সব রকমের প্রত্যাশার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই উন্নতি হঠাৎ কার্যত অচল হয়ে পড়লো, এবং এক শতকের স্থির হয়ে থাকা গতি ভারতবর্ষের ঘড়ির কাঁটাকে উল্টোমুখে অনুসরণ করেছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক আর. সি. দত্ত সমস্যার সতর্ক অনুসন্ধানের পর দ্বিধাহীনভাবে এই উপসংহারে এসেছিলেন যে, দেশীয় শিল্প এবং ব্যাবসার ধ্বংস ছিল বাংলা থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের সরাসরি ফল এবং পার্থক্যসূচক বা প্রভেদমূলক ব্রিটিশ রাজের অর্থনৈতিক নীতি দেশীয় উদ্যোগগুলির বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সরকার কৃত নানাভাবে আমাদের শিল্প ও বানিজ্যকে আক্রমণ অভিজাত মহৎ ব্রিটিশদের কাছে অনাবৃত হয়ে পড়েছিল, তাঁরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ভয়ানক লালসা প্রত্যক্ষ করে। আমরা এই ধরনের রক্তমোক্ষনকারী ঘটনার উল্লেখ পাই ১৮৩৮ সালে আর. এম মার্টিনের লেখায়—বার্ষিক সম্পদ নিষ্কাশন ব্রিটিশ ভারতের ওপর £ ৩,০০০০০০ পাউন্ড যার মোট পরিমাণ ৩০ বছরে ১২ পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, এক বিশাল পরিমাণ অঙ্কের £ ৭২৩,৯৯৭,৯১৭ কোটি টাকা বা স্টারলিং। নিত্য চলতে থাকে এই নিষ্কাশন এমনকি যা ইংলন্ডকেও খুব তাড়াতাড়ি দরিদ্রে পরিণত করতে পারতো। তার মানে কি সাংঘাতিক-এর প্রভাব ছিল ভারতবর্ষের ওপর। যেখানে শ্রমিকের মজুরী ছিল দিনে দুই পেন্স থেকে তিন পেন্স। অর্ধ শতকের জন্য আমরা চলেছিলেম সম্পদ নিস্কাশনের মধ্যে দিয়ে। কখনও কখনও দুই থেকে তিন কিংবা কোনও সময় চার মিলিয়ন পাউণ্ড স্টারলিং বছরে আসতো ভারতবর্ষ থেকে, যা পাঠানো হয়েছিল ইংলন্ডে বা গ্রেট ব্রিটেনে। আমার মনে হয় এটা কখনই সম্ভব নয়, মানুষের কৌশলে নিবারণ করা যাবে, সম্পূর্ণ অশুভ প্রভাব; ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা বছরে তিন থেকে চার মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ বহুদূরের দেশ ভারতবর্ষ থেকে নিস্কাশন যা কিনা কখনই ফিরে আসেনি কোন আকারে।

এফ. জি. শোর, ১৮৩৩ সালে মন্তব্য করেছিলেন, এটা কি সম্ভব যে কোনও দেশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এই ধরনের একটি সম্পদ নিস্কাশনের মধ্যে যার থেকে সে নিজের দেশকে রক্ষা করতে পারে দারিদ্রের হাত থেকে।

রাজস্ব নির্য্যাসের জায়গা থেকে লর্ড স্যালিসবারি ভারতের "রাষ্ট্র সচিব বলেছেন, অত্যন্ত তিক্তভাবে ব্যাঙ্গোক্তি করেছেন যে, যেহেতু আগে থেকে ভারত রক্তাক্ত হয়েই আছে, যেখানে রক্ত জমাট বেঁধে বা অধিক হয়ে আছে যেখানেই চিকিৎসকের ছুরি চালানো দরকার। যারা আগে থেকেই রক্তহীন হয়ে আছে তাদের ক্ষেত্র নয়।" এটা ছিল গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর পক্ষে এক আবেদন। যেখানে মূলধন প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু সম্পদের নিস্কাশন অনেক বেশী পরিচিত যা উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকে, দেখা যাক্, অসমান আইন এবং প্রভেদ ঘটাতে পারে এমন জিনিস যা আমাদের উদ্যোগগুলিকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। আমরা আবার মার্টিনের কথায় ফিরে আসি যাঁর পক্ষপাতিত্বহীন সমালোচনা দেখিয়েছিল সেই লুণ্ঠনকারী পদ্ধতিটিকে। আমি ইতস্তত হয়ে কিছু বলছি না যে, ভারতবর্ষের প্রতি ইংলন্ড প্রদর্শন করেছিল কৃপণ, স্বার্থপর, অনুদার এক ধরণের ব্যবহার যার মধ্য দিয়ে সে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিচালিত করেছিল ওই দেশের সঙ্গে, তার অবিরাম ক্রন্দন, রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য সুযোগ সুবিধা, তার বাস্পীয় কারখানায় তৈরী জিনিসপত্র কলকাতার জন্য ছিল শতকরা এক বা দুই ভাগ। যেখানে বিজয়ির স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি, যে অরোপ করেছিল হিন্দুদের শ্রমসিদ্ধ বা কারখানায় তৈরী জিনিসপত্রের ওপর শতকরা দশভাগ রাজস্ব এবং একই সময় আরোপিত হয়েছে ভয়ানক ক্লেশকর অথবা নিষিদ্ধজনক বিষয়, তার চিনি কফি ইত্যাদির ক্ষেত্রে। দেখা

যাচ্ছে ইংলন্ড সতর্ক হয়ে স্মরণ করছে সেই অসম্মানকর নীতি যা তার উপনিবেশ 'United States of America'-কে হারিয়েছিল।

ভারতীয় শিল্প উৎপাদন সম্পর্কে থর্নটন ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—যাইহোক সে অবশ্যই খুব সোজা পথে সাফল্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা যদি বলি, আমরা তার শিল্প উৎপাদনগুলির সম্বন্ধে কোনও ভাবেই ভগ্নোৎসাহ হবো না। যদিও আমাদের স্মারক গ্রন্থ সেই শর্তসমূহ ধারণ করেছিল, যা বাদ দিয়েছিল তার ভোগ্য সামগ্রী থেকে চিনিকে এবং প্রসারণ ঘটিয়েছিল তার সূতি ও সিল্ক বস্ত্রসমূহের। পূর্বের জিনিসগুলি এই দেশে ব্যয় করা হয়েছিল ১০% ভাগ রাজস্বের সঙ্গে। শেষোক্ত বিষয়টা ছিল আরও পীড়াদায়ক ২০% রাজস্ব, যেখানে ব্রিটিশ আমদানীকৃত জিনিসপত্র ভারতে ঢুকতো কোনও রকম শুল্ক ছাড়াই। যদি কোনও রকম প্ররোচনা সেখানে দেখানো হতো, এটা অবশ্যই দুর্বলতার কাজ হতো। এখানে ঘটনাটা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে।

আসা যাক খোলাখুলি পরিসংখ্যানে। আবারও মার্টিন-এর প্রসঙ্গ ধরে বলতে পারি— ইংলন্ড ব্রিটিশ ভারতের মানুষকে বাধ্য করেছিল ২$\frac{১}{২}$% হারে তাদের বাষ্পীয় কারখানায় তৈরী জিনিসপত্র গ্রহণ করতে। যেখানে সে চাপিয়ে দিয়েছিল ২০% থেকে ৩০% হাতে তৈরী শ্রমসিদ্ধ সূতী ও সিল্ক হিন্দুদের ওপর, তার চিনিতে শতকরা ১৫% ভাগ শুল্ক বসানো হয়েছিল, কফিতে ২০০% ভাগ, গোলমরিচে ৩০০% এবং মদে ৫০০% যখন এগুলি আমদানী করা হতো যুক্তরাষ্ট্রে।

আমরা এই বিষয়টা Wilson-এর ভাবনাতেও লালিত হতে দেখি— এর সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিল ১৮৩১-এ যখন ভারতবর্ষের সূতী ও সিল্ক-এর জিনিসপত্র ৫০% থেকে ৬০% দামে ব্রিটিশ বাজারে লারে জন্য বিক্রি করা হয়েছে একটা সময় পর্যন্ত। ওই সকল জিনিসগুলি থেকে নিম্নতম যা ইংলন্ডে বুনে তোলা হয়েছিল। ফলস্বরূপ এটা প্রয়োজনীয় হয়ে ৭০% থেকে ৮০% রাজস্বকে রক্ষা করা তাদের মূল্য অনুসারে বা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার দ্বারা।

ম্যানচেস্টার এবং 'Paisley' বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের উৎপাদনের প্রথম ধাপ এবং অতিকষ্টে চালু করেছিল তার গতি এমনকি বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে তারা ভারতীয় জিনিসপত্রের ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

রপ্তানী বাণিজ্যের কথা থাক, এমনকি অর্ন্তঃদেশিয় ব্যবসা পরিচালিত হয়েছিল ব্যবসায়িক শ্রেণীর দ্বারা, যা কিনা সন্ধান করেছিল কিভাবে জোর করে মাল চালানোর রাজস্ব, হয়রানী, অগ্রাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবহার ব্রিটিশদের সঙ্গে বন্ধ করা হয়েছিল। আইনসভা এবং অন্যান্য জায়গায়। ট্রেভেলিয়নের প্রতিবেদনে এই সাক্ষ্যের ওপর অন্তঃর্দেশীয় শিল্প দাঁড়িয়েছিল। লর্ড এলেনবরা, ১৮৩৫ সালে পার্লামেন্টে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা লিখিত হয়েছিল এর থেকে কাঁচা পশুচর্ম দিয়েছিল ৫% যখন এটি চামড়ায় পরিণত হতো তখন দেওয়া হতো ৫% -এর ও বেশী; যখন চামড়া পরিণত হতো বুট এবং জুতোয় তার ওপর আরও ৫% শুল্ক ধার্য করা হতো। এইভাবে যেখানে ১৫% শুল্ক ছিল, ভাতীয় চামড়ার জিনিসপত্র যা ভারতে ব্যবহৃত হতো।

অন্তঃদের্শিয় রাজস্বকে কেন্দ্র করে কম করে ২৩৫টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। যে শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তার বেশীরভাগটাই ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবহার। এবং তার কাজের জন্য, এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল সেই পদ্ধতি যা ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অপ্রীতিকর চরিত্রের দিক থেকে এবং রাজস্বের বস্তুগত কোনও লাভ ব্যাতিতই।

শোর নথিভুক্ত করেছিলেন তাঁর খসড়ায়—অন্যান্য কারণগুলিও অবশ্যই সেখানে উল্লিখিত ছিল, প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক আত্মবিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ ঋণের ধ্বংস সাধন আমাদের পৌর আদালতের উৎসাহে হয়েছিল... অসততা হলো... কোনও ভাবেই নয় 'আদৌ স্পষ্ট' এইভাবে ভারতীয়রা কার্যত বাধ্য হয়েছিল একইসঙ্গে অন্তঃর্দেশীয় এবং

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবসর নিতে। একইরকম বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখা দিয়েছিল ভারতীয় মাল জাহাজে করে আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে, যাকে কদাচিৎ বলা হতো জাহাজের মাল বোঝাইকরণ এবং এটা আগেই ১৮১৪-র নেভিগেশন আইনের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। ভারতীয় জাহাজসমূহ অস্বীকার করেছিল ইংলন্ড-এর জাহাজের মাল বোঝাই করনের অধিকারকে।

আর. সি. দত্ত তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ একমুখী মুক্ত বাণিজ্য নীতি, কিন্তু তিনি প্রমাণ করেন নি, সেখানে ছিল একইসঙ্গে একটি সংগ্রামশীল উদ্যোগী শ্রেণী। যাঁরা বৃথাই তাদের মাথা তুলবার চেষ্টা করেছিল। তাছাড়াও তিনি এটা নথিভুক্ত করেন নি যে ভারতীয়রা ছিল অনেক বেশী একগুঁয়ে এই পরিস্থিতির আধারে, এবং তারা সম্পূর্ণরূপে উচ্চকিত ছিলেন তাদের প্রতিবাদে। যদি তিনি এটা করতেন? তাহলে তিনি তখনও পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন নি একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারী হিসেবে এবং ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস বা পতন ব্যাখ্যাত হয়নি, তখন পর্যন্ত ভারতীয় নিরপেক্ষ ব্যাবসার দৃষ্টিকোণ থেকে আর দেশীয় উদ্যোগের দক্ষতার খামতির দিক থেকে। ভারতীয় উদ্যোগগুলির ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় আন্দোলনের নথি অবশ্যই এ-সময় উপস্থিত হয়েছিল, এই প্রমাণ করতে যে, ভারতীয় বাণিজ্য বস্তুত কী ধ্বংস হয়েছিল? সম্পদ নিষ্কাশনকে কেন্দ্রে রেখে রামমোহন বলেছিলেন, ইওরোপীয়রা জড়ো করেছিল যে সম্পদ ভারতবর্ষে, তাই তাদের অবশ্যই উৎসাহিত করেছিল ভারতে বাস করতে। সুতরাং সম্পদ কোনও ভাবেই ভারতবর্ষের বাইরে যায়নি।

১৮৩১ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর কলকাতার একটি আবেদনপত্রে দেখা গিয়েছিল, ব্যাবসার ক্ষেত্রে His Majesty's Privy Council-এর সম্মানীয় লর্ড কে লেখা—সই করেছিলেন ১১৭ জন দেশীয় অভিজাত, দেশীয় দাবি খুঁজে পেয়েছিল এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি—সম্প্রতি বছরগুলিতে আপনার আবেদনকারীরা আরম্ভ করেছিল তাদের ব্যাবসা, যা প্রায় অতিক্রম করে গিয়েছিল বাংলায় গ্রেট ব্রিটেনের বুনে তোলা বিষয়গুলি উপভোগ, কোনও রকম রাজস্ব ছাড়াই খাজনা সংগ্রহ করা তার ওপরে দেশীয় কাঠামোর সুরক্ষা। তারা অতঃপর এই প্রার্থনা মেনে নিয়েছিল British দের সুযোগ সুবিধার পক্ষে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুনয় বিনয় করেছিল কর্তৃপক্ষের কাছে রাজস্ব মুক্ত বাংলার সূতী ও সিল্কের ব্যাবসা যেন গ্রেটব্রিটেনে করতে অনুমতি দেওয়া হয়। British জিনিসপত্র যা বাংলায় উপভোগ্য হয়েছিল তার ওপর একই হারে দাম ধার্য করা হয়।

মার্টিন-এর Anglo-Eastern Empire-এ আর একটি কৌতূহলদ্দীপক আবেদন উদ্বৃত্ত হয়েছিল। এই আবেদন পত্রে সাক্ষর করেছিলেন বাংলায় বসবাসকারী একদল ধনী ব্যক্তি। এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা এবং বিশেষভাবে অনেকটাই দেশীয় উৎপাদনকারী শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকেরা ইতিমধ্যে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছিল, ব্যাবসা-বাণিজ্যের এই ধরনের নীতির ফলে। যার সম্বন্ধে আবেদনকারীরা বলেছিলেন, ইংরেজ কাউন্সিল যে কাজে এগিয়ে আসেন নি। ঐ দেশের উৎপাদনের দিকে যা প্রসারিত ছিল না। যেখানে সমস্ত উৎসাহ দাঁড়িয়েছিল ইংলন্ড থেকে রপ্তানির ওপর, ঐ সকল দেশের বৃদ্ধি ও বৈদেশিক উৎপাদনে যেমন ইংরেজ শিল্পের ক্ষেত্রে। যেখানে বহু সহস্র ঐ দেশীয় মানুষেরা যারা কিছুদিন আগেই তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতো সূতীর বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে, তারা খাদ্যহীন হয়ে পড়েছিল ফলে সুযোগ সুবিধা যোগানো হয়েছিল আমেরিকার উৎপাদনে এবং ইংলন্ডের শিল্প উৎপাদনের কারখানা গুলিতে। এবং চিনির ব্যাপারে যেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবেনদকারীদের ভূমিকা অবশ্যই সরে গিয়েছিল, সেইসঙ্গে ইংলন্ডে প্রচুর রাজস্বের ভার যেমন কার্যকরী হয়েছিল পূর্বভারতীয়দের বিরুদ্ধে শিল্পের বাজার সংকুচিত হওয়া। যখন বিশেষ ধরনের পণ্যদ্রব্যের পালা এসেছিল।

১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারী রসিক কৃষ্ণ মল্লিক টাউন হলে তাঁর অগ্নিস্রাবী বক্তৃতায় ১৮৩৩ সালের সনদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, যার থেকে জনমতের পটভূমি তৈরী হয়েছিল। ''এটা পাস হয়েছিল ভারতের লাভের জন্য নয় বরং

ভারত ভাণ্ডারের সত্বাধিকারীদের জন্য এবং ইংলন্ডের সাদা জনগনের লাভের জন্য। এই অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক লক্ষ লোকের কল্যাণের জন্য তাদের চিন্তা ছিল না... যদি আমাদের কল্যাণের কথা তাদের ভাবনায় থাকতো, তাহলে কেন লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যাবসা মুছে যায়নি?.... বৃথাই কি আমি তাকিয়েছি কোনও খন্ডবাক্যের জন্য যা কিনা বলছে ব্যাবসার ওপর থেকে বাধা অপসারনের কথা। ...আমি বলতে পারি না, কলকাতার ব্যাবসায়ীদের উদ্যোগ কি হতে পারে, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যদিও এই কড়াকড়ি অপসারিত হয়ে ছিল যার বশবর্তী ছিল ভারতীয় শিল্পের শ্রমিকেরা। যদি এই দেশ তার ক্ষমতা এবং সম্পদে সৌভাগ্যশালী আর বর্ধিত না হয়ে থাকে, তার থেকেও বেশী এর আগে সে যা ছিল।" একই প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য করি কিশোরীচাঁদ মিত্রের গলায়, যখন 1843 সালে হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটির সূচনা সন্দর্ভে ঘোষনা করেছিলেন—আমি বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যে দৃঢ়কণ্ঠে সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী আমাদের উচ্চ ব্যবসায়ীদের নীতির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সার্বভৌম যৌথ তহবিল সমর্থন করেছিল তাদের লবন ও আফিমের একচেটিয়া ব্যাবসার বিলোপসাধন। এই সুবিন্যস্ততার মধ্যে দিয়ে দেশীয়রা অংশগ্রহণ করতে পারে শৃঙ্খল মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধার্থে।..."

আরও উত্তেজিত ভাষণ আমরা চন্দ্রনাথ বোসের ভাষণে পাই। যখন তিনি ১৮৬৯ সালের Social Science Association'-এ ভাষণ দেন—এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষ বস্তুত পূর্বদিকের ইংরেজ সভ্যতার "Hewer of work and drawer of water" কাষ্ঠ এবং জল সংগ্রাহক বাংলা একবার জানুক যে বস্ত্র যে পরিধান করে, যে কাগজের ওপর সে লেখে, যে ছুরিতে সে কাটে, দীর্ঘকাল ধরে তা কখনই ইংলন্ড থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে না... তখন ইংলন্ড নিজেই তার বন্ধুত্বের জায়গা থেকে আরও ঘনিষ্ঠ আরও সৎবুদ্ধি যুক্ত হয়ে উঠবে বর্তমানের থেকে এবং তখনই ঐ বন্ধুত্ব একটা খোলামেড়া পারস্পরিক সম্মানের জায়গা থেকে হবে, যে বন্ধুত্ব ছাড়া এই বিষয়টা হয়ে উঠবে অসার্থক। আত্মবিশ্বাসের শক্তি ও আত্মসম্মানে অভিযুক্ত এইসময় দেখাচ্ছে স্বদেশীবাদের বীজ বপনের কাল বাংলায়।

এ বিষয়ে অপবাদপূর্ণ জোরালো বক্তৃতা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম ভোলানাথ চন্দ্রের ভাষায়—ব্রিটিশ বাণিজ্যিক নীতির বিরুদ্ধে, আমাদের নথিপত্র অনুযায়ী তাঁর প্রথম আহ্বান আন্দোলনের এবং যা খুব ঠিক সময়ে স্বদেশী জন্মকান্নার মধ্যে সম্ভাষিত হয়েছিল। ভোলানাথ লিখেছিলেন—এই লুণ্ঠন নগ্ন হয়েছিল, সত্যকে ছদ্মবেশ পরিয়েছিল। আমাদের কৃষিজীবিদের সম্পূর্ণ অবস্থাকে নিম্নতর করতে চেয়েছিল ইংরেজ।

আসুন আমরা গ্রহণ করি শিল্পের এবং বাণিজ্যের শিক্ষা। অনুমতি দেওয়া হোক প্রশাসনে অংশগ্রহণ এবং আমাদের নিজেদের শুল্কের মূল্যতালিকা গঠন—যার সঙ্গে সম্ভবত কিছুটা স্বদেশীকতার সূত্রপাত বিদেশী জিনিসপত্র কেনার মধ্যে দিয়ে, ভারতবর্ষের সন্তানরা প্রমাণ করবে পৃথিবীর কাছে যে সময়োচিত দূরদর্শিতা তাদের ছিল সাধারন কৃষিজীবী হিসেবে অথবা তারা কোনভাবে পারেনা ম্যানচেস্টারের সুতিবস্ত্র শিল্পকে সিংহাসনচ্যুত করতে এবং আবারও তারা তাদের কর্তৃত্বকে স্থাপন করল সুতির শিল্পের জগতে।"

British বাণিজ্যিক নীতিকে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন—এটা হতে পারে সারাংশে ছিল একটি নীতি হিসেবে পুরোপরি এবং বিশুদ্ধ স্বার্থ এবং কোনভাবেই তা রাজস্ব নয়। প্রথমেই নিবারক, পরবর্তী সময় আক্রমনকারক, তারপরে দমনকারক এবং এটা একদম শেষে হয়ে ওঠে দমনক্ষম। দেশীয় লক্ষকে বেধে ছিল যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। এর নামই প্রমাণ করছে যে একটা মুক্ত বাণিজ্য। বস্তুত এটা তুলে ধরেছিল বিশাল একচেটিয়া ব্যবসা।

স্বদেশী আন্দোলনের গুরু আরো বলেছেন,— দেশীয় ইংরেজি এবং দেশী পত্রপত্রিকাগুলি অবশ্যই জোরের সঙ্গে স্বয়ংভর গ্রামীণ bank, দেশী mill, Native chamber of commerce প্রদেশগুলিতে স্থাপনের কথা বলেছিল তারা

অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছিল বিদেশী দ্রব্যের প্রানহীন অভ্যাসকে অধিক পছন্দ ঘরে তৈরী জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে। তারা অবশ্যই নিজকে অস্বীকারের শৃঙ্খলার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেছিল এবং দেশাত্ববোধক চিন্তার অনুশীলন করেছিল। তারা অবশ্যই সংগ্রহ করেছিল এবং সংকলিত করেছিল ভারতীয় শহুরে জীবনের অনুপুঙ্খ জনগনের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য। আমাদের দেশের তাঁতী, কর্মকার এবং প্রযুক্তি শ্রমিকদের দুর্দশাকে তুলে ধরার জন্য। তারা অবশ্যই চিহ্নিত করেছিল প্রবল পরিমাণ এবং ক্রমবর্ধন বাড়তে থাকা ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রমের ওপর লাভের থেকে আসা সম্পদ নিস্কাশনের, তারা দেখিয়েছিল দেশ দিনের পর দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছে এবং পুরোপুরি প্রকাশ্যে এনেছিল পরিসংখ্যানগত প্রবঞ্চনা কর্তৃপক্ষের, তারা অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে চেষ্টা করেছিল ওই নীতির ধ্বংস সাধন যা যোগ করছে আমাদের রাজনৈতিক দাসত্ব যা খুব বেশী করে আমাদের দেশকে শিল্পের দাসত্বে পরিনত করেছিল।

কোনরকম বলপ্রয়োগ ছাড়াই, কোনরকম অবাধ্যতা ছাড়াই কোনরকম আইনগত সাহায্যের প্রার্থনা ছাড়াই। এটি শায়িত ছিল সম্পূর্ণভাবে আমাদের ক্ষমতা থেকে হারানো অবস্থাকে ফিরে পাওয়া। এটা আমাদের কাছে কোন অপরাধ ছিল না, যা একমাত্র আমরা গ্রহণ করেছিলাম, অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে, নৈতিক বিরুদ্ধতা...আসুন আমরা ব্যবহার করি সেই কার্যকরী অস্ত্রকে দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা যাতে কোন ভাবেই England-এর জিনিসপত্র উপভোগ করা যায় না।"

কোনভাবেই আশচর্যের নয় মূল গ্রন্থপাঠ যেমন স্বদেশী ইস্তেহার। অর্থাৎ যদি পরবর্তী সময় স্বদেশীরা এটাকে তাদের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এইভাবে প্রথমদিকের ব্যবসা এবং শিল্পের প্রধান কর্মচারীদের চেষ্টা এবং ক্রমান্বয়ে চলে আসা দেশীয়দের আন্দোলন হচ্ছে এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য R. C. Dutt যা মৌলিকভাবে দেখিয়েছেন আমাদের ব্যবসা এবং শিল্পের ধ্বংস। এইভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন বাস্তব তথ্য এবং কোনভাবেই ওকালতি করেননি জাতীয়তাবাদী চিন্তার সপক্ষে যা তার সমালোচকরা বলেছেন।

এখানে আরও একটা অবশিষ্ট গুরত্বপূর্ণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এটা সন্দেহজনক ছিল যদি ভারতবর্ষ প্রতিযোগীতা করত। শিল্পোদ্যোগী England-এর সঙ্গে, এমনকি পুরোপুরি বিভেদমূলক নীতি ছাড়াই। এখানে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, ভারতবর্ষের ব্যবসা এবং শিল্প অবশ্যম্ভাবীভাবে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ভারতীয় উদ্যোগ কখনওই একটা স্বচ্ছ পরীক্ষার মধ্যে যায়নি। সম্পদের সঙ্গে আদেশ, ভারতবর্ষ অর্জন করেছিল বাণিজ্যিক উন্নতির একটি সুস্থ মান, এমন কি যদি শিল্প বিল্পবের দ্বারা সৌভাগ্যশালী নাও হতো। পর্যাপ্ত ভাবে তার জায়গাটিকে ধরে রাখতো। তার শক্তির সঙ্গে নিজস্ব মূল্যতালিকা গঠন, বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সে যথাযথভাবে মুখোমুখি হতে পারতো। মুক্ত রাষ্ট্রের সুযোগকে সে অস্বীকার করেছিল। এটি অস্বীকার করা কদাচিৎ সম্ভব ছিল যে, ভারতবর্ষ ছিল নিদারুণ ভাবে ভুল যাইহোক এমনকি ইংরেজ শিল্পবিপ্লব তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে ভারতবর্ষ থেকে অত্যধিক পরিমাণে সম্পদ আহরণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতীয়তাবাদের কালে অবশিল্পায়নের ঘটনা তুলে এনেছিল নানা বিতর্ক। G. V. Joshi, M. G. Ranade, Debadhai Naoroji, R. C. Dutt এবং B. D. Basu ছিলেন আদি জাতীয়তাবাদী যারা প্রথম তাদের বক্তৃতায় এবং লেখালেখিতে আলোচনা করেছিলেন কুটির শিল্পের ধ্বংসের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে এবং একইভাবে জনগণকে সচেতন করেছিলেন। R. P. Dutt একজন মার্কসবাদী লেখক একই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশিল্পায়নের বাপারে লেখালেখি করেছিলেন।

পেশাদার ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবীদের লেখায় আমরা বিতর্কের আর একটি ধারা লক্ষ্য করি। তাঁরা যে সকল কারণ উত্থাপিত করেছিলেন তাদের ভাবনা চিন্তায় তার থেকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা তফাৎ ছিল না। D. R. Gadgil এদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম তার্কিক ছিলেন। পরবর্তী সময় A. Sarda Raju, R. D. Choksiy, H.

R. Ghosal এবং N. K. Sinha বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু এদের মধ্যে কেউই বিষয়টি যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেননি। ১৯৬০-এর দশকে অবশিল্পায়ন বিতর্ক গ্রহণ করেছিল একটি নতুন দিক। যখন Daniel Thorner, M.D Morris, Bipan Chandra, Tapan Ray Chowdhury, Toru Matsui এবং অন্যান্যরা এই বিতর্কে অংশ নিলেন। Daniel Thorner-কে অনুসরন করে বলা যায় যে কুটিরশিল্পের ধ্বংসের যথাযথ প্রমাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সেখানে একইভাবে কোন পরিষ্কার নির্দেশ নেই জনসংখ্যার হ্রাস পাওয়ার যা নির্ভর করেছিল শিল্পের ওপর। পুরুষ জনসংখ্যার একটা অংশ নির্ভর করছিল অথবা শিল্পগুলি নিশ্চল হয়ে পড়েছিল মোটামুটিভাবে ১৪.৮ লক্ষ। যে বিরাট সংখ্যক জনগণ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভর করে থাকত তার বৃদ্ধি হয়নি। Thorner বলেছেন জাতীয়তাবাদীরা বহিরঙ্গের বাণিজ্যের ব্যাপারে ভীষণভাবে নির্ভর করেছিল পরিসংখ্যানের ওপর যা নির্দেশ করছিল ঐতিহ্যগত ভারতীয় সুতির রপ্তানীর ভেঙে পড়া এবং অতি দ্রুত বাড়তে থাকা ল্যাঙ্কাশায়ার-এর বস্ত্র আমদানি। কিন্তু এটা কখনওই গঠন করতে পারেনি একটি নির্দিষ্ট প্রমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ধ্বংসের।

Morris D. Morris বলেছেন যে, অবশিল্পায়ন নিজে ছিল একটি অতিকথা। বা (Myth) তিনি বলছেন যে ম্যাঞ্চেস্টার রপ্তানি করেছিল একই সঙ্গে কোনো সুতো এবং বস্ত্র। যেখানে British প্রতিযোগিতা করছিল ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত উৎপাদনের সঙ্গে বা machine-এ তৈরী কোনো সুতো দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী করেছিল দেশীয় হস্তচালিত তাঁতিদের প্রতিযোগীতামূলক অবস্থাকে। তাঁতিরা বিদেশ থেকে কম মূল্যে আনিত বোনা সুতোর থেকে লাভবান হয়েছিল। মাথাপিছু সুতিবস্ত্রের উপভোগ বেড়ে গিয়েছিল ১৮০০ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে অতঃপর হস্তচালিত জিনিসপত্রের যথাযথ চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। ফ্যাশানের পরিবর্তনের কারণে মহিলাদের মাথা পিছু বস্ত্রাদির ভোগও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাছাড়াও এই British বস্ত্র কখনওই বিকল্প হতে পারে না সাধারণ ভারতীয়রা যে ধরনের বস্ত্রাদির চাহিদা করেছিল তার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত Morris বলেছেন যে বাংলার সুতিবস্ত্র শিল্প ছিল না খুব একটা উন্নতির অবস্থায় ১৮০০ সালের কাছাকাছি সময় এবং বাংলার কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়নি ম্যাঞ্চেস্টারের ভারতীয় বাজারকে আত্মস্বাদ করার ফলে।

Morris-এর এই দৃষ্টিকোনটি অত্যন্ত কঠোরভাবে বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল বিপান চন্দ্র, তপন রায় চৌধুরি এবং তরু মাতসুইয়ের দ্বারা। তাঁদের মতে Morris-এর যুক্তিতে দেশীয় তাঁতিরা লাভপ্রাপ্ত হয়েছিল নিম্নমূল্যের আমদানিকৃত বোনা সুতোর দ্বারা, যা উপেক্ষা করেছিল দুটি বিষয়— ভারতীয় সুতোকলের অবলুপ্তি এবং সমস্যা, wool-এর দ্রব্যের মূল্য কমে যাওয়ার কারণ ছিল যেমন England-এ শিল্পবিপ্লবের অধীনে ছিল যা দাঁড়িয়েছিল নতুন ধরনের প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের মধ্যে, উৎপাদনের মূল্য যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। যারা কুটিরশিল্প করত তাদের তুলনায়, এঁদের মূল্য অনেক কম ছিল। এই সমস্ত পন্ডিতদের মত অনুসারে বলা যায় যে, বিষয়টা হল মূল্য হ্রাসের প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নয় England-এও তার জায়গা নিয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদকরা লাভবান হয়েছিল চরকা ও বয়নশিল্পের একইসঙ্গে মূল্য হ্রাসের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ভারতীয় সুতো কাটিয়ে ও তাঁতিদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ছিল অন্যরকম। একদিকে, ভারতীয় চরকা কাটিয়েরা অত্যন্ত তিক্ত কষ্ট স্বীকার করেছিল সস্তায় আমদানিকৃত সুতো আসার ফলে এবং বহু লোক তাদের পেশা ছেড়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁতিরা একই সঙ্গে খুব বেশী লাভ করতে পারে নি। যেমন Britian-এ কোনভাবেই সুতো বোনার মূল্য কমে যায়নি। যদিও তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। আমদানিকৃত কম মূল্যের বস্ত্রাদির সঙ্গে। বিপরীত দিকে মরিস যা বলেছেন, সেখানে বেঁচে থাকার পরিস্থিতির মধ্যে কদাচিৎই উন্নতি ঘটেছিল।

এখানে তাৎপর্যপূর্ণ W. W. Hunter-এর 'Statistical Account of Bengal' যা ১৮৭০-এর দশকে লেখা

হয়েছিল। যা একটি সমৃদ্ধশালী হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পরিস্কার ছবি দিতে পারেনি। প্রচুর পরিমাণ ছড়ানো ছিটনো তথ্য দেওয়া হয়েছিল সরকারী উৎসের ব্যাপারে যেমন জনগণনা এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিবেদন এবং অঞ্চলিক শিল্প জরিপের ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালে বাংলায় J. G. Cumming এর দ্বারা এগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। তারা নিশ্চিত করেছিল একই ছবি যখন আদমশুমারীর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছিল তুলনার জন্য। একটি ১৮০৯-এর জন্য অন্যটি ১৮৮০ জন্য, তারা হয়তো নথিভুক্ত করেনি শিল্প থেকে কৃষিতে ঠিকমত বিসরন বা বিস্তার এর মধ্যে সেখানে অবশ্যই ছিল দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী যা কিনা মুছে দিয়েছিল বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যা যা আনয়ন করছে জনসংখ্যার পূর্বস্থিতি শিল্পে এবং কৃষিতে। যা ড্যানিয়েল থরনার-এর ভ্রমের দিক নির্দেশ করছে।

A. K. Bagchi-র ১৮০৯-১৯০১ গাঙ্গেয় বিহার নিয়ে অব-শিল্পায়নের অনুপুঙ্খ গবেষনা মূলতঃ দাঁড়িয়েছিল বুকানন—হ্যামিলটন-কৃত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরীক্ষনের বা জরিপের উপর নির্ভর করে এবং ১৯০১-এর আদমশুমারী প্রতিবেদনের ওপর ভর দিয়ে।

প্রথমতঃ বাগচী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এটা শুধুমাত্র বিহারের হস্তচালিত তাঁত শিল্পই নয়। যেটা জড়িয়ে ছিল মহাদুর্যোগের সঙ্গে তাছাড়াও অন্যান্য ঐতিহ্যগত শিল্পগুলি, যা আরও সহ্য করেছিল মহাদুর্যোগপূর্ণ ক্ষয়, একই সঙ্গে তাদের উৎপাদন ও কর্মনিযুক্তি। রঙ শিল্পের উৎপাদন নেমে এসেছিল, যা পর্যায়ক্রমে দেখিয়েছিল বিরাট সংকোচন বা হ্রাসপ্রাপ্তি বিহারের সূতী চায়ের ক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ সূতী শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, শতরঞ্জি তৈরী, কার্পেট বোনা, ইত্যাদি। টিকে ছিল যদিও কোনটাই ছিল না উজ্জ্বল স্তরে। দ্বিতীয়ত, বাগচীর ভাষায়, গয়ার এবং সাহাবাদে'র কাগজ শিল্প চুক্তি করেছিল বিলোপসাধনের কেন্দ্র পর্যন্ত।

শোধিত পরিশুদ্ধ চিনি শিল্প গিয়েছিল একটা কালচক্রের মধ্যে দিয়ে। এটা উঠে এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল সাহাবাদে বিশেষত ১৮৭০ পর্যন্ত, তারপর এটি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। তৃতীয়ত, সস্তায় জাভা এবং মরিশাস থেকে চিনির আমদানি বাড়ছিল যা মাতগুড় বা গুড় তৈরীর ক্ষেত্রে অন্তরায়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা ছিল প্রাথমিকভাবে ব্যাপক একটি কৃষি উৎপাদন। শেষ পর্যন্ত, বাগচী দেখেছেন, অবশিল্পায়নের পদ্ধতি চরিত্রগতভাবে পরোপুরি পরিবর্তীত হয়েছিল পুর্ণিয়ার মতো কয়েকটি জেলায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেশীরভাগ উৎপাদনকারীরা যেমন তাঁবু তৈরী, গালার তৌর অলংকার, কাঁচের বাসনপত্র, দাঁতের মাজন, সিন্দুর, কম্বোল বোনা, ইত্যদি শিল্প অনেক বেশি সংকুচিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু শিল্প বাস্তব অর্থেই মুছে গিয়েছিল। এই ক্ষয় মুঙ্গেরের লৌহ শিল্পের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। বাগচী তাঁর ভাবনার উপসংহারে এসে দেখাচ্ছেন, গাঙ্গেয় বিহারে, সেখানে ঘটেছিল জনসংখ্যার শতকরা ক্ষয় যা নির্ভর করছিল শিল্পগুলির ওপর ১৮০৯-এ ১৮৬০ মিলিয়ন থেকে ১৯০১-এ ৮.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত এবং এই বিশাল ধাক্কা নেমে এসেছিল চরকা কাটিয়ে ও তাঁতিদের ওপর ১৮০৯ সালে ৬২.৩% থেকে ১৯০১-এ ১৫.১% পর্যন্ত।

ইরফান হবিব ১৯৮৫ সালে 'Modern Asian Studies' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন, বাগচীর বিশ্লেষণ যেমন অখন্ডনীয় এবং প্রকৃতই ভারতের অব-শিল্পায়নের সম্পর্কিত বাদানুবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই মীমাংসনীয়।

একজন অস্ট্রেলিয়ান অর্থনীতিবিদ মারিকা ভিকজিয়ানি, যাইহোক আপত্তি জানিয়েছিল বাগচী'র উপসংহারে এবং সমালোচনা করেছেন তাঁর পদ্ধতির। ভিকজিয়ানি এই "Indian Economic and Social History Review" প্রবন্ধে লিখছেন বাগচীর অনুধ্যান তুলে এনেছে কিছু সংজ্ঞার সমস্যা এবং পরিসংখ্যানের তুলনামূলকতা। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বা অনুমান করেছেন, বিহারের গাঙ্গেয় জেলাগুলির জরিপের যাথার্থ্য যা করেছিলেন বুরানিন হ্যামিলটন বাগচী যা তুলনা করেছিলেন ১৯০১ সালের আদমশুমারীর তথ্য দিয়ে এবং এই ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তাঁর

অনুসন্ধান। বাগচীর গবেষণা, বলা যেতে পারে, দেখাচ্ছে গাঙ্গেয় বিহারের সাধারণ ধারা। এটা যেমন বাংলার প্রদেশ সঙ্গে অর্ন্তভুক্ত বিহারে ধ্বংসাত্মক পশ্চিমী বাণিজ্যবাদের প্রভাব যা নগ্নভাবে আক্রমণ করেছিল। বুকানন হ্যামিলটনের জরিপ যদিও সবক্ষেত্রে যথাযথ নয়, আমাদের দিয়েছিল সবচেয়ে সেরা লভ্য পরিসংখ্যানগত তথ্য। এর ফল অনেক বেশী বিশ্বাসাযোগ্য অন্যান্য ধরনের মূল্য নিরূপনের থেকে, যা শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে গঠিত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমকালীন পর্যবেক্ষকদের ধারণার, তাছাড়া ঘনিষ্ঠ মিল পাওয়া যায় এই সকল পরিসংখ্যানগত নির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে।

সাম্প্রতিককালে তীর্থঙ্কর রায় দেখিয়েছেন যে, অব-শিল্পায়ন ব্যাখ্যা করেছে কার্য নিয়োগের ক্ষয় কারণ প্রযুক্তিগত অনুপস্থিতি ভারতীয় পণ্য ও ব্রিটিশ পণ্যের প্রতিযোগিতার কারণে। যাইহোক এটি একটি অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা চারটি কারণের জন্য। ১. তিনি সাধারনীকরণ করেছিলেন একটি মাত্র উদাহরণ থেকে, যেমন বলা যায় হাতে তৈরী সূতীবস্ত্র। ২. যেখানে নানা বিভাগ ছিল, যেখানে কর্মনিযুক্তি ভেঙে পড়েছিল যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির ফলে। ৩. অব-শিল্পায়ন হচ্ছে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে পরস্পর বিরোধী এবং কুটির শিল্পের মধ্যে আয়ের বৃদ্ধি। ৪. এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না মজুরী শ্রমের পরিবর্তন অথবা নারী শ্রমের ক্ষয়।

রায় সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি এবং ভারতীয় যন্ত্র সাধারনভাবে প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। ক্ষুদ্র শিল্প পরিবর্তিত হয়েছিল বহির্বঙ্গের প্রতিযোগিতার জন্য নয় বরং ভারতে বাণিজ্যিককরণের অন্তর্গত প্রতিযোগিতার কারণে। রায় বোধহয় উপেক্ষা করেছেন উপনিবেশিক কাঠামো এবং কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যাবসা এবং বলেছেন মুক্ত বাজারের গতি সম্বন্ধে।

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও ক্ষয় অবশ্যই স্থান নিয়েছিল যেমন ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর শুরু করেছিল শক্ত হাতে লাগাম ধরতে। কুটিরশিল্প বাধা পড়েছিল গুদামঘরে মেশিনে তৈরী পণ্যের পূর্বে ঠিক যেমন এটা করা হয়েছিল পশ্চিমে, আধুনিকীকরনের মূল্যের অংশ হিসেবে। ইংলন্ডে এই ক্লেশের কারণ ছিল কুটিরশিল্পের ক্ষয় বা বিকল্প ভারসাম্য তৈরী করেছিল আরও ভালো কর্মনিযুক্তির মধ্যে দিয়ে এবং ফ্যাক্টরি শিল্পে আয়ের উৎপাদনী প্রভাবের ফলস্বরূপ। অসমান প্রতিযোগিতার ভার কাঁধে নিয়েছিল শ্রমিক কারিগরেরা।

৭.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. আর. সি দত্ত—ইকনমিক হিস্টরি অব ইন্ডিয়া Vol–I and II

২. বিপান চন্দ্র—দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিয়া

৩. বিপান চন্দ্র—মডার্ন ইন্ডিয়া

৪. বিপান চন্দ্র—তপন রায়চৌধুরী, তরু মাৎসুই; রি ইনটারপ্রিটেশন অব নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্টরি।

৫. সি. পালিত— নিউ ভিউ পয়েন্টস্ অন দ্যা নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল

৬. অরুণ দাশগুপ্ত, অলক ঘোষ—অবশিল্পায়ন (বাংলায়)

৭. এ. কে বাগচী—প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া

৭.৩ অনুশীলনী

১. অবশিল্পায়ন কাকে বলে? এবং তা ভারতীয় দারিদ্র সমস্যার সাথে কি ভাবে যুক্ত?

২. ব্রিটিশ শাসনকালে এই অব শিল্পায়ন কি ভাবে হয়? ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা এই অবশিল্পায়নের ফলে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

৩. সম্পদ নিষ্কাশন কাকে বলে? এই নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক আলোচনা কর।

৪. সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব (Drain of Wealth) নিয়ে দাদাভাই নাওরোজির মতবাদ আলোচনা কর।

একক ৮ ❑ ভারতে রেলপথের সূত্রপাত

গঠন

৮.০ ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত

৮.১ আধুনিক শিল্পের বিকাশ

৮.২ গ্রন্থপঞ্জি

৮.৩ অনুশীলনী

৮.০ ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত

ভারতবর্ষে রেলপথ-এর সূত্রপাত হওয়ার আগে, এ দেশে যানবাহন ব্যবস্থা কোনোভাবেই বুনে ওঠেনি। অঞ্চলগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্তে ছিল। নদীতীরবর্তী বাণিজ্য এবং সমুদ্রে উপকূলবর্তী বাণিজ্য ছাড়াও, অঞ্চলগুলির মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ অঞ্চলগুলিতে, গরুর গাড়িতে করেই প্রচুর জিনিসপত্র সরবরাহ করা হত। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি নিজেদের প্রধান চাহিদাগুলির ক্ষেত্রে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেইসব অঞ্চলে জিনিসপত্র এবং কাজকর্ম বন্ধ থাকার ফলে ভারতীয় বাজার গড়ে ওঠেনি। Lord Dalhousie ভারতে রেলপথের সূত্রপাত ঘটানোর মধ্যে দিয়ে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি একটি রাজনৈতিক এবং শিল্পপণ্যোৎপাদী আবহাওয়া তৈরী করতে উৎসাহী ছিলেন যা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। ১৮৫৩ সালে রেলপথের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রেলপথ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন।

এর প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সাম্রাজ্যের ওপর রাজনৈতিক একীকরণ তৈরী করা এবং তার ওপরে একাধিপত্য স্থাপিত করা। এর ফলে সরকার এ দেশ এবং দেশের মানুষদের সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সামাজিক ঐতিহ্য এবং আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলস্বরূপ দেশেব মধ্যে যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিদ্রোহীদের দমন, আইন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়, ভূমি রাজস্ব আরও মসৃণভাবে সংগৃহীত করার জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে রেল পথের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করার কথা চিন্তা করেছিল। শীঘ্র প্রসারিত করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে হত। শতাব্দীর প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল যা বিশাল আকার নেয় ১৮৫৭ সালে। এই বিদ্রোহ রেলপথ নির্মাণকে আরও ত্বরান্বিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ এবং একক প্রচেষ্টা ছিল যা সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতের সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু আর্থিক উদ্দেশ্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষকে শিল্পপণ্যোৎপাদী ব্রিটেনের কৃষিকার্যের খামারে পরিণত করতে চেয়েছিল। ভারতের কাঁচা দ্রব্য, কৃষি শস্য, এবং খনিজ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বন্দরে নিয়ে আসা হত— জাহাজবন্দী হয়ে ব্রিটিনে যাওয়ার জন্য। একইভাবে ইংল্যান্ডের তৈরী জিনিসপত্র ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য আসত। এই বাজারকে প্রস্তারিত করতে গেলে রেলপথের দ্বারাই বন্দরের সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে যোগ করা জরুরি ছিল। এর সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে তাদের মূলধনের এক বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ তাদের প্রধান শর্ত ছিল। এই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণই ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণে সাহায্য করেছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণ ঘটেছিল বিভিন্ন প্রকারে। রেলপথে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করার জন্য সরকার জামানত ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। এই জামানত ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার, রেলপথ নির্মাণের জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোকে অবাধ জমি প্রদান করে। সংস্থাগুলির মোট বিনিয়োগের ওপর সরকার ৫ শতাংশ বার্ষিক সুদ দিতে রাজি হয়। সরকার এটাও নিশ্চিত করে যে কোম্পানী এবং সরকারের মধ্যে লভ্যাংশগুলি সমবন্টন হবে। এটাও সম্মতি দেওয়া হয় যে সরকার ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে রেলপথ কিনেও নিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে, ১৮৬৯ সালের মধ্যে ৪২৫৬ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়।

এই জামানত ব্যবস্থা সরকারী রাজস্ব দফতরের ওপর প্রচন্ড আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। ১৮৬৯ সালে সরকার নিজেই সরাসরি ভাবে রেলপথ নির্মাণে কাজে হাত দেয়। নতুন কর্মপন্থা অনুযায়ী সরকার যৌথভাবে রেলপথ নির্মাণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮০ সালে নতুন জামানত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্র তার ভূমিকা ছেড়ে দেয়।

নতুন জামানত ব্যবস্থায় বেসরকারী সংস্থাগুলিকে রেলপথ নির্মাণের জন্য আবার হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়। কিন্তু এসময়ে সরকার কৌশল এবং নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখে। জামানাত ব্যবস্থার সুদের হার ৫ শতাংশ থেকে ৩.৫% কমিয়ে দেওয়া হয়। নতুন জামানত ব্যবস্থা ভারতে রেলপথ নির্মাণের গতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ২৮ হাজার রেলপথ নির্মিত হয়। এই বছরই রেলপথ পরিচালনা আরও কার্যকরী করার জন্য 'Railway Board' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই রেলপথ নির্মাণের গতিকে স্থিমিত করে দেয়। বিশ্বযুদ্ধের পরে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে বন্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদীরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯২৫ সালে সরকার অনেক বেসরকারী সংস্থাগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং তাদের সরকারী মর্যাদা দেয়।

Railway Board আবার কাজ শুরু করে এবং রেল বাজেট শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই কর্মপন্থা সচল থাকে। ৩৩ দিনে ভারতের মোট জায়গায় ৭.৮% রেলপথ ব্যবস্থার আয়ত্বে এসে পড়ে শুধুমাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া। প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় শহরে রেলপথ নির্মিত হয় এবং ৬৫,২১৭ কিলোমিটার রেললাইন ফেলা হয়।

ভারতবর্ষে রেলপথের একটা সাধারণ প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার হল ঃ

১. এই রেলপথ একটা জাতীয় বাজার তৈরী করে। গ্রামীণ এবং স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির অবনতি এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী উৎপাদন ভারতের আর্থিক জীবন যাত্রাকে এককে পরিণত করেছিল এবং ভারতীয় জনমানসের মধ্যে আর্থিক অবস্থার প্রতি এক সুদূর প্রভাব ফেলেছিল।

২. রেলপথ শুধুমাত্র একটা জাতীয় বাজার তৈরী করেনি, এটা ভারতীয় অর্থনীতি এবং বিশ্ববাজারের মধ্যে একটা যোগসাজশ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা কৃষিশস্য উৎপাদনে এক অভূত শক্তি প্রদান করেছিল এবং কৃষকদের আর্থিক সুযোগসুবিধার একটা রাস্তা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল।

৩. এর সূত্রপাতের ফলে, ঘরোয়া এবং বিশ্ব বাণিজ্যের হার—দুই বেড়ে গেছিল এবং ভারত থেকে আমদানী এবং রপ্তানীর পরিমাণও বেড়ে গেছিল।

৪. রেলপথ নির্মাণ বেকারত্বের হার কমিয়েছিল। এবং চাকরির সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছিল। এইখানে বলা যেতে পারে যে লৌহ এবং ইস্পাত এবং কয়লা কারখানাগুলির পত্তন এই রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করেছিল যা মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ দ্বারা পরিচালিত রেলপথ কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা কার্লমার্কস, বিপান চন্দ্র, ড্যানিয়েল থরনার, ডি. এইচ. বুকানন, ইরফান হাবিব, ডি. আর. গ্যাডগিল প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিদের মতামত থেকে জানা যেতে পারে। ১৮৫০ সালে New York Daily Tribune নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন 'ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-কারখানার পূর্বসূরি হচ্ছে এই রেলপথ ব্যবস্থা'। তাঁর মতে, এই রেলপথের সূত্রপাত রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পকারখানাগুলো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং সেইসব যন্ত্রপাতিগুলো কারখানার কাজে লাগানো যাবে যা রেলপথে সরাসরি যুক্ত নয়। মার্কস এটাও বলেছেন, যে আধুনিক কারখানাগুলো ভারতবর্ষে বংশপরম্পরা ধরে হয়ে আসা শ্রেণী বিভাজনকে ভেঙে দেবে যা ভারতের জাত-পাত ব্যবস্থার মেরুদন্ড। তাঁর মতে, ব্রিটিশরা এই রেলপথ ব্যবস্থা থেকে অনেক সুবিধে পেত। কারণ, রেল, যন্ত্রপাতি এবং যাত্রী পরিবাহী গাড়ী কোনো কিছুই ভারতে তৈরী হতো না, বরং ইংল্যান্ড থেকে আমদানী হত। সুতরাং ভারতের মানুষের অবস্থা অপরিবর্তনীয় ছিল। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে রেলপথ নির্মাণ ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে, সংস্কৃতিতে এবং অর্থনীতিতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ড্যানিয়ের থরনার দেখিয়েছেন যে রেলপথের জন্য যে আর্থিক নীতি ভীরতবর্ষের দেশীয় আর্থিক উন্নতিতে সহায়ক হয়ে ওঠেনি। ডি. এইচ. বুকানন দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ পুঁজির সাহায্যে যেহেতু রেলপথ নির্মিত হত সে কারণে ইংল্যান্ড ভারতের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হত, কিন্তু ভারতবর্ষ নিজের ক্ষেত্রে তা হতে পারেনি কারণ সে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারত না। মার্কস তাঁর পূর্বের মতগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে বিদেশী পুঁজির শাসনের ফলে ভারতের শিল্প কারখানাগুলো এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রধান দেশের এক অখন্ড অংশ হিসেবে পরিণত করবে এবং তাকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে, ইরফান হাবিব ১৯৭৫ সালে বলেছিলেন যে রেলপথ শিল্প বিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ১৯৪৩ সালে বলেন যে রেলপথ ছিল আধুনিকশিল্পকারখানার পূর্বসূরী। ডি. আর. গ্যাডগিল দেখিয়েছেন যে ১৮৮০ সালের Famine Commission-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের জন্য মৃতের হার বেশি ছিল যেখানে রেলপথ পত্তন করা হয়নি। সুতরাং দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করার অন্যতম কারণ ছিল রেলপথের সম্প্রসারণ। কিন্তু এই মতামতের সঙ্গে আমরা এক হতে পারি না কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগই এই দুর্ভিক্ষের একমাত্র প্রধান কারণ। আসলে, ঔপনিবেশিক শাসন এই রেলপথের মাধ্যমে শস্যগুলোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে এবং মানুষের দ্বারা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, রেলপথ সম্প্রসারণ এবং রেললাইন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং রাস্তা নির্মাণের মতই রেল সম্প্রসারণ বিভিন্ন বাজার এবং মেলার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী দ্রব্য সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি, রেলপথ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক একীকরণের রাস্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এই রেলপথ নির্মাণ সত্যিই ভবিষ্যতে ভারতকে আরও শক্তিশালী এবং আধুনিক দেশে পরিণত করেছিল।

৮.১ আধুনিক শিল্পের বিকাশ

শহরের হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ কারিগর শিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষি এবং উৎপাদন শিল্পের শতাব্দী প্রাচীন সংযোগে ভাঙন ধরে যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতের পূর্বতন জাতীয় নেতাদের মতে শিল্প কারখানাগুলির শোচনীয় অবস্থাই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও দূর্বল করে দিয়েছিল। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায় যে দেশীয় কারখানাগুলি ধ্বংসের ফলে অবনতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই

ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠেনি যা ভারতবর্ষে দারিদ্র ডেকে এনেছিল। R. C. Dutt'র মতে বিদেশী উপকরণে দ্বারা ভারতীয় উৎপাদন শিল্পের পদচ্যুতি হওয়া ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব থেকে দুঃখজনক অধ্যায়। দেশীয় শিল্প কারখানাগুলির উত্তরোত্তর অবনতি এবং নতুন শিল্পকারখানাগুলি গড়ে না ওঠার ফলে দেশের আর্থিক জীবনযাত্রা বিদেশী পুঁজিপতিদের দখলে চলে আসতে আরম্ভ করে এবং ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষকে চাষাবাদ এবং কাঁচা দ্রব্যের উৎপাদনী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই দ্রব্যগুলি ব্রিটিশ দালালদের দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজবন্দী হয়ে যেত, এবং ব্রিটিশ দক্ষতা এবং পুঁজির সাহায্যে বস্ত্রে পরিণত হয়ে আবার রপ্তানি হত ভারতে স্থাপিত ব্রিটিশ খামারে এবং অন্যান্য জায়গায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সাহায্যে। এর ফলে চরম আর্থিক সঙ্কটে গড়ে ভারতবর্ষ। ভারতীয় নেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে দুদেশের মধ্যে অসৎ বাণিজ্যিক প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করার ফলে ভারতের শিল্প কারখানাগুলির এত দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে,... 'অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল, এবং ভারতীয় উৎপাদন কৌশল আর শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারত।' কিন্তু বিপান চন্দ্রের মতানুসারে, ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে, বেশিরভাগ ভারতের দেশীয় শিল্প কারখানাগুলি হয় একেবারে ভেঙে গেছিল যা কোনোভাবেই পুনরুদ্ধারের অবস্থায় ছিল না অথবা ভাঙনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিল।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষে অবাধে প্রবেশ করল বিদেশী পুঁজি। বেশি লাভের আশায় বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতীয় শিল্প কারখানার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। সস্তায় শ্রম এবং কাঁচা দ্রব্য খুব সহজেই পাওয়া যেত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ এবং তার আশেপাশে অঞ্চল একটা তৈরী বাজার প্রদান করত তা নয়, ভারতে ব্রিটিশ ঠিকাদারদের কাজে শাসকেরা উৎসাহ দিত এবং সমর্থন করত। এই মতকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যেতে পারে না যে ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথমে বিদেশী পুঁজি খুব সহজভাবেই বাণিজ্যিক কাজে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ভারতীয় পুঁজিকে। ভারতীয় পুঁজি যদিও পেছনের সারিতে ছিল তবু কোনোভাবেই একেবারে মুছে যায়নি। কার্যতঃ, দেশীয় পুঁজির স্বল্পতা এবং নতুন ক্ষেত্রে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলার অনিচ্ছা ভারতের শিল্প বিকাশের পথকে অনেক খর্ব করে দিয়েছিল এবং একইসঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজি স্বদেশে ঠিকমত খাটাতে পারছিল না বলে, বিনিয়োগের জন্য নতুন পথ খুঁজছিল। ব্রিটিশ মতানুসারে ভারতের আর্থিক বিকাশের ফাঁকগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য এবং শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে শক্তিশালী লিভার-এর মত এই বিদেশী পুঁজি কাজ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী পুঁজিপতিরা কোনো আদর্শগত কারণে বিনিয়োগ করেনি উপরন্তু দেশীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে পার্থক্য করে ভারতের স্বাধীন আর্থিক বিকাশের পথ রোধ করাই তদের একান্ত চেষ্টা ছিল। তারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে ভারতকে কাঁচা দ্রব্যের উৎস এবং বাজার হিসেবে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ ভারতবর্ষ অর্থবিনিয়োগকারী শিল্পে পরিণত না হচ্ছে। বিদেশী মূলধন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় নেতারা অনেকদিন পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। প্রথমে, রেলপথ এবং কৃত্রিম খাল, খনি, চাষাবাদ এবং আধুনিক শিল্পকারখানাগুলি বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে আবির্ভূত হল, তখন দেশে বিদেশী পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ-এর বিরোধিতা আর সেভাবে দেখা গেল না। ঊনিশ শতকের শেষভাগে, যদিও খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী ভারতীয় নেতৃত্বের একাংশ এই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে সমর্থন করতেন, কিন্তু অধিকাংশই এর প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিলেন। দাদাভাই নওরোজির উদাহরণ দিয়ে এই জাতীয়তাবাদী লক্ষণগুলোর এক পরিবর্তন দেখানো যেতে পারে। দাদাভাই নওরোজী বিদেশী পুঁজির এক গোঁড়া সমর্থক থেকে আস্তে আস্তে এর প্রবল সমালোচক এবং বিরোধী হয়ে গেছিলেন। তাঁর এবং আরো অনেকের মতে যেহেতু বিদেশী সংস্থাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় উপাদানকে বিকশিত করছিল, সেহেতু বিদেশী পুঁজিপতিরা এই বিকাশের ফলে অনেক সুযোগ সুবিধে বুনে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং বাড়তি সম্পত্তি উৎপাদন থেকে ভোগ করত। বিদেশী পুঁজির দেশের অথবা মানুষের আর্থিক উন্নতির পেছনে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। বাস্তবে দেখা যায় যে, বিদেশী সংস্থাগুলি

ভারতের অধিকাংশ মানুষকে পরিণত করেছিল দাসশ্রেণীতে যারা ব্রিটিশ এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের সেবার কাজে লাগত। বস্তুতঃ বিদেশী পুঁজির বিরোধীরা মনে করেছিলেন যে দেশে সত্যিকারের আর্থিক বিকাশ এবং উন্নতি সম্ভব হবে যদি ভারতীয় পুঁজিপতিরা শিল্পবিকাশের পদ্ধতিতে উন্নত করার জন্য নিজেরাই এগিয়ে আসেন, এ বিষয়ে এটা লক্ষণীয় যে, তার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রথম থেকেই শক্তিশালী ব্রিটিশ পরিচালন সংস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগীতার যুদ্ধে নামতে হবে। নির্দিষ্ট ব্যবসা শুরু করতে গেলে, ব্রিটিশ পরিচালন সংস্থা যারা আগে থেকেই জমি দখল করে আছে তাদের কাছে ভারতীয় পুঁজিপতিদের নতিস্বীকার করতে হবে। জাহাজ এবং বীমা কোম্পানিগুলো, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য ব্রিটিশ সংস্থাগুলি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অন্যান্যরা ভারতীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার এক নির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী বিদেশী পুঁজিকে ভারতীয় পুঁজির থেকে সমর্থন করত। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের দ্বারা বিদেশী পুঁজি আদরিত হত ভারতবর্ষে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত, ছার পেত যেমন জামানত লাভ, মুক্ত অথবা সস্তায় জমি এবং সুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারী এবং আইনী ব্যবস্থা কায়েম করা হত, অন্যদিকে দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রতি বীতরাগ প্রদর্শিত হত, তারা ওই সমস্ত ছার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং সর্বোপরি নিজেদেরটাও নিজেদেরকে তত্ত্বাবধান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত। ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের রেলপথের প্রথাও ভারতীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ছিল। ভারতীয় ঠিকাদারদের কাছে বিদেশী দ্রব্য সরবরাহ করার থেকে ভারতীয় মালপত্র সরবরাহ করা সব থেকে কঠিন এবং খরচাসাপেক্ষ ছিল।

সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সুতোয় বোনা শিল্প-কারখানাগুলির প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অনেকদূর অগ্রগতি ঘটেছিল। ১৮৫৩ সালে বম্বেতে কাওয়াসজি নানাভয় এই চর্কীকাটা সুতোর কল আরম্ভ করেন। ১৮৬০ সালের মধ্যে প্রায় ১০টি কটন মিল উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। নাগপুর, আমেদাবাদ, সুরাট, সোলাপুরের বেশিরভাগ মিলের মালিকানা ভোগ করত ভারতীয় পুঁজিপতিরা।

১৮৮৭ সালে, জামশেদজি টাটা নাগপুরে Empress Mill প্রতিষ্ঠা করেন। রেলপথের সূত্রপাতের ফলে সুতোর কলকারখানাগুলির বাজার আরও বিকশিত হয় এবং ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে ৫৬টা কলকারখানা স্থাপিত হয়, যা ১৯০৫ সালের মধ্যে ২০৬ টায় গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৩ সালে, পৃথিবী যে সমস্ত টেক্সটাইল রপ্তানি দেশগুলো ছিল, তাদের মধ্যে ভারতের অবস্থান ব্রিটেনের ঠিক পরেই ছিল।

সূতি শিল্প ছাড়া, কিছু ভারতীয় পুঁজিপতিরা চা, অভ্র, জাহাজ নির্মাণের জিনিসপত্র এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করত। উদাহরণস্বরূপ দ্বারকনাথ ঠাকুরের কথা বলা যেতে পারে ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন, নীল, চিনি, কয়লা এবং জাহাজ ব্যবসায়। এই সময়ে চায়ের চাষের প্রায় ৫% মালিকানা ভোগ করত ভারতীয় পুঁজি। ১৮৭৯ সালের সরকারী রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, হাজারিভাগ জেলায় ৩১১ অভ্রখনির প্রায় ৬৯ টার মালিক ছিলেন ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবারগুলি। রাসায়নিক এবং ওষুধ ব্যবসার ক্ষেত্রেও দেশীয় বিনিয়োগের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে একটা উল্লেখজনক বিষয় হচ্ছে যে ১৮৯২ সালে বাঙালী গবেষক পি. সি. রায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'Bengal Chemical and Pharmaceutical works', যা সে সময় একটা মুখ্য ওষুধ এবং রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংস্থারূপে পরিগণিত হয়। ঊনিশ শতকে দ্বারকনাথ ঠাকুর এর Carr Tagore and Company কয়লা খনিগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং শতকের শেষভাগে আমরা দেখতে পাই যে ছোট ছোট ৬০টা কয়লাখনির মালিক এবং নিয়ন্ত্রক ছিলেন ভারতীয় ঠিকাদারেরা।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কোনোভাবেই লোহা অথবা ভারি কারিগরী কারখানাগুলো উৎপাদনী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করত না এবং ভারতীয়দের নিজেদেরকেই এ সমাধানের উপায় খুঁজে বের করত হত। ছুরি-কাঁচি তৈরীর সবচেয়ে

প্রাচীন কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরে। যদিও এই কেন্দ্রগুলি এবং হস্তশিল্পের কেন্দ্রগুলি গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল, শহরের কেন্দ্রগুলো, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কলকাতা শহরে অবস্থিত। বাংলাই এই রকম কেন্দ্রগুলির প্রথম পথপ্রদর্শক এবং ১৮৬৭ সালে হাওড়ায় কে. এল. মুখার্জি এ্যান্ড কোং হচ্ছে কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথম। আর কারিগরী কারখানাগুলোর মধ্যে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত মার্টিন এ্যান্ড কোং এবং লক্ষ্ণৌর Iron and Steel Co. সবচেয়ে উল্লেখজনক প্রচেষ্টা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন Department of Commerce and Industry নামে একটি নতুন সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা দেশীয় সংস্থাগুলোকে আরও নতুন করে উদ্যোগী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৯০৭ সালে, জামশেদজি টাটা জামশেদপুরে প্রতিষ্ঠা করেন Tata Iron and Steel Company (TISCO), যা লৌহ এবং ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে। টাটা স্টীল তার প্রতিষ্ঠাতা জে. এন. টাটার অধ্যাবসায়ের এবং দূরদৃষ্টিতার এক প্রাঞ্জল উদাহরণ। টাটা গোষ্ঠী ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্পাত আমদানীকারক এবং ব্যাবসাকে ভালো বুঝতে পারত বলে তাঁরা খুবই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অতি অল্প দামে ইস্পাত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রধান বস্তুগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং গবেষণার পরে কারখানায় স্থাপিত হয়। Tata Steel, যদিও এই সময়ের অন্যান্য বড় বড় কারখানাগুলোর সঙ্গে একই মর্যাদা পেত তবুও সরকারের চাহিদার ওপর নির্ভর করত। Tata অথবা পারসী সম্প্রদায় ছাড়াও রাজস্থানের প্রদেশের মারোয়ার প্রদেশের মারোয়ারী সম্প্রদায় ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, প্রথম থেকেই এরা ইউরোপীয় পরিচালন সংস্থাগুলির সঙ্গে পাট ক্রয় অথবা কয়লা বিক্রয় ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ইউরোপীয় দমননীতি সত্ত্বেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং খুব অল্প পরিসরে এর আগের শতক 1920 সালে মারোয়ারী গোষ্ঠীকে এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করার পক্ষে অনুকূল এবং সহায়ক হয়েছিল। শতাব্দী ঘুরতে না ঘুরতেই, প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাটের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা এবং রপ্তানি চলে এসেছিল মারোয়ারীদের হাতে। পাট ব্যবসায় মারোয়ারীদের উপস্থিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাঁচা পাটে ফাটকা এবং গুণচটের অভূতপূর্ব বিকাশ। পাট শিল্পের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ যাঁরা ১৯২২ সালে মিল প্রতিষ্ঠা করেন। বাস্তবিক, ১৯১৯ এবং ১৯২২ সালের মধ্যে বিড়লাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এতটুকু বাড়িয়ে বলা নয়। তিনি দুটো সুতি শিল্প এবং একটি পাট শিল্পের কারখানা প্রস্তুত করেছিলেন সবচেয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে। ১৯২০ সালে বিড়লার উৎসাহ এবং শিল্প কারখানাগুলি লাভজনক অবস্থার ফলে আরো ছটা ভারতীয় মিল এবং একটি আর্মেনিয়ান মিল প্রস্তুত করা হয় কলকাতায়। তাঁত শিল্প থেকে তারা ১০% কিছু বেশি লাভ করতে পারত কিন্তু তাদের টিকে থাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়া তাদেরকে একটা নীতি ক্ষমতা প্রদান করেছিল নির্বাসিতদের থেকে। বিপানচন্দ্রের মতে বছরের পর বছর ধরে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সর্বজন স্বীকৃত এবং গৃহীত ঐতিহ্যগত এবং আধুনিকতার মোড়কে মোড়া স্বদেশী ভাবধারাই ভারতের বৃদ্ধি পেতে থাকা দারিদ্রকে রোধ করতে এবং দেশীয় শিল্প কারখানাগুলিকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ, (১৯০৫-১১) সালের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শতাধিক নতুন স্বদেশী কারখানা খোলা হয়েছিল যা লোহা চামড়া, টেক্সটাইল, রাসায়নিক, তামাক, চিরুণি, কলম, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে যোগ দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধমান দেশগুলোর উপাদনগুলোকে যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ করার দিকে চালিত করেছিল। ভারতবর্ষ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু ব্রিটেন করেছিল। এটা দুই পরস্পর-বিরোধী দিক ছিল। একদিকে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সামগ্রী কম পড়ার দরুণ ভারতে তৈরী মালপত্রের চাহিদা বেড়ে গেছিল। কিন্তু অন্যদিকে, অস্ত্রশাস্ত্র, কাঁচা দ্রব্য, যন্ত্রাংশ অথবা রাসায়নিক দ্রব্য যা আমদানি করত ব্রিটেন বা তার শত্রুদেশ জার্মানী থেকে, তা বন্ধ হয়ে গেলো, তার ফলে, যদিও ভারতীয় জিনিসপত্রের চাহিদা অনেক বেড়ে গেল, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ, করার মত জিনিসপত্র অঢেল ছিল না। কিছু শিল্প কারখানা, যেমন, ভারতীয় সুতী শিল্প কারখানা, জাহাজ এবং লৌহ ও ইস্পাত, এইরকম

পরিস্থিতির ফলে লাভবান হল কিন্তু অন্যান্যরা একেবারে লোকসানের মুখে পড়ল। সরকারী প্রথাকে কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য করল একদিকে যুদ্ধ এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ। যুদ্ধ পর্যন্ত, শিল্পকারখানাগুলির উত্থানে কোন রকম হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

যুদ্ধ, রেলপথ অথবা সরকারী কাজের জন্য যে শিল্পকারখানার জিনিসপত্র কেনার জন্য নির্ভর করতে হত ব্রিটিনের ওপর। এই নির্ভরশীলতার ফলে যুদ্ধের সময় ভারতে এই সামগ্রীগুলোতে হঠাৎ টান পড়ে। এটা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে প্রমাণ করে যে সরকারপক্ষের আচরণ ভারতীয় ঠিকাদারদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না।

যুদ্ধের পর, সরকারের স্থানীয় উপাদানের দিকে নজর পড়েছিল এবং সেই উৎসগুলোকে উত্থিত করার কথাও চিন্তাভাবনা করছিল। ১৯১৮ সালে গঠিত Indian Munitions Board, ১৯১৬-১৮ সালের Indian Industrial Commission এবং ১৯২১-২২ সালে Indian Fiscal Commission—এই তিনটি ঘটনাই তাদের পরিবর্তিত চিন্তাভাবনার এক প্রতিভূ। যেসব সংরক্ষিত শিল্প কারখানাগুলোর স্বাভাবিক সুযোগসুবিধা ছিল তাদেরকেই Fiscal Commission সংরক্ষিত শুল্ক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল যা বিদেশী পণ্য-সামগ্রীর সঙ্গে বিনা সুরক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে পারবে। কিন্তু সরকার, ভারতীয় শিল্পকারখানাগুলোর মালিকদের বিরুদ্ধে পার্থক্য গড়ে তুলেছিল। বস্তুত, ১৯২৩ এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে সংরক্ষিত শুল্কের চাহিদার জন্য ৫১টা ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এর মধ্যে ১১টার জন্য শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেগুলো মধ্যে পড়েছিল নুন, ভারি রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাইউড, লোহা ও ইস্পাত, সূতীবস্ত্র, চিনি ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক প্রতিবন্ধকতা এবং অসহযোগিতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্থাগুলো অগ্রগতি ঠিক ভাবেই হচ্ছিল। Industrial Commission প্রায়োগিক শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ফলে ১৯৩৯ সালে দেশে ২,৫০০ ছাত্রকে নিয়ে তৈরী হল শুধু ৭টা Engineering College ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রায়োগিক বিদ্যা অপর্যাপ্ততাই ব্যাখ্যা করে যে অটোমোবাইল, যন্ত্রাংশ এবং বিমানচালনাসংক্রান্ত শিল্পকারখানাগুলোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির অনুপস্থিতি।

শিল্পকারখানাগুলোর জন্য রাজ্যের কাছ থেকে যে সাহায্য চাওয়া হত তা পরিষ্কার ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, এই চাহিদা ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে অর্থনীতিবিদদের দ্বারাই উচ্চারিত হত এবং সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদী প্রেস-এ অথবা কংগ্রেস আলোচনা সভায় প্রসঙ্গটা উত্থিত হত না। এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উৎসাহের ছিল যা একধরনের সংশয় সৃষ্টি করেছিল সে বিদেশী সরকার যতই বন্ধুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তারা কখনই স্বদেশীয় উৎপাদকদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসের পুণা সর্ব্বজনিক সভার পত্রিকায় ১৮৯০ ৩রা ফেব্রুয়ারী Hindu পত্রিকায় 'The Economic Situation in India' নামক প্রবন্ধে G. V. Joshi খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ইংল্যান্ড চাইত দেশীয় শিল্পকারখানাগুলিকে যতটা সম্ভব নিচুস্তরে নামিয়ে আনা, যাতে তারা সরকারী বিকাশের পথে কোনোরকম উৎসাহ না পায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা যা ইংরেজ শাসক দেখেছিল এবং ভারতের নির্ভরশীলতা থেকে উপলব্ধি করেছিল যে শিল্পসামগ্রীর সরবরাহ করার জন্য ভারত হচ্ছে এক বিশাল বাজার। এইরকম অবস্থায় সরকার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করাও বৃথা যা পুনার লেখক বলেছেন।

৮.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিপান চন্দ্র—ইকোনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া

২. তীর্থঙ্কর রায়—দ্যা ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (১৮৫৭-১৯৪৭)

৩. A. K. Bagchi—Private Investments in India

৪. এস. কে. সেন—দ্যা হাউস অফ টাটা

৫. আম্বা প্রাসাদ—ইন্ডিয়ান রেল ওয়েজ

৮.৩ অনুশীলনী

১. ভারতের আধুনিক শিল্প কিভাবে গড়ে ওঠে? এবং এই আধুনিক শিল্পের সীমাবদ্ধতা কি ছিল?

২. রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩. রেলপথ নির্মাণের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. রেলপথ নির্মাণের ফলশ্রুতি আলোচনা কর।

একক ৯ ❑ ভারত সম্বন্ধে পূর্ব মনোভাব

গঠন

৯.০ প্রস্তাবনা
৯.১ প্রাচ্যবিদ্যা
৯.২ ইভানজেলিকালিজম
৯.৩ উপযোগিতাবাদ
৯.৪ উদারনীতি
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি
৯.৬ অনুশীলনী

৯.০ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং ঊনিশ শতকের প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং চরিত্র ব্রিটিশদের চোখে এক অভূতপূর্ব বিষয় ছিল। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনরায় নবীকরণ করার সময় থমাস ম্যাকলে তাঁর ভাষণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ভারতীয় সাম্রাজ্য হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার একটা অদ্ভুত অবস্থা যার নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে নিজেদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর সময় ব্রিটিশশাসকেরা এই সুদূর প্রসারিত নির্ভরশীলতাকে কিভাবে পরিচালন করবে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণরেখাকে নিজেদের কাছে ব্যাখ্যা করবে, সেই অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিল তারা। ইংরেজী সভ্যতার বিশিষ্ট দিকগুলোকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে ভারত কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেনি। বিভিন্নভাবেই এটা একটা অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, একটা চুম্বকশক্তি যার পরিধা ব্রিটেনের বিশাল বাণিজ্যিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পথকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এটা অসামাজিক যুগের একটা সামরিক সাম্রাজ্য যার বিশাল দায়িত্ব ইংরেজ শিল্পের বাণিজ্যিক মূল্যের দ্বারা দ্বৈতভাবে ভারসাম্যতা বজায় রাখত, পুরো ঊনিশ শতক অধিগ্রহণ করে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসকদের বৈদেশিক নীতি যা রাশিয়ার সঙ্গে এক নকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

পটভূমি ঃ

তাই, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে নিজেদের জন্য যত জমি তৈরী করার চেষ্টা করল ততই তারা এ দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন এবং ব্যতিক্রমী তত্ত্বর উদ্ভাবন করতে শুরু করল। জাতীয়তাবাদী মতামতের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সংজ্ঞানুসারে নিজেদের সমাজের মতো পরিচালনা করতে গিয়ে কাজটা তাদের কাছে আরও কঠিন হয়ে পড়ল। গ্রেট ব্রিটেনের সংযুক্ত রাজ্য তার স্বভাব অনুযায়ী কখনই সংঘবদ্ধ হতে পারেনি 'Imagined Community' বা 'কল্পিত গোষ্ঠী' ভুক্ত অদূরবর্তী ভারতবর্ষের মানুষদের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ জাতীয়ভুক্ত সম্প্রদায়ের বিশ্বাসপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল যে ভারতের মানুষরাও একইভাবে তাদের নিজেদের জাতিসত্তা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। আবার, ঊনিশ শতকে দেখা যায় যে ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এক উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক

কাঠামোয় যা ভারতের অবস্থানরত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে এক বিপরীতমুখী স্রোতের মুখে ফেলেছিল যার ফলে ব্রিটিশ সংবিধানে খুব গভীরভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে ভারতের জনগণের এবং প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তাদের শাসককে বেছে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

৯.১ প্রাচ্য বিদ্যা

১৭৭২-১৮৩৫ সালের ব্রিটিশ প্রাচ্যরীতি বা স্বৈরশাসন ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা যা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে ভারতের সংস্কৃতি ও ভাষা জানানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ক্ষমতায় আসীন হওয়া থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই পর্যায় শুরু হল।

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্‌রা এক অনন্য গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা যুক্তি, ঐতিহ্য ও বিশ্বজনীনতার আদর্শে পুরো অষ্টাদশ শতককে আলোকিত করে রেখেছিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে ভারতে কর্মরত অন্যান্য ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিলেন এই প্রাচ্যবিদ্‌রা যারা প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় রীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান করতেন। ভারতীয় ভাষাবিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ অবদান রেখে গেছিলেন। ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচ্যবিদ্যা এবং পশ্চিমী যুক্তিবাদকে একত্রিত করার ধারণা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যা দ্বারা। বৌদ্ধিক দিক থেকে এই ধারণা উনিশ শতকের ভারতবর্ষে এক শক্তিশালী চিন্তার প্রতিফলন। মেটকাফের মতানুসারে এই বিদ্যার বিস্তীর্ণ পদ্ধতি কিছু প্রাচীন বিশ্বাসগুলোকে প্রশ্নের সম্মুখে এনে ফেলে। এদের মধ্যে 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র'-এর ধারণাটাই পরিব্যাপক ছিল। এই ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা গেছিল যে কোন ইচ্ছা এবং তদানুসারে কোন আইন স্বৈরশাসকদেরও ছেড়ে দিত না। ১৭৭০ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দুদের সম্পর্কে বিস্তৃত মতামত দেন যে অপরিবর্তিত প্রাচীন আইন এই সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজেদের আয়ত্বে রেখেছিল। তিনি এও জোরের সঙ্গে বলেন যে দেশের 'প্রাচীন সংবিধান' ভীষণভাবে অক্ষত ছিল। ১৭৮৪ সালে, ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' যার প্রথম সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম জোনস্ এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে পন্ডিতসুলভ কৌতুহল এবং প্রশাসনিক সুবিধাগুলোর সংমিশ্রণের তথ্যগুলো জানতে পারা যায়। এই পথ অনুসরণ করেই গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির দ্বারা কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, একটা শিক্ষামূলক কেন্দ্র সেখানে কোম্পানীর কর্মচারীদের এই ক্ষেত্রে নিয়োগ করার আগে শিক্ষানবীশ থাকতে হত। এই কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঠিকমত বোঝা যাতে ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতিকে ঠিকমত পরিচালনা করা যায়। শেষপর্যন্ত, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যার সফলতাই তাদের ধ্বংসের অন্যতম উৎস, যেহেতু ভারতের প্রাচীন বিদ্যাগুলো অনুধাবন করা হয়ে গেছিল, খ্রীশ্চান মিশনারী এবং আরো ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা বুঝে উঠতে পারছিলো না যে শাসক না শোষক, কাদের জন্য এই প্রাচ্যবিদ্যা গঠিত। ১৮১৩ সালের সনদ আইন এক নতুন ইউরোপীয় গোষ্ঠীদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই খ্রীশ্চান ইভানজেলিকালরা খুব তাড়াতাড়ি সারা বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। নতুন প্রজন্মের 'উত্তর-প্রাচ্যবাদী'র মিশনারীরা ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীদের থেকে একেবারেই বিপরীত ছিল। তারা হিন্দু সংস্কৃতিকে অপবিত্র এবং অনগ্রসর সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করত। তাদের কাছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূল শক্তি নিহিত ছিল খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতিকে যতটা সম্ভব মুছে ফেলা এবং তার পরিবর্তে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ, ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমী ধারণাগুলোকে আরোপ করা।

৯.২ ইভানজেলিকালিজম

ভারতের ইউরোপীয় সমাজে ইভানজেলিকাল বা ভগবদ্‌সংক্রান্ত প্রভাব আদর্শগত দিক থেকে কতটা বিস্তার করেছিল তা বলা খুব কঠিন এবং এটা যতখানি না স্থানীয় সফলতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তার থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের সমাজে ইভানজেলিকার বা ভগবদসংক্রান্ত মতবাদের বিস্তীর্ণ প্রভাবের দ্বারা। বস্তুতঃ, ভারতের মাটিতে একটা শক্ত জমি তৈরী করার পর, খ্রীশ্চান ধর্মান্তরীদের জন্য নৈতিক রক্ষা, 'সতী', 'শিশুহত্যা'র মত কিছু অমানবিক আচার রোধ করা এবং মন্দির ও হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে ব্রিটিশ সমর্থন তুলে নেওয়ার মত কিছু রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর এই মিশনারীরা সরাসরি মতপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল। যদি এই কর্মকান্ড শুধু একটি কক্ষে পরিবেষ্টিত থাকত এইভাবে তাহলে এই ইভানজেলিকাল মতবাদের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব থাকত। ঘটনা হচ্ছে যে এটা ভারতীয় সমাজকে পুরোপুরি পরিবর্তিত করতে গিয়ে আরো শক্তিশালী রাজনৈতিক স্রোতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। এই মৈত্রীর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আভাস পাওয়া যায় চার্লস গ্রান্ট স্বাক্ষরিত একটি লেখায় যা ১৭৯৭ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্স'দের সামনে পেশ করা হয়। তাঁর স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের আর্জি ছিল যে ভারতবর্ষে এই ইভানজেলিকারন মতবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ব্রিটিশ শক্তির প্রথম কর্তব্য এবং উদ্দেশ্য হওয়াই উচিৎ। গ্রান্ট হিন্দু গ্রন্থগুলো থেকে উক্তি তুলে এনে এবং ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত থেকে ভারত সম্বন্ধে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ভারতবর্ষ নৃশংস কুসংস্কারের স্রোতের মুখে পতিত ছিল, এই কলুষিত সমাজ সবচেয়ে দুশ্চরিত্রার স্থান এবং পৃথিবীতে সবথেকে অসৎ ও দুবৃত্ত অধিবাসীতে অধ্যুষিত এই দেশ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল যার কোন পরিমাপ নেই। উইলবারফোর্স-এর মতে হিন্দু ভক্তরা ছিল 'কাম, অনৈতিকতা, চাতুরতা এবং হিংসার এক একটি অতি দানব। সংক্ষেপে, এদের ধর্মীয় প্রথা ছিল এক বৃহৎ ঘৃণ্য বস্তু।' আসলে, ইভানজেলিকালদের কাছে প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে ভগবানের হাত দেখা গেছে, এবং ইংরেজদের ক্ষমতার অধীনে থাকা ভারতবর্ষের মত আর কোনো জায়গায় এমন স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। ভারতের নিম্নস্তরের মানুষদের কাছে ইভানজেলিকাল মতবাদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে আসল দায়িত্ব এবং কর্তব্য। গ্রান্ট যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ব্রিটিশ প্রথার প্রধান নীতি হল একত্রিত করার নীতি, যা ব্রিটিশ এবং তার ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে সৃষ্ট ভয়ানক ফাঁক বন্ধ করে দেবে।

৯.৩ উপযোগিতাবাদ

দুটো অবস্থানরত সম্ভাবনা যা উজ্জীবিত করত ব্রিটিশ নীতি, এটা সহজেই অনুমেয় যে উপযোগিতাবাদ এই প্রবণতাকে একত্রিত করার জন্য সর্বাগ্রে এসেছিল এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী উৎপাদক শ্রেণী এবং মিশনারীদের মৈত্রীর দ্বারা যে সংস্কার-সাধন উদ্ভুত হয়েছিল তার ব্যূহমুখ তৈরী করেছিল এই উপযোগিতাবাদ। এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে সংস্কার-সাধনে সাধারণ স্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়াই ছিল উপযোগিতাবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত সমাজ-সংস্কারকদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ সরকারের সঙ্গে সস্তায় মুক্ত বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া এবং ভারতবর্ষকে খুব তাড়াতাড়ি আধুনিকতার মোড়কে তৈরী করা। তবুও জেমস মিল এবং বেনথাম প্রণীত মতবাদ যা সমস্ত উদ্ধার মতবাদ থেকে একেবারেই আলাদা এবং স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। উপযোগিতাবাদীদের এবং ইভানজেলিকালদের চিন্তাভাবনার মধ্যে বৃহত্তর অর্থে দেখতে গেলে অনেক সদৃশতা ছিল। ভারতীয় সভ্যতাকে বরদাস্ত করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এই দুই মতবাদ যা ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। ইভানজেলিকালিজম এবং উপযোগিতাবাদ দুটোই ছিল ব্যক্তিত্ববাদী আন্দোলন, দুটোর লক্ষ্যই ছিল প্রথার দাসত্ব

থেকে এবং উচ্চশ্রেণীভুক্ত মানুষ ও পুরোহিতদের অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা। দুজনের কাছেই মানুষ ছিল অনুভূতি সম্পন্ন জীব যার মধ্যে আনন্দ এবং বেদনা দুই-ই সমানভাবে মূর্তমান। অবজ্ঞাই মানুষকে শেষপর্যন্ত সুখী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। উপযোগিতাবাদীদের মতে সুখী হতে গেলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারকে আগে গুরুত্ব দিতে হবে যা একমাত্র সম্ভব জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কিন্তু আইনী প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করলে এই মতবাদগুলো কিছুই নয়। মানুষের চারিত্রিক স্বভাব নির্ধারণ করার ক্ষমতা ছিল প্রথমে আইনপ্রণেতা এবং তার আদেশ, তা হচ্ছে, সরকার এবং আইন। উপযোগিতাবাদীরা তাদের পূর্বসুরীদের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করল ভগবান সরিয়ে মানুষের হাতে 'স্বর্গীয় ন্যায়' আরোপিত করে। ভারতের অসুবিধাগুলোকে বিশ্লেষণ এবং সমাধান করতে গিয়ে মুক্ত মতবাদ এবং ইভানজেলিকালদের থেকে উপযোগিতাবাদীদের পৃথক করে দিল এই ধারণা। মিল ভারতের পরিস্থিতিগুলোকে তিন ধারায় বিভক্ত করলেন—সরকারের গঠন পদ্ধতি, আইনের প্রকৃতি এবং কর-এর ধরন। মিল তাঁর ভাবনাকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন যে এগুলোকে সংস্কার করলে পুরো ভারতীয় সমাজে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা যাবে যা দ্রুত সভ্যতার মাপকাঠিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। জেমসমিল এবং ইংরেজ উদারনৈতিক মতবাদের প্রধান ধারার মধ্যে পার্থক্যগুলোকে একটু গুরুত্ব আরোপ করা যায়। মিল কখনই একমত হতে পারেননি যে মূলধন বা সামগ্রীর উদ্বৃত্তই নয়া আর্থিক শিল্পের মন্দা হওয়াই একমাত্র কারণ। অথবা নতুন বাজার অর্থনীতি উদবৃত্তের নির্গমদ্বার হিসেবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'ভারতবর্ষ, দেশের একটা বৃহৎ অনোপার্জিত বেকারীর অংশকে উপার্জন করানোর জন্য একটা ক্ষেত্র তৈরী করতে সক্ষম হবে'— এইরকম সাধারন দাবিগুলোকে মিল নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। মিল একমত ছিলেন যে মুক্ত বাণিজ্য নীতিগতভাবে ঠিক কিন্তু একে সুখী হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি হওয়ায় যে জনপ্রিয় বিশ্বাস তাকে অস্বীকার করেছিলেন, যা তাঁকে সবার থেকে আলাদা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেনথ্যামের রাজনৈতিক দর্শন ছিল আসলে কর্তৃত্ববাদী যা শতাব্দী লালিত অলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারিতার ফসল। এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করার ধারণাটা উঠে এসেছিল হবসের মতবাদ থেকে। ১৮২০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলাতন্ত্রকে আরও সঞ্চয়ী এবং আরো দক্ষ হওয়ার দিকে চাপ সৃষ্টি করা হতে লাগল। বেনথ্যামের নিজস্ব হিসাব, প্রথাগত অমলাতান্ত্রিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ—এই ব্যক্তিগত দালালির নীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। শুধু তাই নয়, বেনটিঙ্ক ভারতে পৌঁছেই সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কারের কিছু ধারণা দিতে বলেছিলেন এবং স্বভাবতই বেনথ্যাম খুবই খুশী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল যে 'যেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগ আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।'

৯.৪ উদারনীতি

বিশেষ করে পূর্বের শতকগুলিতে, ভারতবর্ষ সেই মাপকাঠির উপাদান এবং তার বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে যা রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ভারতে ব্রিটিশ রীতিগুলো ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার বৃত্তেই ঘোরাফেরা করত এবং ভারতে ইংরেজী সভ্যতার ধারক মিশনারীরা খোলাখুলিভাবে এক মিশ্ররীতির পক্ষ নিয়েছিল। ব্রিটেন তার ছায়া ভারতবর্ষের বুকে স্থাপিত করতে চেয়েছিল। দৈহিক এবং মানসিক দূরত্ব যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান, ইংরেজী আইন এবং ইংরেজী শিক্ষা বলবৎ হওয়ার ফলে। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেনটিঙ্ক গভর্নর জেনারেল ভারতে আসার পরে ব্রিটিশরা সংস্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ব্রিটিশ শাসন ভারতকে উন্নত করবে—এই ভ্রান্ত আশাকে মুক্ত ব্যবসায়ী, উপযোগিতাবাদী এবং ইভানজেলিকালরা সামন্ততান্ত্রিক পরিচালনার একটা স্বতন্ত্র ভাবধারা প্রণয়ন করেছিল যা উদারনৈতিক মতবাদের দ্বারা গঠিত ছিল। নেপোলিয়নের যুগের পরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের

বিশ্বব্যাপী দমননীতি, শিল্প-বিপ্লবের ফসল, এবং নতুন আদর্শের গঠন হিসেবে উদারনীতিকে আর শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনার উপায়ের পথ হিসেবে ভাবা হত না। অ্যাডাম স্মিথ এবং জেরেমি বেনথ্যাম-এর ভাবনা অনুসারে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রিটেনকে পুনর্গঠন করার এটা একটা উপায় মাত্র। উদারনৈতিকরা ধারণা করেছিলেন যে মানুষের প্রকৃতি সবজায়গাতেই সমান এবং তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে আইন, শিক্ষা এবং মুক্ত বাণিজ্যের কর্মপদ্ধতি দ্বারা। তারা ব্যক্তি-মানুষকে পুরোহিত, স্বৈরাচারী এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের যুগ প্রাচীন বন্ধন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ছিলেন যাতে তারা স্বশাসিত, যুক্তিবাদী, বিবেচনা এবং পছন্দের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতে পারে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে তারা বিশ্বের প্রতিটি দেশের, প্রতিটি মানুষের জন্যই বলেছেন।

ভারতীয় সমাজের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক দৃষ্টান্তমূলক পরিচয় বহন করে জেমস মিল-এর ১৮১৪ সালের হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। মিল ভারতবর্ষকে সত্যিকারের রাষ্ট্র হিসেবে সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের শিল্প, উৎপাদন, সাহিত্য, ধর্ম এবং আইনকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে হিন্দুরা কখনই এবং কোনভাবেই সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছতে পারেনি। ভারতকে এই জড়তা থেকে মুক্ত এবং উন্নতির রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিল একটা সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী উপায় বলেছিলেন। বেনথ্যামের মতই তিনি করের স্বল্পতা এবং ভালো আইনের ওপরই জোর দিয়েছিলেন যা সারা পৃথিবীর জাতি এবং ব্যক্তির উন্নতি সাধন করবে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর বাবার কাছ থেকে উদারনীতির নেতৃত্বে দেওয়ার ক্ষমতা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে জড়িত হওয়ার এক স্বাভাবিক প্রবণতা পেয়েছিলেন। উদারনীতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ সর্বজনবিদিত, সেখানে তিনি বলছেন যে সুখের বাইরেও উদারতার একটা নিজস্ব সহজাত মূল্য আছে। তিনি মানুষকে সহজাত স্বার্থপর হিসেবে দেখেননি বরং সেই স্বার্থপরতা বাইরের আইনের দ্বারা সম্পৃক্ত, এই ধারণা তাঁর বাবার থেকে একেবারেই ভিন্ন। জনসাধারণের ভালো এবং নিজেদের সাহায্য করার জন্য তাদের চারিত্রিক বিকাশের পথে শিক্ষনীয় করে তোলা দরকার। তিনি এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে দক্ষ সরকার এবং শিক্ষা ভারতবর্ষের মানুষকে এমনভাবে পরিবর্তিত করবে যে তাদের স্বাধীনতার দাবিকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি বেনথ্যামের উপযোগিতাবাদের কাঠিন্যকে প্রত্যাখ্যাত করে মানসিক ঔদার্যনীতির পক্ষে মত দিতে চেয়েছিলেন। ই. স্টোক্স-এর মতে উদারনীতির আলঙ্কারিক প্রকাশ সব থেকে বেশি পাওয়া যায় ম্যাকলের মতামতের মধ্যে। ম্যাকলে এবং সমসাময়িকদের কাছে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধনের প্রকৃতি ছিল ভঙ্গুর এবং অস্থায়ী। তিনি বলেছিলেন প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ এক ধরণের ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলা ''যারা আমাদের এবং আমাদের শোষিত মানুষদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে—এক শ্রেণীর মানুষ যাদের গায়ে ভারতীয় রক্ত বইছে, কিন্তু যাদের মতামত, আদর্শ, বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা হবে ইংরেজদের মত।''

সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া প্রাচ্যবাদ

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের প্রাচ্য পন্ডিতেরা অতীত ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলির মূল্যবান এবং বিশাল ইতিহাস পুর্নগঠন করেছিলেন। এই ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র গ্রাম এবং সামন্ততান্ত্রিক নীতির 'অপরিবর্তিত' অবস্থান হিসেবে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ভারতের বিস্তৃত অতীত ব্রিটিশ রাজের দরবারে ব্যাখ্যাত হওয়া এবং সহায়ক হয়ে ওঠা প্রয়োজন। পশ্চিমী সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ব্যক্তিবাদ এবং উদারতায় মত মূল্যবোধগুলির দিকে উল্লেখ করে ব্রিটিশরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দিতে পারবেন যেমন পেরেছিলেন জেমস এবং জে. এস. মিল। তারা প্রাযুক্তিক শৌর্য দেখিয়েও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। এই অর্থে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান ছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করল এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে তারা রেলপথ তৈরী করল এবং টেলিগ্রাফের জাল বিস্তার

করল যার পরিকল্পনা ছিল ইউরোপের, ভারতের নয়। মাইকেল অ্যাডাম-এর মতে এই প্রাযুক্তিক শ্রেষ্ঠত্ব মেরী কিংসলের মত দেশীয় সমাজের নরমপন্থীদের কাছেও সাম্রাজ্যবাদী দমনরীতির একটা ব্যাখ্যা, 'আমার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের একবড় নিদর্শন'। শ্রেষ্ঠত্বের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সঈদ। তিনি পশ্চিমী লেখকদের সঙ্কীর্ণতাকে নিন্দে করেছেন যারা অ-পশ্চিমী সভ্যতাগুলোকে 'অন্যান্য' এবং তার ফলে হীন আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সভ্যতার প্রতি পশ্চিমী শ্রেষ্ঠত্বের এই সাহসী ঘোষণা এবং অ-পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি একদেশদর্শী মনোভাবকে নিন্দে করেছেন সঈদ।

সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবসা, দুশো বছরের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং একশ তিরিশ বছরের ভারতবর্ষের বুক থেকে ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটেছিল। ম্যাকলে, এলফিনস্টোন এবং তাঁদের সমসাময়িকদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল যা তাঁরা নিজেরাও আশা করতে পারেননি। তাঁরা হয়ত একে আংশিকভাবে অস্বীকার করবেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁরা তাঁদের দুরদর্শিতাকে অনুভব করতে পারবেন, কারণ দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ কূটনৈতিক দৌত্য এবং সেনাবাহিনীর শাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের অনেক পার্থক্য। যদিও বর্ণে, রক্তে ভারতীয় কিন্তু মননে, আদর্শে ইংরেজ—এইরকম এক শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, তবুও ম্যাকলে এবং মুনরোর মতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। একজন অমনোযোগী পর্যবেক্ষক প্রভাবিত করবে ভারতীয় সমাজের গঠনরীতি, এ দেশের জমিতে পশ্চিমী আদর্শ এবং চিন্তা-ভাবনা, নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধ-এর শিকড় স্থাপিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'হোম গভর্নমেন্ট' আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিপন্নতার মুখে পড়ে এবং তার ফলে ভারত থেকে ঔপনিবেশিক শাসনকে তুলে নেওয়ার জন্য আলোচনা চলতে থাকে। এটা দাবি করা হয় যে ভারতের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা চাপ সৃষ্টির ফলে নয় বরং এটা ছিল স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু এর নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। ভারতীয় রাজ্যগুলোকে স্বশাসিত করার জন্য প্রদান করা হল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীকে হঠিয়ে তাদের জায়গা দখল করতে আরম্ভ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আই.এন.এ'র সংগ্রাম এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চাপ সৃষ্টির ফলে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্যে ওয়েভেল, মাউন্টব্যাটন প্রভৃতি ব্যক্তিত্বদের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠানো হল। এটা ছিল তুলির শেষ টান। ব্রিটিশরা সম্মানজনকভাবে ভারত ত্যাগ করল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আকুলতা আরও উৎসাহিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী অনুভূতির দ্বারা। কংগ্রেস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে তার্কিক বিষয়গুলি উত্থিত করেছিল তার উৎপত্তি ছিল পশ্চিমী চিন্তাভাবনা থেকে। ভারত ব্রিটিশদের বেড়ি ভেঙেছিল পশ্চিমী হাতুড়ির দ্বারা। কোন কোন পন্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের রক্ষাকর্তা হিসেবে ব্রিটিশরা এইভাবে তাদের মহৎ কার্য সম্পাদন করেছিল।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. টি আর. মেটকাফ—আইডিওলজিস অফ দ্য রাজ

২. এরিক স্টোকস—ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যান্ড ইন্ডিয়া

৩. জে. ডি. বিয়ার্স—ব্রিটিশ অ্যাটিউডস টুওয়ার্ডস ইন্ডিয়া

৪. এডওয়ার্ড সঈদ— ওরিয়েন্টালিজম

৯.৬ অনুশীলনী

১. ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্‌দের ভারত সম্বন্ধে ধারণার কথা আলোচনা কর।

২. বিট্রিশ ইভানজেলিস্ট এবং উপযোগীবাদীদের চিন্তা-ভাবনার কথা আলোচনা কর।

৩. ব্রিটিশ উদারতার পশ্চাতে প্রধান চিন্তাগুলো কি ছিল?

৪. সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে নয়া প্রাচ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

একক ১০ ❑ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া

গঠন

১০.০ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া
১০.১ বাংলা রণেশাঁস অথবা নবজাগরণ
১০.২ প্রার্থনা সমাজ
১০.৩ আর্য সমাজ
১০.৪ থিওজফিকাল সোসাইটি
১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি
১০.৬ অনুশীলনী

১০.০ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে ঊনিশ শতক এক অদ্বিতীয় জায়গা অধিকার করে আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর থেকে এবং বছরের পর বছর নানা সংগ্রাম এবং ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছিল এক নতুন ভারতবর্ষ। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনিশ শতকের সূচনায় বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের এক বেদনাদায়ক ছবি পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, এই অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোকরেখা দেখা গিয়েছিল। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাব, ইংরেজী শিক্ষার সূচনা এবং বেকন, লক, ভলতেয়ার বার্ক, বেনথাম, মিল এবং অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিদের শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিম এবং পশ্চিমী চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সংযোগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের উদয় ঘটল। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের পশ্চিমী প্রভাব ছাড়া উদয় ঘটত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ, অনুমান করা যায় যে বাইরের প্রভাব এবং ভেতরের উদ্দীপনার যোগসূত্রেই এই দৃষ্টান্তমূলক ফলাফলের কারণ যা নতুন যুগ আলোকিত করে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ভারতীয় নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সেই নীতি যেখানে ভারত নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই আধুনিক সভ্যতার মূল স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল বাইরের জগতে....'' এন. এস, বোসের মতে 'ভারতের নবজাগরণ হচ্ছে পশ্চিমী উৎকর্ষতার এবং বিস্মৃতি প্রায় অতীত ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের গরিমার একটি সংশ্লিষ্ট উপাদান।'

ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ লাভ করেছিল ইংরেজী শিক্ষার বাতায়ন দিয়ে যা ভারতীয় মননকে উর্ব্বর করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশ বছর পরে ঔপনিবেশিক শক্তি প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে সাংস্কৃতিক দমনরীতি প্রয়োগ করা হয়নি। কোম্পানির সরকার ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষাকে অনুমোদন করেনি। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, ম্যাডরাস এবং বম্বেতে তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরে ভারতের মানুষ প্রথাগতভাবে এবং পরিকল্পনা সহকারে ইংরেজী শিক্ষা নিতে আরম্ভ করে। ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতীয়দের এবং খ্রীশ্চান মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারণ ঘটে। এফ. ডব্লিউ থমাসের মতে ভারতবর্ষে শিক্ষা একেবারে অদ্ভুত কোন ঘটনা ছিল না। এটা এমন একটা দেশ যেখানে শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা খুব প্রাচীনকাল থেকে মূর্তমান ছিল এবং এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী ছিল। যাইহোক, ভারতে

বিশেষ করে বাংলায় শিক্ষার এক সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য মূর্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল বা প্রতিষ্ঠানগুলি, আরবী এবং পার্সি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা, মাকতাব ও পাঠশালা অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর অবস্থা একেবারেই ভঙ্গুর ছিল।

পলাশী যুদ্ধের পর, প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের আদান প্রদানের জন্য ভারতীয়রা অনেক বেশি করে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসতে আরম্ভ করল, তার ফলে তাদের ভাষা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে আরম্ভ করল। ১৭৩১ সালের একেবারে প্রথমদিকে কলকাতায় 'বেলানী চ্যারিটি স্কুল' নামক একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮০০ এবং ১৮১৪ সালের মধ্যে কলকাতায় এবং চিনশুরায় অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত ইংরেজী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরী এবং প্রকাশ করার দায়িত্ব নিল 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী স্থাপিত হিন্দু কলেজে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি, ইংরেজী শিক্ষাও চালু করা হয়েছিল।

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার শিক্ষার ব্যাপারে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারণের ক্ষেত্রে কিছুটা আগ্রহ দেখালেও, তিনি ১৭৮১ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা নামে মাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেখানে আরবী এবং পারসী ভাষা শিক্ষাই একমাত্র গুরুত্ব পেত, বিশেষ মুসলিম আইন। তার ঠিক এক দশক পরে অর্থাৎ ১৭৯১ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন জোনাথন ডানকান। বাংলা গদ্যসাহিত্যকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৮০০ সালে ওয়েলেসলির দ্বারা স্থাপিত হয় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ। উইলিয়াম ক্যারি, একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী বাংলা ভাষায় অনেক কাজ করেছেন যার মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরেজী অভিধান লিখেছিলেন। ১৮১১ সালের ৬ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো স্মরণীয় বক্তব্যকে ধরে নেওয়া হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের প্রথম পদক্ষেপ যা 'অক্ষর জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত' করার ওপরে জোর দিয়েছিল।

সরকারী প্রথার সবথেকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে ১৮১৩ সালের সনদ আইন। সাধারণের রাজস্বে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতবর্ষে শিক্ষার অধিকারের এটা একটা প্রথম আইনসংক্রান্ত পদক্ষেপ। এখানে বলা হয় ভারতের রাজস্বের উদ্‌বৃত্ত থেকে দেশীয় সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও উন্নত করার জন্য ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষদের উৎসাহিত করার জন্য এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন এবং শিক্ষার জন্য গভর্নর জেনারেলকে বছরে কম করে একলাখ টাকা ব্যায় করতে হবে। বস্তুতঃ এই সুবিদিত চুক্তি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ. সি. ব্যানার্জির মতে, ১৮১৩ সালের সনদ আইন ইভানজেলিস্টদের চাহিদা অনুসারে প্রণীত হয়েছিল এবং মিশনারীদের জন্য ভারতবর্ষের দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছিল। কিন্তু কোম্পানির বক্তব্য ছিল যে প্রাচ্য শিক্ষার জন্য অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ প্রদান করার জন্যই এই সনদ আইন বলবৎ করা হয়েছিল। নতুন শিক্ষা প্রণালীর বিকাশের ক্ষেত্রে এটা ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রায় এক দশক ধরে সনদের দ্বারা যে অর্থ অনুমোদিত হয়েছিল তা ব্যায় করা হয়নি। ভারতীয়দের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার প্রথাকে অনেকেই সমর্থন করেছিল। লর্ড হেস্টিংস 'ভুল' ধারণা সম্বন্ধে বলেছেন যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্যের সম্প্রসারণ ঘটা মানেই তারা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কম পরিচালিত হবে এবং তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করবে।

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বহু মিশনারী গোষ্ঠী ইংল্যান্ডে ভীষণভাবে প্রণল্‌ভ এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ উপযোগীবাদীরাও ভারতের সমাজ ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। নতুন শিক্ষার আংশিক প্রয়োগে যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরও দৃঢ় হয় কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সমর্থন করেননি। সুতরাং সরকার

খুবই দ্বিধান্বিত ছিল ১৮১৩ সালের সনদ আইনের প্রবর্তনের এক দশক পরেও, সরকার স্পষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। ১৮২৩ সালে সরকারের শিক্ষা পদ্ধতির একটা স্থির পরিবর্তন প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট কলকাতায় স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ যা প্রাচ্যবিদ্যার পুরোনো পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার একই ধারা বাহন করে চলে। একই বছরে কলকাতায় স্থাপিত 'জেনারেল কমিটি' অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর কাজ ছিল সারা বাংলায় শিক্ষার গুণগত অবস্থার খবর সংগ্রহ করা এবং মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি পথ এবং উপায় নির্দেশ করা। একই বছরে রামমোহন রায় আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে শুধু সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানের জন্য এই কলেজ স্থাপনের প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর কাছে বিনীত আবেদন করেন যে আরও উদার এবং আলোকিত শিক্ষা যেমন অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকে তুলে ধরা। আসলে হিন্দু বুদ্ধিজীবিরা পশ্চিমী শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে হিন্দু বিদ্বোদজনেরা জেমস মিল-এর মত একজন শক্তিশালী সমর্থক পেয়েছিলেন যাঁর কাছে উপযোগিতা ছিল শিক্ষার পরশ-পাথর। আপেক্ষিকভাবে মিলের দ্বারা প্রভাবিত একটি আবেদনপত্রে প্রাচ্য বিদ্যার ওপর পশ্চিমী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লিখিত ছিল যা ১৮২৪ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সদের দ্বারা প্রেরিত হয়।

১৮২৪ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সদের আবেদনপত্রে সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শতকেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী শিক্ষার একটি ক্ষেত্র তৈরী হল। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যুব শাখার একটা অংশ এই প্রথাকে সমর্থন করেছিল, তার ফলে তাদেরকে 'অ্যাংলিসিস্ট' আখ্যা দেওয়া হল। প্রধানতঃ এই প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন প্রবীণেরা—এইচ. টি. প্রিন্সেপ-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—যাঁরা প্রাচ্য বিদ্যাকে চালু রাখার জন্য সরকারী উদ্যোগের জন্য আবেদন রেখেছিলেন, তাঁদেরকে 'ওরিয়েন্টালিস্ট' আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই গোষ্ঠী বিতর্ক আরো প্রেরণা পেল বেনটিঙ্কের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর—যিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে, অথবা যন্ত্রের, অথবা মানুষের চরিত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে উপযোগীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের সর্বজনবিদিত মতামতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, 'অ্যাংলিস্ট'দের আবেদন আরও জোরদার হল এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসায় চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়ানো বন্ধ করে দিতে সক্ষম হল। আইনজ্ঞ ম্যাকলেকে তারা তাদের নেতা বানিয়েছিল যিনি 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৩৫ সালে ম্যাকলে তাঁর সর্বজনবিদিত বক্তৃতায় (Minute) এ ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সংস্কৃত আরবী, অথবা পারসী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না তবুও প্রাচ্যের এই প্রাচীনতম ভাষাগুলো সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা জানাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মতে ভারত এবং আরব দেশের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের থেকে ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থগারের একটা আলমারির গ্রন্থসমূহ অনেক উৎকৃষ্টমানের পরিচয় বহন করে। তিনি ভেবেছিলেন যে যেহেতু ভারতীয়দের তাদের নিজেদের প্রাচীন ভাষা অথবা মাতৃভাষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যাবে না। তাই তাদের বিদেশী ভাষা, বিশেষ করে, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হবে। যেহেতু ভারতের মত বিশাল জনবহুল দেশে শিক্ষার জন্য সরকারী উপাদান খুবই অপর্যাপ্ত ছিল, তাই তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি ছোট গোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে ছিল—যারা ইংরেজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুবাদকের কাজ করবে—এই শ্রেণীর মানুষের রক্তে, বর্ণে ভারত মিশে থাকবে কিন্তু মননে, আদর্শে, মতামতে হবে ইংরেজ। এই নতুন শ্রেণী বিশাল জনসমক্ষের কাছে পশ্চিমী শিক্ষার ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে। ম্যাকলে একে 'ফিলট্রেসান থিওরি' বা 'বিশোধন তত্ত্ব হিসেবে প্রচার করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য স্বীকৃত হল এবং ১৮২৪, ১৮২৭ এবং ১৮৩০ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টার্স'-এর পরিচালক গোষ্ঠীর দ্বারা এই বিষয়টার অনুমোদিত হল। ১৮৩০ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্স দ্বারা অনুমোদিত ইংরেজী ভাষার আস্তে আস্তে সূচনা ঘটল সাধারণ মানুষের ব্যবসায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে... যাতে দেশের মানুষদের কাছে এই ভাষা আরও স্পষ্ট হয়। সেই সময় যেহেতু কেরানী এবং সাধারণ কর্মচারীদের চাকরি পাওয়া সম্ভব

ছিল তাই পরবর্তী সময়ে এটা অনুমান করা হয় যে কোম্পানির শিক্ষাপ্রণালী শুধুমাত্র 'কেরানী তৈরীর' লক্ষেই নিবেদিত ছিল।

১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ পরিষদে গভর্নর জেনারেল একটি আবেদন রাখলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হল যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিক্ষা খাতের সব অর্থ সবথেকে বেশি বিনিয়োগ করা হবে শুধু ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৮৩৫ সালের জুন মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্থাপনের ফলে এই জয় নিশ্চিত হল। সংসদের ভাষা হিসেবে ১৮৩৭ সালে পারসির জায়গা দখল করল ইংরেজী ভাষা। ১৮৪৯ সালে হার্ডিং সেই সব ব্যক্তিদের যাদের ইংরেজী শিক্ষা আছে তাদেরই সরকারী চাকরি দেবার প্রথা চালু করলেন। এটা ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের ক্ষেত্রে আরও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করল। 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্টিটিউশন'কে সরিয়ে ১৮৪২-৪৩ সালে বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাপরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর, ১৮৪৩ সালে ২৮ থেকে ১৮৫৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫১।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে খ্রীশ্চান মিশনারীরা ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা অনেক বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় খুলেছিল এই আশা করে যে পশ্চিমী শিক্ষার আলোতে ভারতীয়রা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ১৮১৮ সালে স্থাপিত অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮২০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় বিশপ'স কলেজ এবং ১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। মিশনারীরা তাদের বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কম সাফল্য লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল।

১৮৫৪ সালের জুলাইতে, স্যার চার্লস উড 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর সভাপতি শিক্ষার ব্যাপারে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। কোম্পানির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় যে প্রাথমিকবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত একটা স্পষ্ট শিক্ষা প্রণালী তৈরী করা। ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। মূল আবেদনগুলো ছিল।

১. শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য আলাদা সাংবিধানিক দফতর তৈরী করা।

২. মূল 'প্রেসিডেন্সি' শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৩. বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা উচিৎ আলাদা প্রতিষ্ঠানে।

৪. অবস্থানরত সরকারি কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয় দেখভাল করা এবং প্রয়োজনে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে।

৫. নতুন মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

৬. আঞ্চলিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিতেও সমান নজর দিতে বলা হয়েছে।

৭. জনগণের তহবিল থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দান করার বন্দোবস্তের কথাও বলা হয়েছে।

শিক্ষা দফতরের প্রতিষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে গেল। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই তিনটে বিশ্ববিদ্যায় স্থাপিত হল; ২৪ জানুয়ারীতে কলকাতা ১৮ জুলাইতে বম্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজ। ভারতীয় উপমহাদেশে অবশেষে পশ্চিমী

শিক্ষা তার দীর্ঘ পরিক্রমার পর দৃঢ়ভাবে তার স্বীকৃত স্থান পেল, যদিও প্রথমদিকে মুসলিমরা কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে হিন্দুদের মত তারাও একে গ্রহণ করল।

ভারতীয় খননে এই পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব খুব উদ্দীপনার সঙ্গে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছিল, এই পুনর্নবীকরণ উদ্দীপিত করেছিল যার প্রতিফলন দেখা যায় সাধারণ মানুষের জীবনের এবং চিন্তাভাবনায়। এই ঐতিহাসিক এবং দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাকে ভারতীয় নবজাগরণ, ভারতীয় বিপ্লব, ভারতের পুনরুত্থান হিসেবে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে এখান থেকেই আধুনিক ভারতের জাগরণ ঘটেছিল, এবং বাংলাই এই জাগরণের মূল কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় নবজাগরণ এবং বাংলা নবজাগরণ এই দুটো আখ্যাই এসেছে ইউরোপীয় নবজাগরণ থেকে, এবং একইভাবে বাংলার ভূমিকাকে ইতালির সঙ্গে এবং কলকতার ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, যদিও এই তুলনামূলক আলোচনাগুলো খুবই আপেক্ষিক এবং ভ্রান্তিকর তবু সাধারণ অর্থে এই তুলনাগুলি কিছুটা হলেও উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে খুবই উপযুক্ত। বাংলাতেই প্রথম ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারণ ঘটে এবং নতুন অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হয় যা এই জাগরণে অগ্রভাগে ছিল।

১০.১ বাংলা রনেশাঁস অথবা নবজাগরণ

অনেক আধুনিক পন্ডিতদের মতে উনিশ শতকের প্রথম আবার কোনো বিদ্যদজনের মতে পুরো উনিশ শতক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জাগরণের মধ্য দিয়ে বাংলা রনেশাঁস তথা নবজাগরণের সাক্ষ্য বহন করে। ইউরোপীয় ভঙ্গিতে রণেশাঁস শব্দটিকে দাবি করে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা জীবন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন শিখেছিলেন। মূলতঃ সমসাময়িক জীবনে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ ভাবে সাড়া ফেলেছিল। বিভিন্ন আন্দোলন, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান গঠন, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন, রাজনৈতিক সচেতনতা, এবং আরও উদীয়মান সামাজিক—রাষ্ট্রিক ঘটনাগুলো রনেশাঁস-এর বাস্তবিক রূপ। রনেশাঁস তত্ত্বের প্রবক্তারা এই ঘটনাসমূহের উৎপত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ইউরোপীয় বিদ্যার মধ্যে (বিশেষতঃ দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য), যা ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছিল। যদিও এই শিক্ষা খুব শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার হিন্দু সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের মধ্যে, তবু আংশিকভাবে মুসলমানদের ও অন্যান্যদের মধ্যে এমনকি শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে।

নবজাগরণের ধারক ছিলেন, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ও তাঁর যুক্তিবাদী শিষ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও তাঁর অনুগামীরা, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৫-৯৪) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। পশ্চিমী ধারণা যা রনেশাঁস চিন্তক এবং আন্দোলনকারীদের প্রভাবিত করেছিল তাদের মধ্যে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, উপযোগিতাবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা, ব্যক্তিবাদ, দৃষ্টবাদ, ডারউইনবাদ, সমাজবাদ এবং জাতীয়তাবাদ। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), জেরেমি বেনথ্যাম (১৭৪৮-১৮৩২), থমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), অগাস্ট কমটে (১৭৯৮-১৮৫৭), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৬০৬-৭৩) এই কয়েকজন আধুনিক মনস্ক পশ্চিমী চিন্তকেরা বাংলার রনেশাঁস চিন্তকদের মধ্যে তাঁদের অনুগামী পেয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (প্রতিষ্ঠিত ১৭৮৪), ব্যাপটিস্ট মিশন অফ শ্রীরামপুর (১৮০০), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭),

ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজ (১৮৩৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর মত প্রতিষ্ঠানগুলির রনেশাঁস ক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য।

নবজাগরণের দুটো ধারা হচ্ছে ১. বহুল সংখ্যায় সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং ২. বিভিন্ন সমাজ সঙ্ঘ এবং সংস্থার উত্থান। রণেশাঁস প্রবর্তিত বিভিন্ন মত বিনিময় করার জন্য এগুলোই বিভিন্ন কার্যালয়ে রূপায়িত হয়। যাইহোক, রণেশাঁস-এর সবথেকে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি। আর একটা প্রধান ধারা ছিল যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে ঠেকানোর জন্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উত্থান, পশ্চিমী শিক্ষা এবং ভাবনার প্রসারণ, তপ্ত এবং বিচিত্র বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসা এসবই রনেশাঁস-এর ফল। বাংলা রনেশাঁস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একযোগ হয়েছিল, এবং তার ফলে জাতীয়তাবাদ দেশে বিদেশের শাসনাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসি এবং পশ্চিমী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর তৌফত-উল-মুয়াহহিদীন অথবা গিফট্ ফর মোনোথিসিস (১৮০৩-০৪) ধর্মমত সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি যুক্তিবাদী লেখা। তিনি পরবর্তীকালে, যুক্তিবাদ এবং উপযোগীতাবাদকে মিশিয়ে একটি সেমিটিক ধরনের মোনোথিজম প্রবর্তন করেন এবং সামাজিক অন্যায় এবং অসাড় বোধজ্ঞানকে সরিয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার চেষ্টা করলেন। পনেরো বছরের (১৮১৫-৩০) হিন্দু এবং খ্রীশ্চানদের বিরোধকে মেটাতে গিয়ে তিনি আপেক্ষিকভাবে বহু ঈশ্বরবাদ এবং ত্রিত্ববাদকে হারিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্রাহ্মমতে একেশ্বরবাদ। তিনি সামাজিক ন্যায়ের জন্য শতাব্দী প্রাচীন বিরোধ উত্থান করেছিল। বিশেষতঃ হিন্দু নারীদের মুক্তির ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে ঔপনিবেশিক সরকার গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর নেতৃত্বে 'সতী' প্রথা দমন করলেন এবং রামমোহন একে সমর্থন করেছিলেন। রামমোহন রায় আবার ছাপাখানার স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন এবং পশ্চিমী পাঠক্রমের সাহায্যে অসাম্প্রদায়িক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

হেনরি ডিরোজিও একজন মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন (১৮২৬-৩১) এবং তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা করার দিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। টম পেইন-এর 'এজ অফ রিজন' এবং 'রাইটস্ অফ ম্যান'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন এই যুবকেরা। 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত এই যুবকেরা প্রায় পনেরো বছর ধরে (১৮২৮-৪৩) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান নামে একটি সঙ্ঘে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রচার করেন। তাঁরা ছটা মাসিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—পারথেনন (১৮৩০), ইষ্ট ইন্ডিয়া (১৮৩১), এনকোয়েরার (১৮৩১-৩৪), জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১-৪০), হিন্দু পায়োনির (১৮৩৫-৪০) এবং বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২-৪৩) প্রথম কয়েক বছর তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন হিন্দুধর্ম। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যর্থতার দিকগুলো আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন।

ডিরোজিয়ানরা রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীদের মতো আধ্যাত্মিকতা এবং যুক্তির দুইয়ের ওপর নির্ভর করতেন না, তাঁদের কাছে যুক্তিই একমাত্র অস্ত্র ছিলো। তাঁরা রামমোহন অনুগামীদের 'অর্ধেক-উদার' বা 'হাফ-লিবারেলস' বলতেন। চল্লিশ দশকের শেষদিকে এই বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়েছিল যখন ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানের প্রবক্তা অক্ষয়কুমার দত্ত শাস্ত্রের অব্যর্থতার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুপ্রাণিত করেছিল রামমোহনের আধ্যাত্মিকতাবাদ এবং তাঁর যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদ-এর অনুপ্রাণিত হয়েছিল দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মবাদকে ঈশ্বরবাদ-এ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রত্যাদেশকে সরিয়ে প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ১৮৫০ সালে মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে এই বিরোধ ত্রিকোণ আকার নিল। বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ দত্তের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সঙ্গে ভালোভাবেই মিশে গেল কিন্তু উভয়ই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতাবাদের বিরোধীতা করলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ থেকে অক্ষয় কুমার দত্ত বিতাড়িত হওয়ার ফলে এই বিতর্কের অবসান ঘটেছিল। যদি অজ্ঞাবাদী হতেন অক্ষয় কুমার দত্ত তাহলে ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাসে এক ধরণের যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ এবং সমালোচনার জোয়ার আনতে পারতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নববুদ্ধিজীবিশ্রেণীর জীবনে লক্ষণচিহ্নরূপে ছিল এই মতবাদ। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর, যিনি অজ্ঞাবাদী থেকে গেছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন অনুমোদিত হয়েছিল এবং তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলনের (১৮৫৫-৫৬) অন্যতম পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। তিনি ৬০-এর দশকে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন করেছিলেন। এই ব্যাপারে এবং স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ শুধুমাত্র রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, ঔপনিবেশিক সরকারও সাহায্য করা থেকে প্রতিহত থাকেন। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর যে নাস্তিক্যবাদ-অজ্ঞাবাদ-নিরীশ্বরবাদ-এর ধারা প্রবর্তন করেন তা শেষ সীমায় পৌঁছোয় দৃষ্টবাদী কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৯৩২) কাছে এসে, যিনি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। ঐতিহাসিকভাবে, এই বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর নাস্তিক চিন্তক জয়রাশি ভট্ট-র অনেক পরে, এই নিরীশ্বরবাদী চিন্তাবিদ্রা ভারতীয় বস্তুবাদ-এর ধারাকে আবার ফিরিয়ে আনে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের জন্য, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট চার্চের কিছু প্রচারকদের, জন্য এবং রামমোহন রায় ও তাঁর বিরোধীদের জন্য বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা করেন। প্যারী চাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে গদ্যগুলো উদ্ভাসিত হচ্ছিল। ডিরোজিও মত দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রথাবিরোধী মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর লিখিত কাব্য এবং নাট্যে প্রথা ভেঙে সূত্রপাত ঘটালেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, ব্যক্তিবাদ, জাগতিকতা, দেশাত্মবোধ, নারী চরিত্রের স্পষ্টতা এবং নাটকে তীক্ষ্ণ বিরোধ। এক ঝাঁক নিম্নমানের নাট্যকার এবং কবি তাঁকে সরাসরি অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন। সাহিত্য ছাড়াও, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দর্শনের চর্চাও করেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-৫৬) (যিনি প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন), মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪), জগদীশ চন্দ্র বোস (১৮৫৮-১৯৩৭), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মত পন্ডিতেরা। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ইসলাম সংক্রান্ত পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামধর্মের নানা দিক নিয়ে অনেক বই এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ লেখেন। বাংলায় প্রথম তিনি তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন কোরান-এর অনুবাদ করতে গিয়ে (১৮৮৬)। অক্ষয় কুমার দত্ত নবজাগরণের আর একটা ধারা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের আলোকপ্রাপ্ত অনেক দার্শনিকদের মত, তিনি এবং বাংলা নবজাগরণের আরো অনেক বুদ্ধিজীবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন, শখের উদ্ভাবক। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্ত সংগ্রহ (১৮৫০) এবং রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬০) এবং বঙ্কিমচন্দ্রর বঙ্গদর্শন (১৮৭০) আরো অনেকের লেখার মত এই নিদর্শন বহন করে।

ঊনিশ শতকের পুরো ছটা দশক জুড়ে বিরাজ করছিল বাংলার নবজাগরণ যখন যুক্তিবাদ ছিল সমাজ পরিচালক নীতি যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার এবং সংস্কারকদের আক্রমণের স্বাভাবিক লক্ষ্য ছিল হিন্দুত্ববাদের কিছু ধারার প্রতি। শেষ চার দশক জুড়ে ছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ গোটা বাংলা, যার উদ্দেশ্য ছিল পুনঃর্জাগরণ এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ উপনিবেশ। বিদেশীদের আয়ত্বাধীন দেশের পরিস্থিতি যুক্তিবাদীদের বেশিদিন বিমুখ হয়ে থাকতে দেয়নি। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালো আইন' (সাদা চামড়ার প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় বিচারক রায় দিতে পারবেন না এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত আইন) বিতর্ক, ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহ, এবং নীলচাষ বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) গুলোর কিছু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বাঙালী চিন্তকদের জাতীয়তাবাদী পথে

নিয়ে আসার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছিল। ষাটের দশকে এই ধারণা অনেক মনীষিদের মনে কল্পনা জাগিয়েছিল এবং অনেক ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্ব যেমন নবগোপাল মিত্র (১৮৪১-৯৪), রাজনারায়ণ বোস (১৮২৬-৯৯), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সন্তানেরা (১৮৬৭-৮১) সাল পর্যন্ত 'হিন্দু মেলা' এবং ১৮৭২ সালে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে 'হিন্দু' জাতীয়তাবাদী ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন।

এই উদ্যোগ 'নয়া-হিন্দুত্ববাদ' নামক একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল যা হিন্দু শাস্ত্র এবং একই সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রশংসিত সমালোচনার সাহায্যে হিন্দুত্ববাদকে পুনরায় রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। নয়া-হিন্দুত্ববাদের প্রবর্তকেরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ব্রাহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)। ব্রাহ্ম ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের একেশ্বরবাদ-এর প্রত্যুত্তরে নয়া হিন্দু ভাববাদীরা সর্বেশ্বরবাদের কথা বলেছেন। তাঁরা শিক্ষা, সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, এবং একই সঙ্গে বোধের অনুশীলন-এর মাধ্যমে সংস্করণ, সংস্কারসাধন উন্নতি প্রভৃতির সমাজ সংস্কারের ধারণাগুলি উত্থিত হবে বলে মনে করতেন। তাঁরা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধকেই আহ্বান করেছিলেন এবং মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে পূজা করতেন। ইন্ডিয়া লিগ (১৮৫৭), ইন্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন, (১৮৭৬), ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩), এবং দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (১৮৮৫)-এর মত কিছু সংগঠন-এর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরো বেশি যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়।

নয়া হিন্দু এবং জাতীয়তাবাদের অনুভূতির জন্য কিন্তু নবজাগরেণর উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিস্পৃহ হয়ে যায়নি। দিলাওয়ার হোসেইন (১৮৪০-১৯১৩) যিনি মুসলমানদের আর্থসামাজিক অসুবিধাগুলো যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা তুলে ধরেছিলেন সমাজে। মির মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সমাজ সমালোচক এবং রোকিয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১), লেখিকা, শিক্ষাবিদ, মুসলমান নারীদের শৃঙ্খল মোচনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন—এঁদের কাছে নবজাগরণ তার জমি নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছিল। আর শতাব্দীর শেষ সীমায় এই নবজীবনের তেজ ছড়িয়ে পড়েছিল উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

অনেক উত্তর আধুনিক পন্ডিতদের মতে, বাংলার 'নবজাগরণ' শব্দটি ভ্রান্তিমূলক এই অর্থে যে এটা একটা প্রবঞ্চনা যার দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকার-এর প্রশাসন এবং শিক্ষা-দফর খুব সচেতনভাবেই একটা শ্রেণী তৈরী করেছিল যা আমরা উনিশ শতকে দেখতে পাই। এই শ্রেণী ছিল খুব ক্ষুদ্র এবং উচ্চবর্ণের শহুরে হিন্দুদের একাংশের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল যাদের ভাবনা চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপ বাংলা সমাজে খুব কম অথবা একেবারেই কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুসলমান সমাজ এবং গ্রামীণ হিন্দু সমাজেও এর কোন প্রভাব পড়েনি।

বাংলা ছাড়াও, এমন কিছু রাজ্যেও, এই জাগরণের চিহ্নও প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায় প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওজফিকাল সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

১০.২ প্রার্থনা সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে ১৮৬৭ সালে মহারাষ্ট্রে স্থাপিত হয় প্রার্থনা সমাজ। আত্মারাম পান্ডুরাঙ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৪০ সালে বম্বেতে পরমহংস মন্ডলী স্থাপনের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা উপাসনা এবং জাত-পাত প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনগুলি শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। পশ্চিম ভারতের সবথেকে প্রথম ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন গোপালহরি দেশমুখ যিনি হিন্দু রক্ষণশীলতাকে আক্রমণ করেছিলেন এবং সমাজের সমতার কথা প্রচার করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রার্থনা সমাজে একেশ্বরবাদের প্রচার করে এবং ধর্মকে জাতপাতের রক্ষণশীলতা এবং পুরোহিতদের দমনরীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। আধুনিক শিক্ষার আলোতে হিন্দুত্ববাদকে সংস্কার করার তাদের লক্ষ্য ছিল। এর প্রধান দুই নেতা ছিলেন ঐতিহাসিক আর. জি. ভান্ডারকর, এবং এ. জি. রাণাডে। এই আন্দোলন মহিলাদের ওপর অত্যাচার, মাদকতা, অস্পৃশ্যতা এবং বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী কর্মসভার আয়োজন করেছিল।

১০.৩ আর্য সমাজ

উত্তর ভারতে আর্য সমাজকে কেন্দ্র করে হিন্দু সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করেন আর্য সমাজ। দয়ানন্দ বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পুরাণের ক্ষতিপূর্ণ দিকগুলো থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত করে তাকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমস্ত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বৈদিক শাস্ত্রকে রেখেছিলেন। দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভগবানের দ্বারে সরাসরি প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁর আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। যদিও বেদের অভ্রান্ততার প্রতি বিশ্বাসই প্রধান ছিল, তবু দয়ানন্দের আন্দোলন অন্যান্য সমাজ সংস্কারকের মতই ছিল। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিমা-পূজো এবং হিন্দুত্ববাদের আচার-আচরণরীতির বিরোধিতা করেছিলেন। দয়ানন্দ বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এবং অন্যান্য সমাজসংস্কারকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পরবর্তী সময়ে আর্যসমাজের কিছু কর্মীদের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। এখানে এটা দ্রষ্টব্য যে আর্য সমাজ বুঝতে পারেনি যে ভারতের জাতীয় একতা সমস্ত ধর্মের, জাতের বিশ্বাসের মানুষকে একত্রিত করার জন্য সব ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের হয়ে প্রচার করতে হত।

১০.৪ থিওজফিকাল সোসাইটি

মাদাম এইচ. পি. ব্লাভাৎস্কি এবং কলোনেল এইচ. এস. অলকট ইউ. এস. এ-তে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন থিওজফিকাল সোসাইটি। ১৮৮৬ সালে এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় মাদ্রাজের কাছে। এই সমাজ হিন্দুধর্ম, জোরাসট্রিয়ানিজম, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ধর্মগুলি আবার ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচার করেছিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত যিনি ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে। ফিওজফিস্টরা বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধের কথা প্রচার করেছিলেন। এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রাচ্যবিদরা যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান এবং প্রশংসা করতেন। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে থিওজফিস্টরা সফল হতে পারেননি। মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে শ্রীমতি অ্যানিবেসান্ত বেনারসে প্রতিষ্ঠা করেন কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় যা পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়।

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জি—দি নিউ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া

২. এন. এস. বোস—দি ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল

৩, ডেফিড কপ্‌ফ—ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দি বেঙ্গল রণেশাঁস

৪. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতণু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

৫. বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

৬. এ পোদ্দার—বেঙ্গল রনেশাঁস।

৭. এম. এন. ফানকুহার—মডার্ন রিলিজিয়াস মুভমেন্টস।

১০.৬ অনুশীলনী

১. ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের কথা আলোচনা কর।

২. রাজা রামমোহন রায়, ইয়ং বেঙ্গল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা নবজাগরণে অবদানের কথা আলোচনা কর।

৩. সংক্ষেপে প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওজফিকাল আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

একক ১১ ❑ ১৮৫৭ সালের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন

গঠন

১১.০ ১৮৫৭ সালের ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন
১১.১ গ্রন্থপঞ্জি
১১.২ অনুশীলনী

১১.০ ১৮৫৭ সালের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন

বিদ্রোহের পর এসেছিল পুনঃর্গঠন। কর্মপন্থার প্রথমেই ছিল ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন করা। ১৮৫৮ সালের সরকারের ভারত আইন বঞ্চিত করেছিল ভারত সরকারের কোম্পানীকে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতির জায়গা নিয়েছিলেন ভারতের জন্য যে রাষ্ট্রসচিব তিনি, যিনি হয়ে উঠেছিলেন, ক্যাবিনেটের অধীনে কর্তৃত্বের মূল কেন্দ্র, আরও ভালো ভাবে বললে ভারতবর্ষে নীতির পরিচালক। স্থানীয় জ্ঞান যোগানোর ক্ষেত্রে যেখানে পরিচালকগণ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেওয়ার কথা দাবী করেছিলেন। এটি ছিল ১৫ জন সদস্য সমৃদ্ধ, এঁদের মধ্যে ৮ জন সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজার বা রাজতন্ত্রের দ্বারা, এবং বাকি ৭ জন প্রথমে পরিচালকদের দ্বারা এবং পরে কাউন্সিলের নিজের সভ্যদের ভোট দ্বারাই সভ্য নির্বাচন হওয়া। এই কাউন্সিলের ঝোঁক ছিল সরকারী অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের এবং দেখা যাচ্ছে সভ্যরা ছিলেন সাধারণতঃ তারা, ভারতবর্ষে গোটা কর্মজীবনের সমস্ত অংশ কাটানোর পর যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত হতেন। রূপায়িত করেছিলেন সরকারী অভিজ্ঞতা অতীত প্রজন্মের। এটি হয়তো চিহ্নিত করা যায় যে, ১৮৫৮ সালের আইনে, ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল পরিচিত হলেন ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া হিসেবে এবং তিনি কার্য করেছিলেন ভারত সচিব এবং তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশে।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, রাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে কোম্পানীর তুলনায় কম ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন ছিল এবং ঐ মুহূর্তে ভারতবর্ষ ছিল চলতে থাকা মনোযোগের বিষয় লন্ডন পরিচালক সমিতি বা চক্রের কাছে। রাজতন্ত্র নিজেই, ব্যক্তিগতভাবে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই মতো তাঁর স্বার্থকে পরিচালিত করেছিলেন একইভাবে তাঁর পৌর এবং সামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবং বৃহৎ অর্থে বা মুক্ত অর্থে ভারতবর্ষের জনগণের ক্ষেত্রে।

'Indian Services'-এর ঘনিষ্ঠ বর্ণ চক্রের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার ঝোঁককে ঐ পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে বাধা দিয়েছিল। ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দিয়ে পাওয়া উদ্যোগ ও স্বাতন্ত্র সে হারিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যেমন এই সার্বিক স্থানান্তর, আমরা একমত হতে পারি যে, পরিবর্তন জড়িয়ে গিয়েছিল অনিয়মিত এবং ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিগত ক্ষতির অনুভব থেকে, যা একঘেয়ে ভাবে আবেষ্টন করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া হাউসকে। কিন্তু এটি ছিল ক্ষতিপূরণের থেকে অনেকবেশী যা অনেকবেশী অগ্রবর্তী তার দ্বারা যা ব্যাপ্ত করেছিল নব্য ভারত কার্যালয়। বাণিজ্যতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ বা ধ্বংসাবশেষ এবং 'ledger-book attitude' মনোভাব যা কিনা পরিচালকগণ দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছিলেন, চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া পর্যন্ত। এই ধরনের গৃহ কাতরতার প্রতি ঝোঁক যার মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সরকার যেমন অনেক বেশী পুলিশের কার্য এবং রাজস্ব সংগ্রহে সেই সঙ্গে বিতৃষ্ণা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিল নতুন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ওপর, একই সঙ্গে যা আবার মুছে গিয়েছিল একান্তে। সার্বিকভাবে সরকার তখন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাচ্ছিল আধুনিক ভারতের দিকে, অনেচেতনভাবে ফিরে যায়নি মুঘল প্রশান্তির দিকে।

যেমন এর ফলে, বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ ত্যাগ করেছিল তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি। বিদ্রোহের সময়ে বেশীরভাগ উচ্চপদস্থ জনেরাই ছিলেন ব্রিটিশ শক্তির কাছে অনুগত, যেমন লর্ড ক্যানিং তার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন "breaknaters in storm" আখ্যায়। ব্রিটিশ রাণীর নামাঙ্কিত ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁরা এইসময় পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে ব্রিটিশ অনুসরন করতে থাকে স্থিতাবস্থার নীতি যতদূর সম্ভব সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে। নানারকম উপাধি পেনসন, এবং তোপ দেগে অভিবাদন জানানোর মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ এদের চেষ্টা করেছিল স্বপক্ষে আনতে এগুলি ছিল ব্রিটিশকৃত সম্মানের স্মারক চিহ্ন। নতুন নীতির মধ্যে প্রথম বাধা ছিল রাজতন্ত্রের দ্বারা সার্বভৌমিকতার ধারনার। সমস্ত রাজ্যগুলি এই সময় হয়ে উঠেছিল রাজকীয় শ্রেষ্ঠতার মনোযোগের বিষয় যেমন মুঘল যুগে দেখা যেত। এই সংযোজক বিষয়টি ছিল আরও নিশ্চিত এবং আরও ব্যক্তিগত, কোম্পানীর নৈর্ব্যক্তিক অস্পষ্ট কর্তৃত্বের তুলনায়। এই পদক্ষেপে দুটি প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমত, সাম্রাজ্যের অখন্ড অংশ হিসেবে বরং উপেক্ষার থেকেও বেশী লালিত হয়েছিল বিলোপসাধনের ঝোঁকের সঙ্গে। তাদের সীমানাগুলি ছিল নিশ্চিত এবং গ্রহণ করার বা অধিকার করার দাবী বাতিল হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ হস্তক্ষেপের অধিকারের সঙ্গে রাজকীয় শ্রেষ্ঠতার ধারনা বাহির হয়েছিল। উচ্চপদের বা রাজতন্ত্রের লালনকারীরা এইভাবে জোর দিয়েছিল ভালো ব্যবহারের ওপরে যে কোম্পানী এর সঙ্গে অবজ্ঞার দূরত্ব রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির প্রভাব এই সময় অত্যন্ত কার্যকরীভাবে ব্যাবহৃত হয়েছিল সুস্থ সরকার গড়ে তুলতে। রাজোচিত দুর্নীতিপূর্ণ প্রশাসন হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যের উদ্বেগের বিষয় এবং তারা উৎসাহিত হয়েছিল নিজেদের স্বার্থে তাদের চারপাশে যে কাজের বাতাবরণ ছিল এবং নিক্ষিপ্ত করেছিল তাদের অবস্থান বা রাষ্ট্রকে। এই ধরনের পদক্ষেপের দ্বারা খোলাখুলিভাবে পশ্চিমী প্রভাব গ্রহণ করতে, যেমন রাস্তা তৈরী এবং রেলওয়ে এবং সেইসঙ্গে শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিক শিল্প তৈরীর ক্ষেত্রে। সুতরাং স্বরতন্ত্র কিছু রাজার একত্রীকরনের মধ্যে থেকে রাজারা পরিণত হয়েছিল একটি নতুন রাজ্য গঠনের বাধা হিসেবে।

১৮৫৩ সালের আইন পরিষদের প্রকৃত অর্থেই রূপান্তর ঘটেছিল। নতুন বিচারক এবং চারজন প্রাদেশিক প্রতিনিধিরাজ পুনঃস্থাপিত হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের দ্বারা অতিরিক্ত সদস্যের দ্বারা। অন্ততঃ এদের মধ্যে $\frac{1}{2}$ সরকারী কর্মচারী ছিলেন না। তাদের নির্বাচনের জন্য কোনও আইন নির্দেশিত ছিল না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ডালহৌসীর আকাঙক্ষা ছিল ভারতীয় প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করা, যা এইভাবে সাফল্যলাভ করেছিল। একই সময়ে পরিষদের ক্ষমতা, যা ক্যানিং সন্ধান পেয়েছিলেন অসুবিধাজনক অর্থে স্বাধীন। যা বদ্ধ ছিল পরিমাণের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট অর্থে যা নিহিত ছিল তাদের আগে। এইভাবে আশা করা হয়েছিল, সর্বোচ্চ সরকার জনগনের থেকে তার বিচ্ছিন্নতাকে কমিয়ে আনবে, যেখানে সরানো হচ্ছে একটি কৃত্রিম সংসদ সংক্রান্ত বিরোধীতা বিচারকদের এবং প্রাদেশিক কর্মচারীদের আচরনে। একই সময়ে আইনপ্রনয়ণের ক্ষমতা বিশিষ্ট শক্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছিল বোম্বে এবং মাদ্রাজে প্রাদেশিক কাজকর্মের জন্য।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে প্রশাসনিক পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল দাম্ভিক আর দিনের পর দিন বাড়তে থাকা আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের একটি ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং নিরেট বা জমাটবদ্ধ ১৮৫৮-র পর, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস—আমলাতান্ত্রিকতার মূল সুর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইস্পাত নির্মিত গঠন।" ১৮৫৮-র ভারত সরকারের আইন ক্ষমতা প্রদান করেছিল নিয়মবিধি তৈরী করতে কাউন্সিলের রাষ্ট্রসচিবকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যারা প্রবেশ করবে তাদের জন্যে, মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে, যা হবে লন্ডনের সিভিল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা। পুনঃস্থাপনের পুরনো পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রার্থীরা কোম্পানীর পরিচালকদের দ্বারা মনোনীত হবেন। ১৮৫৮ সালের আইন অনুসারে সমস্ত স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেওয়া সাম্রাজ্যের বিষয়গুলি পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্য। যাদের ছিল বয়সের সীমা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক নির্দেশ। প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল সিভিল সার্ভিস

কমিশনারদের দ্বারা, তাদের যোগ্যতার ক্রম অনুসারে, তারা মনোনীত হয়েছিল শূন্যপদ পূরণ করতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের, পরিষদের রাষ্ট্র সচিবের দ্বারা। ১৮৬১ সালের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আইন, সংসদের দ্বারা পাস হয়েছিল, সংরক্ষিত ছিল নিশ্চিতভাবে কয়েকটি শ্রেণীর উচ্চপদস্থ পরিচালক এবং বিচার বিভাগীয় পদ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য। এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনের শর্ত বাতিল, যুক্ত হয়েছে সিভিল বা পৌর কর্মচারীদের উন্নত জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে। এটি বঞ্চিত করেছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভবিষ্যৎ ভারতীয় সদস্যদের, প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে পদন্নোতির দাবীকে। প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনে প্রতিযোগিতামূলক I.C.S পরীক্ষায় পাস করেছিলেন, তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই। ১৮৬১ সালে তিনজন সফল ভারতীয় সদস্যরা হলেন— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ১৮৫৮ সালের পর তিনদশকের জন্য, সেখানে শুরু হয়েছিল একটানা বিতর্ক, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের বয়স নিয়ে, এবং ১৮৯২ এর মধ্যে সর্বনিম্ন বয়সের সীমা বাড়িয়ে ২১ এবং সর্বাধিক ২৩-এ আনা হয়েছিল।

পরবর্তী বিষয় ছিল অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারের পুনঃগঠন। ভারত সরকারের মূলধনের যোগান ছিল অদ্যাবধী যৌথভাবে এবং তাঁর পরিষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বিদ্রোহ, রাজস্বের কিছু উৎস বাতিল করে এবং নতুন ব্যয় আরোপ করে। যা যুক্ত করেছিল ৪২ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতীয় ঋণের সঙ্গে, যা যোগ করলে দাড়ায় ৯৮ মিলিয়ন পাউন্ড। বস্তুত, ভারত এই সময় দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল মুঘল আমলের পুরনো স্বয়ংক্রিয় গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক গতির কক্ষপথে। পুরনো শাসনের তুলনায় নতুন কিছু জিনিসের প্রয়োজন ছিল এবং ভাইসরয়ের পরিষদে নতুন পদ পূরণ হয়েছিল ১৮৫৯ সালে রাজস্বাধ্যক্ষ জেমস উইলসনের মনোনয়ন দ্বারা। তিনি অর্থকরী প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমস্ত পদ্ধতিটাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির একটি নকশা তৈরী করেন, পাঁচ বছরের জন্য আয়কর আরোপ করেন, এবং অন্তর্ভুক্ত করেন সরকারী আয়ব্যায়ের আগাম হিসেবের অভ্যেস এবং হিসেবের বিবৃতি দান। তাঁর কাজ, সমাপ্ত হয়েছিল তাঁর উত্তরাধীকার স্যামুয়েল লেইঙ এর দ্বারা (Laing) যিনি শতকরা ১০ ভাগ সমরূপ রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। একটি ভাঙানো যায় এমন ধরনের কাগজের নোট, এবং যুক্ত করেছিলেন লবণ কর। উইলসন এবং লাইঙ-এর কাজ চিহ্নিত করছে আধুনিক ভারতীয় মূলধনের সূচনাকে, এবং এভাবেই বার্ষিক ঘাটতি অদৃশ্য হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

মনোযোগের পরবর্তী বিষয় ছিল ভূমি। বস্তুত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছিল একইসঙ্গে ভূমির অনুপার্জিত বৃদ্ধি এবং জমিদারদের কৃষির বৃদ্ধি যা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলার ভাড়া আইনের সঙ্গে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, এই আইন ছিল সম্পূর্ণ সাফল্য থেকে অনেক দূরবর্তী এবং প্ররোচনা দিয়েছিল প্রচুর মামলা মোকদ্দমার, কিন্তু যদি এটা খুব বেশী ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে এটি যেন একটি কৃষকদের মহাসনদ (Magnacarta) অন্ততঃ এটি প্রমাণ করেছিল একটি বিরাট ঘটনা, বড় জমিদার এবং তালুকদারদের মর্জি বা খামখেয়ালী মনোভাবের থেকে কৃষকদের রক্ষার চেষ্টা করা।

সামরিক পুনর্গঠনের প্রথম সমস্যা ছিল Company-র ইউরোপীয় সেনাদলের আদৃষ্ট বা নিয়তি। সঙ্গে Company-র শাসন চলাকালীন তারা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল না ওই কারণের জন্য ভেঙে যাওয়া এবং ক্যানিং আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন স্থানীয় ইউরোপীয় সেনা দলের অবশিষ্টাংশকে ধরে রাখতে। কিন্তু তিনি home government-এর ধারা বেশি পরিচালিত হয়েছিলেন। যা সিদ্ধান্ত করেছিল সম্পূর্ণ মিশ্রনের ওপর, এবং নতুন শর্তে সমস্ত পদের জন্য চাকরি প্রদান করা হয়েছিল। নতুন নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় অংশটি পুর্নগঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহের আগে সেখানে, অর্থাৎ তিনটি প্রদেশে। ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ভারতীয় সেনাদল থেকে ৪৫ হাজার Europeans ছিল। ভারতীয় থেকে ইউরোপীয় অনুপাত এই সময় ধার্য হয়েছিল অর্ধেক অনুপাতে বাংলার সেনাদলে; এবং অন্য

দুটির ক্ষেত্রে ২ : ১ অনুপাতে। যখন ১৮৬৩ সালে পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল, তখন ভারতীয় সেনাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ইউরোপীয়দের ৬৫ হাজার। সতর্কীকরণের চেতনা বা সাবধানতা আবার দেখা গিয়েছিল ভারতীয় গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগে ভেঙে যাওয়ার দ্বারা যা প্রমাণ করেছিল সেই ভয়ানক অবস্থা যা বিদ্রোহীদের হাতে ঘটেছিল। সেখানে কিছু লোক ছিলেন যাঁরা ১৮ শতকে ব্যবহৃত সৈন্যদলের মিশ্র পদ্ধতিতে ফিরে আসার কথা সপক্ষে ওকালতি করেছেন, যদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যদল ভর্তি ছিল সমস্ত শ্রেণীর মানুষ দ্বারা। কিন্তু, না ঐতিহ্যের চেতনা, না ভবিষ্যৎ বক্তা উৎসাহিত হয়েছিল, পরিবর্তে সৈন্যদলের শ্রেণী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্তিম অবস্থার জন্য পড়েছিল বাকি সময়কাল। দুটি ভারতীয় পদাতিক সেনাদলের অংশ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। সঙ্গে একটি ইউরোপীয় পরিপূরক সেনাদল ছিল। যেমন, ভারতীয় সেনাদল পূর্বে পরিচালিত হত ইউরোপীয়দের দ্বারা। একটি পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল শ্রেণী অনুপাতের নিযুক্তিতে। বহু সংখ্যক যুক্ত প্রদেশ থেকে আসা রাজপুত এবং ব্রাহ্মণরা হ্রাস পেয়েছিল অন্যদিকে সেনাদলে গুরখা, শিখ এবং পাঞ্জাবিরা বেড়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের শেষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান হয়েছিল। যেমন British-রা ক্রমাগত দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে আরও বেশি জাতি বিদ্বেশি মনোভাব নিয়েছিল। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতিভেদের নীতি অনুসরন করেছিল। ইংরেজ শাসক এই সময় প্রবৃত্ত হয়েছিল দমন ও সুবিধাদানের মতো নীতির দ্বৈত প্রয়োগে। তারা তৈরী করতে চাইছিল এমন একটা বিশ্বাস যে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল জনকল্যানের ধারনাকে বর্ধিত করা। এই সুবিধাদানের নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে Indian Council Act-এর মতো আইন পাশের মাধ্যমে। যা বর্ধিত করেছিল ভাইসরয়ের Council-কে কিছু সংখ্যক মনোনীতি ভারতীয় সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন সহজ করে তুলেছিল শিক্ষার প্রসার, দন্ড-সংহিতার ভূমিকা, অপরাধের কার্যপ্রণালীর সংহিতা, ইত্যাদি। ওই দশকগুলি যা বিদ্রোহগুলিকে অনুসরন করেছিল এবং জাতীয় সচেতনতার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছিল। জাতীয় প্রতিক্রিয়া তিক্ষ্ণ বর্শার ফলার মতো হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বারা। এই পদক্ষেপ এখন নির্ভর করেছিল ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এবং তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মনে বিপদ সংকেতের কারণ ছিল। এই বিপদ সংকেতই তাদের চালিত করেছিল devide & rule-এর মতো নীতি অনুসরন করতে। উচ্চপদস্থ লোকদের ঘুরিয়ে দেওয়া জনসাধারনের বিরুদ্ধে, প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রদেশ এবং সর্বোপরি হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের। বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান একতা অসুবিধায় ফেলেছিল বিদেশীদের এবং তারা এখন দৃঢ়ভাবে মনস্থ করল এই একতা ভাঙতে হবে সুতরাং এই ভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার জন্য।

১১.১ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জী—দি নিউ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া

২. ভি. এ. স্মিথ (সম্পাদিত—পি. স্পীয়ার)—দি অক্সফোর্ড হিস্টরি অব ইন্ডিয়া

৩. সুমিত সরকার—মর্ডান ইন্ডিয়া

৪. বিপান চন্দ্র—মর্ডান ইন্ডিয়া

১১.২ অনুশীলনী

১. সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শক্তি কিভাবে ভূমি, অর্থসংক্রান্ত, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে পুনর্গঠন করেছিল?

২. তাদের পুনর্বিন্যাসের প্রথম অসুবিধেগুলি কী ছিল?

৩. সিপাহী বিদ্রোহের ব্রিটিশ প্রশাসনে পরিবর্তনগুলি আলোচনা কর।

৪. দেশীয় রাজ্যগুলিকে কিভাবে ব্রিটিশ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতো?

একক ১২ ❑ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার

গঠন

১২.০ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার
১২.১ রাজারামমোহন রায় এবং ব্রাহ্ম সমাজ
১২.২ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন
১২.৩ বিদ্যাসাগর
১২.৪ প্রার্থনা সমাজ
১২.৫ দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্যসমাজ
১২.৬ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ
১২.৭ থিওসফিক্যাল আন্দোলন
১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি
১২.৯ অনুশীলনী

১২.০ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার

উনিশ শতক হচ্ছে অন্যতম উজ্জ্বল সময় ভারতের ইতিহাসে। বস্তুতঃ এটা ছিল সেই কাল যে দেখেছিল আধুনিক ভারতের জন্ম এবং বহু আন্দোলন ও চিন্তার সূচনার সুদূরপ্রসারী ফল বা প্রভাব। এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত প্রবাদবাক্য যে গভীর অন্ধকার অগ্রবর্তী আলোকিত উজ্জ্বলতায় পৌঁছায় এবং ১৯ শতকের ভারত এবং ইতিহাসের এই রক্তিমাভা প্রস্তুত করেছিল একটি উচ্চ ভাবনার উজ্জ্বল উদাহরণ। নৈরাশ্য আর অবসাদের অনুভব দেশকে ছায়ায় আবৃত করেছিল এর মধ্যে দিয়ে ১৮ শতক বাহিত হয়েছিল। এবং উনিশ শতক অগ্রবর্তী হয়েছিল প্রভূত সম্ভাবনার যুগ হিসেবে। দেশ সমৃদ্ধশালী হয়েছিল নতুন প্রাণের বিকাশের দ্বারা। পুনঃর্জন্মের সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রতিফলিত হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান নিতে শুরু করেছিল আগ্রহের সঙ্গে জীবনের নানা পরিধির ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব জমাট বেঁধেছিল ১৮ থেকে ১৯ শতক সময়ের মধ্যে যা ভারতীয় সমাজ রীতি এবং সংগঠনের অস্পষ্টতাকেই প্রতিফলিত করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে, একটি নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, যা পান করেছিল উদারনৈতিকপশ্চিমী সংস্কৃতি, এবং স্বীকার করেছিল নতুন আন্দোলন গড়ার প্রয়োজনীয়তা কারণ অতীত থেকে পাওয়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক সংগঠনের সংস্কারের জন্য। এটি হবে না সত্যের কোনও হাস্যকর অনুকরণ নিশ্চয় করে বলা যে ১৯ শতকের প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিকআন্দোলন যা বাংলা থেকে নির্গত হয়েছিল। এবং মধ্য শ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিজীবী ছিলেন এই জাগরণের পুরোভাগে।

১২.১ রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ

রাজা রামমোহন রায়কে বলা যায় প্রথমে ভারতীয় যিনি চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় সমাজকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে টেনে বের করতে। তিনি সূচনা করেছিলেন নতুন ভাবনার যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছিল আর জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় নবজাগরণের। তিনি ছিলেন অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যের এক সেতু। রাজা রামমোহন

রায় এবং মহাত্মা গান্ধী প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দুটি সমাপ্তির, বলা যায় সূচনা এবং পরিনতির। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম যুগে। প্রথম জন সুবিদিত আধুনিক ভারতের পিতা হিসেবে বা পথিকৃৎ হিসেবে এবং অন্য জন জাতির জনক হিসেবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম বাংলায় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২ মে এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি ছিলেন আরবী, পারসী, সংস্কৃতি এবং বাংলা আর বিদেশী গ্রীক, ল্যাটিন হিব্রু ভাষায় সুপন্ডিত এক ব্যক্তি। তাঁর সাহিত্যিক কর্মের মধ্যে Tufat-ul, Muwqh-hidin, ইংরেজী বেদান্তসূত্রের অনুবাদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যিশু—সুখ শান্তির পথনির্দেশক ইত্যাদি। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা হলো ১৮১১ সালে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সতী হওয়া। এই ঘটনা রামমোহনের মনে গভীর অব্যক্ত অনুশোচনা এবং করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, যা তাঁকে সংকল্পবদ্ধ করেছিল এই অমানবিক প্রথা মুছে ফেলতে।

তাঁর সমাজ ভাবনা ঃ রামমোহন রায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমস্ত রকম অযৌক্তিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম থেকে এবং অশুভ রীতিনীতি থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করা। ভারতীয় নারী মুক্তির তিনি ছিলেন প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, "Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritence". "আধুনিক অনধিকার প্রবেশ, নারীর প্রাচীন অধিকারের ওপর হিন্দু আইনের উত্তরাধিকার অনুসারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, নারীর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম বিভেদ ও অশুভ রাতিনীতির। তিনি বিরোধিতা করেন বহুবিবাহের, কুলীন প্রথার, এবং সতীদাহের এবং কন্যার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সমীপে যে ভারতীয় নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার এবং সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকল্পে আইন প্রনয়ন করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। যেমন তাঁর দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ১৭তম রেগুলেশন পাস করেছিলেন, যা ঘোষণা করেছিল সতীদাহ বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ। এই আইন বা রেগুলেশন শুরু করেছিল সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি সামাজিক আইন প্রয়নের সাহায্যে। রামমোহন রায় ছিলেন শিশু বিবাহ এবং বর্ণ ব্যবস্থার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক নিরলস ও নির্দয় ধর্মযোদ্ধা যেখানে তিনি ব্যাখ্যাতি হয়েছিলেন একজন অগনতান্ত্রিক ও অমানবিক হিসেবে। তিনি বিধবাদের পুনঃর্বিবাহের স্বাধীনতা এবং মানুষ ও মানুষীর সম অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ ঃ ধর্মের প্রগতিশীল ভাবনার পক্ষে রামমোহন দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত একেশ্বর বাদ এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী ইসলাম, সুফীবাদ, খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক শিক্ষার দ্বারা এবং পশ্চিমের উদার আর প্রগতিশীল তত্ত্বসমূহের দ্বারা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের একেশ্বরবাদী তত্ত্ব প্রচারের মধ্যে দিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন আত্মীয় সভা (১৮১৫-১৯)। ১৮২৮ সালে তিনি স্থাপন করেন ব্রাহ্মসভা, পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজ বিশ্বাস করতো যা কিছু অস্তিত্বময় তার পিছনের কারণ ও উৎস ঈশ্বর। সুতরাং ঐ প্রকৃতি, পৃথিবী এবং স্বর্গ সমস্তই তাঁর সৃষ্টি।

নতুন বিশ্বাসের প্রসার ছাড়াও, তিনি সরকারকে মনোনিবেশ করতে বলেন, আধুনিক পশ্চিমী শিক্ষার ওপর। তিনি নীরবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' নামের একটি বাংলা সাপ্তাহিক চালু করেন যেটা ছিল প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র যার সম্পাদক, প্রকাশক এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন ভারতীয়রা। একবছর পরে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করলেন আর একটি পার্সী ভাষায় সাপ্তাহিক নাম 'মিরাত-উল-আখবর'।

১৮৩০ সালে রামমোহন ইংলন্ডে গমন করেন মুঘল সম্রাটের উপরাষ্ট্রদূত হিসেবে। ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজসভায় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ্ তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইংলন্ডে নানা বিদ্বজন

সমাজে তিনি দারুণভাবে গৃহীত হন, সেখানে রাজা তিন বছর অবস্থান করেন, আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।

বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মৃত্যুমুখী অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিকোণের দ্বারা ১৮৪৭ এবং ১৮৫০ এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে। এটি স্মরণে রাখা দরকার যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বে দেবেন্দ্রনথ জোড়াসাঁকোয় গঠন করেছিলেন তত্ত্বভারঞ্জিনী সভা পরে যা পরিচিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা হিসেবে। যেমন এর কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে, তত্ত্ববোধিনীসভা ক্রমে হয়ে উঠেছিল এর প্রধান সাংগঠনিক শাখা। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে অক্ষয়কুমার দত্তের মতোন বড় লেখক ও পন্ডিত—শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এর সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং অন্যান্য গুণীজন। জীবনের নানাক্ষেত্রে বিচরনকারী নানা মতের প্রথিতযশা মানুষেরা। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশ করেছিল একটি মাসিক পত্র যার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যা প্রসার ঘটিয়েছিল এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের। পরবর্তী সময়ে শীঘ্রই সমাজের তরুন সদস্যরা চেষ্টা শুরু করলো, শুধুমাত্র ব্রাহ্মবাদের মূলকেই প্রসারন নয় নতুন সমাজ চিন্তার সপক্ষে বরং একই সঙ্গে পক্ষপাতহীন কারণের প্রয়োগ, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলগত প্রবন্ধ বা লেখালিখির ওপর জোর দেওয়া। সন্তানারী শিক্ষার সপক্ষে প্রচার, বিধবা পুনঃর্বিবাহের সপক্ষে বলা, বহুগামীতা বা বহুবিবাহ এবং অসংযমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করেছিল। এছাড়াও চেষ্টা করেছিল সমাজের কাজ কর্মকে পরিচালনা করা, কঠিন সাংগঠনিক নিয়ম নীতির দ্বারা। কেশবচন্দ্র সেনের ভিতরে তারা সন্ধান পেয়েছিল সেই যোগ্য নেতার। ১৮৫৭ সালে তিনি যোগ দেন সমাজে এবং ১৮৬১ সালে তিনি সর্ব সময়ের এক প্রচারকে পরিণত হন। উন্নত চিন্তাধারা অগ্রসর হয়েছিল তরুণ ব্রাহ্মদের দ্বারা, যার নেতৃত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র, যা গ্রহণযোগ্য ছিল না প্রাচীনপন্থীদের, যার নেতৃত্বে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, যিনি অস্বীকার করেছিলেন রামমোহন নির্দেশিত প্রাচীন হিন্দুপথ থেকে সরে আসতে। এর ফলস্বরূপ সমাজ ভেঙে গেল। পুরনো সংগঠন এখন থেকে পরিচিত হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে। যার নেতৃত্বে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র গঠন করলেন নতুন সংগঠন, যার নাম হলো 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। ঘোষিত হল 'ব্রাহ্মবাদ' ক্যাথলিক এবং সার্বিক। কেশব জোর দিয়েছিলেন পুতুল পূজা ও বর্ণব্যাবস্থা পরিহারের উপর।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থাপন করেছিলেন 'ভারতীয় সংস্কার সভা'। এর পাঁচটি বিভাগ ছিল। নারীগণের উন্নতি, শ্রমিকদের শিক্ষা, সস্তায় সাহিত্যের প্রকাশনা, সংযমের পক্ষে প্রচার, দানশীলতা সংগঠন শুরু হয়েছিল নারীশিক্ষার এবং বই ও জার্নাল প্রকাশের জন্য। তাঁর অনুরোধ ১৮৭২ সালে ইংরেজ সরকার বা ভারত সরকার 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' বা 'পৌর বিবাহ আইন' পাস করেন। যাইহোক প্রধানত, তাঁরা মনস্থ করেছিল যুক্তিসিদ্ধ বা বৈধতা দেবে ব্রাহ্ম মতে বিবাহকে, যা হিন্দু আইনের চোখে কোনভাবেই যুক্তিসিদ্ধ ছিল না, এটা বাধা আরোপ করে তাদের ওপর যারা এর থেকে সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এটি একবিবাহ বাধ্যতামূলক করেছিল এবং নির্দেশ দিয়েছিল বর ও কনের বিবাহের সর্ব ন্যূন বয়স হবে যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪। এ.সি. ব্যানার্জ্জীকে অনুসরণ করে বলা যায়, এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সমাজ সংস্কারের। ১৮৭২ সালে তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার বিবাহ দিয়ে কেশবচন্দ্র একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাজে সংকট উপস্থিত করলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, অন্যান্য অনেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং স্থাপন করলেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে, উনিশ শতকের শেষের দিকে এটি পরিণত হয় একটি অবসন্ন ও পীড়িত প্রতিষ্ঠানে।

১২.২ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন তার উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঋণী ছিল ১৯ শতকের অন্যতম অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র কাছে। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২৬ সালে, ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে হিন্দু কলেজে যোগদান করেছিলেন। তাঁর শিক্ষার মূল কেন্দ্র কিছু কর্তৃত্বকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর ইংরেজীতে লেখা বিখ্যাত কবিতা—যা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম নামক দেশাত্মবোধক গানের পূর্বে লিখিত— তিনি দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনে পদানত ভারতের অবনতি প্রাচীন ভারতের গৌরবের তুলনায়। ডিরোজিও'র প্রভাব তাঁর ছাত্রদের ওপর ছিল অসাধারন। ১৮৩১ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুর পর, তাঁর ছাত্ররা সভা সমিতি এবং জার্নাল প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তার বিস্তার অব্যাহত রেখেছিলেন। দলের অন্যতম নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্যরা ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

বস্তুত, সোক্রাতেসের মতোই, ডিরোজিও'র অন্বেষণ ছিল সত্য এবং তা অভিযুক্ত হয়েছিল যে তিনি তরুণ প্রজন্মকে বিপথে চালিত করছেন। কিন্তু ডিরোজিও'র প্রভাব ছাত্র সমাজের ওপর অব্যাহত থাকে এবং এটি পরিচিত হয় ইয়ং বেঙ্গল অন্দোলন নামে। তৎকালীন সমস্ত নেতৃত্বস্থানীয় অন্দোলনগুলি এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

১২.৩ বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালে এবং পরবর্তী প্রজন্মে বিদ্যার সাগর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারক। ১৮২০ সালে অত্যন্ত দরিদ্র এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে তিনি প্রচুর কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং ১৮৫১ সালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের মতো উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর মানবতাবাদ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল দরিদ্র, অত্যাচারিত, ভাগ্যতাড়িত এবং সামাজিক কুপ্রথার শিকার, মানুষজনের প্রতি। তিনি আজও স্মরণীয় 'দয়ার সাগর' রূপে।

বিদ্যাসাগর সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কাজে অবদান রেখে গেছেন। তাঁর দ্বারা যে সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছিল সেটির মূল বিষয় ছিল উৎপীড়িত স্ত্রীজাতির প্রতি সমবেদনা। বিধবা পুনঃর্বিবাহের জন্য তাঁর দীর্ঘ লড়াই শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালে আইন প্রণয়ন করেছিল হিন্দু বিধবার পুনঃর্বিবাহ আইন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন, ধর্মগ্রন্থ সমূহে বিধবার পুনরায় বিবাহে অনুমতি আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন। বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাঁর এই সংস্কার প্রত্যাখান করে এবং এই আইন পাস হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে মাত্র ২৫ জন বিধবার পুনরায় বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর সামাজিক নির্বাসন ভোগ করেছিলেন এমন কি তাঁর প্রাণ সংশয় ঘটেছিল। তিনি বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও প্রচার চালিয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন, এটি উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে। এছাড়াও ১৮৫১ সালে সহবাস সম্মতি পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার অনেক বেশী বাস্তব সাফল্য লাভ করেছিল। তিনি অ-ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী পড়াশুনা চালু করেছিলেন। তিনি কাজ

করেছিলেন দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং সহজ বাংলায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন যা ধরে রেখেছিল এক শতাব্দীর উপরেও এর মূল্য। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে তিনি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়গুলির সরকারী পরিদর্শক হিসাবে তিনি গঠন করেছিলেন, ৩৫টি মহিলা বা বালিকা বিদ্যালয় এর মধ্যে কয়েকটি তিনি নিজের খরচায় রক্ষনাবেক্ষণ করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন গর্ভনর জেনারেলের পরিষদের আইন সদস্য কলকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সহযোগী। তিনি কলকাতায় একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন যা এখন তাঁর নামে পরিচিত।

১২.৪ প্রার্থনা সমাজ

কেশবচন্দ্র সেনের মহারাষ্ট্র গমনের ফলস্বরূপ, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, এছাড়া দুজন উল্লেখযোগ্য নেতৃদ্বয় হলেন, ডাঃ আত্মারাম পান্ডুরৎ এবং বি. জি. ভান্ডারকর। প্রার্থনা সমাজের দুটি প্রধান স্তম্ভ বা কাঁটা ছিল ধর্ম-কর্ম এবং সমাজ সংস্কার। রানাডে তীক্ষ্ণভাবে দেখিয়েছিলেন, বেশীরভাগ প্রচলিত অশুভ রীতিনীতি বিপরীত দিকে চলেছিল, যে অভ্যাস দেখা গিয়েছিল এবং উদ্বৃত হয়েছিল প্রাচীনযুগে, যেমন উদাহরণস্বরূপ, নারীদের নির্ভরশীল অবস্থা, শিশু বিবাহ, বিধবার পুনঃর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা, ক্ষুদ্র উপ-বর্ণ বা নিম্নবর্ণ নগ্ন করেছিল অন্তঃবিবাহ বা সমজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা। নারীজাতির অজ্ঞানতা ও তাদের পৃথক করে রাখা। বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, নানা রকমের সংযম মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। নানা বর্ণের একসঙ্গে বসে খাওয়া বা ভোজনে নিষেধাজ্ঞা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি। তিনি এছাড়াও শুরু করেছিলেন শুদ্ধি আন্দোলন সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন চিৎকার চেঁচামেচি বিরোধী এবং সংযমী আর মাদকদ্রব্য পরিহার আন্দোলন। অন্য বিশ্বাসী বা অন্য ধর্মের মানুষদের সমাজের ধর্মে প্রবেশের স্বীকৃতি এবং প্রচলিত হিন্দু বিবাহে যে প্রচুর অর্থের অপচয় হয়, তার হ্রাস, তিনি করেছিলন। তাঁর আন্দোলন খুব শীঘ্র ধারণ করেছিল সর্বভারতীয় চরিত্র।

রানাডের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সমগ্র শতক ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বাহিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন সমর্থক সংস্কারক ছিলেন ধোন্দো কেশব কারভে এবং বিষ্ণু শাস্ত্রী। রানাডে এবং কার্ভে বিধবা পুনঃর্বিবাহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সূচনা করেন বিধবাদের 'গৃহ সভা' বা 'Home Association' যা বিধবাদের শিক্ষা যুগিয়েছিল। বিধবাদের 'হোম এ্যাসোসিয়েশ'নের লক্ষ্য ছিল তাদের শিক্ষিকা হিসেবে ধাত্রী হিসেবে এবং সেবিকা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। ভারতবর্ষের কোনও অংশই এতোখানি সাফল্যের সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের কাজ চালাতে পারেনি। প্রার্থনা সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন মহারাষ্ট্রে যা সৃষ্টি করেছিল অত্যন্ত গভীর প্রভাব।

১২.৫ দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্য সমাজ

মূলা শঙ্কর পরবর্তীকালে দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত, ১৮২৪ সালে গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়-এর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন, এই অভিপ্রায়ে যে, বিবাহের মতো একটি ব্যাপারে যাতে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে না হয় এবং তাঁর আত্মার উত্তেজনা ও আন্দোলন যাতে শান্ত হয়।

গভীরভাবে বেদসমূহ এবং ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের পর, দয়ানন্দ সরস্বতী এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ''আর্যরা

ছিলেন মনোনীত মানুষ, বেদসমূহ ছিল মনোনীত বাণী, এবং ভারতবর্ষ মনোনীত ভূমি।'' এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে স্থাপন করেছিলেন আর্য সমাজ। আমাদের অবহিত হওয়া দরকার যে, 'বেদে ফিরে চলো' নামক শ্লোগান বা বাণী ছাড়াও, আর্য সমাজ একই সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিল সমাজ সংস্কারের। যাইহোক এটি দাঁড়িয়েছিল চতুবর্ন ব্যবস্থার জন্যে যা নির্ধারিত হয়েছিল যোগ্যতার ভিত্তিতে জন্মের দ্বারা নয়। আর্য সমাজ দাঁড়িয়েছিল নারী ও পুরুষের সমাজ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ক্ষেত্রে সমঅধিকারের ওপর। আর্য সমাজ বিরোধীতা করেছিল অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ব্যাবস্থা, শিশু বিবাহ, এবং সমর্থন করেছিল আন্তঃর্বিবাহ এবং বিধবার পুনরায় বিবাহকে, দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজকে প্রস্তুত করেছিলেন বা যুগিয়েছিলেন সমাজ পরিচালনার এবং নৈতিক মূল্যবোধ।

১২.৬ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি বাস ও আরাধনা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে, তিনি ছিলেন এক মরমীয়া। তিনি দেখেছিলেন সমস্ত রকমের ধর্মই এক সর্বশক্তিমানের আরাধনা, সবরকম ধর্মীয় খোঁজ আসলে "একই ঈশ্বরের সন্ধান যাঁর কাছে সকলের গন্তব্য, যদিও নানা পথে সে সন্ধান।'' তিনি শিক্ষা দেন, 'দয়া নয়, কিন্তু মানুষের জন্য সেবা অবশ্যই সম্মানিত হবে ঈশ্বরের মতো।'

রামকৃষ্ণের মানবতাবাদ খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তকে, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, তখন বিবেকানন্দের বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সমগ্র, জীবন উৎসর্গ করবেন। তাঁর গুরুর বাণী প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি আমেরিকা পাড়ি দিলেন এবং শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় যোগদান করলেন। 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর প্রতিবেদনে আমরা দেখলাম—"তাঁর বক্তব্য শোনার পর আমরা অনুভব করলাম কতখানি নির্বুদ্ধিতা হবে এইরকম শিক্ষিত জাতির কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠানো।''

বিবেকানন্দের কোন বিশ্বাস ছিল না সমাজ সংস্কার কার্যে যা সরবরাহ হয়েছিল আমুদে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে অভিজাত শ্রেণীর কাছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন ঐ শিক্ষা, সমস্ত কিছুর সঙ্গে ফলস্বরূপ এসেছিল, যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে মুক্ত করবে সমাজকে তার অসুস্থতা থেকে। সেই প্রসঙ্গে বা তার দ্বারা অত্যাবশ্যকতার সঙ্গে আচার-নিধি আন্দোলনের সমাধা হবে। তাঁর পুস্তিকায় বলা হয়েছিল, 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী'। বিবেকান্দ আবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেণীর কাছে, তাঁরা তাদের সামাজিক অবস্থান ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা সরিয়ে রেখে মিলতে চেষ্টা করুন, সাধারন নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে। তাঁর মতে কৃষকের লাঙ্গলে, মাংস বিক্রেতার চুল্লী থেকে, কুটীর থেকে, অরণ্য থেকে, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে থেকে নতুন ভারত উঠে এসেছিল। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, দরিদ্র এবং পদদলিতদের উন্নতিকল্পে কাজ করায়।

এক শতাব্দী পূর্বেই তিনি অনুমান করেছিলেন রীতিবিযুক্ত শিক্ষার আধুনিক ধারণা এবং স্বাক্ষরতার অভিযানের। যা কিছু সম্পদ সমাজ ব্যয় করতে সমর্থ, তা যেন অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য নয়। তিনি বলেছেন, ''তোমরা সমস্ত সংস্কার আন্দোলনগুলি যেমন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, এবং বিধবার পুনঃর্বিবাহ সাফল্যযুক্ত হবে না, যতদিন তারা সীমাবদ্ধ থাকবে উচ্চকোটির শতকরা ১ ভাগ জনসংখ্যার মধ্যে।'' নারী মুক্তির জন্য আবেদনে বিবেকানন্দ কখনই ক্লান্ত হন নি। তাঁর সংস্কারের আদর্শ দাঁড়িয়েছিল নারীজাতির অবস্থার উন্নতি, শিক্ষা ব্যাবস্থার খোল নলচে বদলানো এবং বর্ণভেদ ব্যবস্থার বিলুপ্তির উপর। তাঁর স্বপ্নকে

সত্য করতে, তিনি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় যুব সমাজের পথপ্রদর্শক, তিনি যুব সমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ওঠো, জাগো এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্দেশ্যে এই কটি কথা বলে আহ্বান করেছিলেন—দীর্ঘকাল যাবৎ কোটি কোটি মানুষ বাস করছে ক্ষুধা ও অজ্ঞানতার মাঝে, আমি অভিমত পোষণ করছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে এক দেশদ্রোহী, যারা শিক্ষিত হয়েছে তাদের অর্থে বা ব্যয়ে, সামান্য তম ঋণ পরিশোধ করেনি তাদের কাছে।''

১২.৭ থিওসফিক্যাল আন্দোলন

থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে মাদাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল অলকট দ্বারা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা ভারতে পদার্পণ করেন এবং স্থাপন করেন সোসাইটির প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজের কাছে (Adyar) আডইয়ার নামক স্থানে। ১৮৮৮ সালে ইংলন্ডে মিসেস অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটিতে যোগ দেন। তাঁর সদস্যপদ গ্রহণ প্রমাণ করেছিল, বিরাট মূল্যের সম্পদ সমাজের কাছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থিওসফিক্যাল সোসাইটি। প্রশংসনীয় কাজ করেছিল। এই ব্যাপারে কার্য হ'ল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বারানসীতে কেন্দ্রিয় হিন্দু মহাবিদ্যালয় চালু করা। সোসাইটি পিছিয়ে থাকা শ্রেণী; নারী এবং বালকদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেছিল এবং এছাড়াও উৎসাহিত করেছিল ব্রতী বালক আন্দোলনে যোগদান করায়। সোসাইটি বিরোধীতা করেছিল শিশু বিবাহের, বলেছিল বন্ধ্যাবস্থার অবলুপ্তির কথা, জাতিচ্যুত মানুষের উন্নতিসধান, এবং বিধবাদের অবস্থার উন্নতিসাধন, করার কথা। থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রমাণ করেছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—ভারতীয়দের জাগরণ ও আত্মসম্মানের বিষয়টি প্রখ্যাত ইওরোপীয় থিওসফিস্ট যেমন অ্যানীবেসান্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, ভারতের সংস্কৃতিক মহত্বের কথা, এবং ভারতের জাতিয়তাবাদ বিকশিত হওয়ার সাহায্য করেছিলেন।

উপসংহারে এসে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজ সংস্কার বস্তুত একটিই প্রগতিশীল মেজাজের দুটি দিক বা আকৃতি, যার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান। প্রথমে প্রায় সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারকগনেরই সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অবদান ছিল। ধীরে ধীরে ঐ আন্দোলন চরিত্রের দিক থেকে হয়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষ, এবং গান্ধীজী স্বাধীনতার জন্য একে গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রামের অবিভাজ্য অংশরূপে।

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জী—দি নিউ হিস্টরি অব মর্ডান ইন্ডিয়া

২. এন. এস. বোস—দি ইন্ডিয়ান অ্যাওকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল

৩. বিপান চন্দ্র—মর্ডান ইন্ডিয়া

৪. অমিতাভ মুখার্জী (সম্পাদিত)—সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল

৫. কে. কে দত্ত—ডন অব রিনাসেন্ট ইন্ডিয়া

৬. দিলীপ বিশ্বাস—রামমোহন স্মরণ/রামমোহন সমীক্ষা

১২.৯ অনুশীলনী

১. রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনগুলি আলোচনা কর।

২. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং আর্য সমাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. বিদ্যাসাগরের অবদানগুলির কথা আলোচনা কর।

৪. থিওসফিক্যাল আন্দোলন এবং প্রার্থনা সমাজ সম্পর্কে লেখ।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে ভারতীয় যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন?

একক ১৩ ❑ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট

গঠন

১৩.০ প্রস্তাবনা
১৩.১ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট
১৩.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৩.৩ অনুশীলনী

১৩.০ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যক্ষ করেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ। পার্সিভ্যাল স্পীয়ার এই পর্যায়টিকে সাম্রাজ্যবাদের চরম উন্নতির পর্যায় (The Imperial Heyday) রূপে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জুড়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। ভারত ছিল এর সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, যার দ্বারা ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পূর্ণ তাই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায় যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বস্তুতঃ, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও তার ফলাফলই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিপানচন্দ্রের 'Modern India' নামক পুস্তকের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলেছেন যে দুই পক্ষের স্বার্থের সংঘাতই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ। ব্রিটিশদের ভারত শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যার দ্বারা অনেক সময়ই ভারতের মঙ্গল বিসর্জিত হয়েছিল।

১৩.১ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে, শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একধরনের আধুনিক যুক্তিগ্রাহী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। তারা রুশো (Rousseau), টমাস পেইন (Thomas Pain), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে সমসাময়িক ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে রাজভাষা, ইংরেজী, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করে যার ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা এবং ধারণার অংশীদার হয়। এইভাবেই ইংরেজী শিক্ষা ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

গুণগতভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এক অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাহায্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত করা

হয় ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গিকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল আমদানী ও তার অন্তঃপ্রবাহ ভারতীয় হস্তশিল্পের পরিসরে দুর্ভাগ্যের সংকেত বয়ে আনে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রোৎপাদিত বিপুল পরিমাণের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ভারতীয় হস্তশিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এক্ষেত্রে ভারতের তাঁত বয়ন শিল্প, উলজাতি বস্ত্র শিল্প, রেশম বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উনবিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করে ঐতিহাসিক ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির পতন এবং বাণিজ্যিক পথে একসঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবাহের আগমন যার ফলস্বরূপ ভারতের গ্রামীণ জীবন যাত্রার অবনমন ঘটে। কৃষক ও কারিগরের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সামগ্রিকভাবে ভারতের বুকে দারিদ্রের করাল ছায়া নেমে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয় এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা শোষণমূলক চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কিত যে হিতবাদী ধারণা তারা পূর্বে পোষণ করত তার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য যে ভারতীয় অর্থনীতিকে অবদমন করে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, তাও পরিস্ফূট হয়। দাদাভাই নওরোজী (Proverty and Un-British Rule in India). রমেশচন্দ্র দত্ত (Economic History of India) এবং রানাডে (Indian Economy) ঔপনিবেশিকতার শোষণমূলক চরিত্রটিকে প্রকাশ করে ভারতে শক্তিশালী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেন। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিপানচন্দ্র তাঁর "Rise and Growth of Economic Nationalism in India" নামক গ্রন্থে। দাদাভাই নওরোজী ভারতের দারিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ভারত প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। সুতরাং একদিকে ছিল উন্নয়নের আরোহন আর একদিকে ছিল উন্নয়নের অবনমন।

সাদা চামড়ার মানুষদের স্বাজাত্য গরিমা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। শাসকশ্রেণীর জাতিগত গরিমা ভারতীয়দেরকে শ্রেণী, বর্ণ, পেশা এবং ধর্মের নিরিখে নিকৃষ্টতররূপে চিহ্নিত করে। ভারতীয়রা প্রায়ই ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত ও আক্রান্ত হত। ব্রিটিশরা এদেশে যে আইনী শাসনব্যবস্থা জারি করেছিলেন তাও ছিল দাম্ভিকতাপূর্ণ, যেখানে সাম্যের আদর্শ ছিল উপেক্ষিত। আইনের দোহাই দিয়ে যেকোন প্রকার শাস্তি থেকে ইংরেজরা রেহাই পেয়ে যেত। যেকোন প্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার হাত থেকেও ইংরেজরা নিষ্কৃতি পেত। ব্রিটিশরা এদেশে শাসক ও শাসিতের জন্য দুধরনের বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। বস্তুত ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে এই জাতিগত বৈষম্য যেমন চাকুরীর সুযোগসুবিধা, রেলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, তেমনই প্রতিফলিত হয় ইওরোপীয় ক্লাবগুলিতে এমনকি ক্রিকেট খেলার মধ্যেও। এই জাতিগত বৈষম্যই ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটি উদীয়মান জাতির প্রতি ঔপনিবেশিক অবমাননা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পশ্চিমের সঙ্গে প্রাথমিক সংযোগের ফলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইওরোপীয় দার্শনিকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং তারা আধুনিক, গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে। উল্লেখ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ইওরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক চরিত্র তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যে, ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন এ সত্য তখন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উপলব্ধি করতে পারেনি। এমনকি রামমোহনের মত ব্যক্তিও ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা বিপথগামী হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের আশায় যারা ব্রিটিশ শাসনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন তারা ক্রমশ হতাশায় নিমজ্জিত হন। পরিবর্তে উপলব্ধি করেন ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের চেহারাকে। সর্বোপরি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা আরও হতাশ হন যখন তারা ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত

হতে থাকে। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে যখন ১৮৭৮ খ্রীঃ একটি নতুন আইন পাশের মাধ্যমে ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯এ ধার্য করা হয়। সুতরাং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত হয়ে যায়। ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিই একমাত্র তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বর্ধিত করতে পারে। সংক্ষেপে ভারতের তিনটি প্রধান শ্রেণী—মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী—ক্রমশ উপলব্ধি করে যে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের একমাত্র পন্থা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি।

ব্রিটিশ অত্যাচারমূলক শাসনের দরুণ পরোক্ষভাবে এদেশে যে উন্নতিগুলি পরিলক্ষিত হয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে রেলপথের প্রচলন, ডাকব্যবস্থার উন্নতি, টেলিগ্রাফের আনয়ন এই বৃহৎ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করে। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার এদেশে যে আধুনিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তার ফলে সারা ভারতে এক ঐক্যত্ব স্থাপিত হয়। স্থানীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির ধ্বংসের ওপর যে আধুনিক বাণিজ্যিক অর্থনীতি প্রতিস্থাপিত হয় তার ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে একধরনের সামগ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র ভারতবাসী একটি একক অর্থনীতির আওতাভুক্ত হয়। একটি জাতীয় বাজার নির্মাণ করা হয় এবং বিভিন্ন বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেশ ব্যাপী ঐকত্বের চেতনা জাগ্রত হয়। সকল ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে তারা সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত।

ভারতীয় ও ইওরোপীয় পন্ডিতরা ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং মহান শাসক অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও আকবরের রাজনৈতিক কৃতিত্বের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান পায়। এই ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণাতেই ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়। উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার, রানাডে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভান্ডারকারের মত ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারে অগ্রবর্তী হন। ফলে এই সকল কিছুর আবহে ভারতীয়রা আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৮৭৬-১৮৮০ সালে লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতার আরও প্রকটিত হয়। **প্রথমতঃ**, ইংল্যান্ডের বহু উৎপাদনকারীদের সন্তুষ্টি বিধানে লর্ড লিটন ভারতে আমদানীকৃত ব্রিটিশ বস্ত্রের ওপর সকল প্রকার শুল্ক তুলে দেয়। **দ্বিতীয়তঃ,** ভারতীয় কোষাগারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উচ্চ ব্যয় নির্বাহের উপাঙ্গে পরিণত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা বলা যায়, সে ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যয় ভারতীয়দেরকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। **তৃতীয়তঃ,** Vernacular Press Act বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন (১৮৭৪) পাশের মাধ্যেমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। **চতুর্থতঃ,** ১৮৭৮ এর অস্ত্র আইন (The Arm Act of 1878) এর মাধ্যমে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্য এদেশীয় মানুষদের অসন্তোষ ইন্ধন যোগায়। **পঞ্চমতঃ,** ১৮৭৮ খ্রীঃ একটি নতুন আইন পাশের মাধমে ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়স সীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ এ আনা হয়। সুতরাং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত হয়ে যায়। **ষষ্ঠতঃ,** ১৮৭৭ সালে যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে তখন দিল্লীতে সাম্রাজ্যবাদী দরবারের অনুষ্ঠান ভারতীয়দের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "A Nation in Making" এ লেখেন—বড়লাট লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ঔদাসীন্যে আঘাত হানে এবং জগজীবনকে উদ্দীপিত করে। যে উদ্দীপনা ব্যতীত সকল আন্দোলন সম্ভবত ব্যর্থ হত ("The reactionary administration of Lord Lytton had aroused the public from its attitude of indifference and had given stimulus to public life... They help to stir a community into life, a result that

years of agitation would perhaps have failed to achieve."

বারুদের স্তূপে আগুন সংযোগ করে ১৮৮৩ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড রিপনের আমলে ইলবার্ট বিল বিতর্ক। ইলবার্ট বিল সারা দেশ ব্যাপী আন্দোলনকে প্রসারিত করে এবং ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করে তোলে।

১৩.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. E. Embree—Charles Grant & the British Rule in India.

২. Eric Stokes—The English Utilitarians & India.

৩. Bipan Chandra—India's Struggle for Independence.

৪. Summit Sarkar—Modern India.

৫. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern India Elite

১৩.৩ অনুশীলনী

১. ভারতের জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

একক ১৪ ❑ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা

গঠন

১৪.০ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা
১৪.১ প্রকাশনা ও জনমত
১৪.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৪.৩ অনুশীলনী

১৪.০ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা

ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তারা রুশো, পেইন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখার দ্বারা পরিচিত হয় এবং ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশলাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। সাহিত্য ছিল জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয় (১৮৩৮-১৮৯৪)। তাঁকে বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বের এক মহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় ("The greatest figure of the second phase of the Bengal Renaissance) বাংলা ভাষায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তার অবদন অনস্বীকার্য। একাধারে বিভিন্ন প্রকার গুণের একত্র উপস্থিতি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণাবলীর মিলনের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, প্রখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক কোঁৎ (Comte) এর প্রত্যক্ষবাদ এবং গীতার আধ্যাত্মবাদের মিলনে প্রবৃত্ত হন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ছিলেন মহান। তাঁর উপন্যাসগুলি ছিল সামাজিক সচেতনতা, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেশপ্রেম। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ। একজন প্রখ্যাত লেখক তাঁকে বিশেষিত করেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত পিতা (Real father of Indian Nationalism) হিসেবে। ১৮৮২ খ্রীঃ রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত বন্দেমাতরম আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এই সঙ্গীতটি ভারতীয়দের, মাতৃভূমি মুক্তির বাসনায় জীবন বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকারী রূপে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী 'Europe Reconsidered' নামক বর্তমান গবেষণায় এই উক্তি তার যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। 'বঙ্গদর্শন' ছিল বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা সুবিদিত লেখকদের মিলনস্থলে পরিণত হয়। এটি ছিল ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় সাময়িক পত্রিকা। বাংলা তার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। পুরাতন ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটি নতুন বাংলা গড়ে তোলার তাগিদেই তিনি প্রবন্ধ ও উপন্যাস

রচনা করেন। একজন ব্যক্তি যিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী এবং সংস্কারক, তাঁর ক্ষেত্রে নতুন বাংলার গঠন ছিল অবশ্যই পৃথক উদ্দেশ্য। স্যার অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—পূর্বে বঙ্কিম ছিলেন একজন শিল্পী এবং পরবর্তীকালে তিনি হন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও জাতি সংগঠক ("The earlier Bankim was an artist and the later Bankim was a seer and a nation builder.")

জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যগুলি স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়। এই সময় দেশপ্রেমমূলক গানগুলির রচয়িতারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস এবং অন্যান্যরা। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে 'রাখীবন্ধন' উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। যা পথ পরিক্রমারত অবস্থায় দেশের জনসাধারণ গাইতে থাকে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক, যিনি অজস্র কবিতা এবং ছোট গল্পের মাধ্যমে বাংলার গ্রাম্য সমাজের সৌন্দর্য বর্ণনা করে দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করার অবদান রাখেন। তাঁর শৈল্পিক গুণের বহুমুখী পথই তাঁকে সামাজিক প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখার্জীর মত সক্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। তিনি 'National Council of Education' এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৮), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৭৪-১৯০৯) অক্ষয়কুমার বড়াল এবং অন্যান্যদের অবদান অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর বিখ্যাত গান লেখেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। তিনি একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু বিভিন্ন দেশপ্রেমমূলক গান ও নাটক রচনা করে পরোক্ষভাবে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু এবং রমেশচন্দ্র দত্তর লেখাও জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উল্লেখের অবকাশ রাখে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসে মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা ও রাজপুত আন্দোলনের যে চিত্র তুলে ধরেন তা জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাব প্রবণতাকে শক্তিশালী করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে যা প্রত্যেককে নাড়া দেয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙালীর আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করার জন্যে লেখেন 'সিরাজ-উদ-দৌল্লা', 'মিরকাশিম', এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'-র মত নাটক।

বাংলা ভাষার মত অন্যান্য দেশীয় ভাষা যেমন হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া, তামিল প্রভৃতি পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করার বিষয় হিন্দী এবং আসামী ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে মিশনারীরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। আধুনিক হিন্দী ভাষার জনকরূপে পরিচিতি ছিলেন ভরতেন্দু হরিশচন্দ্র। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া দ্বারা অসমিয়া ভাষা নবরূপ পায়। একইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িয়া, মারাঠী, তামিল এবং গুজরাটি ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। বেশীরভাগ দেশীয় ভাষাই পশ্চিমী সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারী এবং প্রাচ্যবিদ্‌দের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িয়া লেখকদের মধ্যে ফকির মোহন সেনাপতি, রাধানাথ রায় এবং মধুসূদন রায় এর নাম উল্লেখের দাবী রাখে। মারাঠী ভাষায় বিখ্যাত ছিলেন বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলঙ্কার, তামিলে বিখ্যাত ছিলেন সুব্রাহ্মণ্য ভারতী, উর্দুতে বিখ্যাত ছিলেন আলতাফ হুসেন হালি।

ভারতীয় এবং ইওরোপীয় পন্ডিতরা ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন এবং ভারতের ইতিহাসের মহান শাসক অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও আকবরের রাজনৈতিক কৃতিত্বের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান পায়। এই ঐতিহ্যের অনুপ্রেণাতেই ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়। উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্স মুলার, রানাডে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভান্ডারকারের মত ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হন। ফলে এই সকল কিছুর আবহে ভারতীয়রা আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হন এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

১৪.১ প্রকাশনা ও জনমত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যগুলি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, উচ্চমানের ছিল না। মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উদ্ভাসিত হওয়ার পর দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম সংস্কার কার্য চালু করেন। তাঁর উপলব্ধি করেন যে আধুনিক ধারণাকে জনসাধারনের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় দেশীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করা। এইভাবেই যে ধারনাগুলিকে ইংরেজরা মুষ্টিমেয় শহুরে মানুষদের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন তার প্রসার সাধন সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সচেতনতার বিকাশ ঘটেছিল বিকাশমান ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই। সংবাদপত্র ছিল দেশব্যাপী জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যম। সংবাদপত্রের দ্বারাই ভারতীয়রা একটি সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা আবহে নিজেদের সত্তাকে উপলব্ধি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও আম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ হতে দেখিনা। কিন্তু সাংবাদিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই তার সাফল্যমণ্ডিত যাত্রা শুরু করে। সংবাদপত্রের প্রকাশন মাধ্যম আরও দ্রুত উন্নত হয় মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে, এদেশে যার আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা। তারা সর্বপ্রথম মুদ্রণ প্রযুক্তির ব্যবহার করেন ধর্মীয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। ১৭৮০ খ্রীঃ হিক্কির প্রকাশিত Bengal Gazette ছিল ভারতে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র। প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল 'সমাচার দর্পণ'। প্রকাশক ছিলেন মার্শম্যান (Marshman) যিনি শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে সকল সংবাদপত্র দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), শিক্ষাদর্পন (১৮৬৪), বঙ্গদর্শন (১৮৭৩), আর্যদর্শন (১৮৭৪), সুলভ সমাচার (১৮৭০), বামাবোধিনী (১৮৬৩) ইত্যাদি। ১৮৬৮ খ্রীঃ যশোর থেকে প্রথম অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ, যিনি দেশ ব্যাপী জনমত গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যগুলিও পিছিয়ে ছিল না। পশ্চিম ভারতে 'The Rast Goftar', 'The Native Opinion', 'The Indu Prakash', 'the Maratha'. এবং 'The Keshari' বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ভারতীয় স্বার্থ এবং ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে মূল দ্বন্দ্বটি তুলে ধরেন। দক্ষিণ ভারতে 'The Hindu', 'The Swadesamitra', 'The Andhra Prakashika' এবং 'The Kerala Patrika' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উত্তর প্রদেশে 'The Advocate' 'The Hindustani', 'The Azad' এবং পাঞ্জাবের 'The Tribune', 'The Akbar-i-Am' এবং 'The Koh-i-noor' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক সংবাদপত্রেই ব্রিটিশ কূট কৌশলের সমালোচনা করা হয়। উপরিউক্ত সংবাদপত্রগুলি সমগ্র ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, শিল্পায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। যদিও প্রথমদিকের কিছু সংবাদপত্র ইংরেজদের

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ক্রমে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হল গণতান্ত্রিক উন্নত সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপনিবেশতদের কাছ থেকে কোন প্রকার সমালোচনাকেই ব্রিটিশরা প্রশ্রয় দিতে চায়নি। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি যেভাবে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাতে জনগণকে সমালোচনার সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়া। এই আশঙ্কাতেই ব্রিটিশ সরকার Vernacular Press Act (১৮৭৮) পাশ করে যার দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোর করা হয়। এই আইন পাশের মাধ্যমে দেশীয় মানুযের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এই মর্মে সারা ভারতব্যাপী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ভাইসরয় লর্ড রিপন 'Vernacular Press Act' বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন বাতিল করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯০৪ এবং ১৯১১ খ্রীঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

১৪.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.

২. Judith Brown—Modern India.

৩. Summit Sarkar—Modern India.

৪. Rajat Kanta Roy—The Felt Community.

১৪.৩ অনুশীলনী

১. পলিটিক্স অফ্ এ্যাসোসিয়েশন 'Politics of Association' বলতে কি বোঝ? জনমত গঠনে এর ভূমিকা আলোচনা কর।

একক ১৫ ❑ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা

গঠন

১৫.০ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা
১৫.১ অর্থনৈতিক সমালোচনা
১৫.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৫.৩ অনুশীলনী

১৫.০ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা

পার্সিভ্যাল স্পীয়ারের মতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত জয়যাত্রা সূচিত হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদ রেখা স্পষ্টতর হতে থাকে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা জাতি বৈষম্যের নীতি নেয়। ইংরেজ শাসকরা এবার 'গাজর ও লাঠি' (Carrot and Stick)-র দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। অন্য কথায় বলতে গেলে অনুমোদন এবং দমনের নীতি গ্রহণ করে। তারা এইরূপ ভাবমূর্তি প্রকাশ করতে চেয়েছিল, যেন তাদের সকল নীতিই জনসাধারণের কল্যানার্থে গৃহীত হয়। তাদের অনুমোদনের নীতি প্রতিফলিত হয় ১৮৬১ তে 'Indian Council Act' পাশের মধ্যে দিয়ে, যার মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে কিছু মনোনীত ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়, 'Penal Code' বা ভারতীয় দন্ড আইনের প্রচলন করা হয়। তথাপি মহাবিদ্রোহের ফলে মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়। এখন থেকে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উদ্যোগ নেয়। ফলে ইংরেজ শাসক শ্রেণী সচেতন হয় এবং জাতীয়তাবাদ প্রশমনের তাগিদে 'Divide and Rule' বা ভারতবাসীর মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা অনৈক্য সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করার নীতি নেয়। এই ভেদনীতির ফলেই মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলিমের দৃঢ় ঐক্যে চিড় ধরে এবং ক্রমশ সেই চিড় ভাঙণে পরিণত হয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারী ফলস্বরূপ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের মাধ্যমে একটি যুগের অবসান হয় এবং একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। সে যুগ অনুধাবন করে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। এখানেই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য নিহিত। সাভারকর তাই মহাবিদ্রোহকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ। সমগ্র বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জুড়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। ভারত ছিল তার সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, যার দ্বারা ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পূর্ণ তাই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায়, যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও তার ফলাফলই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিপানচন্দ্রের 'Modern India' নামক পুস্তকের একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলেছিলেন যে দুই পক্ষের স্বার্থের সংঘাতই ছিল এই

সংঘর্ষের মূল কারণ। ব্রিটিশদের ভারত শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যার দ্বারা অনেক সময়ই ভারতের মঙ্গল বিসর্জিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে, শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী একধরনের আধুনিক যুক্তিগ্রাহী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। তারা রুশো (Rousseau), টমাস পেইন (Thomas Pain), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর লেখার সঙ্গে পরিচিতি হয় এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে সমসাময়িক ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে রাজভাষা ইংরেজী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক যোগসূত্রে স্থাপন করে যার ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা এবং ধারণার অংশীদার হয়। এইভাবেই ইংরেজী শিক্ষা ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

১৫.১ অর্থনৈতিক সমালোচনা

গুণগতভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এক অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত করা হয় ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গীকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এক্ষেত্রে ভারতের তাঁত বয়ন শিল্প উলজাত বস্ত্র শিল্প, রেশম বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করে, ঐতিহ্যিক ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির পতন এবং বাণিজ্যিক পথে একসতেজ অর্থনৈতিক প্রবাহের আগমন যার ফল স্বরূপ ভারতের গ্রামীণ জীবন যাত্রার অবনমন ঘটে। কৃষক ও কারিগরের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সামগ্রিকভাবে ভারতের বুকে দারিদ্রের করাল ছায়া নেমে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয় এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কিত যে হিতবাদী ধারণা তারা পূর্বে পোষণ করত তার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য সে ভারতীয় অর্থনীতিকে অবদমন করে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, তাও পরিস্ফুট হয়। দাদাভাই নওরোজী (Poverty and Un-British Rule in India), রমেশচন্দ্র দত্ত (Economic History of India) এবং রাণাডে (Indian Economy) ঔপনিবেশিক শোষণমূলক চরিত্রকে প্রকাশ করে ভারতে শক্তিশালী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেন। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিপান চন্দ্র তাঁর "Rise and Growth of Economic Nationalism in India" নামক গ্রন্থে। দাদাভাই নওরোজী ভারতের দারিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ভারত প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। সুতরাং একদিকে ছিল উন্নয়নের আরোহণ আর একদিকে ছিল উন্নয়নের অবনমন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের গৃহীত শোষণমূলক অর্থনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এদেশের হস্তশিল্প ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করে। নওরোজী ভারতের ক্রমশ দরিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ব্রিটিশদের দৌলতে ভারত ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন যে ভারতীয় সম্পদ নির্গমন বন্ধ করা উচিত। ভারতীয়রা শুল্ক সংরক্ষণের মাধ্যমে ভারতে আধুনিক

শিল্পের বিকাশে পরামর্শ দেন। এবং এই পরিসরে ব্রিটিশ সরকার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এদেশীয় কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে কৃষকদের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভূমিরাজস্বের হ্রাস সেচকার্যের সুবিধা, কৃষি ব্যাঙ্কের বিকাশ প্রভৃতির দাবী জানায়। সরকারী সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উচ্চ ব্যয় এবং উচ্চ শুল্ককে ভারতের ক্রমবর্ধন দারিদ্রের জন্য দায়ী করা হয়।

১৫.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.
২. Judith Brown—Modern India.
৩. Summit Sarkar—Modern India.
৪. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern Bengali Elite
৫. Peter Robb—A History of India.

১৫.৩ অনুশীলনী

১. ব্রিটিশ 'অর্থনৈতিক নীতির'র বিরোধিতা (Economic Critique) সম্পর্কে আলোচনা কর।

একক ১৬ ❑ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্ কংগ্রেসী যুগ

গঠন

১৬.০ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্-কংগ্রেসী যুগ
১৬.১ ইন্ডিয়ান লীগ
১৬.২ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৬.৩ গ্রন্থপঞ্জি
১৬.৪ অনুশীলনী

১৬.০ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্-কংগ্রেসী যুগ

১৮৭০ এর দশকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক পটভূমি।

যদিও ১৮৩০ এর দশক থেকে আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে তথাপি জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বভারতীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন অবধি অপেক্ষা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাত ছিল না। বরং ১৮৩০-র দশক থেকে যে সমস্ত আঞ্চলিক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক সমিতিগুলি স্থাপিত হয়েছিল তাদেরই সম্মিলিত রূপ ছিল এই জাতীয় কংগ্রেসের মত সর্বভারতীয় সমিতি। এই সময়কার রাজনীতিকে ডঃ অনিল শীল ‘‘সমিতির রাজনীতি’’ (Politics of association) বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতে আঞ্চলিক ভাষা ও জাতিভিত্তিক ব্যবধান অতিক্রম করে ভারবর্ষকে এক ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রেরণা দেওয়ার জন্যেই এই সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার এই সময় উল্লেখযোগ্য সমিতি ছিল ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন’ (British India Association)। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমি স্বার্থ সংরক্ষণ করা। ফলে এই সমিতিটি শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ‘British India Association’ তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। প্রথম দিকে এই সমিতি পরিচালনার কাজে ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। ১৮৫৭ খ্রীঃ-এর মহাবিদ্রোহের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ছাত্ররা এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ১৮৭০-র দশক থেকে কলকাতার নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে এই সমিতি গুরুত্ব হারায়। কেবলমাত্র ভূমি স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত এই সমিতির প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। ফলে এই অভাব পূরণের জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতি বিকল্প সমিতির উদয় হয়।

১৬.১ ইন্ডিয়ান লীগ

অস্তিত্বশীল সমিতিগুলি যখন কলিকাতার উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের নতুন জাগরিত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তখন বিকল্প সমিতির জন্ম হয়। ১৮৭৫ সালে শিশির কুমার ঘোষ ইন্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। এই সমিতির নেতা দাবী করেন যে এটি ছিল প্রথম সর্বভারতীয় সমিতি। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী। কিন্তু ইন্ডিয়ান লীগ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। শিশির কুমারের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে। শীঘ্রই ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন লীগের স্থান দখল করে।

১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং অন্যান্যদের দ্বারা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের স্থাপন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন এই সমিতির মুখ্য ব্যক্তি। তিনি ১৮৬৯ খ্রীঃ আই. সি. এস পাশ করেন এবং চাকুরীতে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মীরা সুরেন্দ্রনাথেব মত প্রতিভাধর ব্যক্তিকে সহকর্মী হিসেবে বরদাস্ত করতে না পারায় ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন। বিভিন্ন বিষয়ে এই সমিতি আবেদন, প্রচার ও আন্দোলন গঠন করে। **প্রথমতঃ,** এদেশে একটি শক্তিশালী জনমত গঠন। **দ্বিতীয়তঃ,** সকল ভারতীয়ের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্যকরণ, **তৃতীয়তঃ,** হিন্দু মুসলমান ঐক্যের অগ্রগতি। **চতুর্থতঃ,** বৃহত্তর জনস্বার্থে জনগণকে পরিচালিত করা।

এই সমিতির কর্মকর্তারা, হিন্দু প্যাট্রিয়টের (Hindu Patriot) প্রশংসাসূচক বাক্য অনুযায়ী ছিলেন সুশিক্ষিত ভারতীয় যুবকগণ। এই সমিতির ২৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১০ জন ছিলেন কলিকাতার গ্র্যাজুয়েট, ১ জন কেমব্রিজ গ্র্যাজুয়েট, দুজন কর্মকর্তা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। সুরেন্দ্রনাথ যদিও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন কিন্তু নগণ্য কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক। এছাড়া ছিলেন প্রচুর শিক্ষক ও আইনজীবী। এই সংস্থা মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন-এর গঠনতন্ত্র ছিল গণতান্ত্রিক। এই সমিতির বহু শাখা মফঃস্বলের মহলে বিস্তৃত হয়। **Indian Civil Service', 'The Arms Act', "The Vernacular Press Act', 'Ilbert Bill'** প্রভৃতির বিরুদ্ধে Indian Association জনমত গঠন করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

১৮৭৬ সালে আই. সি. এস পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯এ ধার্য করলে ভারতীয়দের চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ কঠিন হয়ে যায়। ভারতীয়রা বুঝতে পারে ব্রিটিশরা কোন মতেই উচ্চপদের একচেটিয়া অধিকার ছাড়তে চায় না। এই বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয় টাউন হলে। এই সভাকে অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ এর মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই প্রথম জাতীয় স্তর থেকে কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। প্রতিটি অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদের নতুন উদ্যমকে জাগিয়ে তোলেন। ফলে সারা দেশজুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ইংল্যান্ডের House of Commons এ একটি সর্বভারতীয় স্মারক পাঠানো হয় সিভিল সার্ভিস আইন বিষয়ক। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে লালমোহন ঘোষকে পাঠানো হয় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় তদারকির জন্য। পরবর্তীকালে আই.সি. এস. পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সরকার পুর্নবিবেচনা করেন এবং ভারতীয়দের কিছু দাবীকে সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়।

১৮৭৮ খ্রীঃ লর্ড লিটনের দমনমূলক আইনগুলি—Arms Act বা অস্ত্র আইন, Vernacular Press Act বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন পাশ করা হয়। অস্ত্র আইনের মাধ্যমে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার নিষেধাজ্ঞা জারীর মাধ্যমে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমন আইন সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। উপরিউক্ত দুটি আইনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানায়। ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশনকে সামনে রেখে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এছাড়া আফগানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যয়বহুল সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণামে ভারত থেকে প্রচুর অর্থ নির্গত হয়। ফলে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের সদস্যরা আন্দোলনমুখী হন। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের নির্দেশে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদনের খসড়া রচনা করেন যা ব্রিটিশ আইন সভায় পাঠানো হয়। উল্লেখ্য ১৮৮১ খ্রীঃ দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র দমন আইন বাতিল করা হয়।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন নিয়ে ১৮৮৩ খ্রীঃ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৮৬৩

খ্রীঃ ফৌজদারী আইন বিধি অনুসারে কোন শ্বেতাঙ্গ আসামী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হলে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ বিচারক বা জজরাই তাদের মামলার বিচার করতে পারতেন। কোন দেশীয় বিচারক শ্বেতাঙ্গ আসামীকে ফৌজদারী মামলায় বিচার করতে পারতেন না। বলাবাহুল্য যে এই প্রথা ছিল ভয়ানক বৈষম্যমূলক এবং জাতিবৈরিতা সূচক। লর্ড রিপনের আমলে অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ দেশীয় কর্মচারী কভেন্যান্টেড সার্ভিসের ফলে বিচার বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গাত্র বর্ণের জন্যে তারা শ্বেতাঙ্গ আসামীর মামলার বিচার করতে পারতেন না। মফঃস্বলে ইংরেজ জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফলে চা বাগিচা বা নীলকর সাহেবরা দেশীয় লোকেদের মারধর করলেও মফঃস্বলে উপযুক্ত বিচার না থাকায় শাস্তি পেত না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণত অপরাধীদের লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতেন। বিহারীলাল গুপ্ত তখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই বৈষম্য মূলক আইনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লর্ড রিপন এই ব্যবস্থার বৈষম্য ও অন্যায় উপলব্ধি করে তাঁর আইন সচিব কোর্টনী ইলবার্টকে একটি বিল তৈরীর আদেশ দেন। তাঁর নামেই বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়। এই বিলে ভারতীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হলে তার বিচারের অধিকার দেওয়া হয়। ইওরোপীয় সম্প্রদায় এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করে। সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশন ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনসভা ও সংবাদপত্রে মতামত জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপন ইংরেজ প্রতিবাদের চাপে বিলটি সংশোধন করেন। ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়। ইংরেজদের মতই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন (১৮৮৩-র ডিসেম্বর) বা ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান করে। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কারীরা প্রযুক্তি বিদ্যা, সিভিল সার্ভিসের বিধি নিয়ম, অস্ত্র আইন, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ বম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সময় দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। বলাই বাহুল্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

অন্যান্য সমিতি ঃ ১৮৫৮ র পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই প্রসারিত হতে থাক। পূর্বের সংঘ সমিতিগুলি তৎকালীন ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে না পারায় নতুন সভাসমিতির প্রয়োজন দেখা দিল। দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৯ খ্রীঃ লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ জনমত গড়ে তোলার জন্য। ১৮৭১ খ্রীঃ তিনি বম্বেতে উপরিউক্ত সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ তে গোপাল পুরি দেশমুখ, রানাডে এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় পুণা সার্বজনিক সভা। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা তার কার্য শুরু করে, ১৮৮৫ তে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

এইভাবে সভাসমিতি তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। এই সময়টি ছিল ভারতীয় যুবকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যুগ। যা ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রগতির পথকে প্রসারিত করে। ১৮৮৫ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭২ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আনুগত্য জানায় এই মর্মে যে এদেশে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হোক যেখানে ভারতীয়রাও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভ এতটাই দুর্বল ছিল যে পূর্নস্বরাজের দাবী করতে প্রায় ৪৪ বৎসর লেগে গেছিল। প্রত্যেক বৎসরের শেষে কংগ্রেসের অধিবেশন বসত। এই অধিবেশন চলত ৩দিন ধরে। পরবর্তীকালে এই অধিবেশন সম্মেলনের মত একটি সামাজিক উৎসবেও পরিণত হয়। প্রথম দিকে কংগ্রেসের যোগদানকারীরা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী, সাংবাদিক, শিল্পপতি, শিক্ষক, ভূস্বামী প্রভৃতি জীবিকাধারীগণ এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে

সফল। এরা ব্রিটিশ সংস্কৃতি, সভ্যতা এমনকি শাসনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ফলে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল অবধি কংগ্রেসের কার্যাবলী বিপ্লবাত্মক ছিল না। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দু দশকের কার্যাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নরমপন্থী। অবশ্য কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্বের চরিত্র নরমপন্থী ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে প্রথম দিককার কংগ্রেসীরা যে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আদর্শ মনে করেছিলেন তার প্রকৃতিই সম্ভবত এই বিশেষণের জন্য দায়ী। তারা মনে করতেন তাদের প্রধান কর্তব্য জনসাধারণকে আধুনিক রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। তাদের অধিবেশনে জনসাধারণের দাবীদাওয়াকে বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হত। তারা প্রচুর স্মারক এবং দাবী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের কয়েকজন বিখ্যাত নেতারা হলেন দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দিন্ তায়েবজি ফিরোজশাহ্ মেহেতো, পি আনন্দ চালু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দ মোহন বসু, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, বাল গঙ্গাধর তিলক, মদন মোহন মালব্য এবং জি সুব্রমণিয়াম আইয়ার।

সভাসমিতির রাজনীতির মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়, যার দ্বারা সকল ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে কাঠামো প্রদান করা যাবে। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। Indian Association এবং British Indian Association এর মধ্যে যে সীমাবদ্ধগুলি ছিল তাকে অতিক্রম করা প্রয়োজন ছিল, তার সঙ্গে প্রাদেশিকতার গন্ডি অতিক্রম করাও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনকে ফলপ্রসু করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ হয়। লিটনের শাসনকালে তিনি ভারত সরকারের উচ্চ সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ডাকার জন্য যা, ১৮৮৫ খ্রীঃ এ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের এই অধিবশেনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

১৬.২ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ খ্রীঃ এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানামত, নানা বিতর্ক আছে। হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবানের মতে "ভারতে সেই সময় ব্রিটিশ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় তা নিরাপদে বর্হিগত করার জন্য একটি সেফটি ভালভ বা নিরাপদ কপাটের প্রয়োজন ছিল" যা হিউম অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার হিউম ছিলেন র্যাডিক্যাল ইংরেজ নেতা যোসেফ হিউমের পুত্র। জন্মসূত্রে তিনি পিতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক ছিলেন। তিনি ইওরোপীয় বৈপ্লবিক সভা সমিতিগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী হিউম কেন ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন? সেফটি ভাল্ভ মতবাদের সমর্থকরা বলেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আদেশ পালন করাই ছিল হিউমের প্রাথমিক কর্তব্য ও উদ্দেশ্য। সিমলায় ১৮৮৫ খ্রী-র মে মাসে বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও হিউমের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় ডাফরিন মন্তব্য করেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিরোধী দল সরকারের দোষ ত্রুটির সমালোচনা করায় সরকারের সুবিধে হয়। সুতরাং ভারতেও এইরূপ একটি সমিতিকে সমালোচনার অধিকার দিলে এই সমিতি সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সরকারের কাজকর্মের সমালোচনার অধিকার পেলে সেফটি ভাল্ভের কাজ করবে। হিউম ডাফরিনের

পরামর্শ গ্রহণ করে পুণায় 'Indian Union' এর অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। পুণায় কলেরা দেখা দিলে অধিবেশন বোম্বাইয়ে করা হয় এবং এই সমিতির নাম রাখা হয় Indian National Congress বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

উপরিউক্ত বিবরণের উপর নির্ভর করে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে লর্ড ডাফরিন প্রাক্তন সিভিলিয়ান হিউমের সাহায্যে ভারতীয়দের অসন্তোষকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে একটি সেফটি ভাল্‌ভ হিসেবে ব্যবহার করেন। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা আনুগত্য পরায়ণ ছিল তাদের, চরমপন্থীদের থেকে দূরে রাখা। তাদের ধরে রাখার জন্যেই লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেন। এই তথ্য সত্যি যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তথাপি সেফটি ভাল্‌ভের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানকে বিপানচন্দর উপকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন—**প্রথমতঃ,** ১৮৭৮ সালে হিউম ছিলেন রাজস্ব বিভাগ, কৃষি বিভাগ, বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মসচিব। সুতরাং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দলিল তার হস্তগত হওয়া সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়তঃ,** হিউমের জীবনীকার ওয়েডাবান যে সাতখন্ড গোপন রিপোর্টের কথা বলেছেন—যার ফলে হিউম আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনায় চঞ্চল হন। বিপানচন্দ্র এই মত স্বীকার করেন না। কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দলিল কেবলমাত্র দিল্লীতেই লভ্য ছিল। **তৃতীয়তঃ,** হিউম সাত খন্ড গোপন রিপোর্ট ১৮৭৮ খ্রীঃ-এ পড়েন এবং আসন্ন বিদ্রোহের সমভাবনায় চঞ্চল হন। যদি তাই হয়, তাহলে কোন অর্থে এই বিদ্রোহ প্রশমনের তাগিদে ১৮৮৫ খ্রীঃ অবধি অপেক্ষা করতে হল। **চতুর্থতঃ,** কিভাবে একটি দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন ১৮৮৫ খ্রীঃ এ বিভিন্ন প্রদেশের কেবলমাত্র ৭২ জন প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত সমিতির মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে গেল? **পঞ্চমতঃ,** কংগ্রেস যদি হিউমের মস্তিষ্ক প্রসূত চমৎকারিত্ব হত তাহলে ১৮৮৮ খ্রীঃ হিউম কংগ্রেসকে আক্রমণ করতেন না। **ষষ্ঠতঃ,** সেফটি ভালভ্ নীতি প্রচার করতে গিয়ে হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ন যে সাতখন্ড গোপন রিপোর্টের কথা বলেছেন তা ১৯৫০-র দশকে ঐতিহাসিকদের গবেষণায় নিয়োজিত করা ছাড়া আর কোন ফল দেয়নি।

বিভিন্ন শক্তির আন্তঃ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ফলে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির অবদানকে প্রাধান্য দিলে তা অবিচার্যতায় পরিণত হবে। তবে যা উল্লেখের অবকাশ রাখে তা হল—তৎকালীন প্রেক্ষিতে সারা ভারতব্যাপী একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। যেসকল ভারতীয়রা হিউমকে সহযোগিতা করেছিলেন তারা ছিলেন উচ্চ দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ। তারা স্বেচ্ছায় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ক্ষেত্রে হিউমের সাহায্য গ্রহণ করেছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হয়ত হিউমও কেবলমাত্র সেফটি ভালভ্ নীতির থেকেও উচ্চ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কারণ যোসেফ হিউমের পুত্র হওয়ার সুবাদে দুর্বলের প্রতি অনুরক্ততা তার জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ। ফলে দুর্বল ভারতীয়দের জন্য কিছু করার বাসনা তার ছিলই। আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারতীয় রাজনীতিতে হিউমের আগ্রহের কারণকে বর্ণনা করতে পারি। সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন—তৎকালীন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিলই এবং এই পূর্বরচিত পটভূমিকাই কৌশলগতভাবে হিউম গ্রহণ করেন। আসলে হিউম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও প্রকৃত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর (All India National Conference) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে। উল্লেখ্য এই প্রতিষ্ঠানটিই ১৮৮৬ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

১৬.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.

২. Judith Brown—Modern India.

৩. Summit Sarkar—Modern India.

৪. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern Bengali Elite

৫. Peter Robb—A History of India.

১৬.৪ অনুশীলনী

১. জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুত্থানের পিছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট লেখ।

PAPER III

একক ১ ☐ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

গঠন ঃ

১.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কী? (What is Indian Nationalism ?)

১.২ উজ্জীবনের স্তর (Levels of Response)

১.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কী? (What is Indian Nationalism?)

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সাধারণভাবে পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সাপেক্ষে, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতীয়তাবাদ যে ইতিমধ্যেই ভারতীয় মনে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে জনগণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে এবং ঔপনিবেশিক শাসন যে তাতে শুধু অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তর্ক সাপেক্ষ এবং একে বলা যেতে পারে, "teleological model of enlightenment history". যা কিনা একীভূত এবং জোটবদ্ধ জাতির 'ধারণাকে' মিথ্যে বলছে। প্রকৃতপক্ষে, বিস্তৃত পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মধ্যে একটি সর্বসম্মত চিন্তা হল, ঔপনিবেশিক আঘাতে ভারতবাসী তাদের বহুধা বিস্তৃত সমাজে, অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম, জাতি এবং বংশধারার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে একটি এক জাতিতে পরিণত করতে চাইল বা চিন্তা করল যা কিনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত, বা Bayly যাকে বলছেন। পূর্ববর্জিত আঞ্চলিকতার ধারণা এবং দেশজ নীতিবোধ থেকে উদ্ভূত দেশপ্রেমের পরম্পরা।

জাতিগঠনের প্রক্রিয়াটি কিন্তু, তবুও তীব্র দ্বন্দ্ব এবং তর্কের বিষয় হয়ে রইল। পার্থ চ্যাটার্জী ভারতীয় জাতিকে পশ্চিমের দেশগুলো থেকে কিছুটা পৃথক, যদিও তাদের ধারণা উদ্ভূত (derivative discourse), বলে মনে করেন। আশীষ নন্দীও মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াতেই পুষ্ট। It was "shaped by what is was responding to." এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধির বিশ্বজননীতার ধারণার পরিবর্তে তত্ত্বটি পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্র (Nation State) model-এর ধারণাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কে তর্কের উৎপত্তি প্রাথমিক ঔপধনবেশিক তাত্ত্বিকদের ধারণা যে জাতীয়বাদ হচ্ছে এক অণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু (Microscopic minority)-দের সৃষ্টি, যাঁরা সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। 1888 সালে স্যার জনস্ট্র্যাচি (John Strachey) কেমব্রিজের স্নাতক ছাত্রদের বলেন, "There is not, and never was, an India, or even eny Country of India.... no Indian nation, no people of India of which we hear so much.. that men of the Punjab, Bengal, the North West Provinces and Madras, Should ever feel that they belong to one great Indian nation, is impossible." পরবর্তীকালে, Valentine Chirol বলেছেন, যেটাকে ভারতীয় জাতি বলে দেখা হচ্ছে তা হল পৃষ্ঠপোষক পরিসেবা প্রাপ্ত সম্পর্কের রাজনীতিকরণ (the Politicization of Patron-client relations), ভারতীয় সমাজ এগিয়েছে মূলত ঐতিহ্যবাহী সমাজ গঠনের পথেই, আধুনিক জাতি-গঠন প্রক্রিয়ায় নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা R.C. Mazumder-এর নেতৃত্বে এই ধারণার বিরোধিতা করে, ব্যাখ্যা দেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক সরকারের ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ থেকেই সৃষ্ট।

The Namierist Cambridge School, যাঁদের নব্য-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক বলে চিহ্নিত করা হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁদের কাছে ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত হল সহযোগিতা এবং বিরোধীতার ইতিহাস। ব্রিটিশ দেখল যে, ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে সম্পদ, ক্ষমতা এবং গরিমার জন্য প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত। ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শ্রেণির ভারতীয়ের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন হল, যা স্বাভাবিক কারণেই অন্য শ্রেণিগুলোকে সরকারের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলল। স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে বিরোধিতা অবশেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হল যদিও এটা সম্ভব হল পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং পশ্চিমি কায়দায় আর্থরাজনীতিক গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে। শেষ বিশ্লেষণে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল কেবলমাত্র একটি "Loose Coalition," Namier লিখেছেন, "Idealism and Idealists are misnomers" এবং অনিল শীলের বক্তব্যে এরই প্রতিধ্বনি, "Ideology Provides a good tool for fine Carving, but it does not make big buildings."

কেমব্রিজের তাত্ত্বিকদের মত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। Namier-কে সমালোচিত করে Prof. Butter field বলেন, "... human beings are carriers of ideas as well as reposittories of Vested interests." এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে Christopher Hill বলেন, "I do not believe that material conflicts are the only ones deserving Serious analysis."

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কেমব্রিজের তাত্ত্বিকরা ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে মনন এবং আবেগকে অপসারিত করে জাতীয় আন্দোলনকে এমন স্তরে নিয়ে গেছেন যা কিনা তপন রায় চৌধুরীর মতে একটা "animal Politics." এ ধরনের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা এখন এমনকি সংশোধনবাদী কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরাও মেনে নেন না। C.A., Bayly'র "Origin of Nationalities in South Asia (1998)" এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চ্যুতিকে মনে করিয়ে দেয়। যা কিনা নেমিয়ার পন্থীরা, Gallagher, Seal, Johnson এবং এমনকি Judith Brown ভীষণভাবে এড়িয়ে গেছেন, তা হল, ভারতবাসীর নিজেদের দেশের জন্য বিপুল আত্মোৎসর্গ। Bipan Chandra এর মতে, সার্বিকভাবে ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতিকে উন্নীত করতে ভারতীয় আলোক প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবদানের উল্লেখ ছাড়া ভারতীয় জাতিয়তাবাদকে বোঝা সম্ভব নয়। Prof. Sumit Sarkar'ও বলেন যে, ভারতের জাতীয় নেতৃত্বকে সঠিকভাবে বিচার করতে হলে, তাঁদের আর্থসামাজিক ভিত্তি এবং মূলত অনাগরিক (non-bourgeois) সমাজের ভিত্তিতে দেশপ্রেমের ধারণার যুগপৎ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কেমব্রিজের ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণ রাজনীতিক ব্যাখ্যাকে প্রাচীন মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনরায় ব্যাখ্যা দেন। তৎকালীন সোভিয়েত ঐতিহাসিক V. I. Pavlor দ্বারা অনুপ্রাণিত এই তাত্ত্বিকদের ভারতীয় প্রবক্তা হিসাবে R.P. Duttকে ধরা যায়। মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেন এবং এই আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, শিল্পে পুঁজিবাদের বৃদ্ধি এবং বাজার অর্থনীতি শিল্প সমাজের সৃষ্টি ইত্যাদির সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে জাতীয় আন্দোলন হল একদিকে শ্রমিক শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য শ্রেণি সংগ্রাম এবং অপর দিকে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে চালিত জাতীয় দলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যে দলগুলি আন্দোলনকে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে চালিত করে জনগণকে প্রতারিত করছে। এই অতি-সিদ্ধান্তমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরবর্তী বামপন্থী তাত্ত্বিক যেমন S.N. Mukherjee এবং Bipan Chandra অনেকটা সংশোধিত করেন। মুখার্জী— জাতীয়তাবাদের বহুমুখী স্তর, তাদের জটিলতা এবং জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন অর্থকে দেখিয়ে দেন, যাতে বিভিন্ন জাতপাত এবং রাজনীতির আদি এবং নব্য ভাষার

যুগপৎ প্রয়োগের কথা বলা হয়। Bipan Chandra এবং তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের, "India's Struggle for independence (1989)"-এ মার্কসীয় ব্যাখ্যার উপর একটা জাতীয়তাবাদী-গন্ধ-(Nationalist Flavour) আরোপ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনকে কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের ব্যাপার বলতে অস্বীকার করেন। তাঁরা এই যুক্তি দেন যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল মুখ্যত জনগণের আন্দোলন, যদিও অন্যান্য গৌণ বিবাদের (তার্কিক) কোনও মীমাংসা হল না।

ভারতের জাতীয়বাদ যে কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত প্রভাবিত এবং পরিচালিত নয়, সে সম্পর্কে Subaltern তাত্ত্বিকরা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। 1982 সালে Subaltern Studies এর প্রথম খণ্ডে (Ranajit Guha সম্পাদিত) যে দিশারী মন্তব্য করল তা হল "(the) blinkered historiography (of Indian nationalism)" কখনই সত্যকে উদঘাটন বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না কারণ তা উপেক্ষা করছে যে ঘটনাকে তা হল "the Contribution made by the people on their own, that is, independenty of the elite to the making and development of this nationalism." Subaltern ঐতিহাসিকরা বলেন যে ভারতীয় Subaltern'রা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্তর্নিহীত বিদ্রোহী চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আঞ্চলিকতা এবং অদ্ভুত চিন্তাপ্রণীত হয়ে সবসময়ই ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সমান্তরাল ভূমিকা পালন করেছেন।

Gyan Prakash, তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক "Another Reason (1999)" ওই Subaltern ধারণাকে সংশোধিত করে উন্নততর ধারণা দেন। তিনি বলেন, "there was no fundamental opposition between the inmersphere of the nation and its outer life as a nation State ; the latter was the former's existence as another, abstract level." "The nation-State was immanent in the very hegemonic project of imagininig and normalizing a national community. এই অন্তহীন তর্ক থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শক্ত, কোনও সিদ্ধান্তে আসা কি আদৌ সম্ভব অথবা, সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা কি অসম্ভব? সম্ভবত এটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে জাতি গঠন সর্বদাই একটি জটিল প্রক্রিয়া যা কিনা বিরোধিতা, সমন্বয় এবং বহুমুখী সচেতনতার উজ্জীবনের সমন্বয় বিধান। ভারতীয় জাতির ক্ষেত্রেও এটা সত্য। Ania Lomba (Colonialist Past, Coloinalism. 1998), কে উল্লেখ করে বলা যায়, ভারতের বহুবিধ সমাজে (Plural Society) জাতীয়তাবাদের অনেকগুলো দিক থাকবেই— শ্রেণি, জাতি, ব্রাহ্মণ এবং দলিত, নারী এবং পুরুষ, হিন্দু এবং মুসলমান ইত্যাদি।

এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তীর্থযাত্রীরা বিভিন্ন পূণ্যস্থানে যাচ্ছে; ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য যেমন রামায়ন মহাভারত ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা করছে; বিভিন্ন পূণ্য নদীতে পুণ্যস্নান করছে, মঠে এবং উচ্চ পর্বতগুহা-দর্শনে যাচ্ছে। এ সমস্তই ভারতকে সংস্কৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে' সূক্ষ্ম কলা ধর্মনিরপেক্ষ। সংগীত ছিল একটা মস্ত বড়ো Unifier। ভারতের সমন্বয়ের ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন। চৈতন্য, কবীর, নানক নামদেব, রবিদাস এবং অনেক পীর এবং ফকির ভারতের মৌলিক একতাকে জোরালো করেছেন, ঔপনিবেশিককালে, রাস্তা, রেলযোগাযোগ, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, মুদ্রাব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের জনগণকে পারস্পরিক মিলিত হতে এবং রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজনীতিক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে জোরালো করেছে। ভারতীয়দের দ্বারা এটা ছিল পশ্চিমি ধারণার আত্মীকরণ। স্বাধীনতা সংগ্রাম যে শুধু এটাকে ধারালো করছে তাই নয়, এটা দেশপ্রেমের এক গভীর চেতনা সৃষ্টি

করেছে যা কেবল ঔপনিবেশিক দেশেই দেখা যায়। জীবনের সর্বস্তরে দেশপ্রেম তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদকে ম্লান করেছে।

১.২ উজ্জীবনের স্তর (Levels of Response)

Bipan Chandra এর Modern India-তে বলা হয়েছে, "Basically modern Indian nationalism arose to meet the Challenge of foreign domination." এই জাতীয়তাবাদী চেতনা যতই বাড়তে লাগল, ততই বেশি করে ভারতের সমস্ত শ্রেণির জনতা উপলব্ধি করল যে, ভারতের অনগ্রসরতা ব্রিটিশ শাসনেরই ফল এবং বিদেশি শাসকদের হাতেই তাদের স্বার্থ মার খাচ্ছে।

চাষিরা দেখল যে তারা ক্রমশই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কারণ ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত তাদের উৎপীড়ক জমিদারদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্বার্থরক্ষা করছে এবং ঠগ মহাজনদের পোষকতা করছে। বন আইন (Forest Act) দলিত জনজাতিদেরকে উচ্ছেদ করছে। শ্রমিক এবং মেহনতি মানুষ (Artisans & handicrafts man) ক্রমশই হতাশ হতে থাকল কারণ শিল্পের দ্রুত সংকোচন ঘটছে যা, সাম্রাজ্যবাদী শিল্প-নীতিরই ফল। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীতে, ফ্যাক্টরি-শ্রমিক, খনি-শ্রমিক এবং চা বাগানের শ্রমিকরা লক্ষ করল যে, শাসকেরা মুখেই তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতিদেরই পক্ষে। এমনকি জমিদার এবং জোতদাররাও যাদের স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিকদেরও স্বার্থ একই, বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়বাদীদের সঙ্গে হাত মেলালেন, যখন ব্রিটিশদের চূড়ান্ত বর্ণবিদ্বেষ তাঁদের আহত করল এবং তাঁদের মনে আত্মসম্মানের বোধ জাগাল।

সমাজের অন্যান্য অংশও সমানভাবে অসন্তুষ্ট হল। পশ্চাত্য-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণকে বিশ্লেষণ করতে পারল, যেমন R.C. Dutt তাঁর "Economic History of India" তে করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন যে, দেশের বর্ধমান অনগ্রসরতাকে ঠেকানো যেতে পারে কেবলমাত্র দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা, যা রূপায়িত হতে পারে, কেবলমাত্র একটি স্বাধীন সরকার দ্বারাই। পুঁজিপতি শ্রেণিও ক্রমশ তাঁদের বেনীয়ানী চরিত্র ঝেড়ে ফেলে, ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নীতি রোধ করতে একত্রিত হল। তাঁরা ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করে জাতীয় সরকারের কাছে Protection চাইল। ১৯৪০ সালের মধ্যে বহু ভারতীয় শিল্পপতি ব্রিটিশ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে দাবি জানালো।

শেষে Bipan Chandra এর "Modern India" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, "It was as a result of the intrinsic nature of foreign imperialism and at its harmful impact on the lives of the Indian People that a powerful anti imperialist movement gradually arose and developed in India. This movement was a national movement becuse it united people from different classes and sections of the Society who Sank their mutual difference to Unite against the Common enemy."

একক ২ □ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি : নীতি এবং কার্যক্রম

গঠন ঃ

২.১ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি : নীতি এবং কার্যক্রম

২.২ আদি জাতীয়তাবাদীদের কার্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

২.৩ কংগ্রেসি কার্যপদ্ধতি

২.৪ কংগ্রেসি স্বাধীনতা সংকট ও উদারনীতির দ্বন্দ্ব

২.৫ গ্রন্থসূচি

২.১ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি : নীতি এবং কার্যক্রম

১৮৮৫-এ প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর আদি জাতীয়তাবাদীদের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, আমরা স্বীকার করব যে, কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে তথাকথিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে আধুনিক গবেষকরা দূর করেন। সন্দেহাতীতভাবে এই তত্ত্ব Allan Octavian Hume এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bannerjee) এর ভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলির উপর গড়ে উঠেছে যে Hume, Dufferin-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনার জন্য কাজ করেছেন, যা কিনা জনগণের অসন্তুষ্টির বিপক্ষে একটা "Safery Value"। কংগ্রেসের গোঁড়া সমালোচকদের (R. P. Dutt এর মত) কাছে এই তত্ত্বের যথেষ্ট আবেদন ছিল : তাই এল Conspiracy theory, সাম্প্রতিক গবেষকরা, বিশেষত ডাফরিনের নিজস্ব লেখার ভিত্তিতে, প্রমাণ করেন যে, উচ্চস্তরের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কেউ, হিউমের জনরোষ বা অসন্তুষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীকে গুরুত্ব দেননি। "হিউম 1885 এর মে মাসে সিমলায় ডাফরিনের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু ভাইসরয়ের মুখ্য এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, বোম্বাই এর গভর্নরকে উপদেশ (নির্দেশ) দেওয়া যে তিনি যেন প্রস্তাবিত "প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সম্মেলন (Dufferin to Reay, 17 May 1995) থেকে দূরে থাকেন। যাই হোক, সমস্ত কথাই হিউমের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।

আদি জাতীয়তাবাদীদের এইসব নীতি এবং কার্যক্রম এক কথায় নরমপন্থী দশা (১৮৮৫-১৯০৫) হিসাবে সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ধারণার পিছনে কিছু সত্য আছে : "Certainly a broad uniformity in objectives and methods of activity Seems fairly obvious over the entire period." এই সময়ের কংগ্রেস বছরে তিন দিন মিলিত হত যখন সভাপতি এবং অন্যান্য প্রতিনিধির ভাষণ ইংরেজিতে দেওয়া হত এবং তিনটি প্রসারিত আভিযোগক্ষেত্র যথা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর একই রকম প্রস্তাব গৃহীত হত। যদিও "আদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন, যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, এখনও ইতিহাসের আলোচ্যসূচিতে নেই। যা আছে তাহল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা এবং তাকে সুদৃঢ় করা। এ সম্পর্কিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— রাজনৈতিক প্রশ্নে জনমানসে ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং দেশে জনমতকে সংগঠিত করা।" অধ্যাপক সুমিত সরকার নরমপন্থী জমানার তিনটি পৃথক দশা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম দশা ১৮৯২ পর্যন্ত চলেছে, যখন কংগ্রেস ছিল সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হিউম দ্বারা প্রভাবিত। "Erratic,

Platernalistic and domineering, his presence did impart a Certain dynamism which was to be Conspicuously absent in the succeeding years." কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রথম পাঁচ বছরে দ্রুত বাড়তে লাগল, এবং Washbrook এবং Bayly-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৮৮৭ (Madras) এবং ১৮৮৮ (Allahabad) এর কংগ্রেস সম্মেলন ছিল "unusually broad based", ১৮৯২ তে hume ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল। এই সময় থেকে প্রায় ১৮৯০ পর্যন্ত কংগ্রেস একটা স্থির অবস্থায় ছিল। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চার্লু এবং ফিরোজশাহ মেহতার মতো কয়েকজনের একটা গোষ্ঠী সবরকম সিদ্ধান্ত নিতেন এবং পশ্চাতপটে রানাডে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু ১৮৯৯ সাল থেকে, যখন মেহতা কংগ্রেস সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী ছিলেন এবং দলে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন, তখনই দলে নেতৃত্বের আবির্ভাব হল। অন্য কোনো সর্বসম্মত পরিবর্ত Substitute না থাকায় Hume-ই কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রইলেন যদিও তিনি তখন এদেশে ছিলেন না। সেই দিনগুলিতে ভারতে নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেসের প্রচার, ইংল্যান্ডে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির মাধ্যমে চলতে থাকল, যা পরিচালিত হত Weddenburn, Hume এবং Naoroji দ্বারা এবং তাঁদের মুখপত্র ছিল "India" পত্রিকাটি। আদি কংগ্রেসের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল কার্জনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই সময়ে কংগ্রেসে নতুন সক্রিয়তা এল Gokhale' এর নেতৃত্বে যাঁর ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যৌবনের উচ্ছলতা, সন্দেহাতীত আত্মোৎসর্গ এবং সর্বসময়ের জন্য জনসেবা।

২.২ আদি জাতীয়তাবাদীদের কার্যপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সম্ভবত, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনাই ছিল আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আদি জাতীয়তাবাদীরা বার বার ভারতের বর্ধমান দারিদ্রের কথা লিখেছেন এবং বলেছেন এবং এর কারণ হিসাবে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণকে দেখিয়েছেন। এই প্রতিবাদীদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছেন যে, ব্রিটিশ শাসন হল, "An everlasting, in creasing and everyday increasing foreign invasion", যা কিনা, "Utterly though gradually, destroying the Country". আদি জাতীয়তাবাদীরা বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন সেইসব অর্থনৈতিক নীতিকে যা কিনা, ভারতের ঐতিহ্যশালী হস্তশিল্পকে ধ্বংস করছে এবং আধুনিক শিল্পের উন্নতির পথে প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এইসব মতামত আদি কংগ্রেসের কার্যক্রমে, প্রতিফলিত হয়েছে। "The economic issues raised were all bound up with the general poverty of India-drain of wealth theme." বার বার, সিদ্ধান্ত, গৃহীত হয়েছে যে, ভারতের দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে, অভিবাসী ইংরেজদের ভাতা এবং প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমাতে হবে, শিল্পে অগ্রগতির স্বার্থে টেকনিক্যাল শিক্ষাতে আরও অর্থবরাদ্দ করতে হবে এবং পণ্যের মূল্য এবং আবগারি ট্যাক্স কমাতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, অতিরিক্ত জমির খাজনার দায়ে চাষিরা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আদি কংগ্রেস যে কেবলমাত্র ইংরেজি-শিক্ষিত গোষ্ঠী, জমিদার বা শিল্পপতিদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত নয়, তা বোঝা যায় তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি থেকে, যাতে লবণ-কর, বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমজীবী এবং বন-প্রশাসনকৃত আদিবাসীদের কষ্ট ভোগের উপর বলা হয়েছে।

আদি জাতীয়তাবাদীদের অন্য দাবিও ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার যা এইসময় বাঞ্ছিত ছিল, তা

হল উচ্চ প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগ যা, রাজনীতিগত, অর্থনৈতিক বা নীতিগত দিক দিয়ে জরুরি। প্রচলিত ব্যবস্থায় ICS পদে ইউরোপীয়দের অধিকতর ভাতায় নিয়োগের ফলে, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল করে তুলছিল। একই যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের নিয়োগ অনেক কম ভাতায় সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনে নিযুক্ত ইউরোপীয়দের ভাতা এবং পেনসন পুরোটাই ভারতের বাইরে চলে যেত। "Politically, the nationalists hoped that in Indianisation of these services would make the administration more responsive to Indian, needs" এই সব প্রশাসনিক পরিবর্তন ভারতবাসীর প্রয়োজনে অধিকতর সাড়া দিতে পারবে। নীতিগতভাবে, এর ফল অনুভূত হচ্ছিল, যা গোখলের ভাষায়, "a kind of dwarfing or Spenting of the Indian race" "in an atmosphere of inferiority." অর্থাৎ ভারতীয়দের জাতি হিসাবে ছোটো করে, একটা হীনমন্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভারতীয়দের দ্বারা চালিত করার দাবি উঠল, যা, "raised not really just to satisfy the tiny elite who could hope to get into the ICS, as has been sometimes argued, but Connected with much broader themes".

আদি জাতীয়তাবাদীদের আরও কতকগুলি প্রশাসনিক দাবি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনের পৃথকীকরণ দাবি করল এবং জুরিদের ক্ষমতা খর্ব করার সমালোচনা করল। তাঁরা আরও দাবি করলেন যে রাষ্ট্রের সেবামূলক দিকে (welfare activities) যেমন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, কারিগরি এবং উচ্চ শিক্ষায় বিস্তারের সুযোগকে আরও প্রসারিত করতে হবে। তাঁরা চাইলেন কৃষি-ব্যাঙ্ক (Agricultural banks), সেচব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত কর্মসূচি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উন্নততর পুলিশি ব্যবস্থা। তা ছাড়াও, যে সব ভারতীয় শ্রমিক দারিদ্রের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রিটিশ গিয়ানায় কাজ নিয়ে যাচ্ছে তাদের সুরক্ষার জন্য এবং তাদের সপক্ষে দাবি তুললেন।

"প্রথম থেকেই আদি জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে কালক্রমে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক স্বশাসনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁরা অবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে কোনো দাবি করলেন না। পরিবর্তে তাঁরা ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা লাভের পথ অনুসরণ করলেন। তাঁদের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক দাবিগুলো ছিল অত্যন্ত মৃদু। প্রারম্ভে তাঁরা চাইলেন যে, বর্তমান Legislative Council এবং সংশোধন এবং প্রসারণ করে তাতে ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। ১৯৬১ সালের ভারতীয় Councils act'এ কয়েকজন (non-officials) ভারতীয়ের মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হল, এইসব সরকারি মনোনীতরা ছিলেন সাধারণত জমিদার বা বড় ব্যবসায়ী, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে সরকারি নীতিকেই সমর্থন করতেন। যেমন, 1888 সালে, তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে লবণ কর বৃদ্ধিকে সমর্থন জানান। কংগ্রেস মঞ্চে তাঁদেরকে উপহাসের সঙ্গে বর্ণনা করা হত, 'gilded shams' (নকলসোনা) এবং "magnificent non-entities" (জমকালো অস্তিত্বহীন)। জাতীয়তাবাদীরা দাবি করলেন যে কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং সদস্যদের বাজেট এবং দৈনন্দিন প্রশাসনের সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাউন্সিলে সদস্যভুক্ত করতে হবে।

"জনগণের চাপে সরকার ১৮৯২ সালে নতুন ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রবর্তন করলেন। এই অ্যাক্টে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হল, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতে হবে, সদস্যদের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হল, যদিও বাজেটের ওপর ভোটের অধিকার দেওয়া হল না। এই সামান্য সংস্কার ভারতীয়দের অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করল। এর মধ্যে তাঁরা দেখলেন তাদের দাবিকে তামাসা করা হল। তারা তখন কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগুরুত্ব (Elected Majority) চাইলেন এবং জনগণের সম্পদের উপর বেসরকারি ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার দাবি করলেন। তারা স্লোগান তুললেন : no taxation without representation, একই সময়ে তারা গণতান্ত্রিক দাবির ভিতকে প্রসারিত করতে ব্যর্থ হলেন। অর্থাৎ,

তারা জনগণের ভোটাধিকার বা মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি করলেন না।" (Chandra, Tripathi and De, Freedom Struggle.)

২.৩ কংগ্রেসি কার্যপদ্ধতি (The Congress Method)

আদি জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের রাজনৈতিক কাজে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তাকে অনেক সময়, "ভিক্ষাবৃত্তি" বলা হত। আর, তাই তাঁদের, সমালোচকরা তাঁদেরকে বলতেন নরমপন্থী। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় "The Political methods of the moderates can be summed up briefly as Constitutional agitation with in the four walls of the law, and slow, orderly Political Progress." তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতেন। প্রথমত তাঁরা সভা করতেন যেখানে বক্তৃতা হত, আর প্রস্তাব গৃহীত হত। দ্বিতীয়ত তাঁরা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যেতেন। তৃতীয়ত তাঁরা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, স্মারক লিপি এবং দরখাস্ত পেশ করতেন। যেমন, জাস্টিস্ বানাডে বলেন, "These memorials are nominally aiddressed to Government, in reality they are addressed to the people So that they may learn how to think in these matters", এই সব পদ্ধতিই আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা এবং তাঁদের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তিকেই নির্দেশ করে। আন্দোলনের আবেদন ছিল তখনও সীমাবদ্ধ "In particular the leadership was Confined to professional groups Such as lowyers, doctors, Journalists & teachers, and a few merchants & landowners."

আদি জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সরকারি ব্রিটিশদের ধারণার কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম দিকে সরকারি ব্যক্তিদের শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ্যে আসেনি। এমনকি কেউ কেউ ভাবতেন যে হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। একটি অনুষ্ঠানে (ডিসেম্বর ১৮৮৬) ভাইসরয় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের তাঁর Garden Party' তে আমন্ত্রণও জানান। কিন্তু খুব শীঘ্রই বোঝা গেল যে জাতীয় কংগ্রেস শাসকের হাতের পুতুল না হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ প্রশাসকেরা প্রকাশ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের এবং কিছু জাতীয়তাবাদী মুখপাত্রের সমালোচনা ও নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন। লর্ড ডাফরিন বললেন যে এটা "microscopic minority"— এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং লর্ড কার্জন চাইলেন এটার "Peaceful Demise" এ সহায়তা করতে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, এমনকি, ব্রিটিশ অনুগামী কিছু ব্যক্তিকে একটি কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করতে উৎসাহীত করতে লাগলেন।

আদি জাতীয়তাবাদীদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। পরবর্তীকালে চরমপন্থী নেতা, লাজপৎ রায় বললেন : "After more than 20 years of more or less futile agitations for Concessions and redress of grievances. they had received stones in peace of bread." এই রাজনীতি ছিল "halting and half hearted," এবং ভিক্ষাবৃত্তির অনুসারী। তাঁদের বাস্তব সাফল্য ছিল অতি সামান্য। তাঁরা একটা সর্বভারতীয় সাংবিধানিক আন্দোলন সংগঠিত করতেও সফল হননি। তাঁদের জনসংযোগ ছিল না এবং তরুণ প্রজন্ম তখনও তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। তবু, নিক্তির ওজনে, আদি জাতীয়তাবাদীদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর ("not all that bleak") ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁদের কাজ করতে হত কঠিন অবস্থার মধ্যে, জাতীয় চেতনার মুখ্য সংগঠন হিসাবে, যখন সাম্রাজ্যবাদ ছিল মধ্য গগনে। বস্তুতপক্ষে বৃহৎ অর্থে, তাঁদের এটাই হল সবচেয়ে বড়ো সাফল্য, যে পরবর্তীকালে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলন তাঁদের জন্যই গড়ে উঠল তাঁদের আগের পথকে

ঐতিহাসিকভাবে বাতিল করে। তাঁদের সচেতন প্রয়াসেই সাধারণ রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ সম্মিলিত হল এবং সাম্রাজ্যবাদই যে জনগণের সাধারণ শত্রুতা' স্বীকৃত হল। বাস্তবিক, ‘‘জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য জনপ্রিয় এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সহযোগিতায় ভারতীয়রা গণতন্ত্রের ধারণা অর্জন করল, বিশেষত এমন একটা সময়ে যখন শাসকশ্রেণি সর্বদা তাঁদের বলত যে, তাঁরা কেবল সদাশয়তা বা পরোপকারেচ্ছু বা প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের উপযুক্ত [fit only for “benevolent” or “oriental despotism.] তাছাড়াও, বহু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী আধুনিক রাজনীতিতে শিক্ষালাভ করল এবং জনগণ আধুনিক রাজনৈতিক ভাবনা ও তন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হল।

২.৪ কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংকট উদারনীতির দ্বন্দ্ব

আদি জাতীয়তাবাদীদের পরিমাপ যাই হোক না কেন, এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত তাঁরা জাতীয় অনুভূতির একটা ক্ষুদ্র অংশকে প্রতিফলিত করত। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, আমদানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক এবং কার্জনের আগ্রাসী নীতি, সারা দেশে ব্রিটিশকে ইতিমধ্যেই অপ্রিয় করে তুলেছে। ফলে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার যেখানে ১৮৮৫ এ ছিল ২৯৯০০০ তা' ১৯০৫ সালে হল ৮,১৭,০০০ বস্তুত কলকাতার বঙ্গ বাসী এবং পুণার কেসরি এবং কাল কংগ্রেস ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে উচ্চ সমালোচনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল।

কেমব্রিজের ঐতিহাসিকগণ, অবশ্য ভারতে জঙ্গি আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। তাঁদের মতে, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দলের মধ্যে যে ভোটের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফল হল জঙ্গিবাদ (Extremism)। এটা সত্য যে ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে, কংগ্রেসে যথেষ্ট অন্তর্দলীয় সক্রিয়তা ছিল। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমত, সুরেন্দ্রনাথ এর “বাঙ্গালী” মতিলাল ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে সবসময় একটা কোঁদল লেগেই থাকত। দ্বিতীয় “facionalism was Particularly acute in the Punjab, with the three groups with in the Lahore Brahmo Samaj,” যা কিনা আর্যসমাজে একটা বড়ো ভাঙন এবং হর কিষাণ এবং লালা লাজপৎ রাও-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব। তৃতীয়ত “Mylapore Clique',-এর “Egmore rivals” এর মফস্‌সল “Outs”দের মধ্যে ছিল একটি ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, যেমন Wash brook দেখিয়েছেন। চতুর্থত Deccan Education Society-এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে Agarkar এবং Gokhale'র মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কেমব্রিজের ইতিহাসবিদদের মতে, এইসব দ্বন্দ্ব “Had little to do initialty with differences on political or even Social reform issues”, এগুলো কেবলমাত্রই অন্তর্দলীয় কোঁদল।

এই কেমব্রিজ দৃষ্টিভঙ্গি, নানা দিক দিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। প্রথমত কংগ্রেস তখনও যথেষ্ট সম্পদশালী, বাহ্যিক সমর্থনপুষ্ট এবং প্রকৃত রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠেনি। ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে কংগ্রেস রাজনীতির সক্রীয় সমালোচক ছিল, বাংলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে। “The Starting point of the new approach was a two-fold Critique of the moderate Congress for its ‘mendilant’ technique of appealing to British Public opinion, flet to be both futile and dishonourable and for its being no more than a movement of an English-educated elite alienated from the Common people” খুব তাড়াতাড়ি,

নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিক্রিয়া তিনটি রূপ নিল যার প্রতিটি অতি ক্ষুদ্র রূপে (in germ) ১৮৯০ সাল নাগাদ দেখা গেল। প্রথম রূপটি হল বিদেশি শাসনকে প্রত্যক্ষ আঘাত না করে, আত্মোন্নতির অ-রাজনৈতিক ঝোঁকে। দ্বিতীয়ত, মূলত নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজলাভের জন্য চরমপন্থী রাজনীতি জন্ম নিল। তৃতীয়ত, প্রতিক্রিয়া রূপ নিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের যা ছিল স্বাধীনতা লাভের সর্বাপেক্ষা Shortcut।

এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সবচেয়ে বাঙ্ময় সমালোচনা, নরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে করত আদি জঙ্গি জাতীয়তাবাদীরা। ১৮৯৩-৯৪ সালে প্রথম সুসংবদ্ধ সমালোচনা এল, অরবিন্দ ঘোষের লেখা New lamps for old থেকে, যাতে আহ্বান জানান হল "bugess or the middle clan" এবং "the proletariat" এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। অর্থাৎ শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। তিনি বরোদা থেকে তাঁর দুজন দূত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী এবং রবীন্দ্র কুমার ঘোষকে বাংলায় পাঠান। দ্বিতীয়ত ১৮৯৭ সালের কাছাকাছি সময়ে বাংলায় কংগ্রেসি কাজকর্মকে অশ্বিনীকুমার দত্ত "তিন দিনের তামাশা" বলে উল্লেখ করেন। "দত্ত ছিলেন বরিশালের একজন স্কুল শিক্ষক যিনি তাঁর সারাজীবন সামাজিক কাজের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব জনতা তৈরি করলেন যা তাঁর অঞ্চলকে স্বদেশি আন্দোলনের একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করে ১৯০৫ সালের দিনগুলিতে"। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর পুনঃপুনঃ "আত্মশক্তি-র" আহ্বান স্বদেশি পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে এই সমালোচনায় যোগ দেন। চতুর্থত কিছু অন্য বিশেষ ব্যক্তিত্ব এই সমালোচনায় অংশীদার ছিলেন। বিবেকানন্দের বাণী সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমে একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বর্ণ নিয়ে এল, যাঁর আইরিশ এবং অন্যান্য বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, তাঁর Bengal Chemicals (১৮৯৩তে প্রতিষ্ঠিত) এর মাধ্যমে এবং সতীশ মুখার্জী তাঁর "Dawn Society" এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেশজ নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার নব্য রূপ সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন, পঞ্চমত, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রাই ১৯০১ এর Kayastha Samachar পত্রিকা দুটি নিবন্ধে (article) টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং শিল্পে স্বনির্ভরতা সম্পর্কে উপদেশ দেন। সেখানে Harkishan Lal গোষ্ঠী এবং আর্যসমাজীরা ১৮৯০ সাল থেকেই 'স্বদেশি' শিল্পে এবং বিনিয়োগে সক্রিয় ছিলেন। অবশেষে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর তীব্র এবং সর্বাঙ্গীণ প্রচারে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থী আন্দোলনের আগুন জ্বাললেন।

নরমপন্থী এবং চরমপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে নামেই ভিন্ন। চারের নরমপন্থীরাই তাঁদের সময়ে চরমপন্থী, তাঁরা ব্রিটিশ সিংহকে ভয় দেখাতে যে কাজ করতেন তাই পরে ভিক্ষার রাজনীতি নামে উল্লিখিত হয়েছিল। নওরোজীর সংখ্যাতত্ত্ব প্রমাণ করেছিল যে নিঃসন্দেহে ভারতের দারিদ্রের মূল কারণ ব্রিটিশের উপস্থিতি।

চরমপন্থীদের মনে হতে পারে নরমপন্থী যা পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁরাই প্রথম "Purno Swaraj" বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে দাবি করেন। তাঁদের নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্র এঁকে তাঁদের চরিত্র হনন উচিত নয়।

এই প্রচারে বাল গঙ্গাধর তিলক ধর্মীয় গোঁড়ামীকে, জনসংযোগের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করেন। তিনি মহারাষ্ট্র শিবাজি উৎসব এর মত উৎসব পালনের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক ভক্তিবাদ এর উন্নয়নে সাহায্য করেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে কর না দেওয়ার জন্য প্রচার আরম্ভ করেন এবং চালনা করেন। ১৮৯০ সালের আবগারি শুল্কের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারকে পরবর্তীকালের বয়কট আন্দোলনের উৎস হিসাবে ধরা যায়। এইসব ক্রিয়াকর্মের ফলেই দেশে বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮৯৭ সালে পুণার বিপ্লবী সন্ত্রাসকে কেবলই সমাপতন হিসাবে ধরা যায় না। যাতে Rand এবং Ayerst চাপেকার ভাইদের দ্বারা, ব্রিটিশদের পুনা প্লেগের প্রতিকারে ব্যর্থতার জন্য, প্রতিবাদ হিসাবে নিহত হন।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

Sumit Sarkar : Modern India, New Delhi, 1983.

Bipan Chandra : Modern India, NCERT, New Delhi, 1982.

Bipan Chandra & Others : India's Strugle for in dependence, Penguin, 1989.

Shekhar Bandyopadhyay : From Plassey to Partition, New Delhi, 2004.

C.A.Bayly : The Local Roots of Indian Politics, Oxford, 1975.

Sujata Bose, Ayesha Jalal : Modern South Asia-History, Culture, Political Economy, London, 1998.

J.R. Mc. Iane : Indian Nationalism and the Early Congress, Princeton, 1977.

Ashis Nandy : The Illegitimacy of Nationalism — Rabindranath Tagore and the Politics of Self, Delhi, 1994.

D. Argov : The moderates and the Extremists, Bombay, 1987.

একক ৩ ❑ সাম্প্রদায়িকতা : উত্থান এবং বৃদ্ধি

গঠন ঃ

৩.১ সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং বৃদ্ধি

৩.২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

৩.৩ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি

৩.৪ গ্রন্থসূচি

৩.১ সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং বৃদ্ধি

যদি জাতীয়তাবাদ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়, তবে অপরটি হল সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণিগত সচেতনতা, যা কিনা ঔপনিবেশিকতার মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ পেল। "এই অত্যন্ত জটিল বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা বাধা পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট দুটি বাধাধরা বিপরীত ধারণার মাধ্যমে— হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি বিরোধী জাতি— যাঁরা মধ্যযুগ থেকে ভিন্ন জাতি হিসাবে বর্তমান এবং বিপরীত দিকে জাতীয়তাবাদী ভিন্ন Myth যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সুবর্ণযুগ যা ব্রিটিশের 'divide and rule' নীতি দ্বারা ভেঙে গেল। এর ফলে ভারতে প্রাচীন, মধ্য এবং বর্তমান যুগের উপর লিখিত ইতিহাস বইগুলি সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। তবে অতি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এটাই বলে যে, ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আগে, বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল ঠিকই, কিন্তু এই টানাপোড়েন কখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মাত্রা পায়নি, যতদিন না পর্যন্ত চতুর ব্রিটিশ নীতি এটাকে সমর্থন এবং লালন করেছে। কিছু স্থানীয় বিবাদ এবং আন্তঃ ও অন্তঃ সম্প্রদায়গত বিবাদ ছিল, তথাপি, "Communal riots do Seem to have been significantly rare down to the 1880s."

কী ছিল এই ব্রিটিশ নীতি? এটা সর্বজন বিদিত যে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে মুসলিম এবং হিন্দুরা একসঙ্গে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ মুসলিমদের উপর বিশেষভাবে প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে প্রায় 27,000 মুসলিমকে কেবলমাত্র দিল্লিতেই ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই সাধারণভাবে মুসলিমদের ব্রিটিশ সন্দেহের চোখে দেখত। ১৮৭০ সাল থেকে ব্রিটিশের নীতির পরিবর্তন ঘটল বর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুস্থিতি এবং সুরক্ষার স্বার্থে বুদ্ধিমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারা এই আন্দোলনকে নিরস্ত করতে চাইলেন। আর তখনই এল "divide and rule" নীতি অর্থাৎ ভারতীয় জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে, তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদমূলক প্রবণতায় উৎসাহ দান, ব্রিটিশ দাবি করল যে তারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্ধারকর্তা এবং মুসলিম জমিদার, জোতদার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চিত্ত জয়ে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাল। তারা অন্যান্য বিভেদমূলক পন্থা গ্রহণ করল। তারা প্রাদেশিকতাতেও উৎসাহ দিল। ভারতীয় সমাজে জাতিভেদকেও তারা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণকে এবং উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে

নিম্নবর্ণকে। U.P এবং বিহারে আদালতে উর্দুর বদলে হিন্দি চালু করে। তারা সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টি করল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে Divide and Rule নীতিতে, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের নানান ন্যায্য দাবিকেও বিভেদ সৃষ্টির কাজে লাগানো হল। এতে আলোকপ্রাপ্ত সাম্প্রদায়িকতার একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল।" কিন্তু যে মর্মান্তিক ঘটনা এখানে স্বীকার করতে হবে, তা হল, সাম্প্রদায়িকতা একটা বিরাট আকার নিয়েছিল অনেক আগেই— যদিও এটা স্পষ্টতই আলোক প্রাপ্ত শ্রেণির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অসম্পর্কিত ছিল না। যেমন, পাবনা riot বা Moplah এর ঘটনা তেমন বিস্তৃতভাবে ঘটেনি কারণ এক্ষেত্রে বিভেদকারী বুদ্ধিজীবীশ্রেণি নেতৃত্ব দেয় নি (বাংলা বা মালাবারে)। কিন্তু U.P. এবং Punjab এ হিন্দু মুসলিম আলোকপ্রাপ্তরা প্রায় সমান হওয়ায়, দেশের এই অংশে দাঙ্গা ১৮৮০ সালের পর থেকে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েন হয়তো অংশত এর জন্য দায়ি। যেমন, অযোধ্যার বিস্তীর্ণ অংশে এবং আলিগড় বুলন্দসর অঞ্চলে, অধিকাংশ চাষি হিন্দু কিন্তু তালুকদার এবং জমিদাররা মুসলমান। আবার উত্তরপ্রদেশে শহরাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলিমই হল শ্রমিক, দোকানদার বা ছোটো ব্যবসায়ী। অপরপক্ষে বড়ো ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কার ছিল হিন্দু। পাঞ্জাবে হিন্দু ব্যবসায়ী এবং মহাজন (কুসিদজীবী) ছিল মুসলিম চাষিদের বিরাগভাজন।"

৩.২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

যে ব্যক্তি ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি স্যার সৈয়দ আমেদ খান (১৮১৭-৯৮)। তিনি ছিলেন একজন বড়ো শিক্ষাবিদ এবং সমাজসংস্কারক। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি কোরানের বাণীর সংশ্লেষণে সচেষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি গোঁড়া মুসলিম নেতাদের সঙ্গে রাখেন। এই পর্যায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের গভীর সহযোগিতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি আলিগড়ে Mohammedan Anglo-Orintal College প্রতিষ্ঠার সময় উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই 'donation' নেন। এমনকি 1884 সালে তিনি বলেন—"মনে রাখবেন যে হিন্দু এবং মহম্মদীয় দুটি শব্দ কেবলমাত্র ধর্মীয় পার্থক্য নির্দেশ করে; তাছাড়া, সব মানুষ হিন্দু বা মহম্মদীয় এমনকি খ্রিস্টীয়, যাঁরাই এদেশে বাস করেন, তাঁরা সকলেই একই জাতি (nation)। এবং একই জাতি হিসাবে, তাঁরা সকলে সম্মিলিতভাবে দেশের হিতের জন্য কাজ করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের এই প্রাথমিক আলোকপ্রাপ্ত দশা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, তিনি ভারতে মুসলিমদের অবস্থান বুঝতে পারলেন। তিনি বিশেষত রক্ষণশীল মুসলিম জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এবং ব্রিটিশ নীতির মদতে ঘোষণা করলেন যে হিন্দু ও মুসলিমদের রাজনৈতিক স্বার্থ এক নয় বরং বিভিন্ন দিক অভিসারী। "তিনি একান্তভাবে অনুগত (ব্রিটিশ অনুগত) ছিলেন এবং যখন ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল (১৮৮৫) তিনি এর বিরোধী ছিলেন এবং বেনারসের রাজা শিবপ্রসাদকে নিয়ে একটি বিরুদ্ধ আন্দোলনের আয়োজন করলেন যাতে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া হল। তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন যে, যদি ব্রিটিশ এদেশ ছাড়ে, তবে হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রাধান্যলাভ করবে এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি খারাপ আচরণ করবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে, মুসলিমদের যোগ না দিতে তিনি উপদেশ দিলেন। যদিও অন্যান্য মুসলিম নেতা যেমন বদরুদ্দিন তায়েবজি আবেদন জানালেন নতুন জাতীয়সংস্থায় যোগ দিতে।

৩.৩ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি

কীভাবে সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতা মুসলিমদের মধ্যে বৃদ্ধি পেল? এর অনেকগুলো কারণ— স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ব্যক্তিগত আবেদন ছাড়াও অনেক বৃহত্তর কারণ এর জন্য দায়ী। প্রথমত, আধুনিক শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্পে, হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা অপেক্ষাকৃত পশচাৎপদ থাকায় সমাজে একটা ভারসাম্যহীনতা ছিল। যেহেতু উচ্চ শ্রেণির মুসলমান জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণি ছিল রক্ষণশীল এবং উচ্চ শিক্ষার বিরোধী, তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটেনি। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা যা বিজ্ঞান, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়েছিল, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিস্তৃত না হওয়ায় তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এবং পশ্চাৎপদ হয়েছিল। পরে সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব আবদুল লতিফ, বদরুদ্দিন তায়েবজী এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষা মুসলিমদের মধ্যে প্রসার লাভ করল। কিন্তু আনুপাতিক হারে হিন্দু, পারসি এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলিম শিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। একইরূপে, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসারে মুসলমানরা খুব কমই অংশ নিয়েছিল। শিক্ষিত মানুষ, শিল্পপতি এবং বণিক শ্রেণির স্বল্প সংখ্যার জন্য— প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার শ্রেণি তাদের প্রভাব মুসলিম জনগণের উপর খাটিয়ে যেতে লাগল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ঘটল এর বিপরীত। যাদের মধ্যে জমিদার শ্রেণির নেতৃত্বকে সরিয়ে পেশাদার এবং শিল্পপতি শ্রেণি নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় পশ্চাদপদ হওয়ার জন্য তাঁরা অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যায় সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন পেশায় প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাই ঔপনিবেশিক ভারতে অত্যন্ত উচ্চ প্রতিযোগিতার মধ্যে তাঁরা কর্মের সুযোগ কমই পেয়েছেন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ অফিসিয়াল এবং অনুগত মুসলিম নেতৃত্ব সহজেই শিক্ষত হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করতে পেরেছেন। আর তাই তাঁরা মুসলিমদের জন্য সরকারি পদে বিশেষ ব্যবস্থা চাইল। ''তাই যেখানে দেশে স্বাধীন ও জাতীয়তাবাদী উকিল, সাংবাদিক, ছাত্রসমাজ, বণিকশ্রেণি এবং শিল্পপতিরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসছিল, মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ অনুগত জমিদার এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা তখনও নৈতিক মতকে প্রভাবিত করছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল Mombay যেখানে বদরুদ্দিন তায়েবজি, R.M. Sayani, A. Bhimji এবং নবীন ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলি জিন্নাই ছিলেন প্রধান। তৃতীয়ত ভারতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক অভিমুখ, যাতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিকে একেবারেই পৃথক করে দেখানো হয়েছে, যা কিনা এটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, বিভেদমূলক প্রবণতাকে (হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে) উৎসাহিত করেছে।

মুসলিম সমস্যার প্রতি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবও কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভীতি এবং শঙ্কার প্রতি আদি জাতীয়তাবাদীরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। ''তাই তাঁরা সংখ্যালঘুদের বোঝাতে লাগলেন, যে জাতীয় আন্দোলন তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করবেন, এবং সমস্ত ভারতবাসীকে সাধারণ জাতীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থে একত্রিত করবেন। ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে— দাদাভাই পরিষ্কার আশ্বাস দেন যে, কংগ্রেস কেবলমাত্র জাতীয় বিষয়গুলিই গ্রহণ করবে এবং ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়গুলো নয়। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করল যে, তাঁরা এমন কোনো প্রস্তাব নেবেন না যা কিনা মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকারক। বহু মুসলিম কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসে যোগ দেয়। অর্থাৎ কিনা, আদি জাতীয়তাবাদীরা জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট আধুনিক করতে চেষ্টা করেছিল, তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে যে, ধর্ম এবং সম্প্রদায় কখনই রাজনীতির ভিত্তি হওয়ায় উচিত নয়।

জঙ্গি জাতীয়তাবাদের সময়ে, অবশ্য, জাতীয় একতার বৃদ্ধির সাপেক্ষে একটা মন্দন এল। জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের কাজ এবং ভাবনায় একটা ধর্মীয় প্রবণতা (হিন্দুধর্ম) থেকেই এটা সৃষ্ট হল। অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়

সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের বলে চিহ্নিত করল। "উদাহরণস্বরূপ, তিলকের শিবাজি এবং গণপতি উৎসব, অরবিন্দের ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে বন্দনা এবং জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে দেখা, কালীমাতার সামনে জঙ্গি আন্দোলনকারীদের শপথ গ্রহণ এবং দেশভাগ বিরোধী আন্দোলনের প্রারম্ভে গঙ্গায় ডুব দেওয়া, ইত্যাদির কোনো আবেদন মুসলিমদের কাছে ছিল না।" তবে, অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিম বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিলকের মতো, অনেকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সমর্থন করতেন। অধিকন্তু, তাঁদের কোনো কোনো ধারণা, যেমন ভারতমাতা— ছিল আধুনিক, "being in no way linked to religion," তবু, সব মিলিয়ে, জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝোঁককে উপেক্ষা করা যায় না এবং তাই শিক্ষিত মুসলিমদের একটা বড়ো অংশ জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রইল এবং সহজেই বিভেদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হল।

অবশেষে, দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে অপ্রতুল শিল্পোন্নতির জন্য শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব একটি গভীর সমস্যা হয়ে রইল। সীমিত সংখ্যক চাকরির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রোগের কারণ ঠিকমতো নির্ণয় করার পরিবর্তে অনেকেই আপাত প্রতিকারের কথা চিন্তা করল— সাম্প্রদায়িক, দেশজ (Provincial) এবং জাতির ভিত্তিতে চাকরিতে সংরক্ষণ। আর একটু এগিয়ে বললে, বলা যায়, 'বহু হিন্দু বলতে আরম্ভ করল হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বহু মুসলমান, মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা।"

শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে এইসব সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের পত্তন হল Aga Khan, ঢাকার নবাব এবং নবাব মোহসিন-উল মূলক-এর নেতৃত্বে। 1906 সালের পয়লা অক্টোবর সিমলাতে Lord Minto'র কাছে এক স্মারকলিপিতে আলিগড়বাসী মুসলিম আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাল কারণ সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য তাদের অবদান। মুসলিম লিগ এইসময় বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করল, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ দাবি করল এবং ভাইসরয়ের কাছ থেকে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মতি আদায় করল। ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য ব্রিটিশের হাতে লিগ হল প্রধান অস্ত্র। মুসলিম লিগের প্রসংশাকারীরা জাতীয়তাবাদীদের (এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের) এই দোষারোপকে ক্রোধমিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে অপমান করার চেষ্টা করত যে, সমস্ত আন্দোলন (লিগের), টাই, ব্রিটিশ দ্বারা আয়োজিত এবং Command Performance" এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। (মহম্মদ আলি 1923 সালে কাকিনাড়া কংগ্রেস সিমলা প্রতিনিধিবর্গের সম্পর্কে প্রায়ই এই কথাটি প্রয়োগ করতেন)। 1880 সাল থেকে সৈদয় আহমেদ গোষ্ঠী মুসলিমদের জন্য মনোনিত বিশেষ প্রতিনিধিদের কথা বলে আসছেন। এবং যতই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠল, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ততই জোরালো হল। এই ঘটনাবলির মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল, তবুও সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্পর্কে ব্রিটিশের উৎসাহদান ছিল "অনস্বীকার্য ঘটনা"। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং মুসলিম ও হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বার্থের ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য ছিল, যা কিনা "প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই" মুসলিম লিগের দ্রুত সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। মুসলিম লিগ মুসলিম জনগণের কাছে গিয়ে তাদের নেতা হিসাবে দায়িত্ব নিল। কিছু আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম যদিও লিগের সঙ্গে সহমত ছিল না। প্রথমত উগ্র জাতীয়তাবাদী আহবার আন্দোলনের শিক্ষিত তরুণ মুসলিমেরা আলিগড়ের আনুগত্যের রাজনীতি (Loyalist Politics) এবং বড়ো নবাব এবং জমিদারদের অপছন্দ করত। এই আন্দোলনের বড়ো নেতাদের মধ্যে মওলানা মোহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমাম, মওলানা জাফর আলি খান এবং মাজহার-উল-হক উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত দেওবন্দ (Deoband) স্কুল পরিচালিত একশ্রেণির ঐতিহ্যশালী মুসীলম

পণ্ডিত ব্যক্তিও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রদর্শন করতেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন, তরুণ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি কায়রোর আল আজহার (Al Azhar) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯১২ সালে তিনি Al Hilal নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যাতে তিনি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে, আজাদের মতো কিছু মানুষ বাদে অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিমই রাজনীতিতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে এমনকি মুসলিম লিগেরও মোহমুক্তি ঘটল ১৯১১ সাল নাগাদ। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে পুনরায় ঘোষণা করলেন। মুসলিম রাজনীতিকদের উচ্চ শ্রেণির কাছে এটা একটা বিরাট আঘাত। "দিল্লি ভিত্তিক মুঘল-মহিমা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে মুসলিম মতামত প্রশমিত হল না এবং বস্তুতপক্ষে ইতালীয় এবং বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১২) তুরস্ককে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় তারা ব্রিটিশদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হল। এছাড়া ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রত্যাখান এবং ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে কানপুরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মঞ্চকে (Platform) ভাঙ্গা নিয়ে দাঙ্গাও উল্লেখযোগ। তথাকথিত "তরুণ তুর্কিরা" ১৯১২ সালে মুসলিম লিগের দখল নিল এবং দলকে অধিকতর উগ্রপন্থার দিকে চালিত করল। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কিছু সমঝোতা আর ক্রমবর্ধমান ইসলামবাদী অভিমুখে দল চালিত হল।" ১৯১৩ সালের মার্চে মুসলিম লিগ এমনকি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল, যাতে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক স্বশাসন দাবি করাই তাদের লক্ষ্য বলা হল। এভাবে লিগ এবং কংগ্রেস সাময়িকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি হল।' খিলাফত আন্দোলন এবং সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার একটা পর্যায় আরম্ভের সূচনা হল।" সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং সহযোগিতার অনেক প্রচেষ্টা মুসলিম সুবিধাবাদ দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। মুসলিম লিগ "devide and rule"এর ছন্দে নেচে উঠল এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে রাজনীতির খেলা খেলল পৃথক রাষ্ট্র পাওয়ার জন্য যদিও মুসলিমদের একটি ছোটো অংশ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থেকে গেল।

৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি

Bipan Chandra : Nationalism and Colonialism in modern India, New Delhi, 1977.

Bipan Chandra : Communalism in modern India, New Delhi, 1993.

একক ৪ ❑ ভারতের জাতীয় আন্দোলন : পরিবর্তনশীল অবস্থা

গঠন ঃ

৪.১ ভূমিকা
৪.২ নরমপন্থী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এবং চরমপন্থার বৃদ্ধি
৪.৩ বঙ্গভঙ্গ
৪.৪ স্বদেশি আন্দোলন : তার ঝোঁক, স্বদেশি এবং বয়কট
৪.৫ সন্ত্রাস
৪.৬ চরমপন্থার প্রভাব
৪.৭ "মোর্লি-মিন্টো সংস্কার" : প্রেক্ষাপট
৪.৮ ১৯০৯ সালের সংস্কার (Reforms)
৪.৯ মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা
৪.১০ গ্রন্থসূচি
৪.১১ প্রশ্নাবলি

৪.১ ভূমিকা

এই অংশে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তনশীল অবস্থা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, আদি কংগ্রেসের নরম পন্থা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হল, এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এর জনপ্রিয়তা নষ্ট হল। দলের মধ্যে একটি চরমপন্থী দল আত্মপ্রকাশ করল এবং বিপুল জনসমর্থন পেল, বিশেষত স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যা কিনা বঙ্গ বিভাগের (১৯০৫) বিরুদ্ধে আয়োজিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা সংকট দেখা দিল যা পরে ভারতের মুসলিম লিগ নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৪.২ নরমপন্থী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এবং চরমপন্থার জন্ম

স্পষ্টতই নরমপন্থী আদি কংগ্রেসী রাজনীতির কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। নব্যশিক্ষিত অথচ বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগণতান্ত্রিক সংবিধানের এবং নরমপন্থীদের চাপ-সমঝোতা-চাপ (PCP) অবস্থানের জন্য হতাশ হচ্ছিল এবং আরও বলা যায় যে তাঁদের অধিকাংশ দাবিই ছিল অপূর্ণ। তাঁরা একটা সমান্তরাল সংস্কৃতি এবং আদর্শগত আন্দোলন থেকে প্রেরণা এবং আদর্শ আহরণ করল এবং নরমপন্থী নেতাদের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করল। অবশ্য কার্জন-প্রশাসন এর ভ্রান্তিই তাঁদের অনুভূতিকে তীব্রতর করল এবং চরমপন্থী রাজনীতির পথকে প্রশস্ত করল।

কার্জনের ভাইসরয় থাকাকালীন, প্রশাসনে নতুন পরিস্থিতি এবং নীতি, জাতীয় সংগ্রামে একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তিত রূপ দিল। কার্জন, এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রকৃত সংঘর্ষ তিনটি পরপর ঘটনার মধ্য দিয়ে এল : ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে পরিবর্তন, ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বাংলা ভাগ। প্রথম দুটি ব্যবস্থায় সংবিধিবদ্ধ দুটি সংস্থার উপরে রাজকীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ এল এবং ফলে জাতীয়তাবাদীদের একটি বড়ো অংশের বিবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কিন্তু বঙ্গ বিভাগের মতো অনভিপ্রেত ব্যবস্থা স্পষ্টতই বিপুল প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাল। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন।

৪.৩ বঙ্গবিভাগ

বঙ্গ বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে, বিশেষত প্রসাশনিক গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক দিক, এর সৃষ্টি থেকে যা অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে প্রশাসনিক কারণে (সুবিধার্থে) বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন হ্রাসের প্রস্তাব ১৮৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে উঠেছিল যা' পরে পরিপূরক হিসাবে আসাম এবং শ্রীহট্টের পৃথকীকরণের প্রস্তাবরূপে ১৮৭৪ সালে দেখা গেল এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে চিফ্ কমিশনার উইলয়াম ওয়ার্ডের প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রাম ডিভিসন, ঢাকা এবং ময়মনসিংহকে তাঁর প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার। বস্তুত ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক দিকই ছিল নিশ্চিতরূপে প্রশাসনিক মহলের মুখ্য বিবেচ্য। ওয়ার্ডের প্রস্তাব লেফটেনান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেসারের সমর্থন পেল। পরে লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সম্পাদিত আকারে হোম সেক্রেটারি Risley কর্তৃক ঘোষিত হল। (Risly's letter of ডিসেম্বর ৩, ১৯০৩)। এই প্রাথমিক পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন সম্মিলিতভাবে ফ্রেসার, বিজলি এবং কার্জন এবং অবশেষে ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হল। এই সময় থেকে ব্যবস্থাটির পিছনে রাজনৈতিক বিবেচনা পরিষ্কার হল। নতুন পূর্ববঙ্গ এবং আসাম যা ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজসাহী ডিভিসনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহও এর সঙ্গে গেল। গোপন সরকারি নথিপত্র থেকে যা জানা যায় তাতে এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ে। ওই সময়ে এবং পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু-মুসলিম টানাপোড়েনে ইচ্ছাকৃত উৎসাহদানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তার সমর্থন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় কার্জন প্রদত্ত বহু আলোচিত বক্তৃতা থেকে পাওয়া যায়, যাতে তিনি পূর্ববঙ্গীয় মুসলিমদের এই সম্ভাবনার কথা বলেন যে, প্রাচীন মুসলমান ভাইসরয় এবং রাজাদের দিন থেকে তারা যা পাননি এখন তারা একত্রিত হয়ে তাই পাবেন। কিন্তু এই সময় প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মূলত পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (সুমিত সরকার)। এটা যথেষ্ট পরিষ্কার বোঝা যায়, হোম সেক্রেটারি H.R. Risley'র ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ ডিসেম্বরের দুটি note থেকে। কার্জন আরও নির্দিষ্টভাবে বলেন : "আমাদের প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টি এই যে কংগ্রেসদলের কাছে এই প্রস্তাব পছন্দ নয়।"

৪.৪ স্বদেশি আন্দোলন : ঝোঁক, স্বদেশি এবং বয়কট

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হল অভূতপূর্ব। প্রথমে বাঙালিদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগ্রত হল যাকে

চালনা করে এগিয়ে নিয়ে গেল শিক্ষিত বাঙালি ''ভদ্রলোক''। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাগ্রত আত্মবিশ্বাস এবং অহঙ্কারে কার্জনের সমস্ত পরিকল্পনাকে জাতীয় অপমান বলে ধরা হল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গত কুড়ি বছরের মৃদু বিক্ষোভ যা সম্ভবত একটি সীমিত অংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং যার ফলে প্রাপ্তি ছিল যৎসামান্য তার উপর একটা অসন্তোষ দেখা দিল কিন্তু জাতিগত বিভেদ পন্থা এবং শ্বেত ঔদ্ধত্যের প্রতি অসন্তোষ অনেক বিস্তৃতভাবে অত্মপ্রকাশ করল। তৃতীয়ত, ক্রমশ একটি তীব্র আন্দোলন সমগ্র বাংলায় গড়ে উঠল বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে— যা ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ের স্বদেশি আন্দোলন। যদিও হিন্দু 'ভদ্রলোক' সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল এই আন্দোলনের দুর্গ, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে জনতার ভিন্নতর অংশও এতে অংশ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় রাজনীতিতে এই আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা এনে দিল এবং জাতীয় রাজনীতিকে আরও জঙ্গি আন্দোলন এবং চরমপন্থার দিকে নিয়ে গেল।

প্রথম দিকে অবশ্য, দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রচলিত নরমপন্থা। যেমন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার, সভা, প্রতিবাদলিপি প্রেরণ এবং বড়ো সম্মেলন, ইত্যাদি করা হল। এইসব প্রচলিত যখন ব্যর্থ হল, তখন নতুন পথের সন্ধান আরম্ভ হল। তখনই এল ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন, যার প্রস্তাব প্রথম এল ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাপ্তাহিক পত্রিকা সঞ্জীবনী (Sanjivani)-তে এবং তারপর তা' গৃহীত হল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা— অবশ্য কিছু দ্বিধার পর।

সরকারি আধিকারিক দ্বারা চাপ এবং ভীতি প্রদর্শনের পর, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বয়কটের আওতায় এল। এর সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ব্যাপক আবেদন— রাখী বন্ধন এবং অরন্ধন। কিন্তু বঙ্গে এই আন্দোলনের মধ্যে ক্রমশ আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিল। আপাতদৃষ্টিতে দুটি শ্রেণি দেখা গেল ''With some, boycott became the starting point for the formulatin of a whole range of new methods and the abrogation of the Partition Came to be regarded as no more than the pettiest & narrowest of all political objects' (Aurobindo Ghosh in April-1907) অর্থাৎ কিনা বয়কট হল নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য একটা নতুন পন্থার শুরু এবং বঙ্গভঙ্গ রদকে মনে করা হল একটি সংকীর্ণ এবং সামান্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এটা হল ''স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের একটি ধাপমাত্র। সুরেন্দ্রনাথের মতো, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতে, বয়কট হল, ম্যাঞ্চেস্টারের আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে বঙ্গভাগ রদের জন্য একটা শেষ প্রচেষ্টা। প্রতিষ্ঠিত নরমপন্থী নেতারা কোনোক্রমে ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর শিক্ষায়তন বয়কট ফিরিয়ে নিলেন এবং মর্লির সেক্রেটারি অফ স্টেট নিয়োগের পর, তাঁর মহৎ উদারপন্থী সুনামের সুযোগে 'আবেদন নিবেদনের' নিরাপদ পাড়ে ফিরে এল।

অধ্যাপক সুমিত সরকার, পরিচিত নরমপন্থী প্রতিক্রিয়া ছাড়াও, স্বদেশি আন্দোলনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক লক্ষ করেছেন। প্রথমটিকে বলা যায় ''গঠনমূলক স্বদেশি''-এর অর্থ ''বৃথা এবং আত্ম-অবমাননামূলক আবেদন নিবেদনের রাজনীতি (Mendicant Politics) পরিত্যাগ করে, স্বদেশি শিল্প, জাতীয় বিদ্যালয় গঠন এবং গ্রামোন্নয়ন ও পুনর্গঠনের চেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার এবং সতীশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন এই পন্থার সমর্থক এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। তাঁর ''স্বদেশি সমাজ'' বক্তৃতায় (১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গঠনমূলক কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। যেমন অধ্যাপক সরকার বলেছেন, ''অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতি তার প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে ১৯০৬ সেপ্টেম্বর। বরিশালে, ৮৯টি সালিশী সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫২৩টি গ্রাম্য বিবাদের মিমাংসা করেছেন বলা হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার গ্রাম-সমিতি বঙ্গদেশে কাজ করছে বলে ১৯০৭-এর এপ্রিলে একটি প্রচারপত্রে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ঝোঁকটি দেখা গেল উত্তেজিত

শিক্ষিত বঙ্গদেশীয় যুবকদের মধ্যে, যারা তথাকথিত গঠনমূলক স্বদেশি মতবাদে খুশি ছিল না এবং তাই আরও রাজনৈতিক চরমপন্থা গ্রহণে আগ্রহী হল। বিপীন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং যুগান্তর দলের তরুণরা এই শ্রেণিভুক্ত। ১৯০৬ সাল থেকে, তাঁরা সবাই স্বরাজ এর জন্য সংগ্রামের ডাক দিচ্ছিল। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, এই দলের পার্থক্য কেবল তাঁদের দাবির মধ্যেই ছিল না; তাঁদের মধ্যে, তিলকের মতো কেউ কেউ, ১৯০৭ সালে কিছু কর্মেও সম্মত ছিল। "আরও মৌলিক পার্থক্য ছিল প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতিগত এবং এই সময়ে ১৯০৭-এর এপ্রিলে তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় পর পর কয়েকটি রচনায় অরবিন্দের কাছ থেকে এল সেই বিখ্যাত বক্তব্য, যা কিনা পরে "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এর নীতি" হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ আশ্রম এবং স্বাদেশিকতা এবং আত্মোন্নতির 'ধারণা যথেষ্ট নয় বলে, তিনি "সুসংগঠিত এবং অবিশ্রান্ত বয়কট" এর ডাক দেন যাতে ব্রিটিশ পণ্য পরিত্যাগ, সরকারি শিক্ষা, বিচার এবং প্রশাসনকে বয়কট করা (সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি শিল্পের উন্নতি, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং সালিশি কোর্ট স্থাপন করা) এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন, ইংরেজ অনুগতদের 'সামাজিক বয়কট' এবং ব্রিটিশ দমননীতি সহ্যের সীমা ছাড়ালে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন করা। বস্তুতপক্ষে, এই সময়েই আমরা পাই সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ গান্ধিবাদী রাজনৈতিক প্রোগ্রামটিকে, অবশ্যই অহিংসার মতটি বাদে। তৃতীয়ত, স্বদেশি ভাবনার মধ্যে এই সময় তীব্র হিন্দু পুনরুত্থানের ঝোঁক দেখা গেল, যা, উপরোক্ত দুটি ঝোঁককে কখনও কখনও ছাড়িয়ে যেত। এরই ফলে, স্বদেশিরা প্রায়শই মন্দিরে শপথ নিত, জাতীয় শিক্ষাতে অংশত পুনরুত্থান সূচি ছিল, আর ছিল শিবাজি উৎসব যাতে মূর্তি পূজাও হত। এইভাবে, মৌলিক রাজনীতি এবং আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদ একসঙ্গে মিশে গেল। স্বদেশি আন্দোলনে, বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক ঝোঁক পরস্পর অসম্পর্কিত ছিল না— নরমপন্থী আবেদন নিবেদনকারী থেকে ব্যক্তিগত চরমপন্থা পর্যন্ত। অধ্যাপক সুমিত সরকার যেমন বলেছেন, "The Central historical Problem of the period is why this became so since an explanation in terms of the external factor of British repression alone hardly sufficient." অধ্যাপক সরকার ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত সময়ে, স্বদেশি আন্দোলনের নৈতিক উপাদানের (Principle Components) শক্তি এবং আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এর উত্তর খুঁজে পান : বয়কট, জাতীয়শিক্ষা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন জনসংযোগ পদ্ধতি।

৪.৫ চরমপন্থী

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চরমপন্থার দিকে পরিবর্তন। যেহেতু বংলা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত, চরমপন্থাও এখানে প্রথম প্রকাশিত হল। প্রাথমিক বিপ্লবী দল গড়ে উঠল ১৯০২ সাল নাগাদ, মেদিনীপুর এবং কলকাতা উভয় জেলাতেই অনুশীলন সমিতি নামে। এর প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন, প্রমথ মিত্র এবং অরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রারম্ভে অবশ্য, সমিতির কাজকর্ম, শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষাতেই অধিক সীমাবদ্ধ ছিল, কোনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ছিল না। ১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করলেন এবং তার পরেই কয়েকজন ঘৃণিত (hated) ইউরোপীয় (যেমন পূর্ব বঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলারকে) হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা হল। এই সময়ে, হেমচন্দ্র কানুনগো বিদেশে গেলেন সেনা এবং রাজনৈতিক ট্রেনিং নিতে এবং ফিরে এসে, কলকাতার শহরতলি, মানিকতলার একটি বাগান-বাড়িতে একটি সম্মিলিত ধর্মীয় বিদ্যালয় এবং বোমার কারখানা স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম

বোস এবং প্রফুল্ল চাকি, ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন এবং কয়েকজন নির্দোষ ইউরোপীয়কে হত্যা করল। এবং হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অরবিন্দসহ পুরো দলটাই ধরা পড়ল। পূর্ববঙ্গে, অবশ্য, পুলিন দাসের সুসংগঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে চরমপন্থা অনেক বেশি দক্ষ ভূমিকা পলন করছিল। এটা জানা প্রয়োজন যে, "Terrorism" কথাটা একটি অপব্যবহৃত শব্দ। কারণ শহরে গণঅভ্যুত্থান বা গ্রামীণ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ, কোনোটিই এই চরমপন্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে চরমপন্থা বলতে, অত্যাচারী সরকারি অফিসারের বা দেশদ্রোহীর হত্যা, অর্থের প্রয়োজনে 'স্বদেশি' ডাকাতি, বা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির সঙ্গে সেনা-ষড়যন্ত্র। যেমন, অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, "Revolutionary terrorism was to Constitute in the end the most Substantial legacy of Swadeshi Bengal, Casting a spill on the minds of radical educated youth for at least a generation or more" অর্থাৎ বিপ্লবী জঙ্গি আন্দোলন অবশেষে স্বদেশি বাংলার একটা উত্তরাধিকার পরবর্তী অনন্ত একটা মৌলিক শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের উপর রেখে গেছে।

৪.৬ জঙ্গি আন্দোলনের প্রভাব

১৯০৫-১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের অন্যান্য অংশে চরমপন্থার কী প্রভাব পড়েছিল? স্পষ্টতই এই প্রভাবের পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন অঞ্চলিক এবং স্থানীয় উপাদানের উপর নির্ভর করেছে কিন্তু একটি সাধারণ উপাদান ছিল বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশে বিশেষত বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তর প্রদেশে, বিভিন্ন চাকুরি এবং পেশায় সংখ্যাধিক শ্রেণি হিসাবে শিক্ষিত বাঙালিদের জনপ্রিয়তার ক্রমাগত হ্রাস। এর ফলে চরমপন্থা ওই সব প্রদেশে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং উচ্চশ্রেণি-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হল।

"এইসব ঝোঁক মানুষকে মৌলিক ভাবনা থেকে দূরে রাখল, যে ভাবনা মূলত বাংলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন, ডেলি তাঁর Study of Allahabad, এ দেখিয়েছেন, মদনমোহন মালব্য বা মোতিলাল নেহরুর মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতারা এমনকি এই সময়েও প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চিন্তা করতেন। "চরমপন্থা তাই কেবল যথেষ্ট মারাঠি এবং বাঙালি অধ্যুষিত বেনারসেই একটি প্রচণ্ড শক্তি হয়ে উঠেছিল।"

পাঞ্জাবের অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন। এখানে ১৮৯০ সাল থেকেই শিক্ষা, বিমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা গঠনমূলক স্বদেশি ধারা ছিল। বিদেশি যন্ত্রের বয়কট আরম্ভ হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এই সব ক্ষেত্রে আর্যসমাজীরা ছিল বিশেষভাবে সক্রিয় এবং যা ছিল জঙ্গি হিন্দু চেতনা দ্বারা চিহ্নিত। ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের চরমপন্থার দিকে পাঞ্জাবের স্বল্প সময়ের ঝোঁককে অংশত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দ্বারা বিবেচনা করা যায়। Punjab National Bank এবং Bharat Insurance এর পরিচালনা নিয়ে Lajpat এবং Hans Ray-এর নেতৃত্বাধীন আর্য সমাজী এবং Lala Harkishan Lal-এর কর্তৃত্বাধীন ব্রাহ্ম-সমর্থক দলের মধ্যে একটা কলহ ছিল।

লাজপৎ গ্রুপ তাঁদের সংবাদপত্র, "পাঞ্জাবী" প্রকাশ করতে আরম্ভ করল ১৯০৪ সালের অকটোবর, যা কিনা, লালা হরকিষেণ লাল Tribuine এর বিরুদ্ধতা করার জন্য। যাই হোক, চরমপন্থার পাঞ্জাবী সংস্কারণটি ১৯০৬ এর শেষ পর্যন্ত হয়ে রইল নরমপন্থী এবং ব্রিটিশের কাছ থেকে ক্রমাগত প্ররোচনার ফলেই ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গেল। "পাঞ্জাবের বুদ্ধিজীবী মহল ক্রোধে জ্বলে উঠল যখন "Punjabi" পত্রিকাকে জাতিগত অবমাননাকর লেখার দায়ে আদালতে নেওয়া হল, যখন কিনা, একই সময়ে ভারতীয়দের

সম্পর্কে কুৎসিত গালাগালি দেওয়া হচ্ছিল Civil and Military Gazelle পত্রিকায়, যা, সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের অগোচরে রইল।" পাঞ্জাবের চাষিরা শিখ, মুসলিম এবং হিন্দু নির্বিশেষে লায়ালপুর এর চারদিকে অবস্থিত চেনার খাল কলোনি সম্পর্কে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হল এবং আরও বেশি জঙ্গি হয়ে উঠল। তিনটি বিষয় বিশেষভাবে পাঞ্জাবের চরমপন্থাকে ধীরে ধীরে স্তিমিত করল—

(ক) রাজনৈতিক সভার উপরে নিষেধাজ্ঞা, সরকারি দমন এবং লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংয়ের (deportation) নির্বাসন।

(খ) চেনাব কলোনি বিল সম্পর্কে কিছু সরকারি ছাড় এবং জলকরের হ্রাস।

(গ) ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নির্বাসিতদের মুক্তি প্রদান।

মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্রেও চরমপন্থা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব অর্জন করল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, দুটি অঞ্চল বিশেষভাবে চরমপন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল— অন্ধ্রের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং তিরুনেলভেলি জেলা। Washbrook এ ব্যাখ্যা এ সম্পর্কে একান্তই দলাদলিপূর্ণ—মাখলাপুর, এগমোর এবং মফস্সলের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিবাদ। ব্যাখ্যাটি, বৃহদংশে অতিসরলীকৃত। বন্দেমাতারম আন্দোলন যা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজামুন্দ্রী, কাকিনাড়া এবং মসলিপত্তমে, তা' M. Krishna Rao-এর আমন্ত্রণে ১৯০৭ এর এপ্রিলে বিপিন পালের আগমনে একটা বড়োরকমের ব্যাপকতা পেয়েছিল। দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে ছাত্র ধর্মঘট হল এবং অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তিরুনেলভেলিতে পরিস্থিতি ব্রিটিশ দৃষ্টি ভঙ্গিতে ছিল ভয়ঙ্কর। বিশেষ সক্রিয় কেন্দ্রটি ছিল তুতিকোরিন বন্দর। ১৯০৬-এর অকটোবরে ইতিমধ্যেই একটি স্বদেশি Steam Navigation Company স্থাপিত হয়েছে যা' এই বন্দরনগরী থেকে কলম্বো পর্যন্ত স্টিমার চালাচ্ছে। "মৌলিকতার দিকে একটা দ্রুত অগ্রগতি 1908 এর জানুয়ারী থেকে স্পষ্ট হল, সুব্রমানিয়াম শিবার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, যিনি মাদুরার অনুন্নত সমাজের একজন বিক্ষোভকারী। এর সঙ্গে ছিলেন চিদাম্বরম পিল্লাই। এঁরা স্বরাজের বাণী প্রচার করলেন, বয়কট আন্দালনকে প্রসারিত করলেন এবং যদি পুলিশ-রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়, মাঝে মাঝেই অধিকতর অহিংস পদ্ধতির উপর জোর দিচ্ছিলেন। বিদেশি মালিকানার Coral Coton Mills-এ একটি বড়ো ধরনের ধর্মঘট হল। "মার্চের মাঝামাঝি সভাসমিতি বন্ধের ব্রিটিশ প্রচেষ্টায় এবং শিবা ও পিল্লাইকে কারাদণ্ড দেওয়ায়, দোকানপাট বন্ধ হল, পৌরসভা এবং প্রাইভেট সুইপাররা প্রতিবাদ ধর্মঘট করল, তুতি কোরিনের গাড়িচালকরা ধর্মঘট করল, পৌরসভার অফিস, আদালত এবং তিরুনেভেলরীর থানা আক্রান্ত হল উভয় শহরে ১১ থেকে ১৩ মার্চ (১৯০৮) গুলি চলল।" এই সময় থেকে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত তামিল কবি সবুমানিয়া ভারতী, তামিল বিপ্লবীদের মধ্যে একটা দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব প্রয়োগ করেন।

মহারাষ্ট্রে চরমপন্থা তিলকের মতো বিশাল নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বিস্তৃত হল। সেখানে মৌলিক সাংবাদিকতা দ্রুত বর্ধিত হল এবং স্বরাজ ও বয়কট সম্পর্কিত প্রচার উৎসাহ ব্যাঞ্জকভাবে তিলক এবং তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রচারিত হল। "মহারাষ্ট্র এবং বম্বে শহরে ১৯০৭ এর শেষ এবং ১৯০৮ এর শুরুতে তিলকীয় সক্রিয়তার সঙ্গে দুটো বড়ো ধরনের নতুন প্রচেষ্টার সূত্রপাত হল— মদের দোকানে পিকেটিং এবং মূলত মারাঠী শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।" সাধারণভাবে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে চরমপন্থী নেতৃত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু বাংলার উগ্রপন্থা সম্পর্কে লেখা তাঁর কেশরি নিবন্ধের জন্য যখন তিলকের বিচার হয় এবং তাঁকে শাস্তি হিসাবে ছ-বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল, তখন বম্বেতে শ্রমিকশ্রেণি ক্রোধে ফেটে পড়ল। সুমিত সরকারের মতে, এটা "আমাদের ইতিহাসের একটা বড়ো সন্ধিক্ষণ"।

ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সব ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কংগ্রেস সম্মেলনেও প্রতিফলিত হয়েছে এবং অবশেষে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে একটা ভাগ হল। অনিল শীল, চরমপন্থীদের এই দলকে বলেন "দলত্যাগীদের একটি সর্বভারতীয় মেলবন্ধন "যারা স্থানীয়ভাবে তাদের যুদ্ধে পরাজিত।

এই assessment সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করে। প্রথমত, কংগ্রেস তখনও এমন একটা সঠিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি যার দখল নেওয়া লাভজনক (worth "capturing)। দ্বিতীয়ত চরমপন্থীরা বিশেষত বাংলা, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ সালে তাঁদের আঞ্চলিক অবস্থানে পরাজিত হয়নি। তৃতীয়ত কিছু নরমপন্থী নেতা নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেন। তবে এইরকম প্রচেষ্টা শীঘ্রই নরমপন্থী নেতাদের বর্ধমান অনমনীয় মনোভাবে পরিবর্তিত হল। ইংল্যণ্ডে ক্ষমতা দখলকারী লিবারাল সরকারের কাছ থেকে (reforms) আশাই, নরমপন্থী নেতৃত্বের এই হঠাৎ অনমনীয়তার মুখ্য কারণ।

৪.৭ "Morley-Minto সংস্কার" : (প্রেক্ষাপট)

১৯০৫ সালে বয়কট আন্দোলন সরকারকে হতবুদ্ধি করল। বয়কট্, এই প্রথম, ব্রিটিশ প্রভুদের দেখিয়ে দিল যে, বাংলা কেবল আবেদন করা ছাড়াও অন্য পন্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যাঘাতই হল 'বয়কট' যা আমাদের জনগণ গ্রহণ করেছিল। যদিও বয়কট হল একটা আত্মরক্ষামূলক আন্দোলন কিন্তু প্রকৃত অর্থে আপসমিমাংসার একটা অস্ত্র। যে আপস-মিমাংসা এক্ষেত্রে চাওয়া হয়েছে, তা হল বঙ্গভঙ্গ রদ।

যখন বয়কট আরম্ভ হল, তখন জাতির ক্ষোভ ছিল নির্দিষ্টভাবে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে নয়। বিদেশি প্রভুত্বকে অস্বীকার করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু তা ছিল জনগণের একটা আদর্শ। কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রায়োগিক অংশ নয়। আত্মোন্নতি, স্বনির্ভরতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা উদ্দীপনা আমাদের দেশে জাগ্রত হচ্ছিল এবং সেই উদ্দীপনা বা মানসিকতাই বয়কটের মাধ্যমে রূপ নিল। সরকার আতঙ্কিত হল এবং জাতীয়তাবাদীদের উপর এমন দমন-পীড়ন আরম্ভ করল যা আগে দেখা যায়নি। সরকারি পীড়ন কেবলমাত্র আমাদের দেশপ্রেমের অহংকার এবং জাতীয়তাবোধকেই পরম ক্রোধের সঙ্গে জাগ্রত করল। বিশেষত Sir Bampfylde Fuller-এর তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গে সরকারি নীতি, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাল।

লর্ড কার্জনের পদত্যাগ এবং ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড মিন্টোর নিয়োগ এবং মর্লির ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসাবে নিয়োগ-এর ফলে এইরকম একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হল যে, ভারত সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ভারতবাসীর অসন্তোষ এর কারণ দূর করে তাদেরকে শান্ত করা যায়। কিন্তু এই আশা শীঘ্রই ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। মিন্টো এবং মর্লি উভয়েই তাঁদের উদারনীতির দ্বারা ভারত শাসনের পরিবর্তে দমন পীড়নের প্রচলিত নীতির পথ ধরলেন। লর্ড মিন্টো ফুলারের "Favourite wife" নীতিই কেবল অনুসরণ করে চললেন না, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বীজও বপন করলেন। পুনরায়, মিন্টোর হাতেই ভারতে দমনমূলক আইন সবচেয়ে খারাপ রূপ এবং মাত্রা পেল। সরকারের কণ্ঠরোধী নীতি মানুষকে সাংবিধানিক পথে তাদের অভিযোগ প্রকাশের সমস্তরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় মনুষের ক্ষোভ স্বভাবতই গোপন ষড়যন্ত্র এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পথ নিল। এভাবে যথাসময়ে সরকারি দমন নীতির অবশ্য ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে, গোপন উগ্রপন্থী

বোমার রূপ ধরে এল, চলল গোপন হত্যা। চরমপন্থার বৃদ্ধির মূল পাপ, তাই সরকারের দ্বারেই নিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু একবার উগ্রপন্থা আরম্ভের পর সরকার অন্য কোনো আপাত অস্ত্র না পেয়ে অধিকতর সংগঠিত পদ্ধতিতে দমন পীড়নের মাধ্যমে এর প্রতিকারের পথ নিল। এর পর মিন্টো ও মর্লির তত্ত্বাবধানে ভারত সরকার কয়েকটি সাংবিধানিক সুবিধা দিল যাতে নরমপন্থী নেতারা এবং অন্যান্য ক্রিয়াশীল শক্তি সরকারের অনুগমন করে। এইসব সুবিধাই ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (Morley-Minto Reforms Act of 1909)।

৪.৮ 1909 এর সংস্কার

১৯০৫ সাল থেকে ভারত সরকারের নীতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। একদিকে দমন-পীড়ন অন্য দিকে আপস। বয়কট এবং স্বদেশি অন্দোলনের দ্রুত বিস্তার ব্রিটিশ জাতিকে বিস্মিত করেছিল। ভারত সরকার রাষ্ট্রনেতাদের উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করে জনতার অসন্তোষ দূর করতে না পেরে চিরাচরিত দমননীতি গ্রহণ করল। দেখা গেল ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ১৯০৮ এবং ১৯১০ এর Press act দ্বারা, জনপ্রিয় নেতাদের নির্বাসিত করা, অনেককে বন্দি করা, সভা সমিতি নিষিদ্ধ করা এবং আরও অনেক ধরনের দমনমূলক কাজ। কিন্তু দমননীতি সর্বদাই একটা মৃদু প্রতিষেধক এবং সেই সময় মিন্টো এবং মোরলির চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝত না। ফলত ভারত সরকার সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিল, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রইল প্রচলিত আইনগুলিও। ভাইসরয় এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে সাংবিধানিক পরিবর্তন দ্বারা সরকার ভারতীয় নরমপন্থীদের এবং ভারতীয় অভিজাতদের সমর্থন পাবেন। ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে কংগ্রেস সংসদে প্রতিনিধিত্বের প্রসার চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ব্যস্ত পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনের সেক্রেটারি অফ স্টেটের পরিষদেও। মিন্টো এবং মোর্লি ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদারপন্থী মতাবলম্বী এবং উভয়েই এই প্রস্তাবগুলি কিছু অংশে পুরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রস্তাব রচনা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়া, অংশত সরকারের সঠিক ইচ্ছার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তাই অবশেষে ১৯০৯ সালে আইন প্রণয়ন সম্ভব হল।

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাঁদের ক্ষমতার প্রসার। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৬০ করা হল। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলার জন্য সর্বোচ্চ ৬০ করা হল। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলার জন্য সর্বোচ্চ ৫০, যা সংযুক্ত প্রদেশ (VP) এবং পূর্ব বঙ্গের জন্যও বরাদ্দ হল। অন্যদিকে পাঞ্জাব এবং বার্মার জন্য ৩০ পর্যন্ত। মোর্লি স্থির করলেন যে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি সংখ্যাধিক্যের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই সংখ্যাধিক্য জরুরি। ফলে সদস্যসংখ্যার তাৎক্ষণিক বৃদ্ধি হল ১২৪ থেকে ৩৩১ এবং আবশ্যিক সদস্য সংখ্যা ৩৯ থেকে হল ১৩৫ যাঁরা পূর্বেই নির্বাসিত। নির্বাচনীবিধি এমনভাবে করা হল যাতে সবস্বার্থবাহী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বই নিশ্চিত হয়। একটি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তে মুসলিমদের স্বনির্বাচিত পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি মেনে নেওয়া হল। এবং আরও সুবিধা এভাবে দেওয়া হল যে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব, সাম্রাজ্যের প্রতি সেবা এবং সংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সভা নির্বাচিত করতে হবে প্রাদেশিক পরিষদ দ্বারা যেখানে বেসরকারি সদস্যরাই কেবল ভোট দেবেন। ১৯১২ সালের পরিবর্তনের পর তাতে ছ'জন কাউন্সিল

সদস্যকে নেওয়া হল, কম্যান্ডার ইন্ চিফ্, হেড্ অফ দি প্রভিন্স যেখানে ৩৩ জন মনোনীত সদস্য ছিল, ২৪ জনের বেশি সরকারি নয়, ব্যবস্থা পরিষদ ১৩ জন সদস্যকে নির্বাচিত করত জমিদার দ্বারা ৬ জন এবং চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা ২ জন। বাংলায় ছিল, প্রকৃতপক্ষে ২৮ জন নির্বাচিত সদস্য। ২০ জন মনোনীত (১৬ সরকারি), ২ জন বিশেষজ্ঞ এবং ৩ জন কাউন্সিলর সবক্ষেত্রেই, নির্বাচিত মৌলিক সভা ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত, কেবল Burma ছিল ব্যতিক্রম।

ব্যবস্থাপক সভার কার্য প্রসারিত করা হল যাতে আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হল। গভর্নর জেনারেলের ব্যয়প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করা হবে এবং তারপর এর উপর যে কোনো সদস্য ট্যাকসের পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব বা নতুন ঋণ বা স্থানীয় সরকারকে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব আনতে পারবেন যা কিনা আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত আছে। এইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিবৃতিটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন এবং যে কোনো সময়ে প্রস্তাব আনা যাবে। এই প্রস্তাবের ফল হল, সরকার যাকে যথাযথ মনে করবেন সেই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা। চূড়ান্ত বাজেট কাউন্সিলে পেশ করা হবে 24শে মার্চ এর মধ্যে। যখন যে কোনো পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হবে। এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু কোনো নতুন প্রস্তাব আনা যাবে না। মিলিটারি, রাজনৈতিক এবং কিছু প্রাদেশিক বিষয়, রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে ইত্যাদির উপর কোনো আলোচনা হবে না। আরও বলা হল, Governor-General in Council যার উপর আলোচনা চাইবেন না, তার উপর আলোচনা নিষিদ্ধ। বিদেশি শক্তির সঙ্গে বা ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে বা বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা চলবে না।

আরেকটি পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা এই কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন তা হল জনস্বার্থ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব আনা যাবে। যদিও সেসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচ্য সূচি থেকে বাদ দেওয়া হবে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সভাপতি (পরিষদ) যে কোনো প্রস্তাবকে আলোচনার জন্য গ্রহণ নাও করতে পারেন, যা জনস্বার্থ সম্পর্কিত নয় বা প্রাদেশিক পরিষদে আলোচনার উপযুক্ত নয়। প্রস্তাব সংশোধিত হতে পারে এবং গৃহীত হলে তা কেবলমাত্র সুপারিশের স্তরে থাকে।

১৯০৯ সালের আইনের সঙ্গে একটি ঘোষণা ছিল, যাতে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে একজন ভারতীয়কে নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে সেক্রেটারি অফ স্টেট একটি নতুন ব্যবস্থায় তাঁর নিজের পরিষদে দুজন ভারতীয়কে নিয়োগ করেন। গভর্নর জেনারেলের পরিষদে কোনও মুসলিমকে না নিয়ে কেবলমাত্র একজন হিন্দুকে নিয়োগের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অসুবিধা ছিল। কিন্তু এই পদক্ষেপ জাতিগত সাম্য নীতি এবং ১৮৩৩ সালের নীতিপূরণের একটি সিদ্ধান্তমূলক ইঙ্গিত। সংস্কার প্রকল্পের রূপকাররা এই ক্রিয়ার সঙ্গে ছিলেন সংগতিপূর্ণ। ভারতে একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকার বা পার্লামেন্ট গঠন করার ধারণা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁরা মনে করতেন ক্রমবর্ধমান অরাজক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের উচ্চশ্রেণির অনুগতদের রাজশক্তির সমর্থনে সংঘবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা থেকেই বিরত হওয়া উচিত নয়। এই মনোভাব নিয়েই, মিন্টো Lytton এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করলেন যাতে বড় প্রদান (chiefs) বা বড়ো জমিদারদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন যা কিনা একই রকম সংস্থা যাতে স্বার্থবাহী প্রতিনিধিদের বহুল সংখ্যায় প্রদেশগুলিতে নিয়োগ করা হয়েছে। ধারণাটা ছিল, আইন প্রণয়নের পূর্বে স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ভারতীয় অভ্যাসকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা, কিন্তু হোমরা চোমরা মোড়ল বা জমিদাররা তাদের সমকক্ষ নয় এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে বসতে অস্বীকার করল এবং প্রস্তাবটি অবশেষে একটি Imperial Council of Chiefs এর রূপ দেওয়ার জন্য চাপ আরম্ভ হল, যার গঠন সেই সময়ে যথাযথ বিবেচিত হল না। কিন্তু ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে

এমনকি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এই সব মানুষকে তালিকাবদ্ধ করার ধারণার দিকে এটা একটা নিশ্চিত পদক্ষেপ। অধ্যাপক A. B. Keith-এর দৃষ্টিতে, ১৯০৯ সালের সংস্কার তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তা নিজ সরকার গঠনের প্রচারে বা প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের একটা ভালো দিক হল আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয় সদস্যদের প্রকৃত প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে ততটা নয়, যতটা হয়েছিল বিলগুলোর প্রচার এর মাধ্যমে, যা বিভিন্ন কমিটির দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তাঁদের পরামর্শের ফলেই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল এবং সিদ্ধান্তগুলি ফলপ্রসূ হয়েছিল। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ১৯১৭ সালের শেষ পর্যন্ত গৃহীত ১৬৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ৭৩টির সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং প্রদেশগুলোও একই রকম ফল দেখিয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে, ১৯০৯ সালের সংস্কার ছিল সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক। স্বায়ত্ব শাসনের নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং তাই চরমপন্থীরা সংস্কারকে অপমানজনক মনে করল নরমপন্থীরা সন্তুষ্ট ছিল না, কারণ সংস্কার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের অস্বীকার করেছিল এবং এইভাবে ভারতবাসীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবিকে অস্বীকার করেছিল। মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সংস্কারে স্বীকৃতি পাওয়ায়, নরম এবং চরমপন্থী উভয়েই তীব্র অপমানিত হল। ১৯০৯ সালের আইনের আর একটি দুর্বল দিক হল প্রশাসন এবং ব্যবস্থাবিভাগ উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্বের অভাব। ব্যবস্থাপকদের দেশের প্রশাসনের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল একচেটিয়া প্রশাসনিক বিভাগের এবং তারা কোনোভাবেই তাঁদের নীতি এবং কার্য পদ্ধতির জন্য ব্যবস্থাবিভাগের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না এমনকি মুসলিমরা, যারা প্রথমে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিল ১৯০৯ সালের আইনে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতির জন্য, তারাও হতাশ হল এই দেখে, যে ব্যবস্থাপরিষদের প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষমতা নেই এমনকি একজন প্রশাসকের (Executive)-এর সাপেক্ষেও।

৪.৯ মুসলিম লিগের স্থাপনা

শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে এইসব সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের পত্তন হল Aga Khan, ঢাকার নবাব এবং নবাব মোহসিন-উল মূলক-এর নেতৃত্বে। ১৯০৬ সালের পয়লা অকটোবর সিমলাতে Lord Minto'র কাছে এক স্মারকলিপিতে আলিগড়বাসী মুসলিম আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাল কারণ সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য তাদের অবদান। মুসলিম লিগ এইসময় বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করল, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ দাবি করল এবং ভাইসরয়ের কাছ থেকে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মতি আদায় করল। ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য ব্রিটিশের হাতে লিগ হল প্রধান অস্ত্র। মুসলিম লিগের প্রশংসাকারীরা জাতীয়তাবাদীদের (এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের) এই দোষারোপকে ক্রোধমিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে অপমান করার চেষ্টা করত যে সমস্ত আন্দোলন (লিগের) টাই, ব্রিটিশ দ্বারা আয়োজিত এবং "Command Performance"এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। (মহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে কাকিনাড়া কংগ্রেস সিমলা প্রতিনিধিবর্গের সম্পর্কে প্রায়ই এই কথাটি প্রয়োগ করতেন)। 1880 সাল থেকে সৈয়দ আহমেদ গোষ্ঠী মুসলিমদের জন্য মনোনিত বিশেষ প্রতিনিধিদের কথা বলে আসছেন। এবং যতই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠল, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ততই জোরালো হল। এই ঘটনাবলির মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল, তবুও সাম্প্রদায়িকতা

বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্পর্কে ব্রিটিশের উৎসাহদান ছিল "অনস্বীকার্য ঘটনা"। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং মুসলিম ও হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বার্থের ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য ছিল, যা কিনা "প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই" মুসলিম লিগের দ্রুত সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। মুসলিম লিগ মুসলিম জনগণের কাছে গিয়ে তাদের নেতা হিসাবে দায়িত্ব নিল। কিছু আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম যদিও লিগের সঙ্গে সহমত ছিল না। প্রথমত উগ্র জাতীয়তাবাদী আহবার আন্দোলনের শিক্ষিত তরুণ মুসলিমেরা আলিগড়ের আনুগত্যের রাজনীতি (Loyalist politics) এবং বড়ো নবাব এবং জমিদারদের অপছন্দ করত। এই আন্দোলনের বড়ো নেতাদের মধ্যে মওলানা মোহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমাম, মওলানা জাফর আলি খান এবং মাজহার-উল-হক উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত দেওবন্দ (Deoband) স্কুল পরিচালিত একশ্রেণির ঐতিহ্যশালী মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রদর্শন করতেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন, তরুণ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি কায়রোর আল আজহার (Al Azhar) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯১২ সালে তিনি Al Hilal নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যাতে তিনি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে, আজাদের মতো কিছু মানুষ বাদে অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিমই রাজনীতিতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে এমনকি মুসলিম লিগেরও মোহমুক্তি ঘটল ১৯১১ সাল নাগাদ। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে পুনরায় ঘোষণা করলেন। মুসলিম রাজনীতিকদের উচ্চশ্রেণির কাছে এটা একটা বিরাট আঘাত। "দিল্লিভিত্তিক মুঘল-মহিমা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে মুসলিম মতামত প্রশমিত হল না এবং বস্তুতপক্ষে ইতালীয় এবং বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১২) তুরস্ককে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় তারা ব্রিটিশদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হল। এছাড়া ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে কানপুরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মঞ্চকে (Platform) ভাঙ্গা নিয়ে দাঙ্গাও উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত "তরুণ তুর্কিরা" ১৯১৩ সালে মুসলিম লিগের দখল নিল এবং দলকে অধিকতর উগ্রপন্থার দিকে চালিত করল। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কিছু সমঝোতা আর ক্রমবর্ধমান ইসলামবাদী অভিমুখে দল চালিত হল।" ১৯১৩ সালের মার্চে মুসলিম লিগ এমনকি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল, যাতে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক স্বশাসন দাবি করাই তাদের লক্ষ্য বলা হল। এভাবে লিগ এবং কংগ্রেস সামরিকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি হল।" খিলাফত আন্দোলন এবং সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার একটা পর্যায় আরম্ভের সূচনা হল।"

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

Amalesh Tripathi : The Extremist Challenge Calcutta 1967.

Sumit Sarkar : Swadeshi Movement in Bengal 1903-08, New Delhi 1979.

Bipan Chandra : Communalism in Modern India

Ram Gopal : Indian Muslisms — A political History (1858-1942) Bombay 1959.

৪.১১ Exercise

1. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে বিভিন্ন ঘটনার সাপেক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করো।
2. জাতীয় তাত্ত্বিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কেমব্রিজের তাত্ত্বিকদের ধারণা সম্পর্কে কীভাবে প্রতিবাদ জানান? কীভাবে Marxist এবং Subalern (নিম্নবর্গীয়) ঐতিহাসিকেরা জাতীয়তাবাদীতত্ত্বকে সংশোধন করেন?
3. আদি কংগ্রেসের প্রকৃতির পরিমাপ কীভাবে করবে? নরমপন্থীদের পদ্ধতি কি "সাধুবৃত্তি"?
4. ১৮৯০ সাল থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য তোমার মতে দোষী কে? মুসলিম বিভেদ পন্থা কি ব্রিটিশের "divide and rule" নীতির সহায়ক হয়েছিল?
5. বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ এর বৃদ্ধিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
6. ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের কারণ এবং ফল কী?
7. স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলনের ধারা নির্ণয় করো।
8. কীভাবে "স্বদেশী" এবং "বয়কট"কে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের আবাহন (Battle cry) বলা যায়।
9. মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পিছনে কোন নীতিগুলি কী? এর সীমাবদ্ধতাগুলো কী ছিল?
10. ১৯০৬ সালে ভারতের মুসলিম লিগ গঠনের জন্য দায়ি, গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করো।

ইতিহাস

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

তৃতীয় পত্র

পর্যায়—২

একক ১ □ ভারতীয় অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

গঠন ঃ

১.১ ভূমিকা

১.২ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১.৩ সামাজিক প্রতিক্রিয়া

১.৪ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১.৫ ১৯১৭ সালেই মন্টেগু ভারত সফরে আসেন

১.৬ রাওলাট অ্যাক্ট

১.৭ দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান

১.৮ ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ

১.৯ আঞ্চলিক বিভিন্নতা

১.১০ প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অগ্রগতি

১.১১ অনুশীলনী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভূমিকা

১৯১৪ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে অবধারিতভাবে ভারত তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যদিও যুদ্ধ ঘোষণার আগে ভারতীয়দের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয় নি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ভারতের মানুষ ও সম্পদকে এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে ভারতীয়দের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দশ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তির পক্ষে লড়াই করেন এবং বহু সহস্র প্রাণ হারান। ভারতের ১২৭ মিলিয়ন পাউন্ড এই যুদ্ধের জন্য ব্যয় হয় ভারতের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পায় ৩০ শতাংশ এবং এই চাপটা এসে পড়ে প্রধানত সাধারণ মানুষের উপর। তা সত্ত্বেও ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষকে সমর্থন করেন। মনে মনে অনেকেই জার্মানীর বিজয় কামনা করলেও প্রকাশ্যে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য দেখান ও সক্রিয় সমর্থন করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। প্রতিদানে স্বভাবতই তাঁরা আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধান্তে শাসন সংস্কার করা হবে এবং ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের ঘোষণাতেও পদানত জাতিগুলির স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি ছিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ হতে দেরী হল না। মৌখিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন ইচ্ছাই ব্রিটিশ শাসকদের ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) সকল অর্থেই ভারত ইতিহাসে এক নতুন দিক্‌নির্দেশক। অধ্যাপক সুমিত সরকার

মন্তব্য করেছেন—"The World War I brought about really crucial changes in the political life and socio-economic conditions of India."

১.২ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেশবাসীকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফাটকাবাজী ও বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। বিশেষত কাপড়, ওষুধ, চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া হয়ে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সর্বভারতীয় স্তরে মূল্যসূচক ছিল ১৯১৩ সালে ১৪৩, ১৯১৪ সালে ১৪৭, ১৯১৭ সালে ১৯৬ এবং ১৯২০ তে ২৮১। অংশত করবৃদ্ধি এবং অংশ পরিবহণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে ১৯১৮-১৯ এবং ১৯২০-২১ সালে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তদুপরি, যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য চালান দেওয়া হত। তাতেও খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। মোটা চাল, গম, বাজরার মূল্য ভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পায়।

কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ কৃষকের কোন সুবিধা হয়নি। কেননা, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক মহাজনদের কাছে স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুর খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি আহত হয়। আবার খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্যিক শস্যের (Cash-Crops) মূল্য সমহারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ধনী কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

শিল্প শ্রমিক শ্রেণিও সমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে শিল্পজাত জিনিসের আমদানী বন্ধ ছিল। তার ফলে এই সময় দ্রুত শিল্প বিস্তার ঘটে ও স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাগত দিক থেকে এরা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের পর আবার বিদেশ থেকে জিনিস আসতে শুরু করে। দেশের ভিতরেও বড়ো আকারে বিদেশী বিনিয়োগ হয়। এ সবের দরুণ স্বদেশী শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে। প্রতিবাদে শ্রমিকরা লড়াকু মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ধর্মঘট হয়। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকট ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের উপরও যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করেছিল। বি. আর. টমলিনসনের হিসাব অনুযায়ী ১৯১৪ সালে ভারত সরকারকে ৮০,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য এবং ১,৩০,০০০ ভারতীয় সৈনিক ও যুদ্ধ কর্মীর ব্যায়ভার বহন করতে হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভারত সরকারকে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। লর্ড বার্কেন হেড মন্তব্য করেন—"Without India, the war would have been immensely prologed, if inded without her help it would have been brought to a victorious conclusion"। এর জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যয় বৃদ্ধির চাপ শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। নানাভাবে করভার বৃদ্ধি করা হয়। দারুণভাবে ভূমি রাজস্ব, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি পায়, আয়কর চালানো হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের উপর। তাছাড়া, প্রায় বাধ্যতামূলক যুদ্ধ ঋণ চালু করা হয়।

সব কিছু মিলিয়ে, প্রায় সমস্ত শ্রেণি মহাযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১.৩ সামাজিক প্রতিক্রিয়া

১৯১৪ সাল থেকে প্রধানত গ্রামাঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর জন্য বাধ্যতামূলক সংগ্রহ (recruitment) শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে সমাজে ক্রমশই প্রতিবাদ ধূমায়িত হয়ে থাকে।

যুদ্ধ শেষে দূর দূর যুদ্ধ প্রান্তর থেকে যে সব সৈন্যরা দেশে ফিরে এসেছিল, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নতুন যুগের উন্মাদনার সংবাদ। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলার কবি কাজী নজরুলের নাম যিনি সমাজতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ভাবধারার প্রথম উদ্বোধিত হন মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ প্রান্তরক্ষেত্রে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষত যুবকদের মধ্যে যুদ্ধের মারণলীলার ফলে পাশ্চাত্যের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার প্রতি মোহভঙ্গ হয়। বিশ্বের নানা প্রান্তে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সব আন্দোলন শুরু হয় তাও তাদের উদ্দীপ্ত করে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং বলশেভিকবাদের সাফল্যের সংবাদ ঘুরপথে ভারতে এসে পৌঁছলে জগৎ পরিবর্তনের স্বপ্ন জোরদার হয়ে ওঠে যদিও কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে ধারণা তখনও ছিল অস্পষ্ট।

১.৪ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধজনিত বিশেষ অর্থনৈতিক চাপের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর কাছে কিছুটা দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের বিশেষত শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সরব অংশকে খুশী করার তাগিদে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালেই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকতর দাবী জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। 'মডারেটরা' জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঘোষিত লক্ষ্ণৌ চুক্তি দ্বারা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানায়; হোমরুল আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে বিশেষত হোমরুল লীগ নেত্রী অ্যানি বেসান্তের গ্রেফতারের (এপ্রিল, ১৯১৭) তা তীব্র আকার ধারণ করে।

তৎকালীন ভাইসরয় উদারনৈতিক লর্ড চেমসফোর্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য সওয়াল করেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহল এই দাবীর সারবত্তা স্বীকার করলেও এই ক্ষমতার হস্তান্তরকরণ বহুবিধ বিষয় সযত্নে বিবেচনাপূর্বক ধীরে ধীরে করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধারও তারা বিরোধী ছিলেন। আর এক বিখ্যাত উদারনৈতিক এডুইন মন্টেগু ভারতসচিব হিসাবে দেখা দেবার পর হাউস অফ কমন্স-এ এক ঘোষণায় (আগস্ট, ১৯১৭) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতে এক দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন অধিকার দিতে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হন। নিঃসন্দেহে এই ঘোষণা ঐতিহাসিক যদিও তার কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

১.৫ ১৯১৭ সালেই মন্টেগু ভারত সফরে আসেন

মন্টেগু ও চেমসফোর্ডের যৌথ রিপোর্টের (১৯১৮) ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে নতুন শাসনসংস্কার আইন চালু করে তা মন্ট-ফোর্ড-সংস্কার বলে পরিচিত।

এই শাসন সংস্কারের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও আয় সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, রেলপথ, মুদ্রা, পররাষ্ট্রনীতি, শুল্ক, ডাকব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরপক্ষে, প্রাদেশিক সরকাগুলির হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, রাজস্ব প্রভৃতি দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ (Central Executive Council) :

নতুন সংস্কার আইন অনুযায়ী সাতজন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয়। সাতজন সদস্যের মধ্যে অন্তত তিনজন সদস্য হবেন ভারতীয়। কার্যনির্বাহী শাসন পরিষদের সাহায্যে বড়লাট নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। তিনি ভারতসচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, ভারতীয় আইনসভার কাছে নয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভা (Central Legislature) :

কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে (বা Council of State) ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন বড়লাট কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী ৩৪ জন সদস্যকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নকক্ষের (Legislative Assembly) ১৪০ জন (পরে ১৪৬ জন) সদস্যের মধ্যে ৪০ জন মনোনীত এবং ১০০ (পরে ১০৬) জনকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা। উভয়কক্ষেই সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। শুধু মুসলিম নয়, (পাঞ্জাবে) শিখ ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হলেও, কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভাই সারা ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারত। কোন কোন বিষয়ে আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য ছিল। বড়লাট ভেটো প্রয়োগ করে যে কোন আইন প্রণয়ন বন্ধ রাখতে পারতেন। এছাড়া, বড়লাট অর্ডিন্যান্স বলেও আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (Dyarchy) :

প্রদেশগুলিতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা স্থাপিত হয়। আইনসভা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন নির্বাচিত এবং ৩০ জনকে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলির দায়িত্ব সংরক্ষিত (reserved) এবং হস্তান্তরিত (transfered) বিষয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন, অর্থ, বিচার, শ্রম প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল সংরক্ষিত। এইগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁর কার্যনির্বাহী সভার উপর। কার্যনির্বাহী সভায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের হার ছিল আনুপাতিক। অপরপক্ষে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং দপ্তরগুলির আর্থিক বরাদ্দ কম অথচ জনসাধারণের প্রত্যাশা বেশি সেগুলি ছিল "হস্তান্তরিত" বিষয় এবং এগুলি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর। তাঁরা আইনসভার কাছে তাঁদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। এইভাবে ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

সমালোচনা :

যুদ্ধোত্তরকালে স্বায়ত্তশাসনের যে স্বপ্ন ভারতীয় দেখেছিলেন, মন্ট-ফোর্ড সংস্কার আইন পাশ হলে দেখা গেল যে ভারতীয়দের অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কার আইনকে তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক (inadequate, unsatisfactory and disappointing) বলে অভিহিত করেন। অ্যানি বেসান্ত একে দাসত্বের পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন। এম. এ. জিন্না মুসলিমদের স্বতন্ত্র ভোটাধিকার প্রাপ্তির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, প্রাদেশিক আইনসভায় বিদেশি পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের মনোনীত সদস্য হিসাবে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়। একমাত্র মডারেটরাই এই সংস্কার আইন সমর্থন করেন। কংগ্রেসের ভিতর সংখ্যাল্প হওয়ার দরুণ তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গঠন করেন। তবে এই সংস্কার আইনের সামান্য ভাল দিকও ছিল। প্রথমত, প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ভোটাধিকারের কিছুটা সম্প্রসারণ। এর ফলে এক বিরাট সংখ্যক ভোটদাতা সুযোগ পায় যদিও তা মোট প্রাপ্তবয়স্কের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। তাছাড়া, প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকায় দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার সূচনা হয় এবং ভারতীয়রা সংসদীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের কিছু পরিমাণ সুযোগ পান।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই আইনের মধ্যে ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও অব-উপনিবেশনায় (decolonisation) প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর দেখতে পেয়েছেন। বিপরীত মেরুতে কিছু ঐতিহাসিক এই আইনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্য তার অনুকূল্যে প্রভাবশালী অংশকে টেনে আনার সুচতুর কৌশলের উল্লেখ করেছেন। আবার, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ভারতীয় সহযোগী সন্ধানের তাগিদ ঔপনিবেশিক সরকারকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১.৬ রাওলাট অ্যাক্ট

১৯১৭ সালে বিচারপতি এম. এ. ইট. রাওলাটের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের পর থেকে ভারতে যেসব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কাজকর্ম হয়েছে তা পর্যালোচনা ও দমনের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এটি সিডিশন কমিটি নামে পরিচিত। আসলে অর্থনৈতিক সংকটজনিত পরিস্থিতিতে এবং স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পূরণ না হওয়ায় গণমানসে যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, তার থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যে সহজ ব্যাপার হবে না তা বুঝতে সরকারের বাকী ছিল না। এই বিক্ষোভ দমন করতে দরকার ছিল কঠোর স্বৈরাচারী ক্ষমতা। এই উদ্দেশ্যেই রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ ও রাজদ্রোহ দমনের নামে দুটি বিল উত্থাপিত হয় (মার্চ, ১৯১৯)। এই দুটিই একত্রে রাউলাট অ্যাক্ট নামে পরিচিত এই আইনের ধারাগুলি হল :

(১) সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে সন্দেহ করলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল বন্দী করে রাখা যাবে।

(২) যে কোনো ব্যক্তির গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে।

(৩) যে কোনো ব্যক্তির বাড়ী বিনা পরোয়ানার তল্লাসী করা যাবে।

(৪) জুরীদের বাদ দিয়ে বিশেষ আদালতে রাজনৈতিক মামলার বিচার করা যাবে।

(৫) এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করা যাবে না।

(৬) এই আইনের বলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

উপসংহার ঃ

একদিকে ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সীমাবদ্ধতা ও রাউলাট অ্যাক্টের মত কালা আইন এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক অসন্তোষ—এই দুয়ে মিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে গণআন্দোলনের যুগ শুরু হল। আবির্ভাব ঘটল সর্বভারতীয় রাজনীতি। ক্ষেত্রে এক নতুন ব্যক্তিত্ব— মোহনদাস কমরচাঁদ গান্ধী ও তাঁর সঙ্গে এক নতুন যুগের।

১.৭ দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান

ভূমিকা ঃ

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ প্রবর্তন ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর বৃহদায়তন শিল্পের প্রথম প্রবর্তন ঘটে। অধিকাংশ শিল্পই ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এইসব শিল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়;— (১) বাগিচা শিল্প (চা, কফি, রবার ও নীল); (২) পাটকল; (৩) খনি; (৪) ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য কলকারখানা।

এর পাশাপাশি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আকারে ঊনিশ শতকের শেষের দিক থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম-ভারতের পার্সি ও গুজরাটি সম্প্রদায়, রাজস্থানের মাড়োয়ারি, উত্তর-ভারতের ভাটিয়া ও দক্ষিণ-ভারতের চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের বাণিজ্য ও মহাজনি সূত্রে হাতে সঞ্চিত প্রচুর অর্থ ছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এইসব পুঁজিপতি সম্প্রদায়ই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা নেয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তার খাপখাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। পুরনো বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির জীর্ণদশা উপস্থিত হলে নতুন মেট্রোপলিটান বন্দর শহর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে তারা যুক্ত হয়। উদীয়মান ভারতীয় শিল্পপতিশ্রেণির সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সম্পর্ক গোড়ার দিকে শত্রুতামূলক ছিল না। বরঞ্চ তারা ব্রিটিশ পুঁজি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তিতাকারীর (middleman) ভূমিকা পালন করে।

যে শিল্পে দেশীয় পুঁজির সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ ঘটেছিল তা হল সূতীবস্ত্র শিল্প। অধিকাংশ সূতাকলই ছিল পশ্চিম-ভারতে অবস্থিত। ১৮৫৩ সালে পার্শি শিল্পপতি কাউসাজী নানাভাই দাভর বোম্বাইতে প্রথম সূতাকল স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালে বোম্বাইতে সূতাকলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দশ। ১৮৫৯ সালে রণছোড়লাল ছোটেলাল আমেদাবাদে প্রথম সূতাকল স্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালে নাগপুরে জে. এন. টাটা কর্তৃক এমপ্রেস কটন মিলের প্রতিষ্ঠা আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোলাপুর, সুরাট এমনকি উত্তর ভারতের কানপুরেও সূতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলপথের সম্প্রসারণ ও সরকারের অনুকূল ট্যারিফ নীতি এই শিশুশিল্পকে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। চীনে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এই শিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। সূতাকলের সংখ্যা ১৮৭৯ সালে ৫৬, ১৯০৫ সালে ২০৫-এ পৌঁছায় এবং প্রায় দু লক্ষ শ্রমিক এতে কর্মরত ছিল।

অধ্যাপক এম. ডি. মরিসের হিসাব অনুযায়ী ১৯১৩ সালে বিশ্ব বাজারে ভারত ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম সূতীবস্ত্রের রপ্তানীকারক।

সূতীবস্ত্র ছাড়াও, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের চা শিল্প, অভ্র ও কয়লাখনি, জাহাজ নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল এবং মীর্জা ইস্পাহানির মত ভারতীয় পুঁজিপতিরা চা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন। জয়চাঁদ সান্যাল ও মতিলাল শীলের উদ্যোগ প্রথম ভারতীয় চা কোম্পানী দ্য জলপাইগুড়ি টী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮৭৮ সালে।

১৮৯৭ সালের এক সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩১১-টি অভ্রখনির মধ্যে ৬৯টি ছিল ভারতীয় মালিকাধীন। সব অভ্রখনিই ছিল হাজারীবাগ জেলার কোডার্মা অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ৪৬টিই ছিল বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের সাহানা পরিবারের মালিকাধীন।

বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী স্যার পি. সি. রায় দেশীয় পুঁজিপতিদের সাহায্যে ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর পত্তন করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৬ সালে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা ও মাদ্রাজের বণিক চিদাম্বরণ পিল্লাই দ্য স্বদেশী স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণ ও পরিবহণ শিল্পের পাঁচ শতাংশ মূলধন ছিল ভারতীয়দের হাতে।

ভাল সংখ্যক কয়লাখনিও ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার, টেগোর এন্ড কোম্পানী কয়লাখনিতেও বিনিয়োগ করে। উনিশ শতকের শেষের দিকের একটি সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী, রানীগঞ্জ অঞ্চলে ৪০টি এবং ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের ৬২টি ছোট কয়লাখনি ভারতীয়দের হাতে ছিল। ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বাহ্নে এই ছোট খনিগুলির মালিকরা ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন গঠন করেন।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের তীব্র বাধা দান সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং ও ভারী শিল্পেও ভারতীয়রা কিছু বিনিয়োগ করেছিল। ১৮৬৭ সালে কিশোরীলাল মুখার্জী হাওড়ার শিবপুরে আয়রন ফাউন্ড্রি স্থাপন করেন যেখানে কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি হত। ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার মার্টিন এবং বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার স্যার রাজেন মুখার্জী মিলিতভাবে মার্টিন এন্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী (পরবর্তীকালে নাম হয় মার্টিন বার্ন এন্ড কোম্পানী) কালক্রমে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতে পরিণত হয়। ইউ. পি. তে নওল কিশোর লক্ষ্ণৌ আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠান করেন।

১৯০৭ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের ইস্পাত শিল্পে এক যুগান্তর আসে। এটির মূল পরিকল্পনা ছিল স্যার জামশেদজী টাটার। ১৯১১ সাল থেকে নিয়মিত উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে প্রথম বিশুদ্ধ ইস্পাত তৈরি হয়। এই কারখানা স্থাপনের আগে জামশেদজী ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ঝরিয়ায় উচ্চমানের কয়লা ও ময়ূরভঞ্জে আকরিক লৌহের সন্ধান পান।

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-০৮) দেশীয় শিল্পে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। অনেকগুলি নতুন সূতাকল স্থাপিত হয়, যার বেশ কয়েকটি ছিল পূর্ব-ভারতে। এছাড়া নতুন নতুন নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ দেখা যায় যেমন হোসিয়ারী, সাবান, চিনি, নুন, তেল, দেশলাই, চর্মজ দ্রব্য, কাগজ, গ্লাস, সিমেন্ট ও ঔষধ শিল্প। এগুলির মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক উদ্যোগই দীর্ঘস্থায়ী ও বাণিজ্য সফল হয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের বৈচিত্র্যীকরণে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় প্রথম ভারতীয় শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা রমেশচন্দ্র দত্ত।

পাশাপাশি, লর্ড কার্জনের আমলে এই একই সময় কেন্দ্রীয় সরকারে একটি পৃথক শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর স্থাপিত হয়। তার ফলেও শিল্পায়নে উৎসাহ এসেছিল।

১.৮ ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ

এসব সত্ত্বেও অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারত শিল্পে অত্যন্ত পশ্চাদপদ ছিল এবং এই ছোট শিল্পক্ষেত্রও প্রায় পুরোপুরি ব্রিটিশদের প্রাধান্যধীন ছিল। ভারতীয় পুঁজির ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা নানাভাবে ভারতীয়দের এই অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

দাদাভাই নৌরজী ও গোখলের মত প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতীয় উদ্যোগের অভাবকে প্রধানত সঞ্চিত পুঁজির অভাব হেতু বলে মনে করতেন।

আবার অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিলের মতে ভারতীয়দের নতুন আবিষ্কারের ইচ্ছার অভাব ও ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুকতাই শিল্পে পশ্চাদগামিতার কারণ। যাদের হাতে নগদ অর্থ সঞ্চিত হল, তারা শিল্পে বিনিয়োগ করতে ভয় পেত, বরঞ্চ জমিদারী কেনার মত যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত আয়ের সুযোগ ছিল সেখানেই তারা বিনিয়োগ করত।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই দুটির কোনটিকেই প্রধান কারণ বলে গণ্য করেন না। অধ্যাপক অমিয় বাগচী সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় উদ্যোগের প্রধান বাধা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি। তারা ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের বৃহৎ বাজার হিসাবেই দেখতে চেয়েছিল। নানাভাবে তারা বাধাদানের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় শিল্পগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়; অধিকাংশ ব্যাঙ্ক বিদেশী নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভারতীয়দের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া অসুবিধা হত এবং পেলেও চড়া হারে সুদ দিতে হত এবং নানা ধরনের কাগজপত্র ও জামিন দিতে হত।

যে কোনো শিল্পায়নের গোড়ার দিকে প্রাথমিক শর্ত হল সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া; কিন্তু অধিকাংশ নতুন ভারতীয় শিল্পকেই সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত জিনিসের উপর কোনো শুল্ক বসানো হত না; ভারতীয় পণ্যের উপর ধার্য করা শুল্কের ক্ষেত্রেও কোন ছাড় দেওয়া হত না।

পরিবহণ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হত। আমদানীকৃত জিনিসের ক্ষেত্রে রেলওয়ে ট্যারিফ কম করে ও দেশীয় পণ্যের ক্ষেত্রে বেশি করে ধার্য করা হত।

কারখানায় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র ইংল্যান্ড থেকে চড়া শুল্ক দিয়ে আমদানী করতে হত কিন্তু ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে সামান্য হারে শুল্ক ধার্য করা হত।

১.৯ আঞ্চলিক বিভিন্নতা

ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ ও ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভবের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল তার আঞ্চলিক বিভিন্নতা। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল পশ্চিম ভারত বিশেষত বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং তা মূলত সূতীবস্ত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল।

শিল্পায়নে বড়ো ভূমিকা ছিল পার্সি, গুজরাটি এবং মাড়োয়ারি বণিকদের যারা মূলত পশ্চিম ভারতবাসী ছিল

এবং আকিং ও সূতীবস্ত্রের ব্যবসায় প্রভূত বিত্ত অর্জন করা। এই লভ্যাংশ দ্বারা সূতাকল ও অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করে।

পশ্চিম ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেযত ব্যাপক তুলা চায বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাও বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করে।

সর্বোপরি, বস্ত্রশিল্পের একটি বৃহৎ আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল যার চাহিদা ছিল সুনির্দিষ্ট। কাজেই, বহির্বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার উপর এই শিল্পকে নির্ভর করতে হত না।

সন্দেহ নেই, বস্ত্রশিল্পকেও সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সাফল্য ল্যাংকাশায়ারের মিল মালিকদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিলাত থেকে আনীত বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক সরকার তুলে নেয়। তার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সবের ফলে কিছুটা অগ্রগতির পর ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আর এগোতো পারেনি। আবার এটাও সত্যি যে বোম্বাই-এর ভারতীয় বণিক ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অন্তত কিছুটা পরিমাণ কাজ চলা গোছের বোঝাপড়া ছিল। তুলনায় পূর্ব-ভারতে শিল্পে ভারতীয়রা পিছিয়ে পড়ার বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

প্রথমত পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনেক আগে পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি অনেক দৃঢ় প্রোথিত ছিল। তার ফলে পূর্ব-ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশরা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল।

তাছাড়া, পূর্ব-ভারতের দু'টি প্রধান শিল্প চা এবং পাট মূলত রপ্তানী নির্ভর ছিল এবং এদের বিশেষ দেশীয় বাজার ছিল না।

পূর্ব-ভারতের সম্পন্ন ও শিক্ষিত শ্রেণি তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী ছিল জমিদারী কেনা, চাকুরি ও চিকিৎসা ও আইন ব্যবসার মত স্বাধীন বৃত্তিতে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাও কারখানা স্থাপনের চাইতে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী আগ্রহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামদুলাল সরকার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষের নাম করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, পূর্ব-ভারতীয় পুঁজিপতি ও ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মধ্যে আদৌ কোন বোঝাপড়া ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজরা পথ রুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থানীয় মাঝারি ব্যবসায়ীরা গড়ে তোলে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স।

১.১০ প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অগ্রগতি

সামগ্রিকভাবে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সূতাবস্ত্র এবং কয়েকটি ছোট-খাট ক্ষেত্র বাদ দিলে ভারতীয় উদ্যোগীদের তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না। মৌলিক ও ভারী শিল্পের অভাবে ভারতে শিল্প অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে (১৯১৪-১৮)।

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে বিদেশ থেকে আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু জিনিসের বাড়তি উৎপাদন দরকার হয়। এই চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বভাবতই ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিমহল এর সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ব্রিটিশ সরকারও এই সর্বপ্রথম তাদের নানাবিধ উৎসাহ ও সুযোগ দিতে এগিয়ে আসে।

১৯১৫ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের পর সরকার ভারতের শিল্প সম্ভাবনাকে উন্নত

করার জন্য একটি আত্মসচেতন ও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করবে। এরপর ১৯১৬ সালে সরকার স্যার টমাস হল্যান্ডের নেতৃত্বে একটি শিল্প কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন ভারতে শিল্প প্রসারের জন্য সরকারকে "উৎসাহব্যঞ্জক হস্তক্ষেপ" নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির মধ্যে হল—(১) সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ভিত্তিতে পৃথক শিল্পবিভাগ স্থাপন; (২) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৩) কারিগরী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। ১৯১৮ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টেও ভারতে শিল্প বিকাশের জন্য সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। ইতিমধ্যেই সরকার শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দেন। ভারত সরকার আমদানী শুল্কের হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ ভাগ ধার্য করে (১৯১৬)। চিনিশিল্পকে উৎসাহ দিতে আমদানী করার চিনির উপর ১০% শুল্ক চাপান হয়। লোহা ও ইস্পাতের উপরও বাড়তি আমদানী শুল্ক বসান হয়।

পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটে দ্রুত। এই প্রথম ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রভূত লাভের মুখ দেখলেন বিশেষ করে ইস্পাত ও সূতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে। বহু নতুন শিল্পপতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় এবং পুরনো শিল্প গোষ্ঠীগুলি আরো শক্তিশালী হয়। বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতিদের যৌথ মালিকানা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। বহু ব্রিটিশ শিল্পপতি সামরিকবাহিনীর কাজে চলে যাওয়ার শিল্পোদ্যোগ দেখাশোনা করতে না পারায় ভারতীয়দের সঙ্গে অংশীদারীত্বে আসেন।

ইস্পাত এবং সূতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিরা শিল্প বৃদ্ধির পুরো সুযোগ নিতে পানে নি। কেননা ভারতে যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার অভাব ছিল এবং জাহাজের অভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকেও আমদানী করা যেত না। তাছাড়া, অধ্যাপক অমিয় বাগচী মনে করেন যে, সংরক্ষণ নীতি সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের সুষম বিকাশ ঘটেনি। এর কারণ হল সরকারের সংরক্ষণ নীতি সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিক থেকেই উৎপাদন কমতে থাকে। ভারতীয় শিল্পপতিদের দাবী ছিল আরো বেশী সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় সাহায্যের। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বিজয়ী শক্তি ব্রিটেন ভারতীয় অর্থনীতির অনুকূল এই দাবী মেটাতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

যুদ্ধ শেষে দৃঢ়প্রত্যয়ী ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং যুদ্ধের সময়ে হৃত জমি পুনরুদ্ধারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণির মুখোমুখি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

১.১১ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজজীবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর।

২। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্যই কতটা পরিবর্তন এনেছিল?

৩। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপর্যন্ত দেশীয় উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। রাওলাট অ্যাক্ট বলতে কী বুঝ?

২। ভারতে শিল্পায়নের প্রথম যুগে ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৩। ভারতে শিল্পায়নের আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণ কী?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শেষ হয়?

২। মন্ট-ফোর্ড বলতে কাদের বোঝায়?

৩। রাওলাট কে ছিলেন?

৪। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। স্যার জামশেদজী টাকা কেন বিখ্যাত?

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। ত্রিপাঠী অমলেশ— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭ (আনন্দ পাবলিশার্স)।

২। Sarkar Sunil—Modern India, 1885-1947 (Macmillan) (Bengali translation available).

৩। Bandyapadhyay Sekhar— From Plassey to Partition : A History of Modern India (Orient Longman).

৪। Bagchi A. K.—Private Investment in India, 1900-39 (Cambridge University Press).

৫। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and others—India's struggle for Independence (Bengali translation available).

একক ২ ❑ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ

গঠন ঃ

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ
২.৩ গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা
২.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন
২.৫ চম্পারণ সত্যাগ্রহ
২.৬ খেড়া সত্যাগ্রহ
২.৭ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ
২.৮ রাওলাট সত্যাগ্রহ
২.৯ অনুশীলনী
২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে অপনি জানবেন ঃ—

- ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের প্রেক্ষাপট।
- রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভের কারণ।
- গান্ধীর আবির্ভাব ও প্রাথমিক আন্দোলনসূমহ।
- গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও অহিংস আন্দোলনের আদর্শ।

২.২ ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঐ বছরেই যথেষ্ট পরিণত বয়সে (৫০ বছর) গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে তিনি রাজনৈতিক গুরু বলে মনে

করতেন। গোখলেই তাঁকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসে ভারতীয়দের সাথে পরিচিত করান। গোখলে বিশ্বাস করতেন যে, গান্ধীজী ভবিষ্যতে ভারতের নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা হবেন। তাঁর এই ধারণা গান্ধীজী সত্যে পরিণত করেছিলেন।

গান্ধীজীর পথ ছিল অন্যদের থেকে পৃথক। তিনি নরমপন্থী সহযোগিতার নীতি বর্জন করেন এবং চরমপন্থী অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে তিনি বহুদিন নরমপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর মতে, 'স্বরাজ'-এর অর্থ শুধু রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, রিপুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই গান্ধীজীর কাছে প্রকৃত 'স্বরাজ'। অন্যদিকে তিনি নরমপন্থীদের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শকে কোনদিন গুরুত্ব দেননি। সন্ত্রাসবাদীদের অভয়মন্ত্র ও অমরবীর্য দ্বারা তিনি প্রভাবিত হলেও কিন্তু হিংসা ও অসত্যের পথে স্বরাজ সাধনায় তাঁর আপত্তি ছিল। মার্কসবাদীদের মত তিনি সহিংস শ্রেণি সংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সর্বব্যাপী গণসংগ্রামের যে পথ গান্ধীজী বেছে নিয়েছিলেন তার সাথে মার্কসবাদীদের একটা মিল ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ। দক্ষিণ আফ্রিকায় শেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র দিয়ে তিনি জয়লাভ করেছিলেন, অন্য সকলে স্বাধীনতার অর্থ যেভাবে করতেন, গান্ধী তা করতেন না। স্বাধীনতা অর্জন তাঁর কাছে ছিল বৃহত্তর ও মহত্তর একটি লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমমাত্র। ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা জন্ম দিয়েছে অর্থনৈতিক শোষণের এবং দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়া হয়েছে অসম্ভব। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক প্রগতির প্রথম ধাপই হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। গান্ধীর সংগ্রাম ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে নয়। অমর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধীর মতাদর্শের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখেছেন "ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি (তিনি) বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ ইংরেজদের আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।" গান্ধীজী মনে করতেন আমাদের জীবনধারণের জন্য সবকিছু প্রয়োজনীয়, তার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বয়ম্ভর হতে হবে। এই জন্যই তিনি গ্রামীণ উন্নতির উপর জোর দিয়েছিলেন। চরকা ছিল এই স্বয়ম্ভরতার প্রতীক। গান্ধীজীর মতে, সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। সুতরাং ভালবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে শত্রুকেও বশ করা যায়। তাঁর রাজনীতিতে শ্রেণি সংগ্রামের কোন স্থান ছিল না। রাজনীতির এই মহৎ আদর্শ গান্ধী তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সত্যাগ্রহের আদর্শ। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, গান্ধীর কাছে অহিংসা বা সত্যাগ্রহের ব্যক্তিগত তাৎপর্য ছিল একটি গভীরভাবে অনুভূত এক প্রতীয়মানদর্শন। এমারসন, থোরো বা টলস্টয়-এর কাছে এব্যাপারে তিনি কিছুটা ঋণী হলেও কিন্তু এতে কিছুটা মৌলিকতাও লক্ষণীয়। সত্যের অনুসন্ধানই মানব জীবনের লক্ষ্য। পুরোপুরি সন্ত হিসাবে নয়, কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে গান্ধীজী মাঝে মাঝে পূর্ণ অহিংসার সাথে কিছুটা আপসের পথ অবলম্বন করেছিলেন।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের দুটি দিক ছিল— একটি সত্যবাদিতা ও অপরটি অহিংসা। গান্ধীজীর সারা জীবনের সারাংশ হল সত্যের জন্য সংগ্রাম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শুদ্ধ তেজ বা শক্তি থাকে, গান্ধীজী যাকে বলেছেন সত্যের শক্তি এবং এই সত্যের শক্তির দ্বারা সবকিছু জয় করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। গঠনমূলক কাজ ও অন্যায়ের প্রতিশোধক হিসাবে তিনি এই শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

সত্যাগ্রহের মূল কথাই হলো অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগিতা। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ সত্যাগ্রহী করে না। সত্যাগ্রহের আদর্শে উপনীত হবার পথ অহিংসা। অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকারের লক্ষ্য কিন্তু অন্যায়কারীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা নয়, সহযোগিতার সমস্ত পথ বন্ধ করে তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। অহিংস আন্দোলনের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধী বলেছেন যে, এর ফলে অন্যায়কারী এক উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে। যদি সে বলপ্রয়োগ করে কোন আন্দোলন দমন করতে যায়, তাহলে সে সাধারণের

নৈতিক সমর্থন হারায়, আবার সে যদি নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে তাহলে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং অন্যায়কারীর পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

গান্ধীজীর জীবনদর্শনের মূলে ছিল জন্মস্থান গুজরাটের জৈনধর্ম ও পারিবারিক বৈষ্ণব প্রভাব। অপরদিকে ছিল বাইবেল, রাস্‌কিন, থোরো ও টলস্টয়ের প্রেরণা। শেষপর্যন্ত গীতাই তাঁর প্রধান আধ্যাত্মিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। Carlyle-এর **Heroes and Hero-worship** পড়ে তিনি মহাপুরুষদের মহত্ত্ব, সাহসিকতা ও কঠোর জীবনাদর্শের কথা জানতে পারলেন। মার্কিন লেখক Henry David Thorean-র লেখা Civil Disobedience পড়েও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি লেখেন Hind Swaraj। তাতে সে বিশ্ব বীক্ষা ও জীবন দর্শনের সূত্র পাওয়া যায় শেষদিন পর্যন্ত তার মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

এই পুস্তিকায় যে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল তা ছিল, প্রকৃত শত্রু ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, বরঞ্চ সমগ্র আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতা। গান্ধীজী মনে করতেন বস্তুবাদ থেকে জন্ম শিল্পবিপ্লবের এবং শিল্পবিপ্লব জন্ম দেয় সাম্রাজ্যবাদের। এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তে হলে তাঁর মতে সত্য ও প্রেমের শক্তি অর্জন করতে হবে, যাকে তিনি বলেছেন অহিংসা।

জোয়ানবঁদুর তাঁর **'conquest of violence'** গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে কোন অপরিবর্তনীয় অন্ধ অনুশাসন বলে মনে করতেন না। সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর কাছে নৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা রচনার স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সত্যাগ্রহ ও অহিংসার এই আদর্শ তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করেন। নরমপন্থী-চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদের সকলের পথ ছেড়ে তিনি তাঁর নিজস্ব পথ গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর আবির্ভাব আকস্মিক। জাতি এর জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিল না। তিনি জাতিকে তাঁর আন্দোলনের শরীক করে নিলেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা থাকলেও গান্ধীর মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করল এমন একজন ব্যক্তিকে, যিনি একান্তভাবে তাদের কাছের মানুষ। তাঁর বাস্তব বুদ্ধির কাছে ইংরেজরা কখন কখন পরাজিত হয়েছে, আবার তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগও নিয়েছে। তাঁর সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা, ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্ব; সাধারণ পোষাক অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়। সব থেকে বড়ো কথা তাঁর স্বার্থত্যাগ মানুষকে মোহিত করলেন। গান্ধীজীর আগমনের পূর্বের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনো বা করতেন চোখ রাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনো তীক্ষ্ণ কখনো সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমকক্ষ হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত"। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায় "তিনিই (গান্ধীজী) বোধহয় পৃথিবীর শেষ আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী (তাঁর ভাষায় 'রামরাজ্যবাদী') যিনি খ্রিস্টের মত মাটির পৃথিবীতে ন্যায় ও প্রেমের রাজ্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং খ্রিস্টের মতই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।"

২.৩ গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্যারিস্টারি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে গান্ধীজী ছিলেন একাধারে 'এলিস্টে'র ও জনগণের।

তাঁর ব্যক্তিত্ব এই দুই বিপরীত মেরুকে এক বিন্দুতে গ্রথিত করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মক্কেলের মধ্যে ছিল ধনী বণিক থেকে দরিদ্র, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, হিন্দু ও মুসলমান। এখানে তিনি এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন গতির অনুসরণ করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের গতির পরিবর্তন ঘটিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের পথ অনুসরণ করে তিনি সরকারকে বৈষম্যমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন। এই ঘটনা ছিল গান্ধীজীর জীবনে রাজনীতির হাতেখড়ি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা তাঁকে ভবিষ্যত আন্দোলনে পথ দেখিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এর ফলে তাঁর একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কেও তিনি সচেতন হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামে বহু মহিলা অংশ নিয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি মনে করেন রাজনৈতিক আন্দোলনেও মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। G Forbes 'Women In Modern India' গ্রন্থে লিখেছেন যে, গান্ধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। 'Young India' গ্রন্থে গান্ধী বিভিন্ন সময়ে নারীদের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। এই সকল অভিনব অভিজ্ঞতা গান্ধীজীকে ভারতে সর্বভারতীয় নেতারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়।

২.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসার পর গান্ধীজী এক বছর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। এই সময় ভারত ভ্রমণ করে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। গান্ধীজী বুঝেছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সত্যাগ্রহের আদর্শ মেনে নেবে না এবং কংগ্রেসের নেতারাও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবে না। তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষেরা যে সকল অন্যায়ের স্বীকার হচ্ছে তার বিরদ্ধে সত্যাগ্রহ নীতি পরীক্ষা করে এবং এই নীতির সফলতা অর্জনের দ্বারা জনমত গঠনের চেষ্টা করলেন। সুতরাং এই সময়টিকে গান্ধীজীর অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পথ বলা যেতে পারে। এই সময় তিনি যে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সেগুলির কেন্দ্র ছিল চম্পারণ (বিহার), কৈবর বা খেদা (গুজরাট) এবং আমেদাবাদে। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে গান্ধীজী এই সকল আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। লক্ষণীয় তিনটি আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও অনুন্নত অঞ্চল এবং সমস্যাগুলির সাথে কোন সর্বভারতীয় বা জাতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল না। বস্তুত জাতীয় নেতারা যখন আইনসভার সংস্কার ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনায় রত, গান্ধীজী তখন সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দান করে তিনি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে 'দেওতা' রূপে প্রতিপন্ন হন। তাঁর নামকে কেন্দ্র করে এক ধরনের মোহ তৈরি হয়। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল গান্ধীজীর charisma।

২.৫ চম্পারণ সত্যাগ্রহ

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষায় নেমেছিলেন, ভারতবর্ষে তাঁর সেই পদ্ধতিরই সর্বপ্রথম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হলো চম্পারণে কৃষকদের এই আন্দোলন।

বিহারের চম্পারণে নীলকর সাহেবরা 'তিন কাঠিয়া' প্রথায় কৃষকদের তাদের জমির প্রতি বিঘায় তিন কাঠা অংশে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদনের পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নীলের দাম কমে যাওয়ায় কৃষকরা নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে নীলের ন্যায্যমূল্য পেত না এবং নীল চাষ করে তাদের প্রচুর লোকসান হতে লাগল। এর ফলে কৃষকরা নীল চাষ করতে চাইল না। নীলকর সাহেবরা নীলের ব্যবসায়ে লোকসানের দায় কৃষকদের ওপর চাপাতে থাকে এবং নীলচাষ করতে বাধ্য করার জন্য কৃষকদের ওপর নানা নির্যাতন করে। সাহেবরা জমির খাজনা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। কৃষকরা এই বর্ধিত খাজনা দিতে অক্ষম হলে, সাহেবরা জমির চাষ বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়। এর ফলে ১৯০৫-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশেষ করে এই অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯০৮ সালে এই অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ নেয়। চম্পারণের কৃষক ও জোতদাররা শেষপর্যন্ত ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করানো হয়। গান্ধীজী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে চম্পারণে যান এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য জে. বি. কৃপালনীর সাহায্যে কৃষকদের উপর কি ধরনের জুলুম চলে তার অনুসন্ধান করে সত্যাগ্রহের সূচনা করেন। বাধ্য হয়ে সরকার নীল অনুসন্ধান কমিশন বসান এবং গান্ধীজী হয়েছিলেন এই কমিশনের একজন সদস্য। এর ফলে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তুলে দেওয়া হয়। খাজনার হারও শতকরা ২০ থেকে ২৬ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত নীলকর সাহেবরা জেলা ছেড়ে চলে যান। গান্ধী নীলকরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিলেন কারণ তাঁর মতে, নীলকরদের যেমন কৃষক ছাড়া চলবে না, তেমনি কৃষকদের কাছেও নীলকররা ছিল অপরিহার্য।

আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা চম্পারণ কৃষক আন্দোলনে গান্ধী বা গান্ধী অনুগামীদের প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কৃষক জমায়েত করার ক্ষেত্রে শহরতলীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গান্ধীপন্থায় দীক্ষিত রাজেন্দ্র প্রসাদ, এ. এন. সিংহ, শিক্ষক জে. বি. কৃপালনী প্রমুখের যত না ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল নিচু স্তরের মধ্য কৃষকরা. অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, চম্পারণ নীল চাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে সর্বভারতীয় প্রচারের মধ্যেই গান্ধীজীর নিজস্ব ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীর ভূমিকা কতটুকু ছিল বা ছিল না তা নিয়ে সাধারণ কৃষকরা অবশ্য মাথা ঘামায় নি। বেতিয়ার মহকুমাশাসক লিউইল চম্পারণের জেলাশাসক জেককেকে লিখছেন, "আমরা নিজ নিজ মতানুসারে গান্ধীকে আদর্শবাদী, ভাবোন্মাদ বা বিপ্লবী ভাবতে পারি। কিন্তু রায়তদের কাছে তিনি মুক্তিদাতা এবং তারা মনে করেন তাঁর আশ্চর্য সব ক্ষমতা রয়েছে"। জনৈক রায়ত গান্ধীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যতক্ষণ গান্ধী আছেন, ততক্ষণ নীলকর রাক্ষসদের ভয়ের কোন কারণ নেই। অবশ্য গান্ধীপন্থী সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো জঙ্গী ভাবের কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। যেমন, কয়েকটি নীলকুঠির ওপর আক্রমণ ও আগুন লাগানোর ঘটনা। গান্ধীর আন্দোলনে কৃষকরা প্রায় আত্মনির্ভরতা ও প্রেরণা। তবে গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, চম্পারণ কৃষকদের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো—শিক্ষা বিস্তার ও কৃষক ও নীলকরদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে চম্পারণ আন্দোলন গান্ধীকে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দিল। শুধু নিম্নবর্গের মানুষই নয়, অনেক শিক্ষিত মানুষও গান্ধীর ভক্তে পরিণত হয়।

২.৬ খেড়া সত্যাগ্রহ

গান্ধীর হস্তক্ষেপের সাফল্য অনেক বেশী স্থায়ী প্রমাণিত হয় গুজরাটের খেড়া জেলায়। এখানে বড়ো জমিদার ছিল না। অধিকাংশ জোতদারই ছোট, আর কুনবি জাতের পাটিদার কৃষকরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চেয়ে বেশি শক্তিমান। খেড়া বিষয়ে একটি অনুসন্ধান ডেভিড হার্ডিমান দেখিয়েছেন যে, এখানে একটি প্রান্ত উনিশ শতকীয় 'স্বর্ণযুগে'র শেষে ১৮৮৯

এরপর বারবার দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হয়, ফলে রাজস্ব দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯১৭-১৮ সালে খাদ্য উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং কেরোসিন তেল, কাপড়, লবণ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় কৃষকেরা খাজনা বয়কটের নির্দেশ দেয়। সরকার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। গুজরাট সভার সভাপতিরূপে গান্ধী বোম্বাই সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাজস্ব বন্ধের উদ্যোগ এসেছিল খেড়া-র কপোতভঞ্জ তালুকের মোহনলাল পাণ্ড্য-র মতো আঞ্চলিক নেতাদের তরফ থেকে। কমিশনার খাজনা মকুবের আবেদন এবং বোম্বাই-এর লাট অনুসন্ধানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর গান্ধী ১৯১৮-র ২২শে মার্চ সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং ৬ই জুন পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলেছিল। দু' হাজারের মত সদস্য সে বছর খাজনা না দেবার শপথ গ্রহণ করেন। নবীন আইনজীবী বল্লভভাই প্যাটেল ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিক-সহ কয়েকজন তরুণ অনুচর নিয়ে গান্ধী গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে কৃষকদের কর বয়কট আন্দোলনে উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু নামমাত্র ছাড়ের চেয়ে বেশি কিছু না পেয়েই জুন মাসে এই সত্যাগ্রহ তুলে নিতে হয়। বস্তুত চম্পারণে তিনি যতটা সফল হয়েছিলেন এক্ষেত্রে সফলতা ততটা ছিল না। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন—"In Kaire (Khada) it led neighter to an independent enquiry nor to the suspension of revenue he had first demanded"।

খেদা জেলার কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধীজী তথা গুজরাটের রাজনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে গুজরাটের কৃষক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। জুডিথ ব্রাউন-এর মতে যদিও গান্ধীজী তখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তথাপি খেদা সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক কুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। সর্বোপরি যেকোন পরিস্থিতিতে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে, তা প্রমাণিত হয়।

২.৭ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

১৯১৮-র ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এ আহমেদাবাদে যে পরিস্থিতিতে গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন, সেটি ছিল একান্তভাবেই গুজরাটের মিল মালিক ও তাঁদের শ্রমিকদের মধ্যেকার সংঘর্ষ। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী ছিল মালিক-শ্রমিক পক্ষের বিরোধের মূল কারণ। যুদ্ধের ফলে আমেদাবাদের মিল মালিকদের কাছে বিশেষ লাভের সুযোগ আসে। ইউরোপ থেকে বিদেশী জিনিস আমদানিতে টান পড়ে। সেই সুযোগে স্থানীয় বাজারে ভারতে তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়ে। ফলে মিল মালিকদের মুনাফা বাড়লেও যুদ্ধের সময় সব জিনিসের দাম বাড়ায় শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট বাড়ে। এদিকে প্লেগের আশঙ্কায় শ্রমিকরা যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্য ১৯১৭ সালে বিশেষ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও ১৯১৮ সালে প্লেগের ভয় কেটে যাওয়ায় মিল মালিকেরা তা প্রত্যাহার করতে উদ্যোগী হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গান্ধীর সালিশির চেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। মড়কের বোনাসের পরিবর্তে শ্রমিকেরা ৫০% মজুরি বৃদ্ধি দাবি করেন এবং মালিকরা দিতে চান মাত্র ২০%। ফলে ১৯১৮-র মার্চে প্রথম অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। শ্রমিকরা যাতে মালিকদের বিরুদ্ধে কোন হিংসাত্মক আচরণ না করেন, তিনি তাদের সেই উপদেশ দিতেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, অনশন ধর্মঘট শ্রমিকদের মজুরি ৩৫% বাড়াতে সফল হয়।

১৯১০-র বস্ত্র শ্রমিক সভার মাধ্যমে আমেদাবাদে শ্রমিকদের ওপর গান্ধীর প্রভাব আরও সুসংহত হয়।

আমেদাবাদের ধর্মঘটে গান্ধী নিজেকেও যুক্ত করেছিলেন। শ্রমিকদের দাবির প্রতি, শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি

সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য তিনি যেভাবে অনশন করেছিলেন এবং পরে গড়ে ওঠা ইউনিয়নকে যেভাবে পরিচালিত করেছিলেন তাকে সুপরিচিত "গান্ধীপন্থী শ্রমিক সংগঠনের" সূচনা বলে অভিহিত করা যায়।

চম্পারণ ও খেদার আন্দোলনের সঙ্গে আমেদাবাদ মিল শ্রমিকদের আন্দোলনের পার্থক্য ছিল। প্রথম দুটি আন্দোলন ছিল কৃষক আন্দোলন। আমেদাবাদ আন্দোলনে গান্ধী প্রথম শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। এখানেই তিনি আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে প্রথম অনশন করেন। গান্ধী নিজে অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর অনশনের কারণ ছিল, যেসব শ্রমিক সত্যাগ্রহের আদর্শ থেকে সরে আসছিল, তাদের সংশোধন করা। মার্কসবাদীদের মত তিনি মালিক-শ্রমিক শ্রেণি সংঘর্ষের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন উভয়ের মধ্যে উভয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার।

এইসব সংগ্রাম আংশিকভাবে সফল হলেও সেই সাফল্যই গান্ধীকে সারা ভারতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। জনগণ পরিচিত হলো গান্ধী আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে। তারা পেল এক নতুন পথের সন্ধান। ভারতের মানুষদের সামনে যেসব সমস্যা হাজির হতো, সেগুলির সমাধানের জন্য সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করতেন তিনি, যা নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, চম্পারণে, খেদায় ও আমেদাবাদে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কার্যসূচী থেকে গোখলের নরমপন্থী ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রারম্ভিকপর্বে যে গোখলেকেই তিনি নিজের রাজনৈতিক গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। এরই মধ্য দিয়ে তিনি তিলকের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনকে সরিয়ে তার জায়গায় সমগ্র ভারতব্যাপী এক নতুন গণসংগ্রামের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রতিষ্ঠাতা অগ্রনায়করূপে নিজেকে উপস্থাপিত করেন।

২.৮ রাওলাট সত্যাগ্রহ

চম্পারণ, খেদা ও আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আংশিক সাফল্যের পর গান্ধীজী চাইলেন সর্বভারতীয় কোন দাবিতে সত্যাগ্রহ নীতির প্রয়োগ সে সুযোগ করে দিলেন সরকার রাওলাট আইন পাশ করে। বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। তাই সরকার তার মোকাবিলা করার জন্য স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন ১৯১৭ ডিসেম্বরে। এই কমিটি দমনমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে একটি আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করেছিল ১৯১৮, ১৯শে জুলাই। এই আইনের অন্যতম হল জুরি ব্যতিরেকে রুদ্ধদ্বার আদালতে বিচার, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের জামানত আদায়, আপত্তিকর কাজকর্ম থেকে তারা যাতে বিরত থাকে তার ব্যবস্থা করা, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি। এই আইন তৈরি করার একটি সম্ভাব্য কারণ ছিল মন্টেগু প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে উদারনৈতিক সংস্কারে যেসব সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হচ্ছিল, তাদের খুশি করা। ভারত সচিব মন্টেগু স্বয়ং এই আইন প্রণয়নের বিরোধী ছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি সম্মতি দেন। ভারতীয়রা একবাক্যে এই দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। পাঞ্জাবে এই প্রস্তাবের নাম দেওয়া হল—"না উকিল, না আপীল, না দলিল"। বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ওবেরারের পত্রিকাগুলিও এর বিরোতিা করে। ভি. জে. প্যাটেল, মালব্য, সাপ্রু প্রভৃতি নেতারা প্রতিবাদ জানালেন, সদ্যোরোগমুক্ত গান্ধীজীও বিরাগ প্রকাশ করলেন। রোগমুক্তির পর শয্যায় শুয়ে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মালব্যকে লেখা চিঠিতে এই ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ সমগ্র ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ শুরু করা স্থির করলেন। সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হয় এবং প্রথমে ৩০ মার্চ

ও পরে তার পরিবর্তে ৬ই এপ্রিল হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ, ওয়াচা প্রভৃতি কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা এবং তিলকের শিষ্যদের মধ্যে কেলকার, মার্পাদে প্রভৃতি নেতা গান্ধীর বিরোধিতা করলেও বেসান্ত ও তিলকের অনুপস্থিতিতে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, যমুনাদাস, দ্বারকাদাস প্রভৃতি হোমরুল লীগের সদস্য গান্ধীকে সমর্থন করলেন।

রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রভাব ভারতের সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হয়নি। বস্তুত সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসাবে দাবী করা হলেও রাওলাট সত্যাগ্রহ সমগ্র ভারতকে স্পর্শ করতে পারেনি। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে হরতাল পালিত হয়। হরতাল কিন্তু শান্তিপূর্ণ ছিল না। পুলিশের গুলিতে কিছু লোক হতাহত হয়। দিল্লী আসার পথে ৯ এপ্রিল গান্ধীকে ট্রেনে গ্রেপ্তার করা হল। ধর্মঘটের ফলে যেসব শহরে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হয়, সেগুলির মধ্যে অমৃতসর, লাহোর, পাঞ্জাবের ছোটখাটো বিভিন্ন শহর প্রভৃতি ছিল। এই পন্থায় আন্দোলন সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে কিচলু ও সত্যপাল গ্রেফতার হওয়ায় তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ হল, যার পরিণতি ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড। ১৩ এপ্রিল তারিখ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিশাল জমায়েতে বিনা প্ররোচনায় সামরিক অধিকর্তা জেনারেল ডায়ার গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র এই জনতার উপরে গুলি বর্ষণে অন্তত এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হল এবং জনসাধারণের নানা অপমানজনক শাস্তি দেওয়া চলল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে ইংরেজদের দেওয়া নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন। গান্ধীজী ১৮ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলে জুডিথ ব্রাউনের মতে—"The Rowlat Satyagraha.... was a manifest failure"। গান্ধী এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে সরকার রাওলাট আইন প্রত্যাহারও করেননি। গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চল ছাড়া আন্দোলনের ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ কাজ করছিল, রাজনৈতিক চেতনা নয়।"

১৯১৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ সফল করতে গেলে কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের সম্মতি প্রয়োজন। তবু এই আন্দোলন গান্ধীকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাওলাট সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পেল এবং এর ব্যর্থতা ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ খুলে দিল। ভারত সচিব মন্টেগু এই হত্যাকাণ্ডকে "Preventive murder" বলে আখ্যা দিলেও দমনমূলক নীতি কিন্তু অব্যাহত রইল। রাওলাট সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা গান্ধীকে খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করল।

২.৯ অনুশীলনী

(ক) গান্ধীজীর উত্থানের পটভূমি আলোচনা কর।

(খ) গান্ধীজীর নীতি কি ছিল? তিনি কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর সত্যাগ্রহের অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন?

(গ) চম্পারণ ও খেড়া সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর ভূমিকা আলোচনা কর।

(ঘ) ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলে গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনগুলির প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ঙ) রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধীর জনপ্রিয়তার কারণ কি ছিল?

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস** (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ, ১৩৯৭।

২। সুমিত সরকার, **আধুনিক ভারত** : ১৮৮৫-১৯৪৭, কে. পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।

৩। Judith Brown, **Gandhi's Rise to Power—Indian Politics 1915-1922,** Cambridge, 1972।

৪। David Hendriman, **Peasant Nationalist of Guzrat, Kheda District 1917-1934,** (Delhi 1981)।

৫। Ravinder Kumar (ed.) **Essays on Gandhian Politics The Rowlatt Satyagraha of 1919** (Oxford, 1971)।

একক ৩ ❑ Congress—অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন

গঠন ঃ

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ খিলাফত— অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

৩.৩ খিলাফত কমিটি কর্তৃক অসহযোগ কর্মসূচীর ঘোষণা

৩.৪ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ

৩.৫ আন্দোলনের আদর্শ

৩.৬ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী

৩.৭ অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা

৩.৮ সরকারের দমন নীতি

৩.৯ অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন

৩.১০ গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন : পটভূমি

৩.১১ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব ও লন্ডন বৈঠক (১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দ)

৩.১২ লবণ সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযান

৩.১৩ সরকারি লবণ গোলা আক্রমণ

৩.১৪ সরকারের দমন নীতি ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গণ-আন্দোলন

৩.১৫ বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন

৩.১৬ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আন্দোলন

৩.১৭ আইন অমান্য ও কৃষক বিদ্রোহ

৩.১৮ প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ও গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)

৩.১৯ আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

৩.২০ আইন অমান্য আন্দোলনের মূল্যায়ন

৩.২১ অনুশীলনী

৩.২২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানবেন ঃ

- গান্ধী, খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি, প্রকৃতি ও ধারা।
- আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি, প্রকৃতি ও ধারা।
- আন্দোলনগুলির অন্তর্বর্তীকালীন রাজনীতির ধারা।

৩.২ খিলাফত—অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে "খলিফা" বা মুসলিম জগতের ধর্মগুরু মনে করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু তুরস্কের সুলতান যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ভারতীয় মুসলমানরা এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যদিও ভারতীয় মুসলমানরা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী শক্তিরা "সেভরের সন্ধি" দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করে যার বৃহদাংশ ইংরেজদের হস্তগত হয়। এর ফলে তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতাও যথেষ্ট হ্রাস পায়। ঐ ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানরা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়। তাঁরা ব্রিটিশ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলি সহ সমগ্র আরব তুরস্কের খলিফাকে প্রত্যার্পণের দাবী জানায়। এই দাবি ক্রমশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতারা দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ডক্টর আনসারি সমগ্র আরব অঞ্চল তুরস্কের খলিফাকে প্রত্যর্পণ করার দাবি করেন। কংগ্রেসী নেতা হাকিম আজমল খাঁ ডঃ আনসারির দাবি সমর্থন করেন এবং মুসলমানদের দাবির প্রতি গান্ধীজীর সমর্থনের জন্য তাঁর প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পাঞ্জাবের গোলযোগের সময় খিলাফত আন্দোলন উলেমাদের সমর্থনও লাভ করেছিল এবং সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী গান্ধীজী ইতিমধ্যে মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। জুডিথ ব্রাউনের মতে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবর্তী সময় থেকে গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভারতীয় মুসলমানরা গান্ধীজীর সমর্থনকে স্বীকার করে নেন এবং দিল্লীতে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজীকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তুরস্কের প্রশ্নে মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনক না হলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে। মুসলিম লীগও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের সময় মুসলমানদের অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ খিলাফত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসে অসহযোগিতার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন মুষ্টিমেয় মানুষ। দুই সংস্থার নেতৃবৃন্দ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ভাইস্রয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের অভিযোগগুলি তুলে ধরেন। ভাইস্রয় তাদের স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, জার্মানীর অনুকূলে অস্ত্রধারণ করার জন্যই তুরস্ককে ফল ভোগ করতে হবে। আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও আজাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে, সভা সমিতির মাধ্যমে খিলাফতের আদর্শ প্রচার করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ মৌলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও এর ফল ইতিবাচক হয়নি। ইতিমধ্যে গান্ধীজী খিলাফত প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অধৈর্য্য লক্ষ করে ১৯২০ সালের ৭ই মার্চ প্রস্তাব দেন যে, খিলাফত দিবস পালন করার উদ্দেশ্যে ১৭ই মার্চ হরতাল পালন করা হবে।

১৯১০ সালের ১৫ই মে তুরস্ক সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার পরই, গান্ধীজী খিলাফত সমস্যাকে নিয়ে অহিংস অসহযোগের পথে অগ্রসর হওয়ার অভিপ্রেত তাঁর মুসলিম বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন। খিলাফত কমিটি ২৮শে এক বৈঠক করে গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ দিনই জালিয়ানওয়ালাবাগ তদন্ত

কমিটির রিপোর্টও বের হয়। ওই রিপোর্টে জে. ডায়ার ও আর. ডায়ারের কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে প্রচার করার জন্য কমিটির সরকারি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হীন চেষ্টায় সারা দেশে প্রতিবাদ দেখা যায়। এর সাথে অসহযোগ আন্দোলনের পথ গ্রহণের জন্য খিলাফত কমিটির সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়ে দেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়।

৩.৩ খিলাফত—কমিটি কর্তৃক অসহযোগ কর্মসূচীর ঘোষণা

১৯১০ সালের জুন মাসে খিলাফত কমিটি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সেই বছরই জুলাই মাসে সিন্ধু প্রদেশে আহূত খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজী যোগ দেন। খিলাফত কমিটি এই কর্মসূচীতে সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক পদ বর্জন, সরকারের বেসামরিক পদগুলি থেকে ইস্তফা, পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ ও সরকারি খাজনা বন্ধের কথা ঘোষণা করা হয়। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, ১লা আগস্ট অনশন প্রার্থনার মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে।

৩.৪ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (১৯১০ খ্রিস্টাব্দে) সেপ্টেম্বরে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসর কংগ্রেসে অনেক গন্যমান্য নেতাই অসহযোগের পক্ষে ছিলেন না। গান্ধীজী তখন অসহযোগের প্রবক্তারূপে নিজের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর বিপরীত শিবিরে রয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল, জিন্না প্রমুখ নেতাগণ। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে অসহযোগের প্রস্তাব মাত্র সাত ভোটের ব্যবধানে গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের তখনকার গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হলে, তারপরের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে সেখানেই তাকে পাশ করিয়ে নিতে হতো। তাই নাগপুরে ডিসেম্বরে বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। তাই এই কর্মসূচীর সমস্ত কিছু তৈরি করার ভার গান্ধীজীর উপরে পড়েছিল এবং তিনি গণআন্দোলনের অবিসংবাদিত নায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের তিনটি মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি একমত হয়। যথা, পাঞ্জাবের অভিযোগের সন্তুষ্টিকরণ, খিলাফতের প্রতি ব্রিটিশ তথা মিত্রপক্ষের অন্যায়ের প্রতিকার এবং ভারতবাসীকে স্বরাজদান।

কংগ্রেস ভারতের জাতীয় দাবিগুলির সঙ্গে খিলাফতের দাবি সংযোজন করে। গান্ধীজী মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসী আন্দোলন সংযুক্ত করার সুযোগ পান। ১৯১০ : 'খিলাফত-ইস্তাহার' প্রকাশ করে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফত আন্দোলনের অবদান অস্বীকার করা যায় না। খিলাফত আন্দোলন নগরের শিক্ষিত মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। খিলাফত আন্দোলন ছিল ভারতীয় মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কামাল পাশা তুরস্কের খলিফাতন্ত্র বিলোপ করেন এবং

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় এর কোন প্রতিবাদ করেনি।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনা। কংগ্রেসের রাজনৈতিক 'ভিক্ষার নীতি' চিরতরে বর্জন করা হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব চরমপন্থীদের হস্তগত হয়। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

৩.৫ আন্দোলনের আদর্শ

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংকল্পে অবিচলিত থেকে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করা। অহিংস অসহযোগ শুধু ব্যক্তিগতভাবেই নয়, সুসংঘবদ্ধভাবে জনগণ পবিত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হবে, এটিও আন্দোলনের অপর লক্ষ্য ছিল।

৩.৬ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী

''এক বছরেই স্বরাজ''— এই কেন্দ্রীয় রণধ্বনি দিয়ে যে কর্মসূচী তিনি ঘোষণা করেছিলেন সমগ্র ভারতব্যাপী এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এই কর্মসূচীর দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ''গঠনমূলক কর্মসূচী'', এর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশী প্রচার, হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করা, মদ্যপান নিষিদ্ধ করা ও ''তিলক স্বরাজ তহবিলের'' জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় দিকটিকে ''নেতিবাচক'' আখ্যা দেওয়া যায়। যার মধ্যে ছিল আইনসভা, আদালত, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি খেতাব এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন করা, জনশক্তিকে সুসংহত করে তোলাই ছিল গঠনমূলক কর্মধারার লক্ষ্য। এইভাবে সুসংহত জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে জয় করে আনার রূপটা ছিল দ্বিতীয় দিকটিতে। এই বিস্তৃত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হননি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাই অসহযোগ আন্দোলন ছিল এমন এক কর্মপ্রবাহ, যা সঠিকভাবে ভারতের মানুষকে সক্রিয় রাজনীতিতে টেনে আনতে পেরেছিল।

গান্ধীজী জনগণকে ডেকে বলেছিলেন যে, তার যদি এই কর্মসূচী পালনে সময় হয় তবে ''এক বছরেই স্বরাজ'' এই দাবি মেনে নিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য থাকবে। নিজের কর্মসূচী প্রচার করতে তাঁর দেশব্যাপী পরিক্রমায় অসংখ্য মানুষ উন্মাদনায় দিশাহারা হয়ে পড়ে। একদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে মাদ্রাজ ও অন্যদিকে সিন্ধু থেকে অসম পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে গান্ধীর আহ্বান একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। জুডিথ ব্রাউনের মতে, হোমরুল লীগ আন্দোলনের চেয়েও গান্ধীর আহ্বান মানুষের মধ্যে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল।

৩.৭ অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা

খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু ও মুসলমান এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। গান্ধীজীর আহ্বানে উকিল-ব্যারিস্টারগণ আদালত ত্যাগ করেন, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে, বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হয়, শ্রমিকেরা কারখানা ত্যাগ করে। চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। বিদেশী পণ্যসামগ্রীর দোকানের সামনে পিকেটিং করা হয়। কংগ্রেসের চেষ্টায় কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট

বিদ্যাপীঠ, বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে 'জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া' নামে এক নতুন শিক্ষা সংস্থা স্থাপন করেন।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষায়তনগুলিতে ধর্মঘট বা বয়কট বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আইন-পরিষদ বয়কট করার আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ বোম্বাই ও কলকাতা আগমন করলে উভয় শহর ধর্মঘট পালন করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন শুধুমাত্র কংগ্রেস রাজনীতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ ছিল না। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র উপত্যকার কৃষক আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের তালুকদার ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই কৃষকরা বাবা রামচন্দ্র নামে এক নেতার নেতৃত্বে অযোধ্যার অসহযোগ আন্দোলনে কিষাণসভা সামিল হয়। এদের আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি কোন যোগ ছিল না।

৩.৮ সরকারের দমন নীতি

এই সময় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পর লর্ড রীডিং বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং কঠোর হাতে অসহযোগ আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর গুলি ও লাঠি চালনা করা হয় এবং গান্ধীজী ব্যতীত কংগ্রেস ও খিলাফতের সকল নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়। সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গান্ধীজীকে প্রদান করে। গান্ধীজী গভর্নর জেনারেলকে জানালেন যে, যদি সাতদিনের মধ্যে বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্ত করা না হয় তাহলে তিনি দেশবাসীকে রাজস্ব না দেওয়ার পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু ওই সময়সীমার পূর্বেই গোরখপুরের চৌরিচৌরা থানায় এক উত্তেজিত জনতা অগ্নিসংযোগ করে ১২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারেন। গান্ধীজী সম্পূর্ণ অহিংসভাবেই সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেশবাসী অহিংস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আর একদিকে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে 'নবীন তুর্কী' দল তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করলে খিলাফত আন্দোলনও বন্ধ হয়।

৩.৯ অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই আন্দোলন ভারতের সর্বস্তরের ও সমস্ত অঞ্চলের মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিল। এখন প্রশ্ন হল এই আন্দোলন কতটুকু সফল হয়েছিল। অনেক সমালোচকদের মতে এই অন্দোলন একমাত্র গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর কারাবরণের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিসমাপ্তি ছিল একরূপ সুনিশ্চিত। অনেকেই গান্ধীজীর এই আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে শুধু এক বিরাট ভুল বলেই মনে করেননি। একে জাতীয় আন্দোলনের উপর এক বিরাট আঘাত বলে মনে করেছেন।

অন্যদিকে এই আন্দোলন বন্ধ করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী স্বয়ং ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখলেন যে, গণআইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী পরিবেশ প্রয়োজন তা ভারতে দেখা যাচ্ছে না। আসল কথা এই যে, যেখানে গান্ধীজী অহিংসাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন সেখানে তার অনেক অনুগামীরাই অহিংসাতে শুধুমাত্র এক রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেছিলেন, যা প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে। সেই কারণেই গান্ধীজীর আন্দোলন বন্ধের ডাকে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

অন্যদিকে এই আন্দোলন বন্ধ করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী স্বয়ং ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লিখলেন যে, গণআইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী পরিবেশ প্রয়োজন তা ভারতে দেখা যাচ্ছে না। আসল কথা এই যে, যেখানে গান্ধীজী অহিংসাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন সেখানে তার অনেক অনুগামীরাই অহিংসাতে শুধুমাত্র এক রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেছিলেন, যা প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে। সেই কারণেই গান্ধীজীর আন্দোলন বন্ধের ডাকে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, চৌরিচৌরা ঘটনার পর তাকে এবং তখনও কারাগারের বাইরে থাকা কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করার এবং জনসাধারণের উপর আরও দমনপীড়ন চালাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আন্দোলন বন্ধ করে গান্ধীজী ও কংগ্রেস কার্যকরী সভা আন্দোলনকে অসম্মানজনক পরাজয় থেকে এবং জনগণকে মনোবল হারাবার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। একথা সত্য যে, আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতীয় রাজনীতিতে এক হতাশা নেমে এসেছিল এবং এরই পরিণামে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পুনরায় মাথা তুলেছিল।

গান্ধীজী সমালোচকরা ভুলে যান যে, কোন গণআন্দোলন দীর্ঘদিন একটানা চালানো সম্ভব না এবং জনগণের সহ্যশক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের শক্তিও অপরিসীম নয়। সেক্ষেত্রে এমন সময় আসে যখন পরবর্তী পর্যায়ের সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ প্রয়োজন। তাই ভবিষ্যৎ জয়ের দিকে লক্ষ্য করে সাময়িক পশ্চাদপসরণ পরাজয়ের নামান্তর নয়; এটি আন্দোলনের কৌশলেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সম্ভবত গান্ধীজীর এই আন্দোলন বন্ধ করে দেবার সঠিক মুহূর্ত বেছে নেওয়ার নিজস্ব কারণ ছিল।

৩.১০ গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন : পটভূমি

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি করে। এর বিকল্প কর্মসূচীরূপে আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচিত হবার পর সুসংবদ্ধ, নিয়মিত ও নিরন্তর বাধার সৃষ্টি করে শাসনব্যবস্থাকে বানচাল করার কর্মসূচী গ্রহণের জন্য চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু প্রমুখরা উদ্যোগী হন। এঁরা পরিবর্তনকামী বা (Pro-changer) নামে অভিহিত হন। যাঁরা এই নীতির বিরোধিতা করেন তাঁর পরিবর্তন বিরোধিতা বা (Non-changer) নামে পরিচিত হন। ১৯২২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচন পন্থীরা পরাজিত হলে সভাপতি চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করে এবং ১৯২৩ সালে ১লা জানুয়ারী মতিলালের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করেন।

১৯২৩-২৬ সালে স্বরাজ্য পার্টি বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশে ভাল ফল করে। নির্বাচনী ইস্তাহারে স্বরাজ দল ঘোষণা করেছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হলো মাতৃভূমির স্বার্থ ও উন্নতি—কেন্দ্রীয় আইনসভার সঙ্গে সঙ্গে এই দল পৌরসভার নির্বাচনেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে স্বরাজ্য পার্টি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কংগ্রেসের মূলস্রোতে ফিরে আসে। স্বরাজ দলের ব্যর্থতার

আর একটি বড়ো কারণ গান্ধীজীর বিরূপ মনোভাব।

ওই সময়ে গান্ধী ও তার অনুগামী কংগ্রেসিরা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিতকে মজবুত করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন জারী করার সময় স্থির হয়েছিল যে, এই আইন কতটা কার্যকরী হয়েছে এবং ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য ১০ বছর পরে একটি কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিশনে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় চতুর্দিকে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয়। কোন ভারতীয়কে গ্রহণ না করার যুক্তি হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে বোঝানো হয় যে, একমাত্র পার্লামেন্টের সদস্যরাই পার্লামেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করার অধিকারী।

মুসলিম লীগ লিবারেল ফেডারেশন এবং হিন্দু মহাসভাও কমিশনের গঠণতন্ত্রের নিন্দা করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির ফলে অনেকেরই রাজনৈতিক মতাদর্শ ও উচ্চাকাঙক্ষা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে এঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজের দাবী তুললেন। সুতরাং, কংগ্রেসহ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে 'বয়কট' করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বাই-এ এসে পৌঁছালে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। তাছাড়া মিছিল ও কালো পতাকা প্রদর্শন করে সাইমনকে অভ্যর্থনা করা হয়। বিভিন্ন যুব সংস্থাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রমিকদেরও এই আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এইরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও কমিশন-এর তদন্ত সম্পন্ন করে এবং দু বছর পর (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

সাইমন কমিশন বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক শাসনতন্ত্র রচনার কাজও শুরু হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট-এ লক্ষ্ণৌ তে এক সর্বদলীয় সমাবেশে প্রবীন স্বরাজ দলনেতা মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের যে খসড়া রচনা করা হয়, তা বিখ্যাত নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই সংবিধানে বা নেহেরু রিপোর্টে পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দাবি করা হয়। আগেকার সমস্ত আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, এই প্রস্তাবে তা প্রত্যাখ্যান করে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হলো।

নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি পৃথকভাবে তার বিবেচনা শুরু করে। কংগ্রেস সমর্থন করলেও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি বর্জন করে। মুসলিম লীগের প্রধান নেতা মহম্মদ আলি জিন্না ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে তাঁর "চৌদ্দ দফা" দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবির ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়ে পার্থক্য ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন কিভাবে জিন্না মুসলমানদের মধ্যে নিজের নেতৃত্ব ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর বিরুদ্ধগোষ্ঠী মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যমত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। অপরদিকে নেহেরু রিপোর্ট-এ পূর্ণ স্বরাজের উল্লেখ না থাকায় জহরলাল ও অন্যান্য তরুণ নেতা এর তীব্র সমালোচনা করে।

এই অবস্থায় গান্ধীজী হস্তক্ষেপ করেন এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ সরকারকে নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি সমগ্রভাবে কার্যকর করতে হবে নতুবা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। গান্ধীজীর প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে 'মারাত্মক ভুল' বলে মন্তব্য করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত, নেতারা তখন দ্বিধাগ্রস্থ।

সরকারকে এক বছর সময় দেওয়ায় আপাতত সক্রিয় আন্দোলনের কোন প্রশ্ন ছিল না। ১৯২৯ সালের

গোড়াতেই তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন ও তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন। তিনি জনগণকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এদিকে বড়লাট আরউইনও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি কার্যকর করতে বাধ্য হবে। ১৯২৯ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি ঘোষণা করেন যে, সাইমন রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর একটি গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে। ১৯২৯ সালে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসায় বড়লাট কিছুটা আশান্বিত হলেও, টোরী ও উদারনৈতিক নেতারা এর বিরোধী ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে আরউইন এর আলোচনা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। ২০শে ডিসেম্বর আরউইন গান্ধীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কংগ্রেসের দাবিদাওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম। এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ না থাকায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দেশের এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন বসে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করলে জহরলাল নেহেরু তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেন। গান্ধীজীর উদ্যোগে জহরলাল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি জহরলাল 'পূর্ণ স্বরাজ' বা স্বাধীনতার দাবি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, তদানীন্তন পরিস্থিতিতে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান ফলপ্রসূ হবে না এবং নেহেরু রিপোর্টে প্রস্তাবিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা কংগ্রেস গ্রহণ করবে না। একথা অনস্বীকার্য যে, গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই লাহোর কংগ্রেস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২রা জানুয়ারী কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বসে। জাতির কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ জনপ্রিয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে সভাপতি জহরলাল নেহেরু ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

একমাত্র রাজনৈতিক প্রস্তুতি কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না। জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ যেকোন আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ভারতকেও স্পর্শ করেছিল। এর ফলে শ্রমিক, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট দল কর্তৃক পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষক সংঘগুলি সর্বত্র জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বরদোলি-এর কৃষকরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিল এবং সরকারকে দেয় খাজনা বন্ধ করেছিল। ১৯২৮ সালে ভারতে ২৩০টি শিল্প ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছিল। একদিকে রাজনৈতিক অশান্তি ও অন্যদিকে সরকারের দমনমূলক নীতি ভারতে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। স্বভাবতই, গান্ধীজী পরিস্থিতির প্রয়োজনে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এদিক থেকে বিচার করলে অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিস্থিতি ছিল অনেক বেশি অগ্নিগর্ভ।

৩.১১ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব ও লন্ডন বৈঠক (১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দ)

সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে মীমাংসায় আসার চেষ্টা করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২রা মার্চ গান্ধী আরউইনকে লেখা একটি চিঠিতে জানালেন যে, সরকার যদি তাঁর ১১ দফা দাবি

মেনে নেন, তাহলে আইন অমান্যের প্রয়োজন হবে না। এই দাবির মধ্যে কয়েকটি হলো— টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার, পরিবর্তন, সংরক্ষণ, খাজনা হার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস, লবণ কর লোপ, রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবির মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ, এমনকি ডোমিনিয়ন স্টেটাসেরও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সরকার এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। এই অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সব দায়িত্ব গান্ধীজীর হাতে অর্পণ করে। আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী সরকারকে আরও একবার সতর্ক করে দেন। কিন্তু সরকার পক্ষে এর প্রতিক্রিয়া দেখা না দেওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

৩.১২ লবণ সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান

গান্ধীজী বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে, ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। লবণ সত্যাগ্রহ হল গান্ধীজীর প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন। অহিংসভাবে শত্রুকে চারদিক থেকে পর্যুদস্ত করাই ছিল লবণ সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা। লবণ আইন ভঙ্গ ছিল একটি প্রতীকী আন্দোলন। ১২ই মার্চ গান্ধী তাঁর ৭৮ জন ঘনিষ্ঠ সহচর নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল খোলাখুলিভাবে আইন ভঙ্গ করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা। লবণ প্রস্তুতের ব্যাপারে সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই কারণে চড়া মূল্যে ভারতবাসীকে লবণ ক্রয় করতে হত। চব্বিশ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে গান্ধীজী গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে ডাণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হন। পথের সর্বত্র পল্লীবাসীরা সত্যাগ্রহীদের বিপুল সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানায়। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সমুদ্রের জল তুলে লবণ তৈরি শুরু করেন। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম পর্ব শুরু হয়।

গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে একটা নাটকীয়তা ছিল Modern Review পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে যুগান্তকারী ও পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন। লুই ফিশার ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন গান্ধীর কল্পনা শক্তি, মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সবার উপরে একজন মহৎ শিল্পীর নৈপুণ্য।

দেশের নেতৃবৃন্দ সমুদ্র তীরে নানা স্থানে সমবেত হয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার মহিষবাথান এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কয়েকটি স্থানে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চলতে থাকে এবং সমগ্র প্রদেশের সত্যাগ্রহীরা এই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। যে সকল স্থানে লবণ তৈরি করার সুবিধা ছিল না, সেইসব স্থানেও আন্দোলন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা-সমিতির চেষ্টা এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং করা হয়। বিলাতী কাপড়ের দোকানে ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করার ভার গান্ধীজী নারীদের ওপর অর্পণ করেন। 'বয়কট' আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে।

আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সরকারের দমন নীতিও কঠোর হয়ে ওঠে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালায়। জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয় এবং প্রাদেশিক কমিটির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৩.১৩ সরকারি লবণ গোলা আক্রমণ

গান্ধী সরকারি ডিপো ধারসানায় সত্যাগ্রহ করে লবণ আইন ভাঙতে চেষ্টা করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন

আম্বাসতায়েবজী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে সরোজিনী নাইডু ধারসানায় লবণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের কাহিনী ওয়েব স্মিলার নামে জনৈক মার্কিন সাংবাদিক বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে সত্যাগ্রহীরা ধারসানার লবণ গোলার দিকে অগ্রসর হলে ইংরাজ ও ভারতীয় পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুসারে ধারসানা ও ওয়াডালা নামক স্থানে সত্যাগ্রহ পুর্ণোদ্যমে চলতে তাকে। সেই সঙ্গে সরকার অত্যাচার ও উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

৩.১৪ সরকারের দমন নীতি ও ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে গণআন্দোলন

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে হরতাল পালন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। তবে সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। বোম্বাইতে এই আন্দোলনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বোম্বাই ছাড়া বাংলা, মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশেও লবণ সত্যাগ্রহ যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলায় লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু হয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় ৪০টি গ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। যুক্তপ্রদেশ ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের একটি বড়ো ঘাঁটি। দক্ষিণ ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন বোম্বাই, গুজরাট বা মেদিনীপুরের মত তীব্র আকার ধারণ করেনি। আইন অমান্য আসামে উল্লেখযোগ্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পাঞ্জাবেও আইন অমান্য আন্দোলন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

৩.১৫ বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পর বাংলাতেই আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর জেলায় লবণ সত্যাগ্রহের পরই সরকারি কর্মচারী বয়কট, চৌকিদার ও পুলিশের উপর আক্রমণ চলেছিল। মেদিনীপুরে আন্দোলন সর্বত্র গান্ধীবাদী পথে পরিচালিত হয়নি। মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আইন অমান্য ব্যাপক সাড়া জাগালেও এই আন্দোলন বাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কলকাতায় বয়কট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল এই আন্দোলনের অপরিহার্য আন্দোলন।

৩.১৬ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আন্দোলন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খ্যাতনামা অহিংসাবাদী নেতা খান আবদুল গফর খাঁ-এর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলন দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়।

৩.১৭ আইন অমান্য ও কৃষক বিদ্রোহ

আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'খাজনা বন্ধ আন্দোলন' এই আন্দোলনগুলির কারণ হলেও, প্রকৃতপক্ষে এর মূলে ছিল কৃষকদের উপর জমিদারদের শোষণ। এলাহাবাদে 'খাজনা বন্ধ আন্দোলন' শুরু হলে সেই সুযোগে সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের প্রসারের লক্ষ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসে যোগদান করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সংঘটিত কৃষক আন্দোলন সরকার কঠোর হাতে দমন করেন।

গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল বহুমুখী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকার কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

৩.১৮ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ও গান্ধী আরউইন চুক্তি (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতের সব রাজনৈতিক দল রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি গ্রহণে অসম্মত হন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কংগ্রেস ভিন্ন অপর রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড কতকগুলি সাংবিধানিক প্রস্তাব দেন। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব।

ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবে সম্মত হলেও মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িকভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। তপশিলী সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ডক্টর আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন।

ব্রিটিশ সরকার কেন গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেছিলেন, তার একটি কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বি. আর. টমসন বলেছেন যে, সরকারের ইচ্ছা ছিল নতুন সংবিধান কার্যকরী করার আগেই ভারতের বিভিন্ন নেতা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের অভিমত গ্রহণ করা। কংগ্রেসের অনুপস্থিতি সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছিল। গোলটেবিল ব্যর্থ হওয়ায় সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে আসতে চাইলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আশা করেছিলেন যে, পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করবে। মহাত্মাজী-সহ সকল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষপর্যন্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সরকার অত্যাচারমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদনের জন্য ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং গান্ধীজীর উপস্থিতিতে চুক্তি অনুমোদিত হলে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সুনিশ্চিত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩১) ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হওয়ার পূর্বেই ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব কঠোর হয়। এই বৈঠকে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সজ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেও ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল সরকারের নীতি বৈঠকের আলোচনাকে প্রভাবিত করে।

ভারতের নব নিযুক্ত বড়লাট ওয়েলিংডন গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন করেননি। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা। গান্ধীজী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উপর জোর দিলেও ব্রিটিশ সরকার তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিলেন সংখ্যালঘু সমস্যার উপর। গান্ধীজী শত চেষ্টা করেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন এবং হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

৩.১৯ আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী দেশে ফিরে এসে এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। সে সময় সরকার গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তাদি পালন করার পরিবের্ত তা নাকচ করতেই বেশী উৎসাহী হন। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী করে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়। এই অবস্থায় গান্ধীজী বড়লাট ওয়েলিংডনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু সরকার পক্ষের কঠোর মনোভাবে গান্ধীজী হতাশ হন এবং কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়।

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলে সরকারের প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়। গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেইসঙ্গে দেশের উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসী নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। একাধিক জরুরী আইন চালু করে আন্দোলন দমন করার ও সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করা হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করে। এর দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত অনুন্নত সম্প্রদায়কেও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়ায় গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে গান্ধীজীর সঙ্গে পুণা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার বিনিময়ে ডক্টর আম্বেদকর হিন্দুদের যৌথ ভোট দেওয়ার নীতি স্বীকার করে নেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে বিনা শর্তে মুক্ত করেন।

এরপর গান্ধীজী প্রায় দু'বছর হরিজন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসলেও কংগ্রেস এতে যোগদান না করায় এই বৈঠকের একপ্রকার কোন গুরুত্ব ছিল না। এই বৈঠকেই ভারত শাসন বিল নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।

৩.২০ আইন অমান্য আন্দোলনের মূল্যায়ন

অসহযোগ আন্দোলনের মত আইন অমান্য আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন লক্ষ্য ও ব্যাপ্তি—উভয় দিক থেকে ছিল অনেক অগ্রণী ও পরিণত। আইন অমান্য আন্দোলনের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হলো মহিলাদের অংশগ্রহণ। গান্ধীজী নিজে মহিলাদের এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চেহারা

দেখে ব্রিটিশ সরকার চমকে উঠেছিলেন। এই আন্দোলনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় দিক হলো গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন।

লবণ সত্যাগ্রহের তথা আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নরমপন্থী উগ্রপন্থী, মুসলিম লীগপন্থী, হিন্দু-মহাসভাপন্থী প্রায় সকল পন্থীর জনগণ ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আইন অমান্য আন্দোলন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেও এর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কেও কিছু কথা বলা আবশ্যক। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি কারণ হল ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য। এছাড়া দলীয় সংগঠনের ওপর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অসহযোগ আন্দোলনে যেভাবে উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করেছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তা করেনি। আইনজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায় তাদের আগেকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল।

আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আইন অমান্য আন্দোলনের তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

৩.২১ অনুশীলনী

(ক) খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল? এই আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর।

(খ) অসহযোগ অন্দোলনের পটভূমি কি ছিল? এই আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর।

(গ) অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ঙ) আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি আলোচনা কর।

(চ) আইন অমান্য আন্দোলন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথকে ত্বরান্বিত করেছিল?

৩.২২ গ্রন্থপঞ্জী

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)।

২। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, কে. পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।

৩। Judith Brown, **Gandhi and Ciil Disobedience : The Mahatma in Indian Politics 1928-34,** Cambridge, 1972।

৪। Gail Minault, **The Khilafat Movement Religious Symbolism and Political Mobilisation in India** (Oxford, 1971)।

একক ৪ ❑ কংগ্রেস ও ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণি

গঠন ঃ

৪.১ ভূমিকা

৪.২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক

৪.৩ কংগ্রেস ও শ্রমিক

৪.৪ দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ : ভারতের ভিতরে ও বাইরে

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির যে উদ্ভব শুরু হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) নানাবিধ কারণে তার বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়। মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী তুলনামূলকভাবে একটি শক্তিশালী শ্রেণি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ১৯৪৪ সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্প সংস্থায় ৬২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ৯৫ শতাংশ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়েছিল। চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, পাট, বাগিচা, খনির মত শিল্প যেখানে গোড়ায় বিদেশি মূলধন প্রবল ছিল, সেগুলিরও ভারতীয়করণ ঘটতে থাকে।

এই অবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—এই তিনের মধ্যে একটা বহুমাত্রিক সম্পর্ক দেখা দেয়। বিপানচন্দ্র ও আদিত্য মুখার্জীর মত ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, স্বল্পমেয়াদী নানা স্বার্থের তাগিদে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলেও, দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্নে তাদের পরস্পর বিরোধিতা চাপা ছিল না। অন্যদিকে বাসুদেব চ্যাটার্জী, এ.ডি.ডি. গর্ডন, ক্লড মার্কোভিটস, দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী প্রভৃতি মনে করেন যে, পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়েছিল। সাধারণভাবে তারা ঔপনিবেশিক সরকারের সাথে সহযোগিতা করব, কিন্তু নিজেদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগত তখনই বিরোধিতার নীতি নিত। একেই অধ্যাপক রজত রায় 'একই সঙ্গে সহযোগিতা ও বিরোধিতার নীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে ভারতে পুঁজিপতি বণিককুল কোনো একমাত্রিক শ্রেণী ছিল না। বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শ্রেণীর স্বার্থ এক ছিল না এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অঞ্চলগত বৈষম্য।

৪.১.২

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেখা যায় যে মাড়োয়ারী ও গুজরাটি বণিকরা সরকারের নতুন আয়কর ও মুদ্রা (currency) নীতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তাছাড়া, তাঁদের জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে গান্ধী দর্শনের মিল ছিল। কাজেই গান্ধীর প্রতি তাঁরা খুব সহজেই একাত্মবোধ করেছিলেন। জি. ডি. বিড়লা ও যমুনালাল বাজাজের মত শিল্পপতিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীতে পরিণত হন। কিন্তু পার্শি ও অন্যান্য বড়ো শিল্পপতিরা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতি ততটা সম্পৃক্ত বোধ গোড়ার দিকে করেন নি। সরকারও তাদের সমর্থন আদায়ে উৎসাহী ছিল।

মন্টফোর্ড সংস্কার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় ভারতীয় বণিকদের বিশেষ প্রতিনিধি রাখার কথা বলে। ১৯১৯ সালের ফিসকাল অটোনমি কনভেনশন এবং ১৯২২ সালের পরে সংরক্ষণমূলক ট্যারিকের কথা বিবেচনার প্রস্তাবে এঁদের মোটামুটি সন্তুষ্ট করেছিল। রাওলাট সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ও তিলক স্বরাজ তহবিলে মুক্ত হস্তে অর্থদান করেছেন সাধারণ বণিকেরা। কিন্তু পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ও টাটার মত বোম্বাইয়ের বৃহৎ শিল্পপতিরা অসহযোগ আন্দোলনে নিস্পৃহ ছিল। অবশ্য ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিককূল নির্বিশেষে এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে একমাত্র গান্ধীই পারবেন ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে পুঁজিবাদ বিরোধী চরমপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হওয়ার থেকে।

৪.১.৩

কিন্তু ১৯২২ সালের পর নানা কারণে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিশ্রেণির সব গোষ্ঠীই জাতীয়তাবাদের পক্ষে সামিল হয়। যুদ্ধকালীন চাঙ্গা অর্থনীতির (boom) অবসান ঘটে ১৯২১-২২ সালে এবং এরপর যে মন্দা (slump) শুরু হয় তা বিশের দশক বরাবর অব্যাহত থাকে। অবিক্রীত অবস্থার বহু দ্রব্যসামগ্রী পড়ে থাকে এবং শ্রম ব্যয়ও বাড়তে থাকে। বোম্বাই সুতাকল মালিকদের সমস্যা আরো বেশি ছিল দুটি কারণে ঃ সূতার (yarn) জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমদানি-নির্ভর ছিলেন; দ্বিতীয়ত, এই সময় থেকে সস্তার জাপানী সূতীবস্ত্র বাজার ছেয়ে ফেলে, যার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা ভারতীয় সূতাকলদের ছিল না। ফলে, সূতাকলগুলির শেয়ারের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। মিল মালিকেরা সুতাবস্ত্রের উপর ৩.৫ শতাংশ শুল্ক অবলুপ্তির দাবি জানায় এবং আইনসভার ভেতরে স্বরাজ্য দল এই দাবি সমর্থন করে। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে এই দাবি মেনে নেওয়া হয় কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটে নি। ১৯২৬ সালে এগারোটি মিল বন্ধ হয় ও ১৩ শতাংশ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান ট্যারিক বোর্ডের সংখ্যাধিক্য সদস্য সূতা ছাড়া সমস্ত বস্ত্রশিল্পের আমদানি শুল্ক পনেরো শতাংশ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ল্যাংকাশায়ার বস্ত্র মালিকদের চাপে সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। ১৯২১ সালে ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি একত্রে এ্যাসোচেম (বা এসাসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স) গঠন করে। ১৯২৭ সালে এর বিকল্প হিসাবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা গঠন করেন কিকি (বা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিস)। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রভাব ভারতের উপরও আসতে শুরু করে। মার্চ, ১৯৩০ সালে সূতাবস্ত্র সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী আমদানি শুল্ক ১১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়, কিন্তু ব্রিটেন থেকে আগত সূতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না বলে বলা হয়। এতে জাতীয় শিল্পপতিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়; বিড়লা ও ঠাকুরদাস আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

৪.১.৪

সরকারি মুদ্রা নীতি (Currency Policy) নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। টাকার সঙ্গে পাউন্ড, শিলিং-এর বিনিময় হার উঁচু করে বাঁধা ছিল। ফলে লাভের দিক থেকে ব্রিটিশ রপ্তানিকারীদের সুবিধা হয়েছিল আর মার খেয়েছিল ভারতীয় আমদানিকারীরা। এই মুদ্রা নীতি বিতর্ক পুঁজিপতিদেরও কংগ্রেসকে এক মঞ্চে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। বণিকগোষ্ঠীগুলি মূলত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও 'প্রেশার গ্রুপ' রাজনীতিতে নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু স্বরাজ্য দল আইনসভার ভেতর থেকে কাজ করত, ব্যবসায়ীদের এদের সঙ্গে থাকতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের গোড়া থেকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন আবার গণআন্দোলনের পথ ধরল তখনই ব্যবসায়ীদের সামনে সিদ্ধান্তের সংকট দেখা দিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে মহামন্দার ফলে ভারতীয়

ব্যবসায়ীদের অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে কিছু প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও তারা আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মার্কোভিটস অবশ্য মনে করেন যে, বণিকগোষ্ঠীর পক্ষে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই কঠিন ছিল কেননা নানান ধরনের জটিলতা ও বিপরীতমুখী টানের দ্বারা তারা জর্জরিত ছিল।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা (ডিসেম্বর, ১৯২৯) পুঁজিপতিদের কাছে অতিরিক্ত র‍্যাডিকাল মনে হয়। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক সরকারের ঋণ অস্বীকারের কথা বোম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেটে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে কমিউনিস্ট অগ্রগতির ভয়ে এবং ১৯২৮-২৯ সাল থেকে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে একটানা শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট চলতে থাকায়, শিল্পপতিরা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেন। কম্যুনিস্ট বিস্তারে আতঙ্কিত হয়ে দোরাবজী টাটা ইঙ্গ-ইউরোপীয়ান মালিকদের যুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। বিড়লা ও ঠাকুরদাসের বাধায় শেষপর্যন্ত এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় এবং জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পুঁজিপতিদের বিচ্ছেদের আশঙ্কা দূর হয়। যদিও ইতিমধ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সরকার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাহলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা বিশ্বাস করতেন যে, বামপন্থী বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই বড়ো ভরসা।

কংগ্রেসের কাছেও পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে গান্ধী বড়লাটের কাছে যে এগারো দফা দাবি পেশ করেন তার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি দাবি ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের : রূপী-স্টার্লিং বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ; বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ; এবং উপকূলবর্তী জাহাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে অর্পণ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন আন্দোলন শুরু হল তখন পুঁজিপতিদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলির মতই দোলাচলতা লক্ষ্য করা যায়। বণিক ও দোকানদাররা আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন জানায় চাঁদা দিয়ে ও বয়কট আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়ে। 'ফিকি' আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনের নীতি সমর্থন ও পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করলেও, শিল্পপতিরা অন্দোলনে প্রকৃত সাহায্য কমই দিয়েছিল। আন্দোলন চলার ফলে শুধু বিদেশি নয়, স্বদেশি কাপড়ের মিলগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে কেননা মিলের কাপড়ের বিকল্প হিসাবে খাদিকে জনপ্রিয় করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেস ও দেশিয় মিল মালিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শেষে গান্ধী কতকগুলি শর্তের ভিত্তিতে স্বদেশি 'মিলগুলিকে' বয়কটের ডাক থেকে মুক্তি দেন। মাত্র আটটি ছাড়া বাকী মিলগুলি প্রকাশ্যত শর্ত মেনে নেয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তারা সেগুলি বাস্তবায়িত করেনি। কিন্তু আন্দোলন যতই দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ততই বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় গণআন্দোলনের ব্যাপকতা ভবিষ্যতের গণবিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। গান্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যখন আন্দোলন স্থগিত রাখেন, তাঁর পেছনে যে বহুতর কারণ কাজ করেছিল, তার মধ্যে বাণিজ্যিক লবীর চাপ ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বিড়লা ও ঠাকুরদাসের নেতৃত্বাধীন ফিকি প্রতিনিধিদল অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়েই গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের দাবি সমর্থন করে। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয় পর্বে যখন আইন অমান্য শুরু হয়, তখন তাকে সমর্থন দিতে পুঁজিপতিরা আরো অনিচ্ছুক ছিল। জাতীয়তাবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে তারা আরো বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৩২ সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত ইম্পিরীয়াল ইকনমিক কনফারেন্সে ইংল্যান্ড ও তার ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হলেও, ভারতীয় শিল্পপতিদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল না। ভারতীয় পুঁজিপতিদের একাংশ এই সময় থেকে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু খুব সহজেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি খুব সহজে হস্তান্তর করবে না এবং সরকারি নীতি পরিবর্তনের মতো ক্ষমতা তখনও

ভারতীয় পুঁজিপতিরা অর্জন করেনি।

৪.১.৫

১৯৩৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ভারতীয় পুঁজিপতিমাত্রই খুশী হয়েছিলেন। তবে এই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব, জওহরলাল নেহেরু ও সুভাচন্দ্র বসুর মত জনপ্রিয় র‍্যাডিকাল নেতাদের আবির্ভাব পুঁজিপতিদের চিন্তিত করে তোলে। আদিত্য মুখার্জী দেখিয়েছেন যে, তা সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপর নির্ভর না করে বল্লভভাই-রাজাগোপালাচারী-রাজেন্দ্র প্রসাদের মত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে এবং স্বয়ং গান্ধীজীকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশও পুঁজিপতিদের সাহায্য লাভে আগ্রহী ছিল। সর্বোপরি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ১১টির মধ্যে ৮টি প্রদেশে গরিষ্ঠতা লাভের সুবাদে মন্ত্রীসভা গঠনের মত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের আরো কাছে টেনে আনে। তবে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে পুঁজিপতিদের একটা বড়ো ভূমিকা থাকলেও, তাদের সাফল্যের পেছনে গণ সমর্থনের জোয়ার ছিল। ১৯৩৭—এর কংগ্রেসকে কখনোই পুঁজিপতিদের দল বলা যায় না।

কংগ্রেস প্রদেশে ক্ষমতায় আসার ফলে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েরই প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়। মাদ্রাজ, ইউ. পি. ও বোম্বাইতে প্রভূত শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক কল্যাণে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। পুঁজিপতিশ্রেণী তেমন কোন সুবিধা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এতে কিছুটা বিচলিত বোধ করে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীকে আশ্বস্ত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কুখ্যাত বোম্বে ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট (নভেম্বর, ১৯৩৮) যার মালিকঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট ছিল। অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে এই মেডল অনুসৃত হয়।

৪.১.৬

এরপর থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও কংগ্রেসের সম্পর্ক কৌশলগত হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ পুঁজিপতিই জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু তারা সাংবিধানিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিল এবং গণঅভ্যুত্থানকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হবার মাত্র চারদিন আগে ঠাকুরদাস, জে. আর. ডি. টাটা ও বিড়লার মত নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিল্পপতি ভাইসরয়কে লেখেন যে যুদ্ধের মধ্যেই ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়াই একমাত্র সমাধান। আন্দোলন শুরু হলে দেখা যায় যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, জামশেদপুর ও দেশের অন্যত্র কেবলমাত্র দেশীয় মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং ও সূতাকলেই শ্রমিক ধর্মঘট সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক সমালোচকের মত বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় শ্রমিক ধর্মঘটগুলি মালিক পরিচালিত লক আউট ছাড়া কিছু ছিল না।

৪.১.৭

বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর আবার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সাংবিধানিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে। পুঁজিপতি সম্প্রদায় এতে আরো নিশ্চিন্ত বোধ করে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসা প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি কংগ্রেস আঁতাতের রূপরেখা গড়ে ওঠে যা ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ১৯৩৮ সালেই সুভাষ

বসুর কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়, তাতে ঠাকুর দাস ও অম্বালাল সরাভাইয়ের মত বিশিষ্ট শিল্পপতিরা সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালে সুবিখ্যাত "বোম্বাই প্ল্যান" প্রণয়ন করে শিল্পপতিরা স্বাধীনতা উত্তরকালের পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন।

৪.১.৮ উপসংহার

সামগ্রিকভাবে ভারতের পুঁজিপতি সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল, অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "Strategic, issue-based and even pragmatic" মূলতঃ নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে তাঁরা এই সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও সত্যি যে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ও দেশদ্রোহী ছিলেন না। পুঁজিপতি ও জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক ছিল তাই অতি জটিল, সতত পরিবর্তনশীল ও বহুমুখীন এক সম্পর্ক।

৪.২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক

৪.২.১ ভূমিকা

গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষককে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত কৃষকের প্রতিবাদের ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে অষ্টাদশ ও ঊনিশ শতকে বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম দু'দশক তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল নরমপন্থী ইংরাজী শিক্ষিত নাগরিক মানুষদের দ্বারা। কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদাসীন ও অস্বচ্ছ। পরবর্তীকালের চরমপন্থীরাও কৃষকদের সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করেননি।

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে কংগ্রেস যখন প্রথম প্রকৃত গণসংগঠনের রূপ নিল তখন থেকেই জাতীয় আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কের স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃপক্ষে ভারতে ফিরে সক্রিয় রাজনীতিতে পুরোপুরি যোগ দেবার আগে বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের ও গুজরাটের খেদায় কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দিয়েই গান্ধী সর্বপ্রথম আন্দোলনের আঙিনায় আসেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় কৃষকের কোনো ঐক্যবদ্ধ সত্তা ছিল না— জোতদার, বড়ো, মাঝারি ও ছোটো কৃষক, ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর সমস্তকেই সাধারণভাবে কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হত। কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনের সম্পর্ক বিচার করার সময় কৃষকশ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিভাজনের কথা মনে রাখতে হবে।

৪.২.২

গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাতে গ্রামাঞ্চলের সর্বশ্রেণীর কৃষকও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই প্রথম জাতীয় রাজনীতির মূল আঙিনায় ভারতীয় কৃষকের আত্মপ্রকাশ। করবন্ধের জন্য কংগ্রেসের আহ্বান বঞ্চিত কৃষকদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলী ও ফৈজাবাদ জেলায় কৃষকরা বাড়তি সেস দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে শুধু বিদেশী সরকার নয়, জমিদারদের সঙ্গে

রায়তদের মুখোমুখি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় কৃষকরা ইউনিয়ন বোর্ডের কর দিতে অস্বীকার করে এবং এই সূত্রে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক ইউনিয়ন গঠিত হয়। বিহারের ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা টানা ভগৎ আন্দোলন শুরু করে চৌকিদারী কর ও খাজনা বন্ধ করে। ওড়িষ্যার কণিকা রাজের প্রজারা আবওয়ার দিতে অস্বীকার করে। মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে গুন্টুর, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় কর বন্ধ আন্দোলন শুরু হলে স্থানীয় অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই দাবি সমর্থন করে। মালাবারের মুসলিম কৃষক ''মোপিলা''-রা স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, অল্পদিনের মধ্যেই এটি সাম্প্রদায়িকতার রঙ পায়।

৪.২.৩

এককথায় অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম মেলবন্ধনের চেষ্টা করে যদিও এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক রকম টানাপোড়েন ছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর (১৯২২) দুটি ধারার মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। ভারতবর্ষে বিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে বামপন্থী চিন্তা ও সংগঠনের পত্তন শুরু হলে স্বভাবতঃই বামপন্থীরা কৃষক আন্দোলনের শূন্যতা পূরণের জন্য উদ্যোগী হন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পেজেন্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হয়। এঁরা সামন্ততন্ত্র বিরোধী অত্যন্ত র‍্যাডিকাল কথাবার্তা বললেও হাতে গোনা মাত্র কিছুসংখ্যক কর্মীবাহিনী নিয়ে কৃষকদের মধ্যে প্রথমেই বড়ো আকারে কোনো কাজ করতে পারেন নি।

এদিকে কৃষকদের দাবির প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীও নানান বিষয়ের উপর নির্ভর করে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে বদলাতে থাকে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রধান দুটি গোষ্ঠী (যথাক্রমে সুভাষ বসু ও জে. এম. সেনগুপ্ত গোষ্ঠী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন) বাংলা প্রজাসত্ব সংশোধনী বিল আলোচনাকালে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) কৃষক ও ভাগচাষী বিরোধী ও জমিদার ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গী অতি নগ্নভাবে প্রকাশ করেন। জে. এল. ব্যানার্জীর মত মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী আইনসভায় সংশোধনী বিল সমর্থন করেন। হিন্দু ''জমিদার'' বনাম মুসলিম ''বর্গাদার'' ছবি ফুটে ওঠে যদিও মুসলমানদের মধ্যেও অনেক জমিদার ছিলেন এবং বর্গাদার বিরোধিতায় তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে কম যেতেন না। এই অবস্থায় ১৯২৯ সালে কৃষক প্রজা পার্টি বাংলাদেশে জন্মলাভ করে। জে. এল. ব্যানার্জী, নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্তের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী হিন্দু গোড়ার দিকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এটি ছিল মূলতঃ মুসলিম ধনী কৃষকের দল।

অনুরূপভাবে পাঞ্জাবে ফজল-ই-হুসেনের নেতৃত্বে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা ও কংগ্রেস-হিন্দুসভা সমর্থক জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরোধিতা করার জন্য ইউনিয়ানিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত হলেও জাঠ হিন্দুদের একটি বড়ো অংশ ইউনিয়ানিস্ট পার্টিতে যুক্ত ছিল। প্রজা পার্টি ও ইউনিয়ানিস্ট পার্টি উভয়েরই কৃষক ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বড়ো দুর্বলতা ছিল যে, তা মূলতঃ ধনী ও বড়ো কৃষকদেরই স্বার্থরক্ষা করত। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস কৃষকদের এইরকম মডারেট ধরনের দাবি-দাওয়ার পক্ষেও দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিল না।

বাংলা ও পাঞ্জাবের মত বিহারেও কংগ্রেস জমিদার ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছিল।

জমিদারী ব্যবস্থার তুলনায় রায়তওয়ারী অঞ্চলে কংগ্রেসের পক্ষে কৃষকদের দাবির স্বপক্ষে আসা সহজ ছিল। যেমন, অন্ধ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ সরকার ১৮$\frac{৩}{৪}$% রাজস্ব বৃদ্ধি চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে

কৃষক আন্দোলন সংগঠনে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা যোগ দেন।

কৃষক আন্দোলনে কংগ্রেস একমাত্র সাফল্য দেখায় গুজরাটের বরদৌলী তালুকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে এখানে গান্ধীজীর একটি কেন্দ্র সক্রিয় ছিল। স্থানীয় সংগঠকদের আহ্বানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পাতিদের কৃষকদের সরকারের কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হন। বরদৌলী এক জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয় ও শেষপর্যন্ত সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করে।

৪.২.৪

এরপর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রে ভারতীয় রাজনীতিতে গণআন্দোলনের জোয়ার আসে। বহু জায়গায় কৃষকরা কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগের অনেক গভীর ভিত্তি ছিল। বিশ্বব্যাপী মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে (১৯২৯) আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্যের বাজারে দাম কমতে থাকে। যেহেতু কৃষকদের লভ্যাংশ কমতে থাকে, তাদের জমিদারকে দেয় খাজনা এবং সরকারকে দেয় ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর বাকি পড়তে থাকে। কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনে এই সুযোগে কৃষকদের টেনে আনার চেষ্টা করে, কৃষকরাও তাদের সংগ্রামে কংগ্রেসকে কাছে পাবার চেষ্টা করে।

উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দাবি জানায় যে জাতীয় ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব কমাতে হবে; সমস্ত ঋণ শোধের উপর এবং জমিদারদের প্রজা উচ্ছেদের উপর স্থগিতাদেশ (meratorium) জারি করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেবলমাত্র প্রথম দাবিটি সমর্থন করে। যা কৃষক ও জমিদার উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করত কিন্তু অন্য দু'টি দাবি গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। উত্তরপ্রদেশেই বামপন্থী কৃষক আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার হয়। বিশেষ করে এম. এন. রায় ও তাঁর সহযোগীদের প্রভাবে এলাহাবাদ ও অযোধ্যার গ্রামাঞ্চলে কর বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়।

পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে, যেখানে প্রধান শস্য ছিল পাট, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার ফলে বিশ্বের বাজারে চটের দাম কমে যাওয়ায় উৎপাদনকারী কৃষকরা বিপন্ন হয়। তারা কর দেওয়া বন্ধ করে। হাজার নির্যাতন ও পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও তারা নতমস্তক হয়নি। শেষপর্যন্ত সরকার সৈন্য নামাতে বাধ্য হয়।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেরারের বুলদানা জেলায় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা তুলা চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকলে, চাষীরা কৃষক ইউনিয়ন তৈরি করে কর দেওয়া বন্ধ করে ও খাজনা দেওয়াও বন্ধ করে। কৃষক স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারে বেরোয়; জমিদার ও মহাজনদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ও তাদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক সম্প্রদায় এই স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে অংশ নেয়।

বিহারে কিষাণ সভা গড়ে ওঠে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে। বিহারের পশ্চাদ্‌পদ জেলাগুলিতে কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন কার্যানন্দ শর্মা। পরবর্তীকালে তিনি কম্যুনিস্ট দলে যোগদান করেন। সহজানন্দ কিন্তু বামপন্থী সদস্য হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যেই থেকে যান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্তগান্ধী গফ্‌ফর খানের অনুগামী খুদা-ই-খিদমাৎগার ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে রায়বাদীরা কৃষকদের দাবি দাওয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্যে গান্ধীবাদী স্বামী রামানন্দ তীর্থ এক শক্তিশালী কৃষক

সংগঠন গড়ে তোলেন।

আসামের শ্রীহট্ট জেলায় মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভামানীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দেলন গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষ্য করার বিষয় হল যে অসহযোগ আন্দোলনের সমসাময়িককালে এই সমস্ত কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠলেও, এইসব আন্দোলনগুলিই ছিল বিচ্ছিন্ন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারা আদৌ নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কিযাণ সভার স্থানীয় শাখা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় কম্যুনিস্ট বা কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের নেতৃত্বে। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে এই কৃষক আন্দোলনগুলি সহায়ক হয়েছিল। জঙ্গী কৃষক লড়াই করেছেন নিঃসন্দেহে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য, কিন্তু সেই লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন ও বুঝতে পারেন যে সাম্রাজ্যবাদই সকল দুর্গতির মূল।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে রাজনৈতিক জীবনে আবার শূন্যতা নেমে আসে। এই সময় শ্রমিক ও কৃষককে সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসেন গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা। গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীরা বিভিন্ন 'আশ্রম' গড়ে তুলে কৃষকদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন এবং সেইসব জায়গায় কৃষকদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল আঙিনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। ভারতের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বাংলাদেশে আরামবাগ, কুমিল্লা, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে এইরকম গ্রামীণ অশ্রম গড়ে উঠেছিল। আবার অনেক পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলে স্থানীয় ধর্মপ্রচারক বা ধর্মগুরুরা কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসকে কাজে লাগান। অন্যত্র সাধারণভাবে স্থানীয় ও শ্রেণীগত সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বামপন্থীরা কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এইসব প্রচেষ্টাই চরম পরিণতি লাভ করে সারা ভারত কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

৪.২.৫

অন্ধ্রে এন. জি. রঙ্গ ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রাদেশিক রায়ত এসোসিয়েশন এবং জমিদারী প্রজাদের জন্য জমিন রায়তম এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। রঙ্গ ১৯৩৫ সাল থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার ও খেতমজুরদেরও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে রঙ্গকে সাধারণ সম্পাদক ও ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদকে যুগ্ম সম্পাদক করে South Indian Federation of Peasants and Agricultural Labour গঠিত হয়। এঁদের মধ্যে সম্মেলনে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সমাজতন্ত্রীরা ১৯৩৬ সালে মীরাট সম্মেলনে এই দাবি সমর্থন করেন। সারা ভারত কিযাণ সভার প্রথম সম্মেলন হয় লক্ষ্ণৌতে (১৯৩৬)। গুজরাটের বিক্ষুব্ধ গান্ধীবাদী নেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সম্পাদনায় কিষাণ সভার মুখপাত্র হিসাবে কিষাণ বুলেটিন প্রকাশিত হয়। কিষাণ সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী।

কিযাণ সভার দাবি সনদ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এতে ভূমিহীন কৃষক বা খেতমজুরের তুলনায় জোতমালিক কৃষকদের দাবি দাওয়ার উপর বেশি জোর পড়ে। কৃষক সমাজের মধ্যেকার বিভাজন এবং তদ্‌জনিত সমস্যাগুলিকে এঁরা কিছুটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিষাণ সভার মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল ঃ কর ও খাজনা ৫০ শতাংশ হ্রাস, সব প্রজাকে চাযের সত্ব অধিকার দেওয়া, বেগার প্রথার অবলুপ্তি; ঋণ ও সুদ মকুব, বন্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। সারা ভারতে কিষাণ সভার প্রাদেশিক শাখা বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর নীচে ছিল জেলা ও অঞ্চল শাখাগুলি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভার প্রথম সম্মেলন বসে বাঁকুড়ার ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে। কৃষক আন্দোলন এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়। এইসব জায়গায় কৃষক নির্যাতন ছিল আরো বেশী।

৪.২.৬

নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি তে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হলে স্বভাবতঃই কৃষকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কংগ্রেস সরকারগুলি কৃষক স্বার্থে কিছু সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নেন যেমন সুদের হার নির্দিষ্টকরণ, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে বৈধ কৃষকদের উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে গোচারণ কর তুলে নেওয়া। কিন্তু জমিদারী প্রথা অবসানের মত মৌলিক দাবির বিষয়ে তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন। কোন প্রদেশেই কংগ্রেস বা অ-কংগ্রেসী সরকারের কেউই শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণীর সমর্থন খোয়ানোর ভয়ে জমিদারী উচ্ছেদের বিষয়ে আদৌ অগ্রসর হতে পারেন নি।

এই অবস্থায় ১৯৩৭-৩৯ সালের মধ্যে কিষাণ সভার সমর্থক সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তারা ক্রমশঃই জঙ্গী হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের প্রভাব কৃষক সংগঠনের উপর দ্রুত বাড়তে থাকে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা, পুলিশ ও জমিদারদের অত্যাচার কিছুই কৃষকদের আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি।

৪.২.৭

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করার পর আন্দোলনমুখী রাজনীতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে (১৯৩৯)। কিন্তু ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে সারা ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে অভূতপূর্ব জনজাগরণ সৃষ্টি হয়, কৃষক সমাজ তাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলধারায় কৃষকরা প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও কৃষকের জন্য বিশেষ কোনো কর্মসূচী কংগ্রেস তখনও গ্রহণ করেনি। যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কৃষকদের মধ্যে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে তেভাগা আন্দোলন (অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে এক-তৃতীয়াংশ দাবি) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

৪.২.৮ উপসংহার

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে কৃষককে বাদ দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন কখনও গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই কংগ্রেসের আন্দোলনেও লক্ষ লক্ষ কৃষক সামিল হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল বহু-শ্রেণিক (multi-class) আন্দোলন; কাজেই কংগ্রেস অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে কৃষকদের এমন কোনো দাবি-দাওয়াকে সমর্থন করতে পারেনি। এর ফলে, কৃষক আন্দোলন মূলতঃ স্বাভাবিকভাবেই চলে যায় বামপন্থীদের হাতে। আবার যেহেতু ভারতের কৃষক সমাজ বহুধা ধারায় বিভক্ত ছিল, তাই কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনও গড়ে তোলা সহজ ছিল না।

৪.৩ কংগ্রেস ও শ্রমিক

৪.৩.১ ভূমিকা

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় পুঁজির বিনিয়োগের ফলে ভারতে বাগিচাশিল্প, খনি, পাট ও বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এবং রেলওয়ের মত নতুন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে ভারতের সমাজজীবনে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে— তাহল শিল্প শ্রমিকশ্রেণী। যদিও প্রচলিত মার্কসীয় অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে ভারতে আদৌ উদ্ভব ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর

মগ্নচৈতন্য তার কৃষকসভা দীর্ঘদিন পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল। স্বভাবতঃই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের সময় শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক নানা ধরনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছিল।

৪.৩.২

প্রথম পর্বে অর্থাৎ প্রাক্ ১৯০০ যুগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন ও পূর্বপরিকল্পনাহীন। তাৎক্ষণিক ক্ষোভে শ্রমিকরা ফেটে পড়ত, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। মডারেট পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃত্বেরও শ্রমিকদের বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। বাংলা শশীনন্দ ব্যানার্জী ও বোম্বাই-এর এন. এম. লোখাণ্ডের মত মানবতাবাদীরা শ্রমিকদের হিতসাধনের চেষ্টা করলেও তাঁদের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ ছিল না।

দ্বিতীয় পর্ব ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ (১৯০৩-০৮) চরমপন্থী রাজনীতিকরা সর্বপ্রথম শ্রমিক সাধারণের বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাঁদের উৎসাহ ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং আংশিক। ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আন্দোলনে তারা যত উৎসাহী ছিলেন, স্বদেশি শিল্পের ব্যাপারে ঠিক ততটাই ছিলেন উদাসীন। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক ছিল হাতিয়ার, কিন্তু শ্রমিকের নিজস্ব অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

৪.৩.৩

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিকদের উপর আঘাত আসে। সমস্যা তীব্রতর হয় যুদ্ধ শেষে ব্যাপক ছাঁটাই ও বেতন হ্রাসের ফলে। ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করে। কংগ্রেস সংস্কারবাদী সাংবিধানিক চরিত্র কাটিয়ে উঠে গণমুখী ও আন্দোলনবাদী চরিত্র অর্জন করে। গান্ধীর মধ্যে সেই নেতৃত্বগুণ ছিল যা সব প্রদেশের সব শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারত। কাজেই এই সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেল। যদিও এই সময় যে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট ঘটেছিল, তার প্রায় সবগুলিই ছিল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন যে সাধারণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, পূর্ববর্তী অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এই পর্বের শ্রমিক আন্দোলনের পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু তখনও শ্রমিক আন্দোলন শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক গণআন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্ক স্পষ্ট তখনও হয়নি। চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে একাংশ চেয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে যদিও দাস মার্কসবাদী ছিলেন না, ছিলেন র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী। কিন্তু স্বয়ং গান্ধী মনে করতেন যে, এই প্রস্তাব অবাস্তব ও নিষ্ফল। দাসের প্রস্তাব গ্রহণ করলে জাতীয় আন্দোলন নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হবে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দাবি সমর্থন করতে গেলে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সমর্থন হারাতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

৪.৩.৪

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ও শ্রমিক আন্দোলনের ধারা আবার দুটি খাতে বইতে শুরু করে। অধিকাংশ কংগ্রেসী শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ হারায় এবং সংসদীয় রাজনীতিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে

বামপন্থীরা। সাম্যবাদের ধারণা কুড়ির দশকের মধ্যভাগে ভারতে বিস্তৃত হতে থাকে। শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা বামপন্থীদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য হত।

৪.৩.৫

গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ঠিক এক দশক বাদে আবার শুরু হল দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার (১৯২৮-৩৪) প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতির উপর পড়তে শুরু করেছিল। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ১৯২৭-২৯ সালের তুলনায় বা এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের তুলনাতেও শ্রমিকশ্রেণীর আইন অমান্য আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মত। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে পূর্ববর্তী এক দশকে কংগ্রেসের উপর বণিক শিল্পপতিশ্রেণীর প্রভাব যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, শিল্প শ্রমিকদের উৎসাহ সেই হারেই কমতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় কংগ্রেস থেকে যে কতটা সরে গিয়েছিল এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর উপর কম্যুনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যেরও ইঙ্গিত এর থেকে পাওয়া যায়। ১৯২৮ সালে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে জাতীয় বুর্জোয়া পরিচালিত সংগঠন ও আন্দোলন থেকে বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিস্টদের সরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হন কম্যুনিস্টরা।

৪.৩.৬

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে শ্রমিক আনোদলনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠনের ও আইনসভায় শ্রমিক কেন্দ্র থেকে শ্রমিক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতা কংগ্রেসকে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার ও ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকৃত হয়। নির্বাচনে ১১টির মধ্যে ৭টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়।

স্বভাবতঃই নির্বাচিত সরকারের কাছে শ্রমিক সাধারণের প্রত্যাশা ছিল বিরাট। কিন্তু নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভগ্নাংশই পূরণ করা গিয়েছিল। কাজেই তার ফলে স্বভাবতঃই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হল যে, ১৯৩৭-৩৯ সময়সীমার মধ্যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি না ঘটলেও, চারপাশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে শ্রমিকরা তাদের দীর্ঘমেয়াদী দাবি-দাওয়া নিয়ে উত্তাল হয় ওঠে। এই অবস্থায় কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বোঝাপড়ার গুরুতর সংকট দেখা দেয়। এই সুযোগে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা শ্রমিক মহলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নেয়।

৪.৩.৭

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর জাতীয়তাবাদী ও শ্রমিক আন্দোলনে নতুন পর্ব শুরু হয়। যুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব সমাজের সবশ্রেণীর মত শ্রমিকদেরও বিপর্যস্ত করেছিল; মহার্ঘভাতা, রেশনিং ইত্যাদির দ্বারা তার সামান্য সমাধানই ঘটেছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে কংগ্রেস খুব একটা আন্দোলনে উৎসাহী ছিল না, বরঞ্চ কম্যুনিস্টরাই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে উদ্বোধিত করে।

কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার পর কম্যুনিস্টদের চোখে যুদ্ধের চরিত্র

সাম্রাজ্যবাদী থেকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হলে কম্যুনিস্টরা সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য দেবার নাম সমস্তরকম শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময় থেকেই কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয়। এই ভারত ছাড় আন্দোলনে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র। আমেদাবাদ এবং জামশেদপুরের মত জায়গা যেখানে মালিকপক্ষ ছিল কংগ্রেস সমর্থক এবং ইউনিয়নগুলি ছিল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত, কেবলমাত্র সেখানেই উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। ভারত ছাড় আন্দোলনের সূত্রে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হওয়ার ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগ কম্যুনিস্টরা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

৪.৩.৮

শ্রমিকশ্রেণীর উপর জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবের গুরুত্ব আবার নতুন করে অনুভূত হয় ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে। ১৯৪৬ সালের আইনসভা নির্বাচনে শ্রমিক আসনের জন্য কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট প্রার্থীরা পরস্পরের মুখোমুখি হন। যুদ্ধ শেষে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল তাতে অধিকাংশ শ্রমিক কেন্দ্রেও কংগ্রেস প্রার্থীরা বিজয়ী হন। এখন কংগ্রেসের সামনে সমস্যা হল ভোট বাক্সের এই সমর্থন সংগঠনে রূপান্তরিত করা। জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীবাদী হিন্দুস্তান মজদুর সেবক সংঘের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন (১৯৪৫), অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে নিজ ছত্রছায়ায় আনার জন্য কংগ্রেসের মরিয়া প্রয়াস (১৯৪৬) এবং তাতে ব্যর্থ হলে, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭)—এইসব ধাপগুলিই ছিল এই চিন্তার ফসল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্বে (১৯৪৫-৪৭) দেখা যায় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নানাভাবে আঘাত আসছে— ছাঁটাই, বেতন হ্রাস, ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করা ইত্যাদির দ্বারা। অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে মার্চ, ১৯৪৬ সময়কালে প্রায় তিনটি শিল্পে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ দাবি-দাওয়া ছিল অর্থনৈতিক এবং দাবি অংশত পূরণের পরেই ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে তারা সত্যকারের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। ততদিনে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল, কাজেই শ্রমিক অশান্তিকে তারা পরিহার করেই চলতে চেয়েছে।

৪.৩.২ উপসংহার

সব মিলিয়ে দেখলে জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক কখনোই নিবিড় হয়নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারা থেকে শ্রমিকশ্রেণী সাধারণভাবে দূরেই ছিল। গান্ধী স্বয়ং এই শিল্প সম্পর্কে যে অনবহিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু শ্রমিককে রাজনীতির ক্রীড়নক হিসাবে তিনি দেখতে চাননি। তাঁর কল্পিত মডেল ছিল আহমেদাবাদ সুতাকল শ্রমিকের সংগঠন। তাঁর নিজের হাতে গড়া মজুর মহাজন। অরাজনৈতিক ও কল্যাণকামী সংস্থা হিসাবে তিনি তা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস গান্ধী প্রস্তাবিত আদর্শ গ্রহণ করতে পারেনি। তার ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেখা গেল বহুধাবিভক্ত ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠা অজস্র শ্রমিক সংগঠন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন কোনটাই এর ফলে পুষ্টি লাভ করতে পারেনি।

৪.৪ দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ : ভারতের ভিতরে ও বাইরে

৪.৪.১ ভূমিকা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের সংযোজন করেছিল। এর পটভূমি রচনা করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতীর মত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের শিক্ষা; লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতার মত চরমপন্থীদের লাগাতার প্রচার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে মাৎসিনি ও গ্যারীবল্ডীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, রাশিয়ায় নিহিলিস্টদের আক্রমণ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রাচ্যের নবজাগ্রত শক্তি জাপানের সাফল্য।

ঊনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়াতেই এই বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি, চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় রাজনৈতিক মতেরই ব্যর্থতা যুবকদের এক বড়ো অংশকে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর (১৯১৪) বিপ্লবী আন্দোলনে এক নবপর্যায় শুরু হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। ভারতের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব।

৪.৪.২

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে (১৮৪৮-৫২) ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জনক বলে পরিচিত। এরপর মহামান্য তিলকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের ফলে সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন, মিত্রমেলা, অভিনব ভারত সমাজ, আর্য বান্ধব সমাজ প্রভৃতি। চাপেকার ভ্রাতাদের ও বীর সাভারকরের নাম এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু নানা কারণে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত শিখধর্মের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, কৃষকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ আর্যসমাজের প্রভাব এবং লাজপত রায়ের অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। অজিত সিং ও লালা হরদয়ালের দেশত্যাগের ফলে (১৯০৮-১০) প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী আন্দোলনের অবসান ঘটে।

বাংলাদেশে প্রাচীনতম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালে। ১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা যুগান্তর। পরে অনুশীলন সমিতি থেকে একটি গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে যুগান্তর সমিতি নামে আর একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর বোমার মামলায় ধরা পড়ার সূত্রে এই সমিতির গুপ্ত কাজকর্মের সন্ধান পায় পুলিশ। এর ফলে শুরু হয় বিখ্যাত মুরারীপুকুর বোমার মামলা। এই মামলার সূত্রে (১৯০৮-১০) যুগান্তর দলের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেফতার হন। অরবিন্দ নিজে মুক্তি পেলেও সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে সাধনার জন্য পণ্ডিচেরী চলে যান।

৪.৪.৩

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শুরু হবার কাছাকাছি সময়

থেকে। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম পর্বের কর্মকাণ্ড মূলত সরকারি আধিকারদের হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্বে বিপ্লবীরা আরো বড়ো আকারে সরকারি শাসনযন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এইজন্য দেশের বিভিন্ন অংশের গুপ্ত সমিতিগুলি একত্র হয়ে এমনকি বিদেশের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্র আনিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালাতে সচেষ্ট হয়েছিল।

বাংলার অনুশীলন সমিতি রাসবিহারী বসুর অসামান্য নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়ে উত্তর ভারতে তার কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করে। ১৯১২ সালে দিল্লীতে ভারতের নতুন রাজধানী স্থাপিত হবার সময়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের দিল্লী প্রবেশ কালে বোমা নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার এক পরিকল্পনা করেন রাসবিহারী। শেষপর্যন্ত অবশ্য বড়লাট প্রাণে বেঁচে যান। এরপর মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সৈন্য ব্যারাকে এক সঙ্গে অভ্যুত্থান ঘটানো। ১৯১৫ সালের একটি বিশেষ দিন স্থরীকৃত হয়। কিন্তু একজন সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। পুলিশ তন্ন তন্ন করে রাসবিহারীর সন্ধান করতে থাকে। রাসবিহারী ছদ্মনাম পি. ঠাকুর ধারণ করে জাপানে চলে যান। বাকী জীবন তিনি জাপানেই অতিবাহিত করেন এবং সেখান থেকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (বা আই. এন. এ.) প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পর্বে যুগান্তর গোষ্ঠী পুনর্জীবিত হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানী করে অভ্যুত্থানের এক গোপন পরিকল্পনা তাঁরা প্রস্তুত করেন। কোনোভাবে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে তা ফাঁস হয়ে যায়। ওড়িশ্যার বালেশ্বরের সমুদ্রোপকুলের কাছে বুড়ীবালাম নদী তীরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 'বাঘা যতীন' ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা নিশ্চিত ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের এইভাবে অবসান ঘটে।

অসামান্য বীরত্ব সত্ত্বেও উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো, জনসমর্থন ও অর্থের অভাব এবং সরকারি গোয়েন্দাবাহিনীর যোগ্যতর পরিকাঠামোর দরুন সশস্ত্র বিপ্লববাদের ধারাবাহিক ক্রমান্বয়িক ব্যর্থতা স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসাবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনের এক নতুন রাজনীতি শুরু হয়। সব কিছু মিলিয়ে উনিশশো বিশের দশকের প্রথম দিকে সশস্ত্র আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে।

৪.৪.৪

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের কার্যকলাপ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাইরেও তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল। বহির্বিশ্বে বসবাসকারী ভারতীয়, ভারত থেকে নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী ও বিদেশে কর্মরত সৈনিক—সব শ্রেণী থেকেই এই বিপ্লবী দলগুলির কর্মী ও সমর্থকরা এসেছিল। এদের কাজ ছিল প্রধানত—(১) ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের যোগান দেওয়া। (২) ভারতীয় ছাত্র ও অভিবাসী ভারতীয়দের মধ্য থেকে নতুন বিপ্লবী সংগ্রহ করা এবং ভারতীয় যুদ্ধ বন্দী ও ভারতীয় ইউনিটের সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার নেতৃত্বে লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে বিদেশে প্রথম সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপের দিক্‌চিহ্ন বলা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নজরদারী ও ক্রমাগত বাধাদানের

ফলে বিপ্লবীদের মূল কর্মকেন্দ্র লন্ড থেকে প্যারিসে সরে যেতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামা প্যারিস থেকে ‘তলোয়ার’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। লন্ডন থেকে অধিকাংশ বিপ্লবী কর্মীই প্যারিসে চলে আসেন। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর দরুন ফরাসী সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের আর কাজ চালাতে দিতে রাজী ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবশ্য ভারতীয়দের সামনে নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। যুদ্ধে জার্মানী ব্রিটিশ বিরোধী পক্ষে শীর্ষস্থানে ছিল, তাই ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সাহায্য দিতে সে উৎসাহী ছিল। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী জার্মানীতে সক্রিয় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা বার্লিনে মিলিত হয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স কমিটি গঠন করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন দত্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্লবীরা এই কমিটিতে যোগ দেন। এই কমিটি ভারতে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি এবং জার্মানীর সরকারি অফিসারদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত এবং ভারতে অস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করত। বাঘা যতীন প্রস্তাবিত অভিযানের সঙ্গে এই বার্লিন কমিটির সংযোগ ছিল।

১৯১৫ সালে জার্মানীর সমর্থনে কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হন বরকতুল্লাহ্। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতের প্রসিদ্ধ ঐস্লামিক শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্ধ থেকে বহুসংখ্যক কর্মী গোপনে ভারত ত্যাগ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যান। এই মুজাহিরদের নেতা ওবেইদুল্লা সিন্ধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অস্থায়ী সরকারে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার মুজাহিরদের বিষয় জানতে পারে ও ভারতে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেফতার করে ও তাদের বিরুদ্ধে রেশমী রুমাল মামলা চালু করা হয়।

আমেরিকাতেও ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড পিছিয়ে ছিল না। ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেখানে মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিপ্লবী ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা সংশ্লিষ্ট সরকারের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমেরিকায় ও কানাডায় সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনগুলির ব্যাপক গণভিত্তি ছিল ও সাধারণ মানুষের সমর্থনের উপরই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১৩ সালে আমেরিকার ‘এ্যস্টোরিয়ায়’ গদর পত্রিকা ও তার সাথে যুক্ত গদর পার্টি নামে এক বিপ্লবী দল স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শুধু আমেরিকা ও কানাডায় নয়, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেমন চীন, জাপান, মালয় ও সিঙ্গাপুরে গদর পার্টি তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে। কামাগাতামারু জাহাজকে কেন্দ্র করে ভারতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গেও সম্ভবত গদর পার্টির যোগ ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে আমেরিকায় ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ কড়া হাতে দমন করা হয়। ভারতীয় বিপ্লবীদের বিখ্যাত হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৮) অভিযুক্ত করা হয়। এদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জার্মান-ভারতীয় যোগাযোগের সম্ভাবনা নষ্ট হয়। ইতিমধ্যে, বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে (১৯১৭) জার্মানী থেকে বিপ্লবীদের একটি গোষ্ঠী রাশিয়ায় চলে যান। এঁদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে প্রবাসী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম গঠিত হয়।

এইভাবে বিদেশে ভারতের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন গোষ্ঠী মধ্যে ঐক্য ও যোগাযোগের অভাব, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের অপ্রতুলতা, ব্যাপক গণভিত্তি না থাকা প্রভৃতি নানা কারণে এইসব প্রবাসীদের কর্মকাণ্ড সফল হয় নি। কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি তাঁরাই প্রথম সার্থকভাবে জগৎসভায় উত্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাছড়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিদেশে সশস্ত্র

আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে গেলেও তার ধারা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণ আবার পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত আই.এন.এর. (বা ভারতের জাতীয় বাহিনী) ঐতিহাসিক অভিযানের সময়।

৪.৪.৫

দেশের ভিতরে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক প্রত্যাহার (১৯২২) কংগ্রেসের মধ্যে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক, স্বরাজ্য দলের উত্থান ও ব্যর্থতা, সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ব্রিটিশ নীতির প্রতি জনসাধারণের আস্থাহীনতা সব কিছু মিলিয়ে কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবার নতুন জোয়ার আসে।

১৯২৪ সালে উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা মিলিত ভাবে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যরা কাকোরী রেল স্টেশনে এক মেল ট্রেনে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতিতে লিপ্ত হন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় চারজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর মৃত্যুদণ্ড হয়। (১৯২৫) এরপর সংগঠনের নতুন নাম হয় হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। নেতৃত্বে আসেন ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদ। পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিং পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনে এক নতুন মোড় নিয়ে আসেন। পুলিশের লাঠি চালনায় বরেণ্য দেশনেতা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে দায়ী পুলিশ অফিসার ল্যান্ডার্সকে হত্যা করেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। (১৯২) পরের বছর কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন কক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর বোমা নিক্ষেপ করেন। কেউই পালাবার চেষ্টা করেন নি এবং ঘোষণা করেন যে কাউকে আঘাত করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল সরকারি দমন নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ সর্বসমক্ষে নিয়ে আসা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের দুজনকে ও আরো বহুসংখ্যক বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু এবং সুখদেবের প্রাণদণ্ড হয়। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির পরে উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যবনিকাপাত পড়ে যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। এর সর্বশেষ সংযোজন ছিল ১৯৪০ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও ডায়ারকে লন্ডনে হত্যা।

৪.৪.৬

বাংলাদেশেও এই সময় বিপ্লবী আন্দোলনে পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। পূর্বতন দুই প্রধান বিপ্লবী সমিতি অনুশীলন ও যুগান্তরের পরিবর্তে কয়েকটি নতুন বিপ্লবী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রাম জেলায় সূর্য সেন (মাষ্টারদা নামে সুপরিচিত) গড়ে তোলেন রিপাবলিক্যান আর্মি যাতে জড়ো হয় অদম্য সাহসী অকুতোভয় কিছু যুবক-যুবতী—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা, চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁরা আকস্মিক আক্রমণ চালান অস্ত্রাগার, থানা ও পুলিশ ব্যারাক, ধ্বংস করেন রেল ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘোষণা করেন স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ দুদিনের জন্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে শহরকে মুক্ত করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে শেষপর্যন্ত লড়াই চালান পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে।

প্রায় একই সময়ে ঢাকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বা বি.ভি.) শক্তিশালী বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাংলা সরকারের প্রধান কার্যালয় রাইটার্স বিল্ডিংসে ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধে তিনজন নেতৃস্থানীয় বি. ভি. কর্মী বিনয়-বাদল-দীনেশ হত্যা করেন কারা বিভাগের আই. সি. সিম্পসনকে। ঘটনাস্থলেই বাদলের মৃত্যু হয়। বিনয় মারা যান কয়েকদিন বাদে, দীনেশের বিচারের পর ফাঁসি হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

ও অলিন্দ যুদ্ধ ছাড়াও আরো কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এই সময়ে ঘটেছিল। ১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার পর পর তিনজন জেলাশাসককে হত্যা করেন বি. ভি. কর্মীরা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহিলা বিপ্লবী বীণা দাস বাংলার গভর্নরকে হত্যা করার এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

৪.৪.৭ উপসংহার

এই তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্বের বিপ্লবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল যে, ভগৎ সিং এবং সূর্য সেনের মত নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের দ্বারা দেশকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না; কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ দেশে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে যা জনজাগরণ ও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথ প্রশস্ত করবে। দ্বিতীয়ত, ভগৎ সিং ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম যিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং মার্কসবাদের কিছু মৌলিক ধারণা গ্রহণ করেন। সূর্য সেনের অনুগামীদেরও অধিকাংশ যাঁরা জালানাবাদ যুদ্ধের পর জীবিত ছিলেন অধিকাংশ মার্কসবাদী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩০-এর দশকের পর থেকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মোটামুটি পরিসমাপ্তি ঘটে। জেলের ভিতরে ও বাইরে অধিকাংশ বিপ্লবী কর্মীই বামপন্থী ও মার্কসবাদী চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ভারতীয় রাজীনীতির ইতিহাসে এটি একটি গুরত্বপূর্ণ বাঁক।

কাজেই সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার যথার্থই বলেছেন যে, তাঁদের ব্যর্থতা ছিল সাহসী ও গৌরবদীপ্ত। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অহিংস গণআন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল ভারতের জাতীয় সংগ্রামের পরস্পর পরিপূরক দু'টি ধারা। তাছাড়া, এই বিপ্লবী আন্দোলনের পথ বেয়েই ভারতে মার্কসবাদী ধারণার প্রসার ও সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটে।

৪.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের সম্পর্ক (১৯২০-৪৭) বিশ্লেষণ কর।

২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কৃষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল? (১৯২০-৪৫)।

৩। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদের অবদান আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সারা ভারত কিষাণ সভার উদ্ভবের বিবরণ দাও।

২। ভারতের শিল্প শ্রমিকের স্বাধীনতা আন্দোলনে কতটা জড়িত ছিল।

৩। ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কতটা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করতে পেরেছিলেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ফিকির পুরো নাম কী?

২। সারা ভারত কিষাণ সভার প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

৩। ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪। বাঘা যতীন কে?

৫। প্রথম প্রবাসী অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের প্রধান কে ছিলেন?

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। Markovits Claude — Indian Business and Nationalist Politics, 1931-39 (Orient Longman).

২। Sen Sukomal—Working Class of India : History of Emergence and Movement, 1830-1970 (K.P. Bagchi, Kolkata).

৩। Dhanagare D. N.—Peasant Movements in India, 1920-1950 (O.U.P.).

৪। Bandyopadhyay Sekhar — From Pleassey to Partition : A History of Modern India (Orient Longman).

৫। Chandra Bipan, Tripathi Amales and De Barun—Freedom Struggle (National Book Trust).

ইতিহাস (স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

তৃতীয় পত্র ঃ পর্যায় - ৩

একক ১ □ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ

গঠন ঃ

১.০ উদ্দেশ্য-সমূহ
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট , ১৯৩৫ বা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫
১.৩ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন
১.৪ ক্ষমতায় কংগ্রেস ঃ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম
১.৫ সূত্র নির্দেশ
১.৬ অনুশীলনী
১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য-সমূহ

এই এককের উদ্দেশ্য হল ঃ

- বিশেষত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক আইনসভা, ভারতে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তার ধারাগুলিকে তুলে ধরে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের প্রচ্ছন্ন বিপদগুলি হৃদয়ঙ্গম করা;
- কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রকৃতি এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করা;
- কংগ্রেসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে বিচার করা।

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককে ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া, এই এককে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কাজকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.২ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বলবৎ হওয়ার দশ বছর পর এক পর্যালোচনার সংস্থান রাখা হয়েছিল। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশনের নিযুক্তি দিয়ে শুরু এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া অবশেষে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শুধুমাত্র দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩২ সাল থেকে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভারতীয় ভূমিকা যৎসামান্য হয়ে পড়ে**। ১৯৩২ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ও শেষ গোল টেবিল বৈঠকে মাত্র ৪৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ১৯৩১ সালে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১১২।

গোলটেবিল বৈঠক নিজের দায়িত্ব পালন করার পর ব্রিটিশ সরকার তার প্রস্তাবগুলিকে সূত্রায়িত করে এবং "ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব" (Proposals for Indian Constitutional Reform) শীর্ষক একটি শ্বেতপত্রে (white paper) সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভবিষ্যৎ সরকার সম্পর্কে বিবেচনা করতে লর্ড লিনলিথগোর নেতৃত্বে (এপ্রিল, ১৯৩৩) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এক সংযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে পেশ করা এই রিপোর্ট মোটামুটিভাবে ওই প্রস্তাবগুলির মূল বক্তব্যগুলিকে অনুমোদন করে। এই রিপোর্ট ও শ্বেতপত্রের ভিত্তিতেই রচিত হয় ভারত সরকার বিল বা গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বিল, যা ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (ভারত-বিষয়ক সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ভারত সচিব) স্যার স্যামুয়েল হোর হাউস অফ কমন্সে পেশ করেন। কোনও বড়ো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই বিলটি ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট অনুমোদন লাভ করে। নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সীমা নির্ধারণ ও অর্থ বরাদ্দ করার নীতি সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গঠিত দুটি কমিটি ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে তাদের রিপোর্ট পেশ করে।

এই শ্বেতপত্র ও তার সঙ্গে সংযুক্ত কমিটির রিপোর্টটিও ভারতে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে যে এই শ্বেতপত্র তাদের প্রত্যাশা পূরণ তো করেইনি, বরং তার দিকে অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের জাতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত সমালোচনা করেন।

আইনের ধারাগুলি

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ দুটি প্রধান বিষয়ে বিভক্ত ঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' (Federation of India)।

এই আইন অনুযায়ী এক "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র" গঠনের কথা হয়, যার অন্তর্ভুক্ত হবে গভর্নর বা রাজ্যপাল-শাসিত প্রদেশগুলি। 'ইনস্ট্রুমেন্টাল অফ্ অ্যাকশেসনের' (Instruments of Accession) মাধ্যমে এতে যোগ দেবে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি (princely states) এবং চিফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলি। আইনত সবকটি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

কিং-এমপারার বা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহিক প্রাধিকার (executive authority) গভর্নর-জেনারেলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কার্য নির্বাহ করবেন একটি মন্ত্রীসভার সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে, যে মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর ইচ্ছার উপর। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর 'নিজস্ব বিবেচনা', এবং অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত বিচার' প্রয়োগ করতে হত। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়াই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয়টিতে মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেও তা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। এ ছাড়া, চারটি বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল ঃ প্রতিরক্ষা, যাজক বা গীর্জা সংক্রান্ত বিষয়, বিদেশিক সম্পর্ক

** ১৯৩২ সাল থেকে সংবিধান প্রনয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অনীহা দেখা যায়।

(যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের কোনও অংশের মধ্যে সম্পর্ক ছাড়া) ও জনজাতি বা আদিবাসী-সংক্রান্ত বিষয়। তাঁরই নিযুক্ত কৌসুলি বা পরামর্শদাতাদের সাহায্য নিয়ে তিনি এই বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন। এছাড়া, তিনি একজন আর্থিক উপেদষ্টা নিয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। আবার নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রীসভার মাধ্যমে কাজ করা গভর্নর-জেনারেল নয়, সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলের (Federal Legislature) দুটি কক্ষ ছিল। রাজ্যসভার (council of states) সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার (Federal Assembly) সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭৫। রাজ্য সভা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভাতে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৪ ও ১২৫-এর বেশি হত না। জনগণ নয়, এই প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করতেন তাঁদের শাসকরা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলিতে নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর (separate electorates) নীতি। দুটি কক্ষের ক্ষমতা প্রায় সমান সমান হলেও আর্থিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার আধিপত্য ছিল বেশি।

তিনটি বিধান বিষয়ক তালিকার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও তার অঙ্গগুলির বিধান বিষয়ক ক্ষমতার প্রভেদ নির্দেশ করা হয়। এক নম্বর তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, রেল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ন্যস্ত করা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার হাতে। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি দুই নম্বর তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি অর্থাৎ, আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয়-স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পায়। তিন নম্বর তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি, যেমন ফৌজদারি বিধি, চুক্তি বা ঠিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভা ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি সমবর্তী বা যুগ্ম ক্ষমতার অধিকারী হয়। আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেলকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

মৌলিক এক্তিয়ার, আপিল ও পরামর্শের অধিক্ষেত্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার সংস্থান রাখা হয়। মৌলিক এক্তিয়ারের ক্ষেত্রে এই আদালতের বিচারে আসে নিম্নলিখিত যে কোনও দুটি বা তার অধিক পক্ষের বিবাদ ঃ যুক্তরাষ্ট্র, যে কোনও একটি প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী যে কোনও নৃপতি-শাসিত রাজ্য। এখানে উচ্চ আদালত বা হাইকোর্টের আপিলগুলি শোনা হয়। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল কোনও পরামর্শ চাইলে এই আদালত সেই বিষয়ে উপদেশ দেয়। এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে যেতে হয়।

রেল যোগাযোগ পরিচালনার উদ্দেশ্যে এক 'ফেডারাল রেলওয়ে অথরিটি' বা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কোনও সময়ে যদি গভর্নর জেনারেল মনে করেন যে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইনের ধারাগুলি মেনে শাসন চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে (গভর্নর-জেনারেল) তিনি ঘোষিত আদেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ছাড়া অন্য যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের যে কোনও ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন।

ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে রাজশক্তির সমস্ত কর্তৃত্বের অনুশীলনের লক্ষ্যে সেক্রেটারি অফ স্টেট রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে থাকেন। অন্যান্য ক্ষমতা ছাড়াও তাঁকে গর্ভনর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হয়, বিশেষত যখন তাঁরা তাঁদের 'নিজস্ব বিবেচনা' বা 'ব্যক্তিগত বিচার' প্রয়োগ করতে শুরু করেন। তাঁর পরিষদের জায়গায় এক 'উপদেষ্টা মণ্ডলী' গঠন করা হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

এই আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ এগারোটি গভর্নর বা রাজ্যপালের প্রদেশ (মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশ বা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, উড়িষ্যা, সিন্ধু) এবং পাঁচটি চিফ কমিশনার বা মুখ্য মহাধ্যক্ষের প্রদেশ (ব্রিটিশ বালুচিস্তান, আজমীর-মেরয়াড় কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পন্থ পিপলোডা)। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহিক ও বিধান বিষয়ক কর্তৃত্ব মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের প্রদেশগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়— তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় শুধুমাত্র গভর্নরের প্রদেশগুলি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেও গভর্নরের প্রদেশগুলি তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পায় সরাসরি রাজশক্তি বা ক্রাউন থেকে, আগের মত ভারত সরকারের কাছ থেকে নয়। এই প্রথম তারা এক পৃথক আইনী সত্ত্বা অর্জন করে। একান্তভাবে কোনও প্রাদেশিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার কোনও আইনী ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকবে না, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল নিজে গভর্নরদের উপর নজর রাখতে পারবেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হবে, তা তিনটি বিধান বিষয়ক তালিকাতে বিধান বিষয়ক ক্ষমতার বণ্টনের মধ্যেই নির্দেশ করা হয়। প্রদেশগুলির নির্বাহিক ক্ষমতা তাদের বিধান বিষয়ক ক্ষমতার মতই সমব্যাপী হবে।

সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নরের হাতে প্রদেশের নির্বাহিক কর্তৃত্ব থাকবে। তিনি একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন যার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর ইচ্ছার উপর। দ্বৈতশাসনের বিলুপ্তির ফলে মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে সমব্যাপী (Co-extensive) হয়ে যায়। কোনও নির্বাহী পরিষদ থাকে না ও 'সংরক্ষিত' বিষয় থাকে না। কিন্তু গভর্নরের হাতে থাকা বিশেষ ক্ষমতাগুলি মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব করে তোলে।

কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরের 'বিশেষ দায়িত্ব' থাকে, যেখানে তিনি তাঁর 'ব্যক্তিগত বিচার' প্রয়োগ করতে পারেন, অর্থাৎ মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন, 'শান্তি ও সুস্থিরতার ক্ষেত্রে কোনও মারাত্মক বিপদ দেখা দিলে তা নিবারণ করা', 'সংখ্যালঘুদের আইনসঙ্গত স্বার্থগুলি রক্ষা করা, 'বর্হিভূত' ও 'আংশিক বর্হিভূত' অঞ্চলগুলির প্রশাসন চালানো, এবং বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইনগুলি কার্যকরী করতে নির্বাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া পুলিশের নিয়মকানুন, কর্মচারীদের পদোন্নতি বা শাস্তি ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর 'ব্যক্তিগত বিচার' প্রয়োগ করার ক্ষমতাধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক বিধানসভার অধিবেশন ডাকা, প্রাদেশিক বিধানসভায় অনুমোদিত কোনও বিলে সম্মতি দেওয়া, অধ্যাদেশ জারী করা, পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা জন কৃত্যক আয়োগের সদস্য নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তিনি তাঁর 'নিজস্ব বিবেচনা' অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন। 'নিজস্ব বিবেচনা' বা 'ব্যক্তিগত বিচার', এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি গভর্নর -জেনারেলের 'সাধারণ নিয়ন্ত্রণের' অধীন ছিলেন।

আগের মতোই বিভাগীয় সচিবেরা (যারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ সদস্য ছিলেন) সরাসরি গভর্নরের কাছে পৌঁছোতে পারতেন। এর অর্থ তিনি আমলাতন্ত্রকে মন্ত্রীমণ্ডলীর থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন।

এই আইনের এত নম্বর ধারাতে গভর্নরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে তিনি যদি কোনও সময় মনে করেন যে প্রদেশের সরকার আইনের ধারাগুলি মেনে কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তিনি ঘোষিত আদেশের মাধ্যমে উচ্চ আদালত ছাড়া সব বা যে কোনও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন।

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম—এই ছ'টি প্রদেশে বিধানমণ্ডলের দু'টি কক্ষ থাকে ঃ বিধান পরিষদ ও বিধান সভা। বাকী অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শুধু একটি কক্ষ, অর্থাৎ বিধান সভা থাকার সংস্থান

করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিধান পরিষদগুলিতে সদস্য সংখ্যা ৬৫ এবং ২১-এর মধ্যে থাকে। এদিকে বিভিন্ন প্রদেশের বিধান সভাগুলিতে এই সংখ্যা ২৫০ থেকে ৫০-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর নীতির ভিত্তিতে আসন বরাদ্দের পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়। বিধান পরিষদের ক্ষমতা বিধান সভার সমবিস্তৃত ছিল না— বিধান পরিষদ শুধু সংশোধন ও বিলম্ব করার ক্ষমতা পেয়েছিল। গভর্নরের বিভিন্ন ধরনের বিধান বিষয়ক ক্ষমতা ছিল, যার মধ্যে পড়ে অধ্যাদেশ জারী করা এবং 'বর্হিভূত অঞ্চল' ও 'আংশিক বর্হিভূত অঞ্চলের' শান্তি ও সুশাসনের জন্য নিয়মকানুন স্থির করা। বিধানমণ্ডলে অনুমোদিত কোনও বিলে তিনি সম্মতি জানাতে পারতেন, সম্মতি দেওয়া স্থগিত রাখতে পারতেন, পুর্নবিবেচনার জন্য বিধানমণ্ডলে ফেরত পাঠাতে পারতেন, অথবা গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য রেখে দিতে পারতেন।

এক সাধারণ নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীকে এই নম্বর তালিকাভুক্ত সব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সঙ্গে যুগ্মভাবে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিন নম্বর তালিকাভুক্ত সব বিষয়ে আইন প্রনয়নের অধিকারও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলী পেয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎস বরাদ্দ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এক আবশ্যিক পরিণাম ছিল। এই আইনের সুপারিশ করা ব্যবস্থা প্রাদেশিক রাজস্বের জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯১৯ সালের আইনের তুলনায় এই ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আরও ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হয়েছিল। জিন্না ও কংগ্রেস তো বটেই, প্রায় সকল শ্রেণির ভারতীয় জনগণ এই আইনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিল।

ভারতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই নতুন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করেন। প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রতিনিধি নয় কারণ রাজ্যগুলি থেকে যে সব সদস্যদের পাঠানো হয়েছে তাঁরা তাঁদের শাসকদের মনোনীত, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। ''ভারতের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলের শাসকরা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের নির্বাচিত, প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রয়াসের বিরোধিতা করবেন। দ্বিতীয়ত, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে না কারণ গভর্নর-জেনারেল ও গভর্নরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেবার ফলে বহু ক্ষেত্রেই জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে গেছে। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়ের আশি শতাংশের জন্য কোনও ভোটের প্রয়োজন হবে না, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলের কর্তৃত্বকে গুরুতরভাবে খর্ব করবে। চতুর্থত, স্বায়ত্তশাসনের বিকাশের কোনও সংস্থান রাখা হয়নি, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার কোনও ভনিতা করা হয়নি।'' এই আইনকে 'দাসত্বের ফরমান' হিসাবে বর্ণনা করে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একে ভারতীয় নৃপতি, জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির তোষণ বলে সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই আইন ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ধারাগুলির কোনওটিই ভারতের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ও আকাঙ্খাগুলিকে প্রতিফলিত করে না। কাজেই, এই আইনের পক্ষে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিধানসভাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে ''মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অগ্রহণীয়'' এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ''সর্বাপেক্ষা অ-সন্তোষজনক ও দুঃখজনক'' হিসাবে বর্ণনা করে এক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এটি সম্ভব হয় কংগ্রেস এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের সমঝোতার

ফলে। ''সম্পূর্ণত নষ্ট, মন্দ ও অগ্রহণীয়'' বলে বর্ণনা করে জিন্না ১৯৩৫ সালের এই আইনের কঠোর সমালোচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জিন্নার এই সমালোচনা ছিল কুণ্ঠাহীন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি (যাদের বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীতে হিন্দু প্রতিনিধি পাঠাবে) কেন্দ্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। বর্তমান ব্যবস্থার থেকে উন্নততর বলে আখ্যা দিলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনাতে বেশ কিছু আপত্তিজনক বৈশিষ্ট্য আছে বলে জিন্না মনে করেন। তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন কারণ এর ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু—এই চারটি প্রদেশ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। প্রস্তাবিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা জাতীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে কীভাবে আঘাত করবে সে কথা না চিন্তা করে তিনি একে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিচার করেন।

সমালোচনা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তীব্র বিতর্কের পর ১৯৩৫ সালের এই আইন পাশ হলেও শুধুমাত্র প্রদেশগুলি এর ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়। প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে এক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ষাট লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিন কোটিতে পৌঁছোয়। কিন্তু গভর্নরদের হাতে স্ব-বিবেচনার ক্ষমতা থেকে যায়। এই ক্ষমতাবলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে ডাকা, বিলে সম্মতি দেওয়া এবং কিছু বিশেষ অঞ্চল (প্রধানত আদিবাসী বা জনজাতি) শাসন করার অদিকার পান। এই সব ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার কোনও চরম উপদেশ দেবার অধিকার থাকে না। সংখ্যালঘুর অধিকার, প্রশাসনিক কর্মীদের বিশেষাধিকার ও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে গভর্নরদের 'নিজস্ব বিচার' প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়— এক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা উপদেশ দিলেও তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক থাকে না। এ ছাড়া, ১৯৩৫ সালের আইনের কুখ্যাত ৯৩ ধারা অনুযায়ী গর্ভনর যে কোনও প্রদেশের শাসনভার অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, যা কার্যকরী হবার কথা পঞ্চাশ শতাংশ নৃপতিরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে যোগ দেবার পর— সেই কাঠামো মোটামুটি শক্তিশালী এক কেন্দ্রের প্রশাসনে এক ধরনের দ্বৈতশাসনের জন্ম দেয়। নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলি প্রদেশগুলিতে চালু করা 'রক্ষাকবচের' অধীনে থাকে, এদিকে বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষার বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ভাইসরয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। নতুন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক ও রেলওয়েজকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিধানসভা নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। ঋণকৃত্যকে (debt services) এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বেতনকেও সংরক্ষিত বিষয় হিসাবে রাখা হয় এবং মুদ্রা ও বিনিময় সংক্রান্ত কোনও আইন প্রনয়নের জন্য ভাইসরয়ের পূর্বসম্মতির প্রয়োজন হয়। এটা সত্য যে এই আইনের ফলে চূড়ান্ত আর্থিক নিয়ন্ত্রণ লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল— যা টমলিনসনের মত কিছু সমকালীন ইতিহাসবিদ জোরের সঙ্গে দাবি করেন। কিন্তু সেক্রেটারি অফ স্টেট থেকে ব্রিটিশ সরকারেরই নিযুক্ত এক ভাইসরয়ের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে নৃপতিদের মনোনীত সদস্যেরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ আসনের অধিকারী ছিলেন (রাজ্যসভাতে ২৭৬টির মধ্যে ১০৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভাতে ৩৭৫টির মধ্যে ১২৫)। এদিকে পুনা প্যাক্টের দ্বারা সংশোধিত ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ডকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে মুসলিমরা ও অন্যান্য বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এই আইনের আরও বিপজ্জনক একটি ধারা হল রাজশক্তি বা ক্রাউনের সঙ্গে ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের বিষয়টি 'রাজশক্তির প্রতিনিধি', কার্যত ভাইসরয়ের হাতে স্থানান্তর

করা, যে ভাইসরয় দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের মাধ্যমে নয়, বরং পুরোপুরি সরকারি রাজনৈতিক বিভাগ, স্থানীয় অধিবাসী এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্যনির্বাহ করেন। ১৯৩৫ সালের আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি অবশ্য যাত্রা শুরুই করতে পারেননি, কারণ আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার দখলের সম্ভাবনা সম্পর্কে নৃপতিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে সংযোজিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের একাধিপত্যের দাবি হ্রাস করায় অনীহা তাদের আরও নিরুৎসাহ করে তোলে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতারাও মনে করতে থাকেন, যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি বড়ো বেশি মাত্রায় সমতাধর্মী এবং এর ফলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কর্তৃত্বের বিপদের মুখোমুখি হতে পারেন। এদিকে কংগ্রেসের সব শ্রেণিই এই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রকে এক প্রতারণা আখ্যা দেয়। এই অচলাবস্থায় ব্রিটিশরা অবশ্য তেমন অখুশি হয় না, কারণ এর ফলে তারা ১৯২৯ সালের কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এখানে একথা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসের বহু কথিত আরউইন প্রস্তাবের ছয় বছর পরেও এই আইন অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion status) সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, ব্রিটিশরা শেষে ভারতীয়দের হাতে কিছু প্রকৃত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশরা অতি কৌশলের সঙ্গে এই ক্ষমতাগুলিকে কিছু রক্ষাকবচের বাঁধা দিয়ে ঘিরে রাখে। এই আইন অনুযায়ী প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর এই আইনের অগণতান্ত্রিক দিকগুলিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। তবে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, ১৯৩৫ সালের এই আইন ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নতুন দিকের সূচনা করে। ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টির একথা নিশ্চিতভাবে পূর্বাভাষ দেয় যে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

১.৩ কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

১৯৩২ সালের ১৬ই আগস্ট যখন কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও আইন অমান্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য দলের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কিছু অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেই সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এক ঘোষণা করেন যা 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই বাঁটোয়ারার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতিই প্রতিফলিত হয়। এই রায়ে প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিধানমণ্ডলীগুলিতে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয় যেগুলিতে নির্বাচন হতে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর ভিত্তিতে। অর্থাৎ মুসলিমরা নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের দ্বারা, শিখরা শিখদের দ্বারা ইত্যাদি। মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু হিসাবে দেখা হত। এই রায়ে তফশিলি সম্প্রদায়কেও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা করা হল এবং এইভাবে বাকি হিন্দুদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হল।

কংগ্রেস মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের জন্য এই ধরনের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিল, কারণ এর দ্বারা এক সাম্প্রদায়িক ভাবনাকেই উৎসাহ দেওয়া হত যে তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যাদের স্বার্থ সাধারণ ভারতীয় স্বার্থের থেকে আলাদা। এর অবধারিত ফল হল ভারতীয় জনগণকে বিভাজিত করে দেওয়া এবং এক সাধারণ জাতীয় চেতনার বিকাশকে রুদ্ধ করে দেওয়া। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার এক সঙ্গে হিসাবে কংগ্রেস ১৯১৬ সালেই মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কাজেই তখন কংগ্রেস এই অবস্থান নিল যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী হলেও তারা সংখ্যালঘুদের সম্মতি ছাড়া রায়

পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। এর ফলে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র বিরোধিতা করলেও কংগ্রেস একে গ্রহণ বা বর্জন, কোনওটিও না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু তফশিলি সম্প্রদায়কে পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করে বাকি হিন্দুদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার এই প্রয়াস জাতীয়তাবাদীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ইয়ারাভাদা জেলে বন্দি গান্ধিজি বিশেষত এর তীব্র প্রতিবাদে আমরণ অনশনে শুরু করেন। তাঁর কাছে সরকারের এই পরিকল্পনা এক ষড়যন্ত্র মনে হয়। তিনি এই বাঁটোয়ারাকে ভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক আক্রমণ হিসাবে দেখেন যা হিন্দু ধর্ম ও তফশিলি সম্প্রদায়, উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। কারণ এই রায় তফশিলি সম্প্রদায়ের সামাজিক অমর্যাদার সমস্যার কোনও সমাধান তুলে ধরে না। তফশিলি সম্প্রদায়কে পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে দেখতে শুরু করা মাত্র অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির প্রশ্নটি আর উঠবে না এবং এই বিষয়ে হিন্দু সামাজিক সংস্কারের কাজ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

গান্ধিজির বক্তব্য ছিল, পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী মুসলিম বা শিখদের যতই ক্ষতি করুক, তারা মুসলিম বা শিখই থেকে যাবে। কিন্তু তাঁর মত সংস্কার করা যখন অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ অবসানের জন্য কাজ করছেন, তখন পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী অস্পৃশ্যদের চিরদিন অস্পৃশ্যই থেকে যাবে।' বিধানমণ্ডলীতে আসন বা চাকরির মাধ্যমে তফশিলি সম্প্রদায়ের তথাকথিত স্বার্থরক্ষা নয়, প্রকৃত প্রয়োজন হল অস্পৃশ্যতাকে আমূল উচ্ছেদ করা।

গান্ধিজি দাবী করেন যে, তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হোক আরও বিস্তৃত, সম্ভব হলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে এক অভিন্ন, সাধারণ নির্বাচনের সাহায্যে। একই সঙ্গে তিনি তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি সংরক্ষিত আসনের দাবির বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি প্রকাশ করেননি। তাঁর দাবি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর আমরণ অনশন শুরু করেন। সংবাদপত্রগুলিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''আমি আমার নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করি না। তাদের নিজেরই ধর্মের অসহায় নরনারীদের উপর হিন্দুরা যে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে, আমার মতে এই মহৎ উদ্দেশ্যে একশো জীবন উৎসর্গ করা হলেও যথেষ্ট পাপস্খালন হবে না।''

বহু রাজনীতি-সচেতন ভারতীয় এই অনশনকে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে করলেও সকলেই এই বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বেগান্বিত হয়ে পড়েন। প্রায় সর্বত্রই বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বরের দিনটি অনশন ও প্রার্থনার দিন হিসাবে পালন করা হয়। দেশজুড়ে মন্দির, জলাশয় ইত্যাদি তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। গান্ধিজির স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মদন মোহন মালব্য, এম সি রাজা, বি. আর. আম্বেদকর, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, সি. রাজাগোপালাচারী তখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষে তারা 'পুনা প্যাক্ট' নামে পরিচিত এক চুক্তি সম্পাদন করতে সফল হন, যে চুক্তি অনুযায়ী তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভাবনাটি পরিত্যাগ করা হবে কিন্তু তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলীগুলিতে ৭১ থেকে বাড়িয়ে ১৪৭ এবং কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে মোট আসনের ১৮ শতাংশ করা হবে। তফশিলি সম্প্রদায় সমেত সব হিন্দুদের জন্য এক অভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলী গড়া হবে। তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রশাসন কৃত্যকে প্রতিনিধিত্বের বিশেষ সংস্থান করা হবে। তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দশ বছরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শেষে ১৯৩২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গান্ধিজি তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন।

---

* গৃহীত হয়েছে।

১.৪ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন

১৯৩৫ সালের আইন রূপায়ন

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারাগুলি বাদ দিয়ে এই আইন ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। কোনও নৃপতি-শাসিত রাজ্য সংযোজনে সম্মত না হওয়ার ফলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করাই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সাধারণত বলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলী ১৯১৯ সালের আইনের ধারাগুলি অনুসরণ করেই কাজ করতে থাকে। প্রদেশ সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের আইন ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে এবং তারপর ক্ষমতা হস্তান্তর হলে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন আনা হয়।

১৯৩৫ সালের আইনটি অনুমোদিত হবার পর মুসলিম লিগ নতুন প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলীগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৬) হিসাবে জহরলাল নেহরু বলেন যে এই আইনের প্রতি কংগ্রেস আপসহীন বিরোধিতা করে যাবে। একই সঙ্গে তিনি সুপারিশ করেন যে গণপরিষদের (Constituent Assembly) দাবিকে সামনে রেখে এক বিস্তারিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত। এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচি আবার নতুন করে জেগে ওঠে এবং কংগ্রেস তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে।

সবদিকে বিচার করলে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়কে দর্শনীয় বলা যেতে পারে। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১১টিতে জয়লাভ করে। কিন্তু ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৫৮টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ২৬টিতে জয়ী হয়। এর মধ্যে 'সীমান্ত গান্ধী' আবদুল গফ্ফর খানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একাই ১৯টি আসন দেয়। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নব-নির্বাচিত অ-কংগ্রেসি মুসলিম সদস্যরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ এই চারটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের একটিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি।

এর পরবর্তী পর্যায় হল মন্ত্রীসভা গঠন। চারটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম প্রধানমন্ত্রীদের নেতৃত্বে জোট মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। কংগ্রেস এই মন্ত্রীসভাগুলিতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। অ-মুসলিম প্রধান আসামেও মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক জোট মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা— এই পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বোম্বাইতে মোট আসনের প্রায় অর্ধেক দখল করে কংগ্রেস কিছু সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমর্থনের উপর নির্ভর করে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। আসাম এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এক শক্তিশালী গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতভেদকে কাজে লাগাতে পারে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাতে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনও আশাই কংগ্রেসের ছিল না।

এই আইনের প্রতি 'আপসহীন বিরোধিতার' সঙ্গে এরই ধারাগুলি মেনে নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণকে মেলানো সহজ ছিল না। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এক্ষেত্রে এক সমঝোতায় উপনীত হন ঃ আপসহীন বিরোধিতার নীতির কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়, কিন্তু গভর্নর তাঁর 'হস্তক্ষেপের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না, এই শর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা গ্রহনের অনুমতি দেওয়া হয়।

এই শর্ত আরোপ করার ফলে অস্থায়ী এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ছয়টি প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীতে (মাদ্রাজ,

বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ) গভর্নরেরা কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানালেও দল সেই আমন্ত্রণ অস্বীকার করে কারণ গভর্নরেরা শর্ত পালন করার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। গভর্নররা এখন 'অর্ন্তবর্তীকালীন' মন্ত্রীসভা নিযুক্ত করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় আইন অনুযায়ী তারা ছয় মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারে না। শেষে ভাইসরয়ের এক বিবৃতিতে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে লর্ড লিনলিথগো বলেন যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ অনিবার্য না হলে গভর্নররা তাদের বিশেষ ক্ষমতা 'প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবেন। কংগ্রেস এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হয়। এর ফলে 'অর্ন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীসভাগুলি' পদত্যাগ করে এবং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস তার বৈপ্লবিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং জনগণের কাছে থাকতে এক সংসদীয় মনোভাব গ্রহণ করে।' জনগণের জন্য এই আইনের আওতায় থেকেও কিছু করা সম্ভব—এই ধারণা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে আইন অমান্য তার আবেদন হারিয়ে ফেলে।

১.৫ ক্ষমতায় কংগ্রেস ঃ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম

কংগ্রেসি প্রদেশ (১৯৩৭-৩৯)

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অ-কংগ্রেসী জোট মন্ত্রীসভার কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাকে বসানো হয়। এক বছর পরে কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপায়ন করার লক্ষ্যে আসামে কংগ্রেসের প্রাধান্য-সংকলিত এক মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে গঠিত সিন্ধের অ-কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের শর্তসাপেক্ষে সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইভাবে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) ক্ষমতায় আসে। আসামে প্রশাসন কার্যত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সিন্ধে তার সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দুটি প্রদেশ—বাংলা ও পাঞ্জাব কংগ্রেসের রাজনৈতিক কক্ষপথের বাইরে থাকে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারে এক অস্থায়ী রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই দুই প্রদেশের গভর্নররা (একজন ভাইসরয়-সমর্থিত) রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস গভর্নরদের এই আচারণকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয় এবং তার প্রতি ভাইসরয়ের সমর্থনকে ১৯৩৭ সালের জুন মাসে দেওয়া প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করে। এই সংকটের অবসান হয় যখন দুই গভর্নর রাজনৈতিক বন্দিদের 'পর্যায়ক্রমে মুক্তি' দেবার আশ্বাস দেন। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা এখন তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কংগ্রেসি প্রদেশগুলিতে অন্য কোনও সংকট দেখা দেয়নি। কোথাও 'বিশেষ ক্ষমতা' প্রয়োগ করার আগে গভর্নররা তাদের মন্ত্রীদের সম্মতি আদায় করে নিতেন। বিধানমণ্ডলীগুলিতে কংগ্রেস সদস্যেরা সংসদীয় রীতি অনুয়ায়ী দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। কংগ্রেস 'হাই কমাণ্ড', অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ড সব কংগ্রেসি প্রদেশে উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম স্থির করত। এই হাই কমাণ্ড বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী স্থির করত, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কে কে হবেন তা স্থির করত এবং প্রত্যেকের কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত।

ভারতীয় মন্ত্রীরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোটামুটি ভালোভাবেই কাজ করেন। নতুন আইনে গভর্নরদের দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা মাত্র একবার প্রয়োগ করা হয়। কংগ্রেস সরকারগুলি ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণমূলক চরিত্রের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেও ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর ভিতরেই তারা ভারতীয় জনগণের জন্য কিছু স্বাচ্ছন্দ্য দেবার প্রয়াস করেছিল। সব মিলিয়ে বিচার করলে, ভারতীয় ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার পর এই প্রথম বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই না করে প্রেস তার সঙ্গে সহযোগিতা করছিল।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির সামনে অনেকগুলি অসুবিধা ছিল। (১) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত না। একদিকে 'পূর্ণ স্বরাজে'র প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে এত দিন যাদের বিরোধিতা করা হয়েছে সেই প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত রূপায়নের দ্বিচারিতা ছিল। কংগ্রেসকে ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতর কাজ করতে হত, যার ফলে কোনও মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। (২) সব থেকে গুরুতর সমস্যা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। কংগ্রেসের শ্রেণিগত চরিত্র বহুমাত্রিক হবার ফলে তার পক্ষে একই সঙ্গে জমিদার ও কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব ছিল না। (৩) আর্থিক ক্ষেত্রে কড়াকড়ি প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে আর একটি প্রধান সমস্যা ছিল। ভারতের রাজস্বের সিংহভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এর ফলে যে সব ক্ষেত্রে নিয়মিত অর্থের যোগানের প্রয়োজন হত, অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির জন্য সরকার স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারত না। (৩) পার্লামেন্টারি সাব-কমিটি কংগ্রেসের নীতি প্রণয়নের দায়িত্বে থাকায় হাই কমান্ডের পূর্বসম্মতি ছাড়া মন্ত্রীসভা নতুন কোনও প্রকল্পের কাজ হাতে নিতে পারত না।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

১৯৩৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র সাতাশ মাসের ব্যবধানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কিছু দুঃসাধ্য কাজ করেছিল। (১) জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা কিছু দমনমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি সেগুলির কয়েকটিকে বাতিল করে এবং বহু রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়। (২) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিল, অর্থাৎ নাগরিকদের বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিল। (৩) নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুদখোরি-বিরোধী আইন ও প্রজাস্বত্ব বিধি অনুমোদন করে কৃষকদের সাহায্য করেছিল। 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সময়ে কংগ্রেসের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে জমিদারি ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, কৃষি ঋণ মকুব করা এবং শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। (৪) বাস্তবেই প্রাথমিক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছিল। (৫) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কর্মসূচিতে জনস্বাস্থ্য যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। (৬) কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির মঙ্গলের জন্যও কাজ করেছিল। এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নতুন প্রেরণা পেয়েছিল। কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সব মিলিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। (৭) সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল হরিজন কল্যাণ, অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি, মদ্যপান-বিরোধী অভিযান ইত্যাদি। (৮) কংগ্রেস সরকারগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মন্ত্রীরা তাঁদের মাসিক বেতন থেকে পাঁচশো টাকা কম নিতেন। তাঁরা ট্রেনে সাধারণ শ্রেণিতে যাতায়াত করতেন। সততা ও জনসেবার যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছিলেন, আজকের দিনে তা দুর্লভ। এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে সুমিত সরকার অবশ্য বলেন

যে, ‘‘হঠাৎ ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নাগাল পাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাজনক স্থান অন্বেষণ ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মত কুফলগুলি দেখা দিয়েছিল।’’ (৯) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সব রকমের আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ১৯৩৬ সালে পাঁচ লক্ষ ছিল। তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৭ সালে একত্রিশ লক্ষ ও ১৯৩৮ সালে পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে।

অ-কংগ্রেসি প্রদেশ (১৯৩৭—৪৭)

পাঞ্জাবে স্যার সিকান্দার হায়াত খানের নেতৃত্বে (১৯৩৭—৪২) মুসলিম, হিন্দু ও শিখদের নিয়ে গঠিত ‘ইউনিয়ানিস্ট’ মন্ত্রীসভা অন্যান্য অ-কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার থেকে বেশি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। জিন্নার দেশভাগের দাবি হায়াত মন্ত্রীসভাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম লিগ ক্রমশ ইউনিস্ট পার্টির মুসলিম অংশের উপর প্রভাব বৃদ্ধি করতে সফল হয় এবং সিকান্দার হায়াত খানের উত্তরাধিকারী খিজরি হায়াত খানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে মন্ত্রীসভার শক্তি হ্রাস পায়। মন্ত্রীসভা অবশ্য ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একটানা ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয়।

বাংলাতে অবশ্য অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ, কোনও দলই বিধানসভাতে একক বৃহত্তম দল হয়ে উঠতে পারেনি। ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৬০, মুসলিম লিগ ৪০ ও কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রাদেশিক হাই কমান্ড ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে জোট মন্ত্রীসভা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আপত্তিতে এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের জোট মন্ত্রীসভা মাঝে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত গভর্নরের অসাংবিধানিক চাপে হক পদত্যাগ করা অবধি ক্ষমতায় থাকে। আইনের ৯৩ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে গভর্নর কিছু দিনের জন্য প্রশাসন নিজের হাতে তুলে নেন এবং পরে স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে এক মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভাকে ক্ষমতায় বসানো হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত মুসলিম লিগ ক্ষমতা উপভোগ করে, কিন্তু এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে এইচ এস সুহরাওয়ার্দি স্যার নাজিমুদ্দিনের স্থানাভিষিক্ত হন।

এইভাবে মুসলিম লীগ তাদের পাওয়া রাজনৈতিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই জোট মন্ত্রীসভা চলাকালীন মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব বেড়ে উঠতে থাকে এবং এর ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার জন্ম হয়। মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগকে পুঁজি করে মুসলিম লিগকে মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিরোধিতায় তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সিন্ধু-তে (সিন্ধু প্রদেশ) বিভিন্ন নেতার অধীনে অনেকগুলি মন্ত্রীসভা পরপর ক্ষমতায় আসীন হয়। আল্লা বখ্‌স নামে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ এক প্রধানমন্ত্রীকে গভর্নর বরখাস্ত করেন।

ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা এবং আল্লা বখ্‌সকে বরখাস্ত করা— এই দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে ইচ্ছা করলে ‘গভর্নররা ১৯৩৫ সালের আইনকে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার মুসলিম লিগের প্রতি তাঁদের অনুরাগকে প্রকাশ্যে এনে ফেলেছিল।

কংগ্রেসের 'বাংলা শাখা তখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু। তরুণ প্রজন্মের বেশিরভাগ সদস্যরাই এই অংশের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল গান্ধিবাদী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীদের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায় যখন ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার আগের বছরেও সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। গান্ধি এবং দক্ষিণপন্থীরা যখন সংযমের আহ্বান জানাচ্ছেন, তখন সমস্ত বামপন্থীরা যুদ্ধ-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে আরও লড়াকু করে তুলতে বলছেন। সি এস পি (CSP) সমেত সব বামপন্থীরা ১৯৩৯ সালে সীতারামাইয়ার সঙ্গে এই নির্বাচনী যুদ্ধে বসুর পাশে এসে দাঁড়ান। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে গান্ধি প্রকাশ্যে সীতারামাইয়াকে তাঁর নিজস্ব প্রার্থী বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধিজি সঙ্গে সঙ্গে একে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন এবং সীতারামাইয়ার পরাজয়কে তাঁর নিজের পরাজয় বলে অভিহিত করেন। দক্ষিণপন্থী গান্ধিবাদীরা পন্থের আনা সেই বিখ্যাত প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁদের আক্রমণ চালাতে থাকেন। এই প্রস্তাবে পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির উপর আস্থা প্রকাশ করা হয় এবং বসুকে গান্ধির পছন্দমত নতুন কার্য নির্বাহী মনোনীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলাতে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে বসু তখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলাতে বসুর প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশে প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় এবং একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়। এর পর শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বসুকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করা হয়। বাংলাতে কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর পর সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করতে থাকেন।

১.৬ সূত্র-নির্দেশ

১। Conpland R. Constitutional Problems in India. London. 1944.

২। Banerji A.C. (ed.). Indian Constitutional Documents. (1757—1947). 4 vols. Calcutta, 1961.

৩। Gwyer and Appadorai (ed.). Speeches and Documents on the Indian Constitution. 2 vols. London. 1957.

৪। Tamilson B. R. Indian National Congress and the Raj (1929—42). London, 1976.

৫। Moore, R. J. Crisis of Indian Unity (1917—40). Oxford, 1974.

১.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১। দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ভারতে তার কী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের কী উদ্দেশ্য ছিল?

৩। অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ

১৯৩৭ সালে বেশির ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এগারোটির মধ্যে কটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল?

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কমুন্যাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করেন। এই বাঁটোয়ারাতে তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা বলে হিন্দুদের বিভক্ত করার চেষ্টা করা হলে তার বিরোধিতা করে গান্ধি আমরণ অনশন শুরু করেন।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করে। এর ভিত্তি ছিল (ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং (খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এই আইনে তাদের দাবি মানা না হলেও কংগ্রেস এর রূপায়নে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সব রাজনৈতিক দল এই আইনের সমালোচনা করলেও প্রাথমিক কিছু দ্বিধার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ, দুই দলই প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের জন্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীদের বিপুলভাবে পরাজিত করে এবং এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগের প্রদর্শন তেমন আশাব্যঞ্জক হয়নি। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে। তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় ভূমি সংস্কার, হরিজন কল্যাণ, শিক্ষা, দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি ইত্যাদি।

একক ২ ❑ বামপন্থার উত্থান ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম

গঠন ঃ

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ কংগ্রেস ও বামপন্থীরা ঃ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

২.৩ কংগ্রেস ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি

২.৪ প্রজামণ্ডল আন্দোলন

২.৫ মুসলিম লিগ ও পাকিস্তান আন্দোলন

২.৬ সূত্র-নির্দেশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থার উত্থানের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা কংগ্রেসের সঙ্গে, নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সম্পর্ককে উপস্থাপিত করা এবং মুসলিম লিগের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে ব্যাখ্যা করা, যা শেষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়মের জন্ম দিয়েছিল।

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককে কংগ্রেস ও বাম রাজনীতি, কংগ্রেস ও গণ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ও পাকিস্তান গঠনের দাবি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২ কংগ্রেস ও বামপন্থীরা ঃ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

১৯২০-র দশকের শেষে ও ১৯৩০-র দশকের প্রথম দিকে ভারতে এক শক্তিশালী বামপন্থী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে, যার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় সংগ্রামের ধারা এবং নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের দ্বারা ক্রমশ মিলে যেতে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ভারতের মাটিতে শিকড় গড়তে থাকে। ভারতের যুবসমাজ সমাজতন্ত্রকে তাদের মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, যাদের আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে দেখা দেন জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। ক্রমে দুটি শক্তিশালী বামপন্থী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি।

এ সবেরই প্রেরণা ছিল রুশ বিপ্লব। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কম্যুনিস্ট) পার্টি জারের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায় এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সরকার একতরফাভাবে চিন ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে তার সাম্রাজ্যবাদী অধিকার ছেড়ে দিয়ে উপনিবেশিক বিশ্বকে চমকে দেয়। এর থেকে আরও একটি শিক্ষা উঠে আসে ঃ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের দিয়ে সাধারণ মানুষেরা যদি শক্তিশালী জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে ভারতের মানুষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারে। এশিয়ার মানুষ হঠাৎই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ, বিশেষত মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল লেখেন ঃ ''আজ জার্মান সামরিক শক্তির পতন ও জারের স্বৈরাচারী শক্তির ধ্বংসের পর বিশ্ব জুড়ে এক নতুন শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে। এই শক্তি হল তাদের ন্যায্য অধিকারগুলি ফিরে পেতে দৃঢ় সংকল্প সাধারণ মানুষের শক্তি— যে অধিকার তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে, আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার।'' সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে কারণ অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া বহু যুবক এর পরিণাম লক্ষ করে হতাশ হয় এবং গান্ধিবাদ ও বিকল্প স্বরাজবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারায়। সারা দেশ জুড়ে অনেকগুলি কম্যুনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গঠিত হয়। বোম্বাইতে এস এ ডাঙ্গে 'গান্ধি এবং লেনিন' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সূচনা করেন,যার নাম হয় 'দি সোশ্যালিস্ট।' বাংলায় মুজফ্ফর আহমেদ 'নবযুগ' প্রকাশ করেন ও পরে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগিতায় 'লাঙল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবে গুলাম হোসেন ও অন্যান্যরা 'ইনকিলাব' প্রকাশ করেন এবং মাদ্রাজে এম সিঙ্গারাভেলু 'লেবার-কিসান গেজেট' চালু করেন।

১৯২৭ সাল থেকে দেশ জুড়ে ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে সারা ভারত জুড়ে শয়ে শয়ে যুব অধিবেশন আয়োজিত হয়, সেখানে বক্তারা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য চরম ব্যবস্থা নেবার আহ্বান জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও জমিদারতন্ত্রকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯২০-র দশক জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনগুলি দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৩০-র দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ার অসামাজিক ধারণাগুলি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র বেকারির মাত্রা তুঙ্গে ওঠে। এই মন্দার ফলে পুঁজিবাদী ধারণাগুলি আক্রমণের মুখে পড়ে এবং মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের দিকে মানুষ মনোযোগ দিতে শুরু করে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে জহরলাল নেহরু এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী প্রবণতার প্রতিফলন ঘটে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠনের মধ্যেও ওই একই প্রবণতার প্রমাণ মেলে।

মূলত জহরলাল নেহরু-ই জাতীয় আন্দোলনে এক সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নের জন্ম দেন এবং ১৯২৯ সালের পর ভারতে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতীক হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা শুধু এক রাজনৈতিক বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিও—এই ধারণার সঙ্গে নেহরুর নাম যুক্ত হয়ে পড়ে।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে নেহরু ১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনের সভাপতি হন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে তিনি এই পদে আবার নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের সভাপতি ও গান্ধিজির পর জাতীয় আন্দোলনের সব

থেকে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে নেহরু দেশ জুড়ে হাজার হাজার মাইল ঘুরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বারবার নিজের বক্তব্য রাখেন। তাঁর রচিত পুস্তক, নিবন্ধ ও ভাষণে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করে নেহরু বলেন যে, স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়ে উঠে যখন যদি তা সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে আসে। কাজেই স্বাধীনতার পরেই প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে তরুণ জাতীয়তাবাদীদের এক সম্পূর্ণ প্রজন্মকে নেহরু সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত করান এবং তাদের এই ধাঁচে গড়ে তোলেন।

১৯২০-২১ সালে উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে কৃষক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে নেহরু অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর ১৯২২-২৩ সালে বন্দিদশার অবসরে তিনি রুশ ও অন্যান্য বিপ্লব সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক আর্ন্তাতিক অধিবেশনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের বহু কম্যুনিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদের ধারণাগুলিতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেন। ওই একই বছরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন ও সেখানকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে প্রভাবিত হন। ফিরে এসে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এক গ্রন্থ রচনা করেন—তখন তিনি একজন সচেতন বিপ্লবী চিন্তাধারা সম্পন্ন মানুষ।

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেহরু 'ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর্ ইন্ডিয়া লিগ' গঠন করেন, যার লক্ষ্য হল 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করা।'' ১৯২৯ সালে 'কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নেহরু ঘোষণা করেন ঃ ''আমি একজন সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী। আমি কোনও রাজা বা রাজপুত্রে বিশ্বাস করি না। আমি এমন কোনও ব্যবস্থাতেও বিশ্বাস করি না যা শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক রাজাদের জন্ম দেয়, যে রাজারা সাধারণ মানুষদের জীবন ও ভাগ্যকে অতীতের রাজাদের থেকেও বেশি নিয়ন্ত্রণ করেন ও যাদের পদ্ধতি পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির থেকে আদৌ কম লুণ্ঠনাত্মক নয়।'' ''দারিদ্র্য ও অসাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে হলে'' ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ''সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা'' গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। পুঁজি ও শ্রম, জমিদার ও প্রজা— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসকে তেমন কোনও চাপের সম্মুখীন হয়নি, কারণ সেই সময়ে এই ভারসাম্য ভীষণ মারাত্মকভাবে পুঁজিবাদী ও জমিদারদের অনুকূলে ঝুঁকে ছিল।

তিনি এক নিয়ন্ত্রিত অর্থে ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তখনকার মুনাফা ব্যবস্থার পরিবর্তে সমবায়ের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করার সমর্থক ছিলেন। এই সময়ে নেহরু শ্রেণি বিশ্লেষণ ও শ্রেণি সংগ্রামের ভূমিকার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই পর্যায়ে গান্ধিজির সঙ্গে নেহরুর সম্পর্ক কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে। শ্রেণি বিরোধকে অস্বীকার করার জন্য, শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে সমন্বয়ের ডাক দেবার জন্য এবং পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণির রূপান্তরের মাধ্যমে ন্যাসরক্ষকত্বের (trusteeship) তত্ত্ব উপস্থাপনা করার জন্য নেহরু গান্ধিজির সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আত্মজীবনীর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় তিনি গান্ধিবাদী মতাদর্শের কয়েকটি মৌলিক দিকের মৃদু সমালোচনার জন্য উৎসর্গ করেন। একই সঙ্গে ভারতীয় সমাজে গান্ধিজি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তখনও নিচ্ছিলেন—সেই ভূমিকার তিনি প্রশংসা করেন। বামপন্থী সমালোচনার বিরুদ্ধে গান্ধিজিকে সমর্থন করে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে নেহরু বলেন, ''গান্ধি ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন কারণ তিনি জানতেন কীভাবে বাস্তব অবস্থানকে কাজে লাগাতে হয় এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছোতে হয়। অন্যদিকে, আরও উন্নত মতাদর্শ অনুসরণকারী গোষ্ঠীগুলি যেন গজদন্তমিনারে বসে কাজ করে।'' এ ছাড়া, গান্ধিজির কাজ ও শিক্ষা ''অবধারিতভাবে জনচেতনা বৃদ্ধি করেছে ও সামাজিক বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কায়েমি স্বার্থকে

পরিত্যাগ করে যে কোনও মূল্যে সাধারণ মানুষের উন্নতিসাধনে তাঁর সংকল্প জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রভাবে জনমুখী করে তুলেছে।''

কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহরুর আনুগত্য ছিল এমন এক কাঠামোর মধ্যে, বিদেশি শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত যা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকেই প্রধান মনে করত। বাস্তবে যা কর্তব্য হয়ে উঠেছিল, তা হল দ্বিতীয়টির গুরুত্ব হ্রাস না করে দুটিকে একত্রে আনা। এই কারণে ১৯৩৬ সালে সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রে প্রতিফলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা— এই দুটিই তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই দুটি দৃষ্টিকোণের সমন্বয় ঘটিয়ে এক সুসম্পূর্ণ ধারণা গঠন করার দায়িত্ব ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদের।

কাজেই নেহরু কংগ্রেস পৃথক কোনও সংগঠন গড়া বা গান্ধিজি ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার কথা চিন্তা করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসকে এক সমাজতন্ত্রী পথে চালনা করা এবং এটা করা সম্ভব ছিল কংগ্রেসেরই পতাকার নীচে কাজ করে সংগঠনের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের বৃহত্তর ভূমিকা অর্পণ করা। তিনি এ কথাও মনে করতেন যে, জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সরে গিয়ে বামপন্থীরা যেন কোনও সম্প্রদায়ে পরিণত না হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বিপ্লবী আনুগত্যের আকর্ষণে বহু ভারতীয় বিপ্লবী ও বিদেশে বসবাসকারী দেশছাড়া ভারতীয় সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। এদের মধ্যে সব থেকে পরিচালিত হলেন এম এন রায়, যিনি লেনিনের সঙ্গে কাজ করে উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেন। রায়ের নেতৃত্বে এই রকম সাতজন ভারতীয় ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তাসখন্দে মিলিত হন এবং 'কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বা 'ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এই প্রয়াস ছাড়াও আমরা যা লক্ষ্য করেছি, ১৯২০ সালের পর ভারতে বেশ কয়েকটি বামপন্থী ও কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী ও সংগঠনের জন্ম হয়। গোষ্ঠীগুলির বেশির ভাগই ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে মিলিত হয় এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নামে এক সর্বভারতীয় দলের জন্ম দেয়। কিছু দিন পর এস ভি ঘাটে দলের সাধারণ সচিবের পদ গ্রহণ করেন। এই দল তার প্রতিটি সদস্যকে কংগ্রেসের সভা হিসাবে নাম লেখানোর নির্দেশ দেয়, কংগ্রেসের প্রতিটি শাখায় শক্তিশালী বামপন্থী গোষ্ঠী গঠন করতে বলে এবং চরমপন্থী অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্যদের কংগ্রেসকে এক জনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেয়।

প্রথম দিকে কম্যুনিস্টদের প্রধান রাজনৈতিক কাজ ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের দলগুলি সংগঠিত করা ও তাদের মাধ্যমে কাজ করা। এই ধরনের প্রথম সংগঠনটি হল মুজফ্‌ফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার ও অন্যান্যদের দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'লেবার-স্বরাজ পার্টি' যা গঠিত হয় বাংলায় ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে বোম্বাইতে কংগ্রেস লেবার পার্টি ও পাঞ্জাবে কীর্তি কিষান পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৩ সাল থেকে মাদ্রাজে লেবার কিষান পার্টি নামে এক দল ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছিল। ১৯২৮ সালের মধ্যে এই প্রাদেশিক সংগঠনগুলির প্রত্যেকটিকে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি' নামে দেওয়া হয় এবং এদের একত্রিত করে একটি সর্ব ভারতীয় দল গঠন করা হয়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতেও এই দলের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কম্যুনিস্টরা সকলেই এই দলের সদস্য হয়। ডব্লু. পি. পি.-র মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাজ করে একে এক 'জনগনের দলে' পরিণত করা এবং স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণি সংগঠন গড়ে তোলা যাতে প্রথমে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শেষে সমাজতন্ত্র আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। ডব্লু. পি. পি. দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষত বোম্বাইতে কংগ্রেসের ভিতর কম্যুনিস্ট প্রভাব দ্রুত বেড়ে ওঠে। এছাড়া, জহরলাল নেহরু ও অন্যান্য পরিবর্তনকামী নেতারা ডব্লু. পি. পি.-র এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। নেহরু, সুভাষচন্দ্র

যুব লীগ ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তিগুলির সাথে সাথে ডব্লু.পি.পি. কংগ্রেসের ভিতর এক শক্তিশালী বামপন্থী অংশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বাম-মুখী করে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও ডব্লু. পি. পি. দ্রুত সাফল্য অর্জন করে এবং ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। এর ফলে কম্যুনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে সফল হয়।

১৯২৯ সালে ও তার পরে অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের উপর কম্যুনিস্টদের এবং ডব্লু.পি.পি.-র প্রভাব ক্রমশ কমে আসে ও শেষে মুছে যায়। এর পেছনে দুটি কারণ কাজ করে। প্রথমত, সরকার কম্যুনিস্টদের কড়া হাতে দমন করতে আরম্ভ করে। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যেই যে সব কম্যুনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে পেশোয়ারে ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়।' এই দমননীতির চাপে পড়ে কম্যুনিস্টরা অহিংস আন্দোলনের প্রকৃত রূপ 'উন্মোচন' করার কাজে নেমে পড়ে ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের স্লোগান দেয়। ১৯৩২ সালে গান্ধি-আরউইন চুক্তিকে তারা জাতীয়তাবাদের প্রতি কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে বর্ণনা করে।

শেষে ডব্লু. পি.পি.-কেও ভেঙে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, দ্বি-শ্রেণি (শ্রমিক ও কৃষক) দল গঠন করা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ তাহলে এই দল সহজেই পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কম্যুনিস্টরা বরং এক বেআইনী, স্বাধীন ও কেন্দ্রীভূত কম্যুনিস্ট দল গঠন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অবস্থানের এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে কম্যুনিস্টরা এমন এক সময়ে জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যখন সারা দেশ তার বৃহত্তম গণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং মানুষের উপর বামপন্থীর প্রভাব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্বর। এ ছাড়া, কম্যুনিস্টরা সেই সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সরকার এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয় এবং ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়াকে বেআইনি ঘোষণা করে।

এরপরও কিন্তু কম্যুনিস্ট আন্দোলন চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। কারণ, বহু কম্যুনিস্ট তখনও অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে যেতে অস্বীকার করে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট ধ্যান ধারণাগুলি দেশ জুড়ে তখনও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে বহু তরুণ, যারা অসহযোগ আন্দোলন বা বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে আকর্ষিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের পরে সি.পি.আই.-তে যোগদান করে।

১৯৩৫ সালে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যখন পি.সি. যোশীর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি পুনঃসংগঠিত হয়। ফ্যাসিবাদের বিপদের মুখে পড়ে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তি ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চা গঠনের প্রস্তাব দেয়। এর ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে অংশ নেয়। ভারতে কম্যুনিস্ট রাজনীতির পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত এক নথির মাধ্যমে যা সচরাচর 'দত্ত-ব্রাডলে থিসিস' নামে পরিচিত। এই ভাবনা বা 'থিসিস' অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জন মোর্চ গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার ক্ষমতা আছে। ১৯২৪ সালে সদ্যোজাত কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে পঙ্গু করে দেবার উদ্দেশ্যে সরকার কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত এবং সউকত উসমানীর বিচার চালায়। এই মামলাতে চারজনকেই চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের মধ্যেই জাতীয় ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর কম্যুনিস্টদের দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধি সরকারের

উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। তখন একে তারা শক্ত হাতে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেয়। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ হানা দিয়ে পুলিশ বত্রিশজন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে তিনজন, অর্থাৎ ফিলিপ স্প্রাট, বেন ব্র্যাডলে ও লেস্টার হাচিনসন ছিলেন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট, যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নেতৃহীন করা ও জাতীয় আন্দোলন থেকে কম্যুনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা। ধৃত বত্রিশজনকে বিচারের জন্য মীরাটে আনা হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শীঘ্রই লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। জহরলাল নেহরু, এম এ আনসারি, এম সি চাগলার মত বহু জাতীয়তাবাদী বন্দিদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করতে গান্ধিজি বন্দিশালায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নিজেদের সমর্থনে আদালতে বন্দিরা যে বক্তব্য রাখেন, তা দেশের সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই প্রথম কম্যুনিস্ট ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে কম্যুনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার সকারি পরিকল্পনা শুধু ব্যর্থই হয় না, বরং তার ফল একেবারে বিপরীত হয়। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়। ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। ওই পর্যায়ে তাঁদের স্থানে নতুন নেতৃত্বকে বসানো সহজ ছিল না।

যেন এই সরকারি আঘাতই যথেষ্ট নয়—কম্যুনিস্টরা হঠাৎ 'বামপন্থী বিচ্যুতি' বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির দিকে সরে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মারাত্মক ক্ষতি করে।

কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কংগ্রেসকে বুর্জোয়া শ্রেণির দল বলে অভিহিত করে। এছাড়াও, কংগ্রেস এবং সে যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে, অর্থাৎ সেই বুর্জোয়া শ্রেণিকে সাম্রাজ্যবাদের পষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করে। পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে কংগ্রেসের গণ আন্দোলনের পরিকল্পনাকে তারা ভাঁওতা বলে অভিহিত করে এবং একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রভাব খাটানোর এক প্রচেষ্টা বলে সমালোচনা করে। নেহরু এবং বসুর মত কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারাও 'বুর্জোয়ার দালাল' বলে অভিহিত হন।

কম্যুনিস্ট পার্টি এখন তার সদস্যদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলে এবং তার প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসে নাম লেখাতে বলে। ১৯৩৮ সালে আরও এক ধাপ এগিয়ে তারা কংগ্রেসকে 'ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রধান কেন্দ্রীয় সংগঠন' হিসাবে স্বীকার করে। ১৯৩৯ সালে দলীয় সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে' পি. সি. যোশী লেখেন যে 'আজকের সব থেকে বড় শ্রেণী সংগ্রাম হল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম', কংগ্রেস হল যার 'প্রধান অঙ্গ'। একই সঙ্গে তারা জাতীয় সংগ্রামকে শ্রমিক শ্রেণি, অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বাধীন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কম্যুনিস্টরা তখন কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। অনেকে কংগ্রেসের জেলা ও প্রাদেশিক কমিটিতে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে— প্রায় কুড়ি জন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদে অভিষিক্ত হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তারা কেরালা, অন্ধ্র, বাংলা ও পাঞ্জাবে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে। সব থেকে বড় কথা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সব থেকে বেশি জঙ্গি গোষ্ঠী হিসাবে তারা ফের মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

গান্ধিবাদী কৌশল ও নেতৃত্বে হতাশ হয়ে কিছু সমাজতন্ত্র অনুরাগী কংগ্রেসী তরুণ ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩২-৩৪

সালের মধ্যে বন্দিশালায় থাকার সময় এক সমাজতন্ত্রী দল গঠনের পরিকল্পনা করে। তাদের অনেকেই ১৯২০-র দশকের যুব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। বন্দিশালায় তারা মার্কসবাদ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা ও আলোচনা করে। মার্কসবাদ, কম্যুনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে তারা সিপিআই-এর তৎকালীন রাজনৈতিক পথের বিরোধিতা করে। তাদের অনেকেই এক বিকল্পের খোঁজ করতে থাকে। শেষে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব ও মিনু মাসানীর নেতৃত্বে তারা একত্রিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করে। শুরু থেকেই কংগ্রেসি সমাজতন্ত্রীরা চারটি মৌলিক বিষয়ে একমত হয় ঃ (১) ভারতে প্রধান সংগ্রাম হল স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের পথে জাতীয়তাবাদ এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, (২) জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই সমাজতন্ত্রীদের কাজ করা উচিত কারণ কংগ্রেসই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের মতে, এই অবস্থায় কংগ্রেসের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে তা আত্মহত্যার সামিল হবে', (৩) কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করতে হবে, এবং (৪) এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাতে হবে ও তাদের জাতীয় সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করতে হবে।

শুরু থেকেই সি.এস.পি. নিজেকে কংগ্রেসের রূপান্তর ও শক্তিবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করে। কংগ্রেসের রূপান্তরের কাজটির দুটি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল মতাদর্শগত দিক। কংগ্রেস কর্মীদের ক্রমশ বোঝাতে হবে যে স্বাধীন ভারতে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী শ্রমিক ও কৃষকপন্থী নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই মতাদর্শগত ও কর্মসূচিগত রূপান্তরকে অবশ্য এক ঘটনা নয়, বরং এক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়।

সাংগঠনিক, অর্থাৎ নেতৃত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমেও কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবা হয়। প্রথমে তৎকালীন নেতৃত্বকে অপসারিত করার কথা চিন্তা করা হয়, কারণ সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দিতে তাদের ক্ষমতা সন্দেহাতীত ছিল না। সিএসপি কংগ্রেসের মধ্যে এক বিকল্প সমাজতন্ত্রী নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে চায়।

এই দৃষ্টিকোণ অবশ্য শীঘ্রই অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয় এবং এর পরিবর্তে এক 'মিশ্র' নেতৃত্বের কথা ভাবা হয় যেখানে নেতৃত্বের সব স্তরে সমাজতন্ত্রীরা অর্ন্তভুক্ত হবেন। কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের এক বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব গঠনের ধারাটি ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী ও ১৯৪০ সালে রামগড়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরিণামে বাম-দক্ষিণ ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিভাজিত হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে সি.এস.পি. (এবং সি.পি.আই) এই অবস্থান থেকে সরে আসে। সি.এস.পি. (এবং সি.পি.আই) নেতৃত্ব উপলব্ধি করে যে এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু জাতীয় আন্দোলনকেই দুর্বল করে তুলবে না, বামপন্থীদেরও মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তারা বুঝতে পারেন যে একমাত্র গান্ধিজির নেতৃত্বেই ভারতের জনগণকে এক সমবেত আন্দোলনের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য জহরলাল নেহরুর মত সি.এস.পি.-র নেতৃবৃন্দ এই উপলব্ধিকে এক পূর্ণ তাত্ত্বিক রূপ দিতে সক্ষম হন এবং এর ফলে তাঁরা বারবার বিকল্প নেতৃত্বের প্রশ্নটিতে ফিরে যান।

ভারতের পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সি.এস.পি. অবশ্য যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন ছিল। এই কারণে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধকে সম্পর্ক ছিন্ন করার স্তরে নিয়ে যায়নি। কোনও চরম মুহূর্ত এসে পড়লে সি.এস.পি. তার তাত্ত্বিক অবস্থান ত্যাগ করে জহরলাল নেহরুর মতের কাছাকাছি কোনও বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত। এর ফলে সি.এস.পি. অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির সমালোচনার সম্মুখীন হত। যেমন, ১৯৩৯

সালে গান্ধিজির সঙ্গে মোকাবিলায় সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করতে অস্বীকার করায় তারা আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করত এবং ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি প্রমাণ পাওয়া যেত।

শুরু থেকেই সি.এস.পি. মোটামুটিভাবে তিনটি মতাদর্শে বিভক্ত ছিল ঃ মার্কসীয়, ফেবিয়ান (Fabian) ও গান্ধিবাদী। দুর্বলতা দূরে থাক, এটা যে কোনও সমাজতন্ত্রী দল, বিশেষত আন্দোলনের এক শক্তি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সি.এস.পি. ইতিমধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস নামে এক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত এক ক্যাডার-ভিত্তিক দলে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া, ১৯৩০-র দশকের মার্কসবাদের পক্ষে বামপন্থার এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্রোতকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এর ফলে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল যা সি.এস.পি.-কে শেষ অবধি বিব্রত করেছিল। দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মিত্রতা তার অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিভেদগুলিকে দীর্ঘদিন ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিল।

মতাদর্শগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সি.এস.পি. মোটামুটিভাবে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের এক মৌলিক সাদৃশ্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ গান্ধিবাদী রাজনীতির ইতিবাচক মূল্যায়ন হতে থাকলে, দলের নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাপে গান্ধিবাদ ও উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়তে থাকল।

১৯৩০-র দশকে আরও বেশ কিছু বামপন্থী চিন্তাধারা ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ১৯৩০ সালে এম. এ. রায় ভারতে ফিরে আসেন এবং বামপন্থী বা তাঁর মতাদর্শের অনুগামীদের এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনীতি ও মতাদর্শে বেশ কয়েকটি রূপান্তর ঘটে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বামপন্থী অনুগামীরা ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। এই দশকে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট, রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েসন, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন ট্রটস্কি গোষ্ঠীও কাজ করতে থাকে। এ ছাড়া, সংগঠিত দলীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী অধ্যাপক এন জি রঙ্গা ও ইন্দুলাল ইয়াগানকের মত বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই সময়ে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সিপিআই, সিএসপি, নেহরু, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি এক অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুসরণ করে, যা ১৯৩৫ সালের পরে তাঁদের এক সঙ্গে কাজ করতেও ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই কর্মসূচির প্রধান দিকগুলি ছিল ঃ ধারাবাহিক সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, জমিদারি প্রথার বিরোধিতা, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করা, স্বাধীন ভারতকে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রদান করা এবং এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী বিদেশনীতি প্রণয়ন করা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বামপন্থীরা সব থেকে সাহসী, লড়াকু ও আত্মত্যাগী হলেও তারা জাতীয় আন্দোনে সমাজতান্ত্রিক দল ও ধারণাগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। অথচ এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ১৯৩০-র দশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করতেও তারা অসফল হয়। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসবিদরাও এর কোনও সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

এই জটিল ঘটনাচক্রের অনেকগুলি ব্যাখ্যা নিজে থেকেই উঠে আসে। বামপন্থীরা অবধারিতভাবে শক্তিশালী কংগ্রেসের সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে এবং এর ফলে চরম মুহূর্ত দেখা দিলে হয়তো পিছিয়ে গেছে অথবা জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মত তারা মতাদর্শগত ও কৌশলগত নমনীয়তা দেখাতে পারেনি। কিন্তু সরলীকৃত মুক্তি ও চরমপন্থী বাগাড়ম্বরের সাহায্যে তারা দক্ষিণপন্থীদের মোকাবিলা করতে চেয়েছে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের পথ ছিল পিচ্ছিল— মতাদর্শগত

প্রশ্নে নয়, সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সব থেকে গুরুতর অভিযোগ ছিল তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী, তারা গণসংগ্রাম বা গণ আন্দোলনকে ভয় পায় এবং বুর্জোয়া প্রভাব থাকায় তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা আন্তরিক নয়। এই অভিযোগগুলি নস্যাৎ করে দিতে দক্ষিণপন্থীদের কোনও অসুবিধা হয়নি। বামপন্থীরা না মানলেও মানুষ দক্ষিণপন্থীদের কথায় বিশ্বাস করে। তার উদাহরণ হিসাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩৬-৩৭ সালে নির্বাচন ও পদাধিকার গ্রহণের প্রশ্নে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীরা বিবাদে লিপ্ত হয়। তারা এই বিষয়গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপস বলে মনে করে। ১৯৩৯-৪২ সালে লড়াই দেখা দেয় গণ আন্দোলন সূচনা করার প্রশ্নে—গান্ধিজির অনিচ্ছুক মনোভাবকে তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নরম মনোভাব হিসাবে দেখে এবং এর ফলে এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হল বলে অভিযোগ করে এবং ১৯৪৫-৪৭ সালে বামপন্থীরা নেহরু এবং মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ সমেত সব গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করে। এই সময়ে বিবাদের বিষয় ছিল ক্ষমতার হস্তান্তর, যাকে বামপন্থীরা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ মরিয়া প্রচেষ্টা ও ক্লান্ত কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতার প্রতি লোভ, এমনকী বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দেয়।

ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতেও বামপন্থীরা ব্যর্থ হয়। নেহরু ছাড়া কংগ্রেসের বাকি নেতাদের বামপন্থীরা বুর্জোয়া আখ্যা দেয়। তাদের আলোচনার প্রক্রিয়াকে 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস' মনে করে এবং যে কোনও সাংবিধানিক পদক্ষেপকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুতি বলে অভিহিত করে। ভারতের সামাজিক শ্রেণিগুলি ও তাদের রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করার জন্য তারা এক সরলীকৃত পথের আশ্রয় দেয়। কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালনা করার চেষ্টা করলেই বামপন্থীরা তাকে আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ হিসাবে বিবেচনা করে। তারা সর্বদা অহিংসার তুলনায় সশস্ত্র সংগ্রামকে কাম্য মনে করে এবং মতাদর্শ, জনগণের যোগদান ইত্যাদি বাদ দিয়ে সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানাতে থাকে। বামপন্থীদের ধারণা ছিল নেতৃত্ব নির্দেশ দিলেই দেশের মানুষ যে কোনও ধরনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

বামপন্থীদের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল, অল্প সময় বাদ দিলে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির এক সঙ্গে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া। বামপন্থীদের নিয়ে এক সংযুক্ত মোর্চা গঠনের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে তাত্ত্বিক বিবাদ ছিল এবং তাদের নেতাদের মেজাজের প্রভেদও উপেক্ষণীয় ছিল না। দীর্ঘ দিন ধরে নেহরু ও সুভাষচন্দ্র এক সঙ্গে কাজ করতে পারেননি এবং ১৯৩৯ সালে তাঁদের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। নেহরু এবং সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের রাজনীতি সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হন। ১৯৩৯ সালের পরে বসু ও সমাজতন্ত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সি. এস. পি. ও কম্যুনিস্টরা একত্রে কাজ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করে। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট এবং রায় পন্থীদের জন্য সিএসপি তার দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয় যাতে বেআইনি বলে ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক কাজের আইনি পথ খুঁজে পায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টরা শীঘ্রই পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায় এবং একে অপরের ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়। এর অনিবার্য পরিণাম হিসাবে এদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্রীরা এক ধরনের কম্যুনিস্ট-ভীতিতে আক্রান্ত হয় এবং কম্যুনিস্টরা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী নেতাকে সম্ভাব্য বুর্জোয়া বা মার্কিন দালাল (১৯৪৭ সালের পর) মনে করতে থাকে।

বামপন্থীরা অবশ্য ভারতীয় সমাজ ও রাজীনতিতে এক মৌলিক প্রভাব ফেলত সক্ষম হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করা তাদেরকে বৃহত্তম সাফল্য। কংগ্রেসের উপর প্রভাব ফেলাও তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ভোট হলে তার এক-তৃতীয়াংশের উপর বামপন্থীরা তাদের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে নেহরু ও বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুৎ পটবর্ধনের মত সমাজতন্ত্রীকে নেহরু তাঁর কার্যনির্বাহী সমিতিতে মনোনীত করেন। ১৯৩৯ সালে বামপন্থী প্রার্থী হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদের নির্বাচনে পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০-১৩৭৭ ভোটে পরাস্ত করতে সফল হন।

রাজনীতি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে মোটের উপর এক বামপন্থী চরিত্র দেওয়া হয়। নেহরু বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে জোরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে—আজ তা কিছুটা অনিশ্চিতভাবে এক নতুন সামাজিক মতাদর্শের প্রান্তে ঘোরাঘুরি করছে। এমনকী কংগ্রেসের দক্ষিণাপন্থীরাও স্বীকার করে নেয় যে, ভারতের মানুষের দারিদ্র ও দুর্দশার কারণ শুদ্ধ ঔপনিবেশিক শাসন নয়, ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোও তার জন্য দায়ী এবং এর ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন করা আবশ্যক। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে অনুমোদিত মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব, ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত আর্থিক নীতি, ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, ১৯৩৮ সালে এক জাতীয় যোজনা কমিটি গঠন এবং অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত বিষয়গুলিতে গান্ধিজির ক্রমশই চরম অবস্থানের দিকে সরে আসার মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের উপর বামপন্থীদের প্রভাবই প্রতিফলিত হয়। সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোশিয়েসন গঠন এবং ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিপ্‌লস্ কনফারেন্স আহ্বান করা বামপন্থীদের অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। অল ইন্ডিয়া ইউমেনস্ কনফারেন্সও বামপন্থীরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সব থেকে বড় কথা, কম্যুনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মত দুটি বড় বামপন্থী দল গঠিত হয় অথবা গঠিত হতে থাকে।

২.৩ কংগ্রেস ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি

ব্রিটিশদের ভারত অধিকারের নকশাটি বহু বর্ণরঞ্জিত। তারা বিভিন্ন কৌশলে দেশের বিভিন্ন অংশকে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এবং এর পরিণাম হিসাবে এই উপমহাদেশের দুই-পঞ্চমাংশ নৃপতি-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও কাশ্মীরের মত ভারতীয় রাজ্য, যেগুলি আয়তনে বহু ইউরোপীয় দেশের সমান। আবার এমন বহু ছোট ছোট রাজ্যও ছিল যাদের জনসংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, এদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা সবাই ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রধানত্ব স্বীকার করত।

এর প্রতিদান হিসাবে ব্রিটিশরা নৃপতিদের স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে যে কোনও রকম প্রতিরোধ বা সংগ্রামকে দমন করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির বড় অংশেই একনায়কতন্ত্র চালু ছিল, যেখানে সমস্ত ক্ষমতা শাসক বা তাদের অনুগামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই রাজ্যগুলিতে ভূমি করের হার ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় বেশি ছিল এবং আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের মাত্রা সাধারণত খুবই কম ছিল। রাজস্বকে যথেচ্ছভাবে নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার তাদের লাগামহীন অধিকার ছিল— এর ফলে তারা প্রায়শই বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। এদের মধ্যে কিছু কিছু আলোকপ্রাপ্ত নৃপতি ও তাদের মন্ত্রীরা সময়ে সময়ে প্রশাসন, কর ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্কার করার প্রচেষ্টা করেছিল, এমনকী জনগণকে সরকারে অংশগ্রহণ করতেও অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ নৃপতি-শাসিত রাজ্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিকে পশ্চাৎপদ ছিল—যদিও এর জন্য তারা নিজেরা পুরোপুরি দায়ী ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি যে অবস্থানে নিজেদের আবিষ্কার করেছিল, তার জন্য শেষমেশ ব্রিটিশ সরকারই দায়ী। জাতীয় আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকলে এই নৃপতিদের তার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ার নির্দেশ দেওয়া শুরু হয়েছিল। বরোদার মহারাজার মন কেউ জাতীয়তাবাদের প্রতি কোনও রকম সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তাকে ব্রিটিশদের রোষের মুখে পড়তে হত। ব্রিটিশদের অবিরাম নজরদারি ও হস্তক্ষেপের ফলে বেশ কয়েকজন সংস্কারকামী শাসকও সেরকম কোনও উদ্যম নেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল— বড়োদা ও মহীশূরের মত কিছু রাজ্য প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের কাজ হাতে নেয় এবং শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করতে সফল হয়।

২.৪ প্রজামণ্ডল আন্দোলন

ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ও তার সঙ্গে গণতন্ত্র, দায়িত্বশীল সরকার ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বর্ধিত সচেতনতা অনিবার্যভাবে রাজ্যগুলির মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যেসব বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা ব্রিটিশ ভারত থেকে পালিয়ে রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারাই সেখানে মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে আসেন। ১৯২০ সালের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন রাজ্যগুলিতে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। মোটামুটি এই সময়ে এবং এর প্রভাবে রাজ্যগুলির মানুষ বেশ কয়েকটি স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। যে সব রাজ্যে এই ধরনের প্রজামণ্ডল গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ছিল মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, কাথিয়াওয়াড়ি ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি, জামনগর, ইন্দোর ও নবনগর। এই প্রক্রিয়া ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে চলে আসে যখন অল ইন্ডিয়া স্টেট পিপ্‌লস্ কনফারেন্সে রাজ্যগুলি থেকে সাতশো রাজনৈতিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বলবন্তরাজ মেহতা, মাণিকলাল কোঠারি এবং জি আর অভয়ংকর।

ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতি কংগ্রেসের নীতি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে নাগপুরে, যখন সেখানে নৃপতিদের তাদের রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুমতি দিতে অনুরোধ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস অবশ্য একই সময়ে একথাও স্পষ্ট করে দেয় যে রাজ্যের অধিবাসীদের কংগ্রেসের সদস্য হবার অনুমতি দিলেও তারা কংগ্রেসের নামে নিজের নিজের রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে পারবে না। রাজনৈতিক কাজ করতে হলে তা করতে হবে ব্যক্তি হিসাবে অথবা স্থানীয় কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে। ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রভেদ (রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যেও), রাজ্যগুলিতে নাগরিক অধিকারের অভাব যার মধ্যে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার মানুষের রাজনৈতিক পাশ্চাৎপদতা এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির আইন সঙ্গত স্বাধীন সত্তা— এগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের এই বিধিনিষেধ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এগুলি করা হয় রাজ্যগুলিতে এবং ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনের স্বার্থে। এদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যের মানুষদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা এবং নিজেদের দাবির সমর্থনে নিজেদেরই লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করা। ঘরোয়াভাবে কংগ্রেস এআইপিসি সমেত রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলত। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস ১৯২০ সালের প্রস্তাবটিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং বিখ্যাত লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহরু হলেন, "ভারতীয় রাজ্যগুলির পক্ষে অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়.... এই রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে শুধু সেই সব রাজ্যের মানুষরা।" পরবর্তীকালে কংগ্রেস নৃপতিদের কাছে রাজ্যগুলির মানুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করার দাবি পেশ করে।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ঘটনা ভারতীয় রাজ্যগুলির পরিস্থিতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন আনে। প্রথমত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনা করা হয় যেখানে ভারতীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে এক প্রত্যক্ষ সাংবিধানিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবে এবং রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। কিন্তু এখানে একটি ধাঁধা ছিল ঃ এই প্রতিনিধিরা গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হবেন না, নৃপতিরাই তাদের মনোনীত করবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে এরা এক রক্ষণশীল জোট গড়ে তুলবে যাতে জাতীয়তাবাদী চাপ প্রতিরোধ করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। কংগ্রেস, এ আই এস পি সি এবং রাজ্যগুলির অন্যান্য সংগঠন সরকারের এই চাল ধরে ফেলে এবং দাবি করে যে নৃপতিদের মনোনীত নয়, শুধু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই বিধানমণ্ডলীতে পাঠাতে হবে। রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি এর ফলে জরুরি হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা স্থাপিত হওয়া কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়েছে— এই সংবাদ ভারতীয় রাজ্যগুলির মানুষের মধ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে প্রেরণা যোগায়। নৃপতিরাও এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবের মুখোমুখি হয়— কংগ্রেস যেখানে স্রেফ এক বিরোধী দল না হয়ে ক্ষমতাসীন দলে পরিণত হয়েছে এবং সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রভাব বিস্তার করার শক্তির সহায় করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রাজ্যগুলি যেন নতুন করে জেগে ওঠে। এই সময়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও অন্যান্য সংস্কারের দাবিতে রাজ্যগুলিতে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়। যে সব রাজ্যে এই ধরনের কোনও সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না, সেই সব রাজ্যের প্রজামণ্ডলের সংখ্যা ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে ওঠে। জয়পুর, কাশ্মীর রাজকোট, পাতিয়ালা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতে বড় আকারের আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এই সব ঘটনার ফলে কংগ্রেসের নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৩৮ সালের হরিপুরা অধিবেশনেও কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, রাজ্যগুলিতে আন্দোলন কংগ্রেসের নামে নয়, নিজস্ব শক্তিতে ও স্থানীয় সংগঠনগুলির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সেখানকার মানুষের নতুন উদ্দীপনা লক্ষ করে কয়েক মাস পরে গান্ধিজি ও কংগ্রেস এই প্রশ্নে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও সমাজতন্ত্রী অংশ এবং রাজ্যগুলির রাজনৈতিক কর্মীরা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি জানিয়ে আসছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে রাজনৈতিক আবহাওয়াতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে, সরকার ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলস চালু করে এবং রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি অসহিষ্ণুতা বেড়ে ওঠে। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে অবস্থা চরমে ওঠে। তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ না করে সংগ্রামকে রাজ্যগুলির মানুষদের কাছে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানায়। এর ফলে রাজ্যগুলির মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি ছাড়াও ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বলে ও রাজ্যগুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার দাবি করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে রাজ্যগুলির সমস্যা তাতে কেন্দ্রবিন্দু গ্রহণ করে। এটা জাতীয় নেতৃত্ব, বিশেষত সর্দার প্যাটেলের কৃতিত্ব যে, ব্রিটিশ সর্বপ্রধানত্বের অবসানে রাজ্যগুলি আইনত স্বাধীনতা লাভ করার ফলে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে তাঁরা সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণে আনেন। অধিকাংশ রাজ্যই কূটনৈতিক চাপ, হুমকি, গণ আন্দোলন ইত্যাদির সম্মিলিত চাপে মাথা নোয়াতে শুরু করে এবং

নিজেরাও উপলব্ধি করে যে স্বাধীনতা তাদের কাছে কোনও বাস্তবসম্মত বিকল্প নয়। এর ফলে তারা 'ইনস্ট্রুমেন্টস অফ অ্যাকসেশনে' স্বাক্ষর করে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর, জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের মত কিছু রাজ্য শেষ মুহূর্ত অবদ্ধি প্রতিরোধ চালানোর চেষ্টা করে। শেষে শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদ নিজের অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং স্বাধীনতার জন্য বাস্তবিকই গুরুগম্ভীর দাবি তোলে।

২.৫ মুসলিম লিগ ও পাকিস্তান আন্দোলন

পাকিস্তানের ধারণাটি প্রথম এক কেমব্রিজ শিক্ষিত যুবক, রহমত আলির মনে দানা বাঁধে। তিনি তাঁর এই ধারণার কথা গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সদস্যদের জানান। তাঁর মৌলিক তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র মৌলিক মহাজাতি। তিনি বলেন ঃ ''আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার ও বিবাহ আইন হিন্দুদের থেকে আলাদা। এই প্রভেদগুলি শুধু বৃহত্তর নীতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তর পর্যন্ত সেগুলি বিস্তৃত। আমরা হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে আহার করি না, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই না। আমাদের রীতিনীতি, পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার, এমনকী খাদ্যাভ্যাস ও পোষাক পরিচ্ছদ ও ভিন্ন রকমের।'' সেই সময়ে কেউই তাঁর এই ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ক্রমশ তাঁর এই তত্ত্ব ভারতীয় মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় মনে হতে থাকে। মুসলিম লিগের সভাপতি এম. এ. জিন্না সাফল্যের সঙ্গে এই ভাবনার সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকেন, যার পরিণামে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভাজিত হয় এবং পাকিস্তান নামে এক নতুন দেশের জন্ম হয়।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু শতাব্দী ধরে এই উপমহাদেশে একত্র বসবাস করে ও ক্রমশ একে অপরের সঙ্গে বেঁচে থাকতে শেখে ও হিন্দু ও মুসলমানেরা এমন কোনও অভিন্ন ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি যার উপর তারা একটিই দেশ গঠন করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ শাসকরা এই অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ করতে সফল হয়। কাজেই সত্যের কাছাকাছি বলে এটাই ধরে নেওয়া যায় যে, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ ছিল এবং যে একটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতার সম্ভাবনা ছিল, তাও হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ব্রিটিশরা এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে এই প্রভেদগুলিকে আরও প্রকট করে তুলেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না। মুসলিমরা মনে করত যে ব্রিটিশরা তাদের হাত থেকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে এবং ব্রিটিশরা সর্বদাই মুসলিমদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু মনে করত। ওয়াহাবি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনকে বিপদের মুখে ফেলার পরে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে কারণ তাদের ধারণা হয় মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে। তারা কচ্ছের খান বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে বেরিলীর হিন্দু তালুকদারদের উস্কে দেয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি লরেন্স রাজপুত্র শাসকদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। তিনি বলেন ঃ ''একথা সবার জানা নেই যে প্রথমে সম্রাট আলমগীর ও পরে হায়দার আলি হাজার হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন, ধর্মস্থানগুলি অপবিত্র করেন ও তাদের বহু মন্দির ধ্বংস করেন।'' এদিকে মুসলিমরা ইংরাজি শিক্ষা ও পশচাত্য সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে এবং চাকুরি ও আধুনিকতার স্বাদ থেকে রক্ষিত থেকে যায়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি ক্রমশ উল্টো দিকে ঘুরে যায়। হিন্দুরা ব্রিটিশদের শত্রুতার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে এসে তারা ক্রমশ জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আরও বেশি বিপজনক হয়ে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ডিভাইড অ্যান্ড রুল' তত্ত্বটি আসলে বিদ্রোহের সময়েই ব্রিটিশরা প্রয়োগ করেছিল— যদিও পরবর্তীকালেই সেটিকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। ১৮৭০ সাল থেকে ব্রিটিশ নীতির এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন উপায়ে মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে ও সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিতে থাকে। এর পরিণামে এলাহাবাদ, বেনারস, বালিয়া, গাজীপুর, আজমগড় ইত্যাদি স্থানে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্রিটিশদের প্রশাসনিক নীতির এক অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৮৭১ সালে স্যার ইউলিয়াম হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মুসলিম সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি লেখেন ঃ ''শত্রুতা না চালিয়ে গিয়ে এই মুহূর্তে মুসলিমদের সঙ্গী করে নেওয়াই সুবিধাজনক।'' ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকরাও একই মতের অংশীদার ছিলেন।

ব্রিটিশ ও মুসলিমদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করেন। ইংরাজি শিক্ষা, আধুনিক মনস্কতা ও ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের উপযোগিতার কথা তিনি মুসলিমদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটিশদের বলেন যে মুসলিমরা ব্রিটিশ-বিরোধী নয়— একটু নিরাপত্তা পেলে তারা ব্রিটিশদের খুবই অনুগত হয়ে উঠবে। আলিগড় আন্দোলন ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই মত প্রচার করতে যথেষ্ট সফল হয়। ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষা, আধুনিকীকরণ ইত্যাদিতে তিনি এক বড় ভূমিকা নেন। গাজীপুরে তিনি ১৮৬৪ সালে একটি ইংরাজি শিক্ষার স্কুল ও পরের বছর একটি বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে 'অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে ওঠে, ১৮৮৬ সালে 'মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়, ১৮৮৮ ও ১৮৯৩ সালে যথাক্রমে 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিকে অ্যাশোসিয়েশন' ও মহমেডান ডিফেন্স অ্যাসোশিয়েশন অফ আপার ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির প্রত্যেকটি মুসলিমদের যথেষ্ট উপকারে আসে। সৈদয় আহমেদ খান ও তাঁর আলিগড় আন্দোলন— উভয়েই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এর কারণ খান তাঁর কাজের জন্য ব্রিটিশদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁর এই নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে। খান নিজে এবং তাঁর আলিগড় আন্দোলন ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসেরও বিরোধিতা করতে থাকে। তিনি এক সময়ে মন্তব্য করেন ঃ ''কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা। ভারতের জনগণের নামে তারা এই ক্ষমতা অর্জন করতে চাইলেও সংখ্যালঘু হওয়ার ফলে মুসলিমরা সে ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করবে।'' অন্য এক সময়ে তিনি বলেন ঃ ''খুব সামান্য ক্ষেত্রেই যাদের মিল আছে, সেরকম দুটি ভিন্ন মতাবলম্বী জাতি নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা সম্ভব নয়।'' তাঁর পথ অনুসরণ করে আলিগড় আন্দোলন এক সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। পাকিস্তানের জন্ম দিতে এগুলি নিশ্চিতভাবে সাহায্য করে।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ভারতের রাজনীতিতে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে। ১৯০৬ সালে সাংবিধানিক সংস্কারের এক নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর ব্যক্তিগত সচিব স্মিথ মুসলিমদের এক প্রতিনিধিদলকে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। স্যার আগা খানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং চাকুরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধার দাবি জানায়। এর ফলে ১৯০৯ সালের 'রিফর্ম অ্যাক্ট' বা সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে আরও

উৎসাহ যোগায়, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই পদক্ষেপগুলি সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিতে ব্রিটিশদের সচেতন প্রয়াসেরই এক অঙ্গ।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত হয় ভারতীয় মুসলিম লিগের পতাকার নীচে। ১৯০৬ সালে ৩০শে ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লা খান মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা করেন। লিগের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করা, মুসলিমদের অধিকার রক্ষা করা, জনজীবনে শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য আরও ভালো সুযোগ সৃষ্টি করা ও ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রগতিকে প্রতিহত করা। এইভাবে লিগ সৈয়দ আহমেদ খানের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। শুরু থেকেই লিগ কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে থাকে। লিগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং ১৯০৫ সালে ও পরবর্তী সময়ে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের বিরোধিতা করে। লিগ শুরু থেকেই ইসলাম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে লিগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও গভীর হয়। ১৯০৭ সালের করাচি অধিবেশনে লিগের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ ''যদি এক বালকের (মহম্মদ বিন কাশিম) নেতৃত্বে সামান্য কয়েকজন মানুষ সিন্ধ অঞ্চলে কলিমা শিক্ষা দিতে পারে ও শরিয়ত আইন চালু করতে পারে, তাহলে সাত কোটি মুসলমান কি তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে না?'' অবশ্য নবাব সৈয়দ আহমেদ, মৌলানা মহম্মদ-উল-হাসানের মত কিছু মুসলিম নেতা লিগের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরোধী ছিলেন— যদিও তাঁরা লিগের আদর্শে কোনও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি। লিগের চিরস্থায়ী লক্ষ্য ও আদর্শ মুসলিম সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১৯০৯ সালের সংস্কারে লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯১১ সালের পর থেকে অবশ্য ভারতের বাইরে কিছু ঘটনা অল্প সময়ের জন্য লিগ ও কংগ্রেসকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯১১ সালে ইটালি ত্রিপোলি আক্রমণ করে যা তুরস্কের এলাকার এক অংশ ছিল। ১৯১১-১২ সালের বলকান যুদ্ধ তুরস্ককে আরও দুর্বল করে তোলে। ব্রিটেনের শত্রু হিসাবে তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। এই সব সময়ে ভারতীয় মুসলিমরা মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে তুরস্কের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রিটিশদের এই রকম কোনও সমবেদনা ছিল না। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশদের অনড় মনোভাব এবং তার সুলতানের 'খলিফা' উপাধি কেড়ে নেওয়ায় ভারতীয় মুসিলমরা আরও ক্ষুণ্ণ হয়। এর ফলে লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে ইচ্ছুক হয়। কংগ্রেস লিগের কাছে আকর্ষণীয় বেশ কিছু শর্তে রাখে। সে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, সাম্প্রদায়িক ভেটো এবং 'ওয়েটেজ' কে স্বীকার করতে সম্মত হয়। এর ফলে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসই কার্যত খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা করে। এছাড়া, গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার এক প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে মুসলিমদের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হওয়া। কিন্তু কংগ্রেস, ও মুসলিম লিগের মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২১ সালে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহের ফলে আবার সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠে। এর ফলে ১৯২২ ও পরে ১৯২৪ সালে ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং সাংবিধানিক সংস্কারের নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করে। এই কমিশনের সব সদস্যই শ্বেতাঙ্গ ছিলেন সুতরাং কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করে এবং দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা, হরতাল ও মিছিলের আয়োজন করে। লিগ অবশ্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসকে সহযোগিতা করেনি। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অধ্যক্ষতায় এক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে এমন এক সূত্র ও পরিকল্পনা রচনা করা যা লিগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে, যা নেহরু-রিপোর্ট বলে

পরিচিত হয়। নেহরুর রিপোর্টের সূত্রের ভিত্তিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের দাবিতে সে লিগের সমর্থন চায়। কিন্তু জিন্না তাতে সম্মত হন না। এর বদলে জিন্না তাঁর 'চোদ্দ-দফা পরিকল্পনা' পেশ করেন ও কংগ্রেস তা বর্জন করে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু জিন্নার বাড়তি দাবিগুলি মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও কংগ্রেস যোগ না। এর ফলে লিগ ও কংগ্রেসের বিবাদ অমীমাংসিত থেকে যায়। এর মূল কারণ এই যে জিন্না ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা হল দুটি স্বতন্ত্র দেশ বা মহাজাতি। কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে শুধু মুসলিম লীগের। কংগ্রেস এই ধারণাকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে এদের মধ্যেকার অচলাবস্থা থেকেই যায়। মুসলিম লিগ তার দাবিগুলিতে অনড় থাকে এবং তাদের দাবিগুলির সমর্থনে সংহতি প্রদর্শন করতে মুসলিমদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে লিগ সোজাসুজি ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি করে। পাকিস্তানের ধারণার এক অতীত ইতিহাস আছে। ১৯২৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বহু ভারতীয় মনে করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়। লিগও ক্রমশ মনে করতে থাকে যে অখণ্ড ভারতে মুসলিমদের পক্ষে নিরাপদ ও সুখি জীবন কাটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ১৯৩০ সালে লিগের সভাপতি স্যার মহম্মদ ইকবাল বলেন যে, পৃথক বাসভূমি থাকলেই মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব। জিন্নাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তাঁর এই ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন ঃ ''ভারতে এই ব্যবস্থা সম্ভব না হলে একমাত্র বিকল্প হল গৃহযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মাধ্যমে যা প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু কাল ধরে চলে আসছে। ''পাকিস্তানের ধারণার জন্ম না দিলেও তিনি ভারতীয় মুসলিমদের পৃথক বাসভূমির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর ভাবনা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় মুসলিমদের এক বড় অংশকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'নাউ অর নেভার' শীর্ষক এক পুস্তিকায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রহমত আলি ও তাঁর তিন বন্ধু প্রথম পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই প্রস্তাবিত এলাকায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ, উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমি দাবি করার সময় লিগ 'পাকিস্তান' নামটি গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেস ও লিগের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী, যথাক্রমে স্যার সিকন্দর হায়াত খান, ফজলুল হক ও স্যার মহম্মদ মাদুল্লা খান ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌর বার্ষিক অধিবেশনে লিগকে সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে অসফল হলেও লিগ হিন্দুদের, বিশেষণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে যেতে থাকে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রসভাগুলি পদত্যাগ করলে লিগ আনন্দে এই বছরের ২২শে ডিসেম্বর 'দি ডেলিভারেন'' বা 'মুক্তি দিবস' হিসাবে পালন করে। তার প্রচারে লিগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মের আশ্রয় নেয় এবং তার এই কৌশল যথেষ্ট সফল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও লিগকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ব্রিটিশরা ভারতের মানুষকে আশ্বাস দিতে থাকে যে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভারতকে ডোবিনিয়ানের মর্যাদা প্রদান করা। এই সময়ে তাঁর দাবিগুলি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা লিগ বুদ্ধিমানের কাজ বলে
মনে করে। এর ফলে ১৯৪০ সালে লাহোরের বার্ষিক অধিবেশনে লীগ মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমি দাবি করে। কিন্তু তখন লিগ 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করেনি। কিছু ভারতীয় ও ব্রিটিশ সংবাদও মুসলিমদের পৃথক রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করার সময়ে এই শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে। পরে ১৯৪৩ সালে লিগ এই নামটিকে গ্রহণ করে।

১৯৪০ সালে তাঁর আগস্ট অফার' বা আগস্ট ঘোষণায় লর্ড লিনলিথগো এই প্রথম মুসলিমদের আবদ্ধ করেন যে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে কোনও কোনও সমঝোতা হলে তাদের পুর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব পেশ করা হলে লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই তা মানতে অসম্মত হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা করে। লিগ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং যখন সমস্ত কংগ্রেস নেতাই জেলে বন্দি তখন পাকিস্তানের ধারণাটি নিয়ে ব্যাপক প্রচার করে। ধর্মের নামে লিগ মুসলিমদের সমর্থন ভিক্ষা করে এবং তাতে মুসলিম ধর্ম প্রচার করা বিপুল ভাবে সাড়া দেন। পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচার করার উদ্দেশ্যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি না মানা হলে লিগ এমনকী গৃহযুদ্ধের হুমকী দেয়। উত্তর-পশ্চিমে পাঠানদের এক সমাবেশে জিন্না বলেন ঃ ''আপনারা কি পাকিস্তান চান বা চান না? পাকিস্তান চাইলে লিগকে ভোট দিন। আজ আমরা আমাদের কর্তব্য পালন না করলে আপনারা 'শূদ্রে' পরিণত হবেন ও ইসলাম ভারত থেকে মুছে যাবে। আমি কখনও মুসলিমদের হিন্দুদের দাস হতে দেব না।'' এইভাবেই সারা দেশ জুড়ে লিগ তার প্রচার চালায়। একথা প্রকাশ্যে বলা হতে লাগল যে লিগকে সমর্থন করার অর্থ ইসলামকে সমর্থন করা। বহু সংবাদপত্র পাকিস্তান গঠনের দাবিকে সমর্থন জানাতে লাগল। এদের মধ্যে ছিল ইংরাজি সংবাদপত্র 'ডন', উর্দুতে 'অনজাম', 'ইনকিলাব', বাংলাতে 'আজাদ' ইত্যাদি। লিগের প্রচার সাফল্য লাভ করল এবং অধিকাংশ মুসলিম পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিকে সমর্থন জানাল। অস্পৃশ্য সমাজের নেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সি রাজাগোপালাচারীও লিগের দাবিকে সমর্থন করলেন। ১৯৪৪ সালে রাজাগোপালাচারী তাঁর সমঝোতা সূত্র জিন্নার কাছে পেশ করেন। এতে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায় জিন্না এই সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ সালে সিমলা অধিবেশনে লিগ নিজকে সমস্ত ভারতীয় মুসলিমের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে এবং কংগ্রেসের মনোনীত মৌলানা আবদুল কালাম আজাদকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নিতে অস্বীকার করে। এর ফলে সিমলা অধিবেশন ও ওয়াভেল পরিকল্পনা, দুই-ই ব্যর্থ হয়। ১৯৪৫ সালে অ্যাটলি ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকার গঠন করেন। ওই একই বছরে ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ভারতে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে ও মে মাসে তার প্রস্তাব পেশ করে। কংগ্রেস ও লিগ, দুই দলই প্রথমে তা মেনে নিলেও পরে লিগ তা প্রত্যাখ্যান করে ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এর প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করে, যার ফলে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। প্রশাসনে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে লিগ এতে যোগ দিতে সম্মত হয় ও তাতে পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠায়। ভারতীয় গণ পরিষদ (constituent assembly) ডিসেম্বর মাসে তার প্রথম সভা করে। কংগ্রেস একে সার্বভৌম মনে করলেও লিগ সেই মত মানতে অস্বীকার করে। এদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে, যার প্রচুর সম্পত্তি এবং প্রাণহানি ঘটে। হিন্দু ও মুসলিম, দুই সম্প্রদায়েরই লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ও নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশরা ঘোষণা করে যে তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭শে মার্চ লিগ 'পাকিস্তান দিবস' পালন করে। এর ফলে বিশেষত পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলাতে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, নারীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। গান্ধি ছাড়া নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের মত বহু কংগ্রেস নেতাই লিগের পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা করার অর্থহীনতা উপলব্ধি করেন। ভিপি মেনন ভারত বিভাজনের এক খসড়া পরিকল্পনা

তৈরী করেন। ব্রিটিশ সরকার এতে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং 'জুন প্ল্যান' বা 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' নামে এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও লিগের কাছে উপস্থাপিত করেন। দুটি রাজনৈতিক দলই এই প্রস্তাব মেনে নেয়। এর পরে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট বা ভারতীয় স্বাধীনতা, 'আইন, ১৯৪৭ অনুমোদন করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

২.৬ সূত্র নির্দেশ

১। Handa R.L. : History of Freedom Movement in Princely states. N. Delhi, 1968.

২। Walia Ramesh : Praja Mandal Movement in East Punjab States, Patiala, 1972.

৩। Hardy Peter : The Muslims of British India, Cambridge, 1972.

৪। Hashan Mushirul : Nationalism and Communal Politics in India, N. Delhi, 1991.

৫। Chandra Bipan : Communalism in Modern India, New Delhi, 1984.

৬। Chandra Bipan : The Indian Left : Cuetical Appraisals, N. Delhi, 1983.

৭। Adhikari G. (ed.) : Documents of History of the communist Party of India.

২.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১। দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১৯০৬ সাল থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্রমবিকাশের বর্ণনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ভারতে মুসলিম লিগের জন্মের কারণ কী কী? এতে ব্রিটিশদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির অবদান কতখানি?

৩। অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ

কখন এবং কোথায় পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়?

২.৮ সংক্ষিপ্তসার

এই পর্যায়ে বহু রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করার দাবী ক'রে। এই পর্যায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং

প্রজামণ্ডল আন্দোলন। ১৯৩৫ সালের পরে মুসলিম রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার দিকে সরে আসে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের ফলে ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ বিকাশ হয় এবং শেষে ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মুসলিম লিগের এই পৃথক রাষ্ট্রের দাবির পরিণামে শেষে ভারত ভাগ হয়ে যায় এবং স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়।

একক ৩ ❑ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা আগস্ট বিদ্রোহ

গঠন ঃ

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঃ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২

৩.৩ সূত্র-নির্দেশ

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ সংক্ষিপ্তসার

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করা, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদন করে কংগ্রেস কীভাবে এই গণ আন্দোলন শুরু করল তার ব্যাখ্যা করা, এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্যকে চিহ্নিত করা।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঃ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২

১৯৪২ সালে ভারত বিশ্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের খুব কাছাকাছি চলে আসে। মিত্রশক্তির সদস্যেরা ভারতের রাজনৈতিক ভবিতব্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও চিনের চিয়াঙ কাই শেক ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনও এক বোঝাপড়া করে নেবার জন্য ব্রিটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এটা সত্য যে দেশের ভিতরে বা বাইরে, কোনওখানেই সেই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক ছিল না। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার দিন থেকেই জাপান নিরন্তর আক্রমণ চালাতে থাকে— ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়, ৭ই মার্চ রেঙ্গুন ও ১২ই মার্চ আন্দামানও জাপানের দখলে আসে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতের চারদিকের সমুদ্র জাপানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্রিপস যখন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন, তখন ত্রিংকোমালি, কাকিনাড়া ও

বিশাখাপত্তনমের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। মাদ্রাজ সরকার তার কার্যালয়গুলিকে উপকূল অঞ্চল থেকে সরিয়ে ভিতরের দিকে নিয়ে যায় এবং ত্রিংকোমালি থেকে কলকাতা—সমগ্র পূর্ব উপকূল ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কমিটি স্থির করে যে আক্রমণকারী শক্তিগুলিকে ভারতের মানুষ অহিংস অসহযোগিতার মাধ্যমে মোকাবিলা করবে এবং তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের সহযোগিতা করবে না। কংগ্রেস অবশ্য মেনে নেয় যে, ব্রিটিশ ও আক্রমণকারীরা যেসব স্থানে সক্রিয় যুদ্ধে লিপ্ত, সেইসব স্থানে ভারতীয় অসহযোগিতা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে না। ক্রিপস আগে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। ক্রিপস ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে এসে পৌঁছোন।

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ক্রিপস একটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য হল ''যত শীঘ্র সম্ভব ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা।'' (২) এই প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন মর্যাদার সব ভারতীয় ইউনিয়নের গঠনের কথা বলা হয় এবং যুদ্ধের পর তাকে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার দেওয়া হয়। (৩) যুদ্ধের পর ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত গণ পরিষদ দ্বারা এক নতুন সংবিধানের খসড়া রচনার কথা উল্লেখ করা হয়। (৪) যুদ্ধ চলাকালীন ভাইসরয়ের কাউন্সিলকে ভারতীয় নেতাদের এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে পুনর্গঠিত করার কথা বলা হয়— অবশ্য নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের প্রতিরক্ষার ভার ব্রিটিশ সরকারের কাছে থাকবে বলে মনস্থ করা হয়।

কংগ্রেসের নেতারা দাবি করতে থাকেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাবিনেট সরকারের মর্যাদা দেওয়া হোক এবং প্রতিরক্ষা সমেত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হোক। ভারতে জাতীয়তাবাদীরা মনে করতে থাকেন যে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য ভারতীয়দের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশরা তখনই ভারতীয়দের হাতে কার্যকরী ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। কাজেই ক্রিপস ও ভারতীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা বিফল হয়। কংগ্রেসের নেতারা সেই সময়ে কিছু রাজনৈতিক লাভ আশা করছিলেন, স্রেফ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে রাজি হয়ে যাওয়ার মানসিক অবস্থা তাঁদের ছিলনা। এদিকে মুসলিম লিগও ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাতে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কোনও উল্লেখ ছিল না। গণ পরিষদের ধারণা লিগের পছন্দ হয়নি, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল পরিষদে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে। লিগের নেতারা মনে করতেন যে দেশভাগই হল ''ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার একমাত্র সমাধান।'' অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিও ক্রিপসের প্রস্তাবে অখুশি ছিল, কারণ তাঁরা নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আশা করেছিল। হিন্দু মহাসভা এই পরিকল্পনাতে পাকিস্তানের ছায়া লক্ষ করেছিল। রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একমাত্র এম. এন. রায়ের নেতৃত্বাধীন র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ক্রিপসের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। ভারতীয়দের বিভিন্ন রকমের দাবি দাওয়া মেটাতে তিনি ব্যর্থ হন। সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি কাউকেই খুশি করতে সক্ষম হননি। ক্রিপসের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই মিশনকে সফল করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্রিপস একা দায়ী নন। এই ব্যর্থতার জন্য ভারতের ভাইসরয়, আমলা সম্প্রদায়, লর্ড ওয়াভেল ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকেও দায়ী করা যেতে পারে। চার্চিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে চলে আসে যখন তিনি বলে ফেলেন যে ''আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার জন্য এই পদে আসীন হইনি।'' ক্রিপস মিশনের

ব্যর্থতা গান্ধির মনোভাবে এক স্পষ্ট পরিবর্তন আনে। তখন পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চলাকলীন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনও গণ অন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি ব্রিটিশদের সম্পূর্ণভাবে ভারত ত্যাগ করার দাবি জানান।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সরকার ও কংগ্রেসের মিলিত হবার কোনও জায়গা আর অবশিষ্ট থাকে না। একদিকে সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অসম্মত হয়, অন্যদিকে কংগ্রেস এই মনোভাবে অনড় থাকে যে একমাত্র জনগণের সরকারের মাধ্যমেই জাপানি আক্রমণে বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধি মন্তব্য করেন যে ব্রিটিশরা ভারত দখল করে থাকার জন্যই ভারত জাপানের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে। কাজেই ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। এর আগে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য না করার যে যুক্তি গান্ধি উপস্থাপিত করেছিলেন, তা বহু কংগ্রেস নেতার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু শেষে সবাই গান্ধির মতে সায় দেন এবং যাঁরা বিরোধিতা করেন, যেমন সি. রাজাগোপালাচারী, তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। জুলাই মাসে ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় সেই মুহূর্তে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যেতে বলা হয়।

রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে ক্রিপসের ব্যর্থতা গান্ধির দৃষ্টিতে এক নৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। তিনি একই সঙ্গে ব্রিটেনকে কপটতা বা ভণ্ডামির কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে এবং ভারতীয় জনগণের মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের বিদ্বেষকে শুভেচ্ছায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' শব্দবন্ধটি এক মার্কিন সাংবাদিক গান্ধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সৃষ্টি করেন। ২৬শে এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গান্ধি বরং এর পরিবর্তে ''ব্রিটিশদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সময়োচিত ভারত ত্যাগ'' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। তিনি একথাও বলেন যে, ''আমার প্রস্তাব অনুযায়ী তারা ভারতকে ভবিতব্য বা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী তারা ভারতকে নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে যাবে, যে নৈরাজ্যের ফলে দেখা দেবে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও বেপরোয়া লুঠতরাজ। এর থেকেই এক নকল ভারতের জায়গায় উঠে আসবে এক সত্যিকারের ভারত।''

১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনকে সহৃদয়তার সঙ্গে ভারত ছেড়ে যেতে বলে, যাতে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে রাষ্ট্রমঞ্চের সঙ্গে সহযোগিতা করে আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় কমিটি অবশ্য এ কথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, ''এই আবেদনে সাড়া না পেলে কংগ্রেস অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৯২০ সাল থেকে পুঞ্জীভূত সমস্ত অহিংস শক্তির প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই বহুবিস্তৃত সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকতেন অবশ্যই গান্ধিজি। ''কমিটি ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সরকার এদিকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ তার মতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এপ্রিল - মে ১৯৪২) ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (১৪ই জুলাই) গৃহীত প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট বিপদজনক। ভারতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্রিটিশদের ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মনে ঘোরতর অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয় ও ব্রিটিশদের প্রচারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের জনগণের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হয় এবং সেখানে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার দাবিকে সমর্থন করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বৈঠকে অস্থায়ী সরকারের সংবিধানের মোটামুটি এক রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের কথা ভাবা হয় এবং বিশ্ব শান্তি ও ঐক্যের জন্য ভারতের আশার কথা ব্যক্ত করা হয়। প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এই রকম ঃ ''এই কমিটি সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে মুক্তি ও স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতে এক অহিংস গণ আন্দোলন

সংগঠিত করা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে চালানো শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সমস্ত পুঞ্জীভূত অহিংস শক্তি প্রয়োগ করা হবে।'' এই নতুন আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় গান্ধিকে। সরকারি প্রতিহিংসার ফলে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে না, এই রকম পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে সাধারণ নির্দেশাবলী' অনুসরণ করে নিজে নিজে কাজ করার পরামর্শ দেয়।

১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে ঐতিহাসিক বৈঠকে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে গান্ধির ভাষণে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ ''আমি এই মুহূর্তেই ভোর ফুটে ওঠার আগে এই রাত্রিতেই স্বাধীনতা চাই। পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনও কিছু আমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। আমি এখানে আপনাদের সংক্ষিপ্ত এক মন্ত্র দিচ্ছি। এই মন্ত্র আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে থাক ও প্রতিটি নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে আপনারা সেটিকে প্রকাশ করুন। এই মন্ত্র হল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। (Do or die) ''আমরা ভারতকে স্বাধীন করব অথবা স্বাধীন করার প্রয়াসে মৃত্যু বরণ করব। দাস হয়ে আমরা জীবন কাটিয়ে দেব না। ''ভারত ছাড়ো' আন্দোলন স্পষ্টতই ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবে এক নূতন পরিবর্তন আনে। গান্ধি ব্রিটিশদের পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক অপসারণের দাবি জানান। এই দাবি না মানা হলে গান্ধি তাঁর 'অহিংস বিদ্রোহ' সূচনা করার কথা ঘোষণা করেন। এই 'বিদ্রোহের' মূল লক্ষ্য ছিল ''মানুষকে এমন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন কতখানি, তা দেখানোও এর এক উদ্দেশ্য ছিল।''

তখনই ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে কংগ্রেস এইভাবে এক অহিংস গণ আন্দোলনকে অনুমোদন দেয়। এই আন্দোলনের অবশ্য ব্রিটিশদের সরাসরি বিদায় ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে গান্ধির হাতে ছেড়ে দেয় এবং দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর নির্দেশগুলি মেনে চলার আহ্বান জানায়। গান্ধি এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য শেষ সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকা সরকার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করে।

এইভাবে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়। পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট সকালে গান্ধি, নেহরু , প্যাটেল, আজাদ এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া আইনে গ্রেফতার করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সর্বত্র কংগ্রেসের সমস্ত শাখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গান্ধির 'হরিজন' সমেত সমস্ত সংবাদপত্রও পত্রপত্রিকার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সবতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেসের জেলা স্তরের নেতাদেরও গ্রেফতার করা হয়। এইভাবে নেতৃহীন হয়ে পড়লেও জনগণ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে।

নেতাদের বন্দি করার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সব জায়গাতে স্বতস্ফূর্তভাবে হরতাল, সভা, মিছিলের আয়োজন করা হয়। ১১ই আগস্ট থেকে আন্দোলনকারীদের উপর বলপ্রয়োগ করতে শুরু করে। আন্দোলন হিংসাত্মক আবার গ্রহণ করলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপরে লাঠিচার্জ করে, এমন কী গুলিও চালায়। যে সব এলাকাতে কংগ্রেসের প্রভাব বেশি বা যেখানে যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকটের ফলে মানুষের চরম দুর্দশা, সেই সব জায়গাগুলির সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের উপরে পুলিশী অত্যাচারের ফল উল্টো হয়। বিক্ষোভ ও মিছিলে ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মরিয়া হয়ে পুলিশ আরও বেশি করে মানুষকে গ্রেফতার করতে থাকে এবং লাঠি ও গুলির আশ্রয় নিতে থাকে। বিহার, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, খণ্ড প্রবেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের বিস্তৃত অঞ্চল অফিস বা ডাকঘর ও রেল স্টেশন ইত্যাদি আক্রমণ করে।

বিক্ষোভকারীরা ডাক ও তার যোগাযোগ, রেল লাইন এবং সরকারি অফিসগুলি ধ্বংস করে দেয়। সমগ্র ভারত জুড়ে শ'য়ে শ'য়ে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায় এবং জনজীবন একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আন্দোলনের মূল কেন্দ্রগুলি হয় বিহার, সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক। এই সব অঞ্চলে এই আন্দোলন এক গণ বিদ্রোহের চেহারা নেয়।

ত্রিশের দশকে যেখানে কিষান সভার প্রধান ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ও যেখানে কিসান সভার অধিকাংশ কর্মী কম্যুনিস্টদেরও সহজানন্দের যুদ্ধ সমর্থন করা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সেই বিহারেই এই আন্দোলনের সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে। গয়া ছাড়া সমস্ত জেলা থেকে পাটনা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (বিমান যোগাযোগ ব্যতীত) এবং উত্তর ও মধ্য বিহারের দশটি জেলার আশি শতাংশ থানা বিক্ষোভকারীদের দখলে চলে আসে বা সাময়িকভাবে ফাঁকা করে দেওয়া হয়। বহু আদিবাসীও এই আন্দোলনে অংশ নেয়, কারণ কংগ্রেসের সূত্র অনুযায়ী হাজারিবাগ জেলাতেই সব থেকে বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে—১৭৬১ জনের মধ্যে ৫৩৩ জন। এর পরেই আসে সারণ—৫১৭ এবং ভাগলপুর—৪৪৭। বিদ্রোহের এই স্রোত দ্রুত ভোজপুরি-ভাষী পশ্চিম-বিহার থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকে সমমনস্ক সংযুক্ত প্রদেশের বারাণসী বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। বালিয়াতে দশটি থানার সবকটি দখল করে নেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের জন্য এখানে ও নিকটবর্তী গাজীপুরে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। বালিয়াতে সরকারের নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা চিতু পান্ডে। ১৫-১৭ আগস্ট আজমগড়ে মধুবন থানা অবরোধের এক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় নিবলাটের রচনায় ঃ "শুধু লাঠি বা বল্লম নয়, লাঙল, হাতুড়ি, করাত, কোদাল ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে পাঁচ হাজার মানুষ থানার দিকে এগোতে থাকে.... দূর থেকে তাদের লাঠি ও বল্লমগুলি দেখে মনে হতে থাকে যেন এক চলমান জঙ্গল এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে।"

সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করে সব থেকে বেশি প্রভাবিত ষোলটি জেলাতে বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। অবশ্য ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ওই সব অঞ্চলে গেরিলা পদ্ধতিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে, যেগুলির পিছনে থাকে জয় প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীন নেপাল সীমান্তভিত্তিক অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে এক ধরনের শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ স্থানীয় সমান্তরাল সরকারগুলি।

বিদ্রোহী 'জাতীয় সরকারের' এক অতি উত্তম বিবরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা থেকে। বর্ণনাকারেরা হলেন তমলুক জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্তের মতো কংগ্রেস নেতারা। তমলুক ও প্রতিবেশী কাঁথি মহকুমা দীর্ঘদিন ধরে গান্ধিবাদী চিন্তার পীঠস্থান বলে পরিচিত ছিল এবং দুটি অঞ্চলেরই স্থায়ী গঠনমূলক কাজ করার ঐতিহ্য ছিল। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের মতো ১৯৪২ সালে এখানে সেরকম হিংসাত্মক আন্দোলন হয়নি— কিন্তু এখানে আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সুসংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী। এছাড়া বিশেষ কিছু পরিস্থিতির (নৌকা ও সাইকেল ধ্বংস করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা, ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের ভয়াবহ সাইক্লোনের বা ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণের ব্যবস্থা করা, পরের বছরের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) ফলে কিছু সম্পূর্ণ নতুন আর্থিক নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

৮ই আগস্ট ভারত সরকার এক প্রস্তাবে অভিযোগ আনে যে কংগ্রেস 'বেআইনি, বিপজ্জনক ও হিংসাত্মক কাজের' মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনহিতকর ব্যবস্থাগুলিকে বিপর্যস্ত করতে চাইছে। এ ছাড়া আরও অভিযোগ করা হয় যে কংগ্রেস ধর্মঘট সংগঠিত করছে, সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। রবিবার, ৯ই আগস্টের সকালে সরকার এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পুলিশবাহিনী বোম্বাইতে বিড়লা হাউসে চড়াও হয় যেখানে তখন গান্ধি ও

তাঁর সঙ্গীরা বাস করছিলেন। পত্নী বাস্তুরবা, সচিব মহাদেও দেশাই ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে গান্ধিকে গ্রেফতার করে সবাইকে পুনার আগা খান প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। একই সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে আহমেদনগরের 'ওল্ড ফোর্টে' নিয়ে যাওয়া হয়। সারা ভারত জুড়ে ধরপাকড় চালানো হয় এবং সব স্তরের কংগ্রেস নেতাদের নির্বিচারে জেলে পোরা হয়।

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলার তমলুকে বিদ্রোহীরা 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' নামে এক সমান্তরাল সরকার গঠন করে। সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুক— প্রতিটি থানাতেই জনগণ তাঁদের নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তমলুক নন্দীগ্রাম ও মহিষাদলে বিদ্যুৎ বাহিনী বা জাতীয় সেনা দল গঠন করা হয়। কংগ্রেস কমিটি সতীশ চন্দ্র সামন্তকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক বা পরিচালক হিসাবে মনোনীত করে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীল খাড়া। গান্ধি মুক্তি পাবার পর আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই 'জাতীয় সরকার' ভেঙে দেওয়া হয়। তমলুকের এই জাতীয় সরকার এক সশস্ত্র বিদ্যুৎ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন স্তরে আদালত স্থাপন করে ১৬৮১ টি মামলার মীমাংসা করে। বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করে, উনআশি হাজার টাকার ত্রাণ বিতরণ করে ও সব থেকে বড় কথা, ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। ধনী জোতদার ও মুনাফাকারীদের এই সরকার শোষণমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার নোটিশ দেয় এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ ও শস্য সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে।

কলকাতার ছাত্রসমাজ স্কুল ও কলেজে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। কলকাতার বহু অঞ্চলে পুলিশ গুলি চালায় এবং ২৩ থেকে ২৫শে আগস্টের মধ্যে কলকাতাতেই ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। সংবাদ মাধ্যমের উপর দমননীতির প্রতিবাদে অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্ট্যান্ডার্ডের মতো বেশ কিছু সংবাদপত্র দশদিনের জন্য প্রকাশনা স্থগিত রাখে। দেশ জুড়ে গণ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের কাজকর্মও বেড়ে উঠতে থাকে। জয় প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া ও উষা মেহতার মতো সমাজতন্ত্রী নেতারা সামনে থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি' যুগান্তর', 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি' ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতেই হবে। সামরিক বাহিনী ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের আগমনে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে— গ্রামের পর গ্রামে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা চলতে থাকে। সংযুক্ত প্রদেশে, বিশেষত বালিয়া, আজমগড়, গাজীপুর, মির্জাপুর, সুলতানপুর, জৌনপুর ও গোরক্ষপুরে পরিস্থিতি গুরুতর মোড় নেয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের উপস্থিতিতে বিহারে বিপ্লবীদের কাজকর্ম এক নতুন মাত্রা পায়। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং সেখানে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় কংগ্রেস নুনের ডিপোগুলি লুঠ করে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে, গ্রাম স্বরাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খাদ্যভাণ্ডারকে আগলে রাখে। এরাম-বাসুদেবপুর থানায় গণ আক্রমণের ফলে পঁয়ত্রিশ জন প্রাণ হারান (২৮শে সেপ্টেম্বর) ও গুরুপাল অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য এক 'জাতীয় সরকার' কাজ করে। আর এক ঝটিকা কেন্দ্র কটকে অবশ্য গণ আন্দোলনের থেকে স্থানীয় রক্ত বাহিনীর সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আদিবাসী অধ্যুষিত কোরাপুট অঞ্চলে মানুষ জেপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে ভাড়া না দেওয়ার ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে এবং থানাগুলির উপর আক্রমণ চালায়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন লক্ষণ নায়েক নামে এক নিরক্ষর গ্রামবাসী, যাকে এক বনরক্ষীকে হত্যার অভিযোগে ১৬ই নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয়। তালচের রাজ্যে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত গেরিলা কার্যকলাপ চলতে থাকে। সেখানে এক চাষি-মৌলিয়া (কৃষক-শ্রমিক) রাজ প্রায় চারশো বর্গমাইল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তালচের শহর আক্রমণ করে, যা প্রতিরোধ করতে বিমান বাহিনীর সাহায্যে নিতে হয়। এর

আগে তালচেরে বেথি বা বাধ্যতামূলক শ্রম, অরণ্য আইন ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এই বারের আন্দোলনের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল রাজ্য প্রজামণ্ডলের সভাপতি পবিত্রমোহন প্রধানের খুন হয়ে যাবার গুজব।

নগরাঞ্চলে প্রাথমিক আন্দোলনকে দমন করার পর তা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দুটি স্পষ্ট চেহারা নেয় ঃ কয়েকটি অঞ্চলে কৃষক ও গেরিলা আন্দোলন এবং শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাসমূলক ও আত্মঘাতী কাজকর্ম, যার পিছনে অবশ্যই ছিল জনসমর্থন। কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসে মহারাষ্ট্রের পূর্ব খণ্ডেশ ও সাতারা এবং গুজরাতের ব্রোচ জেলার জয়সার তালুক কংগ্রেস ইতিহাসবিদ গোবিন্দ সহায়ের মন্তব্যে সাতারা ও জম্বুসার আন্দোলনের কিছু সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। সাতারাতে স্থানীয় অপরাধীরা নানা পাতিলের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ডাকাতিতে লিপ্ত হয় এবং জম্বুসারেও স্থানীয় ডাকাত মেগজি তিন মাসের জন্য এক মুক্তাঞ্চল গঠন করতে সাহায্যে করে। ওই অঞ্চলে অত্যন্ত শক্তিশালী কৃষক-ভিত্তিক অব্রাহ্মণ 'বাহিয়াজন সমাজ' ঐতিহ্যের সঙ্গে সাতারার আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখানে কিছুটা দেরিতে, অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সমান্তরাল সরকার গড়ে ওঠে এবং ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত তা নিজের অস্তিত্ব কোনও রকমে বজায় রাখতে সক্ষম হয়। গেরিলা যুদ্ধ চালানো ছাড়া এক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল গণ আদালত (ন্যায়দান মণ্ডল) পরিচালনা করা এবং গান্ধিবাদ অনুসরণে কিছু গঠনমূলক কাজ করা। ১৯৪২ সালে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও জাতীয়তাবাদী জঙ্গীপনা সামাজিক পরিবর্তনের দিকগুলিকে কিছুটা পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এটা লক্ষ্য করার মতো যে, 'প্রতি সরকার' স্থানীয় ডাকাতদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়— যার মধ্যে দিয়ে তখনও অত্যাচারিত, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারী কৃষকদের দাবীকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সাতারার পাহাড়ি অঞ্চলে ঘাঁটি করা নিম্নবর্গের ডাকাতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রেসিডেন্সির অন্যান্য স্থানে সমাজতন্ত্রীরা গোপন, সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাতে থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন বোম্বাই শহর থেকে অরুণা আসফ আলির মতো নেতারা। কর্ণাটকে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উপর ষোলশ বার, ছাব্বিশটি রেল স্টেশন ও বত্রিশটি ডাকঘরের উপর আক্রমণ চালানো হয়। কিন্তু এই সময়ে কর না দেওয়ার কোনও আন্দোলন হয়নি, যদিও খেড়া ও বারদোই এলাকাতে উচ্চ শ্রেণিভুক্ত পাতিদার পরিবারগুলির বেশ কিছু তরুণ সদস্য সন্ত্রাসমূলক কাজে যোগ দেয়। সাধারণভাবে এটা মনে করা যেতে পারে যে, কৃষিতে উন্নত এবং সমৃদ্ধ কৃষকদের গ্রামগুলি ১৯৪২ সালের বিদ্রোহ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, গুজরাট তামিলনাড়ুর থানাভুর এলাকার উল্লেখ করা যায়। কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে পূর্ব ভারত, যেখানে কৃষকদের অবস্থা স্থির অথবা নিম্নগামী। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী মানুষের অধিকাংশই এসেছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে নীচুতলার স্তরগুলি থেকে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এই আন্দোলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। চোরাগোপ্তা আন্দোলন ১৯৪৩ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত চললেও প্রকাশ্য আন্দোলন সরকারের চাপে চলতে গেলে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনকে দমন করতে সরকার অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন স্টন চার্চিল ভারতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে (কাঁথির ভগবানপুরেও) একই সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও থানাগুলির উপর আক্রমণ চালানো হয়। সুতাহাটা থানা প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনকারীরা দখল করে নেয়। অন্যান্য জায়গায় অবশ্য রক্তগঙ্গা বয়ে যায় এবং একই দিনে চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়। দুই সপ্তাহ পরে তমলুক মহকুমাতে এক ভয়াবহ ঝূর্ণিঝড়ে পঞ্চাশ শতাংশ শস্য ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় চার হাজার মানুষ এবং সত্তর হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়, যথেষ্ট পরিমাণ

সরকারি ত্রাণের অভাবে (সম্ভবত ইচ্ছাকৃত) কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেরাই এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

ভারতের নারীসমাজ এই আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এই আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা, আসমের কনকলতা বড়ুয়া ও ফুকোনানির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাহাত্তর বছর বয়সী কৃষক পরিবারের বিধবা 'মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্ব দৃষ্টান্তমূলক। আগস্ট বিদ্রোহের সময় তিনি তমলুক থানা দখল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। নারী সমাজ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক ও আদিবাসী সমাজ (পুরুষ ও নারী) উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যার ফলে এই আন্দেলন এক জনমুখী চরিত্র পায়।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে মোটের উপর তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলন (যা শীঘ্রই সরকার দমন করতে সফল হয়) ছিল প্রধানত নগরভিত্তিক, যার বৈশিষ্ট্য ছিল বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, নাগপুর ও আমেদাবাদের মতো শহরগুলিতে হরতাল, ধর্মঘট এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে এই প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু পল্লি অঞ্চলে সরে আসে এবং বারাণসী, পাটনা ও কটক ইত্যাদি কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্রোহী ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং উত্তর ও পশ্চিম বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাংশে শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে কার্যত এক কৃষক বিদ্রোহের সূচনা করে। বাংলার মেদিনীপুর এবং মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উড়িষ্যার কিছু কিছু অঞ্চল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়, যখন বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি জাতীয় সরকার গড়ে ওঠে যদিও সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

সরকারের নৃশংস দমননীতির মুখে দুর্বল হয়ে পড়া এই আন্দোলন সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তার দীর্ঘতম ও সব থেকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই পর্যায়ে শিক্ষিত যুবসমাজ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ঘাঁটি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালায়। তাদের এই আক্রমণ কোনও কোনও সময়ে গেরিলা যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারত-নেপাল সীমান্তে সংগঠিত আন্দোলনের দিকে নজর দিলে। কৃষকদের কিছু কিছু গোষ্ঠী দিনে চাষবাসের কাজ করে রাত্রে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালায়। বিশেষত মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাতারা ও উড়িষ্যার তালচেরে গোপন সমান্তরাল 'জাতীয় সরকার' কাজ করতে থাকে। যথেষ্ট বীরত্বব্যঞ্জক মনে হলেও এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ অবশ্য ব্রিটিশ শাসকদের মনে কোনও ত্রাস সৃষ্টি করতে বা মিত্রশক্তির যুদ্ধ পরিকল্পনার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে তেমন সফল হয়নি। দূরবর্তী মেদিনীপুর জেলার এক প্রান্তে গঠিত এই ধরনের 'জাতীয় সরকার' কলকাতাকে তেমন উদ্বিগ্ন করতে বা আরাকানসও আসাম সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়। এই কারণেই 'তমলুক জাতীয় সরকার' ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর আর টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি।

সরকারি পরিসংখ্যান থেকে অভ্যুত্থানের বিস্তৃতি এবং থাকে দমন করতে ব্রিটিশদের চূড়ান্ত অত্যাচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগে ৯১,৮৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ২৪,৪১৬ জনকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি, ১৬,৭৯৬ জনকে সংযুক্ত প্রদেশ ও ১৬,২০২ জনকে বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়। দু'শো আটটি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন ও ৯৪৫টি ডাকঘর ধ্বংস করা হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং ৬৬৪টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এগুলির মধ্যে বিহারে সব থেকে বেশি (২০৮টির মধ্যে ৭২) পুলিশ চৌকি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বোম্বাইতে ৪৪৭টি বোমা বিস্ফোরণের তুলনায় বিহারে মাত্র ৮টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিহারে বেশি সংখ্যক মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ও বোম্বাইতে সংগঠিত সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম প্রাধান্য পায়। পুলিশ বা সেনাবাহিনীর গুলিতে ১০৬০ জনের

(নিঃসন্দেহে প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি) মৃত্যু হয়। তেষট্টি জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয় এবং ২১৬ জন পুলিশের উর্দি পরিত্যাগ করে (শুধু বিহারেই এই সংখ্যা ২০৫)।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক অন্যতম বৃহৎ অভ্যুত্থান। এই আন্দোলনের প্রসার ও তীব্রতা ছিল অভূতপূর্ব। এই আন্দোলন অহিংসা থাকতে পারেনি। এমনকী প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি প্রকাশ্যে অহিংস থাকলেও মানুষকে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে থানা আক্রমণ করতে এবং পুলিশ ও সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে দেয়। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে অহিংস রাখা সম্ভব হয়না। মানুষ অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু সরকার এই আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলে বহু মানুষ মারা যায় বা আহত হয় এবং বহু আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এর ফলে গোপনে আন্দোলন চালানো শুরু হয়। বিশেষত জয় প্রকাশ নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বেআইনি বা নিষিদ্ধ কংগ্রেস সংগঠন এই গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।

মারমুখী জনতা ২৫০টি রেল স্টেশন ৫৫০টি ডাকঘর ও ৩৫০০টি টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ধ্বংস করে দেয়। শ'য়ে শ'য়ে থানা ও সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়। হাজার হাজার আন্দোলনকারীর উপর গুলি চালানো হয়, এমনকী বিমান আক্রমণ হানা হয়। সেনাবাহিনীর নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলিকে আন্দোলন দমনের কাজে লাগানো হয়। একটি সূত্র অনুযায়ী পুলিশের গুলিতে ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ৬০,০০০ মানুষকে বন্দি বা স্থানান্তরিত করা হয়। বহু অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে লুঠতরাজ চালানো হয়, মহিলাদের উপর বলাৎকার করা হয়, পুরুষদের হত্যা করা হয় ও শিশুদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। ডঃ বিধান চন্দ্রের মতে, "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভারতে এই রকম ভয়াবহ দমননীতি লক্ষ করা যায়নি।"

ব্রিটিশরা এই পরিস্থিতিকে এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। ভাইসরয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, "১৮৫৭ সালের পর এটাই সব থেকে শক্তিশালী বিদ্রোহ। সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে আমরা বিশ্বের কাছে এর ব্যাপকতা ও তীব্রতার কথা আজ পর্যন্ত গোপন রেখেছি।" সেই সময়ে একদিকে যেমন সরকারের নৃশংসতা চরমে ওঠে, তেমনি চারদিকে ব্যাপক ভাবে গণ অন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণের জেলাগুলি ছেড়ে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ব অংশ বেআইনি কার্যকলাপের মুল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সংযুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলা এক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। এখানে মানুষ একজন বন্দির সাহায্য নিয়ে জেলের দরজা খুলে দেয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং কিছু সময়ের জন্য 'পঞ্চায়েত রাজ' প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় মেদিনীপুর জেলা ব্রিটিশ নিয়মকানুন মানতে অস্বীকার করে। তমলুকে প্রশাসন ব্যবস্থা সংকলিত এক 'জাতীয় সরকারের' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জেলাতে পুলিশের বিরুদ্ধে ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করতে হিংসাত্মক কাজকর্ম চালানো হতে থাকে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে অশতি ও চিমুরে এই আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব পড়ে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রেনুগুনটা ও বেজওয়াড়ার মধ্যে ১৩০ মাইল দীর্ঘ রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়। বোম্বাইতে মিল ও কারখানাগুলিতে বিশাল ধর্মঘট ডাকা হয়। উত্তর-পশ্চিম বাংলা, পূর্ব ভারত, মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারাঠা রেলওয়েজের রেলপথের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। উত্তেজিত জনতা সরকারি অফিসগুলি আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন না, কয়েকজনকে হত্যাও করে।

এর উত্তরে সরকার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চরম নৃশংসতার আশ্রয় নেয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে সরকার নৈতিকতা, মানবিক শিষ্টাচার ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়। লাঠি, গুলি ও মাঝে মাঝে আকাশ থেকে গুলি চালিয়ে জনভাবে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়। পুরুষদের নির্দয়ভাবে মারা হয় ও অমানুষিক অত্যাচারের মুখে ফেলা হয়। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর রাত্রে তাদের ঘুমোতে দেওয়া হয় না। তাদের ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত

রেখে নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। মেয়েদের বিবস্ত্র করা হয় ও ধর্ষণ করা হয়— এমন কী শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। গ্রামে বহু ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মানুষদের বিবস্ত্র করে গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রহার করা হয়। বিনা বিচারে বহু মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যৌথ জরিমানা (collective fine) এক নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সব থেকে বড় কথা, নির্দয়ভাবে তা আদায় করা হয়। এসবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা, তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং সরকারি আইন অমান্য করার সমস্ত চিন্তা তাদের মন থেকে মুছে ফেলা। এই আন্দোলনে ছাত্ররা মুখ্য ভূমিকা নেয়। বহু ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং বহু স্কুল ও কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন থামাতে পুলিশ প্রায়ই গুলি চালানোর আশ্রয় নেয়।

সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১,০২৮ জন অসামরিক মানুষের মৃত্যু হয় ও ৩,১২৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। এই সংখ্যা যে প্রকৃত সংখ্যার মনের কম তা স্পষ্ট হয়ে যায় আমরা দেখি যে আন্দোলন দমন করতে কমপক্ষে ৮টি ব্রিটিশ ও ৫৭টি ভারতীয় ব্যাটালিয়নকে ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৪,০০০ থেকে ১০,০০০।

বোম্বাইয়ে উষা মেহতা ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৪২ সালে কয়েক মাসের জন্য কংগ্রেস রেডিও থেকে প্রচার চালান। সাতারাতে নানা পাতিল ও তাঁর সঙ্গীরা এক সমান্তরাল সরকার গঠন করেন। রেলের সম্পত্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার মধ্যে কিছু জায়গাকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে 'জনগণের সরকার' প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যটি টের পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাও ফুটে ওঠে। কিন্তু এই সব বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি বাদ দিলে, এই আন্দোলনে আমরা সংহতি ও পরিকল্পনার অভাব দেখতে পাই। এর ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুঙ্গে উঠে এই আন্দোলন শীঘ্রই তার তীব্রতা হারায় এবং প্রকাশ্য থেকে গোপনে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন আবার নতুন করে জেগে উঠবে না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার তার বজ্রমুষ্ঠি শিথিল করার লক্ষ্য দেখায় না। এই কারণেই গ্রেফতার করার ২১ মাস পরে, ১৯৪৪ সালের ৪ঠা মে সরকার গান্ধিকে মুক্তি দেবার আদেশ দেয়।

এখানে আর একটি বিষয় যোগ করা যেতে পারে। ১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলি সম্ভাব্য সব রকমের সূত্র থেকে সাক্ষ্য আদায় করার চেষ্টা করতে থাকে, যাতে এই আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা যায়। এক বছরের মধ্যে সেই সাক্ষ্য এত বিপুল আবার ধারণ করে যে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে সরকারটি উইকেড্রেন নামের এক আই.সি.এস. অফিসার এবং সংযুক্ত প্রদেশ ও বেরারের তদানীন্তন বিচারপতিকে এক রিপোর্ট তৈরী করার নির্দেশ দেয়। সরকারিভাবে 'রিপোর্ট অন দি ডিসটার্বেন্সেস অফ ১৯৪২-এ নামে পরিচিত এই রিপোর্ট ১৯৪৩ সালের ২৯শে নভেম্বর সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

ইউকেন্ডেনের নিজের ভাষায়, "প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে মোটামুটি বোঝা যায় যে এই দেশের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে গান্ধি এবং ওয়ার্কিং কমিটির কার্যসূচিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সামিল হয়... যে সব ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না, সে সব ক্ষেত্রেও পরিস্থিতিই সেগুলির জন্ম দেয় এবং এর জন্য তাদের কম দায়ী করা যায় না।" ইউকেন্ডেন অবশ্য স্বীকার করেন যে, "আইনের কাছে অবশ্য এই সব তথ্য গ্রহণযোগ্য হবে না— কাজেই এগুলি থেকে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হবে। কারণ, গান্ধির কিছু ভাষা ও চিঠি এবং কিছু সম্ভাব্য রাজসাক্ষীর বক্তব্য ছাড়া তেমন কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা যাবে না।"

এই আন্দোলনের সূচনা করতে গান্ধির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউকেন্ডেন বলেন বিক্ষিপ্ত সত্যাগ্রহ

আন্দোলনগুলির ব্যর্থতা, ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, কংগ্রেসের কর্মীদের মনোবলে চিড় ধরা, মুসলিম লিগের পাকিস্তান সংক্রান্ত দাবিকে ব্রিটিশদের সমর্থনের আশঙ্কা এবং বহুসংখ্যক মার্কিন সেনার ভারতে উপস্থিতি তাঁকে এই আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য করেছিল। ''সবার উপরে ছিল গান্ধির ধারণা যে ব্রিটিশদের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে এই ধারণা না থাকলে এই আন্দোলনের জন্মই হতনা।'' ইউকেন্ডেন যা কিছু ঘটেছে তার জন্য প্রধানত গান্ধিকেই দায়ী করেন। তবুও কংগ্রেস ছাড়াও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের কিছু অংশ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এতে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল স্বল্পস্থায়ী ও সীমিত। কলকাতা শিল্পাঞ্চল মোটামুটি শান্ত থাকে এবং এখানে কম্যুনিস্টদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জামসেদপুর ও আমেদাবাদকে বাদ দিলে আহমেদনগর ও পুনার মতো ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকরা যথেষ্ট সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদান করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই জায়গাগুলিতে কম্যুনিস্ট প্রভাব ছিল স্বল্প এবং গান্ধিবাদের প্রভাবে 'শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক ছিল সৌহার্দমূলক'। এই সব স্থানে 'মিল মালিকরা শ্রমিকদের অনুপস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি।'

এই বিষয়ে কোনও বিস্তারিত সমীক্ষা ধরা না হলেও এ কথা বলা যায় যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বোম্বাইতে এই আন্দোলনে যথেষ্টভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'দি ফ্রিডম স্ট্রাগল ফ্রন্ট' নামের এর নিষিদ্ধ সমাজবাদী ইস্তাহারে বলা হয় যে, পরণের ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করে ধনী মিলমালিক ও ব্যাক্ত মালিকদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে। ১৯৪২ সালে গোপন জাতীয়তাবাদী কাজকর্মে আড়াল থেকে উচ্চবিত্ত মানুষদের, এমন কী উচ্চপদে সরকারি কর্মীদের সমর্থনের কথাও জানা যায়। এই সমর্থনের সাহায্যে কর্মীরা (সি.পি. আইয়ের কর্মীদের বাদ দিলে যাদের এই ধরনের গোপন কার্যকলাপ চালাবার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না) মোটামুটি কার্যকরী এক বেআইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, যার মধ্যে উল্লখযোগ্য হল উষা মেহতার প্রতিষ্ঠিত এক গোপন রেডিও স্টেশন বা বেতার কেন্দ্র, যা বোম্বাইয়ে তিন মাস কাজ চালাতে সফল হয়। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে সেভাবে সক্রিয় না হলেও ১৯৪২ সালে মধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজ এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। শহরের মধ্যে সংঘর্ষে, অন্তর্ঘাত ঘটাতে অথবা কৃষক বিদ্রোহকে উৎসাহ যোগাতে তারা সর্বত্র সমানের সারিতে আত্মপ্রকাশ করে। আগস্ট আন্দোলনকে যা প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করে তোলে তা হল কিছু কিছু অঞ্চলে কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থান। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকারি কর্মীরা সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে বিহারের একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল (সারন) এক 'কুখ্যাত অপরাধীদের এলাকাতে' পরিণত হয়েছে অথবা ছাত্ররা 'বিহারের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে থাকা অপরাধীদের ইচ্ছুক সহযোগী হিসাবে আবিষ্কার করেছে।' এক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ কথা বোঝা যায় যে স্বভাবগত অপরাধী বা ছন্নছাড়া গুণ্ডাদের নয়, আগেকার জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানগুলির মতো ১৯৪২ সালের আন্দোলনও কার্যত কৃষকদের আন্দোলন।

১৯৩০-র দশকের শেষ দিকে যে সব দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা আরও বেদী করে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে ছিলেন এবং মন্ত্রী হিসাবে রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করতেন, সেই তাঁরাও এখন দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগের গৌরব আত্মসাৎ করতে থাকেন। ১৯৪২ সালে যাঁরা প্রকৃত অর্থেই সংগ্রামে নেমেছিলেন, সেই সমাজতন্ত্রীরাও গৌরবের অংশীদার হন। এই দুই পক্ষেরই সমালোচক কম্যুনিস্টরা এদিকে জাতীয়তাবাদী মানুষদের এক বড় অংশের চোখে বিশ্বাসঘাতক হয়ে দেখা দেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশরা যেমন আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই শ্রেয় মনে করতে শুরু করে তেমনই ১৯৪২ সালের এই আন্দোলন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে

আপসকামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের শক্তিশালী করে তোলে। যতই বীরত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক হোক, ব্রিটিশদের সামরিক শক্তির কাছে ১৯৪২ সালের এই অন্দোলনের ব্যর্থতা প্রায় নিশ্চিত ছিল। তবুও এই আন্দোলন দুটি দিক থেকে বামপন্থী বিকল্পকে দুর্বল করে দেয়। প্রথমত, কিষান-সভা বা গান্ধিবাদী কাজকর্মের মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠা কৃষকদের ঘাঁটিগুলি নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে ভেঙে পড়ে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে একদিকে বিহার, সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাংশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলগুলি ১৯৪৫-৪৬ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়নি, তেমনই যুদ্ধোত্তর ওস্বাধীনতার পরবর্তী যুগে মেদিনীপুর ও হুগলীর গ্রামীণ গান্ধিবাদীরা বাংলার রাজনীতিতে উপেক্ষিত থেকে যান। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব বিভাজন ঘটে যায়। ১৯৪২ সালের আন্দোলন নিয়ে 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগও পাল্টা অভিযোগ একদিকে কম্যুনিস্ট এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী ও বসুর অনুগামীদের মধ্যে এক প্রাচীর খাড়া করে, যা এক প্রজন্ম পরেও পুরোপুরি ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি।

এই আন্দোলনের ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ ছিল ঃ (১) সমন্বয়ের অভাব ছিল এই আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক ধরনের শিথিল, বিকেন্দ্রীভূত আন্দোলন। নেতারা গ্রেফতার হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় কম্যান্ড ছিল না। (২) এই আন্দোলনের জন্য কোনও যথার্থ সংগঠন বা কর্মসূচি ছিল না। সংগঠন বলতে মনে করা হত গোপনীয়তা, গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহের ধারণাতে যার কোনও স্থান ছিল না। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির পর মানুষের কাছে কোনও নতুন কর্মসূচি তুলে ধরা হয়নি। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ বালিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করেন, যেখানে জনগণ ক্ষমতা দখল করলেও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। (৩) এ আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা ছিল প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। (৪) ভারতের মধ্যেই ভিন্ন মতাবলম্বী কিছু গোষ্ঠী আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে। অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী অংশকে বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম সমাজই মুসলিম লিগের উপদেশকে শিরোধার্য করে। এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা দূরে সরে থাকে। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্যে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে ও ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব সাহায্য করে। (৫) পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দমননীতির মুখে এই আন্দোলন ভেঙে পড়ে।

ডঃ বিপান চন্দ্রের মতে ঃ "জাতীয়বাদী মনোভাব দেশের কত গভীরে পৌঁছেছিল ও দেশের মানুষ কি বিশাল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিল, তা তুলে ধরার মধ্যে এই আন্দোলনের গুরুত্ব লুকিয়ে আছে। "জনগণের হিংসাত্মক অভ্যুত্থান এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সব রকমের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকার মধ্য দিয়ে বিদেশি শাসকদের বিতাড়িত করার এক দৃঢ় সংকল্প ফুটে ওঠে। বহু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া এবং ভারতীয় জনণের দ্বারা স্বাধীন সরকার ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। সমগ্র দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠা, তাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত শৌর্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে। এখানেই এই আন্দোলনের তাৎপর্য। একজন ইতিহাসবিদ ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে যথাযথভাবে এক "স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৩.৩ সূত্র-নির্দেশ

১. Hitesh Ranjan Sanyal : "The Quit India Movement in Medinipur District" in G. Pandey (ed.) The Indian Nation in 1942, Culcutta, 1988.

২. Francis Hutchins : Spontameous Revolution, the Quit India Movement. N. Delhi, 1971.

৩. Amba Prasad : Indian Revolt of 1982. Delhi, 1958.

৪. Satish Samanta : August Revolution and Two Years National Government in Midnapore. Calcutta,, 1946.

৫. P. N. Chopra (ed.) : Quit India Movement— British Secret Reports, Faridabad, 1976.

৬. Amalendu De : Banglai Bharat Chharo Andolan (Bengali), Kolkata, 2004.

৭. Sumit Sarkar : Modera India. New Delhi, 1982.

৮. Surajan Das : Nationalism and Papular Consciousness : Bengal 1942 in Explovations in History, Kolkata, 2003.

৩.৪ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ভারত ছাড়ো আন্দোলন কি এক স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন, না পরিকল্পিত বিদ্রোহ? জনগণের হিংসাত্মক পথের আশ্রয় নেওয়া কি কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের তাৎপর্য কী?

৩. অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ

'ভারত ছাড়ো' অন্দোলনের দুইজন নেতার নাম কর।

৩.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গান্ধিজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের এক নতুন স্বতন্ত্র পর্যায়ের সূচনা করে। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ করে ও গণ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাস্তবে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করার আগেই ব্রিটিশ সরকার আঘাত হানে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট গান্ধি কংগ্রেসের নেতাদের সরকার গ্রেফতার করে ও কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে। এর ফলে স্বতস্ফূর্তভাবে চর্তুদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সরকার শীঘ্রই এই আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়।

একক ৪ ❑ ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের দিকে

গঠন ঃ

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ ১৯৪০-এর জন আন্দোলনগুলি ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র বসু ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব
৪.৩ দেশভাগের পথে এগিয়ে যাওয়া
৪.৪ দেশভাগ ও ইতিহাসবিদরা
৪.৫ সূত্র নির্দেশ
৪.৬ অনুশীলনী
৪.৭ সংক্ষিপ্তসার

৪.০ উদ্দেশ্য

(১) ভারতের সীমান্তের বাইরে সুভাষচন্দ্র কী ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করেছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা;

(২) নৌ-বিদ্রোহ ছাড়াও যেসব গণ আন্দোলন ভারত ছাড়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা;

(৩) যে সব ঘটনাজনিত কারণে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়, সেগুলির গতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককে সেই সব ঘটনা ও আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ ও পাকিস্তানের জন্মের পথকে প্রশস্ত করে।

৪.২ ১৯৪০-এর গণ আন্দোলনগুলি

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র বসু ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব

১৯৪২ সালের শেষাশেষি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগুন স্তিমিত হয়ে আসে। ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত নেতাকেই গ্রেফতার করা হয়। ভারতর জাতীয়

আন্দোলন অবশ্য তার সীমান্তের বাইরে এর নতুন মাত্রা লাভ করে। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন সুভাষচন্দ্র বসু, অবিসংবাদিতভাবে ভারতের সর্বকালের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা। বসু কংগ্রেসের সভাপতি থাকলেও নীতি ও কৌশল সম্পর্কে গান্ধির সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়। শেষে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে এক নতুন দল গঠন করেন। এই দলের নাম হয় 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। বসুর মনে এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ়তর হতে থাকে যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস হয় যে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সমগ্র সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনে তিনি বিদেশি শক্তিগুলির সাহায্য গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যে সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার ফলে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁর হাতে সেই সুযোগ তুলে দেয়।

গান্ধি ও নেহরু সমেত কংগ্রেস নেতারা এমন কিছু করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, যার ফলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশদের অপদস্থ হতে হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই সহানুভূতি অটুট থাকে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য যারা ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে, সেই ব্রিটিশদের প্রতি অত উদার ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মানীর জয় কামনা করতেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের পরাজয় হলেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হবে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বসুর এই চরম মনোভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল ছিলেন তারা বসুকে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক মনে করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষ চন্দ্রকে ভারত প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কারাগারে অনশন শুরু করেন ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে কলকাতার গৃহে স্থানান্তরিত করা হয় ও গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর এলগিন রোডের গৃহ থেকে তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হন ও কলকাতা ছেড়ে চলে যান। বিশ্বের রোমহর্ষক পলায়নের ঘটনাগুলির মধ্যে একে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যায়। তিনি মোটরগাড়িতে গোমো যান ও তারপর আফগানিস্তানের দুর্গম-পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে রাশিয়াতে পৌঁছোন। বসুর সামরিক সাহায্যের আবেদন অবশ্য তখন অগ্রাহ্য করা হয়। সোভিয়েত শীর্ষনেতা স্টালিন সেই সময় সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে জোট বাঁধার পরিকল্পনা করছিলেন। রাশিয়ার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে তিনি জার্মানী যান ও হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ইটালির শাসক মুসোলিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। হিটলার ও মুসোলিনী, দুজনেই বসুকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মান সরকারের সহযোগিতায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি 'আজাদ হিন্দুস্তান' নামে বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। বার্লিন থেকে বসুকে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালাতে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি জার্মানি থেকে মুক্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে সেনা বাহিনী গঠন করারও অনুমতি লাভ করেন। অক্ষশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউরোপের ভারতীয়রা তাঁকে 'নেতাজী' আখ্যা দেন এবং তাঁর 'জয় হিন্দ' ডাকের প্রতিধ্বনি তোলেন। জার্মানিতে বসু 'ফ্রি ইন্ডিয়ান লিজন' নামে এক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী গঠিত হয় জার্মানিতে ধৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে।

১৯৪৩ সালের মধ্যেই দূর প্রাচ্য (Far East) জাপানীদের দখলে চলে আসে এবং নেতাজি সেইদিকে মনোনিবেশ করেন। জাপান অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভারতীয় অধিবাসীরা নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। এই সংগঠনগুলি ১৯১৫ সালে জাপানে আশ্রয় নেওয়া বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বাধীনে 'ইন্ডয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের' (১৯৪২) মূলকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলির লক্ষ ছিল দ্বিমুখী— একদিকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা, অন্যদিকে যুদ্ধের সংকটের সময়ে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করা। রাসবিহারী টোকিওতে ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করেন, যেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশরা যে সব ভারতীয় সৈন্যদের জাপানিদের হাতে তুলে দেয়, তাদের নিয়েই এই বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এই

বাহিনীর লক্ষ্য হয় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করা। আজাদ হিন্দ ফৌজ রূপ নেবার আগে ১৯৪২ সালের ২৮-৩০ মার্চ টোকিওতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপান অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভারতীয় সংগঠনগুলির ষোল জন প্রতিনিধি এক বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার এটাই সঠিক সময়। ভারতকে 'সম্পূর্ণ স্বাধীন ও কর্তৃত্বমুক্ত' করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কম্যান্ডের অধীনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সামরিক সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠকে ঠিক করা হয় যে, ''ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিরা দেশের জন্য ভবিষ্যৎ ''সংবিধান রচনা করবেন।''

টোকিও অধিবেশনে রাসবিহারী বোস ও বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (মৃত্যু ১৯৭৯) জাপানিদের সঙ্গে বহুবার আলোচনায় বসেন এবং পরে ১৫ই জুন ব্যাংককে এশিয়ার সব প্রান্ত থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন। সেনা ও অসামরিক ব্যক্তিদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে মোট ১২০ জনকে এই বৈঠকে ডাকা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন জাপান, মাঞ্চুকুয়ো, হংকং, সাংহাই, ফিলিপাইনস, জাভা, থাইল্যান্ড, মালয় ও বার্মার ভারতীয় প্রতিনিধিরা। যে সব যুদ্ধবন্দি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করতে ইচ্ছুক, ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে তাদের ষাট জনের এক প্রতিনিধিদল বৈঠকে যোগ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল এ.সি. চ্যাটার্জি, কর্নেল এন. এস. গিল, হাবিব-উল-রহমান, গুলাম কাদির গিলানী, করহানুদ্দিন এবং প্রকাশ রাম স্বরূপ। সেখানে রাসবিহারী বোস সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এবং ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করা হয়। লিগ ঘোষণা করে যে অবিলম্বে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা তার প্রধান লক্ষ্য।

এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এক বার্তাও পাঠানো হয়। ১৬-২২ জুন অনুষ্ঠিত ব্যাংকক অধিবেশনে পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেগুলিকে অধিবেশনের শেষ দিন জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কোনও আনুষ্ঠানিক উত্তর না পাওয়া গেলেও ১০ই জুলাই রাসবিহারীকে লেখা এক পত্রে অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি ও জাপানীদের উত্তরকে গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে এটি উল্লেখের দাবি রাখে ঃ ''প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে যে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সমারিক দায়িত্ব পালনের জন্য ভারতীয় সৈন্য (যুযুধান ও অ-যুযুধান) ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করে অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নামে এক বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।'' এই বাহিনীর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্যাংককের ওয়ারলেস রোডে এবং কাউন্সিল অফ অ্যাকশনের পাঁচ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্ম হয় ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তার সৈন্য সংখ্যা সতের হাজারে পৌঁছে যায়।

মালয়ে পঁচাশি হাজার বন্দির মধ্যে ষাট হাজার জন ছিলেন ভারতীয়। শেষ সৈন্যটি অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বিশ্বাসী জাপানিরা সচরাচর আত্মসমর্পণ করত না এবং যুদ্ধবন্দিদের ঘৃণার চোখে দেখত। এর ফলে তারা যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। কিন্তু ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের কাজে লাগাতে জাপানিরা তাদের ব্রিটিশ অফিসারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিত এবং তাদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য নানা প্রলোভন দিত। তাদের বলা হত যে যুদ্ধের অবসান হয়েছে ও ব্রিটিশরা পরাজিত হয়েছে। তাদের কাছে জাপানের নেতৃত্বে এক নতুন এশিয়ার ছবি তুলে ধরা হত। ভারতীয় অফিসারদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানো হত। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় ক্যাভালরি বা অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন পি কে ধারগালকারের কথা উল্লেখ করা যায়। টানা অষ্টআশি দিন ধরে তাকে পাঁচ থেকে ছয় ফুট লম্বা ও চওড়া এক খাঁচায় রাখা হয়েছিল— মাঝে মাঝে আরও তিন বন্দির সঙ্গেও। ক্যাপ্টেন অবশ্য আত্মসমর্পণ করেননি এবং পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বিরুদ্ধে সাক্ষাত দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি

লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ধারগালকারের মত ব্যক্তিরা ব্যতিক্রম ছিলেন মাত্র। সাধারণ সৈন্যেরা হাজারে হাজারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিল।

লিগের ধর্মীয় আঞ্চলিক কমিটি ও জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষের এক সংঘর্ষের ফলে ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। মোহন সিং সন্দেহ করেন যে জাপানিদের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। এই সংকটের ফলে লিগের কাউন্সিল অফ অ্যাকশন একজোট হয়ে পদত্যাগ করে। কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু রাসবিহারী বোস লিগের নেতৃত্বে বহাল থাকেন। এই সংকট লিগের উপর এক বিরাট আঘাত হানে।

তিন-চার মাস ধরে বিপজ্জনক ভাবে ডুবোজাহাজে ভ্রমণ করে নেতাজি টোকিও পৌঁছন। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে তিনি জাপানের একনায়ক তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তোজো নেতাজিকে বলেন যে যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছোলে তাঁকে নায়কোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাসবিহারী বোস উদারচিত্তে নেতাজিকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদটি অর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ২৫শে আগস্ট নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে থাকেন ও ফৌজকে পুর্নগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের দখলে চলে আসে এবং তাদের নতুন নাম হয় যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ধারণাটি প্রথমে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির এক ভারতীয় অফিসার মোহন সিং-এর মাথায় আসে। সেই সময় তিনি মালয়ে ছিলেন। তিনি জাপানিদের পক্ষে যোগ দেন ও তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জাপানিরা ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তাঁর হাতে তুলে দেয় যাতে তারা পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারে। ১৯৪২ সাল শেষ হবার আগেই চল্লিশ হাজার মানুষ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। 'ওই পর্যায়ে শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয় অংগ্রেসের আহ্বান পেলেই তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে আরও উজ্জীবিত ক'রে তোলে।

কিন্তু জাপানিরা দু'হাজারের বেশি সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করতে অসম্মতি জানায়। এর ফলে মোহন সিং-এর সঙ্গে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয় ও তিনি গ্রেফতার হবার মুখোমুখি হন।

সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব গ্রহণের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের কোনও বাসনা তাদের নেই, জাপানিরা তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলে বসু ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে পুর্নগঠন করার কাজে নেমে পড়েন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট পরে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শীঘ্রই জাপান ও আটটি অন্যান্য দেশ এই সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সরকার আজাদ হিন্দ সরকার নামেও পরিচিত হয়।

বসু রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে ফৌজের দুটি প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে ফৌজে যোগদান করতে আহ্বান জানানো হয় এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, 'রানী ঝাঁসি' রেজিমেন্ট গঠিত হয় শুধু মহিলাদের নিয়ে। এই রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমতী স্বামীনাথন। ফৌজের অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন শাহনওয়াজ খান, জি. এস ধীলন এবং পি.কে. সাহগল। ১৯৪৪ সালে 'দিল্লি চলো' ডাক দিয়ে ফৌজ কাজে নেমে পড়ে। ওই বছরের মে মাসে সুভাষ ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়ে। এই ব্রিগেডের মূল অংশটি নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে পৌঁছোয়। মূল পরিকল্পনা ছিল ইম্ফল অধিকার

করতে জাপানিদের সহায়তা করার পর ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর বাংলার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। পরে যুদ্ধের চাকা জাপানিদের বিরুদ্ধে ঘুরে যায়। জাপান তার বিমান বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সীমান্তে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজ দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় যখন বর্ষা আগে চলে আসার ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং সেনাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থাতে ফৌজের পক্ষে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যুদ্ধ, রোগ, দলত্যাগ ও জাপানিদের সহযোগিতার অভাব ফৌজের শক্তিক্ষয় ঘটায়। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রিটিশ বাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করে এবং ফৌজের কুড়ি হাজার সৈন্য উপবাসী ও হতোদ্যম অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সৈন্যদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে বসুর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এর আগে তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে টোকিও গমন করেন— কিন্তু সেই চেষ্টাও অসফল হয়। বার্মাতে ব্রিটিশদের জয়লাভের পর বহু সৈন্য ফৌজ ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এর ফলে ফৌজ ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই নেতাজি সিঙ্গাপুরে পালিয়ে যান। পরে জাপানিরা জানায় যে ১৯৪৫ সালে আগস্ট টোকিও যাবার পথে তাইওয়ানের কাছে এক বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজির মৃত্যু হয়। বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ আছে যার আজও কোনও মীমাংসা হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে কোনও অবস্থাতেই ছোট করে দেখা যায় না। যুদ্ধ চলাকালীন তারা ভারতীয় সীমান্তের প্রায় দেড়শো মাইল ভিতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। শাহনওয়াজ খান লেখেন, "সংখ্যা ও উপকরণের দিক থেকে শত্রুপক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী হলেও তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকৃত একটি ঘাঁটিও অধিকার করতে পারেনি।" মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে চার হাজার বীর ভারতীয় সৈন্য মৃত্যু বরণ করে। দিল্লির লালকেল্লায় ফৌজের বিচার দেশে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে উৎসাহ যোগায়। নেহরু সমেত সব জাতীয়তাবাদী নেতারা ফৌজের সাহসী সৈন্যদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি জানান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ ফৌজ এক গৌরবময় অধ্যায়। ফৌজকে ব্যর্থ বলা যায় না। বরং সফল বলা চলে। সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রয়াস ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে তোলে। এরা অন্যদের প্রেরণা দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সহায়তা করে। শৌর্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে। অক্ষশক্তি ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া বসুর প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টকে এক নতুন, মুক্ত ভারতের অগ্রদূত বলা যেতেই পারে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব ঃ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ— কোনওটিই ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে পারেনি। কিন্তু সেই ব্যর্থতাগুলি ছিল নিতান্তই তাৎক্ষণিক। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথা বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে এদের ফলেই আরও বেশি করে গণ আন্দোলনের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে যে কোনও বিপ্লবী আন্দোলনই এক সম্মুখগামী পদক্ষেপ ও পরবর্তী পদক্ষেপের এক প্রস্তুতি। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হওয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা মুক্তি পান এবং ভারতের মানুষ তখন সংগ্রামের উপান্ত্য পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত। নীচুতলার চাপের কথা স্বীকার না করে কোনও ভাবেই ব্রিটিশ ও ভারতীয়, দুপক্ষের নেতাদের সিদ্ধান্তগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। কাজেই এ কথা বলা সঙ্গত যে, যুদ্ধোত্তর গণ অভ্যুত্থান বা 'নীচুতলার চাপ' বহু ভাবে আলোচনা ও আপসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও দেশভাগকে ত্বরান্বিত করে।

দিল্লির লালকেল্লায় সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচার শুরু করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে শাহনওয়াজ, স্বীলন ও প্রেম সাহগলকে আদালতে আনা হয়। ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সপ্রু ও নেহরু অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়ান। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘন করে 'বিশ্বাস

ঘাতকতা' করার অভিযোগ আনা হয়। সারা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে এই বিচারের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজাদহিন্দ ফৌজকে সমর্থন করে ও ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার অবশ্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তিনি কংগ্রেসের এই ভূমিকাকে ''জনগণের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসলে এক নির্বাচনী প্রচার'' ছাড়া আর কিছু মনে করেননি। সে যাই হোক, জনগণের প্রতিবাদ কিন্তু দেশের সর্বত্র দৃশ্যমান হতে থাকে। স্কুল, কলেজ, অফিস, কারখানা— দেশ জুড়ে সর্বত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বর এই বিষয় নিয়ে কলকাতায় ঘন ঘন বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। কলকাতার ছাত্রসমাজ বিপুল সংখ্যায় এই সব বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। বহু ক্ষেত্রে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে পুলিশ গুলি চালায়। প্রথম বার পুলিশের গুলিতে দুজন ছাত্রের মৃত্যু হলে ২২ শে ও ২৩ শে নভেম্বর সারা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শিখ ট্যাক্সিচালক, কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন ট্রামকর্মী, কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়। গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়, ট্রেন আটকানো হয় এবং পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশের রিপোর্টে পরে বলা হয় যে, ''বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানো হলেও তারা সরে যেতে অস্বীকার করে অথবা সামান্য পিছু হটে আবার আক্রমণ করতে ফিরে আসে।'' পুলিশ চোদ্দবার গুলি চালায় যার ফলে তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয় ও প্রায় দুশো জন আহত হয়। এর পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

১১-১৩ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের আর এক অফিসার রশিদ আলির বিচারের সময় কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহর আবার অস্থির হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে বেশ কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যু হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণির বিক্ষোভের প্রভাব পড়েনি, এমন কোনও কারখানার খোঁজ মেলা কঠিন হয়ে ওঠে। এমনকী ভারতীয় বিমান বাহিনী, পুলিশ, ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ প্রকাশ পায় ১৯৪৫ সালের নৌ-বিদ্রোহের রূপ নিয়ে।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মেটাতে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিকে আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী নিয়োগ করার অভিযান শুরু হয়। এর ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন। এই নৌ-বাহিনীতে উপনিবেশবাদ এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। অত্যন্ত নোংরা ধরনের জাতি বৈষম্য এখানকার এক ধারাবাহিক চরিত্র ছিল। নৌবাহিনীর নিম্ন স্তরের ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন, খাদ্য এবং অন্যান্য সব বিষয়ে ভীষণ বৈষম্যমূলক মনোভাবের মুখোমুখি হতে হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্মসূত্রে আরও বিস্তৃত এক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতি, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও দেশব্যাপী গণ অভ্যুত্থান নৌ-বাহিনীর উপর প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরে নৌবাহিনীর একটি জাহাজের সাধারণ নাবিকরা খারাপ খাদ্য ও জাতিগত অপমানের একটি বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ক্রমশ অন্যান্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা জাহাজের মাস্তুলে ত্রিবর্ণ পতাকা, ইসলামি প্রতীক চাঁদের ফালির পতাকা ও কাস্তে-হাতুড়ি চিত্রিত পতাকা উত্তোলন করে। বিদ্রোহ শীঘ্রই কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচি ও অন্যান্য বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। নাবিকরা রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি বা ভারতীয় জাতীয় নৌবাহিনী নামে অভিহিত করে এবং ঘোষণা করে যে এর পর তারা শুধুমাত্র ভারতীয় নেতাদের আদেশ মেনে চলবে। এম. এস. খানের নেতৃত্বে 'নাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি' নামে ধর্মঘটিদের এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি পাঁচটি প্রধান দাবি পেশ করে ঃ (১) উত্তম খাদ্য, (২) ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের সমান বেতন, (৩) আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, (৪) নৌবাহিনীর ভারতীয়করণ ও (৫) ইন্দোনেশিয়া থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ও দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন পথটি গ্রহণ করা উচিত হবে সে বিষয়ে

বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বোম্বাইতে বিদ্রোহী সৈন্যরা কংগ্রেস, লিগ ও কম্যুনিস্ট পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দেখায়। কুড়ি হাজারের বেশি নাবিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা বোম্বাইয়ের অস্ত্রাগার লুঠ করে। অ্যাডমিরাল গডফ্রে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। তিনি নৌ বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেন। নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মারাঠা গোলন্দাজ বাহিনী জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালাতে অস্বীকার করে। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায়। মানুষ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে নাবিকদের জন্য খাবর নিয়ে আসতে থাকে এবং দোকানদাররা তাদের যা যা প্রয়োজন সেগুলি তাদের দোকান থেকে নিয়ে যেতে আহ্বান করেন। সুমিত সরকারের মতে, ''ঘটনাগুলিতে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় ব্ল্যাক সি ক্লিটে যে বিদ্রোহ দেখা যায়, তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।'' এই নৌ বিদ্রোহ এক গণ বিদ্রোহ হয়ে ওঠে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ শক্তি নাবিকদের উপর গুলি চালালে আন্দোলন এক হিংসাত্মক মোড় নেয়। স্বতস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ব্রিটিশ সেনা ও জনগণের সংঘর্ষে তিনশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং দুহাজার জন আহত হয়।

বিদ্রোহীরা আশা করেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করবেন। কিন্তু নেহরু,প্যাটেল ও আজাদ নাবিকদের কাজের সমালোচনা করেন। জিন্না, নাবিকদের আত্মসমর্থন করতে বলেন। গান্ধি বলেন যে ব্রিটিশদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতীয় নাবিকরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারতেন। মেন কী কম্যুনিস্ট নেতারাও এই বিদ্রোহের প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখাননি। শেষে অ্যাডমিরাল গডফ্রে বার বার গোলাবর্ষণ করে বোম্বাই শহরকে ধ্বংস করে দেবার হুমকি দিলে প্যাটেল নাবিকদের বোঝান ও তারা ১৯৪৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণ করে। তাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে বিদ্রোহীদের যাতে শাস্তি না হয়, সে বিষয়ে জাতীয় দলগুলি যথাসম্ভব চেষ্টা করবে।

সুমিত সরকার, আর পি দত্তের মত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতরা এই বিদ্রোহকে খুবই তাৎপর্যময় মনে করেন। তাঁদের মতে, এই নৌ বিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। সুমিত সরকার এই বিদ্রোহকে এক তৎপর্যময় ''নীচুতলার চাপ'' হিসাবে দেখেন যা ব্রিটিশদের ভারত থেকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। অধ্যাপক সরকার প্রকৃতপক্ষে নৌ বিদ্রোহকে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচেষ্টা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। একজন মার্কসবাদী পণ্ডিত এই বিদ্রোহকে ''প্রায়-বিপ্লব'' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে অমলেশ ত্রিপাঠীর মত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ এই বিদ্রোহকে ততটা গুরুত্ব দেননি। ত্রিপাঠীর মতে, ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলেই এই বিদ্রোহের প্রতি গণ সমর্থন ছিল সীমিত। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের মত ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ ভারতীয় প্রগতিবাদের পীঠস্থান কলকাতাতেও তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। গ্রামীণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও এই বিদ্রোহের পরিধির বাইরে ছিল।

শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষ

শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষ সেই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হলে ভারতে তখন এক চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনার ভাগীদার হল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা এবং কৃষকরা। এই উত্তেজনা ও অসন্তোষের সূত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তাদের বীজ লুকিয়ে ছিল যুদ্ধের প্রভাবের মধ্যে। যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি, ছাঁটাই ও মূল্যবৃদ্ধি। এই ঘটনাগুলি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে।

১৯৪৫ সালে তার মাদ্রাজ অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকদের অবিলম্বে ভারত ছেড়ে যেতে বলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি কৃষকদের আরও বড় মাপের রাজনৈতিক

কর্মসূচি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৬ সালে সারা দেশ জুড়ে বহু শিল্প ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। ১৯৪৫ সালে যেখানে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৮২৫, ১৯৪৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬২৯-তে। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণির অস্থিরতা বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে।

উপনিবেশবাদী শাসন গোড়া থেকেই প্রায়শ বিভিন্ন ধরনের কৃষক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবণতা থেমে থাকেনি। এই সময়ের কৃষক আন্দোলনগুলি বাস্তবে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসন এমন এক ভূমি ব্যবস্থায় জন্ম দেয় যা পশ্চাদমুখী। প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক শোষণ সব থেকে বেশি আঘাত করে কৃষকশ্রেণিকে। হাজার কৃষককে তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করে ভাগ চাষী, বেগার শ্রমিক বা দিন মজুরে রূপান্তরিত করা হয়। এই সময়কার কৃষক আন্দোলনগুলি শুধু সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নয়, একই সঙ্গে উপনিবেশবাদ-বিরোধীও। এগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে দেখা দেয় ১৯৪৬ সালে বাংলার এক ব্যাপক অংশ জুড়ে, যা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় কম্যুনিস্টরা। এই আন্দোলনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষেরা যোগদান করেন। আন্দোলনকারীদের মধ্যে উপজাতীয়দের সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মত। এই আন্দোলন চলাকালীন কৃষকরা অসাধারণ সংহতির পরিচয় দেয় এবং পুলিশ জমিদার চক্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। উপনিবেশবাদী নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে দমন করে। কিন্তু এই তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক সমাজের উপর এমন এক প্রভাব রেখে যায়, যা সহজে মুছে ফেলা যায় না। এর ফলে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষকদের মুক্তি ও ভূমি সংস্কারের পথ পরিস্কার হয়। ১৯৪৬ সালেই কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে এক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়, যা তেলেঙ্গানা আন্দোলন নামে পরিচিত। কুড়ি হাজারের বেশি কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং এই আন্দোলন গ্রামীণ তেলেঙ্গানার আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই আন্দোলনে প্রায় দু হাজার কৃষক নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন। ১৯৫১ সালে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও তেলেঙ্গানারা মানুষদের কাছে তার স্মৃতি এখনও সজীব।

জাতীয় আন্দোলনগুলির ফলে সরকারি কাজকর্মও ব্যাহত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে দাবিদাওয়া বা অভিযোগগুলি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক। কিন্তু এর আগে সরকারি কর্মচারীদের কোনও ধর্মঘটের নজির ছিল না। ১৯৪৬ সালে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের এক সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত হয়। একইভাবে দক্ষিণ ভারতের রেলকর্মীরা ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে হরতাল পালন করেন। খাজনার উচ্চ হারের প্রতিবাদে প্রায়শই কৃষক ধর্মঘট হতে থাকে। যেগুলির প্রত্যেকটিতে মানুষের এক ধরনের জঙ্গী মনোভাব লক্ষ করা যায়। সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, বাংলা, মহারাষ্ট্র, মালাবার ও হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। দেশের স্বার্থের কথা ভেবে ছাত্ররা পড়াশোনাকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয় নেতাদের হাত শক্ত করতে নেমে পড়ে। এ-কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে সরকার জাতীয় নেতাদের দাবি মেনে না নিলে এই আন্দোলন অচিরেই এক বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হবে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের এই আন্দোলন দমন করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। ব্রিটিশরা তাঁদের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছোনোর জন্য বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। লর্ড ওয়াভেলের ডাকা সিমলা অধিবেশন, ভাইসরয় ও ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের কথাবার্তা এই প্রচেষ্টারই অংশ। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত ছাড়তে তারা দৃঢ়-সংকল্প। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তার আগের ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করতে বাধ্য হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর 'জুন প্ল্যান' (১৯৪৭) পেশ করেন যা ভারতীয়

নেতারা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শীঘ্রই 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' অনুমোদন করে এবং ভারত ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন হয়।

৪.৩ দেশভাগের দিকে / ভারত বিভাগের পথে

সি. আর. (চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী) সূত্র ঃ লিগ এ কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতাকে ব্রিটিশরা ক্রমশ ভারতের স্বাধীনতার এক পূর্বশর্ত হিসাবে দেখতে থাকে। কিছু কংগ্রেস নেতাও এতে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সেই ১৯৪৪ সালেই সি. রাজাগোপালাচারী এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা আনার জন্য তাঁর 'সি আর ফরমুর্লা' নামে আভাস সূত্র প্রণয়ন করেন। তিনি দাবি করেন যে তাঁর এই সূত্র গান্ধি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেছেন।

এই সূত্রে পরামর্শ দেওয়া হয় ঃ

(১) মুসলিম লিগের উচিত স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের দাবিকে সমর্থন করা এবং উত্তরণের সময় অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সহায়তা করা।

(২) যুদ্ধের অবসান হলে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য এক কমিশন গঠন করা উচিত। এই জেলাগুলির মানুষ গণভোটের মাধ্যমে ভারতে থাকা বা না থাকার বিষয়টি নিজেরাই স্থির করবে।

(৩) গণভোটের আগে প্রতিটি দলকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানাতে দিতে হবে।

(৪) বিভাজন অনিবার্য হলে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে দুই সরকারকে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে।

(৫) স্রেফ ঐচ্ছিক ও স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে জনগণের স্থানান্তরকে অনুমতি দেওয়া হবে।

(৬) ব্রিটেন ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই এই শর্তগুলি বাধ্যতামূলক হবে।

(৭) মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে গান্ধি ও জিন্না উভয়েই এই শর্তগুলির প্রতি যথাক্রমে কংগ্রেস ও লিগের অনুমোদন লাভের চেষ্টা করবেন।

এই সূত্রের ভিত্তিতে গান্ধি এক সমঝোতায় পৌঁছতে চাইলে জিন্না তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এই সূত্রে তাঁকে যে পাকিস্তান দেবার কথা বলা হয়, তাকে জিন্না 'বিকলাঙ্গ পোকায় খাওয়া পাকিস্তান বলে বর্ণনা করেন এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন।

ওয়াভেল প্ল্যান বা পরিকল্পনা ঃ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ইংল্যান্ড যান এবং ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা সম্পর্কে চার্চিলের সঙ্গে আলোচনা করেন। ব্রিটেনে তখন সাধারণ নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ায় লেবার পার্টির মত কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল পার্টিও এটা দেখাতে ব্যগ্র ছিল যে ভারতে অচলাবস্থা কাটাতে তারাও সমান আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত মিত্র দেশগুলিও ভারতের সমস্যা সমাধানে বিশেষ আগ্রহী ছিল। এর ফলে ভারতীয়দের কাছে এক নতুন পরিকল্পনা পেশ করা হল, যার নাম ওয়াভেল প্ল্যান।

ওয়াভেল পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয় ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন। এই পরিকল্পনাকে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা হয়। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রে এমন এক সরকার গঠন করা যাতে বর্ণহিন্দু ও

মুসলিমরা সমান প্রতিনিধিত্ব পায়। প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্যান্য সবকটি বিভাগ ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয়। শুধুমাত্র কমান্ডার-ইন-চিফ ও গভর্নর জেনারেলকে ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। বলা হয় যে, নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৯৩৫ সালের আইনের কাঠামোর ভিতর কাজ করবে। তাঁর সদ্যগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাও গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়।

পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করতে সিমলাতে এক অধিবেশন ডাকা হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, শিখ, তফশিলি সম্প্রদায়, ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে সব ভারতীয় নেতাদের এই অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন এই অধিবেশন কাজ শুরু করে। কিন্তু মূলত জিন্নার অযৌক্তিকতা মনোভাবের দরুন আলোচনা ভেঙে পড়ে। কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তার প্রতিনিধি হিসাবে একজন মুসলিমকে মনোনীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি একই পথ অনুসরণ করার কথা বলে। কিন্তু জিন্না কাউন্সিলে মুসলিম লিগ ছাড়া অন্য কোনও দলের কোনও মুসলিম প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে অসম্মতি জানান। জিন্না শুধুমাত্র মুসলিম লিগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস লিগের এই অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে রাজি হয়নি। এর ফলে আলোচনা ভেঙে যায় এবং ১৪ই জুলাই ওয়াভেল এই অধিবেশনকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করেন। এই অধিবেশনের ফলে অবশ্য জিন্নার হাত শক্ত হয়, কারণ ওয়াভেল তাঁকে কার্যত ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেন যার ফলে অধিবেশন ব্যর্থ হয়।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ঃ সিমলা অধিবেশনের ব্যর্থতার পর লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে নয়া দিল্লিতে রাজ্যপালদের এক অধিবেশন ডাকেন, যেখানে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে অ্যাটলির নেতৃত্বে লেবার পার্টি রক্ষণশীলদরে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেবার সরকার আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে ব্রিটেনে ডেকে পাঠায়। সেখান থেকে ফিরেই ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সরকার যথা শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে আগ্রহী।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সাধারণ আসনগুলি ছাড়াও কংগ্রেস বেশ কিছু মুসলিম আসনেও জয়ী হয়। আবার মুসলিম আসনগুলির ক্ষেত্রে মুসলিম লিগও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। চারশো পঁচানব্বইটি মুসলিম আসনের ৪৪৬টি-ই লিগ দখল করে। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মাত্র দশটি মুসলিম আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। শুধু মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লিগ মুসলিম আসনগুলির জয়ী হতে ব্যর্থ হয়। সেখানে খান ভাইদের নেতৃত্বে খুদাই খিদমতগার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর ফলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে, ইউনিয়নিস্টরা কংগ্রেসের সমর্থনে পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা স্থাপন করে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খুদাই খিদমতগার ক্ষমতায় আসে এবং মুসলিম লিগ বাংলা ও সিন্ধে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য এক ক্যাবিনেট মিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। প্রেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত এই কমিশন ওই বছরের ২৩শে মার্চ ভারতে পৌঁছোয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী ভারতীয়নেতাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার পর এই মিশন ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটানোর জন্য তার পরিকল্পনাগুলি ঘোষণা করে। এতে বলা হয় ঃ

(১) দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারাল সরকার গঠন করা হবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে।

(২) বিধানমণ্ডলীতে সাম্প্রদায়িকতা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন প্রতিটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

(৩) নিজেদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছোনর জন্য প্রদেশগুলি পছন্দমত গোষ্ঠী গঠন করতে পারে।

(৪) তার বিধানসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিটি প্রদেশ প্রতি দশ বছর অন্তর সংবিধান পরিবর্তনের অধিকার পাবে।

(৫) ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য এক গণ পরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠন করা হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি প্রদেশকে নির্দিষ্ট সংখ্যার আসন বরাদ্দ করা হবে। প্রদেশগুলিকে বরাদ্দ করা আসনগুলি আবার তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তিনটি সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঃ সাধারণ (মুসলিম ও শিখ ছাড়া বাকি সবাই) মুসলিম ও শিখ (শুধুমাত্র পাঞ্জাবে)। গোষ্ঠীর ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে প্রদেশগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা এই গণ পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে।

(৬) ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত কিছু বিষয় মীমাংসার জন্য গণ পরিষদ ও যুক্ত রাজ্যের মধ্যে একটি চুক্তি করতে হবে। ভারতের অবশ্য কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা থাকবে।

(৭) যত শীঘ্র সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে এক অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

(৮) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ একাধিপত্য বজায় থাকবে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ও শিখরা এই পরিকল্পনাকে মেনে নেয়। পরে গণ পরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা জিন্নার উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে ও তিনি আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। কংগ্রেস এই পরিষদকে ভারতের সংবিধান রচনার যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কংগ্রেসের এই মনোভাবও জিন্নার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণ পরিষদের বৈঠক আয়োজন করা হলে মুসলিম লিগের সদস্যরা ওই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন নিয়েও সমস্যার উদ্ভব হয়। তফশিলি সম্প্রদায় সমেত হিন্দু ও মুসলিম লিগের সমতার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যে প্রস্তাব লর্ড ওয়াভেল পেশ করেন, কংগ্রেস তা বর্জন করে। এদিকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মুসলিম লিগের অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রচেষ্টাও ব্রিটিশদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ২২শে জুলআই ওয়াভেল লিগও কংগ্রেসের কাছে তাঁর নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি ১৪ সদস্যের এক জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন, যাতে তফশিলি সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হবে ৬ ও মুসলিম লিগের প্রতিনিধি থাকবে পাঁচ জন। কংগ্রেস তাকে বরাদ্দ করা সদস্য সংখ্যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেরও নির্বাচিত করতে পারে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নিলেও মুসলিম লিগ কংগ্রেস-লিগ সমতার দাবিতে অনড় থাকে।

এরপর লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে লিগ ১৯৪৬ সালের ১৭ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (Direct Action) ডাক দেয়, যার ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু-

মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিতে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লিগকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই লিগ সরকারে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের পাঁচ জন সদস্য পদত্যাগ করে লিগের সদস্যদের জন্য স্থান করে দেন এবং লিগ ২৫শে অক্টোবর মন্ত্রীসভায় যোগদান করে। কিন্তু মুসলিম লিগের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির ফলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দূরে থাক, লিগের সদস্যরা সরকারের কাজে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের এই আচরণের ফলে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, দাঙ্গা, প্রাণহানি, লুঠতরাজ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে ও পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি হাউস অফ কমন্সে অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করবে। শীঘ্রই লর্ড ওয়াভেলকে ডেকে পাঠানো হয় এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসের শেষাশেষি ভারতে পদার্পণ করেন। সব রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ভারতের সমস্যার এমন এক সমাধানের খোঁজে তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তিনি দেশভাগের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন যাতে কংগ্রেস ও লিগ সমঝোতায় আগ্রহ দেখায়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মাউন্টব্যাটেন ব্রিটেন যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশভাগের প্রস্তাবগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি আদায় করা। ভারতে ফিরে এসে দেশভাগের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আবার লিগ ও কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁরা সম্মতি জ্ঞাপন করলে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের মুসলিম-প্রধান সিলেট জেলাকে বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয় তারা ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে ইচ্ছুক কিনা। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিকেও একই অধিকার দেওয়া হয়। ভারত বা পাকিস্তান—তারা কার অন্তর্ভুক্ত হতে যায় এটি দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই ভারত বিভাজনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে মেনে নেয়। ব্রিটিশ সরকারও এই পরিকল্পনাতে তার সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং সেই অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুমোদন করে, যার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এইভাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লিগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতেই প্রথম দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই অবস্থানে অনড় থাকে যে ভারত এক অখণ্ড ভূভাগ ও তার সব অধিবাসী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত— শুধুমাত্র ব্রিটিশদের 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) নীতি যাদের পৃথক করে রেখেছে। ব্রিটিশরা রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় জাতিত্বকে স্বীকার করে নিলেও সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল একমত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের জন্য সুরক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।

মহম্মদ আলি জিন্না পরের দিকে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' অনুরাগী হয়ে পড়েন— এমন কী ১৯৪৯ সালেও মুসলিম জাতীয় চেতনার বিকাশ ছাড়া তাঁকে অন্য কিছু বলতে শোনা যায়নি। প্রদেশ এবং নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির উপজাতীয় (subnational) গোষ্ঠীগুলির জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলেও তা

গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক আলোচনায় কখনও সে রকম গুরুত্ব লাভ করেনি। ভবিষ্যতে ভারত যে অখণ্ড নাও থাকতে পারে তার প্রথম সম্ভাবনার কথা আঁচ করা যায় ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ক্রিপস্ প্রস্তাবের মধ্যে, যেখানে 'ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে কিছু কিছু প্রদেশ এই পরিকল্পনার বাইরে থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্তাও বেছে নিতে পারে। অবশ্যই ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানালে দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা বন্দি হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি এক জায়গায় থেমে থাকে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেনে লেবার সরকার ক্ষমতায় এলে ভারত থেকে ব্রিটিশদের সরে যাবার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হবার লক্ষণ দেখা দেয়। ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে সমতার ভিত্তিতে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর এই আবেদনে অবশ্য সাড়া মেলেনি। বিকল্প হিসাবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে নির্বাচনের ডাক দেওয়া হয়। কংগ্রেস ''সাধারণ'' আসনগুলিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পৃথক মুসলিম আসনের সিংহ ভাগই লিগ দখল করে নেয়। শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসপন্থী 'রেডশার্টস' মুসলিম লীগের প্রার্থীদের হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এখন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এদের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ব্রিটিশরা অবশ্য তখনও পাকিস্তানের দাবিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে বেশি সুযোগসুবিধা আদায়ের এক কৌশল বলে মনে করতে থাকে। ওয়াভেল এক গোপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, যাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হয়— যে সরকার স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করবে। জিন্না এই প্রস্তাবে সম্মত না হলে তাঁকে বলা হবে যে তিনি শুধু এমনই এক পাকিস্তান পাবেন যা গঠিত হবে শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে। এর ফলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজিত হবে এবং পাকিস্তান আসামের একটি মাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হাতে পাবে। তখন মনে করা হয় যে এর ফলে জিন্নার ধাপ্পাবাজি প্রকাশ হয়ে পড়বে। ওয়াভেল লেবার সরকারের কাছে সম্ভাব্য যে পরিকল্পনা পেশ করেন, সেটাই শেষে গৃহীত সমাধানের সঙ্গে মিলে যায়। লেবার মন্ত্রীসভা অবশ্য নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এক ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করাকেই শ্রেয় মনে করে।

পাকিস্তানের দাবীতে মুসলিম ভোটদাতাদের সমর্থনে অনুপ্রাণিত হয়ে জিন্না ছয়টি পূর্ণ প্রদেশের দাবি জানান। এদিকে কংগ্রেস শুধুমাত্র এমন এক সংবিধান স্বীকার করতে রাজী হয় যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা ভারতীয় গণ পরিষদ মতৈক্যের ভিত্তিতে স্থির করবে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার প্রয়াসে ক্রিপস্ তাঁর চতুর সূত্রটি পেশ করেন। তার 'ত্রি-স্তর' পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেওয়া হয়— প্রদেশ, কেন্দ্র (প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ইত্যাদির জন্য) এবং প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত 'গোষ্ঠী'। প্রথম গোষ্ঠী বা গ্রুপ 'এ'-র অন্তর্ভুক্ত হয় উপমহাদেশের সিংহভাগ, গ্রুফ 'বি'তে পড়ে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধ এবং গ্রুপ 'সি'-র অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা ও আসাম। কংগ্রেস ক্রিপস্ সূত্রকে কাটছাঁট করলেও জিন্না ও মুসলিম লিগ এই সূত্রকে মেনে নিতে রাজি হয়, কারণ তাদের বিশ্বাস হয় যে এর ফলে ছয় প্রদেশ-যুক্ত পাকিস্তান পেতে তাদের সুবিধা হবে। কংগ্রেস পরে এই পরিকল্পনায় তার সম্মতি জানায়। কিন্তু গোষ্ঠী বিভাজনের এই প্রক্রিয়াকে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

১৯৪৬ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লেবার সরকার কংগ্রেসকে এই 'গ্রুপিক্স' বা গোষ্ঠী বিভাজনকে মেনে নেবার জন্য বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষে জহরলাল নেহরু এটি মেনে নিতে অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ জিন্না ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ''প্রত্যক্ষ আন্দোলনের'' ডাক দেন। এর ফলে কলকাতায় ব্যাপক হিংসার সূত্রপাত

হয় এবং চার হাজার মানুষের মৃত্যুর পরই কেবল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। এই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙ বা 'কলকাতা নরমেধ' ওয়াভেলকে বুঝিয়ে দেয় যে ভারতের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাবার একটি চূড়ান্ত দিন ঘোষণা করতে আবেদন জানান। ওয়াভেলকে 'পরাভববাদী' আখ্যা দিলেও অ্যাটলির নিজের কাছেও আর কোনও বিকল্প ছিল না এবং ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে। তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদে অভিষিক্ত হবেন।

অ্যাটলির ঘোষণা অবশ্য ভারতের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসেনি। কোনও ধরনের মতৈক্যের অনুপস্থিতিতে তিনি মেনে নেন যে ভারতের বিভাজন অনিবার্য। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বাস্তববাদী নেতারা স্বীকার করে নেন যে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া থেকে পাকিস্তান গঠন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। তাঁরা বরং চেষ্টা করতে থাকেন জিন্নাকে যথাসম্ভব কম অঞ্চল ছাড়ার। মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেন যে, ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ডিত ভারতের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তাঁর কর্মচারীদের দেশভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন—''যা ভারত ভাগের দায়িত্ব লক্ষনীয়ভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবে।'' অ্যাটলির ঘোষণা অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে কে ভারতে থাকবে ও কে নতুন রাষ্ট্রে (তখনও পাকিস্তান নাম ব্যবহার করা হয়নি) থাকবে। পাঞ্জাব ও বাংলায় বিধায়করা মুসলিম ও অ-মুসলিম হিসাবে পৃথকভাবে ভোট দেবেন— কোনও সম্প্রদায় বা অংশ প্রদেশ ভাগ করতে চাইলে সেটাই করা হবে।

তাঁদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, নেহরু ও জিন্না এই প্রস্তাবে সেরকমই প্রতিক্রিয়া জানান। অবশ্য ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতবাসীদের জানাতে সমর্থ হন যে ভারতীয় নেতারা তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। বিধানসভাগুলিতে ভোট গ্রহণ ছাড়া আসামের সিলেট জেলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হয় তারা পাকিস্তানে থাকবে কি না। বালুচিস্তানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি পাকিস্তানে যোগদান করতে মনস্থ করে।

বাংলা ও পাঞ্জাব, এই দুই জায়গাতেই প্রকৃত বিভাজন রেখা নির্দিষ্ট করে ব্রিটিশ সভাপতি সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন এক বাউন্ডারি কমিশন, যাতে সমসংখ্যক মুসলিম এবং অ-মুসলিম সদস্যরা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকে। সব থেকে সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় মধ্য পাঞ্জাব, যেখানে মুসলিম ও হিন্দুদের পৃথক করার লক্ষ্যে যে কোনও বিভাজন রেখা শিখদের জমির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ হলেও শিখরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল এবং সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল উল্লেখ করার মত।

তাঁর সহকর্মীরা কোনও ভাবেই মতৈক্যে পৌঁছোতে না পারায় র‍্যাডক্লিফ নিজেই দেশভাগের পরিকল্পনাটি স্থির করেন। এতে কিছু কিছু চমক লক্ষ করা যায়। নতুন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম বিহীন চিটাগাং হিল বা চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলাকে তার বাইরে রাখা হয়। পাঞ্জাবের মুসলিম-প্রধান গুরুদাসপুর জেলা সম্পর্কে র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তে অবশ্য সব থেকে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কাশ্মীরের প্রবেশপথ হিসাবেও গুরুদাসপুরের গুরুত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্ট অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সভাপতি হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রকৃত বিভাজন রেখাটি দুই নতুন দেশের নেতাদের জানিয়ে দেন। এই ভাগাভাগিতে উভয় পক্ষই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে ব্যাপক বহির্গমন শুরু হয়— মুসলিমরা পাকিস্তান এবং হিন্দু ও শিখরা ভারতের দিকে রওনা হন। 'চল্লিশ লক্ষ মানুষ পূর্বদিকে পাড়ি দেন, আবার চল্লিশ লক্ষ মানুষ পশ্চিম দিকে যাবার পথে রওনা হন। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় দু লক্ষ

মানুষ প্রাণ হারান। বাংলায় জনগণের বিনিময় এবং হিংসাত্মক ঘটনা অতটা মারাত্মক আকার ধারণ না করে বেশ কিছুদিন ধরে চলে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জন্মের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে হিন্দু উচ্ছেদ চলতে থাকে এবং আশির দশক পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর প্রব্রজন চলে।

দেশভাগের কারণগুলির দিকে পিছন ফিরে তাকানো

দেশভাগ ভারতের ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু যে পদ্ধতি ও পরিস্থিতির মধ্যে এই দেশভাগ অনুষ্ঠিত হয়, তা এই ঘটনাকে ইতিহাসের এক অন্যতম দুঃখজনক ঘটনাতে পরিণত করে। এর এক প্রধান কারণ হল ভারতীয় মুসলিমদের উন্মত্ত ধর্মীয় উদ্দীপনা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব। শতকের পর শতক এক সাথে থাকার পরও মুসলিম ও হিন্দুরা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিমরা দীর্ঘ দিন ধরে ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে ও এর ফলে ধর্মীয় উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে আলিগড় আন্দোলনও এক সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয়। ক্রমশ মুসলিমদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে যে তাদের স্বার্থ হিন্দুদের থেকে শুধু পৃথক নয়, তারা একে অপরের বিপরীত। স্যার মহম্মদ ইকবাল ও অন্যান্য বহু মুসলিম নেতা এই মনোভাবে ইন্ধন যোগান। তারপর জিন্না ও মুসলিম লিগ এই ধারণাকে একই পতাকার তলে সংগঠিত ও বিকাশিত করে। জিন্নার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মুসলিমদের মনে আশার সঞ্চার করে ও তারা প্রয়োজনে হিংসার সাহায্য নিয়েও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রিটিশদের সমর্থন দেশভাগের আর একটি কারণ। ব্রিটিশদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া মুসিলম সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও দেশভাগ— এই দুইয়ের কোনওটাই সম্ভব ছিল না। ১৯৭০ সাল থেকে ব্রিটিশরা মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। আলিগড় আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশরা সক্রিয় সমর্থন জানায়। ১৯০৯ সালের রিফর্ম অ্যাক্টের অনেক আগেই তারা 'বিভাজন ও শাসন' নীতি চালু করে। ১৯০৯ সালে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা মুসলিমদের ও তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়ার কৌশলের এক অঙ্গ মাত্র। লিগ পাকিস্তান দাবি করার আগেই ব্রিটিশরা একে মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত দাবি হিসাবে মেনে নিয়েছিল। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-কে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে তারা সাধারণভাবে লিগ ও মুসিলমদের সব রকম সহায়তা করেছিল। এর ফলেই লিগ তার দাবি নিয়ে এমন অনড় মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং হিংসার পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধা বোধ করে না। লিগের এই আচরণের ফলেই কংগ্রেস শেষে তার পাকিস্তানের দাবিকে মেনে নেয়।

কংগ্রেসের লিগকে তুষ্ট রাখার নীতিও দেশভাগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। কংগ্রেস লিগের সামনে সর্বদাই এক ধরনের কুণ্ঠিত মনোভাব প্রদর্শন করত। এই ধরনের মনোভাবকে কংগ্রেসের দুর্বলতা বলেই মনে করা হত। উচ্চ আদর্শবাদ প্রচার করে ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে এক মূলনীতি হিসাবে স্বীকার করে কংগ্রেস কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে ও লিগের সঙ্গে কূটনৈতিক ভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে শুরু করে। কংগ্রেস বহু ক্ষেত্রে লিগের বহু অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। লিগের সঙ্গে ''লক্ষ্ণৌ চুক্তি'' কংগ্রেসের এক শোচনীয় ভুল, যা মুসলিমদের উৎসাহ যোগায়। ১৯৩২ সালে 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' ঘোষণার পর কংগ্রেস আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, যা প্রমাণ করে যে হিন্দু ঐক্য নিয়ে তার আত্মবিশ্বাস তেমন জোরালো ছিল না। এর ফলে লিগ স্বভাবতই উপকৃত হয়। নিজের নীতির সঙ্গে আপস করেও কংগ্রেস বহুবার লিগের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসের নেতারা, এমনকী গান্ধিও প্রায়শই জিন্নার সঙ্গে দেখা করলে জিন্নার মনোবল বেড়ে ওঠে এবং তিনি আচরণে উদ্ধত হয়ে পড়েন। জাতীয় সংহতির স্বার্থে কংগ্রেস হিন্দুদের আত্মত্যাগ করতে আবেদন জানালেও মুসলিমদের সম্পর্কে নীরব থাকে। ধর্মোন্মাদ এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে অবশ্য যুক্তিসঙ্গত আচরণ আশা করা অসম্ভব ছিল বললে ভুল হয় না। তাদের তোষণ করার নীতি ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কংগ্রেস এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে লিগের

সঙ্গে কোনও মীমাংসায় পৌঁছোন দূরে থাক, কংগ্রেস মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেই উৎসাহ দেয়। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। কংগ্রেসের সব থেকে বড় ব্যর্থতা এই যে সে এমন কোনও আদর্শ বা অভিন্ন লক্ষ্য উপস্থাপিত করতে পারেনি, যা হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সম্প্রদায়কেই আকর্ষণ করবে এবং তারা ধর্মীয় প্রভেদ ভুলে এক সঙ্গে কাজ করবে। ধর্মীয় প্রভেদ দূর করার চেষ্টা করতে গিয়ে কংগ্রেস বরং তা বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও, জিন্না একটি প্রশ্ন তোলেন ঃ স্বাধীনতার পর মুসলিমদের অবস্থান কী হবে? কংগ্রেস এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।' জিন্না নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জিন্না বলেন, "মুসলিমরা হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে।" স্বভাবতই পাকিস্তানের দাবি মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কংগ্রেস ভারতবাসীদের এ কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে, স্বাধীনতার পর সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে এক ধর্মানিরপেক্ষও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ যে ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আশ্রয় নিয়েছিল, তার সাফল্য ছিল অবধারিত।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুসলিম লিগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি সেন্ট্রাল কক্সিউটিভ দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীতে পরিণত করে, যার ফলে তা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনাকে দেশভাগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে। মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ আন্দোলন', ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাবার ঘোষণা ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেশভাগের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন জহরলাল নেহরু বলেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হিংসা দেখা দিয়েছে তা কলঙ্কজনক— এই হিংসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।" সর্দার প্যাটেলও বলেন, "আমার মনে হয়েছিল যে দেশভাগ মেনে না নিলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।" মার্কিন সরকার ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভারত ও তার কাছে আর অর্থনৈতিকভাবে সেরকম লাভজনক থাকে না। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিবাদ ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে তারা আর ভারতীয় সেনাদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। এই সব ঘটনা ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এবং যেহেতু লিগ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় থাকে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী চেহারা নেয়—স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৪.৫ দেশভাগ ও ইতিহাসবিদরা

ভারত ভাগ নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ব্রিটিশ, ভারতীয় ও পাকিস্তানি পণ্ডিত, আমলা, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদরা সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব এবং দেশভাগ সম্পর্কে যা যা মত দিয়েছেন তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

সি.এইচ. ফিলিপস ও এম.ডি. ওয়েনরাইটের "The Partition of India : Policies and Perspectives' গ্রন্থে সংযুক্ত প্রদেশে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের জয়লাভে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও ১৯৪০-এর সাম্প্রদায়িক পরিবেশের চিত্রাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়।

এ. কে. গুপ্ত সম্পাদিত 'Myth and Reality : The Struggle for Freedom in India 1945-47' গ্রন্থে দেশভাগের যন্ত্রণা সম্পর্কে খ্যাতনামা হিন্দী, বাংলা ও পাঞ্জাবি লেখকদের প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়।

বিপান চন্দ্র তাঁর 'Communalism in Modern India' গ্রন্থে দাবি করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি প্রকৃত দ্বন্দ্ব ছিল না—বরং তা গড়ে উঠেছিল প্রকৃত দ্বন্দ্বের এক বিকৃত প্রতিফলনের ভিত্তির উপর। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক বাস্তবের কোনও সাধারণ ধারণা ছিল না, তা ছিল এক "বিকৃত বা অসত্য চেতনা।" মুসলিম 'নেশনহুড' বা 'মহাজাতিত্বের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটের পরিচয় পাওয়া যায় ডব্লু সি স্মিথ, আজিজ আহমেদ মহম্মদ মুজিব, আই এইচ কুরেশি, খালিবদিন সফিদ, হাফিজ মালিক, সৈয়দ রাজা ওয়াস্তি ও কে. কে. আজিজের রচনাগুলিতে যেগুলিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রতি সমর্থনের আভাস মেলে।

বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে শিব রাও, দুর্গা দাস, খুশবন্ত সিং জে. এন. সাহনি, এম. এস. এম. শর্মা ও কে. রামা রাওয়ের রচনাগুলিও যথেষ্ট বিশ্বস্ত।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশভাগ নিয়ে বহু প্রকাশনার জন্ম হয় যেগুলি উপমহাদেশের পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যময় প্রমাণিত হয়। বি. আর. আম্বেদকার রচনা করেন 'Pakistan an the Partition of India'। বেণী প্রসাদের 'Hindu-Muslim Question', হুমায়ন কবীরের 'Muslim Politics', রাজেন্দ্র প্রসাদের India divided' এবং সৈয়দ তুফেইল আহমেদ মাঙ্গালোরির Mussalman Ka Ranshan Must a Quil' রচনাগুলি কংগ্রেসের দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে। অশোক মেহতা ও অচ্যুত পটবর্ধনের 'The Communal Triangle in India' এবং শাউকতুল্লা আনসারির 'Pakistan-The Problem of India' গ্রন্থগুলি থেকে সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

এফ. কে. কে. চুরাশির 'The Meaning of Pakistan', মহম্মদ নোমানের 'Muslim India—Rise and growth of the All India Muslim League' ও কাজী মহম্মদ ইশার 'It shall Never Happen Again গ্রন্থগুলিতে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। সাভারকার ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং এইচ. ভি. শেষাদ্রির 'The Tragic story of Pakistan' রচনাগুলি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

হিউজ টিঙ্কার পেন্ডারেল মুন, নিকোলাস ম্যানসারজ, ই ডব্লু আর লাম্বি, এইচ ভি. হডসন, ইয়ান স্টিফেনস ও লিওলার্ড মোসলের মত ব্রিটিশ পণ্ডিত ও সাংবাদিকরা দেশভাগের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক ধ্বংসলীলার বিবরণ দেন। ম্যানসারজ ও লাম্বি বিশেষ করে দেশভাগের পিছনে সরকারি নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মহাত্মা গান্ধির রচনাসমগ্র ও জহরলাল নেহরুর নির্বাচিত রচনাবলী সাম্প্রদায়িক বিতর্কগুলি সবার সামনে উন্মোচিত করে দেয় এবং এক অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণার উপর মুসলিম লিগের মতাদর্শগত আক্রমণ সম্পর্কে তাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। রাজেন্দ্র প্রসাদ ও বল্লবভাই প্যাটেলের রচনাগুলিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান।

আর. জে. মুর, অনিতা ইন্দর হিং, আয়েশা জালাল, ফরজানা শেখ ও পল ব্রাসের রচনাও দেশভাগ সংক্রান্ত আলোচনাতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

পাকিস্তানের দাবি ও ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের দুঃস্বপ্নের সময়ের জন্য কারা দায়ী, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধানের অঙ্গ হিসাবে কংগ্রেস-লিগ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বিস্তারিত আলোচনা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এমন এন. দাসের Partition and Independence of India : Inside story of the Mountbatten Days, এইচ. এম. সিবভাইয়ের Partition of India : Legend and Reality, দীপক পান্ডের Congress Muslim League Relations, ডি. এ. লো সম্পাদিত Congress and the Raj : Facts of the Indian Struggle, 1917-47 ; ও স্ট্যানলে উলপার্টের Congress and the Indian Nationalism.।

ডেভিদ গিলমার্টিন, ইয়ান ট্যালবট, প্রেম চৌধুরী ও মারা এফ ডি আনসারি ব্রিটিশ ভারতের মূল কেন্দ্রগুলি থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেন। উপমহাদেশের বেশির ভাগ মুসলিমই বাংলাতে বাস করতেন। এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলি ছিল প্রকাশ্য এবং এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সম্প্রদায় থেকেই বেশ কিছু রচনা উঠে এসেছিল। ব্রুমফিল্ড, সুমিত সরকার, রজত কান্ত রায়, কেনেথ ম্যাকফারসন, তনিকা সরকার, সুগত বোস, পার্থ চ্যাটার্জী, অমলেন্দু দে ও জয়া চ্যাটার্জি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিদগ্ধ রচনার মাধ্যমে দেশভাগের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। সুরঞ্জন দাসও বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাগুলির এক সার্বিক, বিশ্বস্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন।

সংযুক্ত প্রদেশকে সাধারণত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রাণকেন্দ্র ও দেশভাগের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হয়। পল ব্রাস এই প্রদেশের এক সার্বিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। যাঁরা গান্ধির কার্যকলাপ ও ১৯৪০-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা জি. ডি. বিড়লার In the shadow of the Mahatma গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। অন্যান্য ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যে আছে এন. কে. বোসের My Days with Gandhi সুধীর ঘোষের Gandhi's Emissary। এছাড়া নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর (Autobiography of an Unknown Indian গ্রন্থে তাঁর গভীর মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে জি.ডি. খোসলার 'Memory's Gay Chariot' ও 'Stern Rekoning' কে. এ. আব্বাসের 'I an not an Island' ও এম. সি. চাগলার 'Roses in December'।

মুসলিম সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচারণা, আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চৌধুরী খালিজুজামানের 'Pathway to Pakistan' আগা খানের স্মরণালেখ্য, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানির 'Quaid-e-Azom as In know Him', ফিরোজ খান নুনের 'From Memory', চৌধুরী মহম্মদ আলির 'The Emergence of Pakistan', সৈয়দ সামসুল হাসিমের 'From My Jinnah', এবং ওয়ালি খানের 'Facts are Facts : The untold story of Indian's Partition'।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচারণের মধ্যে আছে ফ্রান্সিস টাকারের 'While Memory somes', অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের 'Mission with Mountbatten', কনরাড কর্নিফিল্ডের 'The Princely India I knew' ও পেন্ডেরেল মুনের 'Wavell : The Viceroy's Journal'।

মুসিরুল হাসানের মতে, দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে প্রায়শই কিছু আপাত-স্ববিরোধী ঘটনা জড়িয়ে আছে ঃ ১৯৪০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত যাদের প্রতি কোনও সামাজিক সমর্থন ছিল না। সেই মুসলিম লিগ এমন এক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল যার ফলে ভারত ভেঙে টুকরো হল ; জিন্না পাকিস্তানের দাবির মুখ্য প্রবক্তায় পরিণত হলেন এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামরত কংগ্রেস অশোভন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দেশভাগের পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নিল।

দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুযায়ী, দেশভাগ হল হিন্দু ও মুসলিমদের মিটমাটের অসাধ্য পারস্পরিক বিরোধিতার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণাম। জাতীয়তাবাদীদের মতে দেশভাগ আগেই কোনও স্বাভাবিক পরিণতি নয় সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রই দুটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ। ১৯৪০ সালে লাহোরে লিগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, জাতীয়তাবাদীরা তাকেই এক সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ওই প্রস্তাবেই প্রথম সার্বভৌম ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর লিগ ও জিন্না দেশভাগের জন্য অবিরাম চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

সাম্প্রতিক কালে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় স্তর থেকে প্রাদেশিক পর্যায়ে সরে গেছে, যা আবার নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহেরও এক প্রতিফলন বলা যেতে পারে। ১৯৪০-এর ঘটনাবলী ও বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক

রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের নির্দিষ্ট সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তা গঠন ও সামাজিক চলনশীলতাই চিন্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্য এক স্তরে দেশভাগের রাজনীতিরও পুনর্বিবেচনা করা হয়। সংশোধনবাদী চিন্তার একটি ধারা লাহোর প্রস্তাবে নিহিত ভারতীয় রাজ্যগুলির এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনে ব্যর্থতা ও তার ফলে দেশভাগের কারণ অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের রাজনীতির বাধ্যবাধকতা ও স্ববিরোধগুলির উপর মনোনিবেশ করে।

মুসিরুল হাসান দেশভাগ নিয়ে রচিত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ঘটনাবলীর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন, সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সমান্তরাল ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন যাতে দেশভাগের সময়ে মানুষের ভয়, দুর্দশা, হারানোর যন্ত্রণা ইত্যাদিকে আবার অনুভব করা যায়।

দেশভাগের বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের গবেষকদেরও যথেষ্ট ভাবে আকর্ষণ করছে। এম. সেত্তার ও ইন্দিরা বি. গুপ্ত সম্পাদিত ‘Pangs of Partition’ গ্রন্থের দুই খণ্ড দেশভাগের অনিবার্যতা ও বিভিন্ন আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে।

‘The Imperialist Distribution of the Partition of India : A Historigraphical Critique of the Writings of Percival spear and H V Hodson গ্রন্থে বি. এন. পান্ডে সাফল্যের সঙ্গে দেশভাগের কারণগুলির সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন। স্পিয়ার ও হডসনের রচনাতে দেশভাগের পিছনে ব্রিটিশদের ভূমিকাকে ধামাচাপা দিতে হিন্দু ও মুসলিমদের দীর্ঘ দিনের মতভেদকেই বড় করে দেখানো হয়। এই দুই লেখকই ব্রিটিশ শসাক শ্রেণির সদস্য ছিলেন, এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের দায়িত্ব ছিল ভারতবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার অছিলায় ইংরাজ শাসনকে সমর্থন যোগানো। পান্ডে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেশভাগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদদের তৈরী করা এই সব কল্পকাহিনীকে নস্যাৎ করে দিতে সমর্থ হন।

খাজা ও খালিকের মত বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ‘দ্বি-জাতি তত্ত্বকে’ দেশভাগের জন্য দায়ী করেছেন। ‘Genesis of Partition’ শীর্ষক রচনায় তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের চিরকালীন সাংস্কৃতিক বিভাজনের তত্ত্বকে অনুমোদন করেন। ভারতে মুসলিমদের পদার্পণ করার সময় থেকে তিনি এই বিভাজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। দুই সম্প্রদায়ই ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ায় তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। মুসলিমদের বিশ্বজনীন পরিচয় ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হবার পথে এক বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিবাদ লেগেই থাকত। সালের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরা হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব দেখালে এই দুই সম্প্রদায়ের মতো ব্যবধান আরও বেড়ে ওঠে। আলিগড় আন্দোলনের সূচনা ও মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হলে অবশ্য মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এক স্বল্প মেয়াদি ঐক্য সৃষ্টি করলেও চিরস্থায়ী কোনও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি। সরকার গঠন করার সময় অবশ্য হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে এক নতুন মোড় নেয়। ছটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা অর্জন করলে মুসলিমদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার ধারণার জন্ম হয় এবং তারা মনে করতে থাকে যে একমাত্র পৃথক কোনও মুসলিম বাসভূমিকেই তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকা সম্ভব।

সলিল মিশ্র ১৯৩৭ সালে সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতিকে ঘিরে যে সব ঘটনা ঘটে, তাদেরই দেশভাগের জন্য দায়ী মনে করেন। লিগ-কংগ্রেস জোট গঠন করা সম্ভব হলে দেশভাগ এড়ানো যেত কি না, এ বিষয়ে ইতিহাসবিদরা দীর্ঘ দিন চিন্তা ভাবনা করে আসছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে জোট গঠনে ব্যর্থতাই দেশভাগের মূল কারণ এবং তাঁরা এই ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেন। এর ফলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা এক গুরুতর আকার ধারণ করে। সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিম লিগ এককভাবে এক বিশাল গোষ্ঠী ছিল না এবং জিন্নার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। জিন্না এই ধরনের জোট গঠনে সম্মতি দিতেন যদি অন্যান্য প্রদেশেও জোট সরকার গঠন করা হত ও

মুসলিম লিগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসবে স্বীকার করে নেওয়া হত। এই ধরনের জোটের কার্যকারিতা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। জোটের কার্যকারিতা ছিল এক কৌশলগত প্রশ্ন যা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত কংগ্রেসের উচ্চ সারির নেতাদের। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাদের অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ ও অগ্রাধিকারগুলি বিবেচনা করে দেখতে হত।

দেশভাগের পিছনে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা সম্পর্কে বি আর নন্দা ও চিত্তব্রত পালিতের দুটি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য, সেগুলিতে গান্ধির দ্বিধা ও বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "Tragedy and Trinaiph : The last Days of Mahatma Gandhi' শীর্ষক নিবন্ধে নন্দা ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার কথা চিন্তা করে গান্ধির অসহায়তার কথা বর্ণনা করেছেন। গান্ধি আহত হয়েছিলেন এই কথা ভেবে কংগ্রেসের নেতারা তাঁর পরামর্শকে অবাস্তব মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবুও অক্লান্তভাবে ভ্রমণ করে গান্ধি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সাফল হয়েছিলেন। তাঁর 'Mahatma Gandhi and the Partition of India' রচনায় চিত্তব্রত পালিত গান্ধির সত্যাগ্রহের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরেন এবং দেখান দেশভাগের আগে তিনি কীভাবে এক হতাশাগ্রস্ত, একাকী মানুষে পরিণত হন।

দ্বিতীয় খণ্ডে স্মৃতিচারণ, সৃজনশীল রচনা, শিল্পকলা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রধনাত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা সংকলিত করা হয়েছে। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে বহু বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীর অবদান যাদের মধ্যে আছেন সতীশ গুজরাল, মৃণাল পান্ডে, উর্বশী বুটালিয়া, কৃষ্ণ কুমার ও পার্থ চ্যাটার্জি।

এইভাবে ইতিহাসবিদরা সব রকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেশভাগ সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করে সেই বিষয়ে রচিত সাহিত্য কর্মে নানা ধরনের নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

৪.৬ সূত্র নির্দেশ

১. Penderel Moon : Wavell : The Vicevoy's Journal, Oxford, 1978.

২. V P Menon : Transfer of Power, Bombay, 1956

৩. S. Settar, I. B. Gupta (ed.) : Pangs of Partition, Vol. I & II. New Delhi, 2002.

৪. Mushirul Hasan : India's Partition — Process strategy and Mobilization, New Delhi, 1998.

৫. Keka Dutta Rpy : Political Upsurges in Post War India, New Delhi, 1992.

৬. Jalal, Ayesha : The Sole Spokesman, Jinnah the Muslim League and the Demand for Pakistan, Cambridge, 1985.

৭. Chittabrata Palit and Ujjal Ray : Bengal before and after the Partition (1947) : The Changing Profile of a Province, Kolkata, 2004.

৮. Sumit Sarkar : Popular Movement and Middle Class Leadership in Late Colonial India-Perpectives and Problems of a History from Below, Calcutta, 1983.

৯. Bipan Chandra : India after Independence, New Delhi, 1999.

৪.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১. **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১৯৪৭ সালে ভারতের বিভাজন কি অনিবার্য ছিল?

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

ক্যাবিনেট মিশনের মূল প্রস্তাবগুলি কী ছিল? এই প্রস্তাবগুলির প্রতি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী রকম ছিল?

৩. **অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ**

কে প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA) সংগঠিত করেন ও কখন?

৪.৮ সংক্ষিপ্তসার

বিদেশের সহায়তা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বলপ্রয়োগ করে ব্রিটিশকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করা। নেতাজির ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে গভীর এক ভীতির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী (যেমন নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ইত্যাদি) ব্রিটিশদের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে এবং তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে ১৯৪৬ সালে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করবে। কিন্তু ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতার সম্ভাবনার উপর কালো মেঘ হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে পদার্পণ করেন এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই তাঁর পরিকল্পনা মেনে নিলে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি শুরু হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, কিন্তু তার ভূমিখণ্ড থেকে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি করা হয়।

ইতিহাস

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

তৃতীয় পত্র — পর্যায়-৪

একক ১ ❑ ১৯৪৭ সালে ভারত

গঠন ঃ

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ ১৯৪৭ সালের ভারত, দেশভাগের অভিঘাত ও পরিণাম

১.২ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের দৃষ্টান্ত

১.৩ বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভারতের সংহতি

১.৪ নতুন সংবিধান ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত বুনিয়াদ

১.৫ গণতন্ত্রের ভিত্তি ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা, জনকল্যাণ ও মৌলিক অধিকার

১.০ প্রস্তাবনা

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম পর্বের ইতিহাস বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির প্রশ্ন তখনও ছিল অমীমাংসিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত গড়েন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল এবং বিরোধী রাজনীতির প্রসঙ্গ দ্বিতীয় এককে আলোচিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে এদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে বিশ্ববাসীর চোখে স্বীকৃতি লাভ করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তিত হয়। সামাজিক ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠা নেহেরুর লক্ষ্য ছিল।

নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতের বিদেশনীতির মূল রূপরেখা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত নির্জোট আন্দোলনের ডাক দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তির প্রবক্তা হলেও .... সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়নি।

১.১ ১৯৪৭ সালের ভারত

দেশভাগের অভিঘাত ও পরিণাম ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে যে সংগ্রাম তখনও চলছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের দৃষ্টান্ত তা উদ্বুদ্ধ হয়। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের বাস ভারতবর্ষে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে তাদের মুক্তিলাভ ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু

বলেন— নিয়তির সঙ্গে অভিসারে বহু অংশে আমরা বেরিয়েছিলাম। সেই প্রতিশুতি যদি বা সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তবু অনেকাংশে রক্ষা করার সময় এখন এসেছে। পৃথিবী যখন নিদ্রিত, স্বাধীনতা ও নবজীবনের স্পন্দনে ভারত তখন জাগ্রত। ("Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not loholly a full measure, but very Substantially.

নেহেরুর এই উক্তিতে কোটি কোটি ভারতবাসীর আশা- আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। বাস্তবে পরিস্থিতি কিন্তু এমন ছিল যাতে ব্রিটেনকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারত ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। যুদ্ধের ভয়ংকর ক্ষয়-ক্ষতির পর দেশ পুনর্গঠন ছিল ব্রিটেনবাসীর সামনে প্রধান সমস্যা। সাম্রাজ্যের বোঝা অতিরিক্ত ভার হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের শ্রমিক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারতে সাম্রাজ্য আর্থিকভাবে লাভজনক ছিল না। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে জানা যায়, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিরক্ষার ব্যয় মেটাতে রাষ্ট্রের মোট ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ নিয়োজিত হয়। যুদ্ধের বছরগুলিতে ব্রিটেনকে পণ্য সরবরাহের বিনিময়ে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতের প্রাপ্য হয়। অর্থনীতিবিদ কেইনস দেখিয়েছেন, এ সময়ে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের পর ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধোত্তর কালে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের বিচার, নৌ-বিদ্রোহ এবং তেভাগা ও তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সাধারণের ক্ষোভ বারবার প্রকাশ পাচ্ছিল। বড়লাট ওয়াভেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত আগ্নেয়গিরির উৎসমুখের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশ ত্যাগ করা ব্রিটিশদের কাছে সমীচীন মনে হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের স্বাধীনতা পক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মত দেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আটলান্টিক সনদে অঙ্গীকার করা হয়েছিল ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারবে না এবং পরাধীন জাতিগুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার দাবি ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। সবসুদ্ধ অনন্যোপায় হয় ব্রিটেন সাম্রাজ্য থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক আর. জে. মুর এই পর্বের ইতিহাসকে তাই ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন Escape from Empire.

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ব্রিটেন ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাম্বেল জনসন, হডসন, পেন্ডেল মুল, জুডিথ ব্রাউন প্রমুখ ব্রিটিশ লেখক এবং ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাকে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' (Transfer of Power) বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয়দের ক্রমশ প্রহসনের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছিল, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাকে তার চূড়ান্ত পরিণতি বলে তারা মনে করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ বলে, প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এই ধারণায় তাদের প্রচার ছিল "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়"। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে "অবস্থানগত লড়াই" বলে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র বর্ণনা করেছেন। এই লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায় ছিল। প্রতিটি পর্যায় থেকে সরকারের কাছ শেষে ভারতীয়রা কতকগুলি সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তারা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে।

১.২ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অভিজ্ঞতার তুলনা

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মনে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার পর তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। একদিকে পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শরণার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ শরণার্থী পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লী, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক কর্তৃক ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ইউ. ভাস্কর রাওয়ের লেখা The story of Rehabilitation গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়। আগস্ট মাস শেষ হওয়ার আগে মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ লাহোর ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে, প্রায় সত্তর হাজার মানুষ অমৃতসর থেকে লাহোরে প্রবেশ করে। (তথ্যসূত্র : ইউ. ভাস্কর রাও) বিপরীতমুখী শরণার্থীদের মধ্যে পথে সংঘর্ষ এবং সম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে। বাসে ট্রেনে পায়ে হেঁটে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। ইউ. ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে এই সময়ে প্রায় চার লক্ষ হিন্দু নর-নারীর খোঁজ মেলেনি।

পূর্ব ভারতের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। ভাস্কর রাও প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিমে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৯,০০০। দেশভাগের সময় বাংলার কতকগুলি অঞ্চলে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। চট্টোগ্রামের পাজরা অঞ্চলে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ। মোট হিন্দু অধিবাসীদের শতকরা ৪২ ভাগ ছিল পূর্ববঙ্গে। পরবর্তী এক দলকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সংখ্যাগত হিসাব ভাস্কর রাও দিয়েছেন, বছর অনুযায়ী বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায় এরকম ঃ—

সাল	শরণার্থী সংখ্যা
১৯৪৭	৩.৫ লক্ষ
১৯৪৮	প্রায় ৮ লক্ষ
১৯৪৯	২১৩,০০০
১৯৫০	১,৫৭৫,০০০
১৯৫১	১৮৭,০০০
১৯৫২	২০০,০০০
১৯৫৩	৭৬,০০০
১৯৫৪	১.১৮ লক্ষ
১৯৫৫	২.৪৩ লক্ষ
১৯৫৬	৩.২০ লক্ষ

১.৩ বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভারতের সংহতি

স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬-এর ১৩ই খেতাধিয়ের প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসিত রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ রাজ্যের সার্বভৌমিত্বের অবসান ঘটবে। মন্ত্রী মিশন সুপারিশ করে যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে

নিয়ে একটি ইউনিয়ন... গঠন করা হবে এবং পররাষ্ট্র নীতি দেশরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ইউনিয়ন সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত থাকবে। দেশীয় রাজন্যবর্গ মন্ত্রী মিশনের সুপারিশগুলো সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রস্তাবিত ভারত ইউনিয়নে যোগদান আবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাজন্যবর্গের থাকবে। (২) ভারত সরকারের হাতে সমর্পিত ক্ষমতাগুলি রাজন্যবর্গ ফিরে পাবেন। (৩) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের শাসনযন্ত্র ভৌমিক অখণ্ডতা এবং রাজবংশের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনকানুন অব্যাহত থাকবে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ সার্বভৌমিকত্বের অবসান ঘোষণা করা হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত ইউনিয়ন অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগদান করার জন্য অথবা ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হলে কয়েকটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্য যথা ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে ভারত উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে কোন দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তা স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমপর্যায় তুল্য বলে গণ্য করা হবে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাবে 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর' নামে একটি নতুন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। সর্দার প্যাটেল এই দপ্তরের দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করেন এবং ভারত ইউনিয়ন ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে অগ্রসর হন। ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ ২৩শে জুলাই দেশীয় রাজন্যবর্গের এক সম্মেলনে বক্তৃতাদান কালে একই মর্মে আবেদন জানান। সর্দার প্যাটেল ও মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শক্রমে জুনাগড় হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া সকল দেশীয় রাজ্যগুলি কতকগুলি শর্ত সম্বলিত একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে। ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যাপারে দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথম উপায়টি হল কেন্দ্রীয় সরকার — শাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এদের সংযুক্তিকরণ অথবা সন্নিকটস্থ প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযুক্তিকরণ— যেমন উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে পূর্বতলের রাজ্যগুলির সংযুক্তি এবং বোম্বাইয়ের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয় পন্থাটি হল কয়েটি রাজ্যকে সংযুক্ত করে একটি বৃহৎ যুক্তরাজ্য গঠন করা, যেমন রাজস্থানের যুক্তরাজ্য পাঞ্জাবের যুক্তরাজ্য প্রভৃতি। দেশীয় রাজন্যবর্গ ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তি স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ শাসনাধিকার ত্যাগ করেন।

ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য ছিল হায়দ্রাবাদ। এই রাজ্যের শাসনকর্তা নিজাম ছিলেন মুসলমান। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রজাই ছিল হিন্দু। ভারত বিভাগ হবার পূর্বেকার অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদ ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' সম্পাদন করে। শীঘ্রই নিজাম এক উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ভারত বিরোধী সংস্থার নেতা কাশিম রোজভির প্রভাবাধীন হয়ে পড়লে পরিস্থিতি বিশেষ জটিল হয়ে ওঠে। রেজভি হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এমনকি নিজাম ভারতের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনস এ অভিযোগ পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হায়দ্রাবাদ ১৯৫০ সালের ২৩শে জানুয়ারী ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে।

হায়দ্রাবাদ সমস্যা যখন সমাধান হয়েছে তখনই জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন হিন্দু। কিন্তু প্রজাদের গরিষ্ঠ সংখ্যা ছিল মুসলিম। ভৌগোলিক অবস্থান এবং মুসলমান

'সংখ্যা গরিষ্ঠতা' হেতু পাকিস্তান এই রাজ্যটিকে অধিকার করতে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় উপজাতীয় আক্রমণকারীরা জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে লুঠতরাজ শুরু করে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়লে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেও ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির চুক্তিতে এই রাজ্যের শাসক মহারাজা হরি সিং স্বাক্ষর করেন। নিখিল জম্মু-কাশ্মীর কনফারেন্স-এর সভাপতি শেখ আবদুল্লা ভারতভুক্তির ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। হানাদারদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার আজাদ কাশ্মীর সরকারকে সর্বতোভাবে সামরিক সাহায্য পাঠাতে থাকে। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরের অন্যত্র এক জরুরী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনাইটেড নেশনস-এর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। ইউনাইটেড নেশনস আজও কাশ্মীর সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেনি। বর্তমানে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এবং কাশ্মীরের পাকিস্তান 'অধিকৃত অঞ্চল' আজাদ কাশ্মীর এই নামে পাকিস্তানের অধিকারই থেকে গেছে।

১.৪ নতুন সংবিধান এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত বুনিয়াদ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিনিধিবৃন্দ গণ পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রাধান্যের প্রতিফলন গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচনেও দেখা যায়। নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পন্থ, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা গণ পরিষদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।

তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা ভীমরাও আম্বেদকর পরিষদ-নিযুক্ত সংবিধান খসড়া রচনা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, নির্দল সদস্য কে. এম. মুন্সী প্রমুখ। সংবিধান রচনা সভায় বরোদা রাজ্য অংশগ্রহণে করেছিল রাজ্যের তৎকালীন দেওয়ানি ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের উপদেশে সভায় তিনি বরোদা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বেনিগ্যাল নরসিংহ রাও সংবিধান রচনা সভার নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও জুলাই ১৯৪৬ থেকে কমিটির পরামর্শদাতারূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংবিধান রচনার শুরুতে তাঁর নির্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান রচনার অভিজ্ঞতার সার নির্যাস একটি "সাংবিধানিক উদাহরণ গ্রন্থ" হিসাবে প্রণীত হয়েছিল।

(এইভাবে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়েছে।)

ভারতীয় সংবিধানে তিনটি মতাদর্শের সমন্বয় সাধিত হয়েছে ঃ— (১) উদারনৈতিক মতবাদ, (২) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং (৩) গান্ধীজির মানবিক ধ্যান-ধারণা। ব্যক্তি স্বাধীনতা, নির্বাচন ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রভৃতি ছিল উদারনৈতিক চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles) মধ্যে নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজির কর্মসূচীর থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জন, কুটিরশিল্পের প্রসার প্রভৃতি বিষয়গুলি গৃহীত হয়েছে।

গণ পরিষদে কংগ্রেস সদস্যদের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ভারতের সংবিধানে সব ধরনের মতবাদের

প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি খসড়া রাজস্ব কমিটি গণ পরিষদের কাছে সংবিধানের খসড়া জমা দেয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণ পরিষদে তা অনুমোদিত হয়। গণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। "প্রজাতন্ত্র দিবস" হিসাবে এই দিন উদযাপিত হয়।

১.৫ গণতন্ত্রের ভিত্তি ঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতা, জনকল্যাণ এবং মৌলিক অধিকার

ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্রকে যা ধর্মীয় রচনা দ্বারা পরিচালিত হয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মহীন বা ধর্ম-বিরোধী রাষ্ট্র নয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমান মর্যাদা, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব বিশ্বাস' এবং আচারানুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। আইন সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারকে সমভাবে রক্ষা করে। নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদীদের অধিকারও সমানভাবে রক্ষা করা হয়। রাষ্ট্র কোন ধর্মমত আরোপ করে না। ধর্ম-নিরপেক্ষতা নিছক আইনগত ও তাত্ত্বিক ধারণা নয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভাব-বিনিময়। উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

ভারতীয় গণ পরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে এ. এস আয়েঙ্গার বলেন, "ধর্ম-নিরপেক্ষ" শব্দের অর্থ এই নয় যে আমরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করি না কিম্বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্র বা সরকার বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। গণ পরিষদের আলোচনায় ধর্মীয় প্রচারের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম নিরপেক্ষ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মমত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত। গণ পরিষদে আলোচনা কালে এই কারণে ডঃ কে. এম. মুন্সী, কে. শান্তনম প্রমুখ ধর্ম প্রচারের অধিকার স্বীকার করে নেন। তবে তা অবশ্যই অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে। ধর্মীয় মতান্ধতার কারণে ধর্মীয় প্রচারের অধিকারের আপ্রয়োগ ঘটতে পারে বলে কে. টি. শাহ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিবেচনা বর্জন করা হয়েছে। সংবিধানের ২৫(১) নং ধারা অনুযায়ী ধর্মগ্রহণ, পালন এবং প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হলেও জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছাড়া ভারতীয় সংবিধানে অন্য যেসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলি হল ঃ — সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা) (২) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা) (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা) (৪) সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার (৩১নং ধারা) (৫) সম্পত্তির অধিকার (৩১ নং ধারা) এবং (৬) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২-৩৫ নং ধারা)। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে আইনসিদ্ধ অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের লক্ষ্য হল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে নাগরিকদের মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব অর্জন সম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক অধিকার বিষয়ে আমাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। কোন রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝার পক্ষে সেখানকার

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কতখানি এবং কি প্রকার তা জানা আবশ্যক।

সঙ্গে জড়িত নয় এমন অর্থনৈতিক (economic) আর্থিক (financial) এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। ২৫(২) ধারা অনুযায়ী সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধন অথবা দেবালয়ে হিন্দুদের শ্রেণী নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। জৈন, শিখ, এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিয়ম প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। শিখ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গুরুদ্বার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৬নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোন অংশ সেবাও ধর্মকার্যের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং তার জন্য সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও তাদের আছে। জনসাধারণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা কিম্বা স্বাস্থ্যের পরিপন্থী হলে অবশ্য এই অধিকার সংকুচিত হতে পারে। কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচরণ অন্য সম্প্রদায়ের শান্তি ভঙ্গ করলে সরকারকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বলতে কি বোঝায় আদালত তা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নির্দ্ধারণ করবে।

সংবিধানের ২৭নং ধারা বলে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে করদানে বাধ্য করা যায় না। সরকারী অনুদানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ। সরকারের আর্থিক সাহায্য বা স্বীকৃতি-প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর— বা শিক্ষার্থী অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তার অভিভাবকের— অনুমতি ব্যতীত ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না (২৮নং ধারা) অছি বা দানের মাধ্যমে গঠিত ধর্মীয় শিক্ষায়তন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও কিন্তু সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা যাবে না।

সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকরা তাদের অধিকার বিষয়ে সর্বদা সচেতন এবং সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না থাকলে রাষ্ট্র তাদের অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদীরা নাগরিক অধিকারের দাবি বারবার উত্থাপন করেছিলেন। ১৯২৮-এ খ্রিষ্টাব্দে নেহেরু রিপোর্টের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গ রিপোর্টে গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়। পরে গণ-পরিষদের আলোচনা থেকে মৌলিক অধিকারের যে ধারণা ভারতীয় সংবিধানে প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সেখানে কোন শব্দ খরচ করা হয়নি। এটি ভারতীয় সংবিধানের একটি দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইদানীং অবশ্য কাজের অধিকার সম্পর্কে সরকার সচেতন হয়েছেন।

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখে গান্ধীবাদের তুলনায় পাশ্চাত্যের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব বেশি দেখা যায়। উদাহরণগত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল অফ রাইটস্-সহ উক্ত সংবিধানের পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধন, মানব অধিকার বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সংবিধান সভার ঘোষণা, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা এবং ইংরেজ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডাইসী-র রচনার প্রভাব তাতে স্পষ্ট। গান্ধীজির আদর্শানুযায়ী পঞ্চায়েৎ গঠন মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় নিয়ামক নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মার্কিন সংবিধানে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব (theory of natural rights) স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতীয় সংবিধানে এরূপ কোন চিন্তা স্থান পায়নি। কেবলমাত্র সংবিধানের তৃতীয় অংশে সংযোজিত অধিকার ব্যতীত ভারতীয় নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে কোন অধিকার দাবি করতে পারে না। ভারতীয় নাগরিকদের

অধিকার সমূহকে ইতিবাচক (Positive) এবং নেতিবাচক (Negative) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তবে এই দুইয়ের পার্থক্য স্পষ্ট নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে যদি আমরা ইতিবাচক জ্ঞান করি, তবে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তিদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেতিবাচক অধিকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। সংযোজিত অধিকারগুলি কতগুলি— যেমন দেশের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মতপ্রকাশ কিংবা বসতি স্থাপন কেবলমাত্র নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য অদিকার বিদেশীরাও ভোগ করতে পারে। তফশিলী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু অধিকার বিশেষভাবে সংরক্ষিত। তফশিলী সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংবিধানের ১৯নং ধারা অনুযায়ী দেশে চলাফেরা এবং বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন মাধ্যমে নাগরিকদের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশাবলী সংবিধানে প্রথম যুক্ত হয়। কারণ, কর্তব্যবিহীন অধিকার সম্ভব নয়। অধিকার ও কর্তব্য বোধ পরস্পরের পরিপূরক।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি প্রধানত রাজনৈতিক ও আইনসিদ্ধ। সংসদের উভয় কক্ষে দলগত প্রাধান্যের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক অধিকারের প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণেও মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় হিত

ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive principles) বিশেষ গুরুত্ব আছে। আইনত কার্যকর না হলেও রাষ্ট্রের আদর্শ এদের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। বলা হয়েছে, তফশীলি জাতি এবং সমাজের অনগ্রসর অংশগুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি বিধান এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে তাদের রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। বালক-বালিকাদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে কাজের অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকের উপযুক্ত বেতন এবং বেতনের বৈষম্যের দূরীকরণে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। শ্রমিক অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। বেকারদের বিশেষ সাহায্য দিতে হবে। বাস্তবে এইসব নীতি অনেক সময় কার্যকর করা সম্ভব না হলেও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ এইসব নীতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য এইসব নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

একক ২ ❑ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ

গঠন ঃ

২.১ রাজ্যের পুনর্বিন্যাস

২.২ নেহেরুর উদারনীতিবাদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ সাধারণ নির্বাচন

২.৩ নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস

২.৪ নেহেরু ও বিরোধী পথ

২.১ রাজ্য পুনর্বিন্যাস

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন বিভাগে ২৮টি রাজ্য গঠিত হয়েছে। রাজ্যগুলির সীমা নির্দ্ধারণে ভাষা বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুর্নগঠন কমিশন গঠন করেছিল। কমিটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সংখ্যাগরিষ্ঠ তেলেগু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবিতে পট্টি শ্রীরামালু অনশন ধর্মঘটে প্রাণ দেন। পরিণামে সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর অন্ধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পুনরায় গঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট কমিশনের প্রতিবেদনভিত্তিক একটি খসড়া আইন পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করার পর সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধিত হয়। ফলে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সমগ্র দেশ ১৪টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্র-শাসিত ইউনিয়ন অঞ্চলে পুনর্বিন্যস্ত হয়।

ভারতে জাতি সমস্যার সমাধান এর দ্বারা হয়নি। মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাটকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র (রাজধানী বোম্বাই) এবং গুজরাট (রাজধানী আহমেদাবাদ) দুটি পৃথক রাজ্য হিসাবে দেখা দেয়।

আকালী দলের চাপে সরকার ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবকে দ্বিভাষিক রাজ্য ঘোষণা করে। এই রাজ্যে পাঞ্জাবী ভাষাভাষী হিন্দু এবং হিন্দি ভাষাভাষী শিখরা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ ছিল শিখ। হিন্দী এবং পাঞ্জাবি ভাষাভাষী অধ্যুষিত আঞ্চলগুলিতে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হয়। সরকারী কাজকর্মে ইংরিজি এবং উদু ভাষার ব্যবহার আগের থেকে বজায় ছিল। এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের নির্বাচনে আকালী দল পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগণের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের ডাক দেয়। বহু সংগ্রামের পর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয়। হিন্দি ভাষাভাষী অধ্যুষিত হরিয়ানা স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

নেহেরু প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (২৫ অক্টোবর ১৯৫১-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এটি ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। ভারতের মতো বিশাল দেশে, যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্মে বিভক্ত এত বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস, সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্য বিষয়ে অনেকেই

সন্দিহান ছিলেন। দেশের সত্তর ভাগের বেশি মানুষ নিরক্ষর। ভাষাগত মিল তাদের মধ্যে ছিল না। আধুনিকতার আলো অধিকাংশ জায়গায় পৌঁছায়নি। সংসদীয় নির্বাচনের কোনরূপ অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এরকম অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দুরুহতা অকল্পনীয়। নেহেরু কিন্তু নিরাশ হননি। নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়। লোকসভায় মোট ৪৮৯ এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩২৮৩টি আসন ছিল।

নির্বাচনের জন্য সারা দেশ জুড়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। একুশ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী সকল নাগরিককে ভোট দানে উৎসাহিত করা হয়; মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ। পৃথিবীর আর কোথাও এত ভোটার এর আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। প্রতি এক হাজার ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র হিসাবে ২ লক্ষ ২৪ হাজার ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২৫ লক্ষ ব্যালট বাক্স এবং ৬২ কোটি ভোটপত্র প্রয়োজন হয়। ১০ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ভোট পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রার্থীর নামে ভোট কেন্দ্রে পৃথক ব্যালট বাক্স রাখা ছিল। প্রত্যেক প্রার্থীকে একটি প্রতীকচিহ্ন দেওয়া হয়। ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর ভোট বাক্সের ওপর সেই চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। ভোটাররা পছন্দ মতো প্রার্থীর সমর্থনে একটি করে ভোট দিতেন। এই নির্বাচনে ১৪টি জাতীয় দল, ৬৩টি আঞ্চলিক দল এবং বহু সংখ্যক নির্দল প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৭,৫০০। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য লোকসভায় ৯৮টি এবং বিধানসভায় ৬৬৯টি আসন সংরক্ষিত ছিল।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভোটের দিন অনেক জায়গায় উৎসবের চেহারা নেয়। জনসাধারণের উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। মোট ভোটদাতাদের ৪৬.৬ শতাংশ ভোট দেয়। মহিলা ভোটারদের প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রায় ৩ থেকে ৪ শতাংশ ভোট বাতিল হয়। ভারতে ভোট যজ্ঞের এই সাফল্যে বিশ্ববাসী চমৎকৃত হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতেও জাতি সমস্যা তীব্রতা লাভ করে। নাগা, মিজো, লুসাই প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে ১৯৫০-এর দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এ. জেড. ফিজো-র নেতৃত্বে স্বাধীন নাগা রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে এই দাবি মেনে নেওয়া হয়। মিজো উপজাতিকে অনুরূপ আন্দোলনের পথে পরিচালিত করেন লালডেঙ্গা। আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্য গঠিত হয়।

২.২ নেহেরুর উদারনীতিবাদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ সাধারণ নির্বাচন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমষ্টিকরণের প্রতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সমান আকর্ষণ ছিল। ইংল্যান্ডে শিক্ষালাভের ফলে ছাত্র বয়স থেকেই তিনি পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। আবার চোখের সামনে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টাও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত নিপীড়িত জাতিসমূহের এক মহাসভায় (Compress of Oppressed Nationalities) তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন ভারতের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি তখন থেকেই ভারতের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন। গান্ধীজি তাঁর উত্তরসূরী

হিসাবে নেহেরুকে নির্বাচন করেছিলেন। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা নেহেরুকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির বাণী তিনি প্রচার করেন। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সংহতি সম্ভব নয়, তিনি বুঝেছিলেন। সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের পথে নেহেরু দেশকে পরিচালিত করেছিলেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যে এই নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে কংগ্রেসের জয়-জয়কার দেখা গেল। লোকসভায় ৭৫% এবং বিধানসভায় ৬৮.৫% আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, উড়িষ্যা এবং পেপসু (অর্থাৎ Patiala and East Panjab States Union) বাদে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেসের সাফল্য ছিল নিরঙ্কুশ। এমনকি এইসব রাজ্যেও ভোট দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। পরবর্তী দেড় দশক ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের একদলীয় প্রাধান্য বজায় ছিল। বিরোধীরা কোনমতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। নেহেরুর জীবদ্দশায় ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা পুনরায় প্রমাণ হয়। এই দুটি নির্বাচনে ভোটদাতাদের হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালে গড়ে ৪৭% এবং ১৯৬২-তে ৫৮% ভোট প্রদান করা হয়।

২.৩ নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবি গৃহীত হয়। দলে তরুণ অংশের নেতা হিসেবে তিনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। গান্ধীজি তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে জওহরলালকে নির্বাচিত করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অন্তর্বর্তীকালনী সরকারের তিনি-ই ছিলেন প্রধান। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে বল্লভভাবই প্যাটেলের মৃত্যুর পর দলে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দলের যাবতীয় কর্মসূচী তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত হয়। দলীয় প্রার্থী নির্বাচন থেকে দলের নীতি নির্ধারণ, ইস্তাহার রচনা, প্রচারাভিযান প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। মাত্র ৪৩ দিনে তিনি ৪০ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে তিনি একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদন নিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌছান। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য তাঁর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন হিসাবে ধরা যায়। নেহেরু ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। ভারতে সেকুলার রাষ্ট্র গঠনের পিছনে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে তিনি এই মর্মে আবেদন রেখেছিলেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত হওয়ায় দলীয় মতে সংগঠনে শিথিলতা দেখা দেয়। প্রথম সারির নেতারা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং কম যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা তাদের স্থান গ্রহণ করে। দলীয় কাজ কর্মে বিচ্যুতি দেখা দেয়। এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য কামরাজ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কার সাধনে তা ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস এবং নেহেরু তখন ছিল প্রায় সমার্থক। ফলে নেহেরুর উত্তরসূরী কে হবেন, সেই প্রশ্ন নেহেরুর জীবদ্দশার শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কন্যা ইন্দিরার প্রতি নেহেরুর পক্ষপাত কারুর অজানা ছিল না। নেহেরু বংশের ঐতিহ্য ইন্দিরা গান্ধী বহন করে চলেন।

২.৪ নেহেরু এবং বিরোধী পক্ষ

জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও নেহেরু সমালোচনা কণ্ঠরোধ করেননি। কংগ্রেস

নীতির সমালোচনায় বাম এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলি সরব হতে পারত। সংসদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামমোনহর লোহিয়া, জে. বি. কৃপালনী, মিলুমাসানী, এন. জি. রঙ্গ, এ. কে. গোপালন, ভুপেশ গুপ্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংসদের আলোচনায় সভাকক্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠত। কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগী দলগুলি পার্লামেন্টে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কেরলে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে তা অল্পকালের মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ছিল সুস্থ গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বিরোধী এবং অত্যন্ত দুঃজনক।

১৯৫১ সালের নির্বাচনের আগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ''জনমুঙঘ'' দল গঠন করেন। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের নীতি তোষণমূলক বলে এই দল অভিযোগ করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের প্রতি সরকারের আর সহানুভূতিশীল এবং বলিষ্ট নীতি গ্রহণ করা উচিত বলে ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন। কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করার তিনি বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীর প্রবেশ করতে তখন পাসপোর্ট প্রয়োজন হত। ডঃ মুখার্জী এই নিয়ম অমান্য করে কাশ্মীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করায় গ্রেপ্তার হন। কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয় (২৩শে জুন ১৯৫৩)। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃষ্টান্ত নেহেরুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ মিলিয়ে তিনি মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, এন. জি. রঙ্গ, মিনু মাসানী প্রমুখ ''স্বতন্ত্র'' দল গঠন করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে দেখা যায় বিরোধী দলগুলির বক্তব্য দেশের মানুষের মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। লোকসভায় কমিউনিস্টরা প্রায় ১০% ভোট পায়। স্বতন্ত্রের সংগ্রহে ছিল ৮% এবং জনসঙঘের ৭% ভোট। উড়িষ্যা, বিহার, রাজস্থান এবং গুজরাটে স্বতন্ত্র ছিল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

একক ৩ ❑ স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার

গঠন ঃ

৩.০ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি

৩.১ নেহেরুর নেতৃত্বে শিল্প-সংস্কৃতি নীতি

৩.২ সামাজিক ন্যায় বিচার আন্দোলন

৩.০ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে ভাবনা চিন্তা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে স্টালিনের নেতৃত্বে। ভারতীয়রা এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া ১৯৩৪ সালে Planned Economy of India নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর চার বছর পর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। জওহরলাল নেহেরু তার সভাপতি এবং অধ্যাপক টি. কে. শাহ এই কমিটির সচিব নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ারে নেতাদের দৃষ্টি অন্যত্র আবদ্ধ থাকায় ১৯৪৮ সালের আগে কমিটির পক্ষে রিপোর্ট জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের আটজন বিশিষ্ট শিল্পপতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেন। বোম্বাই পরিকল্পনা বা টাটা পরিকল্পনা নামে তা পরিচিত। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম বিশদ রূপ এতে পাওয়া যায়। বিপরীতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি "গণ পরিকল্পনা" পেশ করেন। বোম্বাই পরিকল্পনাতে শিল্পোদ্যোগের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গণ পরিকল্পনায় কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এস. এন. আগরওয়ালা এই সময়ে অন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কিন্তু এর কোনটিই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আবির্ভাব, বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং তুলো, পাট, খাদ্যশস্য প্রভৃতির ঘাটতি যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে পরিকল্পনা মাধ্যমে তা মোকাবিলা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৮ সালে আণবিক শক্তি এবং অস্ত্রোৎপাদন ও রেলপরিবহন মতো কতগুলি শিল্পের দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করে আর কতগুলি শিল্প বেসরকারী হাতে দেওয়া হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নেহেরুর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫১ সালে এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশভাগের ফলে ভারতের অর্থব্যবস্থা যে বৈষম্যের তার প্রতিকার এবং (২) উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতবাসীর মানের উন্নতি এবং পূর্ণতর ও অধিক বৈচিত্র্যময় জীবযনাপনের সুযোগ বৃদ্ধি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছিল ১,৯৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষিতে এবং জলসেচ ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য শতকরা ৪৫.২ ভাগ ব্যয় হয়। শতকরা মাত্র ৪.৯ ভাগ শিল্পে শিল্পবিকাশের প্রয়োজনে ব্যয় হয়। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্তের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল। মোট ৩৭২ কোটি টাকা এই খাতে সংগ্রহ করা হয়। রেলপথ থেকে উদ্বৃত্ত ১১৫ কোটি টাকা পরিকল্পনা

রূপায়িত করতে ব্যয় হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার ফল মোটের ওপর সন্তোষজনক ছিল। ভারতের জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি লাভ করে। অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ কাজ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ স্থিতাবস্থার পর ভারতীয় অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়। কৃষির উৎপাদন ২২ শতাংশ এবং শিল্পোৎপাদন ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আয়তন ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ ব্যবস্থা ভারতের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় প্রধান লক্ষ্য ছিল— (১) জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি (২) দ্রুত শিল্পায়ন (৩) অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং (৪) সম্পদ ও আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমবণ্টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদনের লক্ষ্য ৬১৬ টন ধার্য করা হলেও কার্যত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৫০ লক্ষ টন। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প বেশি গুরুত্ব পায়। কৃষি ও জলসেচের জন্য মোট ব্যয়ের ২০.৯ শতাংশ ধার্য হয়, বৃহৎ শিল্প এবং পরিবহনের ওপর সেক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৪৭.১ শতাংশ। পরিকল্পনায় ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ৪০ লক্ষ টন ধার্য করা হয়ছিল। দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রৌরকেল্লায় তিনটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়। রেলের ইঞ্জিন, ওয়াগন প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হয়। কর্মনিযুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রধানত শ্রমনির্ভর ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভোগ্যদ্রব্যের যোগান-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রাষ্ট্রের উৎসাহ লাভ করে। উন্নয়নের এই ছক বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নামানুসারে “মহলানবীশ মডেল” নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হলেও তীব্র বৈদেশিক মুদ্রা সংকেটর কারণে পরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় সংকোচ করা হয়। পরিকল্পনার মূল কার্যক্রম এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সম্ভব হলে, ভবিয্যতে পরিকল্পনার অন্যান্য দিকগুলি রূপায়নের চেষ্টা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরতা অনেক কমিয়ে অর্থসন স্থানের জন্য ঘাটতি ব্যয় (অর্থাৎ অতিরিক্ত নোট ছাপানো পদ্ধতি) এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা হয়। ঘাটতি ব্যয় থেকে মোট ৯৫৪ টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১০৪৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। জনসাধারণের থেকে ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ ১১৭৮ কোটি টাকা এবং আমানত ও প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি থেকে ২১৬ কোটি টাকা আদায় হয়। পরিকল্পনার প্রয়োজনে ১০৫২ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর হিসাবে সংগ্রহ হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফল আশানুরূপ হয়নি। দ্রব্যমূল্যস্ফীতি ছিল ৩০ শতাংশ, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটে মাত্র ২০ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন। কিন্তু বস্তুত ফলন হয় ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টন। বৈদেশিক লেনদেনের অনুমিত হিসাব ছিল ১,১০০ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৯২০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬১-৬৬। সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথে এবারের প্রধান লক্ষ্য হল—

(১) পরিকল্পনা কালে বাৎসরিক পাঁচ শতাংশ বা তার বেশি কিছু হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে এই হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(২) খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ এবং শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৩) পরবর্তী এক দশক কালের মধ্যে ভারতে শিল্পবিকাশের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ মূলধন এবং প্রয়োজনীয়

উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, যন্ত্রাংশ এবং শক্তি ও জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি

(৪) দেশের জনশক্তি বা লোকবলের সম্পূর্ণ ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কৃষিক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি আবার গুরুত্ব পায়। খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য দশ কোটি টাকা নির্ধরিত হলেও বাস্তবে মাত্র ৭.২ কোটি টন উৎপাদন হয়। দ্রব্যমূল্যস্ফীতি যেখানে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ শতাংশ, সেখানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১.১৩৩ কোটি টাকা। অতিরিক্ত কর বাবদ ২,৮৯২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। বৈদেশিক সাহায্যে পরিকল্পনার ২০ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ হয়। ১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনার কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়।

সমগ্র বিচারে, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফল প্রত্যাশা পূরণ করেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর তিন বছর নতুন কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয়নি। দেশের ভিতর খরা এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে পরিকল্পনা কার্যকর করার মতো অর্থ সরকারের হাতে ছিল না। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে।

৩.১ নেহেরুর নেতৃত্বে শিল্প ও সংস্কৃতি নীতি

১৯৫৬ সালে সমাজতান্ত্রিক আদলে সমাজব্যবস্থা এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যাভিমুখী শিল্পনীতি ভারতে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত থাকার সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত শিল্পনীতিতে এর মূল সন্ধান করা যায়। জাতীয় সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে তার যথাযথ বণ্টন, এই নীতির প্রধান লক্ষ্য বলে ডঃ মুখার্জী বর্ণনা করেন। এর দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শিল্পনীতি এরই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। এর দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের পরিধি বিস্তার ঘটে। ১৭টি শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এগুলি হল— আণবিক শক্তির উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বণ্টন, জাহাজ ও বিমান নির্মাণ, রেল ও বিমান পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন, টেলিফোন এবং টেলিফোনের তার উৎপাদন, এবং ইস্পাত, লৌহ, হীরা, কয়লা, খনিজ তেল, স্বর্ণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ আনবিক শক্তির উৎপাদন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন এবং রেল ও বিমান পরিবহন কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলি নিজেদের সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেলেও সরকার কেরল নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবে।

রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে ১২টি শিল্প চিহ্নিত হয়। এগুলি হল— মেসিনের অংশ এবং বিভিন্ন যন্ত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, অ্যালুমিনিয়াম সড়ক ও সামুদ্রিক পরিবহন, খনিজ শিল্প, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, প্লাস্টিক, রাসায়নিক মণ্ড। এগুলি ক্রমশ রাষ্টায়ত্ত করার লক্ষ্য ঘোষণা করা হল। আপাতত এগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। এমনকি সরকার ইচ্ছা করলে এইসব ক্ষেত্রে কোন বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত। গুরুত্ব বুঝে সরকার এইসব ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারত।

এরপরও বেসরকারী উদ্যোগের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল সরকার যার প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে। সমবায়িক ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠা দেশের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সরকার মনে করত।

ওপরের এই শ্রেণী বিভাগ যে বাস্তবে সর্বদা মেনে চলা হবে, এমন প্রতিশ্রুতি সরকার ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে দেয়নি। বরং বেসরকারী ক্ষেত্রেও প্রয়োজন বোধে সরকার শিল্প গড়ে তুলবে বলে জানানো হয়।

কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনার বৃদ্ধি এবং সম্পদ বন্টনে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার তার পৃষ্ঠপোষকতা করবে বলে জানানো হয়। অর্থনীতির সুক্ষ্ম বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সুদক্ষ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীবৃন্দ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পে অর্থ যোগানের জন্য সরকার-কর্তৃক একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে সরকার কতকগুলি বেসরকারী শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন গঠিত হয়।

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ভারতে শিল্পের বিকাশকে বিশেষ ত্বরান্বিত করতে পারেনি, পরবর্তীকালের মন্দা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম হয়নি। একচেটিয়া পুঁজির বিস্তার ঘটেই চলে। ১৯৭৩ সালে সরকার শিল্পনীতি সংশোধনে বাধ্য হয়।

নেহেরু কেবল রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবুক প্রকৃতির। ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর লেখা Discovery of India গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আত্মচরিত (Autobiography) গ্রন্থে নেহেরু সমকালীন ভারতের পটভূমিকায় তাঁর জীবন বর্ণনা করেছেন। জেল থেকে কন্যা ইন্দিরাকে লেখা চিঠিগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহেরুর কবিসুলভ উদার ভাবুক অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ভারতবাসীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে তিনি উৎসাহী ছিলেন। জাতীয় স্তরে সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমী এবং ললিত কলা আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে এসময়ে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। করে। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় জওহরলালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর.)। বিজ্ঞান এবং কারিগরী ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে বহু গবেষণাগার স্থাপিত হয়র। ১৯৪৮ সালে পরামাণবিক গবেষণার জন্য অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি। নেহেরু বলতেন— ভারি শিল্প হল আধুনিক ভারতের মন্দির। ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি প্রচারে নেহেরু বিশেষ গুরুত্ব দেন।

৩.২ সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং নির্দেশাত্মক নীতিসমূহে সকলের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। নেহেরু দেশবাসীকে এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পালনে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে বারবার নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে সামাজিক ন্যায়বিচারকে স্বীকৃতি জানানো হয়। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে— উপজাতি কল্যাণ, তফসিলি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৩) নারী প্রগতি (৪) গ্রামোন্নয়ন এবং (৫) শিক্ষা বিস্তার।

উত্তর-পূর্ব ভারত, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের পাহাড় এবং বন মিলিয়ে এদেশে প্রায় ৪০০ উপজাতি গোষ্ঠীর বাস। ভারতের মোট জনসংখ্যার তারা প্রায় চার শতাংশ। ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নম্বর ধারায় উপজাতিদের সামাজিক মানোন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে (আধুনিক) শিক্ষার বিস্তারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামাজিক শোষণ এবং বৈষম্যের থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় জীবনের মূল ধারায় তাদের অন্তর্গত করার লক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। উপজাতিদের জন্য

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা ভারতে সামাজিক বিভাজনের অন্যতম কারণ। দলিত নেতা বি. আর. আম্বেদকর নিজে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণায় দূরে রাখতেন। অন্ত্যজদের "হরিজন" নামে গান্ধীজী অভিহিত করেন। তাদের দেবালয়ে প্রবেশের অধিকারের জন্যও তিনি সংগ্রাম করেন। ভারতীয় সংবিধানে ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং ৩৩০-৩৪২ ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার উল্লেখ রয়েছে। ১৯৫৫ এবং ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের দুটি আইনে অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী পুরুষরা এক স্ত্রীর বর্তমানে অন্য দার পরিগ্রহ করতে পারে না। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এখনও প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

গ্রামীণ উন্নয়নের পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ১৯৫২ সালের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী (Community Development Programme)। ৫৫টি ব্লক নিয়ে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। প্রতিটি ব্লকের নিচে ছিল ১০০টি গ্রাম। পরবর্তী এক দশকের মধ্যে সমস্ত দেশকে এই কর্মসূচীর অধীনে আনা হয়। এই প্রকল্পটি কার্যকর করার দায়িত্বে ছিলেন ৬০০০ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (ব্লক ডেভালেপমেন্ট অফিসার, সংক্ষেপে বি.ডিও) এবং ৬ লক্ষ গ্রামসেবক। নেহেরু এই পরিকল্পনাকে ভারতের উজ্জীবনের প্রতীক-রূপে গণ্য করলেও শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিকতার ফাসে এর গতি রুদ্ধ হয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নিযুক্ত বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি-র অনুসন্ধানে ধরা পড়ে গ্রামের গরীব মানুষদের তুলনায় এই কর্মসূচী থেকে গ্রামের বিত্তবান শ্রেণীর বেশি সুবিধা লাভ করছে। এরপর পঞ্চায়েৎ মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অধিক সংখ্যক গ্রামবাসীকে কাজে যুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয়।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারের ওপর সরকার গুরুত্ব দেয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬.৬ ভাগ ছিল শিক্ষিত। গ্রামে এই হার ছিল আরও কম— মাত্র ছয় শতাংশ। সংবিধানে বলা হয়েছিল ১৯৬১ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও সকলকে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি।

একক ৪ ❑ বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)

গঠন ঃ

৪.০ **বিশ্বরাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)**

৪.১ **ভারত ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ, নির্জোট আন্দোলন**

৪.২ **ভারত ও বিশ্ব শক্তিবর্গ**

৪.৩ **ভারত ও চীন**

৪.৪ **ভারত ও পাকিস্তান**

৪.৫ **ভারত ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ সমূহ**

৪.৬ **অনুশীলনী**

৪.৭ **গ্রন্থপঞ্জী**

৪.০ বিশ্বরাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৪৭-৬৪) ঃ

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা জরুরী। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়। ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয় ঘটে এবং মিত্রশক্তি বিজয়ী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল না। এল ঠাণ্ডা লড়াই (cold war)-এর যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলি। অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদের মতাদর্শ বিশ্ব থেকে নির্মূল করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত রূপ ধারণ করতে শুরু করে। ইয়াল্টা ও পট্সডাম সম্মেলনে এই তিক্ত সম্পর্ক স্পস্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সুল্টন বক্তৃতা সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে সাহায্য করে। চার্চিল কমিউনিস্টদের ‘‘বিশ্বাসঘাতক ও সভ্যতার শত্রু’’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ১৯৪৭-এর ১২ মার্চ ট্রুম্যান নীতি ও ৫ জুন মার্শাল পরিকল্পনা এর ঘোষণা সরাসরি ঠাণ্ডা লড়াই এর সূচনা করেছিল। স্ট্রুমান নীতিতে বলা হয়েছিল বিশ্বের যে অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সামরিক সাহায্য দেবে। আর বিশ্বের অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করে মার্শাল পরিকল্পনা। এই পদক্ষেপগুলির সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তরফের থেকে বলা হয়েছিল— ‘‘আমেরিকাকে আর্থনীতিক অনগ্রসর এলকাগুলিতে

সামরিক অভিভাবক বজায় রাখতে হবে যাতে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করতে না পারে।"

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র তার আগ্রাসী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় চরিত্রের কারণে কোন বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব শুধু যে অপছন্দ করত তা নয়, তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যেকোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি ১৯৪৮ সালে NATO গঠন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি ছিল ঠাণ্ডা লড়াই। এই ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বুঝতে হবে।

৪.১ ভারত ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ ঃ নির্জোট আন্দোলন এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ঘোষিত ভিত্তি ছিল জোটনিরপেক্ষ নীতি (Policy of Non-alignment)। জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রবক্তা ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধামন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। ঠাণ্ডা লড়াই এর সূচনাপর্ব থেকেই জোটবদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া তাঁদের নিজেদের পক্ষে সমর্থন খুঁজছিল। কিন্তু এই দুই শান্তিজোটের কোনটিই ভারতের কাছ থেকে স্থায়ী সমর্থন ও প্রশ্নাতীত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পায়নি। ভারত এই দুই গোষ্ঠীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এটাই ছিল ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা জোট নিরপেক্ষতা। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বলেছিলেন— "ভারত সরকারের কতকগুলি মৌলিক উদ্দেশ্য অছে। সেগুলি হল ভারত তার স্বাধীনতা বজায় রাখবে, জাতিগত বৈষম্য ভারত থেকে অপসৃত হবে এবং দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অশিক্ষা ভারত থেকে দূর করা হবে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে প্রতিটি বিতর্কিত বিষয়ের প্রতি স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে, কোন বৃহৎ শক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে নয়।" কে. এম. পানিক্কর বলেছেন— ভারত নিজেকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেনি, জোটনিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে নিজের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেছিল।

১৯৫০-এর দশকের জোটনিরপেক্ষ নীতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। এই নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছিল। কোন পক্ষ অবলম্বন না করায় ভারতের কোন বড় যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে, এই অর্থে জোটনিরপেক্ষতা নীতিকে ভারতের প্রতিরক্ষা নীতিও বলা চলে। ভারতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তার জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা। এর ফলে নিজস্ব স্বার্থ পূরণে ও নীতি নির্ধারণে ভারতের অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হবে। তা উপনিবেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষের পতনে সহায়ক হবে এবং এশিয়ার নবজাগৃতিকে শক্তিশালী করবে। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল একটি 'তৃতীয় অঞ্চল'-এর রক্ষণ ও সম্প্রসারণ যা—শক্তিরক্ষার জন্য মধ্যস্থের কাজ করবে এবং তা পরস্পর বিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী অংশ হিসাবে বিরাজ করবে। ভারতের এই জোট নিরপেক্ষতাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা মনে করলে ভুল হবে। এই জোটনিরপেক্ষতা ছিল আন্তর্জাতিক রাজীনতিতে অংশগ্রহণ করার একটি কৌশল। ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত থেকে এই জোট নিরপেক্ষ নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ভারতের নেহেরু, মিশরের নাসের এবং যুগোশ্লোভিয়ার টিটো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শক্তিসাম্য নীতির প্রবক্তরা অবশ্য জোটনিরপেক্ষ নীতির কার্যকর ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শান্তির ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। একটি দেশ এই শক্তিসাম্য ধরে রাখতে পারে তার সামরিক শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু এর উত্তরে নেহরু বলেছিলেন, কোন জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে সে কখনোই নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকতে পারেনা। বিপানচন্দ্র বলেছেন নির্জোট বলতে নেহেরু কখনোই নিরপেক্ষতা বোঝাননি। কোন আন্তর্জাতিক বিষয়ের গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতা উপভোগ করতে ও সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নেহেরু নিজেও বলেছিলেন— "ঠাণ্ডা লড়াই ও তার সংশ্লিষ্ট সামরিক চুক্তিগুলির ক্ষেত্রে আমরা নির্জোট। বিশ্বের পক্ষে ও আমাদের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা আমরা নির্দিধায় নিন্দা করব।'

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে প্রাথমিক পর্বে ভারতের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করেছিল বিদেশী রাষ্ট্রের উদার আর্থিক সাহায্যের ওপর। জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে ভারত তাই কোন বৃহৎশক্তিরই বিরাগ ভাজন হতে চায়নি। সকলকেই সে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিল। আর্থিক নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় অর্থনীতি অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতের আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর মার্কিন ডলার এসেছিল। আবার ১৯৫০-এর দশকে কিছু কিছু ভারী শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত সোভিয়েতের সহযোগীতা পেয়েছিল।

আবার অনেকে জোটনিরপেক্ষ নীতির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় বা ১৯৬৫ সালে ভারত পাক যুদ্ধে ভারত জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে শক্তিসাম্য নীতির ওপর অনেক বেশী নির্ভর করেছিল।

জোট নিরপেক্ষ নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে নেহেরু সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৯-৫০ সাল নাগাদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়া যখন সংগ্রাম চালিয়েছিল, তখন ভারত কোরিয়ার সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল এবং কোরিয়ার সংকটের জন্য সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পূর্ণ মদতে ইস্রায়েল মিশরের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইস্রায়েলকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করে এবং ইস্রায়েলের মিশর আক্রমণ রাষ্ট্রসংঘের সনদের পরিপন্থী বলে অভিযোগ করে। কিন্তু একই বছর হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরীতে অনুপ্রবেশ করে। তখন কিন্তু ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নেয়নি। সমাজতন্ত্র বাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ অভিযোগ করেছিলেন মিশর ও হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছে।

১৯৫০-র দশকে জোট নিরপেক্ষনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেই কেবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাবমুক্ত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও জোটনিরপেক্ষ নীতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই ১৯৪৭-এর মার্চে ভারত দিল্লীতে এশীয় দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি সম্মেলন (Asian Relations conference) আহ্বান করে। এই আলোচনা বেসরকারী স্তরে হলেও অনেকে মনে করেন এই সম্মেলন ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। জাতিগত বৈষম্যের বিরোধীতা করা হয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পরিবর্তে স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় এশিয়ান রিলেশনস্ কনফারেন্সের আহ্বায়ক ছিল নেহেরু। ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে এই সম্মেলন বসে। বিভিন্ন এশীয় দেশ ছাড়াও এই সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা

মহাদেশের ইথিওপিয়া ও মিশর এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ফলে এই সম্মেলন কেবল এশিয় দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

১৯৫০-এর দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত পাঁচটি নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতিগুলি 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। নীতিগুলি ছিল—বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অপরদেশকে আক্রমণ না করা, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সাম্য ও পারস্পরিক সহযোগীতা নীতি মেনে চলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতে আসেন। 'পাঞ্চশীল নীতি' গ্রহণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর যুগোশ্লোভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটো ভারতে আসেন। নেহেরু ও টিটো একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বো শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনকে 'জোট নিরপেক্ষ' আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা বলা যায়। এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম জোট নিরপেক্ষ (Non-alignment) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কলম্বোতে যোগদানকারী শক্তিগুলি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে মিলিত হয়। বান্দুং সম্মেলন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃত। বান্দুং সম্মেলন ছিল বিভিন্ন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন সত্তা ঘোষণার সর্বপ্রথম যৌথ প্রয়াস। এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রতিনিধিরা বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। বান্দুং সম্মেলনে কতগুলি নীতি গৃহীত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা, সকল বর্ণ ও জাতির সমান অধিকার, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপ্রয়োগ না করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি। তাছাড়া এই সম্মেলনের প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্টাইনের আরবদের অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব হয়েছিলেন।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রে নেহেরু মিশরে রাষ্ট্রপতি নাসের, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সুকর্ণ, ঘানার নক্রমা এবং সুযোশ্লোভিয়ার টিটোর কাছ থেকে মূল্যবান সহযোগীতা পেয়েছিলেন। এই নেতাদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালের ৫ জুন থেকে ১২ জুন কাইরোতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়রো সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষতা, বিশ্বশান্তি রক্ষা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি আদর্শের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছিল। কায়রো সম্মেলনের কিছুদিন পর ১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুগোশ্লোভিয়ার বেলগ্রেড জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন বেলগ্রেড সম্মেলন ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল সন্দেহ নেই।

৪.২ ভারত এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্বে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত; তখন ভারতবর্ষ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের জোট নিরপেক্ষতা বস্তুত সোভিয়েত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র কোন পথ চিহ্নিত করতে পেরেছিল কিনা

অথবা এই দুই বৃহৎ শক্তির যে কোন একটি প্রয়োজন মিটিয়ে ছিল কিনা তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে; ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সমাজবাদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা সূত্রে আনার এও ঠিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সময় এত দেশের শাসকবর্গের চিন্তা ভাবনার পশ্চাতে পাশ্চাত্য উদারনীতি বাদের প্রভাবও কম ছিল না।

অন্যান্য যে কোন দেশের মতো ভারতের বিদেশনীতি ও প্রভাবিত হয়েছে বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই মার্কিন শিবিরে যোগ দিয়েছিল। কাশ্মীর সমস্যা কেন্দ্র করে পাক ভারত সম্পর্কের জটিলতা দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হয়েছে, অপরদিকে ভারতের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয় ভারত মহাসাগর অঞ্চল এবং বস্তুত পৃথিবীর জলভাগের উপর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভৌগলিক কারণ বশত J. C. Kunelre বলেন ভারতবর্ষ কমিউনিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ উপনিবেশিক শাসনটি জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দলকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগঠন জ্ঞান করত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন সোভিয়েতের অনুমোদন লাভ করত বলে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শুরুতে সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেনি, পরে কাশ্মীর প্রশ্নে মার্কিনের মিত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোটদান ভারত সোভিয়েত বন্ধুত্বের বুনিয়াদ রচনা করে, অন্য দিকে পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৪৯-এর অক্টোবর এ গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হবার পর অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ভারতই প্রথম ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতের এই মনোভাব মার্কিন প্রশাসনের মনঃপুত হয়নি।

পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার অধিবাসী গণ ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি কামনা করে আন্দোলন শুরু করলে ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মনোভাবের পার্থক্য দেখা দেয়। ১৯৫৫ সালে সোঃ ইউঃ গোয়াকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে রুষ্ট হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস মনে করতেন গোয়া পর্তুগালের ক্ষমতাধীন, ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর শুরুতে ভারত যখন গোয়া অধিকার করে তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হৈচৈ করে। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া দখল দিতে ভারতের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক পশ্চিমী শক্তি ভারতের বিরোধীতা করে, কিন্তু জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সমর্থন লাভ করেছিল ভারত।

১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় ভারতের প্রতি সহযোগিতা সহানুভুতির মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন শুভেচ্ছা অর্জনের চেষ্টা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সাহায্যের আবেদনে সারা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনেডি এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান একটি বৈঠকে মিলিত হন। মার্কিনের কাছ থেকে ভারত অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। একই সময় আশা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে মিগ বিমান তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য চুক্তি করেছিল। প্রধানত মার্কিন উদ্যোগে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র নির্দ্ধারণ করা যায়নি।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান হঠাৎ কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতের উপর আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানের রাষ্টপতি আমুর খানের অনুরোধ সত্ত্বেও মার্কিন সরকার কোন হস্তপেক্ষ করেনি। চীন যাতে ঐ

যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে সে সম্পর্কে অবশ্য ব্রিটিশ সরকার হুশিয়ারী দেয়। সোভিয়েত পরিষ্কার বক্তব্য পেশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশকেই সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করে। এই সময় ভারত পাক বিরোধ মীমাংসায় সোঃ ইউঃ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ৩-১০ তাসখণ্ড শহরে ভারত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানর রাষ্ট্রপতি আমুর খাঁ আলাপ আলোচনার পর দুইদেশের বিরোধের মীমাংসা করে সম্পর্ক স্বাভাবিকের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

৪.৩ ভারত-চীন সম্পর্ক

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ যেসব দেশে ঘটেছিল ভারত চীন তার মধ্যে অন্যতম। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। চীন ভারতীয় পণ্যসামগ্রী সমাদর লাভ করত। বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে চীনে বিস্তার লাভ করেছিল। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে চীন থেকে ভারতে আসেন। বিংশ শতকে চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসনের সমালোচনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সরব হয়েছেন। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারত প্রথম তাকে স্বীকৃতি জানায় (৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৯)। পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের সদস্যপদ লাভের জন্য ভারত প্রচার চালিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী সো-এন-লাই-এর ভারত সফর কেন্দ্র করে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত চীনকে সমর্থন করেছিল। ১৯৫৪ সালে ভারত এবং চীনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়। পঞ্চশীল বা পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে ঃ

(১) একে অন্যের ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন করবে।

(২) একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে।

(৪) পরস্পরকে মর্যাদা এবং সুবিধা দান করবে।

(৫) শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি অবলম্বন করবে।

তিব্বতে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ভারত-চীন সম্পর্কে ফাটল ধরে। ১৯৫০ সালে দালাইলামা এবং পাঞ্চেতলামার সঙ্গে যুক্তি করে চীন তিব্বতের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ভারত এবং চীনের মধ্যে এর ফলে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। চীনা সৈন্য ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সৌধ এন লাই ভারত সফরে আসেন। পূর্বদিকে ম্যাকমোহন লাইনকে চীন ভারতের সঙ্গে সীমান্তরেখা হিসাবে স্বীকার করলেও উত্তরে সীমান্ত রেখা তিব্বতের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হবে বলে তিনি জানান।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আকসাই চীন অঞ্চলে প্রহরারত ভারতীয় সেনাদের চীন গ্রেপ্তার করে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীন বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হয়। দালাইলামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। লাদাখের এক বিরাট অংশ চীন অধিকার করেছে বলে ভারত অভিযোগ করে। চীনের মানচিত্রে ভারতের এক বিরাট অংশ চীনের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখানো হয়েছে; সেখানে চীন রাস্তাঘাট এবং বিমান অবতরণ ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে— এই মর্মেও ভারত আপত্তি জানায়।

১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর লাদাখ ও নেফা অঞ্চলে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত এই যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। চীনা সৈন্য ভারতের অভ্যন্তরে দ্রুত গতিতে প্রবেশ করে। ২১শে নভেম্বর চীন একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তান চীনের হাতে তুলে দেয়। বিনিময়ে পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে চীন-সোভিয়েট বিরোধ ঘনীভূত হলে ভারতকে সোভিয়েট আরও সাহায্য করে। চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইদানীং দুই দেশের পক্ষ থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। চীন-ভারত বাণিজ্যের জন্য নাথুলা গিরিপথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

৪.৪ পাক-ভারত সম্পর্ক

ভারতের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিরোধিতা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই বিরোধের প্রধান কারণ চারটি ঃ (১) উদ্বাস্তু সমস্যা, (২) কাশ্মীর সমস্যা, (৩) জল-সংক্রান্ত বিরোধ এবং (৪) পাকিস্তানের পশ্চিমী শক্তিজোটে যোগদান। প্রথম দুটি সমস্যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য, একক ১.২ এবং ১.৩)

সিন্ধু নদের জল বণ্টন সমস্যা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ। সিন্ধু নদের যেসব শাখা পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার সব কটির উৎস ভারতে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয়, সিন্ধুনদের জল ভারতের অধিকারভুক্ত হলেও, জলসমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানকে সময় দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের সময়ে পাকিস্তান আশঙ্কা প্রকাশ করে এর ফলে তার অংশে সিন্ধুনদের জল কম প্রবাহিত হবে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহেরু পাক-প্রধান আইয়ুব খাঁ-র সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তী দশ বছরের জন্য ভারত পাকিস্তানকে চেনাব, ঝিলাম এবং সিন্ধু নদের জল ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানকে জল সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে বলা হয়। এজন্য অন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারত পাকিস্তানকে সাহায্য করতে রাজি ছিল। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সময়েও পাকিস্তান আপত্তি প্রকাশ করেছিল। পাকিস্তানের এই প্রসঙ্গে কিছু দাবি ভারত মেনে নিয়েছে।

ভারত নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও পাকিস্তান শুরু থেকে পাশ্চাত্য শক্তিজোটের সঙ্গী হয়েছে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তিজোট (SEATO) এবং বাগদাদ চুক্তিতেও (CENTO) পাকিস্তান স্বাক্ষর করে। জাতিপুঞ্জে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সমর্থন পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বার্থ-বিরোধী প্রতিটি প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে। ভারত-চীন যুদ্ধের পর পাকিস্তান চীনের সাহায্য লাভের জন্যও তৎপর হয় এবং "আজাদ কাশ্মীর"-এর একটি অংশ চীনকে সমর্থন করে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে বেসরকারি বিমান চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর প্রসঙ্গে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হয়। তাসখণ্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আইয়ুব খানের চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (জানুয়ারি ১৯৬৬)।

৪.৫ ভারত এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ভারত শুরু থেকেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ নির্জোট আন্দোলনে নেহেরুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বর্মার (বর্তমানে মায়ানমার) প্রধানমন্ত্রী উ নু ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সমর্থন করেন। ভারতের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতিতে তাঁর কিছুটা অবদান ঢাকতে পারে বলে মনে করা হয়। নেপালের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভারত দেয়। ইন্দো-চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত মত প্রকাশ করে। সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) রাষ্ট্রে বহু সংখ্যক তামিল অধিবাসীদের বসবাস ভারতের সঙ্গে তখন পর্যন্ত সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়নি। বরং প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন।

৪.৬ অনুশীলনী

(১) ১৯৪৭-এ নব প্রতিষ্ঠিত ভারত রাষ্ট্রের সমস্যাগুলির স্বরূপ সম্পর্কে কি জানেন?

(২) ভারত রাষ্ট্রের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে কি জানেন?

(৩) স্বাধীন ভারত দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে কি জানেন?

(৪) ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে কি জানো?

(৫) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কি জানেন?

(৬) নেহেরু শাসনাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ কিভাবে হল?

(৭) নেহেরু শাসনাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ভারতে সামাজিক ন্যায় বিচারের আন্দোলন সম্পর্কে কি জানেন?

(৮) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে কি জানেন?

(৯) ভারত-পাক ও কাশ্মীর সমস্যা (১৯৬৪ পর্যন্ত) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Paul R. Brass : The Politics of India Since Independence.
2. Pranab Bardhan : The Political Economy of Development in India.
3. Francine R. Frankel : India's Political Economy 1947–77 : The Gradual Revolution.
4. S. Bose & A. Jalal (edn.) : Nationalism Democracy and Development : State and Politics in Development.

5. Francine R. Frankel, Z. Hasan., R. Bhargava and B. Arora (edn) : Transforming India.
6. Bipan Chandra, Aditya Mukharjee and Mridula Mukherjee : India After Independence.
7. Partha Chatterjee : The Nation and its Fragments.
8. বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি ঃ ভারতবর্ষ ঃ স্বাধীনতার পর।

PAPER IV

পর্যায় — ১

একক ১ ❑ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পরিধি

গঠন ঃ

১.১ ৭প্রস্তাবনা

১.২ ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা

১.৩ নিদর্শন, উৎস ও ইতিহাস

১.৪ ইতিহাস-রাচনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা

১.৫ জাতীয় এবং বিরোধী ইতিহাস

১.৬ বিশেষীকরণের উদ্ভব—অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস

১.৭ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

১.৮ উপসংহার

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ আকর গ্রন্থসূচী

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককের লক্ষ্য হল ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রয়োগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সাধারণ দর্শন ও অন্যান্য সমবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে ছাত্রদের কাছে এক প্রাঞ্জল বিবরণ উপস্থাপিত করা। আলোচনার মূল বিষয় অবশ্যই ইতিহাসের নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মান।

১.২ ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা

বিষয় হিসাবে ইতিহাস এই পৃথিবীর মতই প্রাচীন। সাধারণভাবে ইতিহাস শব্দটির দুটি অর্থ প্রচলিত আছে। অতীতে যা ঘটেছিল এবং আমাদের সমষ্টিগত স্মৃতি ও ইতিহাসবিদ্‌দের রচনাতে অতীত কীভাবে দেখা দেয়—ইতিহাস বলতে আমরা দুটিকেই বুঝি। ইতিহাস রচনা এক প্রাচীন ও সম্মানজনক পেশা। বিজ্ঞানের ক্ষত্রে না ঘটলেও শিল্পকলার মত ইতিহাস রচনাও প্রাচীন বিশ্বে উৎকর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। ট্রাজেডি রচনায় সোফোক্লেসের মত ইতিহাস রচনায় থুকিদিদেসও চরম দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এখনও ইতিহাসের কোনও সুনির্দিষ্ট বা নিখুঁত সংজ্ঞাকে এত অযৌক্তিক প্রস্তাব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চিরাচরিত পদ্ধতি হল তার মূল উদ্দেশ্যগুলির উপর নজর দেওয়া, যাকে ইতিহাসের দর্শন বলা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হ্যালিকারনেউসের প্রাচীন ইতিহাসবিদ ডায়োনিসাসকে উদ্ধৃত করা অসংগত হবে না : ''ইতিহাস হল (অতীতের) দৃষ্টান্তগুলি থেকে আহরণ করা এক দর্শন।'' ইতিহাসবিদের লক্ষ্য হল মানুষ, দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত, লোককথা, চিন্তাভাবনা—এইসব বিভ্রান্তিকর শৃঙ্খলাবিহীন সামাজিক রূপগুলিকে এক নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও রূপান্তরের প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে তাঁর অনন্য, সজীব প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইতিহাস হল তার সম্পূর্ণতা ও বহুত্ব নিয়ে অতীতের মানবজীবন সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী (his or her story)—যা বলা হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে।

ফ্রান্সিস বেকনের মতে, ''ইতিহাস এমন এক বিষয় যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে।'' আবার ওয়াল্টার র‍্যালি বলেন যে, ''সব ইতিহাসের লক্ষ্য হল অতীতের প্রসার দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাদান করা, যা আমাদের ইচ্ছা ও কাজকর্মকে পরিচালনা করবে।'' জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিক ভন শ্লেজেল ইতিহাসবিদ্‌দের ''বিপরীতমুখী ভবিষ্যদবক্তা'' ও ইতিহাসকে 'বিপরীতমুখী ভবিষ্যদবাণী' বলে অভিহিত করে বিষয়টিতে এক দার্শনিক মাত্রা যোগ করেন।

কোনও কোনও ইতিহাসবিদ ইতিহাসকে ধর্মীয় বিকাশের নিরিখে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, লিব্‌নিজের কাছে ইতিহাস হল ''ধর্মের প্রকৃত প্রকাশ।'' প্রায় একই ধর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় লেকির কাছ থেকে, যাঁর মতে, ''ইতিহাস হল নৈতিক বিপ্লবগুলির নথি ও ব্যাখ্যা'' লিব্‌নিজের মত থেকে সরে গিয়ে লেকি অবশ্য ধর্মের ধারণাকে আচারসর্বস্বতা থেকে নৈতিকতার স্তরে রূপান্তরিত করেন, যা তাঁর মতে চিরকালীন ও বিশ্বজনীন।

ঊনবিংশ শতকের বহু ইতিহাসবিদ্ ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজাকে নিয়ে আসেন। নিঃসন্দেহে ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা এই ধারণাকে উৎসাহ দেয়। বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল এই কারণে সহজেই বলতে পারেন যে, ''পৃথিবীতে মানুষ যা সাফল্য অর্জন করেছে তার ইতিহাস আসলে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস যাঁরা এখানে তাঁদের কাজ করেছেন। ''আর ডব্লু এমারসনের বক্তব্য আরও সংক্ষিপ্ত, ''মূলত ইতিহাস বলে কিছু নেই, আছে শুধু জীবনী।''

বিশ শতকের প্রথম দিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে ইতিহাস দুটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই প্রশ্নগুলির কেন্দ্রে থাকে দুটি বিষয়—আত্মগত ও বস্তুনিষ্ঠা চিন্তা। ইতিহাস হল অতীতের এক কাহিনী যা নির্মিত হয় আত্মগত বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, অর্থাৎ তৎকালীন ইতিহাসবিদ্‌দের বদ্ধমূল ধারণাগুলির প্রেক্ষিতে— এমন এক ধারণার জন্ম দেন বেনেডিটো ক্রোশ, যিনি সব ইতিহাসকেই ''এক সমকালীন ইতিহাস'' বলে অভিহিত করেন। এই ধারণাকে আরও প্রসারিত করে পরে কার্ল বেকার বলেন, ''ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে ইতিহাসের তথ্যের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, যতক্ষণ না তিনি সেগুলিকে সৃষ্টি করেন।'' মাইকেল ওকসটের মতে, ''ইতিহাস হল ইতিহাসবিদের অভিজ্ঞতা, তা নির্মাণ করার একমাত্র উপায় হল ইতিহাস রচনা করা।'' শেষে আর জি কলিংউড বলেন, ''ইতিহাস হল ইতিহাসবিদের মনে অতীতের অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাভিনয়।''

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রবক্তারা কলিংউডকে কঠোর সমালোচনার মুখে দাঁড় করান। এই গোষ্ঠীর সব থেকে শক্তিশালী তাত্ত্বিক ই এইচ কার বলেন যে, ইতিহাসবিদের উচিত এক দক্ষ উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করা যিনি তাঁর বর্তমান পটভূমিতে অতীতের তথ্যগুলি সাজাতে সক্ষম। 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে কার এই বিষয়টিকে ''ইতিহাসবিদ ও তাঁর তথ্যগুলির নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক অন্তহীন আলাপচারিতা'' হিসাবে বর্ণনা করেন।

মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার এই আদর্শ অবস্থানকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, শ্রেণী-সংগঠিত মানুষেরা যেহেতু ইতিহাসকে সুকৌশলে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারে

এবং ইতিহাসবিদও যেহেতু কোনও একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু খাঁটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা কখনওই সম্ভব নয়। সুতরাং মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেন। তাঁরা সমাজের পরিকাঠামোগত বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করেন এবং তার পরিণামে উপরিকাঠামোগত ও রাজনৈতিক রূপান্তরের দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিণামবাদ এর পরিধিকে সংকুচিত করে ফেলে। নিম্নবর্গের মানুষ সংক্রান্ত ইতিহাসবিদরা এই অর্থনৈতিক পরিণামবাদকে কিছুটা সংশোধন করতে পারলেও তাঁদের নিজেদের পরিণামবাদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

বিশ শতকের শেষ দিকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা ইতিহাসের ধারণাকে এক সম্পূর্ণ নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেন। তাঁদের মতে, উচ্চস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ঘটনার সমাহারের যে বিশৃঙ্খল কাহিনীকে আমরা ইতিহাস বলি— তার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ব্যক্তি, দেশ, জাতি, গোষ্ঠী সকলেরই অতীত ও বর্তমানের কিছু অভিজ্ঞতা ও কাহিনী বলার থাকে। এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নয়, তা এমন কী আঞ্চলিক ও স্থানীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতি, রীতিনীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ ইতিহাসবিদরা হলেন কুশলী কাহিনীকার, জেমস্ ও কনোরের মতে যাঁরা "বিভিন্ন আখ্যানশৈলীর অনুসন্ধান করেন এবং মানুষদের ও ঘটনাবলীকে বিশেষ একটি শৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাজিয়ে তোলেন। মার্কসের কাছে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক প্রহসন মাত্র। কিন্তু ফরাসী উচ্চ শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি বিজয় ও ট্রাজেডির প্রতীক। কম্যুনিস্ট-বিরোধী ইতিহাসবিদদের চোখে ঠাণ্ডা যুদ্ধ হল শুভ ও অশুভের যুদ্ধ। আবার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে তা দুই সাম্রাজ্যের যুদ্ধ।

হেডেন হোয়াইটের প্রবন্ধগ্রন্থ 'দি কনটেন্ট অফ দি ফর্ম' এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আধুনিক রচনা। হোয়াইট মনে করেন যে, ইতিহাসবিদ তাঁর আখ্যানশৈলী নির্বাচন করা মাত্র বিষয় ও তাদের ক্রমিক বিন্যাস নির্ধারিত হয়ে যায়। কোন বাস্তব ঘটনা বেশী গুরুত্ব পাবে ও কোনটি পাবে না— এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আখ্যানশৈলী যথেষ্ট সহায়ক হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত মতাদর্শের ফলে বাস্তব ঘটনার ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রকাশভঙ্গির কোনও সংজ্ঞাও দেওয়া হয়নি বা সমস্যাগুলিও নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে ইতিহাস রচনার এক প্রধান সমস্যার দিক থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা চোখ সরিয়ে নিয়েছেন।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও, উত্তর-আধুনিকতাবাদ ব্যাখ্যা করেছে কেন প্রতিটি প্রজন্ম বা ঐতিহাসিক যুগ ইতিহাস পুনর্রচনা করে এবং কেন কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ইতিহাসবিদরা অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। উত্তর আধুনিকতাবাদের যুক্তি-এই যে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কাহিনীর পরিবর্তন ও প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী, যা নির্ভর করে কে এই কাহিনী রচনা করছেন তাঁর উপর। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস রচনা ও পুনর্রচনার মধ্যে মোটা দাগের এক যুক্তি আছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে উন্নয়নগত আলোচনাগুলির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়।

১.৩ নিদর্শন, উৎস ও ইতিহাস

লিখিত ও কথিত শব্দ, ভূখণ্ডচিত্রের রূপ, শিল্পকর্ম, সৃজনশীল সাহিত্য, ললিতকলা এবং আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র—মানুষের অতীতের কাজকর্মের যে কোনও নিদর্শনকে ইতিহাসের এক মূল্যবান সূত্র বা উৎস মনে করা হয়। ইতিহাসের উৎস-উপাদানগুলি বৈচিত্র্যময়, যার প্রতিটিই দাবী করে এক বিশেষ দক্ষতা। আর এই কারণেই কলা ও সমাজবিজ্ঞানে ইতিহাস এক অনন্য স্থানের অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা, যে এলাকাতে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই স্থানটির গুরুত্ব নির্ণয় এবং প্রাপ্ত সামরিক বার্তাগুলি পরীক্ষার কাজ সামরিক বিষয় সংক্রান্ত ইতিহাসবিদের পক্ষেই করা সম্ভব। একই ভাবে ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডে সংগঠিত সাধারণ

ধর্মঘটের এক সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও ট্রেড ইউনিয়নের নথি, সংবাদপত্র ও রেডিওতে প্রচারিত সংবাদ এবং এগুলির সঙ্গে এখনও যে সব ধর্মঘটকারী জীবিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলি পরীক্ষা করা। আবার প্রাক্-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ নির্ভর করে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সংরক্ষণশালার সূত্রগুলি ছাড়াও ইউরোপীয় ও আরব পর্যটকদের সমকালীন পর্যবেক্ষণ ও প্রজন্মবাহিত মৌখিক ঐতিহ্যের উপর।

ইতিহাসের সূত্র বা উৎসগুলিকে মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়— প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক। এই দুইয়ের মধ্যে তেমন স্পষ্ট কোনও বিভাজনরেখা নেই। প্রাথমিক বা মৌলিক সূত্র বললে বোঝায় যে ঘটনা বা চিন্তাধারার কথা বলা হচ্ছে, তার সমসাময়িক নিদর্শন। কিন্তু এই সমসাময়িক শব্দটির বিস্তৃতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ইতিহাসবিদরা সচরাচর সেইসব নিদর্শনগুলি পছন্দ করেন, যেগুলি স্থান ও কালের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির সব থেকে নিকটবর্তী। অবশ্য ঘটনাবলী থেকে বহু দূরে অবস্থিত সূত্রগুলিরও নিজস্ব তাৎপর্য আছে। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ওই বিপ্লবের ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে, প্রাথমিক সূত্র বলতেই সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বা পক্ষপাতমুক্ত কোনও সূত্র বোঝায় না। বহু প্রাথমিক সূত্র ত্রুটিপূর্ণ, বিভ্রান্তিপূর্ণ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয় এবং তারা সচেতনভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। ইতিহাসবিদের দায়িত্ব হল সূত্রগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে এই বিচ্যুতি বা বিকৃতিগুলি বর্জন করা। সূত্রগুলির উপরোক্ত দুটি ভাগের প্রভেদ নির্ণয় করা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন একই রচনাতে দু রকম সূত্রেরই সাহায্য নেওয়া হয়। বিশ শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাস রচনার জন্য মেকলের 'হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড' (১৮৪৮-৫৫) এক আনুষঙ্গিক সূত্র— কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সূত্র।

মুদ্রিত প্রাথমিক সূত্রগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল স্মৃতিকথা ও সংবাদ। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল জনজীবনের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, যা তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এমন সব তথ্য ও মতামত নথিবদ্ধ করা, যা সেই সময়ে প্রকাশ করা এক হঠকারী ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত হতে পারে। বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া গতানুগতিক রাজনৈতিক আত্মজীবনী পড়ার থেকে এই ধরণের স্মৃতিকথা পড়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাকর। এই ধাঁচের লেখার দুটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল 'Memoirs of Duc de Saint Simon', যা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের ভার্সাই (১৬৯৯-১৭২৩) সম্পর্কে এক চমৎকার ভিন্নমতাবলম্বী বা ব্যতিক্রমী বিবরণ এবং 'Memoirs of Lord Harvey', দ্বিতীয় জর্জের রানী ক্যারোলিনের এই প্রিয়পাত্রের লেখা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের (১৭১৭-১৭৩৭) এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ।

সংবাদপত্র হল প্রকাশিত প্রাথমিক সূত্রগুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সংবাদপত্রের এক ত্রিমুখী মূল্য আছে। প্রথমত, তারা সেইসব রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলি নথিবদ্ধ করে, যেগুলি সেই সময় প্রভাবশালী থাকে। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রগুলি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন 'দি টাইমস' সংবাদপত্রের ডব্লু. এইচ. রাসেল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠানো (১৮৫৪-৫৬) যাঁর বিখ্যাত বার্তাগুলি ব্রিটিশ বাহিনীর বিশৃঙ্খল অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। তৃতীয়ত, ধরাবাঁধা ছকের বাইরে বেরিয়ে সংবাদপত্র কখনও কখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে তার ফলাফল প্রকাশ করে। এই ধারার প্রবর্তক হলেন 'মর্নিং ক্রনিকল' পত্রিকার হেনরি মেহিউ। ১৮৪৯ সালের কলেরা মহামারীর পরে লন্ডনের দরিদ্র মানুষদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিক নিবন্ধ রচনা করে চলেন। এই নিবন্ধগুলির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'লন্ডন লেবার অ্যান্ড দি লন্ডন পুওর।'

১.৪ ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইতিহাসবিদের দায়িত্ব হল অতীতের টিকে থাকা বস্তু ও বিভিন্ন স্মরণের তথ্যমূলক উৎস থেকে অতীতের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা। ইতিহাসবিদের পদ্ধতি দুটি নীতি অনুসরণ করে। প্রথমত, তিনি যে কোনও একটি বা একগুচ্ছ সূত্র গ্রহণ করেন, যা তাঁর আগ্রহের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় নীতিটি সমস্যাভিত্তিক। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন গঠন করা হয়, সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে অনুসন্ধান করতে ইতিহাসবিদকে প্রণোদিত করে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হল ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে সমালোচনা। কোনও নথি বা দলিলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে বাইরের সমালোচনা জরুরী। দ্বিতীয় ও আরও অন্তর্ভেদী পর্যায়টি হল ভিতর থেকে সমালোচনা, অর্থাৎ নথি বা দলিলের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা।

অভ্যন্তরীণ সমালোচনার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনেক বেশি বিতর্কিত এবং ঐতিহাসিক কল্পনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মার্ক ব্লখ মধ্যযুগের ফরাসী গ্রামীণ সমাজকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ওই যুগের নথিপত্র প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে কোনও স্পষ্ট সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না। একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সে রকম চিত্র পাওয়া সম্ভব যখন কৃষি-অর্থনীতিবিদরা ফরাসী কৃষিজীবনের এক সুসম্বন্ধ বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং সেই সময়ের নিখুঁত স্থানীয় মানচিত্র পাওয়াও সম্ভব ছিল। ব্লখ এই মতে অনড় ছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে পরিচিত কারুর পক্ষে মধ্যযুগীয় তথ্যগুলির অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ইতিহাসবিদের উচিত প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে পর্যায়ক্রমে পিছিয়ে যাওয়া, যাতে খণ্ডিত ও অসংলগ্ন সাক্ষ্য বা নিদর্শনগুলি থেকে অতীত যুগের এক চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয়। মার্ক ব্লখের মতে, "ইতিহাসবিদ্, বিশেষ ও কৃষি ইতিহাসবিদকে প্রতিনিয়ত নথির উপর নির্ভর করতে হয়— বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতীতের গোপন তথ্যের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তাঁকে পশ্চাদমুখী ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয়।"

ঐতিহাসিক কল্পনার উপর নির্ভরশীল এই পশ্চাদমুখী পদ্ধতি ভারত ও আফ্রিকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রয়োগ করা হয়, কারণ ওই দুই স্থানে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তথ্যমূলক সূত্রগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের। তাঁর 'দি টিও কিংডম' গ্রন্থে জ্যান ভানসিনা ১৮৮০-র দশকের ইউরোপীয় পর্যটকদের পর্যবেক্ষণগুলি বুঝতে তাঁর নিজেরই ১৯৬০-এর দশকের নৃকুলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহিরঙ্গন অনুসন্ধান কর্মের সাহায্য নেন, কারণ দেশজ সংস্কৃতিকে ঠিকভাবে অনুসন্ধান না করতে পারার ফলে ওই পর্যটকরা আফ্রিকার সমাজের যে চিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন তা অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ।

জন টস ইতিহাসবিদকে যথেষ্ট সঠিকভাবে গোয়েন্দাসুলভ মনোভাবসম্পন্ন এক যত্নশীল পর্যবেক্ষক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোনও সূত্র ব্যবহার করার আগে তাঁকে জালিয়াতি ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রতিটি সাক্ষ্য বা নিদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁকে কেন, কী এবং কীভাবে—এই তিনটি প্রশ্ন করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সূত্রগুলিকে একে অপরের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। ই পি টম্পসনের ভাষায়, "এক মনোযোগী অবিশ্বাসে প্রশিক্ষিত মনের সাহায্যে সাক্ষ্য বা নিদর্শনগুলি তদন্ত করে দেখা উচিত।"

১.৫ জাতীয় এবং বিরোধী ইতিহাস

জাতীয়তাবাদীরা চিরকাল ইতিহাসকে এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের এক জাতীয়তাবাদী তাঁর ভাষনে বলেন : "দেশের অভিভাবকরা ও শিক্ষকরা কীভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা

করবেন ও তাকে দেশের যুবসমাজের কাছে তুলে ধরবেন— এই বিষয়টির আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি যে, ইতিহাসকে যদি এমনভাবে পড়ানো যায় যে তা বিভাজন ও ঘৃণার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির জন্ম দেবে তাহলে আমাদের দেশ ও অন্যান্য সব দেশ উপকৃত হবে।"

বাস্তবিকই, জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে ইতিহাস এক শক্তিশালী উপাদান। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় মহাদেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয়। একই সময়ে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ইতিহাস রচনা করে ইতালীয়, জার্মান ও শ্লাভদের মধ্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় বা সত্তার এক ধারণাকে টিকিয়ে রাখা হয়। সারা জীবন ধরে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত থেকে ফ্রান্টিসেক পালাকি প্রায় একার চেষ্টায় চেকদের অতীত আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৮৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে 'চেক জাতির জনক' আখ্যা দেওয়া হয় ও মানুষ গভীর শোকে নিমগ্ন হয়। জার্মানী ও ইতালীর মত নতুন জাতি-রাষ্ট্র, এমন কী ফ্রান্সের মত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেও জাতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে জনশিক্ষার বিকাশ হয়, তার পাঠক্রমে জাতীয় ইতিহাসকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়।

এক প্রসারমান ও ক্রমবর্ধমান নির্বাচকমণ্ডলীর প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যসাধনকারী উপাদানের ভূমিকা নেয়। ঊনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে ব্রিটেনের রাজকীয় অতীতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক বিজয় ও 'নিচু জাতির' উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ব্রিটিশ মানুষদের কাছে এক বিরাট গৌরবময় সাফল্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। আজও ইংরাজদের জাতীয় ইতিহাস অতীতের সেই অধ্যায়নগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করে, যখন প্রথম এলিজাবেথ, কনিষ্ঠ পিট এবং সবার উপরে উইনস্টন চার্চিলের মত নেতার অধীনে, বিশেষত যুদ্ধের সময়ে, সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছিল। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় এই ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দিয়েই মার্গারেট থ্যাচার তাঁর পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতার আগে মার্কিনীরা ব্রিটেনের ঐতিহাসকেই নিজেদের ইতিহাস মনে করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৬) পর এটা উপলব্ধি করা হয় যে, তেরোটি রাজ্যের মধ্যে এক জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার জন্য এক স্বতন্ত্র মার্কিন অতীতের প্রয়োজন। ১৮২০-র দশকে ম্যাসাচুসেটসে প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলিতে এই লক্ষ্যে প্রথম চেষ্টা করা হয়। ১৮৫০-এর দশকের মধ্যে জর্জ ব্যানফটের মত ইতিহাসবিদদের রচনায় এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে, বিংশ শতাব্দীর ভারতেও ঐক্য ও জনসমর্থনের জন্য জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় অতীতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। রাণা প্রতাপ ও শিবাজীকে জাতীয় বীর হিসাবে তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পর যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদার সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের রচনার মোকাবিলা করতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাকে সংগঠিত করেন।

বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাসবিদদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকার মানুষ যে ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের ইতিহাস। সেখানে আফ্রিকার মানুষদের সাফল্যকে স্থান দেওয়া হয়নি বা উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্টো দিকে স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে নির্ভরশীলতা ও হীনমন্যতার ঔপনিবেশিক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘানা ও জিম্বাবোয়ের মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য, ১৮৯৬ সালে রোডেশিয়াতে শ্বেতাঙ্গ দখলদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ১৯৫০ সালে জার্মান পূর্ব আফ্রিকাতে মাজি-মাজি বিদ্রোহের মত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ধরণের বড় মাপের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনা অবশ্য সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। জাতীয়তাবাদী

গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিও আছে যারা জাতীয়তাবাদের এক অভিন্ন ছাঁচের বিরোধিতা করে নিজেদের পরিচয় সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের অতীতের আশ্রয় নেয়। এই কারণেই রচিত হয় আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস এবং জেলা, গ্রাম, উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতির ইতিহাস। শ্রেণীভিত্তিক ইতিহাসও রচনা করা হয়। শ্রমের ইতিহাস রচনার লক্ষ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও সমাজচেতনা বাড়িয়ে তোলা। ১৯৬০-এর দশকে ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদদের 'হিস্ট্রি ওয়ার্কশপ মুভমেন্ট' বা ইতিহাস কর্মশালা আন্দোলনে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

এ ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন এক অনন্য উদাহরণ। নারীবাদীরা মনে করেন যে, পুরুষ-শাসিত পৃথিবীতে সাফল্য লাভ করা প্রথম এলিজাবেথ এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত এবং তাঁদের মত নারীদের নিয়ে অধ্যয়ন কোনও কাজে আসে না। এর পরিবর্তে তাঁরা নারীদের উপর অর্থনৈতিক ও যৌন শোষণ সম্পর্কে গবেষণার উপর জোর দেন— যে বিষয়গুলি আজ পর্যন্ত 'ইতিহাস থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' এক মার্কিনী নারীবাদী ইতিহাসবিদ বলেছেন : ''এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বেশিরভাগ নারীই মনে করেন তাঁদের লিঙ্গের কোনও আকর্ষণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ অতীত নেই। অবশ্য অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মতই নারীদের পক্ষেও এক গোষ্ঠীগত পরিচয় বা সত্তার চেতনা ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই চেতনা অনিবার্যভাবে অতীত সম্পর্কে গড়ে ওঠা এক গোষ্ঠীচেতনা। এই চেতনা ছাড়া কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর সমষ্টিগত স্মৃতিভ্রংশ ঘটে যায়, যা তার উপর এক বাঁধা ধরা সন্দেহজনক ভাবমূর্তি আরোপ করে ও কোনটি ভাল বা কোনটি খারাপ— সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পরিধিকে সীমিত করে।''

১.৫ বিশেষীকরণের উদ্ভব— অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস

মোটামুটিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে আধুনিক ইতিহাস রচনার সূচনা রাজনৈতিক, আইনী ও সাংবিধানিক ইতিহাসের মাধ্যমে। এর পর ঊনবিংশ শতকের মধ্য থেকে শেষ পর্যায়ের মধ্যে আসে অর্থনৈতিক ইতিহাস। বিশ শতকের মাঝামাঝি শুরু হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা। বিশ শতকের শেষভাগে আসে পরিবেশগত ইতিহাস রচনার ধারা। ইতিহাস রচনার এই বংশতালিকা পুঁজিবাদের বিকাশের অনিবার্য ফলশ্রুতি। পাঁচটি পর্যায়ে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করে এ কথা বিস্তারিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, অষ্টাদশ শতকে বিপ্লব ও সাংবিধানিক সংস্কারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সম্পত্তির অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সকলের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার কাঠামো গঠন করে। সেই সময় ইতিহাস আবর্তিত হত রাজনীতি, আইনী বৈধতা ও সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতাকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংস্কার ও বিপ্লব আংশিকভাবে যে শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সূচনা করে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে, তা জন্ম দেয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্ভাবনার। এই ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও রূপান্তর এবং প্রতিযোগিতা, উপনিবেশবাদ ও অর্থব্যবস্থার বিকাশ। তৃতীয়ত, বিশ শতকে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক — এই দুই বিরোধী সমাজের বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনাকে প্রেরণা জোগায়। এই শাখায় সামাজিক সংগ্রামের উত্থান; শ্রমের প্রব্রজন ও বহুজাতিক সমাজের ক্রমবিকাশ। চতুর্থত, পুঁজিবাদ-উত্তর রাষ্ট্রের দ্বারা শ্রমের অভিসন্ধিমূলক শোষণ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা জন্ম দেয় নারীবাদী চর্চার। পঞ্চমত, পরিবেশকে পুঁজিতে পরিণত করার প্রয়াস পরিবেশ রক্ষার জন্য সংগ্রামের সূচনা করে

ও পরিবেশগত ইতিহাসের জন্ম হয়।

এইভাবে বিচার করলে, পরিবেশগত ইতিহাসকে পূর্বের সব ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি বলা যেতে পারে। কোনও প্রান্তিক বিষয় হওয়া দূরে থাক, পরিবেশগত ইতিহাস আজ ইতিহাস-রচনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে বলা যায়। জে ডোনাল্ড হিউজস্ যেমন বলেছেন, "যিনি ইতিহাসকে তার প্রসঙ্গের ভিতর স্থাপন করার ও তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি পরিবেশগত ইতিহাসবিদ হতে বাধ্য।"

১.৬ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে তার নিকটবর্তী শাখাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের অবস্থান নির্ণয় করে আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় ইতি টানতে পারি। চিরাচরিতভাবে ইতিহাস মানবিকী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছে। এর অন্তর্নিহিত দর্শন এই যে, ব্যবহারিক উপযোগিতা যাই থাক না কেন, মানুষ যা ভেবেছে এবং করেছে তার এক অন্তর্জাত মূল্য আছে যা দীর্ঘস্থায়ী। সাহিত্য ও কলা সমালোচকের মত ইতিহাসবিদও আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক রক্ষক এবং সেই উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচিতি মানবজীবনের অবস্থা সম্পর্কে এক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার ক্ষমতা রাখে। এইভাবে বিচার করলে, রিচার্ড কবের ভাষায় ইতিহাস হল "এক সাংস্কৃতিক বিষয় যা নিজের অভ্যন্তরে নিজেকেই সমৃদ্ধ করে।"

এর বিপরীতে সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলি তাদের ব্যবহারিক নির্দেশগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৈজ্ঞানিকরা যেমন প্রাকৃতিক পৃথিবীকে জয় করার উপায় বাতলান, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকেরা তেমনই বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান তুলে ধরার জন্য অর্থনীতি ও সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেন। অবশ্য অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব—এই দুটি বিষয়কেই ইতিহাসের ভ্রাতৃসুলভ বিষয় বলা যায়, যখন এক আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে অন্য আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে রূপান্তরকে সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক সম্পর্ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, প্রব্রজন, উৎপাদন ও ব্যবহারের বিচারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বস্তুগত বাস্তবের মাধ্যমে ভূগোল ইতিহাসকে ন্যায্যতা প্রদান করে। গ্রেকো-পার্সিয়ান যুদ্ধের বিষয়ে লিখতে গিয়ে হেরোডোটাস নীলনদের গতিপথের কথা উল্লেখ করেন। ফরাসী ইতিহাসবিদ Maichelet মনে করেন যে, ভৌগোলিক প্রসঙ্গ ছাড়া ইতিহাস নিছক এক ছোট বা বড় গল্প হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, তৎকালীন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা অর্থহীন হয়ে ওঠে। কারণ, রাজনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া রাজনৈতিক ইতিহাস গল্প বা নাটকসুলভ হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করলে, "ইতিহাস হল শিকড় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল ফল।"

সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা মনে রেখে কোনও কোনও ইতিহাসবিদ তাঁর বিষয়ের সামাজিক প্রয়োগে বিশ্বাস করেন এবং অভ্যাসবশত তাকে মানবিকী বিদ্যা থেকে দূরে সরিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের পাশে স্থাপন করেন। তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' গ্রন্থে ই এইচ কার এরকমই বলেছেন : "বৈজ্ঞানিক, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ— সকলে একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত। এই অভিন্ন বিষয়টি হল মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান, পরিবেশের উপর মানুষের এবং মানুষের উপর তার পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা। এই অনুসন্ধান বা গবেষণার লক্ষ্য এক : পরিবেশকে মানুষের আরও ভালভাবে বোঝা ও তাকে আরও বেশি করে আয়ত্ত করা।"

১.৮ উপসংহার

অন্যকে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে কোনও একই শ্রেণীতে ফেলা শুধু কঠিন নয়, সম্ভবত এক অসম্ভব কাজ। প্রকৃতপক্ষে এর মূল প্রকৃতি অস্বীকার না করে ইতিহাসকে মানবিকী বিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান—কোনওটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইতিহাস এক "সংকর বা দোআঁশলা বিষয়, দুটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার অসীম আকর্ষণ ও জটিলতা। ইতিহাস অধ্যয়নকে যদি সম্পূর্ণ সজীব রাখতে হয়, তাহলে তার এই দ্বিমুখিনতাকে স্বীকার করতে হবে। তার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য শৃঙ্খলা বিসর্জন দিলেও ক্ষতি নেই।"

১.৯ অনুশীলনী

১. ইতিহাসের সংজ্ঞা কী? উত্তর-আধুনিক ইতিহাস-রচনার শ্রেষ্ঠ অবদান কী?

২. বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রগুলির নাম উল্লেখ করুন। মুদ্রিত প্রাথমিক সূত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৩. ইতিহাসবিদের দৃষ্টিভঙ্গি তার সাক্ষ্য বা নিদর্শনের ব্যাখ্যাকে কতটা প্রভাবিত করে?

৪. ইতিহাস কি জাতীয়তাবাদীর কাছে এক কার্যকরী অস্ত্র?

৫. জাতীয় ও বিরোধী ইতিহাসের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৬. ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির প্রভেদ ব্যাখা কর।

১.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

E. H. Carr : What is History, Penguin, 1964.
Marc Bloch : The Historian's Craft, Manchester, 1954.
Edward A. Freeman : The Methods of Historical Study, Macmillan, 1886.
Arthur Marwick : The Nature of History, London, 1976.
John Tosh : The Pursuit of History, Orient Longman, London, 1984.

একক ২ ❑ ইতিহাস-রচনার বিভিন্ন পর্যায়

গঠন ঃ

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ চিরায়ত ইতিহাস-রচনা (Classical Historiography)

২.৩ মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয় ইতিহাস-রচনা

২.৪ নবজাগরণ ও ইতিহাস-রচনা

২.৫ জ্ঞানদীপ্তি ও ইতিহাস-রচনা

২.৬ ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও গিবন

২.৭ ইতিহাস রচনা : ভিকো থেকে হার্ডার

২.৮ উপসংহার

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককের উদ্দেশ্য হল ইতিহাস-রচনার বিকাশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করা। এই পর্যায়গুলি হল : ১। চিরায়ত, ২। মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয়, ৩। নবজাগরণ, এবং ৪। জ্ঞানদীপ্তি— যাদের একত্র করলে ইউরোপের প্রাক্-আধুনিক ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

২.২ চিরায়ত ইতিহাস-রচনা (Classical historiography)

ইউরোপের চিরায়ত ইতিহাস-রচনায় দর্শন অনুপস্থিত ছিল। হেরোডোটাস ও প্লেটোর মত লেখকরা ইতিহাসের এক কল্পনাভিত্তিক ধারণা উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে ইতিহাস এক বিশাল নাগরদোলা, নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্থানপতনের এক কাহিনী। অন্যদিকে তাঁর সমকালীন 'সফিস্টদের' সঙ্গে পরিচিত থুকিদিদেস ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে আসেন কীভাবে এবং কেন পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক। রোমানদের প্রাচীন বিশ্বজয়ের কথা বর্ণনা করার সময় পলিবিয়াসও কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী স্থির করেছিলেন। স্যালাস্ট লিভি, ট্যাসিটাস এবং যোশেফিউসের রচনাতেও পদ্ধতিবিদ্যার ইঙ্গিত ও দার্শনিক পূর্বানুমানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চিরায়ত ইতিহাস-রচনায় কোনও ক্ষেত্রেই, তা কল্পনাভিত্তিক বা বিশ্লেষণমূলক, অথবা ঘটনা বা বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি শিল্পকলার যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধানই হোক, কোথাও আমরা ইতিহাসের দর্শনকে সুগঠিত কাঠামো হিসাবে খুঁজে পাই না। প্লেটোর হাতে আমরা তার শুধুমাত্র এক

আংশিক সূচনা লক্ষ্য করি, যাঁর ক্রিটিয়াসকে আমরা সম্ভবত ইতিহাসের পুরাণশাস্ত্র নির্মাণের এক প্রচেষ্টা বলে মনে করতে পারি। এর সঙ্গে আমরা তাঁর Timaens-এর প্রকৃতির দর্শনের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে Posterior Analytics' রচনায় অ্যারিস্টটল যেভাবে চর্চা করেছিলেন, ঐতিহাসিক জ্ঞানের যুক্তি সম্পর্কে সেরকম কোনও প্রাচীন রচনার খোঁজ পাওয়া যায় না।

প্রায়শই এই দাবী করা হয় যে, পাশ্চাত্য জগতে ঐতিহাসিক চেতনার জন্ম দেওয়ার পিছনে ইসরায়েল ও খৃষ্টধর্মের বিরাট অবদান আছে। এই দাবী একই সময়ে সত্য ও অসত্য। একথা সত্য যে হিব্রুরা ঐতিহাসিক নথি সংরক্ষিত রাখতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যদের ইতিহাস সম্পর্কে বা ঐতিহাসিক ধর্মীয় আখ্যান রচনা করতে কোনও ধরণের আগ্রহ ছিল না। রোমানরা তাঁদের অতীত এবং ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল অবশ্যই পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক পৃথিবীর থেকে চিরকালীন সত্তার বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টান্ত মেনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না যে গ্রীকরা ইতিহাস সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিলেন। গ্রীসের 'সফিস্টরা' তাঁদের চারপাশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পৃথিবী সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ইতিহাসের ধারণাকে যদি আমরা শুধুমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, কেবল তখনই হেরোডোটাস ও প্লেটোর দেওয়া ইতিহাসের চক্রাকার ধারণাকে আমরা অনৈতিকহাসিক মনে করতে পারি।

কাজেই এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে ইসরায়েল ও খৃষ্টধর্ম প্রাচীন পৃথিবীকে তার অনৈতিহাসিক নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারা যা করেছিল তা হল : ১। ইতিহাসে এক ধর্মীয় তাৎপর্য যোগ করেছিল এবং ২। ইতিহাসের অগ্রগতিকে ঈশ্বরের নির্দেশিত দিক ও পরিকল্পনার সংকেত হিসাবে দেখেছিল। এক বিখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ''ঘটনা ও অন্যান্য উপাদানগুলিকে এক সামগ্রিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যা 'বুক অফ জেনেসিসে'র বা সৃজনতত্ত্বের এক অস্পষ্ট উৎস থেকে ইতিহাসের অভ্যন্তরে বা বাইরে এক পরিত্রাণ ও শেষ বিচারের লক্ষ্যের দিকে অর্থপূর্ণ বা তাৎপর্যময়ভাবে এগিয়ে চলেছিল।'' এই দুই ক্ষেত্রেই ইহুদী ও খৃষ্টীয় ঐতিহ্য এক নতুন ধরণের ঐতিহাসিক চেতনাকে প্রকাশ করেছিল, যা পাশ্চাত্য জগতে ইতিহাসের ধারণার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

২.৩ মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয় ইতিহাস-রচনা

মধ্যযুগে পণ্ডিতরা ইতিহাসকে দুটি যুগে ভাগ করেছিলেন : অন্ধকার ও অসত্যের যুগ এবং আলোক ও সত্যের যুগ। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে আছে 'ক্রশ অফ খ্রাইস্ট'। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ধারণা সংগ্রহ করে মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদরা অন্ধকারের যুগের মধ্যে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বা উপযুগ নির্দেশ করেন। কেউ কেউ 'বুক অফ ড্যানিয়েলে' উপস্থাপিত চারটি পর্যায়ক্রমিক বিশ্ব সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন। অন্যরা সেন্ট অগাস্টিনের (৩৫৪-৪৩০) 'সিটি অফ গড' রচনায় যে ছয়টি যুগের রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে গ্রহণ করেন। এই 'সিটি অফ গড' গ্রন্থটিই ইতিহাস-রচনার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যা ইতিহাসের এক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্ম দেয়।

ধর্মীয় মত অনুসারে ইতিহাস ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীর একটি দিক। সমগ্র মানবজাতির জীবন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এ কোনও দেশ, অঞ্চল বা এলাকার ইতিহাস নয়, এ হল এক ''বিশ্বজনীন ইতিহাস''। এর এক প্রারম্ভ আছে—ঈশ্বরের বিধান অনুসারে এর মধ্যে আছে অগ্রগতির বীজ ও এর পরিসমাপ্তি। সংক্ষেপে প্রকাশ করলে, ইতিহাসের এক সূত্র ও লক্ষ্য আছে এবং তা রৈখিক ভাবে এগিয়ে চলে।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে অগ্রগতির এক নিয়ম আছে। ইতিহাস কোনও যদৃচ্ছ ধারাবাহিকতা বা ঘটনাবলীর অর্থহীন সমষ্টি নয়— তা এক বোধগম্য প্রক্রিয়া, যা চালিত হয় এক অন্তর্নিহিত নিয়ম বা ঐশ্বরিক বুদ্ধিসত্তার কোনও মহত্তর পরিকল্পনার দ্বারা। অন্যভাবে বললে, ইতিহাস হল "ঈশ্বরের এক চলমান সৃষ্টি, যার উৎস ঈশ্বর ও লক্ষ্য ঈশ্বর।"

ইতিহাসের এই খৃষ্টীয় রূপান্তরণ এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস ও জীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানালে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করা হয়।

২.৪ নবজাগরণ ও ইতিহাস-রচনা

নবজাগরণের প্রারম্ভে ইতালীতে প্রথম ইতিহাসকে ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন নবজাগরণের সময় চিরায়ত রচনাগুলির প্রতি উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। মানবতাবাদীরা সেগুলিকে এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন, অতীতের এক নতুন পর্যায় বিভাজন কল্পনা করে যে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন।

মানবতাবাদী ইতিহাসবিদরা প্রাচীন ইতিহাসকে 'অন্ধকার যুগ' বা মধ্যযুগীয় ইতিহাস থেকে পৃথক করে নেন এবং নিজেদের আধুনিক যুগকে সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে স্থাপিত করেন। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক— ইউরোপীয় ইতিহাসকে এইভাবে তিন ভাগে ভাগ করা একই সময়ে মূল্যবোধের বিচারের সাহায্যেও নির্ধারিত হয়েছিল। নবজাগরণ-প্রভাবিত মানবতাবাদীরা আলোক ও অন্ধকারের উপমাগুলিতে উল্টে দেন। যেন প্রাচীন যুগকে এতদিন অন্ধকার মনে করা হত, অতীত সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে তা হয়ে উঠল আলোকময় যুগ। রোমের পতনের পরবর্তী সময়কে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বর্বরতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হল। এইভাবে নবজাগরণ-প্রভাবিত মানবতাবাদী ইতিহাসবিদরা তাঁদের নিজেদের যুগকে অন্ধকারের পর আলোকের যুগ, নিদ্রার পর জাগরণ এবং মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হিসাবে তুলে ধরেন।

ইতিহাসের এই মানবতাবাদী পর্যায় বিভাজন মানুষের অতীত চেতনার রূপান্তর ঘটায়। ঐতিহাসিক সমগ্রতাকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক পর্যায়ে বিভাজন ইউরোপীয়দের মধ্যে ক্রমশ নিঃসে কথিত 'ঐতিহাসিক দূরত্বের বিষাদ' জাগিয়ে গেলে। এই মনোভাব মেনেই লভ্য নথি ও অন্যান্য রচনার বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। লরেঞ্জো ভাল্লা (১৪০৬-১৪৫৭) ডোনেশন অফ কনস্টাইটিনের মিথ্যাচারিতা প্রমাণ করেন, অষ্টম শতকের যে নথিতে রোমের বিশপের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এরাসমাস বাইবেলের উপর তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন। ১৫১৬ সালে তাঁর গ্রীক পাঠ্যাংশের বিখ্যাত সংস্করণের সঙ্গে প্রকাশিত 'নিউ টেস্টামেন্টের' লাতিন অনুবাদে তিনি 'ফাস্ট এপিসল অফ জন' তিনি 'কমা জোহানেয়াম' পংক্তিটি বাদ দেন।

পাঠ্যাংশের সমালোচনা এক ঐতিহাসিক বোধের মূর্ত রূপ এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবেই আধুনিক ইতিহাস রচনার প্রথম ধ্রুপদী নিদর্শনগুলি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রকাশিত হয় : লিওনার্দো ব্রুনির 'History of Florence' (1420), মাকিয়াভেলির 'Discoruses on Livy' (1516-1517) ও 'Florentine History' (1525), ফ্র্যান্সেসকো গুইকারডিনির 'History of Italy' (1535) এবং জাঁ বদির 'Easy Introduction to the study of History' (1566)।

নবজাগরণের সময়ের ইতিহাসবিদদের মতে ইতিহাস তার কার্যকারণ সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা পায়। ইতিহাসের

ব্যবহার সম্পর্কে এই ইতিহাসবিদরা ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের কাছে ইতিহাস মানুষের কাছে ঈশ্বরের কার্যকলাপের বৈধতা প্রমাণ করার কোনও তাত্ত্বিক অস্ত্র নয়, তার লক্ষ্য হল জীবনের পথনির্দেশ করা। রাইস ও গ্রাফটন বলেন : "এইভাবে নতুন ইতিহাস হল অতীতের রাজনীতির এক ধর্মনিরপেক্ষ বিবরণ অথবা প্রাচীন ও সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলির এক তুলনামূলক আলোচনা—যা চমৎকারভাবে লিখিত, সুসংহত এবং ব্যবহারিক লক্ষ্য-সমন্বিত এক রচনা, যার কারণ ও উদ্দেশ্যকে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

২.৫ জ্ঞানদীপ্তি ও ইতিহাস-রচনা

নবজাগরণের সময় ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে অষ্টাদশ শতকে। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ইতিহাস-রচনা গ্রীকো-রোমান বা গির্জা-প্রভাবিত ইতিহাস-রচনার বিপরীত ছিল। এ কথা মনে করা হত যে, মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সঙ্গে নবজাগরণের যুদ্ধের ফলেই নতুন যুগের আত্মপ্রকাশ। এই কারণেই 'enlightenment' বা জ্ঞানদীপ্তি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সেই যুগকে সর্বদা পূর্ববর্তী যুগগুলির থেকে পৃথক করে রাখত। এই নতুন বা নব যুগ এ কথা মেনে নেয়নি যে অতীত মানেই স্বর্ণময় এবং পূর্বপুরুষরা যা চিন্তাভাবনা করেছেন তা অনিবার্যভাবে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সঠিক। যুক্তির নির্দেশ মেনে নেওয়াই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। সবকিছু, এমনকী 'চিরায়ত' যুগকেও আর অসামান্য মনে করা হত না। লাতিনকে বর্জন করে দেশীয় ভাষাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। নীতিগল্প ও অতীতের মিথ্যা উপস্থাপনার সমালোচনা শুরু হয়েছিল। সব থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল গির্জা-প্রভাবিত ইতিহাসরচনা, যখন সত্য ও ন্যায় বিচারের খৃষ্টীয় ধারাগুলিকে কঠোরভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল।

বিমূর্ত ব্যক্তিত্যবাদ বা বাস্তবমুখী ধারণা এই সময়েই গড়ে ওঠে। এই বাস্তবমুখী ধারণা, অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের পদ্ধতি চিন্তাভাবনা, মনোবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব ও কার্যকলাপের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম ও গির্জা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি বিচারের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়। এই প্রবণতাই পরে বেনথাম, মিল ও মেকলের উপযোগিতাবাদের ধারার জন্ম দেয়। ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রগুলিতেও যুক্তিবাদ প্রয়োগের সূচনা হয় ও মানুষ ইতিহাসের এক সুনির্দিষ্ট দর্শনের হদিশ পায়। খৃষ্টীয় ইতিহাস-রচনা নৈতিক মূল্যবোধের যে ক্ষেত্রটির উপর গুরুত্ব দিয়েছিল, সেখানেও উচ্চ স্তরের দক্ষতা আমদানি করা হয়।

২.৬ ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও গিবন

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস ভলতেয়ারের রচনায় সাহিত্য এবং মন্তেস্কুর অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। মন্তেস্কু (১৬৮৯ - ১৭৫৫) এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দেন, যা ধর্মতত্ত্ব থেকে ইতিহাসের মুক্তিকে সম্পূর্ণ করে। তিনি ইতিহাসকে এক স্বশাসিত, স্বনির্ভর ক্ষেত্র হিসাবে আবিষ্কার করেন। তিনি এক ঐতিহাসিক চেতনার সৃষ্টি করেন যা প্রধানত অন্তরস্থ (immarent) কিন্তু অতীন্দ্রিয় নয়, এবং এমন ধারণাগুলি প্রয়োগ করেন, যা ধর্মীয় না হয়ে যুক্তিগ্রাহ্য। তার বিশাল 'স্পিরিট অফ দি লজে'র থেকেও পূর্বের রচনা 'পার্সিয়ান লেটারস' বেশি সফল হয় এবং ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য বেশি উপযোগী প্রমাণিত হয়।

ভলতেয়ারই (১৬৯৪-১৭৭৮) হলেন প্রথম ইতিহাসবিদ, যিনি ইতিহাসকে বহিঃস্থ চর্চা থেকে অভ্যন্তরীণ চর্চার দিকে ফিরিয়ে আনেন। ফ্রান্সে Bossnet-এর 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি' যে অগাস্তিনীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছিল ভলতেয়ার তাকে বিদ্রূপ ও বর্জন করেন এবং এমেরি নেফের ভাষা "ঐতিহ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেন।" তৎকালীন বিশ্বজনীন রচনাগুলির বিরুদ্ধে সংকীর্ণতার অভিযোগ তুলে ইতিহাসের স্থান ও কালের পরিধিকে প্রসারিত করেন। ভারত, চীন ও ইসলামী বিশ্ব আগে উপেক্ষিত ছিল— ভলতেয়ার প্রাচীনত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তাদের ফিরিয়ে আনেন। এই কাজ করার সময় তিনি ইতিহাসের উৎস বা সূত্রগুলির সততা ও মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে এক পরিশীলিত সমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

একই ধরণের সংশয় লক্ষ্য করা যায় ব্রিটিশ বহুবিদ্যাবিশারদ এডওয়ার্ড গিবনের (১৭৩৭-১৭৯৪) মধ্যে, যাঁর ছয় খণ্ডের 'Decline and Fall of the Roman Empire" (1776-1788) সেন্ট অগাস্টিনের খৃষ্টধর্ম সুরক্ষা করার প্রয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত। গিবনের এই গ্রন্থ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ সালে কন্সটানটিনোপলের পতন পর্যন্ত এক ধারাবাহিক আখ্যান। একজন পেশাদার ইতিহাসবিদ হিসাবে গিবন লিভি থেকে আখ্যানের রাজকীয়তা, ট্যাসিটাসের কাছ থেকে ঐতিহাসিক অর্ন্তদৃষ্টি এবং পলিবিয়াসের থেকে খুঁটিনাটি রচনার পদ্ধতি আহরণ করেছিলেন।

গিবন বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ, বিজয়, সাম্রাজ্যের উত্থানপতনই হবে ইতিহাসের প্রধান বিষয়— সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক দিকগুলি হবে আনুষঙ্গিক মাত্র। রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে গিবন রাজনৈতিক নীতিবোধের অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেন এবং নৈতিক বিকৃতিকে তার চূড়ান্ত পতনের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেন। গিবনের কাছে রোমান সাম্রাজ্য ছিল সভ্যতার এক প্রতীক, যা বর্বরতা এবং প্রাক্ পরিণামবাদী ধর্মের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ে।

গিবনের বহু সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি ঘটনাবলীর কোনও কালানুক্রমিক ও কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেননি এবং সাম্রাজ্যের কাঠামোগত সমস্যাগুলির প্রতিও আলোকপাত করেননি। তবুও 'জাস্টিনিয়ান' ও 'ট্রিনিটারিয়ান' দ্বন্দ্ব, ইসলামের উত্থান ও রোমান আইনের উৎস সম্পর্কে যার বিবরণ অত্যন্ত চমৎকার এবং এই কারণেই Bury তাঁকে এক ইতিহাস বিশারদ হিসাবে অভিহিত করেছেন, যিনি তাঁর "সময়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন ও সময়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।" তাঁর সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী সময়ে পণ্ডিতরা সংশোধন করলেও গিবনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ তাঁর রচনাগুলিকে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রচনার তালিকায় স্থান দিয়েছে।

২.৭ ইতিহাস রচনা : ভিকো থেকে হার্ডার

ভিকোকে আরও চিরায়ত প্রথায় ইতিহাস রচনা করতে হয়েছিল। তাঁর 'নিউ সায়েন্স (১৭২৫) সেই গ্রীক ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করে, যাঁর মতে ইতিহাস এক চক্রাকার পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ভলতেয়ার, হার্ডার, কান্ট, কন্ডরমেট ও হামবোলড্ট—এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির মধ্যে এক ধরণের অন্তর্নিহিত বিবর্তনধর্মী প্রবণতা আবিষ্কার করেন। ভিকো তখনও ঐশ্বরীয় বিধানে'র ধারণা ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তা করেছিলেন এমন উপায়ে, লোয়িথের ভাষায় "যাতে অতীন্দ্রিয় বা অত্যাশ্চর্য কাজের কোনও চিহ্ন না থাকে।" "ভিকোর রচনাতে ঈশ্বর বা নিয়তি এতই স্বাভাবিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও ঐতিহাসিক যে তাঁর অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।" হিউমের মত ভলতেয়ারের কাছেও অবশ্য সেই নিয়তির কোনও মূল্য ছিল না, যার সাহায্যে "ঈশ্বর মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন।" ভলতেয়ার সেইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসকে আক্রমণ করেন, Bossnet-এর মতে "ঈশ্বর যেগুলির সাহায্যে তাঁর নিজেরই আইনকে যখন ইচ্ছা হয় তখনই ভেঙে ফেলেন।"

হার্ডার এই বিশ্বাসকে প্রসারিত করেন যে, ইতিহাস এক সর্বব্যাপী ও স্বশাসিত প্রক্রিয়া— "সময় ও স্থান অনুসারে মানুষের শক্তি, ক্রিয়াকলাপ ও প্রবৃত্তির এক বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ইতিহাস।"

২.৮ উপসংহার

জ্ঞানদীপ্তি-প্রভাবিত ইতিহাস-রচনাতে যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্গ বা গির্জা, আদালত বা ষড়যন্ত্রের মত বিষয়গুলিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যতটা দেওয়া হয়েছে সমাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উপর। যাজক সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থ উন্মোচন করার জন্য বিভিন্ন ধারণাকে তুলে ধরা হয়। ইতিহাসের দর্শনকে এক পথনির্দেশক এবং অন্ধকার দূর করার আলোকবর্তিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাহ্যিক বা বহিঃস্থ এবং চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে অন্তঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা হয়।

২.৯ অনুশীলনী

১. চিরায়ত ইতিহাস-রচনার বৈশিষ্ট্য কী? হেরোডোটাস এবং থুকিদিদেসের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়?
২. মধ্যযুগীয় পণ্ডিতরা কীভাবে ইতিহাসের পর্যায় বিভাজন করেন? অগাস্তিনীয় ইতিহাস-রচনার সারবস্তু কী?
৩. নবজাগরণ-প্রভাবিত ইতিহাসবিদদের হাতেই কি ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্তি পায়?
৪. ষোড়শ শতকে মানবতাবাদীরা ইতিহাসের ধারণার কতটা রূপান্তর ঘটান?
৫. অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসবিদরা ইতিহাসের ধারণার কীভাবে পরিবর্তন সাধন করেন?

২.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

1. Amold J. Toyenbee : A Study of History, London, 1954.
2. Karl Lowith : Meaning in History, Chicago, 1949.
3. Emery Neff : The Poetry of History, New York, 1947.
4. Geoffrey Barraclough : History in a Changing World, Oxford, 1955.
5. Engene F. Rice and Anthony Grafton : The Foundations of Early Modern Europe, London, 2004.

একক ৩ ❑ ইতিহাস-রচনাতে বার্লিন বিপ্লবের অবদান

গঠন ঃ

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ র‍্যাঙ্কের ক্রমবিকাশ-বার্লিন বিপ্লব

৩.৩ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কে ; বার্লিন বিপ্লবের সাফল্য

৩.৪ ইতিহাস : অতীতের রাজনীতি

৩.৫ ইতিহাসের সূত্রগুলির দিকে নজর ফেরানো

৩.৬ বিশ্বজনীন ইতিহাসের স্বপ্ন

৩.৭ র‍্যাঙ্কে; সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা

৩.৮ উপসংহার

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

৩.১ প্রস্তাবনা

ইতিহাস অধ্যয়নের দুটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতকে তাকে আরও বেশি বাস্তবধর্মী আলোচনায় রূপান্তরিত করে। এদের মধ্যে একটি হল হিস্‌টরিসিজম (historicism), যাকে জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে রোমান্টিক বিদ্রোহের এক উপজাতক বলা যেতে পারে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি হল অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-রচনা। চিরাচরিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ঊনবিংশ শতকে এই দুই প্রবণতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই জন্ম দেয় ওই শতকের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদের। নাগরিকত্বে প্রুসিয়ান এবং বার্লিনের এই ইতিহাসবিদ হলেন লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)। এই এককে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের এক সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.২ র‍্যাঙ্কের ক্রমবিকাশ—বার্লিন বিপ্লব

ঊনবিংশ শতক সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সমালোচনামূলক গবেষণার নতুন নতুন পথ খুলে দেয়। কূটনৈতিক মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাইবেল সংক্রান্ত চর্চা, পুরাণতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের মত আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানগুলির সাহায্যে ইতিহাসের নিজস্ব যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়।

তথ্যের উৎস বা সূত্রগুলির পৃথকীকরণ, পরীক্ষা, সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্য সমালোচনামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। কোনও ঐতিহাসিক রচনার নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠা ও সভ্যতা যাচাই করার জন্য কঠোর মান নির্দিষ্ট করা হয়। হিস্টরিকাল স্কুলের আলোচনা সভাগুলিতে নতুন নতুন পদ্ধতি শেখানো ও প্রয়োগ করা হয়। এই স্কুলে বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে ছাত্র শিক্ষা লাভের জন্য জড়ো হত। পণ্ডিতরা আশা করতে পারেননি, বিজ্ঞানের জগতে ইতিহাস শেষে নিজেকে এক সমান অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই সময়েই আত্মপ্রকাশ ঘটে পদ্ধতি বিদ্যার এবং 'বিজ্ঞানমনস্ক' ইতিহাসবিদদের এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জার্মানীতে নিবুর, র‍্যাঙ্কে, ড্রয়সেন বা মমমেন, ফ্রান্সে Taine ও Fustel de Coulange এবং ইংল্যাণ্ডের লর্ড অ্যাকটন ও বারি।

সমকালীন ইতিহাসবিদদের ও প্রুসিয়ান হিস্টরিকাল স্কুলের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে র‍্যাঙ্কেই ইতিহাসে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রকৃত অর্থে প্রত্যক্ষবাদী বা দৃষ্টবাদী না হলেও এবং হিস্টরিসিজমের রোমান্টিক উৎসে গভীরভাবে মগ্ন হলেও, তাঁর অক্লান্ত গবেষণা ও অবিস্মরণীয় রচনাগুলির মাধ্যমে লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে ইতিহাসের এক নতুন ধারণার সৃষ্টি করেন। এই ধারণা কঠোরভাবে অভিজ্ঞতানির্ভর এবং পরে তাঁর কিছু উত্তরাধিকারীর হাতে তা এক ইতিবাচক বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

৩.৩ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কে : বার্লিন বিপ্লবের সাফল্য

তাঁর প্রথম গ্রন্থ "The Varieties of History" -র মুখবন্ধে র‍্যাঙ্কে বলেন : "অতীতের বিচার এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য বর্তমানকে নির্দেশ—এই দুইয়ের দায়িত্ব ইতিহাসের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আমার এই রচনা অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়— এ শুধু দেখাতে চেয়েছে যা বাস্তবে ঘটেছিল (wie es eigenthich gewesen)। শেষের বাক্যাংশটি আধুনিক অভিজ্ঞতানির্ভর ইতিহাস-রচনার ঘোষণাপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর সাহায্যে বলার চেষ্টা করা হয় যে, ইতিহাস কোনও দার্শনিক দূরকল্পনা অথবা শিল্পকলা, চিত্তবিনোদন বা নীতিশাস্ত্রের বিকল্প নয়। ইতিহাস হচ্ছে ঠিক আগে যা ছিল। "তথ্যের যথাযথ উপস্থাপনাই ইতিহাস-রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম।"

র‍্যাঙ্কের অভিভাবকত্বেই নতুন "Historische Zeitschrift' (1859) তার লেখক ও পাঠকদের কাছে ঘোষণা করে যে, "সবার উপরে এই সাময়িকপত্র বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠুক এটাই আমাদের কাম্য। সুতরাং এর প্রথম কর্তব্য হল ঐতিহাসিক গবেষণার প্রকৃত পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করা এবং তা থেকে বিচ্যুতিগুলিকে নির্দেশ করা।" ১৯০২ সালে Regius Professor of Modern History হিসাবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জে এইচ বারিও এই লক্ষ্যগুলিকেই আবার দৃঢ়তার সঙ্গে পেশ করেন। "যতদিন পর্যন্ত ইতিহাসকে এক কলা হিসাবে ভাবা হত, ততদিন সভ্যতা ও অভ্রান্ততার দাবী অতটা গুরুতর ছিল না... স্বাধীন এক বিজ্ঞান হিসাবে মান্যতা পেতে হলে তার সম্ভাবনা ও পরিধির এক নতুন রূপান্তরের ধারণা প্রয়োজন... যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য তা সকলের দৃষ্টির অতীত ছিল... পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যে পরিবর্তনের জন্য আমরা জার্মানীর কাছে কৃতজ্ঞ।" এইভাবে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে বার্লিন বিপ্লব এবং লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে এই ধারণাটিকে জাগিয়ে তোলেন যে, ইতিহাস এখন এক বৈধ, বিজ্ঞানসম্মত বিষয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.৪ ইতিহাস : অতীতের রাজনীতি

র‍্যাঙ্কে বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি অতীতের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব ভাবাবেগ, নিজস্ব মতাদর্শ ও নিজস্ব রাজনীতি আছে। তিনি মনে করতেন যে, অতীতের অধিকৃত পুনর্নির্মাণ নির্ভর করে সেই নিজস্বতা কতটা কঠিনভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর। এই নিজস্বতাগুলি অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা, যা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি বা চরিত্র দিয়েই শুধুমাত্র বোঝা সম্ভব। এই ধরণের নিজস্বতা কোনও ব্যক্তিসমূহের সম্মিলিত গোষ্ঠী অথবা প্রতিষ্ঠান, যেমন রাষ্ট্র বা গির্জা হতে পারে। এদের প্রত্যেকটি একেবারে অনন্য, যা নিয়ন্ত্রিত হয় এক অন্তর্নিহিত নীতির দ্বারা— যে নীতি তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও বাইরের কাজকর্মের নির্ণায়ক। এই নীতিগুলিকে এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। কাজেই, ইতিহাসে সামান্যীকরণ কোনও কাজে আসে না। কোনও ঐতিহাসিক নিজস্বতাকে তার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করলে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পৌঁছনো যায় না। র‍্যাঙ্কের মতে অতীতের রাজনীতির নিজস্বতার পরিপ্রেক্ষিতের উপর জোর দিলেই কোনও ইতিহাসবিদ বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

নিছক ঘটনাই র‍্যাঙ্কের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মানুষ নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কখনওই তার সজীব প্রকাশভঙ্গি প্রতিটি পৃথক মুহূর্তের দিকে মনোনিবেশ করা ঠিক নয়। বরং তার বিকাশ, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যের সমগ্রতা থেকেই আমরা তার ধারণা পেতে পারি, যা থেকে আমরা কোনওভাবেই মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারি না।

নিজস্বতার সমগ্রতার উপর র‍্যাঙ্কে যে গুরুত্ব আরোপ করেন তা অবশ্য নিজস্ব রাজনীতি বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়— যাকে তাঁর সমালোচকরা রক্ষণশীলতা বলতে পারেন। তিনি তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিবন্ধগুলি ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে নিজেরই সম্পাদিত পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধগুলিতে তিনি উদার-গণতান্ত্রিক ও চিরাচরিত রক্ষণশীল রাজনৈতিক কাঠামোগুলির এক তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেন। অনেকেই তাঁকে রক্ষণশীল মনে করতেন এই কারণে যে, তিনি মনে করতেন ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ধারণাগুলি জার্মানীতে অনুসরণ করা সম্ভব নয় কারণ জার্মানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র ভিন্ন রকমের। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করতেন যে প্রতিটি দেশ একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার ফলে কোনও প্রবণতারই সামান্যীকরণ সম্ভব নয়। র‍্যাঙ্কে বিশ্ববিপ্লবের ধারণাকে বর্জন করেন, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে সমর্থন করেন এবং মানব চরিত্রের মৌলিক সৃষ্টিতে আস্থা জ্ঞাপন করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, বিপ্লব এই মৌলিকতাকে ধ্বংস করে দেবে ও এক সংকটের অবস্থার জন্ম দেবে। এই আশঙ্কা থেকেই র‍্যাঙ্কে ভিয়েনা মীমাংসা বা সমাধান, জার্মান কনফেডারেশন গঠন ও প্রুসিয়ার রাজতন্ত্রী রাজনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন করেন।

৩.৫ ইতিহাসের সূত্রগুলির দিকে নজর ফেরানো

আধুনিক, পেশাদার ইতিহাস অধ্যয়নের অন্যতম স্তম্ভ হল সূত্রগুলিকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো। বার্টহোল্ড ডি নিবুর ও র‍্যাঙ্কে, এই দুজনেই সূত্র, তাদের বৈধতা, পরিপ্রেক্ষিত ও তাদের গঠনের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালান। জাঁ মবিলন (১৬৩২-১৭০৭) ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন, র‍্যাঙ্কের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। সাহিত্যগুণকে বিসর্জন না দিয়েও, র‍্যাঙ্কে ইতিহাসকে সাহিত্যের থেকে বেশি বিজ্ঞান মনে করতেন। তিনি সঠিক পদ্ধতিগত প্রণালীর আঙ্গিককে নান্দনিক রূপের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ঐতিহাসিক

পরিস্থিতিগুলিকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের এক সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রয়াস হেগেল করেছিলেন, র‍্যাঙ্কে তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

৩.৬ বিশ্বজনীন ইতিহাসের স্বপ্ন

র‍্যাঙ্কের মতে ইতিহাসের পরিধি বিশাল ইতিহাসবিদ হিসাবে যাত্রার শুরুতে র‍্যাঙ্কে তাঁর লেখনীর ডগায় সমগ্র বিশ্বকে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই বিশ্বের ক্রমবিকাশের কাহিনী বলতে, যা বিশ্বজনীন ইতিহাসের এক ঐতিহ্যের সূচনা করবে, যে ইতিহাসকে বিশ্বজনীন ইতিহাস বলা যাবে। সারা জীবন ধরে র‍্যাঙ্কে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তারই নিদর্শন হিসাবে যে সব বিশাল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে আছে ১। History of the Roman and German Peoples, 1484-1535; ২। History of the Reformation in Germany, three volumes, 1845-1847; ৩। Memoirs of the House of the Brandenburg, three volumes, 1849; ৪। Civil Wars and Monarchy in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, two volumes, 1852 ; ৫। A History of England Principally in the Seventeenth Century, six volumes, 1875 ; এবং ৬। World History, nine volumes, 1881-1888 (তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

৩.৭ র‍্যাঙ্কে : সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা

এ কথা সত্য যে সূত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির দিকে নজর না দিয়ে ঐতিহাসিক জাঁকজমক ও বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি পক্ষপাত, ঐশ্বরিক বিধানে বিশ্বাস, মার্টিন লুথার ও Hohenzollern বংশ ও প্রুসিয় রাষ্ট্রের উপর অন্ধবিশ্বাস এবং বিশ্ব ইতিহাসকে গ্রীকো-রোমান, ইউরোপীয় ও জার্মান ইতিহাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ফলে র‍্যাঙ্কের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে র‍্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের ফলেই পণ্ডিতরা বাস্তবকে কোনও কাল্পনিক ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে অস্বীকার করেন। তাঁরা "রৈখিক ইতিহাসের শূন্যগর্ভ কল্পনাকে বর্জন করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম নিজস্বতাগুলিকে চিহ্নিত করতে শেখেন, সরলীকরণের অযোগ্য বিশিষ্টতাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন, অসংখ্য অকথিত তথ্যকে স্বীকার করেন এবং অশেষ সৃষ্টি ও রূপান্তর সম্পর্কে সচেতন হন।"

৩.৮ উপসংহার

তথ্য উপাদানগুলির ভাষা ও মূল পাঠের সমালোচনা-ভিত্তিক যে বস্তুনিষ্ঠ রচনাকে র‍্যাঙ্কে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা নিজেই ঊনবিংশ শতকের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপ্লব। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তাঁর বিদগ্ধ পদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের প্রণালী পাশ্চাত্যে ইতিহাস-রচনার উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

৩.৯ অনুশীলনী

১। ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে বার্লিন বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

২। ''বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস' বলতে র‍্যাঙ্কে কী বুঝেছিলেন?

৩। বিশ্বজনীন ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কের ধারণা কী?

৪। ইতিহাস সম্পর্কে 'historicist' ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ কর।

৫। আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্কের অবদানের মূল্যায়ন কর।

৩.১০ আকর গ্রন্থ পঞ্জী

1. R C Collingwood : The Idea of History, London, 1994.
2. Patrick Gradiner (ed.) : Theories of History, London, 1960.
3. H B Barnes : A History of History Writing, London, 1958.
4. G P Gooch : History of Histories, London, 1913.
5. J B Bury : The Idea of Progress, New York, 1955.

একক ৪ ❑ ইতিহাস-রচনা ও প্রগতির ধারণা

গঠন ঃ

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান : জার্মানী ও বুর্কহার্ডট

৪.৩ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান : ইংল্যান্ড — মেকলে থেকে অ্যাকটন

৪.৪ বিষয়ের পুনরানুসন্ধান : ফ্রান্স ও জুল্‌স মিশেলেট

৪.৫ কার্ল মার্কস ও ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৪.৬ মার্কসীয় ধারণার সারবস্তু

৪.৭ সাধারণ প্রবণতা : বিজ্ঞানের ধারণা

৪.৮ উপসংহার

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ আকরগ্রন্থ সূচী

৪.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকে, বিশেষত তার দ্বিতীয় অর্ধে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশপাশি কিছু অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা দিয়েছিল। এগুলি হল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রবক্তা ছিলেন তরুণ জার্মান পণ্ডিত এবং ইংরেজ ইতিহাসবিদরা— এবং আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা পরবর্তী শতকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই এককে ওই দুই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান : জার্মানী ও বুর্কহার্ডট

র‍্যাঙ্কের পর জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর দুই দিক থেকে আক্রমণ চালানো হয়। একদিকে এই চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা— অর্থাৎ " যে সুসম্বদ্ধ প্রণালী বিজ্ঞানকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে"— তা সনাতন দর্শনের যুক্তিবাদী পদ্ধতিগুলির মতই ইতিহাসের সঙ্গে সংগতিহীন। অন্যদিকে দাবী করা হয় যে যুক্তিবাদী দর্শনের চিরাচরিত কাঠামো বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞানে নতুন কাঠামো— এই দুটির কোনওটিতেই ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বুর্কহার্ডট— যিনি বার্লিনে র‍্যাঙ্কে-র উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন— তাঁর 'গুরুগম্ভীর ও দুর্বোধ্য' প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ইতিহাস সব থেকে অবৈজ্ঞানিক এক বিষয়— কিন্তু তাতে জানার মত অনেক কিছু থাকে।"

৪.৩ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান : ইংল্যান্ড — মেকলে থেকে অ্যাকটন

ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘ দিন ধরে ইতিহাস-রচনা এক ধরণের 'হিস্টরিসিজম' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯)। মেকলে বলেন যে, "একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদ ঔপন্যাসিকের আত্মসাৎ করা উপাদানগুলি পুনরুদ্ধার করবেন।" র‍্যাঙ্কে অবশ্যই এই মত গ্রহণ করেননি। পার্লামেন্ট থেকে অবসর গ্রহণের আগে মেকলে 'Lays of Anacient Rome' (1842) এবং 'Critical and Historical Essays' (1843) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর পাঁচ খণ্ডের 'History of England' (1899-61) গ্রন্থে তিনি প্রথাগত আখ্যানকে বিধিবদ্ধ করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক 'হুইগ' ('Whig—ব্রিটেনের পার্লামেন্টের শক্তিবৃদ্ধির সমর্থক ও সংস্কারপন্থী পার্টি) ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন যা পরের প্রজন্মগুলিকে প্রভাবিত করে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর একটি প্রবণতা মূর্ত হয়ে ওঠে লর্ড অ্যাকটনের (১৮৩৪-১৯০২) রচনায়। তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ কমন্সের সদস্য (১৮৫৯-৬৫), রোমান ক্যাথলিক মাসিক পত্রিকা 'The Rambler'-এর (১৮৫৯-৬৪) সম্পাদক এবং ১৮৬৫ সাল থেকে উইলিয়াম ই গ্ল্যাডস্টোনের উপদেষ্টা। অ্যাকটন র‍্যাঙ্কের পাশে দাঁড়ান যখন তিনি বলেন যে, ইতিহাসবিদ হলেন এক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রাহক— যাঁর কাজ হল প্রকৃত ঘটনাকে নথিবদ্ধ করা। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল এই রকম : "ইতিহাসবিদ তখনই সর্বোত্তম যখন তিনি দৃষ্টির আড়ালে থাকেন।" অ্যাকটন "কাঁচি ও আঠা" ধারার (যাঁরা অতীতের বিবরণ তুলে এনে নিজেদের রচনাতে বসান) ইতিহাসবিদদের কালো তালিকাভুক্ত করেন এবং সহযোগীদের যুগ নয়, সমস্যাগুলির উপর নজর দিতে নির্দেশ দেন। জাতীয়তাবাদের বিরোধী হিসাবে পরিচিত অ্যাকটন এই বিখ্যাত ভাবগর্ভ উক্তিটি করেন : "ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়, চরম ক্ষমতা চরম দুর্নীতির জন্ম দেয়।"

লর্ড অ্যাকটন রূপান্তরের ধারণাতে নয়, বিবর্তনমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কখনওই এ কথা মেনে নিতেন না যে, বিদ্যমান তথ্যগুলিতে নতুন এক তথ্য যোগ করলেই পুরনোটির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে যায়। ইতিহাস সম্পর্কে এই মত, কলিংউডের মতে যা "বিচ্ছিন্ন অংশগুলি নিয়ে গঠিত", তা ইংরাজ মানুষদের জন্য কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রির মধ্যে এক চিরায়ত রূপ পায়, যার পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন অ্যাকটন। কেমব্রিজের ইতিহাসগুলি ছিল "এক বিশাল সংকলন, যার অধ্যায়গুলি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলির অংশবিশেষও বিভিন্ন লেখকের রচিত— যেখানে সম্পাদকের দায়িত্ব হল এগুলিকে এক সামগ্রিক সংহতি প্রদান করা।"

৪.৪ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান : ফ্রান্স ও জুল্‌স মিশেলেট

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়টি ফ্রান্সে ইতিহাস-রচনার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে অতীতের মাধ্যমে বর্তমানকে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং ফরাসী বিপ্লব নিজেই এক গভীর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সের রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত জুল্‌স মিশেলেট (১৭৯৮-১৮৭৪) ১৮৩১ সালে রেকর্ড অফিসের ঐতিহাসিক বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। এই কর্মসূত্রেই তিনি তাঁর বিখ্যাত সতেরো খণ্ডের History de France-এর (History of France, 1833-1867) অন্যান্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। নিজের ব্যক্তিত্বকে তাঁর আখ্যানের মধ্যে নিমজ্জিত করে অতীতকে জাগিয়ে তোলার যে প্রণালী তিনি ব্যবহার করেন, তা বিরাট নাট্যক্ষমতার সঙ্গে উচ্চমানের শিক্ষার এক ঐতিহাসিক সংশ্লেষণের জন্ম

দেয়। History of France রচনার দুটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি The People ও History of the French Revolution নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দীর্ঘকাল ইতিহাস-রচনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে মিশেলেটের রোমান্টিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে। শুরুতে তিনি ছিলেন এক চরমপন্থী ক্যাথলিক ও রক্ষণশীল পণ্ডিত, কিন্তু ক্রমশ তিনি এক উদারপন্থী লেখকে পরিণত হন এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি স্বীকার করেন যে তাঁকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করে ভিকোর দেওয়া New Science গ্রন্থটি।

History of France-এর প্রথম ছয়টি খণ্ডে মিশেলেট প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগীয় পর্যায়ের অবসান পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসের বিবরণ দেন। অঞ্চল, গোষ্ঠী ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তাঁর রচনাকে ফরাসী দেশই যেন নতুন জীবন লাভ করে। জোয়ান অফ আর্ককে দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের প্রতীক এবং ফরাসী জাতির অন্তরাত্মা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। তাঁর এই মহান রচনাতে মিশেলেট অতীতের রাজনীতি, অর্থনীতি; ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে উজ্জ্বলভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। পরের খণ্ডগুলিতে তিনি নবজাগরণ থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত আলোচনা করেন।

History of France-এর পাতাগুলির মধ্যেই মিশেলেটের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ছ'টি খণ্ডে তিনি গির্জার কাছে ফরাসী জাতির ঋণ স্বীকার করেন। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তিনি গির্জা, অভিজাততন্ত্র এবং তাদের রক্ষক রাজার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, মিশেলেটর রচিত ইতিহাস পুরোহিত ও রাজাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা, তথ্যগুলির হঠকারী ও ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ এবং প্রতীকী ব্যাখ্যার প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগের জন্য কিছুটা যেন বিকৃত হয়ে পড়েছে।

৪.৫ কার্ল মার্কস ও ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

বিপ্লব সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিশেলেটের ধারণাগুলির যেমন পরিবর্তন ঘটে, কার্ল (হেইনরিখ) মার্কসের (১৮০৮-১৮৮৩) হাতে তেমনই বিপ্লবের প্রণালী সংক্রান্ত ধারণাগুলির পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও সব থেকে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিত মার্কস শুধুমাত্র রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন এক দার্শনিক ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকার।

এঙ্গেলসের ভাষায় 'প্রগতি বা বিকাশের সূত্র' অন্বেষণ করার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ডারউইনের মত মার্কসও বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সংশ্লেষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কোঁতে ও হেগেলের মত মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, নির্দিষ্ট কোনও ঘটনার মূল্য ও অর্থ তখনই বোঝা সম্ভব, যখন তাকে বিকাশের প্রক্রিয়ার এক অংশ হিসাবে দেখা হয়। তাঁর কাছে সব জ্ঞানই এক অর্থে ঐতিহাসিক জ্ঞান— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া বিকাশের জ্ঞান। সুতরাং বর্তমানকে সর্বদা অতীতের আলোকে উপলব্ধি করা উচিত।

রচনার বৈচিত্র্য ছাড়াও মার্কসের লেখায় যুগের যে বৈচিত্র আছে সেটাও উল্লেখ করার মত। এগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা নিয়ে মোটামুটি মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি, অর্থাৎ তথাকথিত তারুণ্যের সময়ের রচনাগুলি লেখা হয় ১৮৪১ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে আছে Introduction to the Critique of Hegel's Philosophy of Law, The Jewish Question, The Holy Family এবং The Poverty of Philosophy। শেষোক্ত গ্রন্থটি লেখা হয় প্রুধোঁর The Philosophy of Poverty গ্রন্থটির

উত্তরে। এই তারুণ্যের যুগের শেষ মনে করা হয় German Ideology ও বিখ্যাত, নীতিদীর্ঘ রচনা The Communist Manifesto-র সঙ্গে। মার্কসের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি রচনা হল ১৮৫৯ সালের A Contribution to the Critique of Political Economy ও অবশ্যই Capital।

রেমন্ড অ্যারনের মতে, "সবার প্রথমেই এ কথা মনে রাখা উচিত যে মার্কস ছিলেন ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত একজন সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ। এই শাসনব্যবস্থা, মানুষের উপরে তা যে পরিণাম চাপিয়ে দিয়েছে এবং তার সম্ভাব্য বিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ছিল।" তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বন্দভিত্তিক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণকারী এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যদ্বক্তা— এই দুই মার্কসকে পৃথক করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

মার্কসের প্রথম ও মূল ধারণা ছিল এই যে নিজের সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার বিভিন্ন প্রণালীগুলি ব্যাখ্যা করে ইতিহাসের চলন অনুসরণ করা যায় না। সেই কাজ করা সম্ভব হবে সমাজের কাঠামো, উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের চলনের মূল শক্তি হল দ্বন্দ্ব, যা ঘটে উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের মধ্যে। এই সংঘর্ষ ঘটে এক আইনী ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে, যাকে বলা হয় উপরিকাঠামো। তৃতীয়ত, উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বে শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। চতুর্থত, এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের তত্ত্বের আভাস। কারণ মার্কসের ইতিহাস-ভাবনায় বিপ্লব কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনা নয়, তা হল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রকাশ। পঞ্চমত, তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কিন শুধুমাত্র পরিকাঠামো ও উপরিকাঠামোর পার্থক্য নির্দেশ করেননি, সামাজিক বাস্তব ও চেতনাকেও পরস্পরের বিরোধী মনে করেছিলেন। সবশেষে মার্কস মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি এঁকেছিলেন। চিন্তাভাবনার প্রণালীর ভিত্তিতে কঁতে যেমন মানুষের বিবর্তনের মুহূর্তগুলি নির্দিষ্ট করেছিলেন, মার্কসও তেমনই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ভিত্তিতে মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি চিহ্নিত করেছিলেন। এই পর্যায়গুলিকে তিনি চারটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিতে ভাগ করেছিলেন, সেগুলি হল এসীয়, আদিম, সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া।

মার্কসের ইতিহাস-ভাবনায় বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিই হল শেষ দ্বন্দ্বমূলক সামাজিক নির্মাণ, কারণ তাকে সরিয়ে যে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয় সেখানে উৎপাদকদের এক সমন্বিত গোষ্ঠী স্থান ও কালের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এ ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে শোষণ করার প্রয়োজন রোধ করে না বা উৎপাদন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক কোনও শ্রেণীর কাছে শ্রমিকশ্রেণীকে অনুগত থাকতে হয় না।

৪.৬ মার্কসীয় ধারণার সারবস্তু

পরবর্তী শতকে পাশ্চাত্যে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে মার্কসের যে ইতিহাস ব্যাখ্যা এক বিপ্লবের সূচনা করে তাকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে; ১। জ্ঞান কখনওই পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনার এক বিমূর্ত প্রক্রিয়া নয়— তা লাভ করতে হলে কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন; ২। এর ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও রাজনীতি অবিভাজনীয়; ৩। মানুষের উৎপাদনের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে হবে; এবং ৪। বিশ্ব ও মীর ব্যবস্থাগুলিকে ঘটনার বাহ্যিক রূপ দিয়ে নয়, তাদের যুক্তিগ্রাহ্যতার নিরিখে বিচার করতে হবে। মার্কস দৃষ্টিবাদী এই ধারণাকে বর্জন করেন যে ইতিহাসকে মূলত এক স্বাভাবিক বা স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হিসাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের অভিপ্রায় ও সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকাকে স্বীকার করেন। মার্কস এই ধারণাকেও

অস্বীকার করেন যে, ইতিহাসের আরো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে মানুষের অভিপ্রায়ের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৪.৭ সাধারণ প্রবণতা : বিজ্ঞানের ধারণা

ই জে হবস্‌বম লক্ষ্য করেছেন যে, ঊনবিংশ শতকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ইতিহাস-রচনার যেন বন্যা বয়ে যায়। এইসব ইতিহাসগুলি রচনা করেন টকুয়েভিল ও ফ্রাঁসোয়া গুইজটের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। গুইজটের এক বিখ্যাত গ্রন্থ হল Memoris to serve as a History of My Age (1858-67)। ইতিহাস-রচনায় এই উৎসাহের এক দীর্ঘস্থায়ী ফল হল প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ। অতীতের স্মরণচিহ্ন সংগ্রহ করা এক সর্বজনীন উদ্দীপনাতে পরিণত হয় এবং জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তখনও জাগ্রত হয়ে ওঠেনি এমন সব দেশের ইতিহাসবিদরা প্রায়শই জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করার কাজে নেমে পড়েন। এইভাবে ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করে তাদের Ecole des Chentes (1821), ইংরেজরা তাদের Public Records Office (1838)। এদিকে জার্মানরাও প্রকাশ করতে শুরু করে Monumenta germaniae Historiae (1826)।

ঊনবিংশ শতকের এই আখ্যানগুলি মানবজাতির বিকাশের যে ব্যাখ্যা জ্ঞানদীপ্তি উপস্থাপিত করেছিল, সেগুলিকেই নতুন রূপ দিয়ে ইতিহাস-রচনার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করার কাজে লাগে। এই আখ্যানগুলিতে বিকাশ বা প্রগতির অর্থ হল অতীতের পাপগুলিকে কাটিয়ে ওঠা। কোঁতের কাছে ইতিহাস ছিল পুরাকাহিনী ও কাল্পনিক অনুমানগুলির বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কাহিনী, যাতে শেষ পর্যন্ত জয় হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির।

তাঁদের মধ্যে যতই মতভেদ থাক, ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ ব্যাপারে এক মত ছিলেন যে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস মানুষকে তার অতীতকে বুঝতে ও ভবিষ্যতকে আন্দাজ করতে সাহায্য করে... "ইতিহাস বীরদের গৌরবান্বিত করেছে ও গোষ্ঠীদের স্বীকৃতি দিয়েছে; সে মিত্র ও শত্রু বিজিত ও পরাজিত, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসঘাতককে পৃথক করেছে।"

৪.৮ উপসংহার

জার্মান বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যই ঊনবিংশ শতকের একমাত্র প্রধান চিন্তাধারা ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়ারের রচনার মধ্যে আমরা ইতিহাসের প্রতি যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি, তা ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম দিকেও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদ সর্বত্র এই ভাববাদী ঐতিহ্যকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়। ইতিহাসকে ব্যবহার করা হতে থাকে জাতীয়তাবাদের অস্ত্র ও প্রগতি বা বিজ্ঞানের ধারণার বাহক হিসাবে। মার্কসের কাছে প্রগতির অর্থ ছিল সমাজের বিকাশ। এই কারণে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিগুলির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন।

৪.৯ অনুশীলনী

১. র‍্যাঙ্কের পরে জার্মানীতে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কি উল্টে যায়? অ্যাকটন কী ভাবে ইংরাজদের ইতিহাসে মেকলের প্রথাগত আখ্যানের পরিবর্তন সাধন করেন?

২. ঊনবিংশ শতকে ফরাসী ইতিহাস রচনার মূল প্রবণতাগুলি কী কী?

৩. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে জুলস্ মিশেলেট ও ফরাসী বিপ্লব পরস্পরের কাছ থেকে অবিচ্ছেদ্য?

৪. কার্ল মার্কস ইতিহাসকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন?

৫. ঊনবিংশ শতকে ইতিহাস কি প্রগতির ধারণার মূল বাহক ছিল?

৪.১০ আকরগ্রন্থ সূচী

1. E. J. Hobsbawm : The Age of Revolution, New Delhi, 1992.
2. T.C.W. Blanning : The Nineteenth Century, Europe, Oxford, 2000.
3. Bernard Crick : Socialism, Delhi, 1998.
4. Raymond Aron : Main Currents in Sociological Thought, Vol. I, London, 1986.
5. David Caute : The Left in Europe since 1789, London, 1966.

একক ৫ ❑ মার্কস এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

গঠন ঃ

৫.০ প্রস্তাবনা

৫.১ মার্কসবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

৫.১.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

৫.১.২ সমালোচনা

৫.২ ট্রেভেলিয়ান এবং ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাস

৫.৩ রাজনীতির সামাজিক প্রেক্ষাপট ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ইতিহাস চর্চা

৫.৪ অনুশীলনী

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ প্রস্তাবনা

বর্তমান পর্যায়ে সামাজিক ইতিহাস চর্চার তিনটি ধারার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির বিশ্লেষণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্কস এক নতুন পথের প্রবর্তক। একে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজ ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ান ইতিহাসকে শিল্পকর্ম রূপে প্রচার করেন। ঐতিহাসিককে অবশ্যই তথ্যানুগ হতে হবে। কিন্তু সেখানেই তার দায়িত্ব শেষ নয়। পাঠকের মনশ্চক্ষে ইতিহাস যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে, সে দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন ট্রেভেলিয়ান। পর্যায় শেষে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসের সামাজিক প্রেক্ষাপট রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি।

৫.১ মার্কসবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

কার্ল মার্কস কে ছিলেন

মহান জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ইতিহাসের এক নতুন বিচারপদ্ধতির জনক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলের ট্রায়ার শহরে তাঁর জন্ম। পিতার ইচ্ছায় তিনি প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে তিনি দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে হেগেলের রচনা গভীর আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। হেগেলের বক্তব্য অনুযায়ী এই পৃথিবীতে কোন কিছুই নিশ্চল নয়; দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। হেগেলীয় দর্শনের গতিশীলতা এবং দ্বন্দ্ববাদ মার্কস্ গ্রহণ করলেও হেগেলের ভাববাদ তিনি বর্জন করেন। বলা হয়, হেগেলের দর্শন এতকাল মাথার ওপর ভর দিয়েছিল। মার্কস তাকে পায়ের ওপর— অর্থাৎ বস্তুবাদী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাইনিশ জেইটুঙ্ নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকায় সম্পাদনাভার মার্কস গ্রহণ করেন। প্রাসিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার অল্পকালের মধ্যে তা নিষিদ্ধ করে। মার্কস নির্বাসিত হন। প্যারিসে এসে তিনি প্রুধোঁ, হেন্‌রিক হাইনে প্রমুখ সমাজবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস নামে সমমনোভাবাপন্ন অপর একজন জার্মান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গেও এখানে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা সম্ভব নয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশে মার্কস ফ্রান্স পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে তিনি আশ্রয় নেন। এখানে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তার German Ideology গ্রন্থটি রচিত হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিচয় এতে মেলে। মার্কসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কমিউনিস্ট লীগ গঠিত হয়। সংগঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মার্কস্ এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন (১৮৪৮)। এখানে সমাজতন্ত্রের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলেন, "মার্কসের রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী মতগুলিকে এই গ্রন্থ একটি দার্শনিক প্রতিবাদে উদ্ভাসিত করে। সমাজতন্ত্রবাদকে এই গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে।" এই গ্রন্থে দুনিয়ার মজদুরকে এক হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় বিপ্লবের বার্তাবাহী রাইনিশ জেইটুঙ্ পত্রিকা সম্পাদনা করে বিপ্লবীদের পক্ষে এই পত্রিকা বৎসরাধিক কাল প্রকাশ পেয়েছিল। মার্কসের শেষ জীবনের আশ্রয় ছিল ইংল্যান্ড। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও তাঁর গবেষণায় কখনও ভাঁটা পড়েনি, রচনাকর্মও অব্যাহত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায় সাম্যবাদের মহান গ্রন্থ ডাস ক্যাপিটাল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ লন্ডন শহরে মার্কস্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মার্কসের রচনায় তত্ত্ব এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। উল্লিখিত German Ideology বা Capital গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে সমসাময়িক ঘটনা বিশ্লেষণে। বিশেষত ফ্রান্সের ইতিহাস ও তার বিপ্লবী ঐতিহ্য তিনি যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করেছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে The Class Struggle in France এবং লুই নেপোলিয়নের ক্ষমতারোহণ বিষয়ে The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon গ্রন্থ দুটির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস কমিউনের সমর্থনে Civil War in France গ্রন্থটি লেখেন মার্কস্। তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত সামগ্রিক চিন্তার প্রধান সূত্রগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

৫.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

মার্কসীয় দর্শনের মূলে আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। পদার্থের মধ্যে রক্ষণশীল শক্তি হচ্ছে থিসিস, পরিবর্তনকামী শক্তি হল অ্যান্টি-থিসিস এবং এই দুয়ের টানাপোড়েনের পরিণাম সিন্থেসিস। যে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার কিছু পরেই দেখা দেয় তার বিপরীত। উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জন্ম নেয় এক নতুন পরিস্থিতি। হেগেলের রচনায় আমরা প্রথম এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি মনে করতেন আদর্শের সংঘাত ইতিহাসের চালিকা শক্তি। মার্কস বাস্তবে দ্বান্দ্বিকতার সূত্রগুলি প্রথম প্রয়োগ করেন। হেগেলের মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন— কোন ঐশ্বরিক শক্তির ইচ্ছায় বা কোন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় ইতিহাস সৃষ্টি হয়নি। ইতিহাস হল উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি।

ইতিহাসের অর্থনীতির ব্যাখ্যার ওপর মার্কস জোর দিয়েছেন। প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই শ্রম এবং বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীরা শ্রমশক্তির মাধ্যমে পরিবেশকে কেবল ব্যবহার করতে পারে— তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। পশুশক্তির মাধ্যমে পরিবেশকে কেবল ব্যবহার করতে পারে— তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। পশুশক্তি জৈবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত পেশীর সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষের শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মস্তিষ্কের প্রয়োগ— কেবল দৈহিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠন করেছে বিভিন্ন উপকরণ, তাদের কাজে লাগিয়েছে। শ্রমের মাধ্যমে পরিবেশের বদল ঘটিয়ে ব্যক্তি একদিকে মানুষ হিসেবে তার নিজের ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে; অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করেছে— বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার শ্রমশক্তিকে প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনে এবং শ্রমকে একটি সামাজিক রূপ দেয়।

মার্কস মনে করেন উৎপাদনব্যবস্থা সমাজকে পরিচালিত করে। Capital গ্রন্থের খসড়া (Grundvisse) রচনায় তিনি বলেন, উৎপাদিকা শক্তি হল বিষয়বস্তু আর উৎপাদন সম্পর্ক আঙ্গিক। দুয়ের মধ্যে content এবং form–এর সম্পর্ক— একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যটিকে ভাবা যায় না। উভয়ের সমন্বিত অবস্থাকে বলা হয় উৎপাদনপদ্ধতি (mode of production)। মানুষ এককভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এই কারণে প্রয়োজন হয় সম্মিলিত শ্রমশক্তির। ফলে উৎপাদিকা শক্তি শুরু থেকে সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আদিম যুগে সমগ্র সমাজ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অধিকারী ছিল। কিন্তু ক্রমশ এক শ্রেণীর মানুষ ক্রীতদাস প্রথার সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে, ক্রীতদাসদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয় মার্কস মনে করেন, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির পতনের তা প্রধান কারণ। অনুরূপভাবে দেখা যায়, রোম সাম্রাজ্যে ৭৪ থেকে ৭১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করেছে।

ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে সামন্ততন্ত্রের যুগে ভূমিদাসরা ক্রীতদাসদের মতো শৃঙ্খলিত না থাকলেও সমানই শোষণের শিকার হয়েছিল। সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত বিদ্রোহগুলি তার প্রমাণ দেয়। যেমন— ইংল্যাণ্ডে ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ জার্মানিতে ১৫২৪-১৫২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষক বিদ্রোহ। ধনতন্ত্রে এই শোষণের ধারা অব্যাহত। পুঁজিপতিরা উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনব্যবস্থার ওপর শ্রমিকদের কোন কর্তৃত্ব না থাকায় নির্ধারিত বেতনের পরিবর্তে তারা তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতিরা মুনাফা ভোগ করে। অথচ উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের কোন ভূমিকা মার্কস্ স্বীকার করেন না। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে একমাত্র শ্রমকে মূলধন সৃষ্টির কারণ বিবেচনা করা হয়। মুনাফার ওপর শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে পুঁজিপতিরা তাদের বঞ্চিত করেছে বলে মার্কস মনে করেন।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত পূর্ববর্তী যত সমাজের ইতিহাস আমরা জানি, তা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ("The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.") শ্রেণী শব্দটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেননি। তিনি নিজে জানিয়েছেন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো-র রচনায় সমাজে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় (১) পুঁজিপতি বা মুনাফা অর্জনকারী (২) জমিদার বা খাজনা আদায়কারী এবং (৩) শ্রমিক বা বেতনভোগী। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা করেছিলেন কয়েকজন ফরাসী ঐতিহাসিক (গিজো, মিনয় প্রমুখ)। ইতিহাসের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে এমন আলোচনা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন না। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডো শ্রেণী বিভাজনকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

মার্কস্ এবং এঙ্গেলস প্রথম উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রেণীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। মার্কসের মতে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ

রক্ষার্থে রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শোষণকার্য অব্যাহত রাখা। রাষ্ট্রের আইন সেই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়। উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী যারা তারা নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন সম্পর্ককে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি সমাজের বাস্তব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎপাদন স্তরকে অতিক্রম করলে সংকটের সৃষ্টি হয়। পুরনো উৎপাদনসম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে। উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়। এভাবেই দাসব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্র পার হয়ে আমরা ধনতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয়েছি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির সামঞ্জস্য ঘটে না। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী— অর্থাৎ যারা সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক— সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে।

মার্কসের বিচারে যা কিছু ঘটে তা অর্থনৈতিক সূত্রে বাঁধা— এমন একটি ভুল ধারণা (economic determinism) আমরা প্রায়ই করে থাকি। এঙ্গেলস এই ধরনের সরলীকরণ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ইতিহাসের চূড়ান্ত কিন্তু একমাত্র নিয়ামক নয়। তা হল বুনিয়াদ, যার ওপর রাষ্ট্র ও সমাজের সৌধ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম বা সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনা ওপরের এই সৌধের অন্তর্গত। তাদের টানাপোড়েন ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, কখনও কোন একটি উপাদানের প্রভাব সর্বাধিক মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণই চূড়ান্ত রূপে দেখা দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে এঙ্গেলস এইভাবে মার্কসের (এবং সহযোগী হিসাবে তাঁর নিজের) অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। (Engels to Bloch, 21 September, 1890)

তাঁর পূর্ববর্তী সাম্যবাদীদের মার্কস্ 'কল্পনাশ্রয়ী' বলে মার্কস অভিহিত করেছিলেন (Utopian Socialism)। বিপরীতে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) বা কমিউনিজম বলে তাঁর মত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমালোচকদের কতকগুলি প্রধান যুক্তি নির্দেশ করা যেতে পারে।

৫.১.২ সমালোচনা

প্রথমত অর্থনীতিকে ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে দেখতে অনেকে রাজি নন। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক তাঁদের মতে অতি জটিল। কোন একটি বিশেষ কারণকে অন্যান্যগুলির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। মানুষকে আদর্শের জন্য প্রাণত্যাগ করতে দেখা গেছে। অর্থনীতিক চিন্তা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়ত, মার্কস্ যেভাবে ইতিহাসের স্তর ভেদ করেন (আদিম সমাজতন্ত্র ↔ দাসব্যবস্থা → সমাজতন্ত্র → ধনতন্ত্র) তা সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন একটি স্তর এড়িয়ে বা উল্লম্ফন করে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত একেবারে অনুপস্থিত নয়। মার্কস নিজের এই স্তর ভেদ সর্বত্র প্রযোজ্য কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' নামে স্বতন্ত্র উৎপাদনব্যস্থার উল্লেখ তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এর প্রকৃত তাৎপর্য সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এখন স্পষ্ট নয়।

তৃতীয়ত, মার্কস মনে করেন, উৎপাদন যেহেতু শ্রমলব্ধ, মুনাফায় পুঁজিপতিদের ন্যায্যত কোন অধিকার নেই। শিল্প পরিচালনা, নিয়োজিত মূলধনের সূত্র, বিজ্ঞাপনের ব্যয় প্রভৃতি তাঁর বিবেচনায় স্থান পায়নি।

চতুর্থত, মার্কস্ লিখেছিলেন ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা থেকে। আজকের পৃথিবীর অবস্থা জানার সুযোগ তাঁর ছিল না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে মজুরি বাড়িয়ে কাজের সময় হ্রাস করে, ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং বিভিন্ন কল্যাণমুখী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে আপোসের পথ প্রশস্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তাই তাদের স্বার্থ সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদা সফল হয়নি। শিল্প-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে তিনি ভেবেছিলেন সমাজবিপ্লব ঘটবে। কিন্তু কার্যত তা না হয়ে রাশিয়ার মতো সেকালে ইউরোপের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত একটি রাষ্ট্রে এই বিপ্লব সংঘটিত হল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির যে স্বপ্ন মার্কস দেখেছিলেন বাস্তবে তা রূপ নেয়নি। জাতীয় স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে প্রবলতর প্রতিপন্ন হয়েছে। গত একশো বছরে প্রযুক্তির যে উন্নতি ঘটেছে তা অভাবনীয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা তাই নতুনভাবে বিবেচনা করতে হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে বলা যায়, মার্কসবাদ শোষিত মানবসমাজকে এক নতুন মুক্তির আলো দেখিয়েছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মার্কসবাদ পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত তত্ত্ব।

৫.২ ট্রেভেলিয়ান এবং ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ঐতিহাসিক সম্ভবত জি. এম. ট্রেভেলিয়ান (১৮৭৬-১৯৬২)। কেলী বয়েড (Kelly Boyd) সম্পাদিত Encyclopaedia of Historians and Historical Writings গ্রন্থে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "Probably no other English historian after World War I was as successful and popular and received so many honours as G.M. Trevelyan." রচনার প্রসাদগুণ এবং লিবারেল বা উদারনৈতিক মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাস ট্রেভেলিয়ানের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য

জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ চার্লস ট্রেভেলিয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মাদ্রাজের গভর্নর হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মেকলে-র ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন। পরিবারে লিবারেল ভাবধারার প্রভাব সেই সময় থেকেই প্রবল ছিল। বেন্টিঙ্কের শাসনকালে মেকলের শিক্ষানীতি প্রণয়নে চার্লস ট্রেভেলিয়ানের সমর্থন ছিল।

পরবর্তীকালে তিনি বিলেতে অর্থ মন্ত্রকের কাজও কিছুকাল সামলেছিলেন। তাঁর পুত্র স্যার জর্জ অটো ট্রেভেলিয়ান ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের অনুগামী। আয়ারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুখ পাঠ্য ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন। পরিবারে এই লিবারেল আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান বড় হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের প্রতি পিতার অনুরাগ তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

প্রথমে হ্যারো স্কুলে এবং পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেভেলিয়ান শিক্ষালাভ করেন। তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জর্জ টাউনসেন্ড ওয়ান্যার এবং রবার্ট সমারভেল-এর মতো বিশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ওপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন লর্ড অ্যাকটন। ইতিহাসে ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে অ্যাকটন বলেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা। তাঁর এই নির্দেশ ছিল যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে মনে করতেন অতীতকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই ইতিহাস। সেজন্য ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ। বিচারকের স্থান তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। র‍্যাঙ্কের এই আদর্শই উনিশ শতকের ইউরোপে অনুসৃত হয়েছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকটনের পূর্বসূরী সিলী (Sir John Robert

Seeley, 1834-1895) ইংরেজ মনীষী টমাস কার্লাইল-এর ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলিকে গুরুত্বহীন বলেছিলেন, যেহেতু লেখকের ব্যক্তিগত মতামত সেইসব রচনায় অত্যন্ত সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। ট্রেভেলিয়ান অবশ্য এই মত মেনে নিতে পারেননি। কার্লাইলের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখাগুলিতে আধুনিক আলোচনা পদ্ধতির সন্ধান না মিললেও কল্পনা এবং বর্ণনাশক্তির গুণে তাঁকে আদর্শ মানতে ট্রেভেলিয়ান দ্বিধা করেননি।

ইতিহাস বিষয়ে ট্রেভেলিয়ানের ধারণা বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে তাঁর *Clio am use, and other essays* গ্রন্থটির (১৯৩১) বিশেষ নাম করা যায়। এখানেই কার্লাইল প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। ইতিহাস ট্রেভেলিয়ানের কাছে শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। গ্রীক সভ্যতায় শিল্প-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীদের অন্যতম ছিলেন Clio, ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে যাঁর উপাসনা করা হয়। ট্রেভেলিয়ান সে কথা স্মরণ করে ইতিহাস রচনায় প্রসাদগুণের ওপর বিশেষ জোর দেন। অ্যাকটনের মতো তিনিও মনে করেন ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, মানুষের মন যাতে সুসংস্কৃত ও সম্প্রসারিত হয় ("to instruct, cultivate and enlarge the human mind")। জাতীয় জীবনে ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব রয়েছে, তা কেবল বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। দু ধরণের ইতিহাসের কথা এখানে ট্রেভেলিয়ান বলেছেন। এক, যা ক্ষুদ্র সময়-সীমায় আবদ্ধ, পণ্ডিতরা যা নিয়ে তর্ক করেন। এবং দুই, মহাকালের বিস্তার— যার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি, যে অতীতকে আমরা ফেলে এসেছি, তা ছিল এককালে বর্তমানের মতো বাস্তব, ভবিষ্যতের মতো অনিশ্চয়তায় ভরা। স্বার্থশূন্য রাজনীতি এবং নাগরিক জীবনের বিকাশের পক্ষে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ আবশ্যক। ঐতিহাসিককে কেবল তথ্যানুসন্ধানী হলে হবে না; তাঁকে হতে হবে মহৎ কল্পনার অধিকারী, সময়ের স্পন্দন যাতে প্রকৃতই উপলব্ধি করা যায়। পাঠক মনে সে উপলব্ধি সঞ্চারিত হতে পারে কেবলমাত্র ইতিহাস সাহিত্য হয়ে উঠলে। পরিণত বয়সে ট্রেভেলিয়ান তাই বলেন—"The motive of history is at bottom poetic." ("History and the reader", *An autobiography and other essays)*।

ট্রেভেলিয়ানের বক্তব্য ছিল র‍্যাঙ্কের বিপরীত। অ্যাকটনের মৃত্যুর পর (১৯০২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐতিহাসিক জে. বি. বিউরি (১৮৬১-১৯২৭) প্রথমেই ঘোষণা করেন, "History is a science, no less and no more." ট্রেভেলিয়ান এরপর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে ইতিহাস চর্চা করেন। ঐ বছর বিউরির মৃত্যুতে তাঁর শূন্য পদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ট্রেভেলিয়ানকে বরণ করে নেন। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের লিবারেল দলের প্রাধান্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ট্রেভেলিয়ানের ওপর মেকলের প্রভাব এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মেকলের তেরিয়া মেজাজ কিম্বা লেখায় গবেষণার অপ্রতুলতা বা তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তির চিহ্ন ট্রেভেলিয়ানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইতিহাসকে রসসাহিত্যে উন্নীত করতে তাঁদের জুড়ি নেই। তা ছাড়া, মেকলে হুইগ ইতিহাস-দর্শনের জনক। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হল মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতিতে দৃঢ় বিশ্বাস এবং বর্তমান নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অতীতকে বিচার। হুইগ দৃষ্টিভঙ্গির অপর এক প্রধান প্রবক্তা লর্ড অ্যাকটন। ট্রেভেলিয়ান এই ধারাকেই বহন করে নিয়ে গেছেন। মেকলের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রেভেলিয়ানের রচনায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রাম বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। একে আমরা তাঁর লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বলব তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ *England in the age of Wycliffe* উনিশ শতকের শেষ বছরে প্রকাশিত হয়। জন ওয়াইক্লিফ ছিলেন চার্চ বিরোধী। চতুর্দশ শতকে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর ভক্তরা ললার্ড নামে ইতিহাসে পরিচিত। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহে তাঁদের অনেকে অংশগ্রহণ করে। পরিণামে তাঁদের অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। এই গ্রন্থে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি

ট্রেভেলিয়ানের সহানুভূতি স্পষ্ট। বিদ্রোহীদের আচরণে তিনি নির্ভীক আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছেন। সতের শতকে স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম এরপর ট্রেভেলিয়ান বর্ণনা করেন তাঁর *England under the Stuarts* গ্রন্থে (১৯০৪)। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, ইউরোপের অন্যত্র যখন একনায়কত্বের প্রতাপবৃদ্ধি, তখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড কিভাবে এক বিকল্প দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই গ্রন্থে তিনি তা দেখাতে চেয়েছেন। উপসংহারে তাঁর সিদ্ধান্ত— স্বাধীনতার লক্ষ্যে অন্য কোনও শতাব্দীতে সম্ভবত এই দ্রুত অগ্রগতি ঘটেনি। ("Never perhaps in any century have such rapid advances been made towards freedom.") প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের বছরগুলিতে ট্রেভেলিয়ানের প্রতিভার সবচেয়ে সার্থক প্রকাশ বোধ হয় ঘটেছে ইটালির ঐক্য সাধনে গ্যারিবলডি-র ভূমিকা প্রসঙ্গে তিন খণ্ডে রচিত গ্রন্থে (১৯০৭ থেকে ১৯১১)। গ্রন্থটি রচনার পূর্বে গ্যারিবল্ডির সৈন্যদল যে পথে অগ্রসর হয়েছিল তিনি স্বয়ং তা পরিক্রমা করেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ট্রেভেলিয়ানের সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি তিন খণ্ডে *England under Queen Anne* গ্রন্থ রচনা (১৯৩০-১৯৩৪)। আঠারো শতকের সূচনায় ইংল্যান্ড শাসন করেন রানি অ্যান (১৭০২-১৭১৪)। এই সময়ের সমাজ ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ইউরোপে প্রাধান্যের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ট্রেভেলিয়ানের রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। ধনীদের স্বার্থে সরকারের শস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার বিরুদ্ধে উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। দুটি জীবনী গ্রন্থে *(The Life of John Bright* এবং *Lord Grey of the Reform Bill)* ট্রেভেলিয়ান এই সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন। আন্দোলনের অন্যতম নেতা জন ব্রাইট এবং যাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে শস্যের মূল্য নির্ণায়ক আইন প্রত্যাহার করা হয়, জন গ্রে— এই গ্রন্থ দুটির নায়ক। ১৯১৩ এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে এদের প্রকাশ ঘটে। উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একটি সামগ্রিক ইতিহাসও ট্রেভেলিয়ান রচনা করেছিলেন (১৯২২)।

ট্রেভেলিয়ানের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *English Social History, a survey of six centuries : Chaucer to Queen Victoria* ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে তিনি ইংল্যান্ডের ইতিহাস পরিক্রমা করেছিলেন *History of England* গ্রন্থে (১৯২৬)। পাঠক মহলে *English Social History* বাদ দিলে, এটিই তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত গ্রন্থ। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ঐতিহাসিক বিবর্তন দুটি রচনারই মুখ্য উপজীব্য। *English Social History* গ্রন্থের ভূমিকায় ট্রেভেলিয়ান সামাজিক ইতিহাসের নঙর্থক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— রাজনীতি বাদে জনগণের ইতিহাস হল সামাজিক ইতিহাস। ("Social history might be defined negatively as the history of a people with the politics left out.") এই ধরণের বক্তব্যের কম সমালোচনা হয়নি। সত্যিই তো, রাজনীতি বাদ দিয়ে বর্তমানে সমাজ-জীবনকে কল্পনা করা সম্ভব কি? রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজ-জীবনকে প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত করছে। বস্তুত, ওপরের উদ্ধৃত বাক্যের পরমুহূর্তেই ট্রেভেলিয়ানকে বলতে শুনি— রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাধারণের জীবন বর্ণনা করা দুরূহ। বিশেষত যেখানে ইংরেজদের নিয়ে কথা। কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভূরি ভূরি রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা হয়েছে। *English Social History* রচনার মাধ্যমে ট্রেভেলিয়ান চেয়েছিলেন কিছুটা ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। সামাজিক পরিবর্তন তাঁর মতে ফল্গুধারায় নিজস্ব নিয়মে বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন হেতু প্রবাহিত হয়। রাজনীতি ওপরতলার ব্যাপার, সমাজ-জীবনে তা তত প্রভাব বিস্তার করে না। ("But, on the whole, social change moves like an underground river, obeying its own laws or those of economic change, rather than following the direction of political happenings that move on the surface of life.") অর্থনীতি থেকে সমাজজীবন এবং সমাজ থেকে রাজনীতির উৎপত্তি ট্রেভেলিয়ান লক্ষ্য করেন। সুতরাং তাঁর মতে সামাজিক ইতিহাস ছাড়া অর্থনৈতিক ইতিহাস বন্ধ্যা এবং রাজনৈতিক ইতিহাস দুর্বোধ্য। ("For the social scene grows out of economic

conditions, to much the same extent that political events in their turn grow out of social conditions. Without social history economic history is barren and political history is unintelligible.") সামাজিক ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের সংযোগ সেতু নয়। অতীতে মানুষের জীবনযাপন, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত সম্পর্ক—সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত বলে ট্রেভেলিয়ান মনে করেন। ইতিহাসের প্রবাহজনিত তিনি লক্ষ্য করেন। এক যুগের লক্ষণ অন্য যুগে ফুটে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের কতটুকুই বা আমরা জানি। যা জানি, রচনার নির্দিষ্ট পরিসরে তার সবটা ফোটানো কি সম্ভব? সুতরাং কল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসকে হতে হবে সত্য; তার অভিপ্রায় কাব্যিক। ইতিহাস সত্য হয়ে উঠলেই তাতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয় সৃষ্টি হবে। ট্রেভেলিয়ানের ইতিহাস চেতনার সারমর্ম এভাবেই *English Social History* গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

"Truth is the criterion of historical study ; but its impelling motive is poetic. Its poetry consists in its being true. There we find the synthesis of the scientific and literary views of history."

ট্রেভেলিয়ানের মূল্যায়নে বলা হয়েছে— তিনি ইতিহাস — রচনায় কোন নতুন ধারার প্রবর্তন করেননি; প্রচলিত ধারার উৎকর্ষ আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাস—রচনার যে ধারায় মেকলে কার্লাইল এবং অ্যাকটন প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইতিহাস—রচনার এই হুইগ ধারাকে ঐতিহাসিক হারবার্ট বাটারফিল্ড (Herbert Butterfield) তাঁর *Whig Interpretation of History* গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন। বর্তমানের নৈতিক মাপকাঠিতে অতীতকে বিচার করতে গিয়ে এই ধারার ঐতিহাসিকরা অতীতকে তার নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করতে অপারগ বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাস টোরি এবং হুইগদের মধ্যে বিভাজিত মনে করে তিনি রানি অ্যানের রাজত্বকালে রাজনীতিকদের আচরণে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বুঝে উঠতে পারেননি। ঐতিহাসিক স্যার লিউইস নেমিয়ার ব্যক্তিগত অভিসন্ধির দ্বারা রাজনীতিকরা পরিচালিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে ট্রেভোলিয়ান আপত্তি করেন। পরে অবশ্য *George III and the Historians* গ্রন্থে নেমিয়ার তাঁর পূর্বের বক্তব্য খানিক সংশোধন করেছিলেন। ট্রেভেলিয়ানের বিশ্লেষণে সামাজিক বর্গ (sicuak category) বা পরিসংখ্যানগত আলোচনা পাওয়া যাবে না। গৃহযুদ্ধে ভুস্বামীদের (জেন্ট্রি) অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে টনি-র বক্তব্যে তাঁকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখি না। ট্রেভেলিয়ানের কাছে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ মতাদর্শগত সংঘাত ("war of ideas")। তবে তাঁকে এক কট্টর হুইগ ভাবা ভুল হবে। রানি অ্যানের শাসনকালে টোরিদের ভূমিকা বরং তাঁর অপেক্ষাকৃত সমর্থন পেয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান তিনি মনে করেন টোরি এবং হুইগদের ভারসাম্য রক্ষার ফল। ইংরেজ জাতির ইতিহাস নিয়ে ট্রেভেলিয়ান গর্ব বোধ করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিতর্ক থেকে দূরে থাকলেও পাঠযোগ্যতা যদি ইতিহাস-রচনার সাফল্যের প্রধান একটি মানদণ্ড হয়, তবে ট্রেভেলিয়ারের কৃতিত্ব বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। এমন শিল্পগুণান্বিত রচনা খুব কম ঐতিহাসিকের পক্ষেই লেখা সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে তিনি গিবন এবং মেকলের যথার্থ উত্তরসূরী।

৫.৩ রাজনীতির সামাজিক প্রেক্ষাপট; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ইতিহাস চর্চা

উনিশ শতকের শেষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া কারবার এবং বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে Progressive Movement নামে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একে সমর্থন

জানায়। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে সমাজে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় Progressive আন্দোলন তা দূর করতে চেয়েছিল। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুঁজিপতিরা যে অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আন্দোলনকারীরা তার প্রতিকার চেয়েছিলেন। গণপ্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার-কার্যে সরকারের সহযোগিতা তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই সংস্কারমুখীনতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন ফ্রেডারিক জ্যাকসন টার্নার, চার্লস বিয়ার্ড এবং কার্ল বেকার।

অ্যাটলান্টিক উপকূল থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত বিস্তার ঘটেছিল পশ্চিমদিকে। সেখানে নতুন ভূখণ্ড সর্বদাই বসতি স্থাপনের জন্য হাতছানি দিত। এই নতুন বসতিগুলিতে কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল জন-অধ্যুষিত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে বিস্তারের সুযোগ রুদ্ধ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম কারণ সন্ধান করেছেন টার্ণার। অন্যদিকে, সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রবর্তনের সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কায়েমী স্বার্থের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বিয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান ক্ষমতাধিকারের প্রতিশ্রুতি এবং ফল লঙ্ঘিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। আঠার শতকের ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা স্মরণ করেন কার্ল বেকার।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড হফ্‌স্টাডার (Richard Hofstader) তাঁর *The American Tradition and the men who made it* গ্রন্থে Progressive ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। পুঁজিবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। জেফারসন, জ্যাকসন, লিঙ্কন প্রমুখ যে সব রাষ্ট্রপতি Progressive ধারণার ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে আদর্শায়িত তাঁরা যে মূল ধারার ব্যতিক্রম নন, হফ্‌স্টাডারের লেখায় তা ফুটে ওঠে। গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি বলেছেন— ভ্রাতৃত্ববোধ নয়, মার্কিন গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল অর্থগৃধ্নুতা ("it has been a democracy in cupidity rather than a democracy of fraternity.") যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদের সাফল্যের ফলে ব্যক্তিগত সম্পদ এবং স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের ন্যূনতম শর্ত লঙ্ঘন করা কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রাচুর্যকে মার্কিন সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য মনে করেন ডেভিড পটার (David M. Potter)। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বই *People of Plenty : Economic abandaned and the American Character*। উৎপাদনমুখী সমাজে নিত্য নতুন চাহিদার উদ্ভব হয়, আবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। লাভের উদ্দেশ্যে কেবল যে অর্থনীতি পরিচালিত হয় তা নয়, জীবনযাত্রার সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ে। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে ঝুঁকি নেবার সাহস, জেদ, সঙ্কল্প, উচ্চাশা এবং আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য মার্কিন চরিত্রে সহজাত। প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্য তার কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে, জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়লে উপযুক্ত সাহায্য সবসময় মেলে না। প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ডেভিড পটার এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ড্যানিয়েল বুরস্টিন (Deniel J. Boorstin) ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর তিন খণ্ড ব্যাপী গ্রন্থের প্রথমটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থের শুরুতেই সিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছেন— কোনও পরিকল্পনা বা লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়ার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন বেশি ঘটেছে ইউরোপের স্থানচ্যুতির কারণে ("A new civilization was being born less out of plans and purposes than out of the unsettlement which the New World brought to the ways of the old.") পরবর্তী খণ্ডগুলির শুরুতেও বুরস্টিন বলেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের মূল কথা হল অন্বেষণ, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য যতটা প্রয়োজনভিত্তিক ততটা আশাবাদী নয়।

১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মার্কিন ঐতিহাসিকদের বিশেষ উৎসাহের পিছনে ছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসাবে সে দেশের প্রতিষ্ঠা লাভ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় (Cold War) কমিউনিজমের বিরোধিতায় মার্কিন জনমতে এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়। মার্কিন ইতিহাসে এই পর্ব Age of Consensus নামে পরিচিত। কোন নির্দিষ্ট মতবাদের আশ্রয় ছাড়াটা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং আর্থিক বিকাশে সাধারণের অংশগ্রহণ সম্ভব হল যে উদারনীতিবাদের ফলে, ঐতিহাসিকরা তার সমর্থনে পঞ্চমুখ হলেন। সমাজবিজ্ঞানী লুই হার্টস (Louis Hartz) তাঁর The Liberal Tradition in America গ্রন্থে (১৯৫৫) বলেন— ইউরোপ তার দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রার সময় যেরকম সামাজিক বিপ্লব দেখেছে, যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রত্যক্ষ করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার প্রশ্নে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়েছিল; রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন তার ফলে হয়নি। অন্য সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সে দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মতৈক্যের এই দিকটি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাধান্য পেয়েছিল। সে কারণে মার্কিন ইতিহাসে এই পর্বকে Age of Consensus এবং এ পর্বে ঐতিহাসিকদের Consensus Historians বলা হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া, ছাত্র বিক্ষোভ, বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি কারণে পরবর্তী এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস-রচনায় তার প্রভাব পড়ে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে হফস্টাডারের ছাত্র লী বেনসন (Lee Benson) প্রণীত *The Age of Jacksonian Democracy : New York as a Test Case* প্রকাশিত হয়। জ্যাকসন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি মার্কিনে রাষ্ট্রপতি থাকাকালে (১৮২৮-১৮৩৬) সে দেশে গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বেনসন মনে করেন ধারণাটি অতিরঞ্জিত। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য তালিকা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর ভোট-ভাবনা কেমন একই রকম হয়। ভোট-দাতার অর্থনৈতিক অবস্থা বা শ্রেণীগত অবস্থানের তুলনায় তিনি কোন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তা জানা বেনসনের মতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের সদস্য তালিকা বিশ্লেষণে তিনি যন্ত্রগণকের (Computer) সাহায্য নিয়েছেন। মার্কিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা প্রথম কমপিউটারের সাহায্যে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের গবেষণায় কাজে লাগিয়েছেন, বেনসন তাঁদের অন্যতম। গত চল্লিশ বছরে আরও অনেক মার্কিন ঐতিহাসিককে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা গেছে। ইতিহাসকে গাণিতিক শৃঙ্খলায় বাঁধা যায় কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে প্রচুর। সব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল দিয়েছে বলা যাবে না। প্রসঙ্গত রবার্ট উইলিয়াম ফোগেল এবং স্ট্যানলি এল এঙ্গারম্যান (Robert William Fogel and Stanley L. Engerman) প্রণীত *Time on the Cross : The Economics of American Negro Slavery* গ্রন্থের নাম করা যায়। ১৯৭৪ সালে এটি দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস ব্যবস্থা যতটা অমানবিক বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তার অনেকটা অতিরঞ্জিত বলে এখানে লেখকরা প্রচুর পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাঁদের বক্তব্য গৃহীত হয়নি।

মার্কিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব অনুপস্থিত নয়। মার্কসের বক্তব্য হুবহু অনুসরণ না করলেও নয়া বাম ঐতিহাসিকরা (New Left historians) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনমতো গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির এঁরা কঠোর সমালোচক। উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম অ্যাপলম্যান উইলিয়ামস (Wiliam Appleman Willians), গ্যাব্রিয়েল কল্‌কো (Gabriel Kolko), লয়েড গার্ডনার (Loyd C. Gardner) প্রমুখের নাম করা যায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য এরা প্রধানত মার্কিন বিদেশনীতিকে দায়ী করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী সি. রাইট মিলস (C. Wright Mills) তাঁর *The Power Elite* গ্রন্থে (১৯৫৬) দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তারা পুঁজিপতি এবং রাজনীতিবিদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিভাবে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করছেন। গ্যাব্রিয়েল কল্‌কো রচিত *The Politics of War : The world and United States*

Foreign Policy, 1943-1945 এবং *The Roots of American Foreign Policy* গ্রন্থে মার্কিন নয়া বাম ঐতিহাসিকদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মার্কিন রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক নিত্য নতুন আলোকপাতে প্রায় প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

৫.8 অনুশীলনী

1. মার্কসের ইতিহাস চিন্তা কি কারণে বৈপ্লবিক?
2. ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হেগেল এবং মার্কসের পদ্ধতিগত পার্থক্য কি ছিল?
3. ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ইতিহাস রচনায় ট্রেভেলিয়ান কি কারণে বিশিষ্ট?

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

শোভনলাল দত্তগুপ্ত— মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা

S. William Halperin — Some Twentieth Century Historians

একক ৬ □ মরিস ডব এবং পুঁজিবাদের উত্থান

গঠন ঃ

৬.১ ভূমিকা

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ মূল্যায়ন

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ ভূমিকা

ধনতন্ত্রের উদ্ভব ইতিহাসের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা চলেছে। এই বিতর্কে নতুন একটি অধ্যায়ের সংযোজন করেন বামপন্থী অর্থনীতিবিদ মরিস ডব। পর্যায়ের প্রথম এককে তাঁর প্রধান বক্তব্য এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। ইউরোপে পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল যে সমস্ত দেশে ইংল্যান্ড তার মধ্যে অগ্রগণ্য। পিউরিটান ধর্ম মতবাদ কিভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল বোঝাতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক Tawney। তিনি ব্রিটেনের শ্রমিকদলের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে রাজনীতিতে নতুন এক সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা লাভ কিভাবে ঘটনাস্রোতকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি বিশ্লেষণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত বিষয়ে ঐতিহাসিকদের প্রক্রিয়া পর্যায়ের শেষাংশে দেখানো হয়েছে।

৬.২ প্রস্তাবনা

উক্ত অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে পারবেন যে প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক মরিস ডবের রচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদের উত্থান ঘটেছিল। পুঁজিবাদের উত্থান নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু কিছু বিতর্ক যেমন আলোচ্য অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে তেমনিই মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে।

মরিস ডব—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনে বাম চিন্তাধারার অন্যতম প্রতিনিধি মরিস ডব। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। একই সঙ্গে *Marxism Today* নামে মার্কসীয় চিন্তার প্রসারে নিয়োজিত একটি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রূপে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Studies in the Development of Capitalism* ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর দু-দশক ধরে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *On Economic Theory and Socialism* এবং *Wages, An Essay in Economic Growth and Planning* (১৯৬১) এবং Capitalism

Yesterday and Today (১৯৬২)। ১৯৬৭ সালে Soviet Economic Development since 1917 নামে একটি গ্রন্থে তিনি সোভিয়েট অর্থনীতির সমীক্ষা করেন।

Studies in the Development of Capitalism নামক গ্রন্থে মরিস ডব মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার নূতন এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্থান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ডবের বক্তব্য অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের পতন ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন যুগ-সন্ধিক্ষণের উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের উপরই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমসাময়িক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মতে দূর বাণিজ্য নিছক অনুঘটকের কাজ করেছিল, তার চালিকা শক্তি ছিল না। উল্লেখ্য বাণিজ্যের দিগন্ত উন্মুক্ত হওয়ার দরুন বণিকেরা ম্যানরের বাইরে থেকে পণ্য সম্ভার ও বিলাসদ্রব্য আনতে শুরু করেন। ক্রমে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে ঐ সব দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঠিক অর্থের তাগিদে সামন্ত প্রভুরা প্রজাদের উপর কর চাপাতে থাকে। শেষে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শুরু করে। একে প্রক্রিয়াকে খাজনার নগদীকরণ (Commutation of rent) বলা হয়।

ডবের মতে সামন্ততন্ত্রের পতনের মূল কারণ ছিল সামন্তপ্রভুদের ক্রমশ বাড়তে থাকা চাহিদা। মামুলি প্রযুক্তির সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না বলে ভূমিদাসরা পালাতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সামন্ত প্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গা নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভব ছিল না। চাহিদা ও উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধ বলেছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও পুঁজিতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে কৃষিব্যবস্থার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে মার্কসের চিন্তাধারা উল্লেখ্য। মার্কসের মতে পুঁজিবাদের সূচনা হয়েছিল কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলশ্রুতি হিসাবে। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়ার মূল কাণ্ডারী ছিল কৃষিসমাজের অন্তর্গত বিত্তশালী কৃষক ও নগরাঞ্চলের বণিকশ্রেণীর।

ডব দেখান যে খাজনার নগদীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হলে খাজনা মেটানোর তাগিদে কৃষকেরা তাদের উৎপাদনের সিংহভাগ নগদ অর্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। এইভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে সে যে মুনাফা অর্জন করত সেই সব উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে সে অন্যান্য সাধারণ কৃষকদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করত এবং সেই পণ্য নিয়ে সে পুনরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে যেত। এভাবেই সাধারণ কৃষক ক্রমশ পুঁজিপতি কৃষকে পরিণত হয়। ডবের মতে ধনতন্ত্রের উত্থানে পুঁজিপতি কৃষকের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিত্তশালী কৃষক কৃষি উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে জমিতে লগ্নি করতে শুরু করে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাসে ডবের উল্লেখযোগ্য অবদান এই ছিল যে শিল্প-পুঁজির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বুর্জোয়া ভূমিকাকে নস্যাৎ করে গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ পণ্য উৎপাদকদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তারা উৎপাদকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল। অর্থাৎ ডব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ঐ সব ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিলেন। সুতরাং পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের পণ্য উৎপাদক এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করেন। ডবের মতে ঐ সময় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের স্বাধীন কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ডব সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেননি। যেখানে পুঁজিপতি কৃষক

উদ্‌বৃত্ত জমিতে লগ্নী করে পুঁজি বাড়াতে সফল হয় সেখানে বাণিজ্যের সাফল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। ফলস্বরূপ বাণিজ্য বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠে। ক্রমে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিও অনুরূপভাবে কৃষি ও জমিতে লগ্নী করতে সম্মত হয়। এই প্রসঙ্গে ডব আরও দুটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত শহরের বাজার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের বহু পথঘাট থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের অগ্রবর্তী দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল নয়, প্রত্যক্ষ বাধ্যতামূলক শ্রম সেবারূপে ভূমিদাসত্বের অবসান ঘটেছিল, অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। দ্বিতীয়ত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পূর্ব ইউরোপের বহু অঞ্চলের ভূমিদাসত্বে ও দৃঢ়তর (??) হবার প্রক্রিয়াও জড়িয়ে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে।

এদিকে কৃষক কৃষিজীবি সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে তার ক্ষেত খামার ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ঘটাতে তৎপর হয়েছিল। সেই সঙ্গে তারা তাদের প্রতিবেশী অন্যান্যদের শ্রমশক্তি ক্রয় করতে থাকে। ধীরে ধীরে বৃহৎ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তারা তাদের নিজস্ব উৎপাদন পদ্ধতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। একই সাথে তারা নিজেদের শহরাঞ্চলে পুঁজিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে নয়, শহরাঞ্চলের শিল্পপতি হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধের সময় ক্রমওয়েলের নিউ মডেল আর্মি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টস্ সমসাময়িক প্রাদেশিক উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির সমর্থন লাভ করেছিল। শেষে এরাই ছিল ইংলন্ডের রাজদ্রোহীদের স্থায়ী সমর্থক। অন্যদিকে সনদপ্রাপ্ত বণিক শ্রেণি এবং একচেটিয়া কারবারীরা রাজতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থক। আর ঐ একই সময় বাণিজ্যপুঁজির ধারক ও বাহকেরা প্রগতির পথ পরিহার করে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশ্রেণীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ছাড়া ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়, অবশ্যই আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও বাহ্যিক প্রভাব সমূহ পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে এবং ডব দেখিয়েছেন যে সমাজ বিবর্তনের উপর বাহ্যিক শক্তিসমূহের প্রভাব বিপুল কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহ্যিক শক্তিসমূহ যে প্রভাব ফেলে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি তারই বিশেষ আকার ও গতি নির্ধারণ করে দেয়।

ডবের আলোচনার বা বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত অসম্পন্ন কৃষকেরা স্বাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সমাজব্যবস্থাতেও তারা তাদের স্বতন্ত্রভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সামর্থ হয়েছিল। সুতরাং ডবের বক্তব্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছে। প্রথমত এই সাধারণ মাপের উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তার প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর দ্বিতীয় স্তরে এই অতি সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমোন্নতির তালে তালে সামন্ততান্ত্রিক নানা ধরণের বিধিনিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে ফেলে। শেষে সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির পথ প্রশস্থ হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এই রূপান্তর অর্থাৎ সামন্তদের শ্রমদানে থেকে অব্যাহতি লাভের তাগিদে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ মুদ্রাতন্ত্রের প্রসার ও খাজনার নগদীকরণের দরুণ সম্ভব হয়েছিল। আর এরই ফলশ্রুতি হল চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং ক্রমে ক্রমে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ। তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পৌছাতে সময় লেগেছিল প্রায় দু-শত বৎসর। সেইমত ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনাকাল ধরা হয়। ইংলন্ডের ইতিহাসের দিক থেকে তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রথম এলিজাবেথ। ডব এই মধ্যবর্তী পর্যায়কে শুরুতে সামন্ততান্ত্রিক নয় আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয় বলে অভিহিত করলেও শেষ পর্যন্ত একেই রূপান্তর পর্ব অর্থাৎ পুরানো ব্যবস্থার দ্রুত অধঃপতন এবং নতুন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ক্রমবিকাশ বলে অভিহিত করেন।

মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক—

মার্কসের মতে ব্যবসা-বাণিজ্য সামন্ততন্ত্রের বাহিরে নয়। সামন্ত প্রথার রূপান্তর হয় অধীন চাষী বা ভূমিদাসের কাজকর্ম আর ভূস্বামী প্রভুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপান্তরের ফলে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপান্তরের ফলে আর তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর ঘটে তারই সাথে (দ্রষ্টব্য মার্কস Capital গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে) উল্লেখ করেছেন যে যে ব্যবস্থার চাষী উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী হয়েও সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিন বিনা মজুরীতে প্রভুর জমিতে চাষ করে : সে ব্যবস্থায় কর শ্রমকর-এর আকার নেয়। পরের পর্যায়ে শ্রমকর রূপান্তরিত হয় উৎপন্ন ফসলের দেওয়া কর অথবা Rent in King-এ, তৃতীয় পর্যায়ে ফসলে দেওয়া কর রূপান্তরিত হয় নগদ অর্থে দেওয়া কর অথবা Money Rent-এ। এ অবস্থায় চাষী ফসলের বদলে তার দাম ভূ-স্বামী প্রভুর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এর একটি অর্থ যে, উৎপাদনের একাংশ অবশ্যই পণ্যে রূপান্তরিত হয়, পণ্য হিসাবে উৎপাদন হয়ে ওঠে তার প্রাথমিকরূপ। এরপরে দেখা যায় নগদ করের ব্যবস্থায় ভূস্বামী এবং চাষীদের সম্পর্ক রূপান্তরিত হয় বিশুদ্ধ নগদ অর্থের সম্পর্কে। ফলে সৃষ্টি হয় ভূমিহীন দিনমজুর শ্রেণীর সৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল চাষীরা মুনাফার জন্য দিনমজুরদের শোষণ করতে থাকে : এইভাবেই প্রশস্ত হয় ভবিষ্যৎ পুঁজিপতি রূপে তাদের উদ্ভব ও বিকাশের পথ।

১৯৪৬ সালে Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে প্রকাশিত সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরের মরিস ডবের পেশ করা রূপরেখা আর পল স্যুইজীর সে রূপরেখার সমালোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সুপরিচিত The Transition from Feudalism to Capitalism-বিতর্ক যাতে ডব আর স্যুইজী ছাড়াও রডনী হিলটন, ক্রিস্টোফার হিল, কোহাচিরো তাকাহাসি, জন হেরিংটন, এরিট হবস্‌ব প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিত আর ইতিহাসবিদ। ডব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন পুঁজিবাদ এসেছিল সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় ডবের মতে বাজারী অর্থনীতি বা মুদ্রা-ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ও সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের জন্য দায়ী ছিল।

পল স্যুইজীর মূল বক্তব্য ছিল সামাজিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনই সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। এবং স্যুইজী আরও বলেন যে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদক ব্যবস্থা ছিল তারপরে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমে পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করে।

সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থাতে সামন্তদের প্রভাব যে বেশী ছিল অস্বীকার করা যায় না। ডবের মতানুসারে বিকাশশীল ধনতন্ত্রের আঘাতে যে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল একথা তিনি মানতে রাজী নন। কারণ তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে উঠবার মানেই ক্ষুদ্রতর উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যেতে বসেছিল। ফলে ভূমিদাসত্বের একেবারে অবসান এবং ধনতন্ত্রের গড়ে ওঠার মাঝে একটা সময়ের ফাঁক ছিল।

অতএব ডব স্যুইজীর বিতর্ক বহুদিন ধরে চলে আসছিল। হিলটন তাঁর বই 'The Transition from Feudalism to Capitalism-এ বলেছেন যে সামগ্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলেই ধনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তারপরে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা আসে যা পুঁজিবাদের পথকে সুগম করে দেয়। আর এর পাশাপাশি ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল অপর একটি ঘটনা সেটি হল জন বিস্ফোরণ (Population Explosion)। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে ইওরোপের জনসংখ্যা বাড়ে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ বলে ঐতিহাসিক ব্রেনার মনে করেন। ব্রেনারের ম্যালথুসিয়ান তত্ত্বকে অবশ্য ফীবোয়া ও লাদুরিও সমর্থন করেছিলেন। এছাড়া

হবস্‌বম্‌ অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য দিয়ে ও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন শাসনতন্ত্রের সংকট এবং পুঁজিবাদের কিভাবে উদ্ভব ঘটেছিল।

৬.৩ মূল্যায়ন

ডব প্রমাণ করতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী তত্ত্বকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যতই বিরোধিতা থাকুক না কেন ডব তাঁর তত্ত্বে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সামন্ততন্ত্র থেকে এক কথায় ধনতন্ত্রে উত্তরণ দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময়ে ইউরোপের অর্থনীতিক প্রকৃতি ছিল আসলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙ্গন ধরে ও বার বার বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে এর সাথে সাথে ধনতন্ত্রের উত্তরণও ঘটতে থাকে।

সাধারণ মনে করা হয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎপাদনশীল শক্তি। অন্যদিকে ধনতন্ত্র বলতে বোঝায় শিল্প ও বাণিজ্যের উত্থান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাতে উৎপাদন বেড়ে যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হল বাণিজ্যনির্ভর এখানে বাজারের জন্য ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন হয়। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক বাজারের জন্য উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে নিজের ভোগের জন্য ও সামন্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটানোর জন্য। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ইতিহাস আলোচনা করার সময় এইসব লক্ষণগুলি মনে রাখা খুবই জরুরী। বাণিজ্য বিস্তার হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে পুঁজিবাদ বার-বার লক্ষণ। পুঁজিবাদের আর একটি কারণ হল বাণিজ্য এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া বর্ণনায় ডবের অভিনবত্ব বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন চিন্তার সূচনা করেছে। এখানেই ডবের মৌলিকত্ব।

৬.৪ অনুশীলনী

(ক) মরিস ডব কিভাবে পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা করেন তা ব্যক্ত করুন।

(খ) মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে মূল বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে— তার সম্পর্কে আপনি কি একমত?

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

(i) Maurice Dobb. : Studies in the Development of Capitalism.
(ii) Rodney Hilton : Transition from Feudalism to Capitalism.
(iii) E. J. Hobsbawm : 17th Century Revolutions ; past and present (1958)
(iv) Paul Sweezy (From Hilton ed.) : Brenner Debate, Transition from Feudalism to Capitalism.

একক ৬.৬ ❑ সতের শতকে ইংল্যান্ডের বিপ্লবে টনির ভূমিকা

গঠন ঃ

৬.৬ প্রস্তাবনা

৬.৭ ঐতিহাসিক টনির ভাষ্য ও বিতর্ক

৬.৮ ইংল্যান্ডের ধর্ম ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক

৬.৯ মূল্যায়ন

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

সতের শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাস রাজতন্ত্র বনাম পার্লামেন্টের সংঘর্ষ ঘিরে আবর্তিত। গৃহযুদ্ধ এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব এই পর্যায়ে দুটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা এই পর্যায়ের ইতিহাসকে বিভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করতে পারি। সাংবিধানিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর যেমন তাৎপর্য আছে, সেরকম ইংল্যান্ডের শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন এই যুগের ইতিহাসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ঐতিহাসিক মহলে ১৭ শতকে ইংল্যান্ডের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত।

সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইংরেজ বিপ্লব নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে কম বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই বিপ্লব ছিল শ্রেণীগত সংঘাত হিসাবে। উনিশ শতকের উদারপন্থীদের মতে ইংল্যান্ডের বিপ্লব ছিল সংসদীয় রাজতন্ত্রের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, যার পরিণামে সপ্তদশ শতকের শেষে রাজশক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধি সভার আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দেশের সামাজিক কাঠামোতে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল তাঁদের লেখনীতে তা স্থান পায়নি। আবার অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে এই বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামের চরমরূপ। মার্কস বলেন প্রধানত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনই সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকেরা সতের শতকে ইংরেজ বিপ্লবে মার্কসের সূত্র প্রয়োগ করে বিপ্লবকে বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের পটভূমিকায় বিচার করেছেন। মার্কসের পূর্বেকার চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডে। ১৫৩৬-৪০ খৃষ্টাব্দে মঠ ব্যবস্থার উচ্ছেদ মাধ্যমে মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াস দেখা যায়। জমিতে ধর্ম বা পুঁজি বিনিয়োগের বিষয়টি সম্পদশালী শ্রেণীর কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। এরপর ধীরে ধীরে কাউন্টিগুলিতে পুঁজিবাদী কৃষকের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক হিল মনে করেন। একই সময় ইংল্যান্ডে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটে। এইভাবে একের পর এক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলে সমৃদ্ধশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে পড়ে।

৬.৬ প্রস্তাবনা

টনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক দলের প্রতিনিধি। Religion and The Rise of Capitalism গ্রন্থে ইংল্যান্ডের

ইতিহাসে মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। Richard Henry Tawney-র জন্ম ৩০শে নভেম্বর ১৮৮০ সালে কলকাতায়। মৃত্যু ১৯৬২ সালের ১৬ই জানুয়ারী লন্ডনে। টনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজটি রচনা করেন। সেটি হল *The Agrarian Problem of the 16th Century,* ১৯১২ সালে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে তিনি লন্ডনে School of Economics-এর অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির লেকচারার হিসাবে তাঁর প্রবন্ধ Harrington's Interpretation of His Age বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ১৯৪১ খ্রি., 'Economic History Review'-এ প্রকাশিত 'The Rise of the Gentry' এবং ১৯৫৪ খ্রি. 'The Rise of the Gentry A Post Script' নামক প্রবন্ধদ্বয় সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান বিপ্লব সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে একজন বলিষ্ঠ ও বিতর্কিত ঐতিহাসিকের মর্যাদায় ভূষিত করে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী অধ্যাপক টনি বিশের দশকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টিকে যথার্থভাবেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নৈতিক আদর্শে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ ১৯২০-তে প্রকাশিত *The Aquisitive Society*-র প্রধান বক্তব্য এই যে মূলধনী সমাজের সম্পদ পুঁজি করার যে বিরাট আগ্রহ সেটি নীতিগতভাবে অন্যায় এবং ক্ষতিকারক। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ যে বিশেষ পরিচিত তা হল *Religion and the Rise of Capitalism,* ১৯২৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি পিউরিটান ধর্মসংঘাতের পিছনে কিভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল তা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

৬.৭ ঐতিহাসিক টনির ভাষ্য ও বিতর্ক

সতের শতকে ইংল্যান্ডের ইংরেজ বিপ্লব বিষয়ে টনির মতবাদের পিছনে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের সমালোচনা। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক S. R. Gardiner সতের শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্লবকে পিউরিটান মতবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন। ইংল্যান্ডে সে সময় পিউরিটান মতবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। লর্ড ইংল্যান্ডের চার্চের সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রভাব পড়ে ক্যান্টার-বেরীর আর্চবিশপদের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে গৃহযুদ্ধ প্রাথমিকভাবে আদর্শের যুদ্ধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক সরকার গঠনের জন্য। তবে এই ব্যাখ্যার অনেকেই বিরোধিতা করেন। কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে তাঁরা অনবহিত। তথাপি কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়নি। পিউরিটানগণ ও পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ রাজার অধিকারকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র ও চার্চের আইন প্রণয়ন রচনাতেই আগ্রহী ছিল ফলে ক্রমে ধর্মীয় সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হয়। ল্যাডের অনুগামীগণ ও পিউরিটানগণ কেউই সমঝোতায় আসতে চায় নি। ধর্ম ও রাজনীতি তখন এমনভাবে জড়িত ছিল যে, তাদের পৃথক করা অসম্ভব ছিল। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে লডের নীতি পিউরিটান মনোভাবাপন্ন সমস্তশ্রেণীর মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে রক্ষায় নিজেরাই উদ্যোগী হয়।

বিংশ শতাব্দীর মার্কসীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন, কেবলমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। প্রকৃত মার্কসবাদীরা বলেন যে এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছিল জেন্ট্রিদের কাছে একটা বিপ্লবস্বরূপ; সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। জেন্ট্রির সাফল্যই ইংল্যান্ডকে এই বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক সমাজে রূপান্তরিত করে।

ঐতিহাসিক গার্ডিনারের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন অধ্যাপক টনি। তিনি তাঁর ১৯২৬ সালে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ *Religion and the Rise of Capitalism* গ্রন্থটিতে পিউরিটান ধর্মসংঘাতের পিছনে কিভাবে

ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল তা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক টনি দেখিয়েছেন জেন্ট্রি বিত্তবান এবং প্রভাবশালী হয়েছে মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, কেন অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দক্ষিণ ও পূর্ব লণ্ডনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্লামেন্টকেও সমর্থন করে; অথচ বাণিজ্যিক দিক থেকে অনগ্রসর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রধানত সমর্থন করে রাজতন্ত্রকে।

গত শতকে গার্ডিনারের অনুরূপে ট্রেভেলিয়ান বলেছেন যে এই বিপ্লবের পিছনে ছিল ভাবনার সংগ্রাম; কোন শ্রেণীসংগ্রাম নয়। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লব ছিল দুটি সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রাম। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীরা সমস্ত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করত। তাই তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ছিল। আবার আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল দুটি অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত। কিন্তু সতের শতকে ইংরেজ বিপ্লবের পিছনে কোন সংঘাত কাজ করেনি সুতরাং এই বিপ্লবে ছিল দুই রাজনৈতিক দলের (রাজশক্তি বনাম পার্লামেন্ট) সংঘর্ষ। (The great rebellion was of two parties) তাঁর মতে প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করলে একটা সুস্পষ্ট মানবিক চরিত্র ফুটে ওঠে। গার্ডিনার ও ট্রেভেলিয়ানের বক্তব্যকে সমর্থন করে অধ্যাপক রোজার লোক্যার বলেন যে সতের শতকে বিপ্লব ছিল ধর্মগত বিরোধের ফসল। এই যুদ্ধ যে কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় এতে দরিদ্র শ্রেণীও যোগদান করেছিল ফলে ধনীদের মধ্যে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয় ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৬.৮ ইংল্যাণ্ডের ধর্ম ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক

অধ্যাপক টনির মতামতের জোরালো প্রতিবাদ এসেছে অক্সফোর্ডের প্রাক্তন রেজিয়াস অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের কাছ থেকে। ইকনমিক হিস্ট্রী রিভ্যুতে উভয়ের মসীযুদ্ধ চলেছিল।

অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের সতের শতকের বিপ্লবের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদিও তা একটি সম্পত্তিভিত্তিক ছিল। তাঁর মতে ইংরেজ বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু অথবা কেবলমাত্র (mere) জেন্ট্রির দ্বারা যাদের প্রশাসন, আইন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার কোন ক্ষমতা ছিল না; তারা কোর্ট ও জেন্ট্রির ক্ষমতা বিনষ্ট করতে সংকল্প গ্রহণ করে। অলিভার ক্রমওয়েল একজন কেবলমাত্র ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আরো দেখান যে, ইংল্যাণ্ডের বিদ্রোহ ও ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল এবং নেপলস্-এ বিদ্রোহ ঘটার ফলে ইউরোপে নবজাগ্রত রাজতন্ত্রগুলোর অবসান ঘটে ফলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তথাপি উপরিউক্ত ব্যাখ্যা কতকগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে মেলে না।

Professor Aylmer দেখান যে কোর্ট ও জেন্ট্রি সমশ্রেণীভুক্ত ছিল না। কারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে জেন্ট্রিদের কেউ কেউ রাজাকে আবার কেউ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল অপরদিকে রোমান ক্যাথলিকরা ছিল 'ক্ষয়িষ্ণু জেন্ট্রি তারা আবার রাজার পক্ষ সমর্থন করে। সুতরাং এই জেন্ট্রিশ্রেণী গৃহযুদ্ধের চরিত্র গড়তে নতুন ভুমিকা নেয়, কারণ তারা তাদের দাবীর ভিত্তিতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক ট্রেভর-রোপার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪ সালে ইকনমিক হিস্ট্রি রিভ্যুতে তিনি প্রত্যাক্রমণ করেন 'The Rise of the Gentry : A postscript' প্রবন্ধে। সাতটি কাউন্টির ২৫৪৭ ম্যানরে ১৫৫৮ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে কিভাবে জমি হস্তান্তর ঘটেছে টনির প্রতিপাদ্য বিষয় সেই মালমশলার ওপর তৈরী। টনির মতে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী পূর্বে এক নতুন ভুম্যধিকারী শ্রেণীর উদয় হয়। তারা ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করতে থাকে এবং রাজা, চার্চ, পুরাতন অভিজাতকুল এবং ছোটখাট প্রজা সকলেই শোষণ করে সম্পত্তি বাড়াতে থাকে। অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী এবং বিপ্লবের পর তাতে সাফল্য লাভ।

লরেন্স স্টোনের গবেষণা টনির মতবাদকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। তিনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অমিতব্যয়হেতু পুরাতন অভিজাতকুলের আর্থিক অবনতি ও তৎসঞ্জাত সম্মানের এবং সামরিক শক্তির হ্রাস দেখিয়েছেন (L. Stone. 'The Anatomy of the Elizabethan Aristoracy", *Economic History Review,* XVIII)। এছাড়া এদের আধ্যাত্মিক শক্তি জুগিয়েছিল পিউরিটান চিন্তাধারা যা ব্যবসায়কে প্রায় ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা লাভকে অন্যতম Virtue বলে মনে করত।

মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মতে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী জেন্ট্রি শ্রেণীরা বিদ্রোহে ছিল সামন্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে। টনি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মার্কসপন্থী নন তথাপি তিনি তাঁর বিখ্যাত The Rise of the Gentry (1558-1640) প্রবন্ধে জেন্ট্রি শ্রেণীর প্রধান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সে সময় দেশে জেন্ট্রি নামে এক নতুন ভূম্যাধিকারী জোতদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে রাণী এলিজাবেথের সময় থেকেই। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় জমি হস্তান্তর ও কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর গবেষণা চালিয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঐ নতুন জোতদার শ্রেণীরাই সাধারণ কৃষকদের, এমনকি চার্চ ও রাজকীয় সম্পত্তি শোষণ করতে থাকে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল জেন্ট্রিদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। তাছাড়া এ সময় খাজনার হার দ্রুত বৃদ্ধি হলে রাজনীতিতে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং অধ্যাপক টনির মতে গৃহযুদ্ধ ছিল এক নতুন সম্পদশালী শ্রেণীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজাত নিয়ন্ত্রকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম। টনিই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গৃহযুদ্ধকে বিচার করেছিলেন। টনির চিন্তাভাবনায় যে খানিকটা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বোঝা যায়। এর আগে অবশ্য এঙ্গেলস্ সতের শতকের ইংরেজ বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলেছেন। সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক টনি Gentry এবং Merchants-দের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তার ওপর দৃষ্টি দেন। অধ্যাপক টনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ক্ল্যারেন্ডনের উক্তিতে তার সাক্ষ্য মেলে।

সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের প্রথম ঐতিহাসিক Earl of Clarendan লিখেছেন যে, "Parliamentary leaders were for the most part clothiers and men who, through they are rich had not been before of power or reputation there ... though gentlemen of ancient families and estates ... were for the most part well affected to the king... সুতরাং নতুন অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানো অসম্ভব মনে করেন। ফলে রাজতন্ত্রের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অধ্যাপক টনি গৃহযুদ্ধের আর এক প্রত্যক্ষদর্শী হ্যারিংটনের লেখা তথ্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৫৬০-এর দশকে রচিত হ্যারিংটনের বিখ্যাত গ্রন্থ Commonwealth of Oceana গ্রন্থে কীভাবে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণী একটি ভয়ংকর গৃহবিবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা তিনি উপলব্ধি করেন। এর থেকেই তার সিদ্ধান্ত হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যখন স্থানান্তরিত হল এক নতুন শ্রেণীর হাতে, তখন রাষ্ট্রবিপ্লব ছিল অবশ্যম্ভাবী। হ্যারিংটন বলতে চেয়েছেন কিভাবে অভিজাত শ্রেণী রাজ্যের ভূসম্পত্তিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল। তা নিয়ে হ্যারিংটনের এর বিশ্লেষণেই জানা যায়। টনি আরোও বলেছেন যে এ সময় আর এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের মন ছিল বাণিজ্যিক। বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ সমাজের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। শুধু তাই নয় এরা ছিল রাজদ্রোহীদের সহযোগী। সুতরাং টনির মতে, প্রথমদিকে পিউরিটানিজম রক্ষণশীল ছিল, পরে সমাজ ও ধর্মমতের টানাপোড়েনে তা ব্যবসায়ী ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যারিংটনের লেখার উপর নির্ভর করে টনি লেখেন—"But if it broke the discipline of the Church of Laud and the state of Strafford, it did so but as a step towards erecting a more rigorous

discipline of its own. It would have been scandalised by economic individualism, as much as by religions tolerance....", (Religion and the Rise of Capitalism [1926] pp. 211-12) অপরদিকে হিলের মতে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ থেকে প্রত্যক্ষ ধনতন্ত্রের জন্ম হয়নি, ক্যাথলিক ধর্ম ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে যেসব বাধা সৃষ্টি করেছিল তা অপসারিত করে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল মাত্র।

সুতরাং সপ্তদশ শতকে বিপ্লবে এদের ভূমিকাও কম ছিল না।

অধ্যাপক টনির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন ঐতিহাসিক J. W. Nef. ও Stone। এঁদের বক্তব্য হল ১৫৪০ থেকে ১৬৪০-এর মধ্যে ইংল্যান্ডে এক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পবিরর্তনও ঘটেছিল। এঁদের মতে তৎকালীন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এক দল গড়ে ওঠে। এই দলে ছিল সেইসব বণিক, শিল্পীদের সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ যেমন Clothiers, ব্যবহারজীবী, ইওমেন ও ছোটখাট ফ্রিহোল্ডার, নূতন জোতদার শ্রেণী। অধ্যাপক টনির মতে যাঁরা টিউডর আমল থেকেই কৃষিকর্মে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রয়োগ করছিল (R. H. Tawney, The Agrarian Problem in the Seventeenth Century 1912) তারা খনিজ সম্পদ উৎপাদনে মন দিয়েছিল এবং সুবিধামত শিল্প, বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগগুলিতে মূলধন নিয়োগ করত। এই দলের বিরোধী শিবিরে ছিল সেইসব বণিক, একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ; বড় বড় মহাজন, যারা লাভজনক চাকুরীর বিনিময়ে রাজাকে টাকা ধার দিত; রাজকর্মচারী ও পারিষদবর্গ এবং আধা-ফিউড্যাল অভিজাতকুল। এই অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি আর যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালাতে না পেরে ব্যয়বাহুল্য কমাতে না পেরে ক্রমশ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এঁরা নতুন জোতদার শ্রেণীর উন্নতি সুনজরে দেখতে পারেননি। যোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে মন্ত্রীরা যখন শিল্পকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা পেলেন স্বাভাবিক ভাবেই তখন বিপ্লবের নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত স্বার্থের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল।

জে, ডব্লু, নেফ ১৫৪০-১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে দেশের শিল্প ক্ষেত্রে পরিবর্তনের উপর গবেষণা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংঘাত নয়, শিল্প ও ধনাগম সংস্থাগুলিকে করায়ত্ত করার ফলে একটা অর্থনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক মরিস ডবের মতে স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র পার্লামেন্টের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কলহের মূলে কাজ করেছিল অর্থনীতি জনিত শ্রেণীসংঘর্ষ। মরিস ডব ইংরেজ বিপ্লবের সঙ্গে প্রাসিয়ার বুর্জোয়া ধাঁচের বিপ্লবের যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল বলে তিনি মনে করেন। সপ্তদশ শতাব্দী আর এক ঐতিহাসিক ক্রীস্টোফার হিল জোরের সঙ্গে বলেছেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এতদিন টিকে ছিল তা মূলত সামন্ততান্ত্রিক। ১৬৪০-এর দশকের বিপ্লবের আঘাতে ঐ শক্তি বিনষ্ট হয়। এইভাবে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ও প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি মরিস ডবের অনুকরণে একে বুর্জোয়া বিপ্লবের অভিধায় আখ্যায়িত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সপ্তদশ শতকের বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের পথ সহজতর হয়েছিল বলেই একে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বলা সমীচিন হবে। (The state power protecting an old order that was essentially feudal was violently overthrown, power passed into the hands of a new class and so the freer development of capitalism was made possible) (সি. হিল, দ্য ইংলিশ রেভোলিউশন ১৬৪০ পৃ. ৬)

৬.৯ মূল্যায়ন

সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্লবের কারণ ও চরিত্র প্রসঙ্গে যা আলোচনা হয়েছে তার সবগুলি বিষয়ের মধ্যেই

কিছু কিছু সত্যতা আছে, ফলে শ্রেণীগত ও ভাবধারাগত এই দুটি চরিত্রের স্বপক্ষে যুক্তি প্রচুর। একথা ঠিক যে ইংল্যান্ডের জনগণের ভেতরে একটি নতুন শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছিল এবং এই শ্রেণীবিন্যাস ইংল্যান্ডের জনমানসে নতুন ভাবধারা নিয়ে এসেছিল। এই ভাবধারার সংঘর্ষ ছিল বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ কিন্তু একথাও ঠিক যে, এই ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই একটি শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীগুলির ভেতরে নবোদিত মধ্যবিত্তরা, বিভক্ত পিউরিটানরা এবং সাধারণ মানুষ বেশি অংশ নিয়েছিল। অধ্যাপক টনি ধর্মীয় সংঘাতের পিছনে পুঁজিবাদীতত্ত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল তা নিয়ে তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। টিউডর যুগে যেহেতু পার্লামেন্টের একটি বিশিষ্ট চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল সেহেতু দেশের মধ্যে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠাও বিপ্লবের একটা কারণ ছিল। বস্তুত সাধারণভাবে ভাগ করলে দেখা যাবে যে রাজকীয় অধিকার ও পার্লামেন্টের অধিকার এই দুটি অধিকারই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল। এই বিপ্লবের মূল প্রশ্ন ছিল সার্বভৌমত্ব কার হাতে থাকবে। ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিকভাবে এই সময় অগ্রসর ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এরা নিজেদের স্বার্থে রাজার ক্ষমতা বাঁধতে চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে অতৃপ্ত পিউরিটানরা নিজস্বার্থে পার্লামেন্টে রাজার বিরোধিতা শুরু করেছিল। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে তাদের স্বাধীনতায় আঘাত হানতে পারে স্টুয়ার্ট রাজারা। এই কারণে তারা বিদ্রোহী মনোভাব গ্রহণ করল। রাজার ক্ষমতা ক্রমশ দুর্বল হয়েছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক বিভাগে। তবুও রাজা স্বেচ্ছাচারী হন এবং পাঁচজন হাউস অব কমনসের সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন ও মিলিশিয়া বিল নাকচ করেছেন। এরপর পার্লামেন্ট উনিশটি প্রস্তাব দেয় কিন্তু ১৬৪২ সালের ১লা জুন রাজা এই প্রস্তাবগুলি বাতিল করে দেন। ফলে সংঘবদ্ধভাবে রাজার বিরুদ্ধে শ্রেণীগুলি বিরুদ্ধচারণ করে। রাজা এদের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসেননি, বরং সংঘর্ষের পক্ষেই যান। ১৬৪২ সালে দুপক্ষের সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। তবে একথা ঠিক যে এই বিপ্লবের চরিত্র ছিল মিশ্র, যা একেবারে শ্রেণীভিত্তিক ছিল না। ব্রানটন এবং পেনিংটনের মতে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ তখন ইংল্যাণ্ডে তৈরী হয়নি। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ তৈরীর জন্য যে অর্থনৈতিক কাঠামো থাকার প্রয়োজন তা তখন ইংল্যাণ্ডে তৈরী হয়নি। সুতরাং এই বিপ্লব আবার সম্পূর্ণ ভাবধারা-ভিত্তিকও নয়। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে শুরু হয়েছিল এই বিপ্লব।

তাই টনির মতে "এই বিপ্লবের ফলে সমাজবিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক কাঠামোরও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল।"

৬.১০ অনুশীলনী

১. সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব সম্পর্কে টনির ধর্মীয় মত কি ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন?

২. How does Tawney explain the origin of the English Revolution ? Do you agree, with his explanation ?

৩. Critically discuss the different views about the origin of the English Revoution in the Seventeenth Century.

৪. সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব সম্পর্কে টনির বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৫. সতের শতকের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব বিষয়ে টনির সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. R. H. Tawney : Religion and the Rise of Capitalism (1926)
2. Christopher Hill : (i) The English Revolution (1640), (ii) The World Turned upride down
3. E. J. Hobsbawm 17th Century-Revolution
4. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
5. G. M. Trevelyan : England under the Stuarts.
6. John Morrill, Reaction to the English Civil War.

একক ৭ ❑ সামাজিক ইতিহাসের কাঠামো এবং মনস্তত্ত্ব

গঠন ঃ

৭.১ ভূমিকা

৭.২ প্রশ্নাবলী

৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ ভূমিকা

সামাজিক ইতিহাস রচনায় বিশ শতকের গবেষণা একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত হয়েছে। এর মূলে প্রধানত যাঁদের অবদান তাঁরা হলেন 'Annals' গোষ্ঠীভুক্ত ফরাসী ঐতিহাসিকবৃন্দ। তাঁদের মতে যে কোন ঘটনার পিছনে ঐতিহাসিক কাঠামোতে দেখা যাবে দীর্ঘকাল জুড়ে নিয়মিত Cycle and Crisis (বা সময়ের আবর্তন ও সঙ্কটকাল) 'Annals' গোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধিরা হলেন লুসিয়ান ফেভ্র্, মার্ক ব্লন্দ, ফার্নান্দ ব্রোদেল, পিয়ের শানু, জর্জেস ডুরি, রবার্ট মানরো, রয় লাদুরী প্রমুখ।

রাজনৈতিক-সামরিক ঘটনাবলী এবং তথাকথিত বিশিষ্ট মানুষদের মূল্যায়নে ঐতিহাসিকের কর্তব্য থেমে থাকে না। তৃণমূল স্তরের মানুষের (grass-root) দিনগত জীবনের বিশ্লেষণ, জনতার (masses) মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিচ্ছবি অনুধাবন করে ঐতিহাসিককে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। জনগণই ইতিহাসের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে, রাজনৈতিক নেতা নয়। এই ধারণা অনুযায়ী সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ক্রিয়াকলাপ, আইনজগৎ, নাগরিক সমাজের (civil society) মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন ('behaviour') একটি সংগঠিত কাঠামোর (structure) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারলে তবেই ইতিহাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসকে ঘটনার বেড়াজাল থেকে বের করে এনে ঐ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রথম তাকে বিশ্লেষণ করে দু'জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক— লুসিয়েন ফেভ্র্ (Lucien Fabvre, 1878-1956) এবং মার্ক ব্লখ্ (Marc Bloch, 1886-1944)। ১৯২৯-এ এই দুই ঐতিহাসিক এক বিখ্যাত জর্নাল প্রকাশ করলেন : Annals of Economic and Social History (সংক্ষেপে Annals)। পরে এঁদের নির্দেশিত পথে অনেকটা অগ্রসর হলেন ফার্নান্দ ব্রদেল (Fernand Braudel)। ব্লখ এবং ফেভর-এর পূর্বে হেন্‌রি ব্‌র (Henri Berr, 1863-1954) 'Review of Historical synthesis (1900)' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'Evolution of Humanity' নাম দিয়ে একশত খণ্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করার পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সমাজের অন্তবর্তী মানুষের সবরকমের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা এই পরিধির মধ্যে। এর পর 'আনাল' জর্নালের প্রতিষ্ঠাতারা ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে গ্রহণ করলেন সমাজতত্ত্ব (sociology) ভূগোল এবং মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি। এঁরা অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ের নথিপত্রজনিত রেকর্ডকে অবহেলা করেননি, এমনকি আইনচর্চা এবং করসংক্রান্ত দলিলপত্রগুলিকেও বাদ দেননি। এই প্রথম ইতিহাস চর্চায় গৃহীত হল প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত তত্ত্ব, শস্যের ফলনের হিসেব, জমির আকৃতি, মহামারী, পুষ্টি ও অপুষ্টির খবরাখবর, পোষাক, ফ্যাশান, উৎপাদনব্যবস্থা, পণ্য এবং সম্পদের বিভাজনজনিত তথ্যের বিন্যাস প্রভৃতি।

কোন ঘটনার পিছনে ইতিহাসের পরিকাঠামোতে দেখা যাবে একটি দীর্ঘসূত্রী সময়ের নিয়মিত 'cycle and crisis' বা সময়ের আবর্তন ও সঙ্কটকাল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে ভালো ও মন্দ ফসলের উৎপাদনের ওঠা-পড়া ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেলে দেখা যাবে মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি। ফলে তারা দূরবর্তী স্থানে শস্য পাঠাতে অপারগ হবে, এবং শহরগুলিতে দেখা দেবে খাদ্যসঙ্কট। অর্থাৎ আর্থিক সঙ্কট আসবে কৃষিভিত্তিক সাংগঠনিক দুর্বলতার মধ্য থেকে। ("Structural Weakness of Agricultural Economics"—French Studies in History, estd-Maurice Aymard and Harbans Mukhia, Vol I, p-7 ; Longman)। এরকম ঘটনা সব দেশে, সব সময়েই ঘটতে পারে। ফ্রান্সে বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক কাঠামোতে পানীয় মদের অতিরিক্ত উৎপাদন, আর তার পরেই তার স্থিতিশীলতা কৃষক সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছিল, কারণ বাজারে মদ বিক্রী করাই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বিপ্লবপূর্ব ফরাসী দেশ এই ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে ব্যতিক্রমী ছিল। বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলির এটি অন্যতম।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই যে বিরাট পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ফ্রান্সে ঘটেছিল তার কিছু কারণ ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের পর ফরাসী শিক্ষিত সমাজে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বে ফরাসীরাই প্রথম সারিতে অবস্থান করবেন, এমন ধারণার সৃষ্টি হয়। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'French Quest for Security' অর্থাৎ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্সের প্রচেষ্টা তৎকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছিল।) যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দুর্বলতা কোথায় এবং ইউরোপীয় মহাদেশ কেন এরকম ধ্বংসাত্মক ঘটনার মুখে দাঁড়াল, সেই কারণ খুঁজতে গিয়ে ফরাসী ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেন। মার্ক ব্লক্ লিখলেন "French Rural History : An Essay on its Basic Characteristics." দ্বিতীয়ত, এই সময় মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূগোল এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বিশেষত সমাজতত্ত্ব (sociology) বিষয়টি একটি বহুবিস্তৃত আয়তন ধারণ করায় ঐতিহাসিকরা তার দ্বারা প্রভাবিত হন। 'আনাল' গোষ্ঠী ক্রমশ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

'আনাল' গোষ্ঠীর প্রধান পণ্ডিতগণ ছিলেন লুসিয়েন ফেভ্র্, মার্ক ব্লখ, ফার্নান্দ ব্রোদেল, পিয়ের শ্যনু, জর্জেস ডুরি, রবার্ট মানরো, রয় লাদুরী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কাঠামোভিত্তিক ইতিহাস অনুসন্ধানকারী প্রধানত ছিলেন ফেভ্র্ ও লাদুরী এবং এঁদের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত সাংস্কৃতিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক। নানা বিষয়েই এঁরা গবেষণা করেছেন, যথা-কৃষির সংগঠন, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, মানসিকতা, মধ্যযুগ থেকে সামন্ততন্ত্রে সংগঠন, এবং ধনতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে উত্থানের কাহিনী।

'আনাল' গোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক কয়েকজন ঐতিহাসিকের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লুসিরেন ফেভ্র্ এবং মার্ক ব্লখ্ স্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। উনিশ শতকের ইতিহাসচিন্তার ধারাকে বর্জন করে তাঁরা সমাজের ইতিহাস এবং তার পরিকাঠামোগত পরিবর্তনকে ইতিহাস সমীক্ষার প্রধান উপাদান বলে নির্ণয় করলেন। ফেভ্র্-এর অন্যতম গ্রন্থ *Martin Luther* প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ লুথারের জীবনবৃত্তান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আসলে ঐ আন্দোলনের সামাজিক ইতিহাস এবং তখনকার মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ করার চেষ্টা। *The Earth and the Social Evolution* ইতিহাস-এ রচনার ক্ষেত্রে ফেভ্র্ ভৌগোলিক উপাদানগুলির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। ব্লখ্-এর গবেষণাপ্রসূত কাজ *The Island of France (Paris and the Five Departments)* বিবৃত করেছে এ স্থানের ভাষার, জমির চরিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ এবং স্থাপত্য। ১৯২৪-এ প্রকাশিত *The Royal Touch* গ্রন্থটিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে রাজা স্পর্শের

মাধ্যমে মানুষকে রোগমুক্ত করতে পারেন বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তার বিশ্লেষণ করে ব্লখ্ দেখিয়েছেন যে রাজতন্ত্রের দৈব ক্ষমতায় সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস দেশে রাজতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Feudal Society*-তে আলোচিত হয়েছে কি ভাবে সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তৎকালীন মানবসমাজের মানসিকতা কাঠামোগতভাবে সামন্ততান্ত্রিক দুনিয়াকে ধারণ করেছে। ব্লখ্ সময়ের ইতিহাসকে মানববিজ্ঞানের একটি দুরূহ বিষয় হিসেবে ('serious science of men in time') দেখেছেন। মানুষের সমবেত ধ্যানধারণ, বিশেষ (belief) এবং প্রচলিত 'myth' — কিভাবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক বা যোগসূত্র নির্ণয় করে তিনি তার সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন। ব্লখ্ বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের ক্ষুদ্র পরিসর নিয়ে সমীক্ষায় যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের কাজ ইতিহাসের বৃহত্তর এবং পরিবর্তনশীল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে, তবেই ঘটনাসমূহের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফার্নান্দ ব্রোদেল-এর *'The Mediterrenean and the mediteranean World in the age of Philip II'* ইতিহাস-রচনার ধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বইটির নামেই প্রকাশ যে ব্রদেল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ভৌগোলিক আবহ এবং পরিবেশের (environment) প্রেক্ষিতে উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ, একটি 'গ্লোবাল' (global) পরিধির কাঠামোতে তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের স্পেন সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য মানুষ তার পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক অবস্থান এবং সময়ের উপর ছাপ রেখে যায় এবং বিপরীতে বিরাট সামাজিক কাঠামো মনুষ্যচালিত রাজনীতি এবং বৌদ্ধিক ঘটনাবলীকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। যেমন বিশ্বে ইহুদীদের নিগ্রহ, এবং রেনেসাঁর যুগের সাংস্কৃতিক চর্চা— এক দীর্ঘ সময়ের ওঠা-পড়ার আবর্ত এবং ছকের মধ্যে ঘটে থাকে। ব্রোদেল-এর মতে বাস্তবে সমাজে তিনটি স্তর উপস্থিত থাকে। প্রথম এবং মূল স্তরটিতে পরিব্যাপ্ত থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে নিয়ামক উপাদানগুলি। দ্বিতীয় স্তর সংগঠিত করে দীর্ঘসময়কাল ব্যাপ্ত এক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যায় ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক এবং অন্যান্য (যথা, বৌদ্ধিক) ঘটনার সমাবেশ। The Mediterrenean and the Mediterrenean World in the age of Philip II' গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানবসমাজকে উপস্থিত করা হয়েছে দীর্ঘসময়ব্যাপ্ত পার্থিব পরিবেশের (পাহাড়, নদী, দেশের উপকূলভাগ, সমুদ্রপথ ও নদীপথ ইত্যাদি) পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় খণ্ডে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিবর্তনের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট— যথা, দ্রব্যমূল্য উপার্জনকারীদের বেতন কাঠামো এবং বাণিজ্যের পরিস্থিতি— এগুলি পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। অর্থাৎ ব্রদেলের বক্তব্য অনুযায়ী দীর্ঘসময়কালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকি সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনমুখী হয়ে পড়ে। বৈশিষ্ট্যগুলির এই পরিবর্তন বহু ক্ষেত্রে কাঠামোর। গ্রন্থের শেষ, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হয়েছে ক্ষুদ্র সময়ের পরিসরে রাজনীতি সহ অন্যান্য ঘটনা এবং মানুষের কথা।

ব্লখ্ সমাজ-ইতিহাসের যে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে একটি 'hierarchical' অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষণীয়। তাঁর এই বক্তব্যের অবশ্য প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। ইতিহাসবেত্তা দেখিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসকে খুবই সামান্য স্থান দিয়েছেন, এবং প্রশ্ন তুলেছেন, যে, যদি ব্যক্তিবিশেষ এবং ঘটনাসমূহের চাপে সমাজের কাঠামোতে কোন ভাঙন না ধরে তবে তো দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামোতে কখনোই কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু কার্যকালে পরিকাঠামো বা structure-এর নানা স্তরেই এর পরিবর্তন ঘটে, ঐ পরিবর্তনের প্রবহমানতাই তো সামাজিক ইতিহাস। সুতরাং বলা যায় ব্রোদেল তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও, তাঁরা ব্রোদেল-এর 'total history' বা সার্বিক ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাসকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর দিকেই তাঁরা বেশী নজর দিয়েছেন, শত হলেও Mediterranean-এর সঙ্গে তুলনীয় বিশাল মাপের ইতিহাস রচনা করা স্বাভাবিকভাবে দুঃসাধ্য।

পঞ্চাশের দশকে 'আনাল' স্কুল-এর ঐতিহাসিকরা ক্রমশ অনুধাবন করলেন যে একই পরিকাঠামোতে বিশ্বের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা অসঙ্গত, পৃথিবীর সব সমাজ একাত্ম নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনেক বৈষম্য উপস্থিত। পিয়ের শ্যনু (Pierre Chaunu) ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ করে 'Mentality' বা মানসিকতার বিচারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করলেন। যেমন যোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে প্যারিসের অধিবাসীদের সহস্রাধিক মৃত্যু সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিবর্তন এসেছিল, তিনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দলিল বিশ্লেষণ করে তিনি তা উদ্‌ঘাটিত করেন। এ কাজে বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি ইতিহাস রচনা করেন ইমলানুয়ের লাদুরী (ব্রোদেল-এর বিশিষ্ট ছাত্র) 'The Peasants of the Languedoc' (1966) গ্রন্থে বিবৃত করলেন, কি ভাবে কৃষক সমাজ পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়ছিল। রবার্ট মাঁদ্রো (Robert Mandrou) ''Introduction to Modern France' (1961) গ্রন্থে পূর্বেকার মানবসমাজের বিশ্লেষণ করলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিভিন্ন ব্যাধি সম্পর্কে কতখানি ভীতি ও আতঙ্ক। তাঁদের ভয়ে ছিল তীব্র আবেগ, দুঃখ, করুণা এবং নিষ্ঠুরতা। মাঁদ্রো দেখিয়েছেন সমাজ শুধুমাত্র বিভিন্ন স্তরভেদের উপাদান দ্বারা নয়, কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। 'আনাল গোষ্ঠীর' ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করেছেন হস্তাক্ষর, অপরাধতত্ত্ব (criminology) এবং ডাকিনী বিদ্যার ইতিহাস। এমনকি, পোশাক বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের ইতিহাসকেও তাঁরা বাদ দেননি। সংস্কৃতির বহুদিক তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, লোকসংস্কৃতির তো বটেই (Folklores)। জ্যাক্ লা গফ্-এর Medieval Civilisation', লাদুরীর *Carnival in Romans* (১৯৮০) এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক কীম থমাস-এর *Religion and Decline of Magic* বইগুলি অতীতের মানুষের ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসের বিশ্লেষণ।

আঠারো এবং উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের গ্রামীণ ও শহরের জনতার আচরণ—ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গণ আন্দোলনের চরিত্র— বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক জর্জরুদে তাঁর Crowd in History (1964) গ্রন্থে সামাজিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা সর্বদাই ক্ষেত্র বিশেষের ভৌগোলিক পটভূমিকার এবং জনসমষ্টির মানসিকতা বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন। তাঁরা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য ভাষাতত্ত্ব চিহ্নের অর্থ (cartography), লোকগাথা, প্রচলিত গল্পসমূহ আর সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। বিভিন্ন প্রথা (Custom), ঐতিহ্য (tradition), স্থানের নাম, এমনকি জমির ছক (pattern), কেও তাঁরা গবেষণার বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন, সেগুলি থেকে পুরানো সমাজ সভ্যতাকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এঁদের বিশেষ অবদান এই যে structure বা পরিকাঠামোর মধ্যে মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তাভাবনাকেও যথাযথ গুরুত্ব দান করা হয়েছে যদিও সমালোচকরা মনে করেন যে ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বৃহৎপরিসর কাঠামোগত তথ্যকে অতিরিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং বিবাহ রেজিস্ট্রেশান-এর দলিলগুলিকে (records) প্রচুরভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির (social groups) ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হওয়ার (formulation) কাহিনীকে, এবং মানুষের মানসিকতার বিশ্লেষণ করে ইতিহাসচর্চার অন্তর্গত করে এঁরা ইতিহাস নামক বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। হওয়া করা একান্তই উচিত— মিশেল ফুকো (Michel Foucault) মতিচ্ছন্নতা বা উন্মাদ অবস্থার ইতিহাস নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। *Madness and civilisation : A History of Insanity in the age of reason* তাঁর এক অসাধারণ কাজ। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন *Displine and punishment : The Birth of the Prison* (1975)। এই বইতে তিনি পরবর্তী ফ্রান্সের কয়েদখানা (Prison) এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থা যথা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা এবং সামরিক ব্যারাকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এইগুলি crime বা অপরাধতত্ত্বের মানসিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

৭.২ প্রশ্নাবলী

১. সমাজ-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘আনাল’ গোষ্ঠীর নতুনত্বের পরিচয় দাও। এঁরা ইতিহাসের পরিকাঠামো (Structure) তত্ত্ব বলতে কি বুঝিয়েছেন?

২. মার্ক ব্লখ্ এবং ফার্নান্দ ব্রোদেল-এর ইতিহাসতত্ত্ব বিশ্লেষণ কর। এঁদের মধ্যেও কি ধরণের পার্থক্য দেখা যায়?

৩. সমাজ-ইতিহাসের পরিধিতে মানসিক ইতিহাস (বা History of Mentality) কে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী

1. Rise of the Modern West — Meenaxi Phukan (Macmillan)
2. A Text book of Historigraphy — E. Sreedharan : (Orient Longman)
3. French Studies in History — (Vol I) Editors : Maurice Aymard and Harbans Mukhia : (Orient Longman)
4. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — অমলেশ ত্রিপাঠী (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
5. Britanica Ready Reference Encyclopedia.

একক ৮ ❑ ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাসে মার্কসীয় ঐতিহাসিক : হিল, হব্‌স্‌বম্ এবং ই. পি. থম্পসন এবং নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস

গঠন ঃ

৮.১ ভূমিকা

৮.২ ব্রিটিশ মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকগণ

৮.৩ এরিখ্ হব্‌স্‌বম্ (Eric Hobsbaum)

৮.৪ ই. পি. থম্পসন (E. P. Thompson)

৮.৫ নতুন ইতিহাস— নিম্নবর্গের কথা (Subaltern Studies)

৮.৬ প্রশ্নাবলী

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ ভূমিকা

কার্ল মার্কস সর্বপ্রথম ইতিহাসকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরেছেন। একথা আজ সর্বজনবিদিত, যে কার্ল মার্কস-এর চিন্তাধারা আধুনিক যুগের মানুষকে সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সমাজ, এবং শ্রমজীবিশ্রেণীর অর্থনৈতিক উত্তরণের কথা আজ যে বহু মানুষ ভাবছেন, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভাবক ছিলেন কার্ল মার্কস। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ, বুর্জোয়া উদারনীতি এবং হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের দুর্গকে মার্কস ধূলিসাৎ করেছিলেন।

ইতিহাস-চিন্তাধারায় কার্ল মার্কস উদ্ভাবন করেছিলেন নিশ্চিত কতকগুলি ঐতিহাসিক সূত্র। তিনি ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র,— কিন্তু অত্যাশ্চর্য মেধার অধিকারী এই জার্মান পণ্ডিত ইতিহাসে এক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন যাকে বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (Historical Materialism)। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ'-ও বলা যেতে পারে। খুব সংক্ষেপে এবং সরলীকৃত করে তাঁর প্রতিপাদ্যগুলি এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে— প্রথমত হেগেলীয় সময়ে পরিবর্তনশীলতা বা অগ্রগতির ভাববাদী তত্ত্বকে বিপরীতমুখী করে বাস্তবানুগ করে নেওয়া, যাকে বলা হয় 'বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ' (Dialetic Materialism) ; দ্বিতীয়ত তাঁর 'উদ্বৃত্ত মুনাফাতত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) এবং তৃতীয়ত আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণীসংগঠন এবং শ্রেণীসংঘাত ও বিপ্লবের মাধ্যমে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করা। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্-এর প্রতিপাদ্য এই যে, পুরাতন কাল থেকে মানবজাতির প্রতিটি পর্যায় বা ধাপ ঐ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এবং ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায় তার প্রয়োজনানুগ একটি আদর্শ তৈরী করে নিয়েছে, এবং ঐ পর্যায়গুলির পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধান উপাদান ছিল শ্রেণীসংঘাত বা শ্রেণীসংগ্রাম।

পশ্চিম জার্মানীর 'ট্রিয়ার' শহরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কস-এর জন্ম হয়েছিল, এবং শহরটির শিক্ষিত গোষ্ঠী ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান হিসেবে মার্কস বাল্যকালে যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৩৬-এ প্রবেশ করেন। চার বৎসর আইন অধ্যয়ন করে, 'ডক্টরেট ডিগ্রি' লাভ করেছিলেন। বার্লিন নগরীতে তখন বামপন্থী চিন্তাধারা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। 'মোজেস হেস্' ("The Sacred History of Mankind") , উইলহেল্‌ম্ ওইট্‌লিং ("Mankind as it is, and as it ought to be") এবং উদারপন্থী মন্ত্রী ফন্ স্টাইন শ্রমজীবিদের স্বার্থে দরিদ্র সমাজের অধিকারের কথা আলোচনা করে চলেছিলেন। বিশেষত ওইলিং-এর রচনায় বক্তব্য ছিল দরিদ্র সমাজের শিক্ষা ও সুখের অধিকার অনস্বীকার্য। তাঁর রচনাসমূহ মার্কস ও এঙ্গেলস্-কে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল। ফয়ারব্যাখ্, সেই নট সাইমন, ব্যাবুক্, টক্‌ভিল এঁরা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও আমেরিকান বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। মহৎ দার্শনিক হেগেল আমৃত্যু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন (১৮৩১ পর্যন্ত)। মার্কস হেগেলীয় দর্শনের প্রতি অকৃষ্ট হন, এবং হেগেলীয় দর্শনের পঠনপাঠন এবং সমীক্ষায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

১৮৮২-এ কার্ল মার্কস বন নগরীতে 'রাইন্‌শে জাইটুং' (Rheinshe Jeitung) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন, এবং কিছুদিন তার সম্পাদনাও করেন। ঐ পত্রিকাটি তার তীক্ষ্ণ মতামতের জন্য প্রশাসনিক স্তরে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কাগজটি প্রাসীয় সরকার বন্ধ করে দিলে তিনি বন নগরী ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসেন। ১৮৪৩-এ প্যারিসে চলে আসার পর সেখানেই তাঁর ফ্রেডারিখ এঙ্গোল্‌স্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আর এই পরিচয় ইতিহাসের এক আশ্চর্য যোগাযোগ। আমৃত্যু মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ ছিলেন বন্ধু এবং পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে সহযোগী। ফ্রেডারিখ এঙ্গেল্‌স্ ছিলেন একজন প্রাসিয়ান ফার্ম-মালিকের পুত্র। প্যারিস্ ত্যাগ করে প্রধানত ব্রাসেল্‌স্-এ বাস করার সময় উভয় বন্ধু গভীর নিষ্ঠা সহকারে এবং বিভিন্ন তথ্যকে বিশ্লেষণ করে যে তত্ত্বে উপস্থিত হয়েছিলেন তাকেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ তত্ত্ব পূর্ববর্তী সাম্যবাদী দর্শনকে স্থানচ্যুত করেছে।

ইতিহাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন কতকগুলি বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে মানবসমাজ প্রবাহিত হয়েছে। এশিয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া— এগুলি ছিল মানবসভ্যতার ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির ধাপ। প্রতিটি ধাপেই সমাজের পরিবর্তন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যখন নতুন উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে পুরাতন উৎপাদনকাঠামোর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে, আর ঐ সংঘাতের মধ্য থেকে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন যুগের বিপ্লব, এবং ইতিহাসে তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ তাঁদের ইতিহাসের দর্শনকে উপস্থিত করেছিলেন 'লীগ অফ দ্য জাস্ট্' নামক সংস্থার সামনে ১৮৪৭-এর নভেম্বর মাসে। তাঁদের বক্তব্য সমন্বিত ওই পুস্তিকা সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রধান হাতিয়ার 'The Communist Mainfesto'। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছিল, "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles". প্রাচীন সভ্যতায় ক্রীতদাসশ্রেণী যারা তাদের শ্রমদান করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বজায় রাখত, তারা বিদ্রোহ করেছে মালিকদের বিরুদ্ধে; মধ্যযুগে বারবার ঘটেছে কৃষক বিদ্রোহ এবং সামন্তপ্রথা ভেঙে যখন বুর্জোয়া বা বাণিজ্যিক সমাজ উঠে এসেছে, তখন কৃষক বিপ্লব ঘটেছে এবং ইংল্যাণ্ডে ১৬৪২-এ, ফ্রান্সে ১৭৮৯, এবং জার্মানীতে ১৮৪৮-এ। বাণিজ্যজীবী সমাজ যখন ধনতান্ত্রিক সমাজে উপনীত হবে, তখনি ঘটবে শ্রমিকশ্রেণীর (প্রলেতারিয়েত) পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিবাদী

অর্থনীতির দ্বারা যে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করেছে (Thesis) তার বৈপরীত্যের (antithesis) কাঠামোতে তৈরী হয়েছে এক বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণী, যারা মালিকদের কাছে পণ্য হিসেবেই গণ্য হয়। ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্রমশ সংখ্যায় ক্ষুদ্রতর হয়েছে (ছোট শিল্পগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে বৃহত্তর শিল্পসংস্থাগুলি) আর কারখানাগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে মজুরশ্রেণীর ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং ঐ বিশাল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মালিকদের সংঘাতের সঙ্গে পথে অগ্রসর হওয়া অবধারিত, এবং তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের তত্ত্বে বিশ্বাসী; জাতীয়তাবাদ মার্কসীয় তত্ত্বে গৌণ। "Workers of all land, Unite"—এই ছিল তাঁর আহ্বান। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রমিক -শোষণের রূপ মার্কস ও এঙ্গেলস্ নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন। যে 'প্রলেতারিয়েত'-কে মার্কস ইউরোপে অবলোকন করেছেন, তারা গ্রামীন জীবন থেকে 'মুক্তি' (alienated) পাওয়া এক সর্বহারা শ্রেণী—"The Workers have nothing to loose, but their chains." তাই তারা ধনতান্ত্রিক মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে, এবং সর্বরকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবে। মার্কস-এর পূর্বসূরী সাম্যবাদীরা বলেছিলেন, "all men are brothers". বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের বক্তব্য ছিল প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে জোর করে ভেঙে ফেলে দিতে হবে : "The forcible overthrow of the whole existing order." মার্কস-এর মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে প্রলেতারিয়েত যে শোষণমুক্ত সমাজ সৃষ্টি করবে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমজীবিদের একনায়কতন্ত্র ("Dictatorship of the proletariat") ক্রমশ রাষ্ট্রের প্রয়োজন লুপ্ত হবে; প্রত্যেকে সামাজিক সম্পদকে তার যথাসাধ্য অবদান দ্বারা পুষ্ট করবে, আর সমাজ প্রত্যেককে দেবে তার প্রয়োজনমাফিক পণ্য। এ এক ধরণের ইউটোপিয়া।

মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলিই বাস্তবে ঘটেনি। যেমন তিনি ভেবেছিলেন, প্রলেতারিয়ত সত্যিই সে ভাবে দরিদ্রতর হয়ে ওঠেনি; অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে। তাঁর প্রত্যাশা মত উন্নত শিল্পাশ্রিত দেশে (যথা ব্রিটেনে / যুক্তরাষ্ট্র) বিপ্লব ঘটেনি। বিপ্লব এসেছে কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলিতে— রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়া, কিউবায়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট বারবার সামাল দিয়েছে এবং বিশ্ব জুড়ে শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়নি, বরং জাতীয় স্বার্থে সংগ্রাম করেছে।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্ব এক বিরাট জগৎ উন্মুক্ত করেছে, যেখানে একথা সর্বতোভাবে স্বীকৃত যে, উৎপাদনব্যবস্থাকে সবল করে তোলার উপরেই সমাজ ও মানুষের উৎকর্ষ নির্ভর করছে। শ্রেণী বা গোষ্ঠীগুলিই সমাজের মূল ভিত্তি। এই শ্রেণীসংগঠনের গুণগত অবস্থান সম্পর্কে এবং উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন ও আলোচনা— এই দুটি ব্যাপার সম্পর্কে শিক্ষিত জগৎকে অবহিত করে মার্কস ও এঙ্গেলস্ সামাজিক ইতিহাসকে এক নতুন মাত্রায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার এক নতুন হাতিয়ার তৈরী করেছে। উৎপাদনপদ্ধতিই সমাজকে, এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে, এই ধ্রুব সত্যকে উন্মোচন করে মার্কস 'সার্বিক ইতিহাস' বা total history-কে একটি নিশ্চিত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

ক্রিস্টোফার হিল (Christopher Hill)

সপ্তদশ শতকে ইউরোপ, তথা ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানচর্চার হাওয়া এসেছিল, এবং রেনাসাঁ ও রিফর্মেশন-এর পরোক্ষ ফল হিসেবে এই বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহকে দেখা যেতে পারে। ক্রিস্টোফার হিল বিভিন্ন লেখায় বলেছেন, বুর্জোয়া জাগরণ এবং পিউরিটান আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্ত ছিল। তিনি বলেছেন, পিউরিটান ধর্মীয় বিপ্লব

যে নৈতিক মূল্যবোধ এনেছিল, তাতে ছিল বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যা সংশ্লিষ্ট উপাদান। তারই ফলে ব্রিটিশদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর মেধার উৎকর্ষ এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল, যে তারা ১৬৪০ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে 'experimental Science', বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। হিল বিশ্বাস করতেন যে, টমাস গ্রেশাম (Thomas Gresham) তৎকালীন লন্ডনের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী যিনি Gresham College প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ঘটনাই প্রমাণ করে যে ব্রিটেনে পিউরিটান ধর্ম, আধুনিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ পারস্পরিকভাবে জড়িত ছিল। এইচ এফ, কিয়ারনে (H. F. Kearney) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি এবং বলেছেন যে, Gresham College Oxford এবং Cambridge-এর মতোই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা নাকি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে। এখানে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল এবং ব্যবসায়ীদের রাজনীতি, ধর্ম এবং বিজ্ঞান এখানে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ, তিনি একথা স্বীকার করেননি যে, ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণী বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিক্ষাবিস্তার নির্ভর করেছিল শিক্ষিত মানুষদের সমর্থন এবং সাহায্যের উপর। দু'টি বিষয়ে ব্রিটিশ জাতি তখন বিশেষভাবে চিন্তা করত— জমির অবস্থা এবং সমুদ্রে যাতায়াত। এরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য প্রধানত দায়িত্ব নিয়েছিল। কোনো একটি গোষ্ঠী নয়— অর্থাৎ Puritan মনোভাবাপন্ন বাণিজ্যজীবিরা নয়। Hill-Kearney-র এই বিতর্ক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৮.২ ব্রিটিশ মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকগণ

ক্রিস্টোফার হিল্ (Christopher Hill)—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার হিল-এর জন্ম হয় এক মেথডিস্ট (Methodist) পিতামাতার সন্তানরূপে। মেথডিস্ট আদর্শ ইংলণ্ডের চার্চের অন্তর্গত এভানের্জলিকাল আন্দোলনের প্রতীক, এবং ব্রিটিশ চার্চের কিছুটা বিচ্ছিন্নতাবাদী। হিল বলেছেন, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর এই ঘটনা প্রভাব ফেলেছিল। বলা হয়, যে ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত ধর্মী মূল্যবোধ (non-conformity, অর্থাৎ একাত্ম না হওয়া) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর অসাধারণ মেধা সহজেই তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, এবং সেখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি মার্কসীয় তত্ত্ব গ্রহণ করে, ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি এর পর এক বছর বাস করেন, এবং তারপর বিভিন্ন জায়গায় অধ্যাপনার শেষে 'ব্যালিয়ল' (Balliol) কলেজে আধুনিক ইতিহাসের শিক্ষক (tutor) হিসেবে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে, মেজর পদে উন্নীত হন। যুদ্ধের শেষে ক্রিস্টোফার হিল কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের সঙ্গে ই. পি. টম্পসন, এরিক হব্স্‌বম্, বড়নী হিল্টন্, জর্জ রুডে, মরিস্ ডং ইত্যাদি— যুক্তভাবে 'কমিউনিস্ট পার্টি হিস্টরিয়ান্স্ গ্রুপ' (Communist Party Historians' group) সংগঠিত করেন। ১৯৫২-তে এই সংগঠন বিখ্যাত পত্রিকা 'পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' (Past and Present) প্রকাশিত করেন। এই জর্নাল শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু আলোচনা প্রকাশ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী আক্রমণের ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ হিল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করেন। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্রিস্টোফার হিলের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল *'Lenin and the Russian Revolution'*, (১৯৪৭), The Good Old Couse (১৯৪৯) এবং এডমন্ড ডেল' (Edmond Dell) এর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসমূহ যেগুলি ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Intellectual Origins of the English Revolution* ঐ বিপ্লবের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে সবিশেষ পরিবর্তিত করেছে। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন *Economic Problems of the Church, Puritonism and Revolution, 'The Country of Revolution'*, ইত্যাদি।

তাঁর লিখিত *Intellectual Original of the English Revolution* এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, যে, ব্রিটিশ বিপ্লবের পিছনে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা (intelectualism) এবং পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকরা বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবের পিছনে কোন জ্ঞানদীপ্তির কার্যকারণ উপস্থিত ছিল না। হিল বললেন, বিশেষ আদর্শ বা ধারণা ব্যতীত কোন বিপ্লব সম্ভব হয় না, যদিও ঐ আদর্শ বা ধারণা সমকালীন পারিপার্শ্বিকেরই ফলশ্রুতি। বাস্তবের পরিস্থিতি সমকালীন ধ্যানধারণাকে জন্ম দেয়। যে কোন পণ্ডিতের ধারণাসমূহ এবং চিন্তাসম্ভার— মার্টিন লুথার, রুশো, এমনকি মার্কস-এরও চিন্তাধারা বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে, তার কারণ সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজনগুলিকে তাঁদের তত্ত্বসমূহ সমর্থন করেছে। পুরাতন মূল্যবোধ মানুষ অগ্রাহ্য করে, যখন সমান্তরালভাবে অন্য কোন যুগোপযোগী আদর্শ তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। মার্ক ব্লখের সঙ্গে একমত হয়ে হিল বলেছিলেন, ইতিহাস লেখা হবে সমাজের সমস্ত আঙ্গিককে গ্রহণ করে, তাই বুদ্ধিমত্তার ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

'The Guardian' পত্রিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩-এ মন্তব্য করেছে, ক্রিস্টোফার হিল ব্রিটিশ জাতির কাছে সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের উপর কিভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে, সেই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর কারণেই সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডকে সঠিকভাবে জানা শুরু হয়েছিল। অন্য একজন সমালোচকের মন্তব্য : ইংরেজ বিপ্লব এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে দেখা দিয়েছিল যেখানে ধর্মীয় ধারণাই ছিল প্রধান উপাদান। ঐতিহাসিক হিল এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ঐ ধর্মীয় বাতাবরণকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে এবং তিনি-ই করেছিলেন এই বিশ্বাস, তিনি ব্রিটিশদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ব্রিটেনের বিপ্লব ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

৮.৩ এরিখ্ হব্‌স্‌বম্ (Eric Hobsbaum)

ঐতিহাসিক এরিখ হব্‌সবম্ ইজিপ্টে জন্মেছিলেন ১৯১৭-র জুন মাসে। ভিয়েনা ও বার্লিনে তাঁর শৈশব কেটেছিল। ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং ১৯৩৩-এ লন্ডনে চলে আসেন। 'কিংস' কলেজ, কেমব্রিজে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইতিহাসে ডক্টরেট লাভ করেন। পরে, ১৯৪৭-এ তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৬-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন; ১৯৪৬-১৯৫৩ পর্যন্ত তিনি Communist Party Historians Group-এর সদস্য ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ার হাঙ্গেরী আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে চলে আসেন। অবশ্য ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ Birkbeck কলেজের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন; ১৯৭৮-এ Fellow of the British Academy নির্বাচিত হন। ১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ করেন।

হব্‌স্‌বম্‌ আধুনিক কালের ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের অন্যতম। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে বিশেষত তিনি আঠারো শতকের যুগ্ম বিপ্লব (Dual Revolution), অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব (রাজনৈতিক) ও ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্লবকে (অর্থনৈতিক) তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই দুটি বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ অসাধারণ ও বহুবিস্তৃত। হব্‌স্‌বম্‌ মনে করেন যে, এই দুটি বিপ্লবের সুদূর প্রসারী-ফলাফল বর্তমানের উদারপন্থী ধনতন্ত্রকে (liberal capitalism) পুষ্ট করেছে। শ্রমজীবী শ্রেণী এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা তাঁকে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী করেছিল। তিনি অবশ্য শ্রমজীবি-সংস্কৃতিকে কোন উচ্চমানের সংজ্ঞা প্রদান করেননি, কারণ তিনি ঐ সংস্কৃতির মধ্যে দারিদ্র এবং নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন।

হব্‌স্‌বম্‌-এর কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম *The Age of Revolution : Europe 1789-1848; Incustry and Empire Labouring Men, Studies in the History of Labour, Primitive Rebels and Bondits* ইত্যাদি। মূলত হব্‌স্‌বম্‌ একজন অর্থনীতির (মার্কসবাদী) ঐতিহাসিক এবং শিল্পবিপ্লব তাঁর বিশেষ সমীক্ষার বিষয়বস্তু। তিনি মনে করেন যে ধনতন্ত্র এমন একটি অবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে অবস্থান করে। ধনতন্ত্রের উত্থানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে আর্থিক সংগঠন সমাজ ও রাজনীতিকে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Industry and Empire*-এ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে ব্রিটেন পৃথিবীর প্রধান এবং অগ্রগণ্য শিল্পাশ্রয়ী দেশে পরিণত হয়েছিল, তারপর সাময়িকভাবে ঐ প্রাধান্য থেকে কিছুটা স্থানচ্যুত হয়েছিল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ মাত্রায় তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এবং ঐ সব ঘটনাগুলি ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক ব্রিটেনের সমাজ এবং সংস্থাগুলির অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, যদিও ধনতন্ত্রের উত্থান ও অগ্রগামিতা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটেনে আর বাধা পায়নি। সেখানে পুরাতন কৃষকসমাজ ক্রমশ অপসৃত হয়েছে, আর নগরসভ্যতা দেখা দিয়েছে; নারী ও পুরুষ তাদের শ্রমের বিনিময়ে রুজি জোগাড় করতে শুরু করেছে, অর্থাৎ শিল্পবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ব্রিটেনে সুনিশ্চিত হয়েছে। তাঁর Primitive Rebels and Bandits প্রকাশিত হবার পর থেকে পশ্চিমের ঐতিহাসিকরা অপরাধতত্ত্বকে একটি আইনগত সমস্যা হিসেবে না দেখে সামাজিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখতে শিখেছেন। পূর্বে মনে করা হত, ডাকাতি একটি স্বতস্ফূর্ত এবং অতি প্রাচীন (Primitive) বিদ্রোহের প্রকাশ; হব্‌স্‌বম্‌ বারবার আলোচনা করে দুর্বৃত্তের উপজীবিকাকে সময়োপযোগী একটি সামাজিক পটভূমিকায় উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ ডাকাতি ব্যাপারটি একটি সমস্যা যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে সামাজিক ভারসাম্যহীনতার গভীরে। হব্‌স্‌বম্‌ শিল্পবিপ্লবের 'উড়াল' দেওয়া বা 'take off'-এর সময়টিকে ১৭৮০ খৃ. ধার্য করেছেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা আরও ৩০-৪০ বৎসর পূর্বে 'take off'-এর সময়কে চিহ্নিত করেছিলেন। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে এই 'উড়াল' কথাটির অর্থ উৎপাদনক্ষমতা কিছুটা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার পর হঠাৎ একটি সুবৃহৎ, সীমাহীন স্তরে পৌঁছে যাওয়া পণ্য উৎপাদন, কর্মদক্ষতা এবং মানবশক্তির প্রয়োগ, সর্বক্ষেত্রেই এই বিশালতা দেখা দেয়। আর কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং নগর নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই শিল্পবিপ্লব। *Industry and Empire* গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, কেন বিশেষ করে ব্রিটেনেই এমন শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল, মহাদেশের অন্য কোন দেশে নয়। তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ডের প্রশাসনিক নীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যাতে দেশের মানুষের মুনাফা বৃদ্ধি হয়। উপরন্তু ব্রিটেনে কৃষিক্ষেত্রে এতটাই উন্নতি হয়েছিল, যে কৃষকশ্রেণীর শুধুমাত্র কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে না থেকে, শিল্পে শ্রমদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীরা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে

উঠেছিল। মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলিতে এই ধরণের অর্থনৈতিক আবহ গড়ে ওঠেনি। তাই ব্রিটেনেই সম্ভব হয়েছিল শিল্পবিপ্লব।

হব্‌স্‌বম্‌ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ঐতিহ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রগুলিতে 'এলিট' গোষ্ঠী তাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ চরিত্রকে বজায় রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতাকে প্রমাণ করার জন্য 'Tradition' বা ঐতিহ্যকে উদ্ভাবন করে চলেন।

Listner পত্রিকার মন্তব্য : হব্‌স্‌বম্‌ একটি 'Original and Masterly reinterpretation of western economic history' উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৮.৪ ই. পি. থম্পসন (E.P. Thompson)

ই.পি. থম্পসন অক্সফোর্ডে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন, ১৯৯৩-তে তাঁর মৃত্যু হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এই ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইতালীতে চলে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৮-এ তিনি লীড্‌স্‌ (Leads) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পরে ওয়ারউইক (Warwick) বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, এবং Communist Party Historians' group-এ সদস্য হন— যার সদস্য ছিলেন এরিখ্‌ হব্‌স্‌বম্‌, ক্রিস্টোফার হিল্‌, বড়নী হিল্টন, মরিস্‌ ডং, জন সেভিল— ইত্যাদি বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট দল ত্যাগ করে, ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে Campaign for Nuclear Disarmament নামক সংস্থাটি গড়ে তুলতে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে সহায়তা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে. বি. প্রিস্ট্‌লী, বার্ট্রান্ড রাসেল, ভেরা ব্রিটেন, এ. জে. পি. টেইলর, মাইকেল ফুট ইত্যাদি। পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বইগুলির মধ্যে অন্যতম *The Making of the working class, Whigs and Hunters, Protest and Survive, The Proverty of Theory* ইত্যাদি।

The Making of Working class গ্রন্থটির ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন। এই বইটির সারমর্ম, কিভাবে শ্রমজীবি শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রসঙ্গে থম্পসন শ্রেণীসংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী-চরিত্র এক ধরণের পারস্পরিক সম্পর্ক, যেখানে কিছু মানুষ জন্মগত অথবা কর্মসূত্রে নিজেদের মধ্যে একই স্বার্থে একাত্মতা বোধ করে, এবং অপরাপর গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে পার্থক্য অনুভব করে। এই পারস্পরিক বন্ধন এবং তার বিপরীতে অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে বিরাট ফারাক 'শ্রেণী' বা 'class' সৃষ্টি করে এবং অন্য কোন কাঠামোতে শ্রেণী সংজ্ঞাকে ফেলা যায় না। কৃষি এবং শিল্পাশ্রিত ধনসম্পদ বা ধনতন্ত্র কিভাবে দরিদ্রশ্রেণীর সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছে, ই পি থম্পসন সেই বিশ্লেষণে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যেখানে ধনতন্ত্রের সুবিধাগুলির পরিমাণ (quantity) মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন, থম্পসন সেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজ গুণগতভাবে (qualitatively) কি হারিয়েছে, তারই বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শিল্পবিপ্লব আসল শুধুমাত্র দারিদ্র্য এবং ব্যাধি নয়, কিন্তু 'কাজের' উপরেও তার কালো ছায়া ফেলেছে। বিশেষজ্ঞদের বিচারে *Making of the Working Class* গ্রন্থটি শ্রমজীবিশ্রেণীর প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি, আর সক্রিয় চেতনাকে বিশ্লেষণ করেছে। একটি 'mert and faceleas mass' (Marurick) হিসেবে শ্রমজীবী শ্রেণীকে তিনি দেখেন নি, যা নাকি অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক করেছেন।

দরিদ্রশ্রেণীর সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তিনি কৃষি ও শিল্পবিপ্লবের প্রভাবের মূল্যায়ন করেছেন।

সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে Centre for Studies of Social History প্রতিষ্ঠা করার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐ সংস্থায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখার প্রচেষ্টা শুরু হয়— মানবসমাজের নিচু স্তর থেকে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ। ব্রিটিশ সমাজের অপরাধ এবং আইনসংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকে উপরতলা থেকে আলোচনা না করে, একেবারে নিম্নতম স্তরের অবস্থা বিশ্লেষণ করে সমস্যাগুলিকে দেখাবার চেষ্টায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

থম্পসনের সমালোচকরা অবশ্য বলেছিলেন, তিনি তথ্য বা evidence-কে যথাযথ গুরুত্ব দেননি, এবং অনেক সময়েই প্রচলিত মতামত (heresay) আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে লিখে গেছেন, এবং শ্রেণীসংজ্ঞার সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ই. পি. থম্পসন বলে গেছেন শিল্পবিপ্লবের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় এমন অনেক অসুস্থতা আছে, যা চেষ্টা করলে এখনও সারানো যায়। কারণ পরিবর্তন (Evolution) কখনোই শেষ হয় না। *The Obsever* পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী ৪,১৯৭৯) তিনি বলেছেন, লেবার পার্টির একজন মার্কসপন্থী সদস্য হিসেবে, তিনি সর্বদাই এমন এক রাজনীতি দেখতে চেয়েছেন, যেখানে তাঁর দেশে একটি সাম্যবাদী সমাজ তৈরী হবে— এমন একটি সমাজ— যেখানে বর্তমানের চেয়ে অনেক উচ্চমানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজে এবং প্রশাসনে ("As a Marxist ... in the Labour Party I have always tried to coverage a politics that will enable us, in this country, to effect a transition to a socialist society—and a society a great deal more democratic in worth as well as in government than our present one...")।

বহুমুখী ছিল তাঁর গণসংযোগ। কখনো ট্রাফালাগার স্কোয়ারে (Trafalgar Square)-এ ভাষণ দিয়েছেন, কখনো চেক্ (Check) দূতাবাসে ধর্না দিয়েছেন তাদের (চেকোশ্লোভাকিয়া) 'জাজ' (Jazz) সঙ্গীত গোষ্ঠীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের শান্তি প্রচেষ্টার আন্দোলন এবং পরমাণু বিরোধী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেবার কাজে তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

৮.৫ নতুন ইতিহাস— নিম্নবর্গের কথা (Subaltern Studies)

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের কিছু ঐতিহাসিক মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুনভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁরা ইতিহাসে মার্কসীয় তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে জড়বাদী (materialistic) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে এঁরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রভাব ও তারই চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। ইতিহাস-রচনার এই ধারাটিতে তথ্য আবিষ্কারের উপাদানগুলিকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। শতাব্দীকাল যাবৎ ভারতীয় সমাজের যে মানবগোষ্ঠী ইতিহাসচিন্তার পর্দায় প্রতিফলিত হয়নি, তারাই এখন ইতিহাসের প্রশ্নগুলির একমাত্র বিষয়বস্তু। এই ইতিহাসচর্চায় রাজনৈতিক সমস্যাগুলি পিছনে পড়ে গেছে, আর সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। এই নতুন ইতিহাসচর্চার একটি বিশেষ অংশকে বলা হয়েছে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', যাকে অনেক পণ্ডিত বলেছেন প্রতিবাদের

ইতিহাস।

বিশ শতকের আটের দশকের প্রথমেই এই 'নিম্নবর্গের (subaltern) ইতিহাস' রচয়িতাগোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে। এই ইতিহাসতত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব এইখানে যে, ভারতীয় সমাজের সমীক্ষা থেকে এর উৎপত্তি হওয়ার পর নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের চিন্তাধারা এখন লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং বিভিন্ন দেশজ সংস্কৃতির সমীক্ষার একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক ভারতের ঔপনিবেশিক জাতীয় জাগরণের ইতিহাসকে ইতিপূর্বে প্রধানত ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের কর্মকাণ্ড এবং সাফল্যের ইতিহাস হিসেবে দেখা হত। এখন তার সমান্তরাল রেখায় স্থান করে নিয়েছে দরিদ্র মানুষের প্রতিবাদী ইতিহাসের কাহিনী, আর জাতীয় জাগরণে তাদের ভূমিকা।

'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বা *Subaltern Studies* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক রণজিৎ গুহর সম্পাদনায় কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে। অধ্যাপক গুহ সোচ্চারে বলেছিলেন যে, ঐ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ উত্থানের কাহিনীকে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে না। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে, ইংরেজদের ধ্যানধারণা এবং জ্ঞানচর্চার অংশীদার হয়ে তবেই ভারতীয় শিক্ষিত বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ইংরেজ শাসনেরই পরোক্ষ ফল। অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে, দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা কিন্তু সাধারণ স্তরের মানুষ, যাঁরা বুদ্ধিজীবি বা 'elite' শ্রেণীর গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ অবদান রেখেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি, বা গুরুত্ব দেননি। যথা, ১৯১৯-এ 'রাওলাট' আইনের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অংশ হিসেবে নিম্নবর্গের মানুষ যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত অভিযানে নেমেছিল সেই কাহিনী অলিখিত এবং অনুচ্চারিত থেকে গেছে। রণজিৎ গুহ এবং তাঁর সঙ্গে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, 'এলিট' (elitist) রাজনীতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের মানুষেরা (জনতা) আগাগোড়াই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত থেকেছে এবং সেই ধারাটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ অংশ।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Subaltern' কথাটির অর্থ নিম্নস্তরের কোন পদে আসীন মানুষ, এবং ঐ 'নিম্নস্তর' কোন শ্রেণী, জাত অথবা 'জেণ্ডার' (নারীবাদ)-কে বোঝাতে পারে। 'Subaltern' কথাটি নেওয়া হয়েছিল Gramschi-র রচনার একটি পাণ্ডুলিপি থেকে এবং ক্রমশ ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমাজের নিম্নতম স্তরের অধিবাসীদের প্রতি এই সংজ্ঞা আরোপ করা হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, রচয়িতারা মার্কসীয় তত্ত্বকে গ্রহণ করে, কৃষক শ্রেণি, কারখানার মজুর এবং উপজাতিসমূহ এবং তাদের আন্দোলনগুলি নিয়ে কাজ করেছেন। ঐ সব অতিসাধারণ মানবগোষ্ঠী তাদের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়ে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এরা যৌথ বিদ্রোহের মাধ্যমেই উচ্চস্তরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। লক্ষ্যহীনভাবে এবং অনিশ্চয়তার সঙ্গে নয়, সচেতনভাবে, অনন্যোপায় হয়ে এবং চরমপন্থী হিসেবে এরা বারবার বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছে। দুষ্ট জমিদার, সুদখোর মহাজন, অসাধু ব্যবসায়ী, দায়িত্বহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং আইনজীবিদের শোষণ ও আক্রমণের হাত থেকে তারা রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে বিদ্রোহী আন্দোলনের মাধ্যমে। এরা পরিকল্পনামাফিক আন্দোলন করেছে, এবং বিদ্রোহী সত্তা গ্রাস করে নিয়েছে গ্রাম, কারখানা আর বনাঞ্চলের আদিবাসীগোষ্ঠীগুলিকে। এই কারণেই নিম্নবর্গের ইতিহাসরচনায় স্থান পেয়েছে ধর্ম, কুসংস্কার, দাঙ্গার প্রবৃত্তি। ঐ বিষয়গুলিকেই বিশ্লেষণ করে চলেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতাগণ।

সাবঅলটার্ন ইতিহাস রচনায় প্রবিষ্ট হয়েছেন ডেভিড আর্নল্ড, যিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন অন্ধ্র প্রদেশের পাহাড়ের

অধিবাসীদের বিদ্রোহের কাহিনী। মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ (সমসাময়িক কালের) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে কৃষকদের সচেতনতা আর ক্রিয়াকলাপ তাঁদের এই সঙ্কটে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল। আর্নল্ড বলেছেন, ঐতিহাসিকরা প্রধানত দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কৃষক-সচেতনতার ইতিবাচক দিকটি অগ্রাহ্য করেছেন। জ্ঞান পাণ্ডে লিখেছেন ১৯১৯-২২-এর অযোধ্যার কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী এবং জাতীয়তাবাদের উপর তার প্রভাব নিয়ে। ভারত ছাড়ো (১৯৪২) আন্দোলনে নিম্নবর্গের মানুষদের ভূমিকার কথা (বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে) লিখেছেন স্টীফেন হেনিংহাম। কেউ কেউ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ১৯৪৭-৭৮-এর মধ্যে বিহারে কৃষি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের পিছনে কৃষক অসন্তোষই ছিল প্রধান বা মুখ্য সঞ্চালক। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পিছনে ছিল কমিউনিস্টদের দ্বারা নির্ধারিত নীতি। দীনেশ চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন ১৮৯০-১৯৪০-এর মধ্যে পাটকল (Jute Mill)-এর শ্রমিকদের কথা। তিনি দেখিয়েছেন, পাটকলের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ক্রমশ সাম্যবাদী এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বর স্তরে 'elitist' দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করে, মজুর ও নেতাদের মধ্যে 'বাবু-কুলি' সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আন্দোলনের চরিত্র নষ্ট করেছিল। শহিদ আমিন-এর বক্তব্য, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও অকর্ষণ কৃষক চেতনায় অনেকখানি প্রবেশ করতে পেরেছিল, কারণ এই কৃষকশ্রেণী ছিল দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী, অর্থাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

গৌতম ভদ্র লিখেছেন 'The four rebels of 1857', পার্থ চ্যাটার্জির কাজ Caste and Subaltern Consciousness, আশিস নন্দী, যিনি ঠিক নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের মধ্যে পড়েন না, তাঁর একটি আলোচনা, 'The Intimate Enemy'। অনেকভাবে অনেক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে চলেছেন 'নিম্নবর্গের মানুষ'দের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াকলাপ, তাদের সচেতন বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব।

নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতাগণ ভারতীয় সমাজের একেবারে শিকড়ে গিয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি মার্কসীয় তত্ত্বের গণ্ডির বাইরেও তাঁরা শ্রেণী-সত্তা সম্পর্কে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'নিম্নবর্গীয়' ইতিহাস তত্ত্ব শেষ বিশ্লেষণে ইতিহাসরচনার একটি অংশবিশেষ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, সার্বিক সামাজিক ইতিহাসে পৌঁছতে পারে না। এই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধিজীবিদের সম্বন্ধে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রবেশ করেছে, তাই জনতার বিক্ষোভের বাইরে বিরাট ইতিহাসের গণ্ডিকে এই ইতিহাসবিশারদরা এড়িয়ে গেছেন। কতকগুলি খণ্ড ইতিহাসের বাইরে, সুবৃহৎ এবং সুসংহত ইতিহাসে পৌঁছতে পারেননি। তথাপি, একথা অস্বীকার করা চলে যে, অবহেলিত মানুষদের সম্পর্কিত তথ্য এবং তাঁদের সংগৃহীত 'নিম্নবর্গের' ইতিহাসরচয়িতাগণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এনে উপস্থিত করেছেন, বহুদিনের অন্ধকারে জমে থাকা অজানা, অচেনা ইতিহাসকে এঁরা লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত করেছেন। সচেতনভাবে সমাজের সমস্ত অংশকে যা না কি অপাংক্তেয় বলে বিবেচনা করা হত— বিশ্লেষণ করে ইতিহাস রচনা করতে শিখিয়েছেন এই 'Subaltern' গোষ্ঠির ইতিহাসবিদগণ।

৮.৬ অনুশীলনী

১. শ্রমজীবি মানুষের ইতিহাস রচনায় ই.পি. টমসন কিভাবে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন?

২. ব্রিটেনের সামাজিক ইতিহাস রচনায় ক্রিস্টোফার হিলের অবদান কি ছিল?

৩. বামপন্থী ঐতিহাসিক এরিখ হবস্‌বম্‌কে ব্রিটেনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম বলা সঙ্গত কিনা আলোচনা করুন।

৪. নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Meenaxi Phukan — Rise of the Modern West.
2. David Thompson — Europe Since Napoleon.
3. Eric Hobsbawn — Industry and Empire ; The Age of Revolution, 1789-1848.
4. E.P. Thompson — The English Working Class.
5. Christopher Hill—The Centurey of Revolution.
6. E. Sreedharan— A Textbook of Historiography.
7. চিত্রা অধিকারী— আধুনিক ইউরোপ, বিন্যাস ও বিবর্তন (১৭৮৯-১৯১৯)
8. Communist Manifesto — Marx and Engels.

একক ৯ ❑ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ

গঠন

৯.০ প্রস্তাবনা
৯.১ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ
৯.২ প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার
৯.৩ মিলের ইতিহাস এবং প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র
৯.৪ অনুশীলনী
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ প্রস্তাবনা

বর্তমান পাঠক্রমে ভারতে ইতিহাস চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে গত দুশো বছরের মুখ্য ধারাগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে আঠার শতকের শেষভাগে ওরিয়েন্টালিস্ট নামে পরিচিত ভারতবিদ্যা-বিশারদদের অবদান স্মরণ করি। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এখানকার অধিবাসীদের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইতিহাস প্রসঙ্গে বিদেশী শাসকরা তথ্যসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেছিল। ওরিয়েন্টালিস্টরা সেই চাহিদা পূরণ করেন। তাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞানপিপাসা দ্বারা চালিত হননি। এই কারণে তাঁরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। অন্যদিকে প্রশাসনের ভিতর সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা এদেশে নির্বিচারে প্রয়োগ করতে চান। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তারা কোনরূপ মর্যাদা প্রদর্শন করেননি। ভারতীয়দের তারা মনে করতেন অসংস্কৃত। ভারতীয়দের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। জেমস্ মিল ছিলেন এই ধারার প্রতিনিধি। তাঁর মনোভাব আমরা প্রথম অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছি। আধুনিক কালে ভারতীয়দের ইতিহাস চিন্তার প্রাথমিক প্রকাশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটতে দেখা যায়।

৯.১ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ

একাদশ শতকের সূচনায় সুলতান মামুদের ভারতাভিযানের সঙ্গী প্রখ্যাত চিন্তাবিদ **অল-বিরুণী** তাঁর **তারিখ-ই-হিন্দ** গ্রন্থে ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনার অভাব উল্লেখ করেছেন। নির্দিষ্ট তথ্যের পরিবর্তে তারা কল্প কাহিনির অবতারণা করে বলে তাঁর অভিযোগ। গ্রীস দেশে প্রাচীনকালে **হেরোডটাস** কিম্বা **থুকিডাইডিস** অথবা রোম সাম্রাজ্যে **ট্যাসিটাস** কিম্বা **লিভি** ইতিহাস রচনার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। ব্যতিক্রম হিসাবে দ্বাদশ শতকে **কলহন**- বিরচিত **রাজতরঙ্গিনী** গ্রন্থের নাম করা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার অভাব স্বীকার করতে হয়। এর কারণ এই নয় যে ইতিহাস বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস পঞ্চম বেদের মর্যাদা লাভ করেছিল। সংস্কৃতে **ইতিহাস** শব্দের অর্থ "এইরূপ ঘটেছিল" **(ইতি-হ-আস)**। কৌটিল্যের ***অর্থশাস্ত্র*** গ্রন্থে ব্যাপকার্থে এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

পুরাণ, ইতিবৃত্ত, উদাহরণ, আখ্যায়িকা, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র তাঁর মতে ইতিহাস বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। পিতার শ্রাদ্ধকর্মে ইতিহাস আবৃত্তির নির্দেশ দিয়েছেন মনু। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে বিস্তৃত বংশতালিকা পাওয়া যায়, **পার্জিটার** যার সাহায্যে ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। তবে তা অত্যন্ত বিতর্কিত। রাজসভায় কবিরা আশ্রয়দাতার প্রশস্তি গেয়েছেন। এইসব রচনায় কল্পনা ও বাস্তবে প্রভেদ করা দুরূহ। মধ্যযুগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায়, পারস্য ও আরব দেশে ইতিহাস রচনার সমাদর ছিল। ভারতীয় লেখকরা শাসকদের রাজত্বকালের বৃত্তান্ত আরবী-ফারসী ভাষায় লেখার সময় এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের আদি পর্বে ইতিহাস রচনার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে সময়ের দিক দিয়ে প্রথম **রামরাম বসু-র *মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** (১৮০১)। গ্রন্থের সূচনায় লেখক বলেছেন, এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা তিনি পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে শুনেছেন। ("যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।") এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী সর্বজনজ্ঞাত। পরবর্তীকালে **নিখিলনাথ রায়** এই একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রামরাম বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন- "যিনি সর্বপ্রথম অন্ধকারময় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গুহায় ক্ষীণবর্তিকা হস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হইলেও সেই ক্ষীণবর্তিকা যে পরম আদরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষার ঐতিহাসিকগণ বসুমহাশয়কে তাহারদিগের পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিবেন।" পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনাশৈলী অনুসরণে রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ ***মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** বলে নিখিলনাথ দাবি করলেও মধ্যযুগের ভারতে শাসনবৃত্তান্ত লেখার ঐতিহ্য স্মরণ করে **ডেভিড কফ্** বলেন- কেবলমাত্র একটি রচনার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়েছে বলা সঙ্গত নয়। ("Because Ramram's book was essentially a narrative of the rise and tribulations of a Hindu Raja of Jessore and because such traditions of secular rulers were part of the historical tradition in Muslim India, it is difficult on the basis of this work alone to prove the influence of a European historical outlook.") -Kopf, 123-4.

আঠার শতকে বাংলার রাজনীতির কিছুটা পরিচয় মেলে দুটি গ্রন্থে। **রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্*** গ্রন্থটি ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর কিছু পূর্বে নদিয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় দেহরক্ষা করেছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় সংক্রান্ত প্রচলিত কাহিনির উল্লেখ করেছেন রাজীবলোচন। তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে সংস্কৃত ঘেঁষা এবং সম্পূর্ণ ফারসী প্রভাবমুক্ত। নাটকীয় রস সৃষ্টি করতে তিনি তাঁর লেখার কয়েক জায়গায় সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে রামরাম বসুর ***মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** গ্রন্থের তুলনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত ***রাজাবলী*** অধিক প্রতিনিধিস্থানীয় বলে **ডেভিড কফ্** মন্তব্য করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সামরিক সাফল্যলাভের ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে। আঠার শতকের এক পণ্ডিত হিন্দুদের পুরাবৃত্ত বিষয়ে নিজের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে এখানে ছাপার অক্ষরে ধরতে চেয়েছেন— বলেছেন **কফ্** ("Mrityunjoy's *Rajabali* was the work of an eighteenth century pundit who has attempted to crystallize his random thinking on the Hindu past into the concrete form of the printed word.")

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা ছিলেন ইংরেজদের আশ্রিত। উপরোক্ত দুটি গ্রন্থের লেখক ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন বলে **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার** মনে করেন। রাজীবলোচনের গ্রন্থ প্রকাশের সাত বছর আগে মহারাজ রাজবল্লভের পরিবারের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে এক আবেদনপত্রে জানানো হয়েছিল, ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে মীর কাসিমের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে,

সিরাজউদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে নদিয়া-রাজের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়। রাজানুগ্রহলাভের আশা এর পিছনে প্রধান কারণ, বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাজীবলোচন এই ধারা অনুসরণ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। **রাজাবলী** গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ না থাকলেও সিরাজের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনায় রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা প্রায় একইরকম। **রাজাবলী** গ্রন্থে কলকাতায় মহারাজ রাজবল্লভের আশ্রয় গ্রহণের কারণ হিসাবে নবাবের পক্ষ থেকে তাকে জাতিচ্যুত করার চেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে রাজীবলোচনের গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছর পর **চার্লস স্টুয়ার্ট** তাঁর বাংলার ইতিহাস ***(হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল)*** গ্রন্থে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের তালিকায় মহারাজ রাজবল্লভের উল্লেখ করেননি। সমকালীন অন্য কোনও সূত্রে **ডঃ মজুমদার** অনেক সন্ধান করেও এই চক্রান্তের সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেননি। অথচ জনশ্রুতির এমনই প্রভাব যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। রাজীবলোচনের দৃষ্টান্তেই **অধ্যাপক মজুমদার** মনে করেন সম্ভবত **দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়** ***ক্ষিতীশ বংশাবলি*** গ্রন্থে মহারাজ রাজবল্লভকে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের একজন ভেবেছেন। ইতিহাস রচনায় জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করা যায় না, সিরাজ প্রসঙ্গে রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আলোচনা এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ বলে ডঃ মজুমদার মনে করেন। ("The two Bengali works demonstrate what little reliance can be placed on popular tales about Sirajuuddaula and his times even though they were current less than half a century after his death." R. C. Majumdar,Maharaja Rajballabh, 44)। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় সম্প্রতি তাঁর ***পলাশীর ষড়যন্ত্র ও বাঙালি সমাজ*** গ্রন্থে নবাবের বিরুদ্ধে বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং নদীয়ার রাজাদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। জগৎ শেঠের বাসভবনে সিরাজের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলেছিল বলে রাজীবলোচন বর্ণনা করেছেন, অধ্যাপক রায়ের সে বিষয়ে মন্তব্য- "এর উপর নির্ভর করা যায় না তবু এই বর্ণনাই সবচেয়ে বিস্তৃত।"

রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে আমরা এক নতুন যুগের সুচনা লক্ষ্য করি। এবং সমাজ সংস্কার তাঁর বিভিন্ন রচনায় অতীত থেকে উদাহরণের অন্ত নেই। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ছাড়াও তিনি আরবী-ফারসী এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ***মনিয়ের উইলিয়ামস*** তাঁকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জনক বলেছেন, ("father of comparative theology") হিন্দু শাস্ত্র, কোরাণ এবং বাইবেল তিনি মূলে পাঠ করেছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে এসব বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মে ব্যুৎপত্তির কারণে তাঁকে বলা হত "জবরদস্ত মৌলবী"। প্রাচীনকে তিনি আঁকড়ে থাকতে চাননি। শিক্ষার জন্যে সরকারের বরাদ্দ অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে এদেশে যাতে ব্যয় হয় সেজন্য তিনি ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যের অমর্যাদা তিনি কখনও সহ্য করেননি। ডঃ টাইটলার নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসকের সঙ্গে বিতর্ক এক জায়গায় চলাকালে তিনি বলেন- সভ্যতার উদয় হয়েছিল ভারতে। ইংরেজদের কাছ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলেও সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা ধর্ম বিষয়ে ভারতবাসীকে এসব বিষয়ে অন্য দেশের কাছে ঋণী হতে হয় না। আমাদের নিজেদের ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

"If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says, we are indebted to the English he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent, and also my gratitude; but with respect to *Science, Literature* or *Religion* I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history

it may be proved that the world was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguish us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

রামমোহন অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন, ধর্মের মূলসূত্র এক। পুরোহিতরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সংকীর্ণতা ও পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়ে এক ঈশ্বরের চিন্তা করলে হিন্দু সমাজের মঙ্গল— একথা তিনি তাঁর *বেদান্ত গ্রন্থ*-এর (১৮১৫) মুখবন্ধে বলেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা। খ্রিষ্টের নীতি নির্দেশকে বাইবেলের সার কথা মনে করতেন রামমোহন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বমানব। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত কখনও সফল হতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন। স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আয়ারল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নেপলসে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি যেরকম দুঃখ পেয়েছিলেন, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সাফল্য তাঁকে সেরকম উৎসাহিত করে। লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই তিনি একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াতিক্ তাঁকে সভ্য পদে বরণ করে। প্রাচ্যবিশারদদের অন্যতম **টমাস হেনরি কোলব্রুক** -এর সঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। ভারত-আত্মার মর্মমূলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, এই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "ভারতপথিক" আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদের সঙ্গে রামমোহনের অবশ্য একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ-

"রামমোহন পণ্ডিত হলেও এবং তাঁর নানা শাস্ত্রবিষয়ক রচনাবলী অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণাকে সাহায্য করলেও, সেগুলি চরিত্রত গবেষণাকর্ম নয়। ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের সঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বহু সময়েই এক; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে তাকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের অধঃপতিত জাতি ও সমাজকে আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তাঁর প্রাচ্যশাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্য। এক কথায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাত্র বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তাঁর এই গোত্রভুক্ত রচনাগুলিতে পাণ্ডিত্য ও মননের গভীরতার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত যে হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই।" (**দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, ২২৭**)

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে **হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও** (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন তারুণ্য ও মুক্তবুদ্ধির প্রতীক। ১৮২৮ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ছাত্রদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ডিরোজিওর শিষ্যরা ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী নামে পরিচিত হন। ডিরোজিও-শিষ্য **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩) বলেছেন—ডিরোজিও প্রায়ই ছাত্রদের কাছে অতীত ইতিহাস থেকে দেশপ্রেম, ন্যায়পরায়ণতা, সমাজ-হিতৈষণা এবং আত্মত্যাগের কাহিনি পাঠ করে শোনাতেন। তাঁর ব্যাখ্যা গুণে ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হত। ("He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils." Peary Chand Mitra, A biographical Sketch of David Hare) ১৮৩৩ সালে ডিরোজিয়ানরা **সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা** (Society for the Acquisition of General Knowledge, সংক্ষেপে SAGK) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৩৫) উদ্বোধন করতে গিয়ে ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি ও গুরুত্ব ("The Nature and Importance of Historical Studies") বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন— "ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা বিশ্বাস অর্জন করি। অতীতে অধঃপতিত বহু জাতি বর্তমানে যা কিছু মহৎ ও শুভ তার জন্যে প্রসিদ্ধ। ইতিহাস মন দিয়ে পড়লে আমরাও কি দেশ এবং নিজেদের উন্নত করার সম্ভাব্য বহু পথ খুঁজে পাবো না?" (There are many nations that at one time groaned under wretched degradation, but who stand conspicuous now for everything that is good and great. Shall we not then in all probability come to the possession of many means of raising ourselves and our country if we attend closely to the lessons of history?")

ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে ইতিহাস চর্চায় **প্যারীচাঁদ মিত্র**-র নাম সর্বাগ্রে করত হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করে পরবর্তী দু'বছর হিন্দু যুগে এদেশের অবস্থা সম্পর্কে তিনি চারটি অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (State of Hindustan under the Hindus.)। ভারতবিদ্যা চর্চায় **হোরেস হেম্যান উইলসন**-এর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়াও অন্যান্য যেসব গ্রন্থের তিনি সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল **জেমস মিল**-এর ভারতের ইতিহাস (History of India), **জি. আর গ্লেগ্** প্রণীত বৃটিশ ভারতের ইতিহাস *(History of British India)*, এবং **টড্**-এর Annals and Antiquities of Rajasthan। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, টডের ইতিহাস ভারতীয়দের দীর্ঘকাল আকৃষ্ট করেছে। মোঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ইংরেজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** সম্পাদিত ***বিদ্যাকল্পদ্রুম*** (Encyclopedia Bengalensis, ১৯৪৬-৫১) নামক কোষ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **প্লেটো, রাজা বিক্রমাদিত্য** এবং **যুধিষ্ঠিরের** চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ডেভিড হেয়ারের একটি জীবনী তিনি রচনা করেন।

সংস্কারকদের প্রভাবে ১৮৬০-এর দশক থেকে সমাজে নারীর ভূমিকা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে। প্যারীচাঁদ মিত্র এই আলোচনায় যোগ দেন। ১৮৬০ সালে তিনি ***রমারঞ্জিকা*** নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, যে হাত দোলনা দোলায়, তা পৃথিবী শাসন করে *("The hand that rocks the cradle, rules the world.")*। এই সূত্র ধরেই উল্লিখিত গ্রন্থে প্যারীচাঁদ দেখিয়েছেন সন্তান পালনে পরিবারে মা কিরকম গুরু দায়িত্ব পালন করেন। উদাহরণ হিসাবে রামায়ণ মহাভারতের কতকগুলি প্রধান নারী চরিত্র (কৌশল্যা, সীতা, কুন্তী, এবং দ্রৌপদী), স্পার্টার বীর রমণী এবং রোম সাম্রাজ্যে প্রজাদের হিতাকাঙ্খী গ্রাচি-ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী কর্নেলিয়া-র নাম করেন। ***এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা*** নামে একই বিষয়ে অপর একটি গ্রন্থ প্যারীচাঁদ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাজপুতানার ইতিহাসে সংযুক্তা (পৃথ্বীরাজের সঙ্গ অমর প্রেমের কাহিনির নায়িকা হিসাবে) এবং আঠার শতকে মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাঈ (যাঁর পরিচালনা গুণে হোলকার রাজ্য বিশেষ উন্নতি করেছিল) চরিত্রের বর্ণনা করেন। *The Development of the Female Mind* নামক প্রবন্ধে বৌদ্ধ যুগে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করেছেন প্যারীচাঁদ।

ডিরোজিওর আর এক শিষ্য **নীলমণি বসাক** (১৮০৮-১৮৬৪) **নব-নারী** গ্রন্থ রচনার জন্যে প্রসিদ্ধ। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম যাঁরা উৎসাহ গ্রহণ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন **ডেভিড হেয়ার** (১৭৭৫-১৮৪১)। ডিরোজিয়ানদের উদ্যোগে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। পূর্বোক্ত রচনাটি নীলমণি বসাক এই প্রতিযোগিতায় লেখেন সেবছর প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "প্রাচীন ও মধ্যযুগের নারী চরিত্র" ("exemplary biography of females in ancient and medieval times")। প্রতিযোগিতায়

প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। গ্রন্থ ভূমিকায় লেখক বলেছেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজে নারীদের অবহেলা করা হত, এই ধারণা দূর করতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। নয়জন নারীর চরিত্র এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থের নাম ***নব-নারী***। এঁরা হলেন যথাক্রমে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ এবং রানি ভবানী। অনুসন্ধান এবং তথ্য সংকলনের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত বলে গ্রন্থকার দাবি করেছেন। পৌরাণিক কাল-চেতনাকে বর্জন করে লেখক পাশ্চাত্য কাল গণনার রীতি অনুসরণ করেছেন। পৌরাণিক ধারণায় কাল মণ্ডলাকৃতি। বিপরীতে পাশ্চাত্য চিন্তায় সময় সুনির্দিষ্ট রেখাপথে অগ্রসর হয়।

যে যুক্তিবাদী আলোচনায় কালচক্রের পরিবর্তে সময়ের রৈখিক গতিপথ এবং পুণ্য চিন্তা অপেক্ষা জাগতিকত বিবেচনা এমনকি প্রচলিত কাহিনি বর্ণনাতেও প্রাধান্য পায়, নীলমণি বসাকের গ্রন্থে তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চাকে পরিণতি দান করেছে। পৌরাণিক কালচিন্তার বেষ্টন থেকে ভারতের ইতিহাসকে উদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা পঞ্চাশ বছর আগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে শুরু এখানে তা নিশ্চিত ভাবে জয়লাভ করল— বলেছেন **অধ্যাপক রণজিৎ গুহ।**

("Thus, a rationalist discourse which enables linearity to replace cyclicity and the secular the sacred even in traditional narratives, celebrates in Nilmani Basak's *Nabanari* the coming of the age of a modern historiography in the Bengali language. It was a decisive victory in that struggle to free the Indian past from the coils of epic time, which had begun with the works of the pandits of Fort William College some fifty years ago."- Ranajit Guha, *Historiography of India, A Nineteenth Century Agenda and its Implications.* 39-40)

রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮১৭-১৯০৫) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ***তত্ত্ববোধিনী সভা*** প্রতিষ্ঠা করেন। সভার (১৮১৩) মুখপত্র-রূপে প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। বাংলা ভাষায় এই পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল একটি কমিটির ওপর। দেবেন্দ্রনাথ এবং পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) প্রমুখ বিদ্বৎজন। ***তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়*** ভারতের সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশিত **প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা** (১৭৭১ শকাব্দ ৭১ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। মার্শম্যান-প্রণীত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থের সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ থেকে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত (১৮২৮-১৮৩৬) অংশটি ***বাঙ্গালির ইতিহাস*** নামে অনুবাদ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আধুনিক ইতিহাস চর্চার উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল যে পরিপ্রেক্ষিতে, পরিশেষে তার সামান্য উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রধান কেন্দ্র। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল আগে। আধুনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বাঙালি মনীষীরা দীর্ঘকাল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৯.২ প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে এদেশের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করেন কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষী। প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ বা **ওরিয়েন্টালিস্ট** নামে এঁরা সমধিক প্রসিদ্ধ। আঠার শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম সিকিভাগ পর্যন্ত মোটামুটি এঁদের কার্যকাল। এর আগেও যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপে কোনও কৌতূহল দেখা যায়নি তা নয়। কাশিমবাজার কুঠিতে নিযুক্ত **জে. মার্শাল** নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে ***ভাগবত পুরাণের*** এক ইংরেজি অনুবাদ করেন বলে জানা যায়। আগ্রা নিবাসী জার্মান মিশনারী **হাইনরিশ রোট** (মৃত্যু ১৬৬৮) একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে তা প্রকাশিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতেও এরকম উদ্যোগের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সেখানে কর্মরত এক ওলন্দাজ ধর্মযাজক **আব্রাহাম রজার** প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে মালাবার অঞ্চলে নিযুক্ত জেসুইট ধমর্যাজক **জোহান এর্নস্ট্ হানক্সলেডেন** একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তবে তা মুদ্রিত হয়নি। এর ওপর নির্ভর করে প্রায় এক শতাব্দী পরে ঐ একই অঞ্চলের অস্ট্রিয়া দেশীয় ধর্মযাজক **ফ্রা পাওলিনো** লিখেছিলেন দুটি সংস্কৃতি ব্যাকরণ এবং আরও কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এইসব বিক্ষিপ্ত উদাহরণ বাদ দিলে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব ওরিয়েন্টালিস্ট রূপে যাঁরা খ্যাত তাঁদেরই প্রাপ্য। কর্মসূত্রে এঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অবদান কেবলমাত্র জ্ঞানরাজ্যেই সীমিত ছিল না। এর একটি প্রায়োগিক দিকও ছিল। ভারতবর্ষের মতো বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ শাসনের জন্য এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আচারানুষ্ঠান, বিশ্বাস ও ধর্মমত প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা করা ছিল জরুরি। ওরিয়েন্টালিস্টদের রচনা ও অনুসন্ধান এই প্রয়োজন সাধনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। **ওয়ারেন হেস্টিংস** গভর্নর জেনারেল থাকাকালে (১৭৭৪-১৭৮৫) মুক্তহস্তে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

আলোকপ্রাপ্তির যুগে (Age of Enlightenment) পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বাইরে যেসব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, ইউরোপীয়দের সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। ফরাসী দার্শনিক **ভলতেয়ার** (১৬৯৪-১৭৭৮) একটি গ্রন্থে পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন। এতে তিনি হিন্দু সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রণজিৎ গুহ কর্তৃক ***A Rule of Property for Bengal*** গ্রন্থে উদ্ধৃত *আলেকজান্ডার ডাও* তাঁর History of Hindostan (3vols, 1768-72) গ্রন্থে বলেন—এশিয়ার যেসব দেশ ইংরেজরা অধিকার করেছে কিংবা যেগুলির সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে সেখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বা ধর্মমত বিষয়ে অনুসন্ধান না করার কারণে ভাবীকাল বোধহয় তাদের অপরাধী জ্ঞান করবে। ("Posterity will perhaps find fault with the British for not investigating the learning and the religious opinions which prevail in those countries in Asia into which either their commerce or their arms have penetrated")

হেস্টিংস ছিলেন ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি প্রথম এদেশে আসেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর ১৭৭২ সালে তাঁকে এই রাজ্যের গভর্ণর (১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল) নিযুক্ত করা হয়। (১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল) কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে লেখা এক চিঠিতে (১১ই নভেম্বর ১৭৭৩) তিনি বলেন—কোনো ব্যবসায়িক সংস্থার পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এজন্য ভারতীয়দের সাহায্য প্রয়োজন। হেস্টিংসের উদ্যোগে কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করে তাঁরা আইন সংক্রান্ত

প্রয়োজনীয় বিধি "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব" নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত করেন। ফরাসী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। পরে তা *A Code of Gentoo Laws* নামে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করেন **ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড** (১৭৫১-১৮৩০)। অত্যন্ত দক্ষতা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে ভূমিকায় হেস্টিংস মন্তব্য করেন। গ্রন্থটির তাৎপর্য প্রকাশমাত্র অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক মন্তব্য করেন ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন আইন এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ("probably a compilation of the most ancient laws in the world")। এর দু বছর পর হালহেডের *Grammar of Bengal Language* মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য প্রথম বাংলা ভাষায় ছাপার হরফ তৈরি করেন হুগলির **পঞ্চানন কর্মকার**।

১৭৭৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য হেস্টিংস একটি পদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে হেস্টিংস কেবল ফারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। স্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে (২০ শে নভেম্বর ১৭৮৪) গীতা পাঠের ফলে তিনি কিরকম অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে কথা জানান। ভারতের চিত্রশিল্প এবং পান্ডুলিপি সংগ্রহেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৭৮১ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হলহেডের *A Code of Gentoo Laws* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেন, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষায় সবচেয়ে সাহায্য করে ধর্মসহিষ্ণুতা এবং প্রচলিত আইন ব্যবস্থা অবলম্বন—যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শাসকদের স্বার্থ বা আইনের বিরোধিতা করে। ("Nothing can so favourably conduce to these two points as a well-timed toleration in matters of religion and adoption of such original institutes of the country, as do not immediately clash with the laws or interests of the conquerors.")

হেস্টিংসের কাছে ওরিয়েন্টালিস্টদের ঋণের সীমা ছিল না। হলহেডকে তিনি উৎসাহ দান করেছিলেন। আগেই সে কথা বলেছি। ইংরেজিতে ***গীতা*** অনুবাদ করতে সংস্কৃত ভাষা বিশারদ **চার্লস উইলকিন্স**-কে তিনি প্রণোদিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার হেস্টিংসের নির্দেশে কোম্পানি বহন করে। "ইম্পে" কোড **উইলিয়াম চেম্বার্স** ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই কাজের জন্য তিনি প্রতি মাসে দু হাজার টাকা পেতেন। জোনাথন ডানকান ঐ কোড বাংলায় অনুবাদ করার জন্য পনের হাজার টাকা পেয়েছিলেন ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে। হেস্টিংসের সাহায্য ও উৎসাহে **ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন** প্রকাশ করেন *A. Compendious Vocabulary English and Persian* (১৭৮০) এবং **আবুল ফজল** কৃত **আইন-ই-আকবরী**-র ইংরিজি অনুবাদ (১৭৭৭-১৭৮৬) **কর্ণেল জেমস রেনেল** ভারতের যে মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন তা সম্ভব হত না হেস্টিংসের সাহায্য ছাড়া। রাজনীতির পাশাপাশি ভারতে যুক্তি এবং নৈতিকতার মানোন্নয়নে হেস্টিংস সচেষ্ট ছিলেন। একথা বলেছেন তাঁর জীবন চরিতকার জি. আর গ্লেইগ, "He laboured, in short, to promote not only the political but the moral and rational improvement of the provinces." Thomson এবং Garret বলেন— "He (Hastings) loved the people of India and respected them to a degree no other British ruler has ever equalled." **ডেভিড কফ** বলেছেন— "His basic convictions became the credo of the Orientalist movement: to rule effectively one must love India, to love India one must communicate with her people and to communicate with her people one must learn their languages."

প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির যে পরিবেশ হেস্টিংস গড়ে তোলেন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা একটি সংগঠিত রূপ লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল এশিয়া মহাদেশে মানুষ

এবং প্রকৃতির যা কিছু সৃষ্টি তার অনুসন্ধান করা। ("The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature.") কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার আগে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ পণ্ডিতেরা বাটাভিয়া-য় এরকম একটি সোসাইটি গঠন করেছিলেন। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার **রবার্ট চেম্বার্স** (১৭৩৭-১৮০৩), **স্যার জন শোর (১৭৫১-১৮৩৪)** এবং সংস্কৃত ভাষায় **সুপণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স**। একই আদর্শের অনুসরণে ১৮২২ খৃস্টাব্দে পারী নগরীতে **সোসিয়েতে আশিয়াটিক** এবং ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লন্ডনে **রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড** প্রতিষ্ঠিত হয়। **আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি** এবং **জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি** যথাক্রমে ১৮৪২ এবং ১৪৪৪-এ স্থাপিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্যার **উইলিয়াম জোন্স**-এর (১৭৪৬-৯৬) নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও এক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের অবদান কারও চেয়ে কম ছিল না। সভাপতিরূপে তাঁর নাম প্রথমে প্রস্তাবিত হলেও কর্মব্যস্ততার কারণে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না বুঝে তিনি এতে রাজি হননি। তাঁর অনুরোধে স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায় প্রাচ্য-বিদ্যার কোন না কোন বিষয়ে জোন্স ভাষণদান করতেন। ১৭৮৪ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট দশটি বক্তৃতা করেন। তাঁর প্রথম দুটি বছরের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে *On the Orthography of Asiatik Words* এবং *On the Gods of Italy, Greece and India*। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বাৎসরিক ভাষণে হিন্দুদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রথম জোন্স বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন পারসিক ভাষা জেন্দ এবং সংস্কৃত একই মূলোদ্ভূত। তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে ইউরোপে তুলনামূলক ব্যাকরণ শাস্ত্রের চর্চার সূচনা।

আরবী, ফারসী এবং চীনা জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গেও জোন্স আলোচনা করেন। সোসাইটির মুখপত্র ***এশিয়াটিক রিসার্চেস*** পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শুরু থেকেই পত্রিকাটি বিভিন্ন গবেষণাধর্মী রচনায় সমৃদ্ধ ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পাশচাত্য জগতের পরিচয় সাধনে জোন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি কালিদাস বিরচিত ***অভিজ্ঞান শকুন্তলম*** নাটকটি তিনি ইংরেজিতে ***Sacontala or the Fatal Ring*** নামে অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত কোন নাটক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়নি। কালিদাসের রচনাকে জোন্স সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে গেঅর্গ ফরস্টার জার্মান ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাকবি গ্যেটে তা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলেন, যদি কেউ বসন্তের ফুল ও পরিণত ফল এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের দুর্লভ সমাবেশ একত্রে দেখতে চায় তবে তাকে শকুন্তলা পাঠ করতে হবে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুশর্মা রচিত *হিতোপদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ জোন্স প্রকাশ করেন। কালিদাসের *ঋতুসংহার কাব্যটি* তাঁর সম্পাদনায় পরে প্রকাশিত হয়। এটি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যটিও জোন্স ইংরেজিতে সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন। চার্লস উইলকিন্স *মনুসংহিতার* অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থের মাত্র এক তৃতীয়াংশ অনুবাদ করতে পেরেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজ জোন্স সমাপ্ত করেন। জোন্সের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৭৯২)।

১৭৮৭ খৃস্টাব্দে জোন্স গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগশয্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং উদ্ভিদ-বিদ্যার গবেষণার জন্য প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি পত্রে তিনি জানান উদ্ভিদ-বিদ্যা-চর্চা এবং সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন তাঁকে সবচেয়ে আনন্দ দেয়। আধুনিক ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে জোন্সের নাম চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী **ডাঃ উইলিয়ম রক্সবার্গ** ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত অশোক বৃক্ষের "জোনিসিয়া অশোক" *(Jonesia Asoka)* নামকরণ করেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বৃক্ষটি এই নামেই পরিচিত। ভারতের অতীত ইতিহাস, ভূ-বৃত্তান্ত, হিন্দু সঙ্গীত এবং প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও জোন্স অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই সব বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক।

জোন্সের পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম সংস্কৃত পন্ডিত রূপে **হেনরি টমাস কোলব্রুক** (১৭৬৫-১৮৭৩) প্রসিদ্ধ। ১৭৮৩ সালে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার পদে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়েস ছিল আঠার। ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে তখনও তাঁর মনে কোনরূপ আগ্রহের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু স্যার উইলিয়ম জোন্স এবং চার্লস উইলকিন্সের দৃষ্টান্তে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্য তাঁকে উৎসাহিত করে, যেহেতু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁর পরিবার স্বচ্ছল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কোলব্রুক সংস্কৃত বিভাগের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১০ সালে দেওয়ানী আদালতের বিচারকরূপে তিনি নিযুক্ত হন। চার বছর পর তিনি এই আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। পরে তাঁকে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য এবং (১৮০৭-১২) বাংলা রাজস্ব বোর্ডের সদস্য পদে দেখা যায়।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। সোসাইটির মুখপত্র Asiatick Researches পত্রিকায় তাঁর সবশুদ্ধ ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হিমালয়ের উচ্চতা নির্ধারণ এবং গঙ্গানদীর উৎস সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জৈনধর্ম বিষয়ে আধুনিক গবেষণার তিনি পথিকৃৎ। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের লেখনী ধারনের দুই দশক পূর্বে ১৭৯৫ সালে On the Duties of A Faithful Hindu Widow নামক প্রবন্ধে কোলব্রুক দেখান হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রথার সমর্থন সূচক কোনও নির্দেশ হিন্দুশাস্ত্রে নেই। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত On the Vedas নামক তাঁর অপর এক নিবন্ধ সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান পন্ডিত উইন্টারিৎস্ বলেন—এই রচনা বেদ সম্পর্কে বর্তমান কালে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পথপ্রদর্শক। ১৮৫৯ সালে *Calcutta Review* পত্রিকায় বেদ সম্পর্কে কোলব্রুকের গবেষণাকে বলা হয়— "the most valuable contribution to Indian literature that has yet been made. He walked with a firm foot and a clear eye through the quicksands and has marked out the path most distinctly for those that followed."

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিরচিত "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" হিন্দু আইন সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। জোন্স গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোলব্রুক এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। ১৭৯৭-৯৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাজটির জন্য তিনি কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেননি। এই দায়িত্ব পালনের জন্য স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তাঁর প্রশংসা করেন। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটির নাম ***A Digest of Hindu Law on Contracts and Succession***। বইটি পূর্বে প্রকাশিত হলহেডের ***Code of Gentoo Laws***-এর তুলনায় কোলব্রুকের রচনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সংস্কৃত *হিতোপদেশ*

ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা ছাড়াও কোলব্রুক ঐ ভাষায় *অমরকোষ* নামে সংস্কৃত অভিধান সম্পাদনা করেন। তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে **ম্যাক্সমুলার** বলেন, "though it (Colebrooke's *Grammar*) was never finished, it will always keep its place like a classical torso, more admired in its unfinished stage than other works which stand by its side, finished, yet less perfect." জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়ার অবদানের জন্য পাশ্চাত্যবাসীদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বলে কোলব্রুক মনে করতেন। এশিয়ার অতীত উদ্ধারে ইউরোপীয়দের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান তিনি। হিন্দুশাস্ত্রে একেশ্বরবাদের প্রতি তিনি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন।

১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পরেও কোলব্রুকের ভারত-বিদ্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধানে ছেদ পড়েনি। হিন্দু গণিত এবং ভারত বিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ এই সময় ইংল্যান্ডের Geographical Society এবং Astronomical Society পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮১৭ সালে কোলব্রুক ভারতীয় বীজগণিত, গণিত এবং পরিমিতিবিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার্লি জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সালে কোলব্রুক তাঁর যাবতীয় পুঁথি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিকে দান করেন। দশ হাজার পাউন্ড মূল্যে তিনি এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৮২৩ সালে লন্ডনে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ার্ল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কোলব্রুক। তাঁকে সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলেও তিনি পরিচালকের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করতে রাজি হয়েছিলেন। ১৮২৩-২৮ সালের মধ্যে কোলব্রুক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পাঁচটি দীর্ঘ নিবন্ধ এখানে পাঠ করেন। এগুলি পরে সোসাইটির *Transactions*-এ প্রকাশিত হয়।

জোন্সের তুলনায় কোলব্রুকের অবদান ম্যাকসমুলারের বিচারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে জোন্সের অনুসন্ধান কতগুলি বিষয়ে মাত্র সীমিত, সেখানে কোলব্রুক ব্যাকরণ, দর্শন এবং বৈদিক সাহিত্যের মত বিভিন্ন দুরূহ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পন্ডিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মাত্র তাঁকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন বলে ম্যাকসমুলার মন্তব্য করেছেন, ("few scholars were able to go beyond Colebrooke")। তাঁর আরও বক্তব্য, জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করলে কোলব্রুকের নাম প্রতিষ্ঠানগুলির গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত। উত্তরকালে কোলব্রুকের পুত্র **স্যার টমাস এডোয়ার্ড কোলব্রুক** (১৮১৩-১৮৯০) তিনবার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পিতার ন্যায় ভারত-বিদ্যাবিশারদ না হলেও ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহ ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তিনি সর্বদাই ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করতেন। তাঁর চেষ্টায় কোলব্রুকের নিবন্ধগুলি *Miscellaneous Essays* নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় কোলব্রুককে সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** বলেন, "As a great mathematician, zealous astronomer and profound Sanskrit scholar, he wrote nothing that did not at once command the high attention of the public and not with standing the great advance that has been made in Oriental researches of late years, his papers are still looked upon as models of their kind."

প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এবং তার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার কাজে **চার্লস উইল্‌কিন্স** (১৭৪৯-১৮৩৬) ভারত-তত্ত্ববিদদের মধ্যে অগ্রগণ্য মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পঞ্চম পালরাজ বিগ্রহপাল দেবের একটি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করে তিনি তার অনুবাদ *এশিয়াটিক রিসার্চেস্* পত্রিকার ১ম খণ্ডে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করেন।

ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ সংস্থা রয়াল সোসাইটি তাঁকে সদস্য পদে বরণ করে। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপিরও পাঠোদ্ধার করেন। বাংলা এবং ফারসী ভাষায় তিনি টাইপ নির্মাণ করেন। কোম্পানির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে উইল্‌কিন্স তার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উইল্‌কিন্স ভারত ত্যাগ করেন।

কোলব্রুক দেশে ফিরে দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন এবং নিজ গৃহে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই সময়ে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থটি ছাত্রোপযোগী বিবেচিত হয়েছিল। সংস্কৃত *হিতোপদেশ* এবং *মহাভারত* অবলম্বনে শকুন্তলার কাহিনি উইলকিন্স ইংরেজিতে শোনান। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার লন্ডন শহরে আনা হয়। অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত আরও কিছু পাণ্ডুলিপি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। উইলকিন্স এর গ্রন্থগারিক নিযুক্ত হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির শিক্ষানবিশদের জন্য **হেল্‌বেরি কলেজ** প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে প্রতিষ্ঠানটির পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। পরীক্ষায় ছাত্রদের মূল্যায়নের দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে উইল্‌কিন্স সংস্কৃত ভাষায় ধাতু সম্বন্ধে একটি ব্যাকরণ *(ধাতু মঞ্জরী)* রচনা করেন। লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। দেশে বিদেশে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে **ডক্টর অফ সিভিল ল** উপাধি প্রদান করে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁকে **নাইট** উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে উইলকিন্স লন্ডনে পরলোক গমন করেন।

পাশ্চাত্য ভারতবিদ্যা বিশারদদের মধ্যে **হোরেস হেম্যান উইলসন** (১৭৮৬-১৮৬০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানির চিকিৎসক হয়ে তিনি প্রথম ভারতে আসেন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। উত্তরকালে তিনি কলকাতায় মিন্টের 'ডেপুটি এসে-মাস্টার' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় **জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন** এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে (১৮২৩), তিনি তাঁর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। হিন্দু কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য বোডেন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হলে তিনি প্রথম তা অলঙ্কৃত করেন। চার বছর পর তিনি ইন্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে উইলসন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুকের মৃত্যুর পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির ডিরেকটর নির্বাচিত হন।

সংস্কৃত কাব্যনাটকের রীতিসম্মত আলোচনার জন্য উইলসন স্মরণীয়। পুরাণের অনুবাদ ও বিশ্লেষণে তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। কলহন - কৃত *রাজতরঙ্গিনী* গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ সংগ্রহ এবং ভারতীয় ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রা চর্চায় উইলসনের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কাজ সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে নিত খণ্ডে *ঋগ্বেদ সংহিতার* ইংরেজি অনুবাদ। উইলসনের সংস্কৃতবিদ্যায় কোলব্রুকের গভীরতা ও বিচারশীলতা না থাকলেও ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁকে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রানুবাদের কাজে রামমোহন এই অভিধানখানি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে উইলসন তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকায় শংকরাচার্যের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে রামমোহনের কাছে ঋণ স্বীকার করেন।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় হেস্টিংসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন **জোনাথন ডানকান।** ১৭৭২ সালে তিনি কোম্পানির রাইটার পদে যোগদান করেন। কর্ণওয়ালিসের আমলে তিনি ফারসী ভাষার অনুবাদক এবং রাজস্ব

বিভাগের সচিব পদে নিযুক্ত হন। বারাণসীর রেসিডেন্ট থাকাকালীন সেখানকার এক রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে শিশু কন্যা হত্যার অমানবিক প্রথা তিনি গোষ্ঠী প্রধানদের বুঝিয়ে রোধ করতে সক্ষম হন। তাঁর উদ্যোগে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ***Asiatick Researches*** পত্রিকায় তাঁর কতগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৭৯৩ সালে বারাণসীর উপকণ্ঠে প্রাপ্ত দুটি মৃৎপাত্র সম্পর্কে তাঁর রচনা। এই রচনাটি প্রকাশের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে সারনাথকে সনাক্ত করা সহজ হয়।

প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ** স্থাপিত হয়। এর আগে ঐ বছর ১০ই জুলাই ১৮ আগস্ট তারিখে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে লেখা দুটি প্রতিবেদনে প্রতিধ্বনিটির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। ভারতে আগত কোম্পানির প্রতিটি সিভিলিয়ানের এখানে তিন বছর শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যিক ছিল। এখানকার দীর্ঘ পাঠ্যসূচীর তালিকায় ছিল আরবী, ফারসী, কন্নড়, সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, প্রভৃতি ভাষা, হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি (civil jurisprudence), বিভিন্ন দেশের আইন, অর্থনীতি (বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ), ভূগোল ও গণিতশাস্ত্র, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ, গ্রীক, লাতিন এবং ইংরেজি ক্লাসিকাল সাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা। ওয়েলেসলি আশা করেছিলেন এই শিক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির সিভিলিয়ানরা ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় জীবনচর্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠবে, শাসননীতিতে যার প্রতিফলন ঘটবে। প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রথম যুগে কলেজে অধ্যাপকদের তালিকায় বিশেষভাবে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন **হেনরি টমাস কোলব্রুক** (সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র), **জে. বি. গিলক্রাইস্ট্** (হিন্দুস্তানী), **এন্. বি. এডমনস্টোন, ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্উইন** (ফারসী ভাষা ও সাহিত্য), জন বেইলি (আরবী, ফারসী ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র), প্রভৃতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ এবং অন্যদিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী-মার্শম্যান প্রমুখের মিলিত কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের **হলেবেরিতে** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদের শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। পরে বেন্টিঙ্কের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপন্থীদের জয়লাভের পর কলেজ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউনসিলের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য একটি সংস্থা গঠিত হয়। এখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছিল রামায়ণের অনুবাদ, কোলব্রুক সম্পাদিত *অমরকোষ, হিতোপদেশ, দণ্ডীর দশ কুমারচরিত* এবং ভর্তৃহরির *শতকত্রয়* ইত্যাদি সংস্কৃত আরবী, ফার্সী, বাংলা, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি ভাষাসমূহে এবং এমন কি চীনাভাষাতেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পক্ষ থেকে অতি ব্যাপক ও অনেকাংশে সফল প্রকাশন-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। উইলিয়ম কেরির তত্ত্বাবধানে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যরীতির বিশেষ উন্নতি হয়।

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), **যশুয়া মার্শম্যান** (১৭৬৬-১৮৩৭) এবং **উইলিয়াম ওয়ার্ড** (১৭৬৯-১৮২৩) -এর নেতৃত্বে **শ্রীরামপুর মিশন** স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। কেরী এবং মার্শম্যান ছিলেন বহু ভাষাবিদ। ভারতে খিস্টধর্ম প্রচার তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও শ্রীরামপুর মিশনারিরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সেই সব ভাষার গদ্যসাহিত্যে তাঁরা

প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কেরীর রচনা তালিকার দিকে তাকালে দেখি তিনি ব্যাকরণ লিখেছিলেন বাংলা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, কন্নড় এবং (মার্শম্যানের সহযোগিতায়) ভুটানী ভাষায়। বাংলা এবং মারাঠী ভাষায় তিনি অভিধান প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তিনি সংস্কৃত ভাষার একটি অভিধান এবং তেরটি ভারতীয় ভাষার একটি শব্দকোষ প্রস্তুত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেগুলি আগুনে পুড়ে যায়। মার্শম্যানের সহযোগিতায় মূল বাল্মীকি রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডর ইংরেজি অনুবাদ কেরি এবং মার্শম্যানের অপর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। *অমরকোষ* ও *হিতোপদেশ* সম্পাদনায় কেরী কোলব্রুককে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত সংস্কৃত, বাংলা এবং মারাঠী ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেরী এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান এবং কৃষিবিদ্যায় কেরির যথেষ্ট কৌতূহল ও অধিকার ছিল। এদেশে এইসব বিষয়ের চর্চায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া চলে। কেরী এবং মার্শম্যানের সহযোগী **উইলিয়াম ওয়ার্ড** ছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় শ্রীরামপুরে প্রাচ্যভাষাসমূহের হরফ ঢালাইখানা ও ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। এশিয়া মহাদেশে তাঁর তুলনা ছিল না। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানে ২,১২০০০ বই ছাপা হয়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রূপে উত্তরকাল তাঁকে মনে রেখেছে *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos* (চারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১১) এবং *A View of History, Literature and Mythology of the Hindoos* (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১৮) নামক গ্রন্থের জন্য।

উপনিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কেবলমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের মনে ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এমন ভাবা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে তাদের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার যোগ অনস্বীকার্য। ভারততত্ত্ব **(ইন্ডোলজি)** সন্ধানে ইংরেজ মনীষীরা যেমন অগ্রসর হয়েছিলেন, সেরকম নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর ঐ দেশের পুরাবৃত্ত চর্চার প্রথম পর্যায়ে ফরাসী পণ্ডিতের উদ্যোগ রীতিমত চোখে পড়ে। ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ এবং ফরাসী গবেষকদের যথাক্রমে একই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরণের গবেষণা কার্যের বিকাশ ঘটেছিল ঠিকই। কিন্তু কেবলমাত্র জাগতিক পুরস্কারের আশায় পণ্ডিতসমাজ আকৃষ্ট হয়েছিলেন বললে তাঁদের প্রতিভার অবমাননা করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বহু পরিচয় তাঁদের রচনা ও কর্মে ছড়িয়ে রয়েছে। রোমান্টিক ভাবান্দোলনের প্রভাবে একদিকে যেমন তাঁরা অতীতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, সেরকম অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্ভূত অন্যান্য যেসব সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আঠার শতকে ভলতেয়ার প্রমুখের লেখায় বিশ্ববীক্ষার সূচনা হয় তার প্রতিফলনও তাঁদের লেখায় দেখি। ভারতবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ তাঁরা। বেন্টিঙ্কের আমলে কোম্পানির শিক্ষানীতি প্রণয়নে শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীদের কাছে তাঁদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

৯.৩ মিলের ইতিহাস এবং প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র

শিল্প বিপ্লবের পর্যায়ে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে উপযোগিতাবাদী রাষ্ট্রদর্শনে (Utilitarianism)। এই তত্ত্বের প্রথম বিস্তৃত আলোচনা মেলে ইংরেজ দার্শনিক **জেরেমি বেন্থাম** (১৭৪৮-১৮৩২) রচিত *A Fragment on Government* গ্রন্থে (১৭৭০)। আঠার শতকের অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের

স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭২-১৭৭৬) এবং ফরাসী বিপ্লব যে তোপ দাগে তাতে উদারনৈতিক মতবাদের জয় হয়। বেন্থামের দর্শন এই নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মূল কথা হল সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখবিধান। উপযোগিতার মাপকাঠিতে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উপযোগিতার সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি বলেন— "It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right or wrong." রাষ্ট্রগঠনের পিছনে কোনোরূপ চুক্তি আছে বলে বেন্থাম মনে করেন না। মানুষের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং সে প্রয়োজন নিবৃত্তিতে রাষ্ট্রের সার্থকতা বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যা-কিছু অন্তরায় তার সংস্কার করা উচিত। বিচার পদ্ধতি সরলীকরণ এবং বিচারালয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধির ওপর তিনি জোর দেন। সরকার স্বৈরাচারী না গণতান্ত্রিক তার একমাত্র বিচার হতে পারে তা কিভাবে অধিকার ও কর্তব্য পালন করে তার দ্বারা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে সকলের সমান ভোটাধিকার এবং একটি শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী প্রয়োজন। শক্তিশালী নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তিনি পথ চলতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে কোনোরূপ শিক্ষাগ্রহণ করা যায় বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর চিন্তাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাষ্টচিন্তার ইতিহাসের এক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন—"The critical faculty was most conspicuous in his intellectual equipment, while respect for the antique and the historical *per se* was entirely lacking." (Dunning, *A History of Political Theories.*Vol III. 212)

বেন্থামকে ঘিরে বুদ্ধিজীবীদের যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক **জেমস মিল** (১৭৭৩-১৮৩৬)। ভারতের ইতিহাস রচনায় তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। ১৮০৬ সাল থেকে তিনি নিজেকে একাজের জন্য প্রস্তুত করেন। সমগ্র গ্রন্থটি রচনা করতে তাঁর বারো বছর সময় লেগেছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা *History of British India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল কখনও ভারতে আসেননি। কিন্তু সে-কারণে তাঁর রচনা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর যুক্তি ছিল এরূপ। প্রথমত, ভারতের মতো বিশাল দেশের সবটা তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। দ্বিতীয়, ভারত বিষয়ে সমসাময়িকদের ধারণা ও সংস্কার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতেন। মিল চেয়েছিলেন ভারত সম্পর্কে প্রকাশিত সমস্ত তথ্যের যথাযথ বিচার করে গ্রন্থ রচনা করতে। ইংল্যান্ডে বসেই সে কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ভারতের ইতিহাস প্রথম রচনা করেন **রবার্ট ওর্ম।** ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা। *A History of the Military ransactions of the British Nation in Indostan from the year 1745* প্রকাশিত হয়। ১৭৬৯ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৮২ সালে *Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Marattoes, and of the English Concern in Indostan from 1659* নামে তাঁর অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। ওর্ম তাঁর ইতিহাস রচনার জন্য বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর এই সংগ্রহ এখনও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের সম্পদ। **উইলিয়াম রবার্টসন** এই পর্যায়ের অন্য এক ঐতিহাসিক। ১৭৯২ সালে তাঁর লেখা *Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India* প্রকাশিত হয়। ওর্ম এবং রবার্টসন প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মিল সেরকম কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। ভারত ইতিহাসের সমগ্র পরিসর ছিল তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে এবং আরও পরে ১৮২৬ এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে উইলসন এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে মিলের ইতিহাস একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হয়। ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে

প্রভাবিত করার বিশেষ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ১৮১৯ সালে মিল লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যোগ দেন। কোম্পানির যে-সব কাগজপত্র ভারতে পাঠানো হত সেগুলির প্রধান পরীক্ষকের সহকারী রূপে তিনি নিযুক্ত হন। (Assistant to the Examiner of India Correspondence) ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত তিনি ঐ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সমসাময়িকদের চোখে তাঁর গ্রন্থ কিরূপ মর্যাদা পেয়েছিল তার একটি উদাহরণ ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সময় পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বিতর্ক চলাকালে **মেকলে**-র উক্তি— রোম সাম্রাজ্যের পতনের ওপর গিবন-এর গ্রন্থ প্রকাশের পর ইংরিজি ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে মিলের রচনা মহত্তম ("The greatest historical work which has appeared in our language since that of Gibbon." Quoted in R. C. Majumdar, *Historiography in Modern India.* 8-9)।

মিল ছিলেন বেন্থামের শিষ্য। উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। আগেই বলা হয়েছে এর জন্য তিনি ভারতে আসার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। যেসব আকরিক সূত্রের ওপর তিনি নির্ভর করেছিলেন সেগুলিকে বিশ্বস্ত বলা চলে না। ওর্মের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। **ক্লডিয়াস বুকানন** নামে একজন ভারত-বিদ্বেষী খ্রিস্টধর্ম প্রচারকের সাক্ষ্য তিনি উদ্ধার করেছেন। **টেনান্ট** এবং **টাইটলার** নামে দুজন ইংরেজ পর্যবেক্ষকের ভারত সম্পর্কে অগভীর কিছু মন্তব্যের সাহায্য তিনি নিয়েছেন। তথ্য নির্বাচনে তাঁর পক্ষপাতিত্বের প্রতি অধ্যাপক **সি. এইচ. ফিলিপিস** দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আঠার শতকের শেষদিকে ভারতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার করতে আসেন ফরাসী পাদ্রি আবে দু বোয়া। ১৮১৬ সালে তাঁর লেখা *A Description of the Character, Manners and Customs of the people of India* নামক গ্রন্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে যা কিছু ভারত-বিরোধী তার উল্লেখ মিলের লেখায় পাওয়া গেলেও ভারতীয়দের সমর্থনে যেসব কথা আবে দু বোয়া বলেছেন মিল সেগুলি উদ্ধার করেননি। দৃষ্টি দেননি।

প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও সভ্যতার বিকাশ ঘটে ছিল বলে মিল মনে করতেন না। এইখানেই ওরিয়েন্টালিস্টদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় জোন্সের নিষ্ঠা এবং সত্যসন্ধিৎসার প্রশংসা করা সত্ত্বেও আক্ষেপের সুরে তিনি বলতে ভোলেন না এশিয়ার প্রধান দেশগুলিতে উন্নত ধরণের সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জোন্স পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত হয়েছিলেন ("It was unfortunate that a mind so pure, so warm in the pursuit of truth, and so devoted to Oriental learning, as that of Sir William Jones, should have adopted the hypothesis of a high state of civilization in the principal countries of Asia.")। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা বিষয়ে জোন্সের উৎসাহের মূলে দুটি কারণ মিল উল্লেখ করেছেন। প্রথম যা-কিছু আমাদের পছন্দের তা কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। দুই, ভারতীয়দের প্রতি আচরণে প্রশাসন যাতে আরও সচেতন হয়। সেই উদ্দেশ্যেও জোন্স ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয়দের ভূমিকা বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন। ("Beside the illusions with which the fancy magnifies the importance of a favourite pursuit, Sir William was actuated by the virtuous design of exalting the Hindus in the eyes of their European masters; and thence ameliorating the temper of the government.")। অধিকাংশের মতো সভ্যতা বিষয়ে জোন্সের কোনো সুসম্বদ্ধ ধারণা ছিল না বলে মিল মন্তব্য করেন ("the term civilization was by Jones, as by most men... attached to no fixed and definite assemblage of ideas.")। প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা এত উন্নত হলে ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে কি করে তা এমন কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতায় ঢেকে গেল, মিল

তার কুলকিনারা করতে পারেনি। অশিক্ষা, আলস্য, লোভ এবং দুর্নীতিতে ভারতীয় সমাজ ছেয়ে গেছে বলে মিল মনে করতেন। হিন্দুরা বুদ্ধি এবং উন্নত কল্পনাশক্তির অধিকারী হলেও বাস্তবোপোযোগী কোনো কিছু উদ্ভাবনের ও সাংসারিক তুচ্ছতার প্রতি অধিক মনোযোগী বলে মিল মন্তব্য করেছেন ("The attention of the Hindu is more engaged by frivolous observance, than by objects of utility.")। শকুন্তলা কাব্যে জোন্স মোহিত হলেও রচনাটি মিলের হৃদয় স্পর্শ করেনি। প্রাচীন ভারতের শিল্পকর্মে তিনি প্রয়োগ নৈপুণ্যের অভাব বোধ করতেন।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে মিলের মূল্যায়ন ছিল জোন্সের বিপরীত। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের বক্তব্য তথ্য প্রসূত নয় বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচীন হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, শিল্প ও বিজ্ঞান, তাদের আইন-কানুন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব মিলিয়ে আমরা একটি সিদ্ধান্ত করতে পারি তারা ছিল অমার্জিত ("As the manners, the arts and sciences of the ancient Hindus are entirely correspondent with the state of their laws and institutions, everything we know about the ancient state of Hindustan empire conspires to prove that it was rude.")। প্রয়োগে দীর্ঘসূত্র না হলেও হিন্দু আইন দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার বিচারে পৃথকীকরণ করেনি। তা সর্বত্র স্পষ্ট এবং সুসংহত নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিচার ও আইন সংস্কার উপযোগিতাবাদীদের চোখে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। এটি ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন (Common law) তাদের মতে ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ব্রিটেনের আইন সংস্কারে উপযোগিতাবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মকে তারা যুক্তির আলোকে বিচার করতেন। প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তায় ঈশ্বর বিষয়ে উন্নত ধারণার পরিচয় মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণভাবে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে মানুষ বিভিন্নরূপে প্রকৃতি পূজা করত। এই ছিল ধারণা মিলের। সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য এবং পুরোহিততন্ত্রের তিনি সমালোচনা করেছেন। ভারতীয়দের বিনীতভাব তাঁর মতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে থাকার ফল। প্রাচীনকালে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে কেবল মানুষ পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। মধ্যযুগের ইউরোপ গত শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যবাসীর চোখে ছিল "অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ" (Dark Ages)। মিল সেই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু যুগের তুলনায় এমনকি পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিকেও তিনি অনেক উন্নত বলতে দ্বিধা করেননি ("people of Europe even during the feudal ages, were greatly superior to the Hindus.")। ভারতীয়দের নৈতিকতার মান মিলের মতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তিনি বলেছেন—তারা ক্রীতদাস-সুলভ ("In truth, the Hindu, like the Eunuch, excels in the qualities of a slave... In the still more important qualities which constitute what we call the moral character, the Hindus ranks very low.") মিলের ভারত ইতিহাস প্রকাশ পায় এমন এক সময়ে যখন ভারতে ব্রিটিশ শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছিল। আঠার শতকের মধ্যভাগ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেও ১৮১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে। অধ্যাপক পার্সিভাল স্পীয়ার এই পরিবর্তন বোঝাতে বলেছেন— "The British empire *in* India became the British empire *of* India." ভারতের বিশাল ভৌগলিক ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র লক্ষ্য করে কোম্পানির প্রতিনিধিরা— মনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ— এদেশের গভীরে অজানা বিপদের ভয়ে সতর্ক ছিলেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সমাজে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর কোম্পানির কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন দেখা দিল। ঐতিহাসিক **এরিক স্টোকস** আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের সূচনায় এদেশে অবস্থিত কোম্পানির প্রতিনিধিদের "রোমান্টিক" এবং তাদের উত্তরসূরীদের "উপযোগিতাবাদী" আখ্যায়িত করেছেন। (দ্রষ্টব্য, Eric Stokes, *The English*

Utilitariaus and India)। উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মিল কোম্পানির ভারত বিস্তারের প্রথম পর্যায়ের প্রশাসকদের নীতির সমালোচনা করতে ছাড়েননি। উদাহরণ স্বরূপ, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মীর কাসিমের শুল্ক বিলোপের সিদ্ধান্তে ইংরেজদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় তাঁর মন্তব্য— স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচার রহিত ও নির্লজ্জ হতে পারে, এই ঘটনা তার চরম দৃষ্টান্ত। মিল ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচক। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূস্বামীদের দৃষ্টান্ত দেখে যারা এই বন্দোবস্তের পক্ষে মত দেন, তারা আশাহত হবেন বলে তিনি সতর্ক করেছিলেন। কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থা ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান না করেই করা হয়েছিল। মিল বুঝেছিলেন, এর ফলে কৃষকরা আরও শোষিত হবে। ১৮৩১ সালে পার্লামেন্টের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে (১১ এবং ১৮ আগস্ট) তিনি বলেন— সরকার যদি সম্পূর্ণ খাজনা গ্রহণ করে, তবে কৃষি-কাজে উৎসাহ কমবে না। এর মূলে ছিল খাজনা (rent) সম্পর্কে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ **রিকার্ডো**-র বক্তব্য ঃ খাজনা হল উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজি বা শ্রম ছাড়া যা অর্জিত নয়।

উপযোগিতাবাদীরা নিজেদের মন-গড়া ছাঁচে এদেশ শাসন করতে গিয়ে প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেন। রিকার্ডো-র তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে ভারতীয় সমাজের প্রভাবশালী অংশের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। সমাজে অভিজাত বর্গ এতকাল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিল। তাদের হঠাৎ ক্ষমতাচ্যুত করায় সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ জাগে। অযোধ্যায় বিদ্রোহের পিছনে তালুকদারদের নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ব্রিটেনে রক্ষণশীলরা এই ঘটনার জন্য একদিকে মিশনারিদের এবং অন্যদিকে সংস্কারকদের অনেকটা দায়ী করে। হিন্দু কলেজের ছাত্র **কাশীপ্রসাদ ঘোষ** (১৮০৯-১৮৭৩) কলেজ অধ্যক্ষ উইলসনের অনুরোধে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী Government Gazette-এ মিলের ভারত ইতিহাসের প্রথম চার অধ্যায়ের সমালোচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম ছিল (Criticism of Mill's British India)। কাশীপ্রসাদ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ভারতে রাজশক্তি প্রাচীনকালে স্বৈরাচারী ছিল না। হিন্দুদের যুগ গণনা পদ্ধতি, প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা এবং বর্ণাশ্রম প্রথার তিনি প্রশংসা করেন। উইলসন ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ও ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্যতম। মিলের গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব যখন পরবর্তী সময়ে তাঁর ওপর পড়ে, তখন পাদটীকায় মিলের বক্তব্যের তিনি প্রচুর সংশোধন করেন।

৯.৪ অনুশীলনী

ক) উনিশ শতকে ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রকাশ কিভাবে হয়েছিল তাঁর বর্ণনা দিন।

খ) প্রাচ্যবিদ্যা কিভাবে ভারতে নবজাগরণে সাহায্য করেছিল তার বর্ণনা দিন।

গ) সমবাদী দার্শনিক মিলের প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

Ranajit Guha, *Historiography of India.* A Nineteenth Century Agenda and its implications.

David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance.*

R. C. Majumdar, *Historiography in modern India.*

C. H. Philips, ed. *Historians of India. Pakistan and Ceylon.*

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা।*

একক ১০ ❑ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া

গঠন

১০.০ প্রস্তাবনা

১০.১ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া (ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম)

১০.২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১০.৩ বঙ্কিমচন্দ্র

১০.৪ স্বামী বিবেকানন্দ

১০.৫ অনুশীলনী

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ প্রস্তাবনা

এদেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের অবদান নতুন করে উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর *পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে* বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের পূর্বেই দেশমাতৃকাকে দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মারাঠা ইতিহাসের নায়ক শিবাজীর গুণকীর্তন করেছেন ভূদেব এমন এক সময়ে ইংরেজ লেখকদের রচনায় তাকে দস্যু দলপতি হিসাবে চিত্রিত করা হত। চিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ থেকে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা বলে অরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বিবেকানন্দ আমাদের পথ প্রদর্শক।

১০.১ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া (ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম)

পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের প্রশ্ন না করে পারেননি— কিসে এর শক্তি, কোথায় বা দুর্বলতা, ভারত কেন পরাধীন, জাতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য কি? ইতিহাসের পাতায় এর উত্তর খুঁজতে হয় কেবল জ্ঞান পিপাসা মেটাতে নয়,— আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। নিছক তথ্যমাত্র নয়, তথ্যকে অতিক্রম করে যায় যে কল্পনা তার আশ্রয় নিতে হয়। ঘটনার নিহিত তাৎপর্য এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অন্বেষণে ইতিহাস দেখা দেয় এক নতুন রূপে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার ঐক্যসূত্র ধরা পড়ে। খন্ডকাল অতিক্রম করে দৃষ্টি খোঁজে মানবজীবনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। ইতিহাসের এই নবরূপ সৃষ্টিতে উনিশ শতকের বাংলায় যেসব মনীষী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন **ভূদেব মুখোপাধ্যায়** (১৯৩৬-১৮৯৪), **স্বামী বিবেকানন্দ** (১৮৬৩-১৯০২) এবং **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৬-১৮৯৪) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

১০.২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলকাতার বিখ্যাত হরিতকীবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। পারিবারিক প্রভাব ভূদেবের ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল। পরিণত বয়সে *পুষ্পাঞ্জলি* গ্রন্থের ভূমিকায় পিতৃঋণ স্মরণ করে তাঁর নিবেদন ঃ-

"তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষলাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিচল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তরবাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু অতএব কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি পরম্পরা সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার— তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।"

শেষ জীবনে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ভূদেব স্বগ্রামে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠি এবং মায়ের নামে ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্বে এই দুই সংস্থার আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক তাদের নামে বরাদ্দ করেন।

পিতা চেয়েছিলেন কুলপ্রথানুযায়ী পুত্র সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠুক। কিন্তু ভূদেবের আগ্রহে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। ছাত্রসমাজে মিশনারীদের প্রভাব রোধ করতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখের উদ্যোগে **হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়** স্থাপিত হল (১৮৪৬) ভূদেব তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমশ স্কুল ইনস্পেকটর পদে উন্নীত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এতদিন ঐ পদ ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। চাকরি জীবনে ১৮৬৪ সাল থেকে তিনি ***শিক্ষাদর্শন ও সংবাদপত্রসার*** নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি চার বছরের অধিক কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার পরিচালিত এডুকেশন গেজেট পত্রিকার তিনি সম্পাদক হন। অধ্যাপক **প্রমথনাথ বিশি** বলেছেন- 'বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন **বঙ্গদর্শন**, দেবেন্দ্রনাথের যেমন তত্ত্ববোধিনী, অক্ষয় সরকারের যেমন সাধারণী, **এডুকেশন গেজেটও** তেমনি ভূদেবের বাণীবাহী দূত।' (ভূমিকা, *ভূদেব রচনা সম্ভার)*। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে ভূদেব দেহরক্ষা করেন।

ভূদেবের রচনাগুলিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় (১) *পুরাবৃত্ত সার* ঃ মানবসভ্যতার প্রাচীন যুগ এখানে আলোচিত হয়েছে। (২) *ইংল্যান্ডের ইতিহাস* (১৮৬২) ঃ আত্মসম্মান এবং স্বাজাত্যভিমানের (National Pride) কারণে ভূদেব মনে করেন অন্যান্য জাতির তুলনায় ইংরেজ এগিয়ে আছে মহারানী ভিক্টোরিয়া রাজত্বকাল পর্যন্ত ব্রিটেনের রাজা এবং রানীদের ইতিহাস এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। (৩) *রোমের ইতিহাস* (১৮৬৩)। (৪) *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯০৪) ঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালের অবসান (১৮৩৫) থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যের প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের আইন সদস্য বেথুন - কর্তৃক এদেশে ব্রিটিশ - বংশোদ্ভূতদের সাধারণ আদালতের অধীনে আনা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা এবং নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ভূদেবের স্বাধীন

সমাজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা এবং নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ভূদেবের স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবন্ধ সাহিত্য। *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২), *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), এবং *আচার প্রবন্ধ* (১৮৯৫) গ্রন্থত্রয়ের মধ্য দিয়ে ভূদেব হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে যুক্তি বিস্তার করেছেন। সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন - "এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে সব বিষয়েই তথ্যজ্ঞান, অস্ফুট কর্তব্যসূত্র অনির্দিষ্ট এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।" গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য জাতীয়ভাব বৃদ্ধি এবং জাতি ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ণয়। জাতিভেদ প্রথার ওপর হিন্দু সমাজ নির্ভরশীল বলে ভূদেব মনে করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম এই সত্যের বিরোধিতা করে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভূদেবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই কারণে তিনি বলেছেন—"ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ; ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি - শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।" ব্রাহ্মণরা আচারনিষ্ঠ এবং সেই কারণেই সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে ভূদেব মনে করতেন। ইংরেজ শাসন তাঁর মতে মোটের ওপর দেশের পক্ষে কল্যাণকর— "ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহারা সুশাসন করিতেছেন, ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন। অতএব ইংল্যান্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন।" *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে ভূদেবের ঘোষণাঃ "আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করতে চাই না।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি ভূদেব সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। পরিসংখ্যান দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন "ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জমিয়াছে এখানে তাহার নামগন্ধ নাই।" জাতীয় ভাবের উন্নতি প্রার্থনা করলেও স্বজাতিপ্রেম ভূদেবের মতে সর্বোচ্চ আদর্শ নয়। *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থের শেষে ভূদেবের বক্তব্য ঃ "সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্যধর্মের সর্ব্বোচ্চ আসন। আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙমানসগোচরে নিমজ্জিত করিতে চাহেন।" সমকালীন হিন্দু সমাজকে তিনি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন। জাতীয়ভাবের সঙ্গে ভূদেব এইভাবে সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদকে মিলিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে নব্য হিন্দু আন্দোলনের পিছনে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, ভূদেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থের প্রশংসা করে রাজনারায়ণ বসু বলেন— 'ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেবভক্তি এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।"

তৃতীয়তঃ, উপন্যাস। ১৮৫৭ (?) সালে প্রকাশিত হয় ভূদেবের *ঐতিহাসিক উপন্যাস* গ্রন্থ। এর দুটি কাহিনী লেখক নিজেই জানিয়েছেন কন্টার (Conter) রচিত ইংরেজি আখ্যায়িকা *রোমান্স অফ হিস্ট্রি* থেকে গৃহীত। ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থের প্রথমে রয়েছে "সফল স্বপ্ন" নামে উপাখ্যান। এর নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র সবক্তগীন (শাসনকাল ৯৭৭-৯৯৭)। লেখক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থভুক্ত অপর রচনাটি হল "অঙ্গুরীয় বিনিময়।" শিবাজী এবং ঔরঙ্গজেব কন্যা রোশনারার প্রেম বিনিময়কে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। মারাঠা শক্তির উত্থানের পিছনে ধর্মভাবকে অন্যতম কারণ হিসাবে লেখক, চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন— "সকল জাতিরই অভ্যুদয়কালে তত্তৎ জাতীয় জনগণের ধর্মবৃদ্ধি প্রবল হয়। এমনকি সেই জাতীয় অতি - নিকৃষ্ট তামস প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিত তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল।" মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হবার বহু আগেই "অঙ্গুরীয় বিনিময়"

কাহিনিতে মারাঠী বীরকে বলতে শুনি— "আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পার্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্তবিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগমান নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদয় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারত রাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতে করাকর্ষণ করিবে।" ভিন্ন রাজ্যে মারাঠারা যে লুণ্ঠনকারী ছিল ভূদেব তা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, "যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্রখন্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল।" শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূদেব বলেছেন— "মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃত ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়গনের অন্তঃকরণে হিতৈষিতা উদ্রিক্তা করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এইজন্য তাহার চরিত্র লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) গ্রন্থের বিবরণে লেখক বলেছেন, "কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কন্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য কথন।" জার্মান মনীষী গ্যেটে-র (Goethe) একটি উক্তি তিনি শুরুতে উদ্ধার করেছেন। "Ordinary history is traditional, higher history mythical, and highest history mystical." ইতিহাস বিষয়ে ভূদেবের মনোভাব এর থেকে বোঝা যায়। এই গ্রন্থে যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ শেষে মার্কন্ডেয় মুনি ব্যাসদেবকে বলেন, "এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেপীমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইলে।" **অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী** এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— "ভারতভূমিকে দেবী-রূপে কল্পনা বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। পুষ্পাঞ্জলি'র প্রকাশ ১৮৭৬ সালে, 'আনন্দমঠ' রচনার অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় এ ক্ষেত্রে 'পুষ্পাঞ্জলি' কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন।" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র *পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থ* সম্পর্কে এই ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন- "হিন্দুবিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মুর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির গ্রন্থাকারের সভক্তিক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হীন নহে।"

নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন- "পৃথিবীতে যত পয়গম্বর বা নরদেব এ পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়।" (ধর্মচর্যা, পারিবারিক প্রবন্ধ) *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৭৬) একটি কল্পকাহিনি। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠারা জয়ী হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি ঘটতে পারত কল্পনা করে ভূদেব এখানে রোমাঞ্চিত। কনৌজ এবং বারাণসী হত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কনৌজে এক দিকে গ্রীক লাতিন এবং অন্যদিকে আরবী - ফারসী ভাষার চর্চা হত। আর্ন্তজাতিক ইতিহাসের গবেষণা হত, ভারতের পুনরুত্থান বিষয়ে পন্ডিতেরা মহাকাব্য রচনা করতেন। বারাণসীতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হত। ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেত। ভূদেবের কল্পনা কেবল হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করেনি। *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* গ্রন্থে রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা-দৃশ্যে এক মারাঠা সর্দার নিবেদন করেন—"ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর পর নহেন, ইনি উহাদিগকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরা ইহার পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও

অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব - সম্বন্ধ হয় না? আবশ্যই হয় - সকলের শাস্ত্রমতে হয়।'' রক্ষণশীলতা এবং আধুনিকতার টানাপোড়েনে ভূদেব চরিত্র জটিলতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমকালীন কংগ্রেস নেতাদের মতো মডারেট। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু আচারানুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কিসে হিন্দু সমাজের উন্নতি হয় তা ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলন ছাড়া ভারতের ঐক্য রক্ষা যে সম্ভব নয় তা বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি।

১০.৩ বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বিষয়ে নটি প্রবন্ধ লেখেন ঃ- ১। ভারত কলঙ্ক (বৈশাখ, ১২৭৯) ২। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (ভাদ্র, ১২৮০) ৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (ভাদ্র, ১২৮০, অগ্রহায়ণ, ১২৮২) ৪। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (আশ্বিন, ১২৮০) ৫। বাঙ্গালির বাহুবল (শ্রাবণ, ১২৮১) ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (মাঘ ১২৮১) ৭। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) ৮। বাঙ্গালীর উৎপত্তি (পৌষ, ১২৮৭- জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) ৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)। এই তালিকার সঙ্গে যোগ করা যায় *প্রচার* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (শ্রাবণ, ১২৯১)। *বিবিধ প্রবন্ধ* গ্রন্থে পরে প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ

"এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে যে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।- যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারীর ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশি। দর বেশি হউক বা কম হউক পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? *বাঙ্গালিতে* বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,— সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কই, আমিত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি— এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা ত শুনিলাম না।" (ভূমিকা, *বিবিধ প্রবন্ধ,* দ্বিতীয় ভাগ)

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সন্ধান করেছেন। যেমন "পাল ও সেন রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?... কে বিচার করিত,... রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য এসকল কিরূপ ছিল?... কোন ধর্ম কতদুর প্রচলিত ছিল? ...তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ? ... বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? ... ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?" বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে এই সব প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে **অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের** মন্তব্য ঃ "তাঁহার মন দেশকালধৃত

ইতিহাসের এই সমগ্ররূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়া মনে হইতেছে।" (*বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* প্রথম অধ্যায়)। সেকালে এরাজ্যের প্রচলিত ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন বাদশাহ - সুবাদারের "জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র"। মিল, স্টুয়ার্ট মার্শম্যান, লেখব্রীজ এবং তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকদের পদ্ধতি, অনুসন্ধান ও পরিণাম বিচার তাঁর কাছে অনেক সময় অজ্ঞতা পরজাতিবিদ্বেষ ও বিজিতের প্রতি বিজেতার স্বাভাবিক দম্ভের প্রকাশ মনে হয়েছে। সেই বিদ্বেষ, অসূয়া, ঘৃণা ও অনুকম্পা থেকে বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য তিনি ইতিহাসের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীন সিরাজ রচিত *তবকৎ-ই-নাসিরি* গ্রন্থে বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গজয়ের কাহিনী তাঁর অমূলক *ঠেকেছিল*। এ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" তিনি আরও বলেন, "যে বাঙ্গালী এ সকলকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।" এই ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম ডাক দিয়েছিলেনঃ "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

"তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সবাই লিখিবে।"

বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার কিভাবে ঘটল, বঙ্কিম তা-ও জানতে আগ্রহী। এই প্রবন্ধের শেষে তাঁকে বলতে শুনিঃ "দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।"

উপন্যাসের আধারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বর্ণনা করেছেন। *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) মুঘলদের বঙ্গবিজয়ের কাহিনি; *কপালকুন্ডলা* (১৮৬৬) জাহাঙ্গীরের সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ; বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত *মৃণালিনী* (১৮৬৯); *চন্দ্রশেখর*-এর (১৮৭৪) বিষয়বস্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমল থেকে গৃহীত; *আনন্দমঠ*-এর (১৮৮২) পশ্চাৎপটে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; *সীতারাম* (১৮৮৭) মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু রাজার বিদ্রোহের কাহিনি; *রাজসিংহ* (চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৩) আওরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতদের শক্তি-পরীক্ষা। এইসব উপন্যাস আলোচনাকালে বঙ্কিচমন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা গেছে। কিন্তু তা কতখানি যথার্থ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে জগৎ সিংহ-এর প্রতি আয়েষার ভালবাসায় অনেক লেখক বঙ্কিমের মুসলমান-বিদ্বেষের গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু তারা ভুলে যান, মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে বঙ্কিম কখনো অয়েষার মতো নির্মল চরিত্র সৃষ্টি করতেন না। কতলু খাঁ নীচ, বিবেকহীন। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমার চিরত্রের তুলনায় ওসমান ও আয়েষার চরিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল। *কপালুকন্ডলা*-য় মতিবিবি বুদ্ধিমতী কিন্তু হৃদয়হীন ও নৈতিকজ্ঞানবর্জিত। তার কামনার আগুনে নবকুমার দগ্ধ। কিন্তু মেহেরুন্নিসা প্রণয়নিষ্ঠ। কেউ বলবে না যে মুসলমান বলেই মতিবিবিকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। মৃণালিনী-তে বখ্‌তিয়ার চক্রান্তকারী কিন্তু পশুপতি বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী। চন্দ্রশেখর-এ দলনী প্রতিব্রতা ও আত্মত্যাগে প্রোজ্জল অথচ শৈবলিনী পাপাচারী। মীরকাসিম প্রজাহিতৈষী শাসক ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা; অথচ তকি খাঁ নীচ। সীতারাম-এ ফকির সাম্প্রদায়িক ও নিষ্ঠুর; কাজী ফকিরের মতো সাম্প্রদায়িক না হলেও বিপজ্জনক। কিন্তু চাঁদ শাহ ফকির বিজ্ঞ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। সীতারামের হিন্দু রাজ্যের নাম বঙ্কিম রেখেছিলেন "মহম্মদপুর"।

রাজসিংহ উপন্যাসে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ পুনরুত্থাপিত হয়েছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ছবি চঞ্চলকুমারী যে-দৃশ্যে পদদলিত করেছেন সেখানে বঙ্কিমের মুসলমান বিদ্বেষ প্রকট হয়েছে— এমন মন্তব্যও শোনা গেছে। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন হিন্দুরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করেনি। চঞ্চলকুমারী ছিলেন তাদের প্রতিনিধি যারা ঔরঙ্গজেবকে ঘৃণা করত ও তার পতন কামনা করত। এই উপন্যাস লেখার সময় বঙ্কিম সে সময়ে প্রামাণ্য বলে যে সব পুস্তক বিবেচিত হত, সেগুলি থেকে তথ্য আহরণ করেছেন— যেমন প্রিঙ্গেল কেনেডির 'এ হিস্ট্রি অব দি গ্রেট মোগলস', জেমস টড লিখিত 'দি অ্যানালস অ্যান্ড অ্যানটিকুয়িটিস অব রাজস্থান', ওরম রচিত 'হিস্টরিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস অব দি মোগল এম্পায়ার', মানুচি রচিত 'স্টোরিয়া দ্য মোগোর', এফ এফ কাট্রো রচিত 'দি জেনারেল হিস্টরি অব দি মোগল এম্পায়ার' প্রভৃতি। রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের বিকৃতি যদি কোথাও ঘটে থাকে, তবে সে দায়িত্ব কেবল বঙ্কিমের নয়। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন— ''যদিও বঙ্কিমের যুগে বাদশাহের সহিত রাজসিংহের মহাযুদ্ধের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই বা রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহা হইলেও বর্তমানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।'' ছোটোখাটো ঐতিহাসিক কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তাঁর মতে বঙ্কিম 'প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই।'' উপন্যাসের উপসংহারে লেখকের নিবেদন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

''গ্রন্থাকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোনও পাঠক মনে না করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে— হিন্দু হউক, মুসলমান হউক— সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এ জন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।''

আনন্দমঠ উপন্যাস এবং বিশেষত ঐ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ''বন্দে মাতরম্'' গানকে কেন্দ্র করে উনিশশো ত্রিশের দশকে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা যায়। কাজী আবদুল ওদুদ, রেজাউল করিম, আনিসুজ্জামান প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে লড়াই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ এবং সন্তানদলের মধ্যে। বঙ্কিম সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন তিনি উপন্যাসে ইংরেজদের নাম না করে ''যবন'' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আবার এ-ও মনে রাখা দরকার যে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা মিলিয়ে সেকালে জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। ''বন্দে মাতরম্'' গানে ''সপ্তকোটি'' শব্দে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে বাংলার মোট জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। ''বন্দে মাতরম্'' গানে হিন্দু ধর্মের কোন দেব-দেবী নয়, দেশমাতৃকাকে দেবী রূপে কল্পনা করে বঙ্কিম তাঁর আরাধনা করেছেন। তাই তা কোন প্রচলিত ধর্মের সীমায় আবদ্ধ নয়। বিশেষত মনে রাখা যেতে পারে, উপন্যাসে মহাপুরুষের উক্তি,— ''তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা আর্যধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম।'' বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলা বোধহয় তাই সঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহেতুক অপবাদ কিংবা ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ''ভারত কলঙ্ক'', প্রবন্ধে তিনি ভারতীয়দের গৌরব ও দুর্বলতা দুই-ই বিশ্লেষণ করেছেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর পঁচিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আরবরা একদিকে উত্তর আফ্রিকায় মিশর এবং সিরিয়া পার হয়ে স্পেন এবং অন্যদিকে পারস্য ও তুর্কীস্থান অধিকার করলেও ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মহম্মদ বিন্ কাসিমের হিন্দু জয় থেকে মহম্মদ ঘুরীর দিল্লির তক্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। সামরিক শক্তিতে ভারতীয়দের অন্যান্য জাতির তুলনায় হীন বলে বঙ্কিম মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এই ধারণার পিছনে *''ভারত-কলঙ্ক''* প্রবন্ধে তিনি যেসব কারণ উল্লেখ করেন সেগুলির মধ্যে প্রথম হল হিন্দুদের ইতিবৃত্তের অভাব। দ্বিতীয়ত, হিন্দুরা বিধর্মীদের ঘৃণা করত। তাই তারা তাদের দেশ জয় করার কোন চেষ্টা করেনি। বরং দেশান্তরে জাতি - ধর্ম বিনাশের সম্ভাবনায় তারা ভীত ছিল। ভারতবর্ষের পরাধীনতার আরও কতকগুলি কারণ বঙ্কিম নির্ণয় করেন। এদেশের প্রকৃতি উর্বর। সহজে ফসল ফলে। অল্পায়াসে জীবন-ধারণ সম্ভব। ভারতীয় স্বভাব যতটা ভাবপ্রবণ ততটা কর্মঠ নয়। সামাজিক সংহতির অভাব বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। ইংরিজি লিবার্টি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স শব্দদুটি বাংলায় তিনি স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দ্বারা অনুবাদ করেন।

''যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান - শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহাঁজাদা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না।'' (''ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'', *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় খন্ড।)

ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমান অবস্থার তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম সমাজ-ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাচীনকালে রাজকার্য সমাজে সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় রাজার মধ্যে বিভেদ করত না। বঙ্কিম বলেছেন, ''জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া, কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখনও তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই'' (''ভারত-কলঙ্ক'')। এই সাধারণ নিয়মের অবশ্য কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। মধ্যযুগে মেবার রাজ্যের দৃষ্টান্ত বঙ্কিম স্মরণ করেন। অনুরূপভাবে শিবাজী এবং রঞ্জিত সিংহ যথাক্রমে মারাঠা এবং শিখদের মধ্যে জাতীয়ভাব সৃষ্টিতে সফল হয়েছিলেন। তাঁদের কীর্তি স্মরণ করে বঙ্কিমের আক্ষেপ— ''যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখন্ড জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?'' জাতিভেদ প্রথার অনিষ্টকর পরিণাম সম্পর্কে বঙ্কিম আমাদের সচেতন করেন। ইংরেজ শাসনে ইংরেজরা যেমন অনুগৃহীত, হিন্দু রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণরা তেমন সমাজে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করে বঙ্কিম যে সিদ্ধান্তে পৌছান ঃ

''যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে— আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগকে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না— জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে

উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীনে না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *"বঙ্গদেশের কৃষক"*-এ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে দুটি প্রতীকী চরিত্র অঙ্কন করেছেন— রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখ। এতে তিনি কৃষকদের একটি শ্রেণী হিসাবেই দেখেছেন— হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে নয়। *সাম্য* প্রবন্ধে তিনি মানুষের সমানাধিকারের কথা বলেছেন। পাশ্চাত্যের সমাজবাদী ধারণার সঙ্গে এই গ্রন্থে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ মেলে। পরে অবশ্য তিনি রচনাটিকে প্রত্যাহার করেছিলেন।

একসময় বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছিল কোঁত্-এর পজিটিভিজম্ (ধ্রুবদর্শন বা প্রত্যক্ষবাদ) এবং বেন্থাম ও মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ (হিতবাদ ও উপযোগবাদ)। *দেবী চৌধুরাণী*-র (১৮৮৪) মটো হিসাবে কোঁত্-র "Catechism of Positive Religion" থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে অনেক জায়গায় কোঁত্-এর তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। হিতবাদ এবং ধ্রুববাদের স্থান গ্রহণ করে হিন্দুর শাস্ত্রসংহিতা ও ভক্তিদর্শন। সীলি (Sir John Robert Seeley, 1834-95) রচিত Ecce Homo (Behold the Man) গ্রন্থের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। এই গ্রন্থে যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হয়েছিল। Religion of Culture তত্ত্বের জনক সীলি। "The substance of religion is culture"—তাঁর এই মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে মানবজীবনের তাৎপর্য বিচারে নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের আলোচনায় তার প্রভাব দেখা যায়। কৃষ্ণচরিত্র রচনার সময়েও এ তত্ত্ব তাঁর মনে ছিল, যদিও ধর্মতত্ত্ব তার দু-বছর পরে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব মূল তত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্র তার ফলিত ব্যাখ্যা *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত।" কেন না "অনুশীলন ধর্মে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তাহার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ। যথার্থই তাঁর প্রকৃত চরিতকথা কি ছিল, তা একালে বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য।" কৃষ্ণচরিত্রের বিচার - প্রসঙ্গে বঙ্কিম সম্পূর্ণ যুক্তি ও বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের যে বর্ণনা তাঁর কাছ যুক্তিবিরোধী মনে হয়েছে তাকে তিনি অম্লানবদনে পরিত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ-

"বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ— একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা— যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে।" (বঙ্কিমচন্দ্র, *আধুনিক সাহিত্য*)

বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম আমরা যাঁকে সাধারণতঃ যাকে "পেট্রিয়টিসম" বলি তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। *ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে* "*স্বদেশপ্রীতি*" অধ্যায়ে তিনি বরং বলেছেন—"ইউরোপীয় Patriotism

একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করতে হইবে।.... জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লেখেন।" বঙ্কিমের শিক্ষানুযায়ী— "আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে প্রীতি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে প্রীতি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।" প্রীতির স্বরূপ বোঝাতে বঙ্কিম বলেন— "দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা নহে। তাহার ওপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যতদিন প্রীতির জগৎ পরিমিত স্ফূর্তি না হইল ততদিন প্রীতিও অসম্পুর্ণ- ধর্মও অসম্পূর্ণ।" (ধর্মতত্ত্ব, একবিংশ অধ্যায়) বঙ্কিমের এই চিন্তা সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী একটি লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। পুরাবৃত্ত আলোচনা তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬)। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বাংলার ইতিহাস প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণের লেখা প্রথম - *শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেন ঃ 'ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। - ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থে প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না।" তবে গ্রন্থটি কৃশ কলেবর (মাত্র ৯০ পৃষ্ঠা)। বঙ্কিম যে কারণে তাঁর আক্ষেপ গোপন করতে পারেন নি, "মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি"। রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) সেকালের অপর একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধদর্শন, ভারতের পুরাবৃত্ত সমালোচনা প্রভৃতির নাম করা যায়। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য ইটালির ফ্লোরেন্টিনো আকাডেমি তাঁকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১০.৪ স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ থেকে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা শুরু- একথা বলেছিলেন অরবিন্দ। পরবর্তী দশ বছরে বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখার সংখ্যা প্রচুর। ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা ভঙ্গ করে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আবেদন ছিল আন্তর্জাতিক। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের।" (*পত্রাবলী*, পত্রসংখ্যা ২১৩)। অন্যত্র পাশ্চাত্যবাসীর প্রতি "শিক্ষালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পড়ি; তোমাদের ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্যসকল অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সার্বজনীন।" (হিন্দুধর্ম, ধর্মসমীক্ষা)

বিবেকানন্দ এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। সমাজের ওপরের স্তরের মানুষদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য তিনি বলেছেন- "আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!!" নতুন ভারত গড়ার কাজে বিবেকানন্দ তাকিয়েছিলেন শ্রমজীবী জনতার দিকে—"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে— তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো

ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই"। (পরিব্রাজক) বিবেকানন্দ বিশেষভাবে আবেদন করেছিলেন যুব শক্তির কাছে— "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো— মানুষ চাই পশু নয়।" (পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৬৭) শরীরচর্চার ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তিনি বুঝেছিলেন, দেহে মনে সুস্থ, সবল, নির্ভীক না হলে কোনো কাজই সম্পন্ন হবে না।

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে স্বামীজি পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেন। "এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ তাহা কোনোকালে কোথাও দেখা যায় নাই।" (পত্রসংখ্যা ৭৮) বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা হিন্দুদের পতনের অপর এক প্রধান কারণ। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে বিধি নিষেধ স্বামীজী কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। (পত্রসংখ্যা ৬৭) খেতড়ির পন্ডিত শঙ্করলালকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি দেশের দুর্গতির জন্য আরও কতগুলি কারণকে দায়ী করেন ঃ- "আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই। ইহার দুইটি কারণ ঃ প্রথমতঃ এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আধিক্য আমাদের কর্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তা - প্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা বা দূরভ্রমণ করিবার লোক ছিল বটে, তবে তাহারা সবই ছিল বণিক; পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের আকাঙ্খা, তাঁহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল।" (পত্রসংখ্যা ৫৮) ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসভায় যাবার পথে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখে তিনি বলেন "জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণভাবে জাগরিত হয়েছে — আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। এদের যে-কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে।" চীনদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চীনা শ্রমিকদের কাজ করার আগ্রহ তাঁকে সমান মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য তাঁর উপদেশ — "আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন জাপান যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার।" (পত্রসংখ্যা ৬৭)।

বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনায়, বক্তৃতায় ও চিঠিপত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমবার জাহাজে আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি মালয় উপদ্বীপের পেনাঙ, সিঙ্গাপুর, চীনের হংকং ও ক্যান্টন এবং জাপানের কোবি, ইয়াকোহামা, কিয়োটো, ওসাকা প্রভৃতি শহর থেকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন তা জ্ঞানগর্ভ। স্বামী অখন্ডানন্দকে তিব্বত সম্বন্ধে লেখা এক চিঠিতে আমরা বুঝতে পারি সে দেশ সম্পর্কে তাঁর জানার কৌতূহল কত ছিল। তিব্বতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, তিব্বতীদের তন্ত্রাচার, কীভাবে তার অধঃপতন ঘটে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ ও তার ভিন্নরূপ, বেদের কর্মবাদ, ইহুদী ধর্মের কর্মবাদ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অতি সহজ চলিত ভাষায় ঐ চিঠিতে (পত্রসংখ্যা ৩৪) বিবেকানন্দের গভীর তত্ত্বমূলক আলোচনার কোনো তুলনা নেই। তিব্বত বিষয়ে স্বামীজীর সচেতনতার আরও পরিচয় পাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা এক চিঠিতে (মার্চ, ১৮৯৬) ঃ "তুমি heart of Tibet তে দেখ নাই— only a fringe of the trade route. ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation— দেখতে পাওয়া যায়।' (পত্রসংখ্যা ২৬১) সিংহলের ইতিহাস সম্পর্কে স্বামীজির সচেতনতার প্রমাণ নিচের পংক্তিগুলি ঃ- "সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয় - খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাংলাদেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে। এখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র, আর অনুরাধাপুর ছিল

সেকালের লন্ডন।'' (পত্রসংখ্যা ৩২৫)। *পরিব্রাজক* গ্রন্থে সিংহল ভ্রমণের বিবরণ প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

ভগবান বুদ্ধের বাণী এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবেকানন্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ''খ্রীষ্ট্র ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, অন্যেরা হলেন ধর্মাচার্য।'' (*স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, দশম খন্ড ২০৪) এই ধর্মাচার্যদের তালিকায় দুটি নাম— মহম্মদ এবং লুথার। মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় (''ভারতীয় মহাপুরুষগণ'') বুদ্ধ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ ''পৃথিবী এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের শিষ্যরূপে নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আর্বির্ভূত হইলেন।'' (ঐ, পঞ্চম খন্ড, ১৫৬) স্বামী অখন্ডানন্দকে এক চিঠিতে ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে বিবেকানন্দ আরও বলেছেন— ''তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart যাহা জগতে আর হইল না।'' (পত্রসংখ্যা ৩৪)। বুদ্ধের পর যেসব ধর্মপ্রচারক এদেশে আর্বির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ''শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ ও চৈতন্যের ছিল বিশাল হৃদয়।'' আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ''ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশস্বরূপ।'' স্বামীজি তাঁর পায়ে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন— ''যদি আমার জীবনে একটিও যথার্থ তত্ত্ব কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার— তাঁহারই বাক্য।'' (দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত ''ভারতীয় মহাপুরুষ'' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদদের অবদান বিবেকানন্দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি নিজেই বলেছেন — ''ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতগণ সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা অধিক কল্পনাশক্তি লইয়া সংস্কৃতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানিতেন অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা করিতেন অনেক, আর অনেক সময়ে তাঁহারা অল্পস্বল্প যাহা জানিতেন, তাহা লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন।'' পাশ্চাত্যপন্থীরা আবার প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কোনরূপ উৎকর্ষ স্বীকার করতেন না। বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে ইউরোপে কয়েকজন সংস্কৃত বিশেষজ্ঞের সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা প্রকৃতই বিদ্বান এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জার্মান পাণ্ডিত ডয়সেন তাঁর বিচারে এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পূর্ববর্তী ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে ম্যাক্সমুলার তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। ম্যাক্সমুলারের ভারত-প্রীতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— ''যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম।'' (''ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার'', *বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, দশম খন্ড, ১৮০) স্বামীজি ইতিহাসের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করতেন। খেতড়ির মহারাজকে এক চিঠিতে (পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৮০) তিনি লেখেন ঃ ''যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করে। অনেকে বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধ হয়, বিপরীতটাই সত্য। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়াছিল ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।'' স্বামী ত্রিগুনাতীতানন্দকে পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিত করে বিবেকানন্দ বলেন ঃ ''খ্রিস্টিয়ান মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ দিকি।'' ভারতীয় মুসলমানদের খোঁজ রাখতেও স্বামীজি কত আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর পরবর্তী উক্তি থেকেই বোঝা যায় ঃ ''তবে কোনও আরবী জানা মুসলমান ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভালো হয়। ফারসী ভাষায় অনেক Indian History আছে, যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে।'' (পত্রসংখ্যা ২৫১) বিবেকানন্দের চিন্তায় ভেদবুদ্ধির স্থান ছিল না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন— যত মত তত পথ। বিবেকানন্দ তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। চিকাগো

ধর্মসম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি সব রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে এক চিঠিতে (১০ জুন ১৮৯৮) তিনি লেখেন ঃ-

"বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম- ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই— যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই। অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, 'সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই এক ধর্মের বিবিধ প্রকাশ মাত্র', সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।'

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই — বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ— একমাত্র আশা।" (পত্রসংখ্যা ৪০৫)

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বোঝাতে বিবেকানন্দ একটি (pattern) উদ্ভাবন করেছিলেন। *বর্তমান ভারত* গ্রন্থে এবং আরও কতগুলি রচনায় (উপদহরণত, "ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং খেতড়ির মহারাজ ও মার্কিন অনুগামিনী মেরি হল-কে ১৮৯৫ সালের কোন এক সময়ে এবং ১লা নভেম্বর, ১৮৯৬ সালে যথাক্রমে লেখা দুটি চিঠিতে) আমরা এই ধারণার সম্মুখীন হই। কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর আরও অনেক দেশে সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। তারা কেবল ধর্মকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত না, রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণা যোগাত। বৈদিক যুগের শেষে ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন হিসাবে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বুদ্ধদেব ছিলেন ক্ষত্রিয়। শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাভারতের কৃষ্ণও তা-ই। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, সমাজে ক্ষত্রিয়দের প্রভাব বাড়ছে। *গীতা*-য় শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান মেলে ধরলেও সামাজিক বৈষম্যের সমস্যার সমাধান হয়নি। বিবেকানন্দ বলেছেন— "স্পার্টানরা যে প্রকার হেলটদের উপর ব্যবহার করিত অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (পত্রসংখ্যা ১৩) মৌর্য সাম্রাজ্য বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সহায় হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব ভিনদেশী জনগোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছিল, তাদের সাংস্কৃতিক মান তত উন্নত ছিল না। ক্রমে এরা বৌদ্ধধর্মের কোলে স্থান লাভ করে। তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ফলে ক্রমশ তাদের আচারানুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ ক'রে বিকৃতি ঘটায়। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি থেকে দেশকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তবে তাঁর সীমাবদ্ধতা বিবেকানন্দের চোখে ধরা পড়েছিল ঃ-

"কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার— এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব - ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন।" (দ্রষ্টব্য "ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ) মধ্যযুগের ভক্ত সন্তেরা— যেমন চৈতন্য, কবীর, দাদু, নানক এবং রামানন্দ মানুষের সমান অধিকার প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে আমরা বৈশ্যতন্ত্রের অধীন।

ইংরেজ শাসনে বহির্জগতের সঙ্গে নতুন করে ভারতের সম্পর্কে স্থাপিত হলেও শোষণের চরিত্র বিবেকানন্দের লেখায় সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষ বছরে মেরী হেল-কে (৩০ অক্টোবর ১৮৯৯) এক চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ "বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের মাত্র একটিই ভালো দিক আছে, যদিও অজান্তে ঘটেছে— তা

ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর করে। সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হ'ত — অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে — তা হলে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে আরও কত বিস্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুট ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার, কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধ শিক্ষিত, বিজাতীয় নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান ব্রিটিশ ভারত সাজানো তামাশা— আর কিছু নয়।" (পত্রসংখ্যা ৪৬৬) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি উত্তেজনা গোপন করতে পারতেন না। বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব তা তিনি সঠিক বুঝেছিলেন। সিপাহীদের সাহস এবং সংগ্রামী মনোভাব তাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। (দ্রষ্টব্য, শংকরীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, ১৮২২)।

দারিদ্র্য এবং অশিক্ষাকে ভারতের অবনতির প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করে বিবেকানন্দ ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন— "এক্ষণে কার্য ঃ 'আধুনিক সভ্যতা পাশ্চাত্যদেশের ও 'প্রাচীন সভ্যতা' ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল যেদিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চ জাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রসারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি— রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ সংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।" (পত্র সংখ্যা ৩৩২) পুনরপি— "ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল— জনসাধারণের দারিদ্র্য। পত্রসংখ্যা ৯৮)। *বর্তমান* ভারত গ্রন্থে বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী— "সর্বদেশে শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে।" স্বামীজির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কয়েকজন বলেছেন— রাশিয়া এবং চীনে শ্রমজীবী বিপ্লব সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা অবর্থ্য প্রমাণ হয়। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *প্রাগুক্ত*, ৪৫৭)

১০.৫ অনুশীলনী

১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বিস্তারটি ব্যাখ্যা করুন।

২। স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ভারত জীবনের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করুন।

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

অমলেশ ত্রিপাঠী — *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব* (নির্মল দত্ত কর্তৃক লেখকের The Extremist Challenge গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

তপন রায়চৌধুরী — *ইউরোপ পুনর্দর্শন* (গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লেখকের Europe Revisited গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

একক ১১ ❑ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা

গঠন

১১.০ প্রস্তাবনা
১১.১ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা
১১.২ স্বর্ণযুগের সন্ধানে
১১.৩ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা এবং রমেশচন্দ্র দত্ত
১১.৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস এবং পর্ব বিভাজন সমস্যা
১১.৫ অনুশীলনী
১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একে একে এগিয়ে আসেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকবৃন্দ। মহারাষ্ট্রে বিচারপতি রানাডে এবং সরদেশাই অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকদের অলোচনা পদ্ধতির পার্থক্য বোঝাতে আমরা প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগের প্রতি উভয়ের মূল্যায়ন পাশাপাশি তুলে ধরেছি। যা এককালে "স্বর্ণযুগ" নামে বন্দিত হয়েছিল ইদানীং অনেক ঐতিহাসিক তার অপূর্ণতা ও সামাজিক বৈষম্য লক্ষ্য করেছিল। অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের জাতীয়তাবাদীরা নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত হলেও এদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তাঁরা সরকারী নীতিকে দায়ী করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই মতবাদের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা। তাঁর যুক্তি আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশে সাম্যবাদী ধারণার প্রসারে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অত্যন্ত সচেষ্ট হন। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বে রজনী পাম দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডি. ডি. কোশাম্বি প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় মার্কসবাদের প্রয়োগ আলোচনার একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। প্রসঙ্গতঃ তার প্রতি দৃষ্টি আকর্যণ করা হয়েছে।

১১.১ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা

জাতি গঠনের পিছনে যে সব কারণগুলি প্রধানত উল্লিখিত হয়, তার অন্যতম হল স্বাতন্ত্র্যবোধ। যখন কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে অবস্থানকারী জাতি এবং তার জীবন যাত্রার ভিত্তি রূপে পরিগণিত যৌথ মানব-গোষ্ঠী ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে সমাজ, ভাষা, মত, বিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেকে অপরের থেকে বিশিষ্ট বোধ করে, তখন জাতীয়তাবাদের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। রেনেসাঁস যুগে পাশ্চাত্য ভুখণ্ডে জাতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল স্পেন প্রভৃতি দেশে। বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজে প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্ব

দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের পর জাতীয়তাবাদের ধারণা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। ইউরোপে উনিশ শতক ছিল জাতীয়তাবাদের স্বর্ণ যুগ। কবি, শিল্পী, ভাবুকরা নানাভাবে জাতীয়তাবাদের বন্দনা করেন। গ্রীস অটোমান শাসন থেকে মুক্ত হয়। জার্মানী এবং ইতালিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা জাতীয়তাবাদী শক্তির সাফল্য ঘোষণা করে।

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঐতিহাসিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেবল সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, পরাধীন জাতির কাছে নিজেদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং তাদের মানসিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদীদের একটি প্রচলিত কৌশল। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তা রোধ করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন **রামরাজ** (১৭৯০-১৮৩৩)। তাঞ্জোরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। এই পরিবার ছিল বিজয়নগরের রাজবংশোদ্ভূত। শহরের দুশো ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বৃহদেশ্বর মন্দিরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বালক বয়স থেকে তিনি নিজেকে প্রশ্ন না ক'রে পারেননি— কি ক'রে এর নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল? উত্তর খুঁজতে তিনি দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন শিল্প শাস্ত্র বিষয়ে বহু অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা জন্মায়? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আদলে মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) শহরের ফোর্ট সেন্ট ডেভিড্-এ একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। রামরাজ ঐ প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী জীবনে রামরাজ ব্যাঙ্গালোর শহরের জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ১৮২২ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড তাঁকে সদস্যের মর্যাদা দেয় (Corresponding member)। ১৮৩৪ সালে এই একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী (Essays on the Architecture of the Hindus) প্রকাশিত হয়। রামরাজ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি থেকে ৪৮টি নকসা গ্রন্থভুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থ প্রকাশ পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা এবং মন্দির-ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শক।

প্রাচীন ভারতের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত করেন মারাঠা পণ্ডিত **মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী** (১৮২১-১৮৯২)। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। কাশীর সংস্কৃত কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদ তিনি বহু বছর (১৮৪২-১৮৯০) অলংকৃত করেছিলেন। ১৮৫৮ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে একটি প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য (একাদশ শতক) বিভেদক অন্তরকলনবিদ্যা (Differential Calculus) বিষয়ে অবহিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির রচিত *সূর্যসিদ্ধান্ত* গ্রন্থ প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন বাপুদেব (১৮৬১)। আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সদস্য পদে বরণ করে। সরকার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারতে পুরাতত্ত্ববিদ্যা চর্চার প্রথম পর্যায়ে যাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাঁদের অন্যতম হলেন **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** (১৮২২-১৮৯১)। ১৮৪৬ সালে তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশ বছর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী কালে তিনি একাদিক্রমে বহু বছর সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। সোসাইটির **বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা** গ্রন্থমালায় ১২টি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে রাজেন্দ্রলালের প্রথম গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur)। ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রধান চারটি গ্রন্থ হল, *The*

Antiquities of Orissa (প্রথম খন্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮০) *Buddha Gaya : The Hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮), দুখন্ডে প্রকাশিত Indo- Aryans (১৮৮১) এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২)। *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খন্ডে উড়িষ্যার প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে ঐ রাজ্যের (তখনও বাংলার অন্তর্গত) বিভিন্ন মন্দির— যেমন ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারকে অবস্থিত — এবং প্রত্নবস্তু স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে আলোচিত। *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল ভারতে স্থাপত্য বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ভারতে স্থাপত্য কর্মের সূচনা গ্রীক প্রভাবের ফল। অশোক স্তম্ভের (খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) পূর্ববর্তী কোনো স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন তখনও পাওয়া যায়নি। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতীয়রা গ্রীকদের সংস্পর্শে এসেছিল। গ্রীকদের কাছ থেকে ভারতীয়রা স্থাপত্য বিদ্যা শিখেছিল,— এই ছিল তখনকার প্রচলিত মত। কিন্তু এই অশোকস্তম্ভই রাজেন্দ্রলালের মতে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই প্রস্তরস্থাপত্যের কথা জানত। অশোক একজন ভারতীয়। বৈদেশিক প্রভাবে তিনি অশোকস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অশোকস্তম্ভ উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাক্ষ্য বহন করে। স্তম্ভটি যথেষ্ট বেড়যুক্ত এবং উচ্চতায় ৪২ ফুট। নির্মাণকার্যের জন্য পাথর বহু দূর থেকে বয়ে আনতে হয়েছে, খাড়া করতে প্রয়োজন হয়েছে বিশেষ নৈপুণ্য। স্তম্ভের অলংকরণ এবং পালিশ বিস্ময়কর। স্থাপত্যকর্মের ঐতিহ্য দেশে বিশেষভাবে গড়ে না উঠলে অশোকের পক্ষে স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হত না। রাজেন্দ্রলালের যুক্তি পণ্ডিত মহল শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

The *Indo-Aryans* গ্রন্থের দুটি খন্ডে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যে তা রাজেন্দ্রলালের বিস্তৃত অধ্যয়ন, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতের মন্দির স্থাপত্য এবং জটিল নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি রয়েছে সেকালে সমাজে গো-মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান প্রসঙ্গে প্রবন্ধ। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃতভাষায় লেখা বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের ওপর নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির প্রামাণ্য বিবরণ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* কেবল আয়তন বিচারে নয়, উপাদানের প্রাচুর্যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ, বিশেষজ্ঞ মহলে যা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। তিনজন পণ্ডিতের সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি পাঠ এবং বিষয়বস্তু সংকলন তিনি মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, নিজেও বহু পুঁথির সারসংগ্রহ করেছিলেন। এই কাজে শেষদিকে তাঁর সঙ্গে **পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** (১৮৫৩-১৯৩১) যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধগয়া বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল অন্যান্যদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করলেও তথ্যবিচারে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন,— নির্বিচারে কোন তথ্য গ্রহণ করেননি।

ইংল্যান্ডে প্রচলিত পেনি ম্যাগাজিনের অনুসরণে ১৮৫১ সাল থেকে রাজেন্দ্রলাল *বিবিধার্থ সংগ্রহ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদে পত্রিকার চরিত্র বোঝাতে একে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণী-বিদ্যা এবং শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে মাসিক বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। কেবলমাত্র ভারতের ইতিহাস ভূগোল বা পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে এই পত্রিকায় আরবদের পারস্য বিজয় এবং রাশিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হত। ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার দায়িত্ব রাজেন্দ্রলাল পালন করেছিলেন। উদাহরণত, পত্রিকার দ্বিতীয় খন্ডে হায়দার আলি এবং চতুর্থ খন্ডে টিপু সুলতানের জীবনী বিবৃত হয়। "শিবাজীর চরিত্র" নামে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ১৮৬০ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকা ছেলেবেলায় তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ করতো বলে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে জানিয়েছেন। ১৮৬১

খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার তিন বছর পর *রহস্য-সন্দর্ভ* নামে অপর একটি পত্রিকা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন। এটি ন'বছর চলেছিল।

রাজেন্দ্রলালের মনোযোগ কেবল পুরাতত্ত্ব চর্চায় নিবদ্ধ ছিল না। ১৮৭৬ সালে তিনি কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ১৮৭৮ সালে তিনি ঐ সংস্থার সহ-সভাপতি এবং ১৮৮১ সালে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অধিক সুযোগ প্রদান এবং ইলবার্ট বিল সমর্থনে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মডারেট। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড, জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি এবং হাঙ্গেরির রয়াল আকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে সভ্যপদে বরণ করে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সরকার তাঁকে ''রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উনিশ শতকে ভারতীয়রা জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে প্রশ্ন ছিল, ভারতীয়রা এক জাতি গঠন করে কিনা? এমনকি ভারতীয় নেতারাও এ বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ, **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন *A Nation in the making*। ইংরেজ শাসন ভারতকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বেড়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানে উপযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাদের সামনে চাকরির সুযোগ ছিল সীমিত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভির পরীক্ষা প্রবর্তিত হলেও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ জন ভারতীয় তাতে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬। সর্ব ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মোট পদ সংখ্যা তখন ছিল ৯০০। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে সমাজের সর্বস্তরে ক্ষোভ দেখা দেয়। ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসকদের তাচ্ছিল্য, বিচারে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাত ইত্যাদি কারণেও সরকার সমালোচিত হয়। একদিকে ভারতের কুটির ও হস্তশিল্প ধ্বংস এবং অন্যদিকে আধুনিক শিল্প স্থাপনে সরকারের অনীহা অর্থনীতিকে বেহাল করে। কৃষকরা ছিল কর ভারে জর্জর।

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার এই পশ্চাৎপট মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব কেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমশ প্রসার ঘটে। **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬-১৮৯৯) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে **জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভা** প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে **নবগোপাল মিত্র** ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে **হিন্দু মেলা** প্রবর্তন করেন। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্বক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতিতে উৎসাহ দান। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল সোসাইটি, ন্যাশনাল স্কুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল নিজেই এক সময়ে ''ন্যাশনাল'' নামে অভিহিত হতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ **হিন্দু পেট্রিয়ট, বান্ধব, নব্যভারত, বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার** প্রভৃতির নাম করা যায়। **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে **ভারতসভা** প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অধিক সুযোগ দেবার দাবিতে তিনি সোচ্চার হন। উত্তর ভারতে ১৮৭৬ সালে তাঁর প্রচারাভিযানে সাড়া জাগে। ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩) কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। ১৮৮৩ সালে ভারতসভার উদ্যোগে **প্রথম জাতীয় সম্মেলন** এবং তার দুবছর পর **জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা** এক নতুন যুগের সূচনা করে। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা প্রবাহে অনুপ্রাণিত বোধ করেন।

বাংলাভাষায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি **রজনীকান্ত গুপ্ত** (১৮৮৯-১৯০০)। হিন্দুমেলা আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রজনীকান্তের লেখা **জয়দেবচরিত** পুরস্কৃত হয়। এটিই তাঁর রচনার প্রথম নির্দশন। এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি *এডুকেশন গেজেট*এ রাজপুত মারাঠা ও শিখজাতির বীরত্বের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করতে থাকেন। এই রচনাগুলি পরে *আর্যকীর্তি* নামে পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রজনীকান্ত পাণিনির উপর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়। ভূমিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **আর. জি. ভাণ্ডারকর** রচনাটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন যে, মৌলিক সমালোচনা ও মন্তব্য- সমন্বিত এই গ্রন্থটি অর্ধশতাব্দীকাল পরেও ছাত্রদের কাছে মূল্য হারায়নি।

রজনীকান্তের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভারতীয়দের মধ্যে রজনীকান্তই সর্বপ্রথম সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রজনীকান্তের দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফল। গ্রন্থের উপাদানরূপে তিনি বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ ও রচনা, সরকারি কাগজ, লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। সুগভীর দেশপ্রেম, সহানুভূতি ও মানবতাবোধ তাঁর গ্রন্থে সুস্পষ্ট, ভাষা ওজস্বিনী। রজনীকান্তের অন্যান্য রচনার মধ্যে *প্রবন্ধমালা, নব চরিত, ঐতিহাসিক পাঠ,* ভারতকাহিনি, ভীষ্মচরিত, *আমাদের জাতীয়ভাব, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রতিভা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিভা গ্রন্থে লেখক উনিশ শতকের পাঁচজন মনীষী-বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের— জীবনী আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩০১ বঙ্গাব্দে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** স্থাপিত হয়। বাঙালির সারস্বত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে শুরু থেকেই পরিষদ একটি মর্যাদার স্থান গ্রহণ করে। রজনীকান্ত পরিষদের প্রথম পর্যায়ের অন্যতম সদস্য। *পরিষৎ* পত্রিকার-র তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। পরিষদের অন্যান্য কাজেও তিনি মূল্যবান উপদেশ এবং সময় ও শ্রম অকাতরে ব্যয় করেন। **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** বলেছেন- ''স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথ প্রদর্শক''। (চরিতকথা)

স্বদেশী যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক **অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়** (১৮৬১-১৯৩০)। পেশায় তিনি ছিলেন রাজশাহী জেলার এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত প্রধান গ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে (১) *সমরসিংহ* (১৮৮৩) (২) সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৮) (৩) *সীতারাম* (১৮৯৮) (৪) *মীরকাসিম* (১৯০৬), (৫) *গৌড়লেখমালা* (১৯১২) এবং (৬) *ফিরিঙ্গি বণিক* (১৯২২)। **অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন** রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছেন—''রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার। শুধু তাই নয়, উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গ কথা' রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত ভাবেই অক্ষয়কুমারের নামোল্লেখ দেখা যায় অন্তত একবার (ভারতী, ১৩০৫ আষাঢ়, পৃ ৬৬৬; সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)। অতঃপর রবীন্দ্র-সম্পাদিত *'বঙ্গদর্শন'* পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩০৮) থেকেই অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।'' *(প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস সাধনা)*

সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে *সাধনা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েক সংখ্যা এইভাবে প্রকাশ পাবার পর পত্রিকাটি উঠে যায়। তখন

গ্রন্থের বাকি অংশ *ভারতী* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিরাজ চরিত্রে যে কালিমা লেপন করেছেন, অক্ষয়কুমার নবাবকে তা থেকে অনেকটা মুক্তি দেন। তবে তিনি কোনও তথ্য গোপন করেননি। এই গ্রন্থ রচনার কাজে তিনি সমকালীন ইংরেজি এবং ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে তথ্য উদ্ধার করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক **ম্যালেসন** মনে করতেন, সিরাজ যত না খল, তার চেয়ে বেশি হতভাগ্য ("Siraju'ddaulah was more unfortunate than wicked.")। অক্ষয়কুমার তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি ম্যালেসনের অপর একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ("the name of Siraju'ddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in the tragic drama who did not attempt to deceive.')। অন্ধকূপ হত্যার যে বিবরণ হলওয়েল দিয়েছেন, তা যে বিশ্বাসযোগ্য নয় এ কথা অক্ষয়কুমার প্রথম যুক্তি তথ্য সহকারে প্রমাণ করেন। কলকাতার ডালহৌসি (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) অঞ্চল থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েলের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে এই ঘটনার স্মরণে যে স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তা অপসারিত করে। *সিরাজউদ্দৌল্লা* গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের কিছু কিছু বক্তব্য (যেমন, *অন্ধকূপ হত্যা* প্রসঙ্গে) প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা যে সর্বত্র বজায় থাকেনি রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন—

"গ্রন্থকার যদিও সিরাজ-চরিত্রের কেনো দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম-সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরায়নতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনের মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।" তবে নির্ভীকতার কারণে অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছেন—"বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।"

সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থের পরিপূরক রূপে অক্ষয়কুমার মীরকাসিমের রাজত্বকাল বর্ণনা করেন। অত্যন্ত নিপুণভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে এই গ্রন্থেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য সংশোধন করে। গ্রন্থের অনুক্রমণিকা অংশে তিনি বলেন ঃ-

"কিরূপে পুরাতন ভাসিয়া গেল, কিরূপেই বা নূতনের অভ্যুদয় হইল, তাহারই কার্যকারণ শৃঙ্খলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

"বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজা-রক্ষার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন; তাহাই মীরকাসিমের ইতিহাসের প্রধান কথা।"

অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক **ঐতিহাসিক চিত্র** পত্রিকা প্রকাশ পায়। সম্পাদকীয়তে পত্রিকার উদ্দেশ্য এই বলে বর্ণনা করা হয় ঃ "নানা ভাষায় লিখিত ভারত ভ্রমণকাহিনি ও ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃতি ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।" রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সূচনাংশ রচনা সমর্থন জ্ঞাপন করেন। **সিরাজউদ্দৌলা** গ্রন্থ প্রকাশের পর যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর মন্তব্য ঃ ''ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইলে পক্ষপাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশি বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ লইয়া আর-এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশির লেখনীমুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।'' অক্ষয়কুমারের আগ্রহে এবং দীঘাপতিয়ার জমিদার কুমার শরৎকুমার রায়ের আনুকূল্যে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে **বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি ভারতবর্ষে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠান। পূর্ব ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সমিতির অবদান অনস্বীকার্য।

১৯১২ সালে *গৌড়লেখমালা* নামক গ্রন্থে পাল রাজত্বকালের লেখমালাসমূহ অক্ষয়কুমার সংকলন ও সম্পাদনা করেন। প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারে লেখমালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদ আলোচনা আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে **অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন** বলেন— "বাংলার ইতিহাস সংকলনের প্রথম প্রয়াসের ফল এই গ্রন্থখানি। এই তার বিশেষ গৌরব।" এই ১৯১২ সালেই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম সম্পাদক **রমাপ্রসাদ চন্দ্র** (১৮৭৩-১৯৪২) সম্পাদিত গ্রন্থ *গৌড়রাজমালা* প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এক দীর্ঘ ভূমিকায় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং লেখকের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন— "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত প্রথম বাংলার ইতিহাস বলে পরিচিত হবার মর্যাদা এই গ্রন্থেরই প্রাপ্য। নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিতে দেশের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখার সূত্রপাত হয় এই গ্রন্থ রচনার সময় থেকেই।" একই সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের মতে, "সম্ভবত বাংলার ইতিহাস রচনায় নবযুগ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম সেনাপতির মর্যাদা অক্ষয়কুমারেরই প্রাপ্য।"

জাতীয় ভাবে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে **সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮৬৫-১৯৪৮) **ডন সোসাইটি** স্থাপন করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ** স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। **হারানচন্দ্র চাকলাদার** (১৮৭৪-১৯৫৮), **রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়** (১৮৮৪-১৯৬৩), **বিনয়কুমার সরকার** (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রমুখ পরবর্তী কালের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী তাঁদের জীবনের সূচনায় সতীশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ডন সোসাইটির সদস্য হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় **বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল** প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁরা সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনা করেন। প্রথম বছর এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ। নীল চাষিদের দুর্দশা এবং জলপথে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে হারানচন্দ্রের প্রবন্ধ ডন পত্রিকায় ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পরে নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। বিনয়কুমার সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের অতীত ইতিহাসের তুনালমূলক আলোচনার প্রবর্তন করেন। সমাজবিজ্ঞানীরূপে তিনি অধিক পরিচিতি।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *History of Indian Shipping* ১৯১২ সালে প্রকাশিত। সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের যোগাযোগ এই গ্রন্থে প্রধানত স্থান পেলেও লেখকের দৃষ্টি মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রসারিত। এই গ্রন্থের অংশবিশেষের ভিত্তিতে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেছিলেন। পরে ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতবর্ষের ভৌগলিক অখণ্ডতা সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে উদাহরণ সহযোগে তার আলোচনা করেছেন রাধাকুমুদ **Fundamental Unity of India** গ্রন্থে। ১৯১৪ সালে এই গ্রন্থ প্রথম লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত লেবার দলনেতা **জেমস র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড** *(James Ramsay MacDonald, 1866-1937)* গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন ঃ "Dr. Mookerjee writes only of history, but it is a history

which we read with political thoughts in our mind." জাতীয়তাবাদের ধারণা যে ভারতীয় চিন্তায় নিহিত, পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা নয়, *Nationalism in Hindu Culture (1921)* গ্রন্থে রাধাকুমুদ তা বোঝাবার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের বহু নির্দশন তিনি উপস্থিত করেছেন *Local Government in Ancient India* গ্রন্থে। ১৯১৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারত স্বায়ত্ত শাসনের দাবি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের বছরগুলিতে **হোম রুল** আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে করা হয়। ভারতের ইতিহাস থেকে এই দাবির সমর্থনে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত *Corporate Life in Ancient India* (1922) গ্রন্থে এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক রূপরেখা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কতকগুলি গ্রন্থে বিবৃত করেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁরা *Ancient India* গ্রন্থের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর এই ধরনের উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেন। মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধিতা করে তিনি পরিণত বয়সে রাজনীতিতে যোগ দেন।

প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৮৬-১৯৩১) স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পিতা মতিলাল ছিলেন বহরমপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়। **রাজেন্দ্রপ্রসাদ** (১৮৮৪-১৯৬৩) এবং **শরৎচন্দ্র বসুর** (১৮৮৯-১৯৫০) মতো পরবর্তীকালে বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতারা ছিলেন তাঁর সহপাঠী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নির্দেশে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত প্রত্নবস্তুগুলির তালিকা প্রণয়নের কাজে রাখালদাস অংশগ্রহণ করেন।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১০ সালে রাখালদাস ভারতীয় যাদুঘরে *Archaeological Assistant* এর পদে বৃত হন। এখানেই তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ থিয়োডোর ব্লকের সংস্পর্শে আসেন। ব্লকের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক, বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে, পরিচিত হন। ১৯১১ সালে রাখালদাস *Archaeological Survey of India*-তে সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হন। একই সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি *Archaeological Survey of India*-র পশ্চিম ভারতীয় শাখার এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত পূর্ব ভারতীয় শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান-রূপে মণীন্দ্র নন্দী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে অকালে মৃত্যুবরণের আগে পর্যন্ত তিনি সেই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

রাখালদাসের প্রধান কৃতিত্ব ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হলো যে, ভারতীয় সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম অন্যান্য সভ্যতাগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালাবার জন্য সরকার আরো উদারভাবে অর্থ মঞ্জুর করেন। এরপর ১৯২৫-২৬ সালে উত্তরবঙ্গের রাজশাহি জেলার পাহাড়পুরে রাখালদাসের নেতৃত্বে খননকার্য শুরু হয়। ফলে মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথম পর্বে সোমপুরে নির্মিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ রূপ, ভূমি-নকশা ও মন্দিরের অলঙ্করণের বৈচিত্র্য সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়ে।

লেখতত্ত্ব, প্রাচীন লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাবিদ্যা, প্রাচীন মূর্তি এবং শিল্পতত্ত্ববিচার প্রভৃতি ইতিহাসের অন্যান্য শাখাতেও রাখালদাস বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লেখতত্ত্ব-বিশারদ হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯০৯ সালে *Journal of the Asiatic Society of Bengal* পত্রিকায় লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন সম্পাদনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তিনি আরো অনেক অভিলেখ সম্পাদনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন, বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, ভোজবর্মনের বেলবা তাম্রশাসন এবং মালয় থেকে প্রাপ্ত মহানাবিক বুধগুপ্তের শীলমোহর লিপি। লেখতত্ত্বের ওপর রাখালদাসের জ্ঞান লিপিতত্ত্বে গভীর বুৎপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এ বিষয়ে দুটো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ (১) Origin of the Bengali Script (১৯১৯) এবং (২) Palaeography of the Hathigumpha and Nanaghat Inscriptions (১৯২৯)। *প্রাচীন মুদ্রা* নামে সাধারণের জন্য রাখালদাস বাংলায় একটি সহজবোধ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

শিল্পকলা ও মূর্তিতত্ত্বের উপাদানসমূহের ব্যবহারেও রাখালদাস কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। মধ্যপ্রদেশের ভূমারা, উড়িষ্যার গন্ধারদি প্রভৃতি জায়গার মন্দিরগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বহু স্মৃতিসৌধ বা স্তম্ভ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তিনি সরজমিনে লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী অঞ্চলে হৈহয় রাজাদের আমলে নির্মিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়নের ফসল *Haihayas of Tripuri and their Monuments* (১৯২২ সালে লিখিত, কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১-এ প্রকাশিত)। তাঁর *Temple of Bhumara* (১৯১৯) গ্রন্থে কিভাবে একটি মন্দিরকে আঙ্গিকের বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় রাখালদাস তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। *Bas reliefs of Badami* (১৯২৮)-তে পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের বাদামী অঞ্চলের গুহাগুলির সমৃদ্ধ ভাস্কর্য-নিদর্শনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। রাখালদাসের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ বোধ হয় তাঁর *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* নামীয় মহাগ্রন্থ (তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত)। প্রধানত বাংলা ও বিহারে পাল-সেন রাজাদের আমলের সংখ্যাবহুল এবং মনোজ্ঞ ভাস্কর্যকর্ম এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নিদর্শন লেখকের নিজের আবিষ্কার।

রাখালদাসের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে *Palas of Bengal* (১৯১৫), *Age of the Imperial Guptas* (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত), দুখণ্ডে *History of Orissa* (১৯৩০-৩১) এবং *Pre-historic Ancient and Hindu India* (মৃত্যুর পরে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত)।

ইতিহাস রচনায় নিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী হলেও স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমের প্রতি রাখালদাসের অনুরাগের নিদর্শন তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর গ্রন্থে ভারত-আক্রমণকারী শক ও কুষাণদের বিজেতা হিসাবে গুপ্ত রাজাদের ভূয়সী প্রশংসা মেলে। স্কন্দগুপ্তকে তিনি যথার্থ দেশপ্রেমিকের মর্যাদা জানিয়েছেন। অশোকের অহিংসা নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল বলে তিনি মনে করতেন।

রাখালদাস আটটি উপন্যাস রচনা করেন, যার মধ্যে সাতটি ইতিহাসাশ্রয়ী। তাঁর দেশাত্মবোধ এখানে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে *করুণা* উপন্যাসে যেখানে স্কন্দগুপ্ত নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র অগ্নিগুপ্ত হূণদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মৃত্যুবরণ করেন। দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রতি রাখালদাসের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান আক্রমণকারীদের দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেছেন। উত্তর ভারতের হিন্দুদের সমালোচনায় তিনি বলেন, 'ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার অভাব তাদের পতনের অন্যতম কারণ। *Pre-historic Ancient and Hindu India* গ্রন্থে তিনি বলেছেন তাদের মধ্যে

বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবরায় বা হরিহরের মতো দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ী হিন্দুদের গুণাবলির অভাব ঘটেছিল।'

বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি রাখালদাসের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উল্লেখ ছাড়া এই আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। শশাঙ্ক এবং ধর্মপালকে নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের পরাজয়ের ফলেই বাণভট্ট ও য়ুয়ান চোয়াঙ তাঁর সমালোচনা করেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁদের মন্তব্যগুলি তিনি তাই গ্রহণ করেননি। বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি রাখালদাসের অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে *Eastern Indian School of Sculpture* গ্রন্থে তাঁর এই মন্তব্যে ঃ- অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের পূর্বস্থ প্রদেশসমূহে শিল্পকৃতি চমৎকারিত্ব, উৎকর্ষ ও ব্যাপ্তির বিচারে এমন এক স্তরে উঠেছিল, যার কাছাকাছি উত্তর ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশগুলি পৌঁছতে পারেনি। এ ব্যাপারে পাল ও সেন-বংশীয় রাজারা অন্য সবাকে শ্রেষ্ঠতায় অতিক্রম করেছিল।

পশ্চিম ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ধারা প্রবর্তন করেন **মহাদেও গোবিন্দ রানাডে** (১৮৪২-১৯০১) এবং **কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ** (১৮০৫-১৮৯৩)। তেলাঙের প্রতিভা যৌবনে প্রকাশ পেয়েছিল। বাল্মিকীর রামায়ণ গ্রন্থের আখ্যানভাগ মহাকবি হোমারের ইলিয়াড থেকে নেওয়া— এমন একটি তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে জন্ম নিয়েছিল। উভয় কাব্যে রাজমহিষীর অপহরণ এবং পরিণামে একটি সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা থেকে সম্ভবত এই ধারণার উৎপত্তি। তেলাঙ একটি প্রবন্ধে এই ভ্রম নিরসন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। মারাঠীদের মধ্যে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ লিখে রাখার চল ছিল। (বাখর) ১৮৯০ সালে তেলাঙ এবং রানাডে সরকারের কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রাথমিক তথ্যোপাদান পরীক্ষা করার সুযোগ লাভ করেন। এর ভিত্তিতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রানাডের বিখ্যাত গ্রন্থ *Rise of the Maratha Power*। মারাঠারা গোড়ায় লুটেরা এবং শিবাজি দস্যুদলনায়ক ছিলেন বলে ইংরেজ লেখকদের রচনায় অপবাদ দেওয়া হত। রানাডে এই কলঙ্ক মোচন করেন। মারাঠা জাতি গঠনে একনাথ, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের অবদান তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শিবাজির নেতৃত্বগুণ অকুণ্ঠে স্বীকার করলেও মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের পিছনে জাতিগত ঐক্যের মনোভাব প্রধান প্রেরণা বলে তিনি মনে করতেন। মোগলদের হাত থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, এই ধারণার তিনি বিরোধিতা করেন। মোগলদের পর মারাঠারা এদেশে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। ক্ষমতার লড়াইয়ে তারাই ছিল ইংরেজদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। *Rise of the Maratha Power* গ্রন্থে রানাডে মারাঠাদের গৌরবের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্রের অন্যতম জাতীয়বাদী ঐতিহাসিক **গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই** (১৮৬৫-১৯৫৯)। বরোদার রাজদরবারে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। সর্বদাই তিনি সেখানে কোন-না-কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুবরাজদের শিক্ষার্থে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি মারাঠী ভাষায় বারটি গ্রন্থ (রিয়াসৎ) রচনা করেন। এর প্রধান অংশ ছিল মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত। ১৯২৬ সালে Main Currents of Maratha History নামে একটি গ্রন্থে সরদেশাই প্রথম মারাঠাদের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি তিন খণ্ডে লেখা New History of the Marathas (১৯৪৬-৪৮)। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে *(Shivaji and his line)* মারাঠাদের উৎপত্তি থেকে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মারাঠাদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের রাজ্যবিস্তারর যুগ, *Expansion of the Maratha Power*। পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে এই খণ্ডের সমাপ্তি। শেষ পর্যায়ে *(Sunset over Maharashtra)* মারাঠা শক্তির পতনের কারণ আলোচনা করেছেন সরদেশাই। এখানে উল্লেখ্য, মারাঠী এবং ইংরিজি ভাষায় মৌলিক তথ্যোপদান পরীক্ষা করা কেবল তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। ফারসী কিংবা ইংরেজী ব্যতীত অন্য ইউরোপীয় ভাষায়

রচিত তথ্যের জন্যে তাঁকে অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হত। মারাঠা ইতিহাসের বহু মূল্যবান নথি সরদেশাই সম্পাদনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে মারাঠী ভাষায় ঐতিহাসিক পত্র ব্যবহার (১৯৩৩)। পেশোয়াদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্রের সংকলন তিনি ৪৫ খণ্ডে প্রকাশ করেন (Selections from the Peshwa Daftar)। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট-দের চিঠিপত্রের সংকলন Poona Residency Correspondence তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এগুলির মূল্য কম নয়। **আচার্য যদুনাথ সরকার** (১৮৭০-১৯৫৮) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। গবেষণা-সূত্রে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, যদিও সর্ববিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ যদুনাথ মনে করতেন পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) অহমদ শাহ্ আবদালির কাছে মারাঠাদের পরাজয় ছিল একটি জাতীয় বিপর্যয়। কিন্তু সরদেশাই তা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ছিলেন না। এই ঘটনার অল্পকাল পরে পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ে মারাঠা বাহিনীর উত্তর ভারত অভিযানে এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন। সরদেশাইয়ের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য মারাঠা জাতির প্রতি ভালোবাসা। মারাঠাদের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন। মারাঠাদের রাজনৈতিক শক্তি স্থায়ী না হওয়ার ব্যর্থতায় দুঃখ শোক লেখায় প্রকাশ পায়।

১১.২ স্বর্ণযুগের সন্ধানে

বাস্তবের সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে মানুষ অতীতের দিকে তাকাতে ভালোবাসে। যদি সে অতীত হয় এমন যা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহান, তবে তাকে নিয়ে গর্ব করা হয়। ইতিহাসে তাকে আমরা বলি স্বর্ণযুগ। এমনই বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে পনের শতকের ইউরোপ তাকিয়েছিল প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের দিকে। রেনেসাঁস যুগে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে এই দুই ধ্রুপদী সংস্কৃতির অবদান অপরিসীম। মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ তাদের এই মহান উত্তরাধিকারের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। কন্সটান্টিনোপল শহরে সঞ্চিত এই জ্ঞান-ভাণ্ডার ইউরোপীয়দের সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল পনের শতকের মধ্যভাগে, কৃষ্ণ সাগর তীরে অবস্থিত ঐ শহর ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা অধিকার করার পর। গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপ নিজেকে আবিষ্কার করে। মধ্যবর্তী শতকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের আখ্যা লাভ করে (Dark Ages)। গ্রীক ও লাতিন ভাষাজ্ঞান ব্যতীত মানবিকী বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে বলে ইউরোপীয়রা মনে করত না। আঠার শতক পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। ভারততত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম যুগের প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা এমন এক সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করেছিলেন যার মাহাত্ম্য ইউরোপীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের সাধনার কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ)

বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতীয় ইতিহাসে "স্বর্ণযুগ" বলতে আমরা সাধারণত গুপ্ত যুগকেই বুঝি। ("For historians writing in the early twentieth century, the 'golden age' had to be a utopia set in the distant past, and the period chosen by those woring on the early history of India was one in which Hindu culture came to be firmly established."- A History of India, **Romila Thapar**)। ভিনসেন্ট স্মিথ,— যিনি সমুদ্রগুপ্তকে ভারতীয় নেপোলিয়ন ("Indian Napoleon") বলেছিলেন,— গুপ্ত যুগকে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় এবং স্টুয়ার্ট যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন ("a time of exceptional intellectual activity in many fields–a time not unworthy of comparison with the Elizabethan and the Stuart period of England." Smith, *Early History of India)*। **বার্নেট** গুপ্তযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিস-এর যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুপ্ত যুগ সংক্রান্ত আলোচনায় এই ধারণাই

অসাধারণত অনুস্যূত হয়েছে।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। গুপ্ত সম্রাটরা কেবল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কবি ও সুপণ্ডিত। সমুদ্রগুপ্ত **'কবিরাজ'** উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সভাকবি হরিসেণের এলাহাবাদ-প্রশস্তি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এ যুগে পুরাণসমূহ রচিত ও স্মৃতিশাস্ত্র সংকলিত হয়। সম্ভবত মহাভারত এই সময় নতুন করে পরিমার্জিত হয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছিলেন। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটির* এবং বিশাখাদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* নাটক এ যুগের রচনা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য ভিন্ন না হলে মহাকবি কালিদাস একালেই তাঁর রচনা প্রণয়ন করেন। তাঁর *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, রঘুবংশম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মেঘদূতম,* প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে পক্ষিলস্বামিনের *ন্যায়সূত্র*, বসবন্ধুর *পরমার্থসপ্ততি,* দিঙ-নাগাচার্যের *প্রমাণ সমুচয়* এই যুগের মূল্যবান ফসল। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের রূপকার ছিলেন বিষ্ণুশর্মা, দণ্ডি ও দশকুমার।

গুপ্তযুগে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন (৪৭৬ খ্রিঃ) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে, তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। **সূর্যসিদ্ধান্ত** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এ যুগের অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **বরাহমিহির** ও **ব্রহ্মগুপ্ত**। দশমিকের ব্যবহার গুপ্ত যুগেই প্রচলিত হয়। সুশ্রুত ছিলেন একালের অসাধারণ শল্য চিকিৎসক। অনেকে মনে করেন, কিংবদন্তী **ধন্বন্তরীর** আবির্ভাব এই সময়ে ঘটেছিল। দিল্লির লৌহস্তম্ভ এ যুগের ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। দীর্ঘকাল উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্তম্ভগাত্রে এখনও মরচে ধরে নি। গুপ্তযুগের অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও তামার মূর্তি পাওয়া গেছে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পে গুপ্তযুগের অবদান অবিস্মরণীয়। গুহামন্দির নির্মাণে গুপ্তযুগের শিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন; অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইট-পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ গুপ্ত যুগে শুরু হয়। মণিনাগের মন্দির এবং দেওঘরের দশাবতার মন্দিরের শিল্পকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **স্যার পার্সিব ব্রাউনের** মতে, দেওঘরের দশাবতার মন্দিরটি গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন। **ভিনসেন্ট স্মিথ** বলেন, "স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা— এই তিনটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল গুপ্তযুগে।" **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে গুপ্তভাস্কর্য আক্ষরিকভাবেই ভারতীয় ও ধ্রুপদী। সাঁচী, সারনাথ ও মথুরায় প্রাপ্ত বুদ্ধিমূর্তি এ যুগের ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। সারনাথের বুদ্ধমূর্তির মধ্যে এক অপূর্ব প্রশান্তির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের মূর্তিগুলির অঙ্গ-সংস্থাপনের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। অজন্তা গুহার প্রাচীর গাত্রে যে-সব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, সেগুলি রঙে, রেখায় ও ভাব-মাহাত্ম্যে সর্বকালের মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। "মাতা ও পুত্র", "হরিণ চতুষ্টয়", "বোধিসত্ত্ব চক্রপাণি" ইত্যাদি গুহাচিত্রগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। বাঘগুহার প্রাচীর চিত্রগুলিও অনবদ্য।

গুপ্ত যুগকে "স্বর্ণযুগ" বলা কতখানি সঙ্গত এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ক্ষেত্র বিশেষে সংশয় প্রকাশ করেছেন। **অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম** বলেছেন পূর্ব ও পশ্চিমদেশে বহু ঐতিহাসিক অতীত ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সন্ধান করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে অতীতের পর্যালোচনা করে মানুষ পারে ভবিষ্যতকে আরও উন্নত করে তুলতে। ("Too many historians in East and West alike have looked back to vanished golden ages, and tried to build Utopias in the past; but man can only create a better future for himself by looking the past squarely in the face."–A. L. Basham, *Foreword* to the book *Economic life in Northern India in the Gupta Period* by S.K. Maity) অনুরূপভাবে অধ্যাপক **দ্বিজেন্দ্র**

নারায়ণ ঝা মন্তব্য করেন,— উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের কাছে ইতিহাসের সব যুগই স্বর্ণময়, সাধারণ মানুষের কাছে নয়। জনসাধারণের স্বর্ণযুগ, অতীতে নয়, ভবিষ্যতে নিহিত। ("for the upper classes all periods in history have been golden; for the masses none. The truly golden age of the people does not lie in the past, but in the future."–D. N. Jha, *Ancient India : An Introductory Outline)* প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, গুপ্ত যুগে হিন্দু সভ্যতার চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল, এমন ভাবা ভুল। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে এযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চোখে পড়ে যথাক্রমে অজন্তার গুহাভ্যন্তরে এবং সারনাথে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পকর্ম বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পাঁচটি প্রচলিত শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি গ্রীক পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। জ্যোতিষ চর্চার প্রতি বরাহমিহিরের ঝোঁক বিজ্ঞানমনস্কতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। গুপ্ত যুগের অনেক আগে থেকেই পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। গুপ্ত যুগে তা বর্তমান রূপ লাভ করে। গুপ্ত সম্রাটরা— বিশেষত সমুদ্রগুপ্ত— তিনজেরাই শিলালেখে নিজেদের প্রশস্তি করেছেন। সংস্কৃত কাব্য বা নাটকে গুপ্ত সম্রাটদের গুণ কীর্তন করা হয়নি। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে শুঙ্গ রাজাদের কথা প্রচার করা হয়েছে, বিশাখাদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*-এ প্রধান চরিত্র চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। পুরাণে গুপ্ত রাজাদের "ম্লেচ্ছ প্রায়" বলা হয়েছে। এর থেকে আমরা সমাজে তাদের নিচুতে অবস্থানের কথা বুঝতে পারি।

গুপ্ত যুগের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এ সময়ে জাতিভেদ এবং বর্ণব্যবস্থাপ্রথা পূর্বের তুলনায় অধিক জটিলতা প্রাপ্ত হয়। নাটকের ভাষা ব্যবহারে সামাজিক বৈষম্য প্রকাশ পায়। অভিজাতদের ভাষা সংস্কৃত। প্রাকৃত ছিল সাধারণের ভাষা। সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে পুরুষ শাষিত। স্ত্রীলোক এবং সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থার অবনতি হয়। ফা-হিয়েন চণ্ডালদের অবস্থার অবনতি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। ভূমিদাস প্রথার সূচনা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ় ছিল বলা যায় না। গুপ্ত যুগে আর্থিক সমৃদ্ধি আগের মতো ছিল না। উজ্জয়িনী কিংবা কনৌজের মতো গুপ্ত যুগের প্রসিদ্ধ শহরগুলির বৈভব ছিল মৌর্যদের রাজধানী পাটলিপুত্র অপেক্ষা কম। শিল্প-সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। লোক শিল্পের নিদর্শন যেমন মাটির মূর্তি কিংবা বাসন কম সংখ্যায় দেখা যায়। স্বর্ণমুদ্রার প্রাচুর্য থাকলেও রৌপ্যমুদ্রা, দিনার প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি দেখা যায়।

ওপরের সমালোচনাগুলি কতখানি যথার্থ সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে "হিন্দু যুগ" বলে চিহ্নিত করা ভুল হবে। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়গুলির অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার ক্রমবিকাশকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু, ইতিহাসের কোনও পর্বকে আমরা যখন "স্বর্ণযুগ" আখ্যায় ভূষিত করি, তখন তার কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়। গুপ্ত যুগের শিল্প-সাহিত্য সে মর্যাদা বহন করে। যা প্রকৃতই শ্রদ্ধেয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেবলমাত্র নেতিবাচক দিকগুলি যদি আমরা তুলে ধরি, তবে বিচারে ভারসাম্য বজায় থাকে না। গুপ্ত যুগের মূল্যায়নে সে ভুল যেন আমরা না করি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এখনও পৃথিবী থেকে দূর হয়নি। গুপ্তযুগে এরূপ ভেদ ছিল না, এমন দাবি কেউ করবেন না। কিন্তু সে সময়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিস্তার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিতর্কিত। (পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ছেদ পড়লেও দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় নতুন বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে, বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল বলা যাবে না। গুপ্ত যুগে নগরের অবক্ষয় প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পাটলিপুত্র পূর্বের গৌরব হারালেও কনৌজ এবং থানেশ্বর গুরুত্ব অর্জন করে। কাশী এবং মথুরা বস্ত্র ব্যবসায় এবং মন্দির নগরী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়। হরিদ্বার ছিল তীর্থস্থল। গুপ্তযুগের নিদর্শন হিসাবে তামা ও লোহার বহু

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গৃহকর্মে নলযুক্ত পাত্র (spouted pottery) ব্যবহৃত হত। **রমিলা থাপার** মনে করেন, এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব গুপ্ত যুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে, এই সভ্যতার ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই তার বিকাশ ঘটে। বিন্ধ্য পাহাড়ের দক্ষিণে সভ্যতার অধিক বিকাশের জন্য আমাদের গুপ্ত-পরবর্তী যুগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

১১.৩ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা এবং রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম যুগের জাতীয়াতাবাদীদের অন্যতম অবদান বোধহয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা। ওপনিবেশিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনভাবে এ দেশের রূপান্তর ঘটানো হচ্ছিল বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন ঃ- (১) এদেশকে ব্রিটেনের কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত করা, (২) এদেশকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজাররূপে ব্যবহার করা, এবং (৩) ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে এ দেশকে কাজে লাগানো। একদিকে দেশের পুরনো হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন এবং অন্যদিকে আধুনিক শিল্পবিকাশে সরকারের অনীহার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতের রেলপথ, চাবাগিচা, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে লগ্নি করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি আমদানি করা হচ্ছিল, তাঁরা তার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে, গ্যারান্টি বা ঋণের ব্যবস্থা করে কিংবা সরকারি অর্থপুষ্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করুক। বিদেশে ধারের ব্যবস্থা করে দেশী শিল্পকে সে মূলধন ধার দেওয়াও সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। ইস্পাত, খনি প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করার সামর্থ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের তখনো হয় নি। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নতির স্বার্থে কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন সরকার উদ্যোগী হয়ে এ-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তুলুন। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ সম্প্রসারণও তাঁরা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতির স্বার্থে কংগ্রেসী নেতারা স্বদেশি ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এর ফলে অনেক স্বদেশি দোকান খোলা হয়েছিল। **গণেশ বাসুদেব** যোশি যখন ১৮৭৭ সালের রাজদরবার পরিদর্শন করেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নিখুঁত হাতে বোনা খাদি। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে একটি বড়ো স্বদেশি আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছিল। ছাত্রেরা সেখানে প্রকাশ্যে বিদেশি কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করে। ভারতে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক রহিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন, জাতীয়তাবাদীরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। বস্ত্রশিল্পের উপর কর চাপানোর নীতির বিরুদ্ধে ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন চলে। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ কী তা ভারতবাসীর কাছে এই আন্দোলনের ফলে ধরা পড়েছিল এবং দেশব্যাসী জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরাও আরও কতকগুলি দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভূমিরাজস্বের অত্যাধিক চড়া হার কমিয়ে আনা হয় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কৃষিব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার চাষীদের যাতে সুলভে ঋণ দেয় সে জন্য তাঁরা সরব হয়েছিলেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁরা সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন। আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসম্পর্কের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে ব্রিটিশ সরকার আগ্রহী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। আন্দোলনের আর একটি লক্ষ্য ছিল চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন। তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থা ও সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা চেয়েছিলেন আমূল পরিবর্তন। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বিশেষ করে যে-সব করের বোঝা বইতে হত (যেমন লবণ শুল্ক)

সেগুলি তুলে দেওয়ার দাবি তারা জানান।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রকৃতি বোঝাতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান উদ্ধার করে তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন কিভাবে ভারতের অর্থসম্পদ ও মূলধনের একটি বড়ো অংশ নানা পথে এদেশ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। এজন্য তাঁরা "সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব" বা "ড্রেন থিয়োরি" অবলম্বন করেন। একটি বড়ো অংশ নানা পথে এদেশ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। **দাদাভাই নৌরজী** (১৮২৫-১৯১৭) তাঁর *Poverty and Un-British Rule in India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে এদেশে অসংখ্য ব্রিটিশ কর্মচারীর বেতন ও অবসরবৃত্তি এবং ব্রিটিশ পুঁজির লভ্যাংশ সুদ সমেত প্রতি বছর ৩০,০০০,০০০ বা ৪০,০০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ সম্পদ ভারত থেকে ব্রিটেনে চলে যায় অথচ অসংখ্য ভারতবাসী অনাহারে মারা যায়।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা **রমেশচন্দ্র দত্ত** (১৮৮৪-১৯০৯)। এই প্রসঙ্গে অন্য যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন রানাডে জি. ভি. যোশী, জি. এস আইয়ার প্রমুখ। দাদাভাই নৌরজীর বক্তব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮৬৯ সালে রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ সালে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে তিনি বিলেতে যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করেন। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ শুরু হলে ARCYDAE ছদ্মনামে তিনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকার প্রজাস্বত্ব বিষয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনা করেন। *The Peasantry of Bengal* গ্রন্থে কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। ব্রিটেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর *England and India–A Record of Progress during Hundred years* নামক গ্রন্থে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র ছিলেন সেকালের অন্য নেতাদের মতো মডারেট। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রধানত জমিতে অত্যধিক করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর *Open Letter to Lord Curzon on Famines and Assessments in India* নামক গ্রন্থে সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্বের অপব্যবহারের সমালোচনা করেন। রমেশচন্দ্রের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস *(Economic History of India)*। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রথম খণ্ডের (১৯০২) বিচার্য। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের অর্থনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

চাকরি সূত্রে রমেশচন্দ্র পঁচিশ বছরের অধিক সময় বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিক্রমণ করেন। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর অক্লান্ত অনুসন্ধান। তিনি প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবরণী (Parliamentary Paper), বিভিন্ন সরকারি কমিশনের বিবরণ এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মন্তব্য থেকে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র তিনি বিশেষ ব্যবহার করেননি। প্রথম খণ্ডের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে কোম্পানি আমলে ভারতে ভূমি ব্যবস্থার আলোচনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাংলায় ভূমি রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারিত, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ এখানে কম। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে ত্রিশ বছর অন্তর জমির নতুন বন্দোবস্ত হয়, ভূমি রাজস্বের হার অত্যধিক এবং অনিশ্চিত। "অর্ধ ভূমিকরের নিয়ম" (Half Rental Rule) শুধু কাগজের পত্রে; বাস্তব অবস্থা এই যে নতুন নতুন কর চাপিয়ে "কৃষক"-এর কাছ থেকে বেশি কর আদায় করা হয়। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনের "ল্যান্ড রেজলিউশন" উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জমিদারের উপর ভূমিকর গড় আয়ের অর্ধেকের থেকে কম; অযোধ্যায় ভূমিকর গড় আয়ের শতকরা ৪৭ অংশ, উড়িষ্যায়

তা ৫০ ভাগের কিছু বেশি। শহরে ব্রিটিশ বণিকদের বিরোধিতার কারণে ব্যবসায়ীদের উপর কর বসান হয়নি— "কৃষকদের" উপর করের বোঝা চাপানো হয়েছে। ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটির (Dufferin Enquiry Committee, 1888) বিবরণী থেকে তথ্য উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র ভারতবাসীর, বিশেষত কৃষক সমাজের, চরম দারিদ্র্যের নির্দেশ করেছিলেন। রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় কৃষক শ্রেণী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। গরীব কৃষকরা সংখ্যাধিক। তাদের জীবন ধারণের মান খুব নিচু। গ্রামের মানুষদের একটি বড় অংশ জমিহীন ক্ষেতমজুর। এটোয়ার কলেক্টর লিখেছিলেন, ক্ষেতমজুরের মাসিক আয় তিন টাকার বেশি নয়। গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ঋণে নিমজ্জিত। ব্রিটিশ শিল্পের জন্যে কাঁচা মালের উৎপাদন এবং ভারতে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় রমেশচন্দ্রের মতে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক নীতির দ্বিবিধ লক্ষ্য। এর ফলে ভারতে প্রাচীন শিল্পগুলি ধ্বংস হয়। লক্ষ লক্ষ কারিগর বাস্তুচ্যুত হয়ে কৃষিতে সংস্থান খোঁজে। জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অতীতে ভারতের যেসব শিল্পের দেশে-বিদেশে কদর ছিল, কোম্পানির আমলে সেগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া (de-industrialisation) রমেশচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেন।

বার্ক-এর বিখ্যাত Ninth Report অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র "নির্গম তত্ত্ব" ব্যাখ্যা করেন। বাংলার রাজস্বের একটি অংশ ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্য কেনার কাজে ব্যয় হয় (investment)। এইভাবে ভারতের সম্পদ বাইরে চলে যায়। বিনিময়ে ভারত কিছু পায় না। ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ রমেশচন্দ্রের মতে এই সম্পদ নিষ্কাসনকে দায়ী করেন। ১৭৯২ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে মোট উদ্বৃত্ত রাজস্ব ছিল ৪৯ মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু এই অর্থ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে কোম্পানির অংশীদারদের "ডিভিডেন্ড" বা লভ্যাংশ মেটাতে ইংল্যান্ডে চলে যায়। এর ওপর ছিল জাতীয় ঋণ, যার ক্রমবর্ধমান সুদের অংক ভারতের করদাতাদের বহন করতে হত। রমেশচন্দ্রের আক্ষেপ ঃ "ভারতের রাজসূর্য যে অর্থ বাষ্প সৃষ্টি করছে তা ভারতে বৃষ্টির মত না পড়ে অন্য দেশে ঝরে পড়ছে, অন্য দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।"

অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে রমেশচন্দ্র রেলওয়ে বনাম সেচ বিতর্কের অবতারণা করেছেন। রেলওয়ে স্থাপনের দায়িত্ব সরকার বিদেশি কোম্পানির উপর ন্যাস্ত করে। লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে সরকারি তহবিল থেকে এই কোম্পানিগুলির মূলধনের সুদ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি সরকার দেওয়ায় বিপুল অর্থের অপচয় হচ্ছিল। ভারতে রেলপথ বিস্তারের পিছনে শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বাজার বিদেশি পণ্যের কাছে উন্মুক্ত করা। ফলে দেশজ শিল্পগুলির বাজার বিনষ্ট হল। রেলওয়ের প্রসার বন্ধ করে সেচের উন্নতির জন্য অধিক অর্থ বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন রমেশচন্দ্র। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন, সেচের উন্নতি কৃষির উন্নতির সহায়ক, এবং ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। রেলপথ নির্মাণ এবং সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "হোম চার্জেস" বেড়ে যাচ্ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ ছিল ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড। জাতীয় ঋণ একই সঙ্গে স্ফীত হচ্ছিল, ১৮৭৭ থেকে ১৯০০ সনের মধ্যে তা ১৩১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২২৪ মিলিয়ন পাউন্ড হয়েছিল। এই পর্বে আফগান যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ "If manufactures were crippled, agriculture over-taxed, and a third of the revenue remitted out of the country, any nation on earth would suffer from permanent poverty and recurring famines."

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়েছিল, রমেশচন্দ্র তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৭১ সনের পর থেকে পাউন্ডের তুলনায় টাকার দর দ্রুত কমতে থাকে। হোমচার্জেস মেটাতে পরিণামে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ে। ফাউলার কমিটির (Fowler Committee, 1898-99) কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্যে রমেশচন্দ্র টাকার দর কৃত্তিমভাবে বৃদ্ধি করবার বিরোধিতা

করেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল টাকার দর বাড়লে মহাজনের সুবিধা, অন্যদিকে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষেতমজুর মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা তাদের ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে। সমস্যার আসল সমাধান "হোম চার্জেস" হ্রাস করা, কেননা এই পাওনা পাউন্ডে মেটাতে হয় এবং টাকা বিদেশে চলে যায়।

রমেশচন্দ্র ছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে পরিচালিত ব্রিটিশ শুল্কনীতির কঠোর সমালোচক। ১৮৮২ সালে বিদেশি পণ্যের উপর শুল্ক-কর তুলে নিয়ে সরকার অবাধ বাণিজ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই নীতি ছিল ভারতীয় মূলধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই এবং আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থবিরোধী। ১৮৯৪ সালে সরকার বিলিতি কাপড় এবং সুতোর ওপর ৫% শুল্ক বসায়। ১৮৯৬ সালে তা প্রত্যাহার করা হলেও বিদেশী বস্ত্রের ওপর ৩$^{১}/_{২}$% আমদানি শুল্ক এবং দেশি বস্ত্রের ওপর একই হারে উৎপাদন শুল্ক বসান হয়। ভারতীয় মালিকরা ছিল শিশু বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষক। সেখানে সরকারের এরকম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ রমেশচন্দ্র না করে পারেননি।

ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য রমেশচন্দ্র নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রস্তাব দেন

১। ভূমি রাজস্ব হ্রাস।

২। ভূমি রাজস্ব ব্যতীত জমির ওপরর অন্য সব কর বিলোপ।

৩। সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারের অধিক অর্থ বরাদ্দ।

৪। রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণে অহেতুক ব্যয় নিষিদ্ধকরণ।

৫। ভারতের সামরিক ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ।

৬। ব্রিটেন এবং উপনিবেশগুলির মধ্যে সামরিক ব্যয় বন্টন।

৭। ভারতীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে বে-সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস।

৮। ভারতীয়দের বস্ত্রশিল্পের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার।

রমেশচন্দ্রের বক্তব্য জাতীয়তাবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আজ শতবর্ষের ব্যবধানে কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডি. আর. গ্যাডগিল বলেছেন ঃ- "Dutt does not appear to pay much attention to the positive aspects of State policy and action. Indeed, his insistent complaints about high taxation and the level of Government expenditure would indicate a preferencefor a lessening of Government activity and outlay." রেলওয়ে, সেচ, রাস্তা, সেতু, সরকারী বাড়ী নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগ উনিশ শতকের শেষার্ধে এক নতুন নীতির সূচনা করেছিল, রমেশচন্দ্র যার গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি নয়, ব্যয় সংকোচনের তিনি সমর্থক। সরকারি বিনিয়োগ এবং সরকারি উদ্যোগের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাননি বলে মনে হয়। সেচ বনাম রেলওয়ে বিতর্কটি ছিল অনাবশ্যক। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। ব্যয় সংকোচনের নীতি দেশের কৃষিপ্রধান অনগ্রসর কাঠামোকে বজায় রাখতে সাহায্য করত। সন্দেহ নেই, ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্য্যায়ে সরকারী নীতি বিদেশী সংস্থাগুলি পাহাড় প্রমাণ মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরে রেলপথের অবদান কম নয়। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির সুপ্ত

সম্ভাবনা তা বাস্তবে খুলে দিয়েছিল। কয়লা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। রেলপথ এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ কর্ম সংস্থাপনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ভারতে রেলপথ হবে "আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত"— মার্কসের বিখ্যাত উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়।

"হোম চার্জেস"প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের সমালোচনা সম্পূর্ণ গ্রহণ সম্ভবযোগ্য। তিনি একে "অর্থনৈতিক ড্রেইন" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু "হোম চার্জেস"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল রেলপথ নির্মাণ বাবদ ঋণের সুদ এবং ভাণ্ডার (stores) কেনার টাকা। মেইজি পর্বে জাপানও বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছিল, সুদের টাকা তাকেও গুণতে হয়েছিল। যা সত্যই সমালোচনার বিষয় তা হ'ল রেলওয়ে নির্মাণের সরঞ্জাম বিদেশে কেনার নীতি, ভারতে এই সরঞ্জাম নির্মাণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনীহা। সমগ্র ঔপনিবেশিক পর্বে এই নীতি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল; ভারতে ইঞ্জিন তৈরির কাজ শুরু হয় স্বাধীনতার পরে।

ভাণ্ডার ক্রয় (Stores purchase) নীতি রমেশচন্দ্র বিবেচনা করেননি। রেলপথ সড়ক, সেতু, পোতাশ্রয়, বন্দর বাড়ি ও সেনানিবাস প্রভৃতি নির্মাণের কাজে সরকারের ভাণ্ডারে রক্ষিত পণ্য ব্যবহৃত হত। রিপনের সময় থেকে ভাণ্ডার ক্রয় নীতির কঠোরতা শিথিল হতে আরম্ভ করলে দেখা গেল যে কয়েকটি ভারতীয় শিল্প— যেমন কাগজ শিল্প, পশম শিল্প, চামড়া শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প— লাভবান হয়। সরকারকে মাল সরবরাহ করে এই শিল্পগুলি নির্দিষ্ট মুনাফা লাভের সুযোগ পেয়েছিল। বিদেশি প্রতিযোগিতার মুখে দেশের সংকুচিত বাজারের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়নি। দেশের বাইরে ভাণ্ডার ক্রয়ের দাবি তাই সমসাময়িক সংবাদপত্রে এবং ভারতীয়দের লেখায় ও বক্তৃতায় বার বার উঠেছিল।

"কৃষক" বলতে রমেশচন্দ্র বুঝতেন যে রায়ত ভূমি-রাজস্ব দেয়। কিন্তু যে কৃষক জমির মালিককে খাজনা (rent) দেয়, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি যায়নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যায় বেড়ে চলেছিল; ঋণের দায়ে জমি বিক্রির ঘটনা তখন ব্যাপক। কৃষকদের একটি অংশ হয়ে পড়েছিল জমিহীন ক্ষেতমজুর। ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটির বিবরণে এই অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছিল। ভূমিকর হ্রাসের যে দাবি রমেশচন্দ্র করেছিলেন কৃষকদের এই অংশকে (অর্থাৎ যারা খাজনা দিত, অথবা যারা ক্ষেতমজুর) তা স্পর্শ করত না। বাংলায় কৃষি ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে জমিদার হয়ে উঠেছিল খাজনা আদায়কারী। অজস্র মধ্যসত্ত্বভোগীর আবির্ভাব হয়, কৃষকদের কাছ থেকে অত্যধিক খাজনা আদায়ে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। মহাজনী কারবার এবং বর্গা প্রথা পরিণামে বিস্তার লাভ করে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় কৃষকদের যে রঙিন চিত্র রমেশচন্দ্র এঁকেছেন তা কেবল তাঁর কল্পনাতেই ছিল।

১১.৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস এবং পর্ব বিভাজন সমস্যা

১৯১৭ সালের বলশেভিক সাফল্যে অসংখ্য মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র শোষণহীন নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মার্কস এবং এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (১৮৪৮) রচনার মাধ্যমে সর্বহারাদের শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (dialectical materialism)। ইতিহাসে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁরা বলেন, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। উৎপাদন পদ্ধতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা সম্পদের

অধিকারী। সাধারণ মানুষকে শোষণ করে তারা বিত্তবান হয়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষণানুযায়ী মার্কস এ পর্যন্ত ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেন— যেমন আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদ। প্রতিটি ব্যবস্থাই নিজের সংকটের বীজ বহন করে। যারা সম্পদের মালিক তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে অন্য শ্রেণী। মার্কসের মতে শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে এবং এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। আন্দোলন পরিচালনায় পার্টির বিশেষ দায়িত্ব আছে।

মার্কসবাদ কেবল তত্ত্বকথা নয়। বরং মার্কস বলেন— ১১এ পর্যন্ত দার্শনিকরা সমাজে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু মূল কর্তব্য হল সমাজের পরিবর্তন সাধন। এখানেই মার্কসবাদের বিশেষত্ব। মার্কসীয় তত্ত্বের সারমর্ম বোঝাতে এঙ্গেলস এক চিঠিতে বলেছিলেন— রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ক্রমবিবর্তন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে, আবার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকেও। এমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই হল কারণ, একমাত্র তা-ই সক্রিয়, বাকি সবকিছু নিষ্ক্রিয় পরিণাম। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বরং ঘটে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, যা চূড়ান্ত নির্ণায়ক। ("Political, juridical, philosophical, religious, literary artistic etc. development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic basis. It is not that the economic situation is the *cause, solely active,* while everything else is only passive effect. There is, rather, inter-action on the basis of economic necessity, which ultimately always asserts itself."- Engels to W. Borgius, 25 January, 1894, quoted in Karl Marx and Frederick Engels, *Collected works,* 1970, 694)

১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাসখন্দে (বর্তমান উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী, আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত), প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি শুরুতে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯২০) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **মানবেন্দ্রনাথ রায়** (১৮৮৭-১৯৫৪) লেনিনের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। লেনিন ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। অপরদিকে রায় বলেন, গান্ধী আন্দোলন জনগণের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, বুর্জোয়া নেতৃত্বে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। ১৯২২ সালে তাঁর লেখা *India in Transition* গ্রন্থে এই মত প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথ প্রদর্শক এস. এ. ডাঙ্গে। *Gandhi vs Lenin* নামে একটি গ্রন্থে (১৯২১) ইতিমধ্যেই লেনিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নেতা হিসেবে গান্ধীজির সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি এসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। প্রথম কয়েক বছর এই দায়িত্ব পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন **সাপুরজি সাখলাতওয়ালা** (১৮৭৪-১৯৩৬)। তিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ক্রমশ তাঁর স্থান গ্রহণ করেন রজনী পাম দত্ত (১৮৯৬-১৯৭৪)। তাঁর বিখ্যাত রচনা *India Today*। ১৯৪০ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলিতে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে সমকালের ঘটনা এই গ্রন্থে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। দত্ত ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সমর্থনে মিটিং করার অভিযোগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বসার বিশেষ অনুমতি লাভ করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের

কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা প্রকাশ এবং সম্পাদনায় তিনি দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটেনে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে তাঁর বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন— যেমন সজ্জাদ জহীর, জেড. এ. আহমদ, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। দত্তর বক্তব্য মার্ক্সবাদী মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কংগ্রেসে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বিবিধ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব যেমন এই শ্রেণী গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে সেই আন্দোলন যাতে চরম আকার ধারণ করে কায়েমী স্বার্থের বিপদ না ঘটায় সেদিকে তারা লক্ষ্য রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে বলে দত্ত মনে করতেন। "Two-fold or vacillating role of the Indian bourgoesie and desiring to lead the Indian people, yet fearing that 'too rapid' advance may end in destroying its privileges along with those of the imperialists.

"This contradiction reached its culmination in the period of revolutionary upsurge after the second world war, when the leadership of the National Congress reached what they declared to be a final settlement with imperialism by the acceptance of the Mountbatten Award for the partition of India and the establishment of the Dominions of India and Pakistan." ***(R. P. Dutt, India Today Chap. X)***

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১)। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি "যুগান্তর" গোষ্ঠির সদস্য ছিলেন। ১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের মুখপত্র *সাপ্তাহিক যুগান্তর* পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ সালে তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এক দশকের অধিককাল প্রবাসে জীবনযাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে বিপ্লবী **গদর দল** এবং নিউইয়র্কের **সোসালিস্ট ক্লাবের** সংস্পর্শে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিন শহরে ভারতীয় বিপ্লবীদের গঠিত **বার্লিন কমিটির** তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২ সালে নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম জার্মানীর হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রিতে ভূষিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে কমিউনিস্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আমন্ত্রণে তিনি মস্কো শহরে যান। সেখানে ভারতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেন। এই পরামর্শ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা **সরোজ মুখোপাধ্যায়** (১৯১১-১৯৯০) বলেন— "১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল এই গুরুত্বপূর্ণ দশটি বছর বাংলার বুদ্ধিজীবী স্বদেশী মহলের কাছে রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।" উপরন্তু— "তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলার যুব সমাজ সমাজতন্ত্রবাদের দীক্ষিত হয়ে উঠেন।" (**সরোজ মুখোপাধ্যায়,** *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ও আমরা, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)।

ভূপেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেকে সীমিত রাখেননি। ১৯২২ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম সংক্রান্ত একটি কার্যক্রম পেশ করেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে শ্রমিক-কৃষকদের মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। বঙ্গীয় কৃষক সভার তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি দুবার সভাপতিত্ব করেন। বাংলায় তিন খণ্ডে *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* তাঁর বিখ্যাত রচনা। *Dialectics of Hindu Ritualism* এবং *Dialectics* of *Land Economics of India* নামে দুটি ইংরেজি গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর

ধারণা ব্যক্ত করেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস পুনরুদ্ধারে একটি বড় অসুবিধা হল নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব। ভূপেন্দ্রনাথ এই অভাব পূরণের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য এবং শিলালেখের ওপর বিশেষ নির্ভর করেন। গবেষণা মাধমে তিনি প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। ঋগ্বেদে শাসকদের ভূমিদানের ফলে ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে দেখি, *মঘবান এবং মহাকুল* প্রভৃতি শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর Indian Polity গ্রন্থে ভূপেন্দরনাথ এইভাবে নির্দেশ করেন ঃ- **মহারাজাধিরাজ → মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্ত, মহামণ্ডলিক** (অর্থাৎ সামন্ত প্রভু) **→ সামন্ত, মণ্ডলিক, মণ্ডলাধিপতি, মণ্ডলপতি, মণ্ডলেশ্বর** (মণ্ডল অর্থ রাষ্ট্রের একাংশ) → **ভুক্তিপতি** (ভুক্তি অর্থ প্রদেশের অংশবিশেষ) **মহাভোগপতি, ভোগপতি, মহাভোগিক, ভোগিক → বিষয়পতি** (অর্থাৎ জেলাপ্রধান), **গ্রামপতি → ষষ্ঠাধিকৃত** (অর্থাৎ যিনি রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করতেন) → **ভোজক** (সম্ভবত নিষ্কর জমির মালিক) → **কুটুম্বি ক্ষেত্রকর, কর্ষক ক্ষেত্রপ,** (অর্থাৎ, কৃষক যেখানে জমির মালিক) → বর্গাদার → ভূমিহীন কৃষক। সর্বশেষ দুটি স্তরে স্বতন্ত্র উল্লেখ শিলালেখে মেলে না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে ভূপেন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতীয় কৃষক সর্বদাই শোষিত হত।

চতুবর্ণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ নতুন আলোকপাত করেছেন। পুরুষ সুক্ত বাদে ঋগ্বেদে কোথাও চতুর্বর্ণের উল্লেখ নাই। বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন পুরুষ সূক্ত অংশটি প্রক্ষিপ্ত, মূলে ছিল না। বর্ণ এবং বৃত্তির মধ্যে প্রথমে কোন বিভেদ ছিল না। এই কারণে আমরা সব ব্যক্তির সন্ধান পাই যারা নিজেদের বর্ণের পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে নিয়োজিত। ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি একই গোত্রোদ্ভূত হওয়ার মধ্যেও আমরা এই বক্তব্যের সমর্থন পাই। বংশানুক্রমিকভাবে বৃত্তি পালনের মধ্যে দিয়ে বর্ণব্যবস্থা দৃঢ়তা লাভ করে বলে ভূপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ শ্রেণী হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করে। শ্রেণী ছিল পাশ্চাত্য গিল্ডের সমতুল্য। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, শ্রেণী ক্রমশ জাতিতে (Caste) রূপান্তরিত হয়। তবে বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে এর কোন সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ যে জাতিভেদের সহায়ক হয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। মার্কসের শ্রেণী (Class) সংগ্রামের তত্ত্ব ভূপেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। ব্রাহ্মণদের তিনি সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হিসাবে গণ্য করেন। বর্ণভেদ প্রথার সমর্থনে তারা শাস্ত্রের যুক্তি অবতারণা করতেন। রাজশক্তি কিভাবে সামাজিক বর্ণ নির্ধারণ করল *বল্লাল চরিত* গ্রন্থ থেকে ভূপেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ দিয়েছেন। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় অতীতে বৈশ্য-রূপে গণ্য হলেও বল্লাল সেনের বিধানে সমাজে একঘরে হয়ে পড়ে। অথচ কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার এবং কৈবর্ত সম্প্রদায় ঐ একই রাজার কাছ থেকে সৎ-শূদ্রের মর্যাদা লাভ করে। মৌর্য এবং পাল বংশ ভূপেন্দ্রনাথের মতে শূদ্র শক্তির প্রকাশ, থানেশ্বরের মৌখারি বংশকে তিনি বৈশ্য জ্ঞান করতেন। গুপ্ত যুগে তাঁর বিবেচনায় ব্রাহ্মণতন্ত্র চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। এসব সিদ্ধান্ত বিতর্কমূলক। ভূপেন্দ্রনাথের কাছে যে তথ্য ছিল তার সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের অবস্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস রচনায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর পাণ্ডিত্য ও সমাজ সচেতনতা গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস চর্চায় মার্কসবাদীদের অবদান বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো নয়। একজন বামপন্থী গবেষক স্বীকার করেছেন ঃ- ‘‘সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলেও ভারতে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা এর কিছু আগে-পরে সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন, এমন প্রমাণ চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের রেনেসাঁস সম্বন্ধে যেসব মত চালু ছিল তার যথার্থ

বিচারেও কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। সম্ভবত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর অনুরোধক্রমেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং Notes on the Bengal Renaissance নামে কাজ চলার মতো একখানি ইংরাজী পুস্তিকা আমাদের হাতে তুলে দেন। এই পুস্তিকা যত সংক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ হোক না কেন এর জন্য পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই অধ্যাপক সরকারের প্রাপ্য।" (ধনঞ্জয় দাস, *মার্কসবাদী সাহিত্য প্রসঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, ৬৯।) *ইতিহাসের ধারা* নামে বাংলায় অধ্যাপক সরকার প্রণীত অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করতে হয়। সহজ ভাষায় সংক্ষেপে এখানে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসারে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত চরিত্র সম্পর্কে চল্লিশের দশকে আলোচনা করেন **গোপাল হালদার** (১৯০২-৯৩), **বিনয় ঘোষ** (১৯১৭-৮০) এবং **নরহরি কবিরাজ** প্রমুখ। বিদেশ থেকে ফিরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন **হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মহম্মদ হবিব (১৮৯৫-১৯১৭) এই সময়ে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। সুলতানী আমলে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

ইতিহাস চর্চার প্রচলিত ধারার বাইরে অবস্থান করেন দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (১৯০৭-৬৬)। গোয়ার কোসবেন নামক স্থানে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষজ্ঞ। দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা পুত্রের মধ্যে বর্তেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপনা সূত্রে তিনি যুক্ত থাকায় দামোদর উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। বিষয় হিসাবে তিনি ইতিহাস, গণিত এবং ভাষাবিদ্যা নির্বাচন করেন। মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, পালি, আরবী, লাটিন, গ্রীক এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বারাণসী এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে অল্পকাল দায়িত্ব পালনের পর তিনি পুনার ফার্গুসন কলেজে যোগ দেন। কর্মজীবনের দীর্ঘতম (১৯৪৭-৬২) তিনি টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসস্ট্রিয়াল রিসার্চ তাঁকে এমেরিটাস প্রফেসর পদে বরণ করে। কিন্তু পরের বছর অকালে তাঁর প্রয়াণ হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে কোশাম্বী দুটি গ্রন্থ রচনা করেন ঃ *An Introduction to the study of Indian History* (১৯৫৬) এবং The Culture and civilization of Ancient India (১৯৬৫)। Exasperating Essays; Exercises in the Dialectical Method (১৯৫৭) এবং Myth and Reality, Studies in the formation of Indian culture (১৯৬২) নামে দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। প্রথমটিতে তিনটি এবং দ্বিতীয়টিতে পাঁচটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের পথে প্রধান বাধা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতা। আকরিক উপাদানগুলির (সাহিত্য, মুদ্রা, শিলালেখ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি) সমন্বয় ব্যতীত ঐতিহাসিক চিত্র যথাযথভাবে উপাদান ব্যবহারে তাঁর সতর্কতা লক্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলির ওপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন, যেহেতু এখানে প্রাপ্ত তথ্য শিলালেখের দ্বারা সমর্থন করা যায়। তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফল তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। কারণ তিনি মনে করতেন, খাদ্যোৎপাদনে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন হেতু মানুষের শারীরিক গঠনের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার প্রতি নৃতাত্ত্বিকরা উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন না। তবে তিনি মনে করতেন ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রয়োজন। কারণ প্রাচীন কালের সব চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয়নি। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কোশাম্বী জনশ্রুতি এবং কল্পকথাকে (Myth) অবহেলা করেননি, যেহেতু সাধারণের বিশ্বাসের প্রতিফলন তাতে ঘটেছে। *An Introduction to the study of Indian history* ভারতের ইতিহাসের কোন আনুপুঙ্খিক বিবরণ নয়। আলোচনার জন্য ভারত ইতিহাসের

প্রধান ধারাগুলি এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে। দশটি অধ্যায়ে আলোচনা বিভক্ত। বিষয়টির প্রারম্ভিক ধারণা এবং আলোচনা পদ্ধতি বর্ণনার পর সমাজে শ্রেণী বিকাশের পূর্বেকার অবস্থা, সিন্ধু সভ্যতা, আর্যদের আগমন ও বিস্তার, মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার, গ্রামীণ অর্থনীতির সংগঠন, বাণিজ্য ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। *The Culture and Civilization of Ancient India* গ্রন্থে অনুরূপ বিষয় বিন্যাস ঘটান হয়েছে। সাক্ষ্য-সাবুদের অভাবে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রযুক্তিগত বিবর্তন এবং তার অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে কোশাম্বী যথার্থই আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মূল কথা হল সমাজ ও সংস্কৃতির মূলস্রোতে আদিবাসীদের আত্তীকরণ (assimilation)। বিভিন্ন সময় যেসব বিদেশি জনগোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছে উপজাতিদের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের আচারানুষ্ঠান, প্রচলিত বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি।

বিজ্ঞানমনস্কতা কোশাম্বীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সন-তারিখ চিহ্নিত প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি আগ্রহ বোধ করেননি। কারণ শ্রেণীগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব পাল্টায়। একই ঘটনা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান তাৎপর্য বহন করে না। উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন অনুসন্ধানের ওপর কোশাম্বি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মার্কসের সব সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেননি। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি, "ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই, অন্তত জানা এমন কোন ইতিহাস নেই" ("Indian society has no history at all, at least no known history")। এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত কোশাম্বীর রচনা তা প্রমাণ করে। এশিয়া মহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, উৎপাদন ব্যবস্থা নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করেছে— মার্কসের ইত্যাকার বক্তব্য ভারত ইতিহাস সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের ফল বলতেও কোশাম্বী দ্বিধা করেননি। উদাহরণত, হল চাষ প্রবর্তন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। মৌর্য, সাতবাহন এবং গুপ্ত যুগের মতো প্রাচীনকালের সাম্রাজ্যগুলি গ্রাম সমাজের বিকাশের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার এবং সৈন্য বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং কৃষিতে প্রচুর উৎপাদন। না হ'লে রাষ্ট্রের পক্ষে বিরাট রাজস্ব আদায় করা সম্ভব নয়। গুপ্ত যুগে গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে বাণিজ্যিক লেন-দেন ব্যাহত হয়। এই সময় থেকেই ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূচনা। ভক্তি আন্দোলন তাকে আরও সুদৃঢ় করে। গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ বলতে কোশাম্বি অস্বীকার করেন। কবিকুল এবং পুরোহিততন্ত্রের চেষ্টায় তাঁর মতে গুপ্ত যুগ "স্বর্ণযুগ" আখ্যা লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বর্ণযুগ রয়েছে ভবিষ্যতে, অতীত ইতিহাসে নয়। তবে ইতিহাস চর্চা থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি।

কোশাম্বির বক্তব্যের সঙ্গে সব ঐতিহাসিক একমত হবেন আশা করা যায় না। উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তিনি মন্তব্য করেছেন। মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ স্নানাগারকে তিনি মনে করেন পবিত্র জলাধার সংক্রান্ত ধারণার (যেমন পুষ্কর হ্রদ) পূর্ববর্তী একটি নির্দশন। নাগরিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং কৃষির উৎপাদন আনুপাতিক না হওয়ায় সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়েছিল,— কোশাম্বির এই মন্তব্যও কম বিতর্কমূলক নয়। অভ্যন্তরীণ পণ্য বন্টনে মন্দির এবং পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে তিনি মনে করেন। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের জন্য তিনি সঙঘ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন, যেহেতু উৎপাদন তাদের কোন অবদান ছিল না। কোশাম্বী মনে করতেন, সামাজিক সংগঠন উৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক উন্নত হতে পারে না। উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার অধিকারীর পক্ষে কেবল কোন জনগোষ্ঠীর মুখে ভাষা জোগান সম্ভব। এসব সিদ্ধান্তের পিছনে কোন তথ্যগত সমর্থন নেই। কিন্তু

আমরা শুরুতেই বলেছি, প্রচলিত ইতিহাস চর্চার পথ কোশাম্বী পরিহার করেছেন। অনুসন্ধিৎসার ব্যাপ্তি, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনায়াস দখল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা এবং ভাষার প্রসাদগুণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি অনন্য মর্যাদায় ভূষিত।

গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের প্রচলিত পর্ব বিভাজনে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। **জেমস মিল** তাঁর ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে এদেশের প্রাচীন এবং মধ্যযুগকে সর্বপ্রথম "হিন্দু" এবং "মুসলিম" আখ্যা দেন। ব্রিটিশ শাসনকালকে আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, প্রাচীনকালে এদেশে কেবল হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধ, জৈন এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। সিংহাসনেও তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন যুগকে এক কথায় তাই "হিন্দু' বলা সঙ্গত নয়। অনুরূপ আপত্তি "মুসলিম" যুগ নামকরণেও। তাছাড়াও কই, ইংরেজ রাজত্বকালকে তো শাসকদের ধর্মানুযায়ী আমরা "খৃষ্টান" যুগ বলছি না। ইতিহাসের পর্ব বিভাজনের ক্ষেত্রে শাসক বংশ (মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি) কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন জনগোষ্ঠী (যথা রাজপুত কিংবা ইলবরী তুর্ক) বিশেষভাবে উল্লেখ করার রীতিও সুপ্রচলিত। কিন্তু কখন যে একটি যুগ শেষ হয়ে অপর একটির সূচনা হচ্ছে তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর *History of Medieval India* গ্রন্থের শুরু করেন আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় থেকে (৭১২ খ্রিস্টাব্দ)। অথচ বর্তমানে আমরা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতককে "আদি মধ্যযুগ" গণ্য করি। আধুনিক ভারত ইতিহাসের সূচনা কোথা থেকে— ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) না পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) নাকি ১৮৫৭ পর্যন্ত তা বিস্তৃত? দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল দিল্লী সুলতানী প্রতিষ্ঠার বহুদিন পর পর্যন্ত; পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ রাতারাতি ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাচীন ভারতে কাল গণনার রীতি আধুনিক ধারণার সঙ্গে মেলে না। এই অবস্থায় আমরা ভারতীয় ইতিহাসে পর্ববিভাজনের সমস্যার মীমাংসা এখনও করতে পারিনি। নিরবচ্ছিন্ন কাল প্রবাহের কথা স্মরণ করলে এমন বিভাজন আদৌ সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন থেকে যায়।

১১.৫ অনুশীলনী

১) ভারতের স্বর্ণযুগ কোন সময়কে বলা হয় ও কেন বলা হয়?

২) মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস বর্ণনা কিভাবে করা হয়েছে।

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

S.K. Mukhapadhyay - Evolution of Historiography in Modern, India, 1900-1960.

S. P. Sen ed. - Historian and Historiography in Modern India.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত - ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

শ্যামলী সুর - ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত - স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক।

একক ১২ ❑ ঐতিহাসিক বিতর্ক

গঠন

১২.০ প্রস্তাবনা
১২.১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র
১২.২ আঠার শতকের ভারত
১২.৩ অনুশীলনী
১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ প্রস্তাবনা

ভারতের ইতিহাস চর্চায় এখনও যেসব সমস্যার সমাধান হয়নি দুটি উদাহরণ যোগে আমরা সর্বশেষে তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস গতিশীল। নতুন নতুন সমস্যা যেমন তার যাত্রাপথে আত্মপ্রকাশ করে, সেরকম আলোচনা ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়। লিঙ্গভেদ এবং পরিবেশ চেতনা দুটি প্রধান বিষয় হিসেবে ইদানীং বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। ভবিষ্যতে আশা করা যায় অনেক আরও অভিনব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। ইতিহাস রচনার অতীত পশ্চাৎপট মনে রাখলে সাম্প্রাতিক ধারা বোঝা সহজ হবে, এই আশায় বর্তমান পাঠসহায়িকা প্রস্তুত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে।

১২.১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। মার্কস মনে করেন ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে দাস ব্যবস্থার অবসানে তার আবির্ভাব। সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এই বিচারে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন দেশের নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ থাকে না। তার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যা যুক্ত। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মার্কস বুঝেছিলেন কায়িক পরিশ্রম করে না এমন ভূ-স্বামীদের মালিকানাধীন অথবা তাদের অধিকারভুক্ত বড় বড় ভূ-সম্পত্তিতে অধীনস্থ উৎপাদকদের দ্বারা কৃষিজ এবং কারিগরী উৎপাদনের এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম অথবা শ্রমজাত পণ্যের দেওয়া/আদায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা নির্ধারিত হত না। উৎপাদক শ্রেণীগুলির ওপর মালিকানা স্বত্ব/অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক, সামরিক এবং আইনের শক্তি দ্বারাই তা সংগঠিত হয়। **মার্ক ব্লক** - এর ধারণায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অধীনতা (vassalage) এবং রক্ষণাবেক্ষণের (patronage) পারস্পরিক সম্পর্কে মানুষ আবদ্ধ। বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এর প্রধান লক্ষণ। **মরিস ডব** সামন্ততন্ত্রকে ভূমিদাসত্বের সঙ্গে প্রায় সমার্থক রূপে চিহ্নিত করেছেন। ভূমিদাসত্ব বলতে তাঁর মতে কেবল বাধ্যতামূলক কায়িক সেবাই বোঝায় না, আইন এবং রাজনীতি মারফৎ উৎপাদকের শোষণের কথা এইসঙ্গে বুঝতে হবে। **পেরী অ্যান্ডারসন** এবং **রবার্ট ব্রেনার** প্রমুখ সাম্প্রতিক মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে বলে মনে করেন না।

মার্কসীয় আলোচনা পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য গবেষক মহলের অনেকে একমত নন। এফ. এল. গ্যানসফ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য এমন কতগুলি প্রতিষ্ঠান যা অধীনতা ও সেবার— প্রধানত সামরিক— বাধ্যবাধকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেবার বিনিময়ে ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন প্রভু। **এম. এম. পোস্টান** বলেন, চাষীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ ছিল অর্থনীতির মূল নির্ভর। কিন্তু জমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। পোস্টান-এর ব্যাখ্যায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ প্রকট হয় যখন ভূসম্পত্তি ছিল জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল, কৃষি ও বাণিজ্যের গতি ছিল মন্থর। **এলিজাবেথ এ. আর ব্রাউন** সামন্ততন্ত্র শব্দটি প্রয়োগে আপত্তি করেছেন তা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না বলে। এইসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করা যায়। মধ্যযুগের ইউরোপে যে সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জমির পত্তনি-ব্যবস্থা। উচ্চতর সামন্তপ্রভুরা নিম্নতর সামন্তদের মধ্যে, আবার নিম্নতর সামন্তরা কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন বা বিলি-বন্দোবস্ত দিতেন এবং এইভাবে ভূমিকে ভিত্তি করে পিরামিডাকৃতি সমাজের স্তর-বিন্যাস হত। তবে এমনকি ইউরোপেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন সার্বজনীন রূপ ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে যেভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে তা ঘটেনি।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত করেন **ডি. ডি. কোশাম্বি**। *An Introduction to the Study of Indian History (1956)* গ্রন্থে তিনি বলেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে বিভিন্ন সামন্ত অঞ্চল গঠিত হয়। শাসকরা জমির ওপর অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক অধিকার সামন্তপ্রভুদের হাতে তুলে দেন। কোশাম্বী এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন ওপর থেকে অরোপিত সামন্ততন্ত্র *Feudalism from above,* সামন্তপ্রভুরা ক্রমশ প্রজাদের ওপর অধিকার খাটাতে থাকে। রাষ্ট্র এবং কৃষকের মধ্যে অন্তর্বর্তী স্তর হিসাবে তারা দেখা যায়। কোশাম্বীর ভাষায়, এ হল তলদেশ থেকে সামন্ততন্ত্র, *Feudalism from below.* **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** অবশ্য এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। কোশাম্বির দৃষ্টিতে ভারতের ঊর্ধ্ব এবং নিম্নস্তর থেকে সামন্ততন্ত্র একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মার্কসের ব্যাখ্যানুযায়ী উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের মূল চালিকা শক্তি। মার্কসবাদীর পক্ষে রাষ্ট্রের ওপর তলা থেকে সামন্ততন্ত্রের নিম্নদিকে বিস্তার মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কোশাম্বী স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেননি ভারতে সামন্ততন্ত্র কবে শেষ হল। *Culture and Civilization of the Indian People* গ্রন্থে তিনি অবশ্য জানিয়েছেন ব্রিটিশরা এদেশে এক নতুন ধরণের উৎপাদন মান চালু করে যা ধনতন্ত্রের অন্তর্গত।

প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের আলোচনা বিস্তারিত রূপ ধারণ করে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে **অধ্যাপক আর. এস. শর্মা** প্রণীত *Indian Feudalism* গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। তাঁর মতে ভারতের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের সূচনা খ্রিস্টিয় ৩০০ থেকে ৬০০ সময় সীমায়। পরবর্তী কয়েক শতক ধরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ৯০০-১২০০ খ্রিঃ-এর চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত তিনটি অঞ্চলের ওপর শর্মা আলোকপাত করেছেন। প্রথম, গুর্জর ও প্রতিহারদের শাসনাধীন উত্তর ও পশ্চিম ভারত; দ্বিতীয় পাল শাসিত বিহার ও প্রাচীন বাংলার বিস্তৃত ভুখন্ড; এবং শেষতঃ রাষ্ট্রকূট অধিকৃত দাক্ষিণাত্য। কোন প্রক্রিয়ায় ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়? অধ্যাপক শর্মা এরও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। গুপ্তযুগে মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের নিয়মিত কর্ষণযোগ্য জমি দান করা হত। একে বলা হয় **অগ্রহার।** যারা এইসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা যেসব চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করাতেন তাদের অবস্থা ছিল অস্থায়ী রায়তদের মতো। উত্তরাধিকার সূত্রে ও দান উপলক্ষে কৃষি-জমি উত্তরোত্তর খন্ডিত হয়। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে শূদ্ররা ভাগচাষীর কাজ করত।

পুরোহিত শ্রেণী চাষীদের কাছ থেকে খাজনা পেলেও রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেবার বাধ্য-বাধকতা তাদের ছিল না। ফলে তাঁরা একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি (ক্ষেত্রস্বামী) হিসাবে দেখা দেয়। মহীপতি বা রাজা ও কর্ষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ছেদ পড়ে। স্বাধীন কৃষকরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। কেননা, নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণি ইচ্ছামতো পুরাতন কৃষকদের উৎখাত করে নতুন ভাবে অন্য কৃষকদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করে তাদের কাছ থেকে বেগার শ্রম ও অন্যান্য অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারতেন। দানগ্রহীতাদের প্রশাসনিক ও বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। গ্রামাঞ্চলে রাজা এবং সৈন্য কিংবা সেনাবিভাগের রাজপুরুষেরা ছাউনি ফেললে গ্রামবাসীদের রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব অনেক সময় আদায় ও ভোগ করতেন। এর ফলেও স্বাধীন কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

গুপ্তযুগে শহরাঞ্চলে অবক্ষয় অধ্যাপক শর্মার বক্তব্যের অপর এক দিক। এই তত্ত্বের সমর্থনে ১৯৮৭ সালে তিনি Urban Decay in India (c. 300- c. 1000) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুটি পর্যায়ে এই অবক্ষয় ঘটেছিল। প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিংবা চতুর্থ শতকে; অপরটি ষষ্ঠ শতকে। অধ্যাপক শর্মা এর বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করেছেন— যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বহিরাক্রমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্মীয় প্রবণতা। পুরাণে কলিযুগের বিবরণে তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকের সামাজিক সঙ্কট ধরা পড়েছে বলে অধ্যাপক শর্মা মনে করেন। *বৃহৎসংহিতা* এবং ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন। খনন কার্যের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার অবশেষ পূর্ববর্তী তিন শতকের তুলনায় সংখ্যায় অল্প। আগের মতো দুর্মূল্য সামগ্রী আর চোখে পড়ে না। গৃহনির্মাণের উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। অধ্যাপক শর্মার মতে মুদ্রার অপ্রতুলতা গুপ্তযুগে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়েছিল। গুপ্তরা দৈনন্দিন কেনাবেচায় প্রয়োজনীয় তাম্র-মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন কম। ফলে উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা আঞ্চলিক হয়ে পড়ে। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীরা এতদিন রাজার বেতনভোগী ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্যিক সংকোচন ও মুদ্রা ব্যবহারের পরিণামে অধ্যাপক শর্মার অনুমান নগদ বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা রদ হয়। গুপ্তযুগে শাসন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রী-ভূত রূপ ধারণ করে। অগ্রহার ব্যবস্থায় রাজাকে দিতে না হলেও অভিজাত সামন্তদের বোধহয় তাদের এলাকা থেকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করতে হতো।

প্রাচীন ভারতের সামন্ততন্ত্র প্রসঙ্গে অধ্যাপক শর্মার বক্তব্য ঐতিহাসিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক ডি. এন. ঝা, বি. এন. এস যাদব, কে. এম. শ্রীমালি প্রমুখ তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবন্স মুখিয়া প্রমুখ তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অধ্যাপক সরকার প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতে ভূস্বামী এবং জমিতে ভাড়াটিয়া সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের তাম্রশাসনাদি বিশ্লেষণ করে (Landlordism and Tenancy in Ancient and Mediaeval India as Revealed by Epigraphical Records) বলেছেন, পুরোহিত ও মঠ মন্দিরকে যে জমি দান করা হত, তা ছিল অপ্রহত ও খিলক্ষেত্র অর্থাৎ অকর্ষিত পতিত জমি। এই জাতীয় জমি উদারহস্তে দান করার ফলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, গ্রামবসতির বিস্তার ঘটেছিল। যে-সব অকর্ষিত পতিত জমি সাধারণত দান করা হত (*অপ্রদ, অপ্রহত* বা *খিল*) তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি ছিল ক্ষেত্র বা বাপক্ষেত্র (অর্থাৎ যে জমি ছিল কর্ষণযোগ্য, উর্বরা এবং সহজেই বীজবপনীয়) **ফা হিয়েন** - এর উক্তি থেকে জানা যায় মন্দির নির্মাণের সময় রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায় জমি, বাড়ি, বাগান এবং চাষের জন্য লোক ও বলদ দান করতেন। এর থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, যে-সব জমি গুপ্তযুগে দান করা হত তা অকর্ষিত ছিল বলেই কৃষিশ্রমিক ও বলদের প্রয়োজন হত। ফা-হিয়েন আরও বলেছেন ঃ- যারা রাজার জমি চাষ করে, তারা উৎপাদনের একাংশ প্রদান করে। যারা যেতে চায় তারা জমি ছেড়ে চলে যেতে পারে, যারা থাকতে চায় তারা থাকতে পারে। সুতরাং গুপ্তযুগে যে নতুন জমিদার

শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তারা কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করতে পারত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কয়েকটি বাকাটক তাম্রশাসনে গ্রামে রাজার সেনাবাহিনীর আগমন উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা সৈন্যদের আহার্যের যোগান দিত বলে পরোক্ষ উল্লেখ আছে। কিন্তু এর থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা চলে না যে রাজকর্মচারীদের বা সৈন্য সামন্তদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নগদ বেতনের পরিবের্তে ভূখন্ড দান করা হত। কারণ, ফা-হিয়েন থেকে আমরা জানি রাজার দেহরক্ষী ও অন্যান্য সাহায্যকারী সকলেই বেতন লাভ করত।

প্রাচীন ভারতে রাজা তাঁর রাজস্বের জন্য প্রধানত নির্ভর করতেন ভূমি-রাজস্বের উপর। দানগ্রহীতাদের রাজস্ব থেকে মুক্তিদানের পরেও রাজার কয়েকটি অধিকার বজায় থাকত, — যেমন প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং খনি ও বনাঞ্চলের ওপর একচেটিয়া অধিকার। গুপ্ত লেখমালা থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে জমি দান করা হত 'নীবিধর্ম অনুসারে'। দান গ্রহীতার জমি ভোগ দখলের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু হস্তান্তরের অধিকার ছিল না। ইউরোপে প্রাচীন যুগে দাসপ্রথা এবং মধ্য যুগে ভূমিসাদ প্রথাকে ভিত্তি করে যেভাবে দাস-অর্থনীতি ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তা হয়নি। হ'লে, অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে দাসদের মুক্তির জন্য উদার বিধিনিয়ম করা হত না। এ দেশে কৃষকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ অথবা দরিদ্র হলেও কখনই ভূমিদাসে পরিণত হয় নি। শূদ্রমাত্রেই দাস ছিল, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। হরবন্স মুখিয়ার মতে মধ্যযুগে ভারতে কৃষক উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। ফলে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ইউরোপের মতো আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক এখানে গড়ে ওঠেনি।

গুপ্তযুগে নগর সভ্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনবতি ঘটেছিল, এমন সিদ্ধান্ত তর্কের সম্মুখীন হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অগ্রহারগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায়, এক একটি অগ্রহার কৃষি ও কারিগরী শিল্পের ভিত্তিতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল, তথাপি সেই সূত্র ধরে অনুমান করা চলে না যে, সমগ্র দেশে গ্রামগুলিতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনগুলিতে শ্রেষ্ঠী (মহাজন), স্বার্থবাহ (ব্যবসায়ী) এবং কুলিকে (কারিগর-শিল্পী) শব্দগুলি বারবার চোখে পড়ে। তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃত। বিহারে প্রাপ্ত সীলগুলি থেকে জানা যায় এদের নিগম বা গিল্ডের কথা। এই সীলগুলির প্রাপ্তিস্থান বৈশালীতে যে অন্তর্দেশীয় একটি কেন্দ্র ছিল, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় সে-যুগে তাম্রলিপ্ত ছিল একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বন্দর। **রোমিলা থাপার** মনে করেন রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাস পরিবর্তনর সঙ্গে সঙ্গে অলোচ্য পর্বে নতুন বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। পাটলিপুত্র পূর্বের গৌরব হারায়। কনৌজ তার স্থান গ্রহণ করে। মৌখালিদের শাসন কেন্দ্র ছিল থানেশ্বর। মথুরা এবং কাশী বস্ত্রবিপণনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

খ্রিস্টিয় ৬০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত উত্তর ভারতে মুদ্রার অনুপস্থিতি বা স্বল্পতর ব্যবহারের ধারণা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি। গুপ্ত বংশের শাসকরা অধিক পরিমাণে রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন বেশি এবং সেই তুলনায় তাঁদের তাম্রমুদ্রার পরিমাণ ছিল কম। অথচ দৈনন্দিন কেনাবেচায় রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে তাম্রমুদ্রার চল অনেক বেশি। ফা-হিয়েন বলেন গ্রামের মানুষেরা হাটে-বাজারে কেনাবেচা করতে আসত। ছোটখাট বেচাকেনার জন্য কড়ি ব্যবহার হত। প্রাচীন বাংলায় কড়ি পাওয়া যেত না। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে **মা-হুয়ান চীনা** ভাষায় লিখিত বৃত্তান্তে বলেন,— বাংলা থেকে চাল রপ্তানী হত মালদ্বীপে, পরিবর্তে সে দেশ থেকে কড়ি আসত বাংলায়। এর থেকে বাংলার বহির্বাণিজ্যের কিছুটা আভাস মেলে। তবে প্রশ্ন ওঠে, বৃহৎ অঙ্কের বাণিজ্যিক লেনদেনে যে বিপুল পরিমাণ কড়ির প্রয়োজন হওয়ার কথা, তা বণিকরা বহন করতেন কিভাবে? এই প্রসঙ্গে

দ্বাদশ শতকের শেষ ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বিনিময় মাধ্যমে হিসাবে লেখমালায় নতুন একটি শব্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *'চুর্ণী'*। মনে হয়, এর দ্বারা ধাতব চুর্ণকে বোঝান হত। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ময়নামতীতে উৎখননের ফলে আদিমধ্যযুগীয় পূর্বে রৌপ মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এইসব রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার ছিল। **নোবুরু কারাশিমা** প্রমাণ করতে চেয়েছেন চোল রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে পদস্থ অধিকারিকগণ লুণ্ঠনের মারফৎ প্রচুর সম্পদ আহরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এর সাহায্যে তারা প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। অগ্রহার সৃষ্টির স্বার্থে তার কৃষিজীবী প্রজাদের উৎখাত করেন। এক্ষেত্রে জমির বৃহৎ মালিকানা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক ছাড়াই গড়ে ওঠে।

গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করেন না **রোমিলা থাপার।** খননকার্যের ফলে যেসব প্রত্ন অবশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে তামা ও লোহার বহু নিদর্শন চোখে পড়ে। গৃহস্থালির জন্য নল যুক্ত পাত্র (Spouted pottery) লোকে ব্যবহার করত। **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** আবার দুটি কারণে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব বলে মনে করেন। *কামসূত্র* (চতুর্থ শতক) উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন গ্রাম সমাজ স্তর বিভক্ত ছিল। *মিলিন্দপন্থ গ্রন্থে* বৌদ্ধ প্রচারক নাগসেন রাজা মিলিন্দকে এক জায়গায় বলেন, গৃহস্বামীরা কেবল গ্রামবাসী— অন্যদের যেমন ক্রীতদাস বা পরিচালকদের তিনি ধর্তব্য জ্ঞান করেন না। অধ্যাপক ইরফান হাবিব বলেন— This is good evidence of what Kosambi terms feudalism from below, although he would place its period much later. (Interpreting Indian History)। অন্য যে কারণের প্রতি অধ্যাপক হাবিব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অষ্টম শতকের শুরুতেই অশ্বারোহী সেনার আবির্ভাব। সপ্তম শতকের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথের ব্যবহার অবলুপ্ত হয়ে এসেছিল। উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে অশ্বারোহীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শাসন করা সম্ভবপর ছিল। হাবিব একে বলেছেন (a kind of "Feudalism from above")।

ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। বর্তমানেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এর রেশ দেখতে পাই। অধ্যাপক বরুণ দে বলেছেন, 'আমরা যদি ওড়িষ্যায় যাই এখনও দেখব যে, যে অঞ্চলটা ছিল মুঘল বন্দি এবং পরে ব্রিটিশদের অধীনে এলো সেখানে আধুনিকতা অনেক আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। যে অঞ্চলকে মুঘলরা বলত গড়জাত বা নানা গড়ের সমষ্টি, সেখানে এখনও সামাজিক সামন্ততন্ত্র জোরদার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে যেখানে প্রচুর সামন্ততান্ত্রিক খুদে রাষ্ট্র ছিল সেখানে আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চল এখনও প্রচুর আছে। আজকের দিনে নেহেরু বংশজাত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন বিকল্প খাড়া করার কথা যারা ভাবেন তাঁরা কোন ছোট ঠাকুরকে রাজা সাহেব বলে অভিহিত করেন। তারপর বিকল্প বলে ধরে নিতে আহ্বান করেন। এর চেয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? এরই মধ্যে আস্তে আস্তে ধনতন্ত্রের প্রবর্তন আমরা দেখতে পাই। ("ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ক্রম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্য", গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান* ৩)

১২.২ আঠার শতকের ভারত

১৭০৭ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সূর্য অস্তমিত হয়। সমগ্র ভারত জুড়ে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিরতা দেখা দেয়। অভিজাত গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র ও পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়। নাদির শাহ এবং আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণে একদা বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

১৭৪০ খ্রিঃ- এর পর মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও মোগল সম্রাট তখনও আইনত ছিলেন ভারতের অধীশ্বর। কিন্তু মোগল সম্রাটের পদের ঐতিহ্য বা সম্মান অক্ষুন্ন ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে সুবাদাররা কার্যত নিজেদের অঞ্চলে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মোগল সম্রাটের প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক আনুগত্য দেখায়। মারাঠা শক্তির আর্বিভাবে মনে হয়েছিল তার মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তারাই হবে। কিন্তু ১৭৬১ খ্রিঃ- এর পাণিপথের যুদ্ধের পর সে স্বপ্ন বিলীন হয়। এই সুযোগে পূর্ব ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আধিপত্য বিস্তার করে। ইংরেজদের দাবি ছিল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের হাত থেকে তারা ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছে। আঠার শতকের ভারতের ইতিহাস তাদের মতে ঘোর কালিমাচ্ছন্ন। এই ধারণাই দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়েছে। **আচার্য যদুনাথ সরকার** সম্পাদিত *History of Bengal* গ্রন্থের মধ্যযুগের পর্ব শেষ হয় পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সামরিক সাফল্যের বর্ণনায়। ঐ সময় থেকেই তাঁর মতে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ পার হয়ে আমরা আধুনিক কালে পৌঁছিলাম। ("On 23rd June, 1757 the middle ages of India ended and her modern age began")। সতের শতকে যে অভিজাত গোষ্ঠী মোগল সাম্রাজ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করেছিল, উত্তরসূরীরা তার ঐতিহ্য রক্ষায় ব্যর্থ হল। প্রশাসন দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়, সমাজ নৈতিকতা তলানিতে ঠেকে ("hopelessly decadent soceity")। এই একই কথা তাঁর আগে বলেছিলেন ঐতিহাসিক **হার্মান গোয়েৎজ (Harmann Goetz,** *Crisis of Indian Civilization in the Eighteenth and early Nineteenth Centuries)*।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** তাঁর *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭) গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর একই রকম মসীময় চিত্র এঁকেছেন। তিনি মনে করেন,— "এর পরের পর্বটি যে- দৃশ্যটি উপস্থাপিত করে তার থেকে শেখার কিছুই নেই। লাগামহীন লুঠতরাজ, বিশৃঙ্খলা আর বিদেশি আক্রমণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল।" মারাঠা আক্রমণের ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্য কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার আলোচনা করেছেন অধ্যাপক **অশীন দাশগুপ্ত** *(Indian Merchants and the Decline of Surat)*। সুরাট বন্দরের শাসকরা ঘটনার পরিণাম বণিকদের কাছ থেকে অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সুরাটের বণিকদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। অটোমান এবং সাফাভি রাজবংশের পতন ঘটে। ইয়েমেনের গৃহবিবাদে বিভিন্ন দল এবং উপদলের টাকার খাঁই গুজরাটি বানিয়াদের মেটাতে হয়। মোখা, জেদ্দা ও বসরার বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিণামে তাদের সংকট বৃদ্ধি পায়।

সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করলে আঠার শতকের পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যজনক এবং বিশৃঙ্খলা বলে বর্ণনা করা উচিত কিনা সে-সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন ইদানীং কিছু ঐতিহাসিক। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র তাঁর *Parties and Politics in the Mughal Court, 1707-1740* গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক দশক মোগল ইতিহাস অলোচনা করে দেখিয়েছিন অভিজাতবর্গের মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না, — যেমন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল-মুলক এবং বাংলায় মুর্শিদকুলী খান। কিন্তু প্রতিভার সম্যক ব্যবহার সম্ভব ছিল না। সতীশ চন্দ্র পরবর্তীকালে আঠার শতকের ভারত প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা ভাঙনের চিত্র অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। নাদির শাহ এবং আহমদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণের পরও দিল্লি সম্পূর্ণ হতশ্রী হয়ে পড়েনি। ১৭৮০ সালে *মাসির-উল-উমারা* গ্রন্থের লেখক শা'নওয়াজ খান বলেন নাদির শাহের আক্রমণে যে ক্ষতি হয়েছিল দিল্লি তা অচিরেই কাটিয়ে ওঠে। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আমোদ প্রমোদানুষ্ঠান সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বাদ পড়েনি। সতীশ চন্দ্রের মতে শাসকবর্গ বাণিজ্যিক লাভ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, অযোধ্যার নবাব সদত খান শুল্কের হার কমিয়ে বাণিজ্যের সুবিধা করে

দিয়েছিলেন। মীর, সৌদা প্রমুখ উর্দু ভাষার কবিরা পৃষ্ঠপোষকদের ভাগ্য বিপর্যয়ে কাতর হলেও উল্লেখ করতে ভোলেন না সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষরা সামনের সারিতে চলে এসেছে। সমাজে পরিবর্তন এসেছিল এর থেকে বেঝা যায়। লাহোর, দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি শহরের জৌলুস ম্লান হয়ে এলেও বিলাস পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল মনে করার কারণ নেই, যেহেতু অভিজাতবর্গ দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল।

আঠার শতকে ভারতীয় বণিকদের অবক্ষয়ের প্রশ্নটি সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন আছে। একথা ঠিক যে উপকূলের সঙ্গে পশ্চাদভূমির যোগাযোগ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই শতকে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু সুরাট শহরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করার অসুবিধা আছে। এই বন্দর শহরের বিকাশ হয়েছিল একান্তই বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে। যা লক্ষণীয় তা হল, এখানকার অধিবাসীরা শহর সুরক্ষিত করার দায়িত্ব দীর্ঘকাল নিতে চায়নি। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ফলে তারা সহজেই শত্রুর শিকার হয়। সুরাটের সঙ্গে গুজরাটের অন্যান্য শহরের (যেমন আমেদাবাদ) পার্থক্য এই ক্ষেত্রে সহজেই চোখে পড়ে। সুরাটের বস্ত্র ব্যবসায়ের পতন যতখানি দ্রুতগতি বলে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত বর্ণনা করেন, তা বাস্তব অবস্থার কতখানি সঠিক প্রতিফলন সে সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার বাজারে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হ্রাস পাচ্ছে ১৭৪০ পর্যন্ত ইংরেজরা বাংলায় কাপড় নিয়ে ঐসব অঞ্চলে ব্যবসা করেছেন। উপরন্তু ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এই সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় হ্রাস পেলেও কফির বাজার তেজী ছিল। আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে গায়কোয়াড় বংশ গুজরাটে শান্তি ফিরিয়ে আনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব তাই সুরাটের পতনের অন্যতম কারণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে আমাদের সংশয় থেকেই যায়, বিশেষত যখন মনে রাখি যে সমুদ্র বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক সমাজের অভ্যন্তরীণ খুটিনাটি অশীন দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি। প্রাথমিক স্তরে নিযুক্ত ভারতীয় উৎপাদকদের চলিষ্ণুতা এবং উৎপাদন পুনর্বিনস্ত্য করার ক্ষমতাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বর্গী আক্রমণে বাংলার অর্থনীতির অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল বলে মনে করা অনুচিত হবে— বলেছেন **অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী।** হলওয়েল, বোল্টস প্রমুখ সমকালীন পর্যবেক্ষকদের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় কুঠিয়ালদের হিসাবপত্র থেকে বোঝা যায় বাংলার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রাক্-পলাশী পর্বে মোটের ওপর প্রচলিত ধারায় চলেছিল। আসল আঘাত আসে কোম্পানির শাসনকালে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পাশাপাশি নতুন আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন আঠার শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাঙনের চিত্র আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণ আকর্ষণ করায় নতুন শক্তি বিন্যাসের প্রতি দীর্ঘকাল আমরা যথেষ্ট দৃষ্টি দিইনি। কৃষি ব্যবস্থায় যে ভয়াবহ সংকটের চিত্র ইরফান হাবিব এঁকেছেন, তার বিস্তার ভারতব্যাপী ছিল কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন করতে ছাড়েননি। *Cambridge Economic History of India* গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বলা হয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে নতুন জমি সম্ভবত চাযের অধীনে আনা হয়। ভাঙন নয়, ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উপরোক্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের চাপ বলে অধ্যাপক হবিব যার উল্লেখ করেছেন, আঠার শতকের প্রথমার্ধে তা পরিমাপ করার সময় মনে রাখতে হবে কৃষি পণ্যের দাম প্রায় দিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর তা মোটামুটি স্থিতিশীল হয়, এমনকি তা হ্রাস পেতে থাকে (Cambridge Economic History of India, Vol. II 26). দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে মত শহরগুলি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও ফৈজাবাদ, লক্ষৌ, বেনারস, পাটনা প্রভৃতি শহরের বিকাশ ঘটে। নতুন যে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল, সেগুলির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৭২৪ খ্রীঃ স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজাম-উল-মুলক। তাঁর বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছেন সমসাময়িক ব্যক্তি কাফি খাঁ। নিজাম-উল-মুলক প্রতাপশালী জমিদারদের এবং শক্তিশালী মারাঠাদের বদান্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন।

১৭২২ খ্রিঃ সাদাত খাঁ অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলেন। বিদ্রোহী জমিদারদের সাধারণভাবে নিজেদের এলাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ বশ মানানো যায়নি। সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করত। ১৭২৩ খ্রিঃ তিনি নতুন করে তাঁর রাজ্যে রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন। ফলে জমিদারদের নিগ্রহ থেকে কৃষকদের অনেকখানি রক্ষা করা সম্ভব হয়। ১৭৩৯ খ্রিঃ তার মৃত্যুর পূর্বে অযোধ্যা কার্যত একটি স্বাধীন রাজ্যের রূপ নেয়। সাদাত খাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত। সৈনিকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তাঁর উত্তরসূরী সফদর জঙের রাজত্বকালে এলাহাবাদ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতি ও শিল্পের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৭৪ খ্রি পর তা রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সফদরজঙ অচিরেই খ্যাতিলাভ করেন। অযোধ্যার বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন তিনি। তাঁর নৈতিকতার মান ছিল প্রশংসনীয়। প্রশঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজাম ও বাংলায় মুর্শিদকুলী ছিলেন একই রকম নৈকিকতার অধিকারী। আঠার শতরেক মোগল অভিজাতবর্গ সম্পর্কে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার যে অভিযোগ সাধারণত করা হয় তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় মুর্শিদকুলীর শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর সুদক্ষ শাসনে বাংলা দেশে রাজনৈতিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করে গতিশীল করে তোলেন। তিনি কঠোর হাতে বিদ্রোহী জমিদার সীতারাম রায়, উদয়নারায়ন, গোলাম মহম্মদ, সুজাত খাঁ ও নাজাত খাঁকে দমন করেন। বাংলার ভূমি রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি পথ নির্দেশ করেন। রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। রাজস্ব বিভাগের অধিকাংশ পদে মুর্শিদকুলী হিন্দু কর্মচারীদের প্রাধান্য দেন। ঐতিহাসিক **সলিম উল্লাহ**- এর *তারিখ-ই-বাংলা* গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ মেলে। মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা ও ন্যায়পরায়ণতার তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বাণিজ্যিক বিকাশের দিকেও তার লক্ষ্য ছিল।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে জাঠরা বিদ্রোহ করে। দিল্লী, আগ্রা এবং মথুরার সন্নিকট অঞ্চলে কৃষিজীবী হিসাবে তারা জীবনধারণ করত। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও জাঠ শক্তিকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। বদন সিং সুরজমলের নেতৃত্বে নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। ভরতপুর রাজ্যে তারা সংগঠিত হয়। ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রিঃ তাদের চরম বিকাশ ঘটে। সুরজমল ছিলেন অতি দক্ষ সৈন এবং প্রশাসক। পূর্বে গঙ্গা থেকে পশ্চিমে আগ্রা এবং উত্তরে দিল্লি থেকে দক্ষিণে চম্বল পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জাঠ শক্তির পতন ঘটে।

মোগলদের বিরুদ্ধে শিক শক্তি সংগঠনে নেতৃত্ব দেন শিখদের শেষ গুরু— গোবিন্দ সিং (১৬৬৪-১৭০৮)। তাঁর মৃত্যুর পর বান্দাবাহাদুর নতুন ভাবে লড়াই শুরু করেন। ১৭১৫ সালে তিনি মোগল সৈন্যের হাতে বন্দি হন। তাঁকে হত্যা করা হয়। শিখরা ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পায় বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাঞ্জাবে মোগল শাসন ব্যবস্থার বিপর্যয়ে। শিখ ইতিহাসের এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিসল সংগঠন। মিসলগুলি ছিল সমতাভিত্তিক। তারা নিজেদের নেতা নিজেরা নির্বাচন করে। মিসল গুলি সংখ্যায় ছিল ১২। দুর্ভাগ্যবশত তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র ক্রমে অন্তর্হিত হয়। তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শিখ শক্তির বিকাশে অন্যতম বাধার সৃষ্টি করে।

মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী হিসাবে পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠাদের নিজেদের দাবী পেশ করেছিল। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ডাক দেন। উত্তর ভারতে মারাঠাদের অভিযান

১৮৬১ সালে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ্ শাহ্ আবদালীর হাতে পরাজয়ের পর কিছুকাল বাধা প্রাপ্ত হয়। পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে (১৭৬১-১৭৭২) মারাঠা শক্তির পুনরুত্থানের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, পেশোয়ার অকাল মৃত্যুতে তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বিভিন্ন মারাঠা পরিবার যেমন গায়কোয়াড় হোলকার, সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের শক্তি সংগঠিত করে। উত্তর ভারতে মহাদজী সিন্ধিয়া নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত মারাঠারা নিজেদের শক্তি অক্ষুন্ন রাখে।

দক্ষিণ ভারতে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহীশূর রাজ্য হায়দর আলী এবং টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিশেষ শক্তিশালী হয়। টিপু বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর প্রতিনিধিরা তুরস্ক, ফ্রান্স এবং অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। তার রাজ্যে সাধারণ প্রজার সন্তুষ্ট ছিল। কৃষিকার্য ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ১৭৯৯ খ্রিঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। টিপু ছিলেন উদার প্রকৃতির শাসক। মারাঠারা শৃঙ্গেরী মঠের ক্ষতিসাধন করলে তিনি তা পূরণ করেন। তার রাজপ্রাসাদের অদূরেই ছিল শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আঠার শতক বৈশিষ্ট্য বর্জিত ছিল না। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ নীতি তাঁর উত্তরসূরীরা অবলম্বন করেননি। যোধপুর ও জয়পুরের শাসকেরা মোগল রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে হিন্দুরা প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিল। হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজামের দেওয়ান ছিলেন পূরণচাঁদ। মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দুদের রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে স্থানীয় ভাষা বিকাশ লাভ করেছিল। অহম্ রাজারা অসমিয়া ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ওয়ারিশ শাহ পাঞ্জাবী ভাষায় স্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন। কেরলে মালয়ালম্ ভাষার প্রভুত বিকাশ ঘটে। কাঙ্গারা ও রাজপুত চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্যের দিক থেকে দেখা যায় লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়া এযুগের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি। অম্বরের রাজা সোয়াই জয়সিং (১৬৮১-১৭৪৩) জয়পুরে যে শহর গড়ে তুলেছিলেন তা ক্রমে বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বেনারস এবং মুথরায় সৌর পর্যবেক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সমস্ত দিক বিচার করলে আঠার শতকের ভারতকে কেবলমাত্র নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের যুগ বলা যায় না।

১২.৩ অনুশীলনী

১) আঠার শতকের ভারত প্রসঙ্গে একটি টীকা লিখুন।

২) ভারতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে একটি রচনা লিখুন।

১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

রণবীর চক্রবর্তী— প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।

বরুণ দে—"ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ক্রম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্য", গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ৩

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : ₹ 150.00

(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006